শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান

অরুণ ঘোষ

এম্-এ, এম্-এড্, পি-এইচ-ডি

এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক : সমীর ঘোষ
এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

প্রথম সংস্করণ : আগষ্ট ১৯৫৯
পুনরমুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৮৭

মুদ্রক :
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

পুরোভাষ

প্রথম সংস্করণ

আমার বইখানি লেখার পিছনে দুটি প্রধান কারণ আছে।

প্রথম, আমার নাতিদীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এক সন্তোষজনক বাংলা সংস্করণের অভাব প্রতিপদে অতি তীব্রভাবে অনুভব করে এসেছি কি শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে কি নব প্রবর্তিত বি-এ ক্লাসে সর্বত্রই শিক্ষাবিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীগণ নির্ভরযোগ্য একটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বাংলা বইয়ের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধে আমাকে বার বার অবহিত করে এসেছে। তাদের প্রেরণায় ও তাড়নায় এ তাদের অভাব মেটানোর জন্যই এই বইটি লেখা।

দ্বিতীয় কারণটি আরও ব্যাপক এবং আমার একান্ত নিজস্ব ভাবে অনুভব করা যেদিন ছাত্ররূপে মনোবিজ্ঞানের রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশ করি সেদিন থেকেই মান আচরণের অনাবিষ্কৃত প্রদেশগুলির বৈচিত্র্য ও বিবিধতা আমাকে চমৎকৃত ক এসেছে। আরও বেশী চমৎকৃত ও মুগ্ধ করে এসেছে সেই রহস্য ভেদ করার জ বিদেশী গবেষক ও শিক্ষাব্রতীগণের অনলস বিরামহীন প্রচেষ্টা। তাঁদেরই গবেষণ লব্ধ তথ্যে আজ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কলেবর সমৃদ্ধ এবং সেই মূল্যব তথ্যগুলির বাস্তব প্রয়োগেই শিক্ষার বহু সমস্যা সমাধানের পথে।

ভারতের শিক্ষা সমস্যারূপ সহস্র রাহুর কবলস্থ হলেও তাকে মুক্ত করার প্রচে অত্যন্ত উদাসীন। বাঁধ, ষ্টিলপ্ল্যাণ্ট, নভস্পর্শী প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণের ফাঁকে ফাঁ স্বাধীন ভারতের সরকার ইতস্তত দু'একটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগ স্থাপন করলেও এ ক্ষেত্রে সত্যকারের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রে জানেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষায় ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপের একা নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা আজও পর্যন্ত তৈরী হয় নি, অথচ ইংলণ্ড আমেরিকায় যা সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না।

এই দৈন্যের একটি বড় কারণ হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পিতামাত শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষাব্রতীগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব। তাঁদের সকলে মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ভিন্ন সত্যকারের শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞা কখনই গড়ে উঠতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা অশিক্ষা চেয়ে কোন অংশে কম ক্ষতিকর নয়। অথচ আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এম কতকগুলি প্রাচীন মনোবিজ্ঞান-বিরোধী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলির প্রভাব

সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টাটাই বিরাট একটি অপচয়ে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। ভারতের শিক্ষাকে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হলে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাব্রতী সকলকেই সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সেই আগামী শুভদিনটির অগ্রদূতরূপে আমার এই বইখানি অর্পণ করলাম। এই বইটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করে দেবে এবং শিক্ষার সমস্যাগুলির স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি বাস্তব ছবি তাঁদের সামনে তুলে ধরবে।

১৫ আগষ্ট, ১৯৫৯
১৬এ, ফার্ন রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৯

অরুণ ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

পরিমাপ ও পরিসংখ্যান

এক

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান নামটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান এই দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের সম্মিলনে এই বিশেষ শাস্ত্রটি গঠিত। কোন্ কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এবং কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে এই দুটি শাস্ত্রের মিলনের প্রয়োজন হয়েছে তা অবশ্যই আমাদের বর্তমান অলোচনার অন্যতম মুখ্য বিষয় হবে। তার আগে আমরা মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা এ দুটি শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হব।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ও স্বরূপ

প্রচলিত অনেক শব্দের মতই মনোবিজ্ঞান শব্দটিও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তবে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি কাহিনী পাওয়া যাবে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে। ইংরাজী সাইকোলজি[1] কথাটির উৎপত্তি হল সাইকি[2] এবং লজি[3], এই দুটি পদের সমন্বয়ে। সাইকি কথাটির অর্থ হল আত্মা। আর লজি কথাটির অর্থ হল বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। অর্থাৎ সাইকোলজি কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল আত্মার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের জন্ম দর্শনশাস্ত্রের সূতিকাগারে। দার্শনিকদের বিশ্ব-রহস্য সমাধানের প্রচেষ্টার সহায়করূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়। দর্শনের মৌলিক সমস্যাটি হল দৃশ্যমান জগতের মূলসত্তাটির স্বরূপ নির্ণয় করা। তার জন্য তাকে সব কিছুরই বাহ্যিক অস্তিত্ব ভেদ করে পৌঁছতে হয় তার মূলগত সত্তায়। দার্শনিকদের মতে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, মৌলিক সত্তাটি হল আত্মা। অতএব দৃশ্যমান জগতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যে মানুষ, তাকে জানতে হলে জানতে হবে আত্মার স্বরূপকে। দ্বিতীয়ত, সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আমাদের অর্জিত জ্ঞান, অর্থাৎ বাহিরের জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা। এই 'জানা' বস্তুটির স্বরূপ কি, কতটুকু তার যাথার্থ্য এবং কোথায়ই বা তার সীমা—এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দর্শনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে দার্শনিকেরা অনুভব করলেন যে আত্মার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং তার ফলেই সৃষ্টি হল সাইকোলজির বা আত্মার বিজ্ঞানের।

এই দর্শনভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি বহু প্রাচীনকালে। ভারতীয় দর্শনে আত্মা ও মন সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শন,

1. Psychology 2. Psyche 3. Logy

গীতা ও ন্যায়বৈশেষিকে মন, জ্ঞান, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ গবেষণা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, অগাষ্টাইন, আকুইনাস, ডেকার্ট, হব, লক, বার্কলে, হিউম প্রভৃতি দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞানের বহু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কখনও অবাস্তব কোন কিছুকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। আত্মাকে চিরকাল কল্পনা করা হয়েছে অগ্নিশিখার মত—চেতনারূপী সর্বশক্তির আধার অথচ ইন্দ্রিয়াতীত। এ বস্তু নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক চলতে পারে কিন্তু সত্যকারের বিজ্ঞান গড়ে তোলা যায় না। বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বজনীন সূত্র বা আইন খুঁজে বার করা এবং তার পদ্ধতি হল সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ। কিন্তু আত্মা সর্ব প্রকার নিরীক্ষণের ধরাছোঁয়ার বাইরে, পরীক্ষণের কথা ত দূরে থাকুক। অতএব 'আত্মার বিজ্ঞান' কথাটাই আত্ম-বিরোধী।

পরবর্তী সুধীরা সাইকোলজির এই অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করলেন এবং আত্মার পরিবর্তে তাঁরা সাইকোলজির বিষয়বস্তু করে তুললেন মনকে। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ দ্বিমত নন। তা ছাড়া মনকে আমরা চিনি, জানি, তার কার্যাবলীর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত আছি। অতএব মনকেই সাইকোলজির প্রকৃত বিষয়বস্তু করা উচিত।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে চেতনা শব্দটি ব্যবহার করলেন। তাঁদের মতে মনের চেয়ে চেতনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট। অতএব এই সব চিন্তাবিদ্ আত্মাকে সাইকোলজির রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন এবং মন বা চেতনাকে ভিত্তি করেই এই নতুন বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। তখন থেকেই সাইকোলজি আত্মার বিজ্ঞানের পরিবর্তে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান।

সাইকোলজি যখন আত্মার বিজ্ঞান ছিল তখন গবেষণার পদ্ধতি ছিল জল্পনা-কল্পনা, কেবলমাত্র অনুমান। কিন্তু এই নতুন বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি হল অন্তর্নিরীক্ষণ[1]। নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে নিজেই নিরীক্ষণ করার নামই অন্তর্নিরীক্ষণ।

মূলত এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে বহু মনোবিজ্ঞানী মনের প্রকৃতি, কার্যাবলী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চালান। বহু চিত্তাকর্ষক তথ্যে ভরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হল। নব নব তত্ত্ব ও সূত্র স্তূপীকৃত হল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এক দল নতুন মনোবিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীদের সকল আবিষ্কারগুলি অপ্রমাণিত ও অনুমানপ্রসূত বলে উড়িয়ে

1. Introspection

দিলেন। তাঁদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হল যে মন বা চেতনাও আত্মার মতই সকল প্রকার নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের গণ্ডীর বাইরে। তবে তাকে নিয়ে সত্যকারের বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে তোলা যায়? মনের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া ঘটে তার কোনটাই ত বাইরে থেকে নিরীক্ষণ করা যায় না। তাদের সম্বন্ধে সব কিছু তথ্যই অনুমান করে নিতে হয়। এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অন্তর্নিরীক্ষণ পদ্ধতি রূপে গ্রহণ-যোগ্যই নয় এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কোন মতেই বিজ্ঞানসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না।

অন্তর্নিরীক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা হলেও আসলে এটি নিরীক্ষণ নয়। কেননা যে সময়ে কোন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে ঠিক সে সময়ে সেটিকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অন্তর্নিরীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে। অতএব অন্তর্নিরীক্ষণের মধ্যে কল্পনার প্রভাব, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অনুমান প্রভৃতি যে থাকবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ ধরনের একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গড়ে তোলা যায় না।

এই নতুন মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। স্থূলই হোক আর সূক্ষ্মই হোক, সব আচরণই আমাদের নিরীক্ষণের অধীন। অতএব মনোবিজ্ঞানকে যদি সত্য সত্যই একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে হয়, তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুগুলিকে বাদ দিয়ে প্রাণীর আচরণকে করতে হবে তার নিরীক্ষণের বিষয়বস্তু।

ধরা যাক, একজনের খুব রাগ হয়েছে। যদি নিছক তার মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে রাগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে অন্তর্নিরীক্ষণের সাহায্য নেওয়া ছাড়া ঐ ব্যক্তির অন্য কোন উপায় থাকবে না। কেননা তার মনের ভিতর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে সেটা কোন উপায়েই জানা যাবে না। কিন্তু যদি ব্যক্তির আচরণকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করা হয়, তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে। লোকটির রক্তচক্ষু, চীৎকার, আস্ফালন প্রভৃতি বাহ্যিক আচরণ নিরীক্ষণ করে রেগে যাওয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। আর এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আরও উন্নত করে তোলা যায় তবে 'রেগে যাওয়া' সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম তথ্যও আমাদের হাতে এসে পেঁছবে। ঐ ব্যক্তির নানা অভ্যন্তরীণ দৈহিক পরিবর্তনগুলিও এক ধরনের আচরণ—যেমন, মাংসপেশীর সঙ্কোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে রেগে যাওয়া সম্বন্ধে বহু অতি-মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

একদল চরমবাদী মনোবিজ্ঞানী স্বয়ং মনকেই মনোবিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত করে দিয়েছেন। তাঁরা হলেন আচরণবাদী[1]। আচরণবাদীদের মতে সমস্ত আচরণই দেহের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কার্যকলাপের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। মন বা চেতনাকে তার মধ্যে আনা নিষ্প্রয়োজন। এই চরমবাদীদের মতামত অবশ্য অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেন না কিন্তু বর্তমানে যে প্রায় সকল মনোবিজ্ঞানীই প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করাকেই মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ বলে মেনে নিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সাইকোলজির স্বরূপ বার বার বদলে গেছে। সাইকোলজি প্রথমে ছিল আত্মার বিজ্ঞান, পরে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিক কালে হয়ে দাঁড়িয়েছে আচরণের বিজ্ঞান। সাইকোলজির সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক মতভেদ থাকলেও প্রাণীর আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক সূত্রাবলীর উদ্ঘাটনই যে সাইকোলজির মুখ্য কাজ এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানকে বর্তমানে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। পশু মনোবিজ্ঞান এবং মানব মনোবিজ্ঞান। মানব মনোবিজ্ঞান আবার মানব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে নূতন নূতন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন, শিশু মনোবিজ্ঞান, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, শিল্পাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। সেইরকম শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানের যে শাখাটি গড়ে উঠেছে সেইটিই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান নামে পরিচিত।

প্রাণীর আচরণের স্বরূপ ঃ সঙ্গতিবিধান

ইতিপূর্বে মনোবিজ্ঞানকে মানব আচরণের বিজ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আচরণ কথাটি নিতান্ত ছোট হলেও, অর্থের দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পারলে মনোবিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব এবং বিশালতা উপলব্ধি করা যাবে না। অতএব আমাদের পরবর্তী প্রয়াস হল প্রাণীর আচরণ বলতে আমরা কি বুঝি তা পরীক্ষা করা।

প্রাণীর আচরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে আচরণ হল সেই সব প্রচেষ্টা যা প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করার বা খাপ খাইয়ে নেবার তাগাদায় সম্পন্ন করে।

প্রাণী মাত্রেই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। বিনা পরিবেশে কোন প্রকার অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ আবার অতি জটিল এবং বৈচিত্র্যময়। আলো, হাওয়া, উত্তাপ, ঋতুর প্রভাব প্রভৃতি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে সুরু করে সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য, বংশ-

1. Behaviourist

মর্যাদা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্নেহভালবাসার দাবী প্রভৃতি অগণিত বিষয় আছে যা আধুনিক মানুষের পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং এই প্রত্যেকটি শক্তির সঙ্গে তাকে সন্তোষজনক ভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, নইলে কোন না কোন প্রকারের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই ত গেল পরিবেশের কথা। আবার খাপ খাইয়ে নেবে
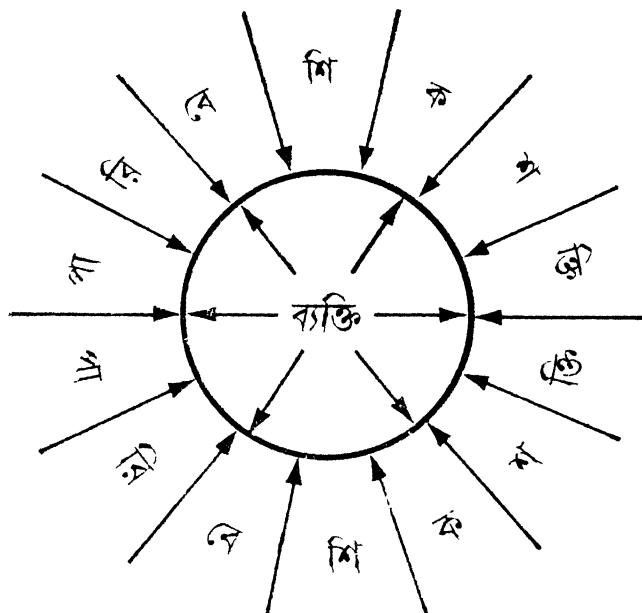
[ব্যক্তির উপর প্রতিনিয়ত পারিবেশিক শক্তিসমূহ কাজ করে চলেছে এবং ব্যক্তিকেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সেগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিবিধান করে যেতে হচ্ছে। পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি-বিধানের এই প্রচেষ্টার নামই আচরণ]

যে প্রাণী সেও স্বয়ং একটি জটিলতার প্রতিমূর্তি। প্রথমত, প্রাণীর দেহেই আছে বহু বিচিত্র যন্ত্রপাতি এবং সেগুলির প্রত্যেকটির ক্রিয়াকলাপ এত বিভিন্ন ও জটিল যে আজও বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি—যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মেরুদণ্ড, পেশী, গ্রন্থি, রক্তশিরা, মূত্রাশয়, চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি, ইত্যাদি। প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কাজে এদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব একটি ভূমিকা আছে এবং তার ফলে সঙ্গতিবিধানের কাজটিও হয়ে ওঠে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। ঘরের ভিতরের গরম হাওয়া থেকে হঠাৎ বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে দাঁড়ানর মত সামান্য একটি কাজে আমাদের দেহকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হয় যা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারব না। বিমান আক্রমণ, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনা প্রভৃতি জটিল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াগুলি যে আরও অনেক জটিল হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াসকেই আমরা সাধারণ ভাষায় আচরণ নাম দিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য প্রাণীর আচরণ হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মের মুহূর্ত থেকে এমন কি গর্ভকালীন অবস্থা থেকেই এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস সুরু হয় এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। বলতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে দেহযন্ত্রের চরম অক্ষমতার নামই মৃত্যু। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া। সুসংহত ও সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রাণীর বহুবিধ আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের সাহায্যে সেগুলির অন্তর্নিহিত সূত্র আবিষ্কার করা, এক কথায় এই হল মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী।

শিক্ষার স্বরূপ

মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তার কাজই বা কি তা আমরা মোটামুটি জেনেছি। এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে শিক্ষার স্বরূপ জানা দরকার। সাধারণ মানুষ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত সেটা হল শিক্ষার একটি অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থলব্ধ বিদ্যাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদও আমরা করি গ্রন্থ-লব্ধ জ্ঞানের তারতম্যের উপর। যে লোক লিখতে পড়তে জানে না তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্তু এইভাবে কেবলমাত্র বিশেষধর্মী কোন জ্ঞানের অর্জনকে শিক্ষা বলার অর্থই হল শিক্ষাকে একটি অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তির প্রস্তুতীকরণ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার পরিসীমা আরও অনেক বড়—সারা জীবনব্যাপী। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে কোনও নতুন অভিজ্ঞতা বা প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবর্তিত করে নতুন আচরণের সৃষ্টি করা। কাঁটাচামচের সাহায্যে ভোজনে অনভ্যস্ত কোন ভদ্রলোকের বিসদৃশ আচরণ তাঁর এক বিলাতফেরৎ বন্ধুর ডিনার টেবিলে প্রথম দিন সমবেত অতিথিগণের হাস্যকৌতুকের বস্তু হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখা গেল যে সেই ভদ্রলোকই নিপুণ হাতে কাঁটাচামচ চালাচ্ছেন এবং সেদিন তাঁর আচরণ আর কারও হাস্যোদ্রেক করল না। এই যে দ্বিতীয় দিনে ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল এটা হল শিক্ষাপ্রসূত এবং পূর্ব দিনের ডিনার-টেবিলের অভিজ্ঞতাই হল ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে শিক্ষা। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনা-বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনে এই শিক্ষা চলেছে নিরন্তর ছেদহীন ধারায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে প্রতিনিয়তই শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছে—প্রকৃতির সর্বজনীন পাঠশালায়। এক কথায় প্রাণীর জীবনবিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা

হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমার্থক। এ অর্থে কেউ নিরক্ষর থাকতে পারে কিন্তু সত্যকারের শিক্ষা-বর্জিত কেউই থাকতে পারে না।

মানুষমাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাস করে। তার প্রত্যেকটির আচরণ তার নিজের সমাজের সংগঠনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জন্য সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বিশেষ কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে পারা অবশ্য প্রয়োজন। সেজন্য কোন সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখা নির্ভর করছে সেই সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ কতকগুলি আচরণ শেখার উপর। তাছাড়া সমাজের সংরক্ষণ ছাড়া সমাজের উন্নয়নের জন্যও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। পূর্বপুরুষদের অনুসৃত আচরণগুলি ছাড়াও প্রতি যুগে কিছু কিছু পুরাতন আচরণ অচল বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই নতুন আচরণগুলি প্রবর্তন করেন সমাজসংস্কারকেরা, নতুন আদর্শ এবং চিন্তাধারার জনকেরা। অতএব সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতি এই দুয়ের প্রয়োজনেই কতকগুলি সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ-অনুমোদিত আচরণ প্রত্যেক সমাজেরই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আয়ত্ত করতে হয় এবং এই প্রক্রিয়ারই নাম শিক্ষা। এর জন্য প্রত্যেক সমাজেই আছে কতকগুলি সুসংগঠিত সংস্থা, যেমন পরিবার, স্কুল, কলেজ, ধর্মায়তন এবং ছোটখাট সামাজিক সংগঠন। এগুলিরই মাধ্যমে অপরিণত নাগরিকদের শেখান হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা বলতে আমরা সেই সব আচরণ আয়ত্ত করা বুঝি যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং যে আচরণগুলি সমাজ-অনুমোদিত কতকগুলি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক

শিক্ষকের মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দরকার কেন?

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ের প্রকৃত স্বরূপ পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এ দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট ও গভীর। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানটির সাহায্যে আমরা প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকি। কেমন করে বিশেষ বিশেষ আচরণ সংঘটিত হয়, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ বিশেষ আচরণ সৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন আচরণগুলির পেছনে কোনও সর্বজনীন সূত্র পাওয়া যায় কিনা—এই সব তথ্য নির্ণয় করা হল মনোবিজ্ঞানের কাজ। আর সেই আচরণের প্রয়োগমূলক দিকটি হল শিক্ষা বিষয়বস্তু। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ, উভয়ের দিক দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ

অপরিণত নাগরিকদের শেখানই হল শিক্ষার প্রকৃত কাজ। সেদিক দিয়ে মনোবিজ্ঞান যদি হয় আচরণের বিজ্ঞান, শিক্ষা হল আচরণের প্রয়োগশাস্ত্র।

অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি অবিচ্ছেদ্যও বলা চলে। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক তাই নয়, অপরিহার্যও সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই বিশেষ আচরণটি প্রাণী কিভাবে শিখতে পারে এবং কোন্ কোন্ পরিস্থিতি এই শেখার পক্ষে অনুকূল, কিসে স্বল্পতম প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফল পাওয়া যাবে ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যগুলি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষে নিঃসন্দেহে সহজ হয়ে উঠবে। আর এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা যে সর্বদাই কষ্টকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর হয়ে থাকে তার প্রমাণ সব দেশেরই শিক্ষার ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে।

মনে করা যাক কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মুখস্থ করাতে চান বা বীজগণিতের কোনও সমীকরণ শেখাতে চান। এখন কবিতা মুখস্থ করতে হলে বা সমীকরণ শিখতে হলে কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় এবং কোন্ কোন্ বাহ্যিক ও মানসিক পরিস্থিতি এই সব প্রক্রিয়ার অনুকূল বা প্রতিকূল এই তথ্যগুলি জানা থাকলেই শিক্ষকের প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে নইলে নয়।

প্রাচীন শিক্ষাদান পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল যে সেগুলি মনোবিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং কল্পিত ধারণার দ্বারা এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে উঠত। সত্য বলতে কি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন এনেছে ততটা অন্য কোন ক্ষেত্রে আনতে পারে নি। শিখনপ্রক্রিয়ার স্বরূপ, মুখস্থ করার উপকারিতা, শাস্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষা-ঘটিত বহু সমস্যা সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে সব ধারণা পোষণ করতেন আজ মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে সেগুলি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সেই জন্য আজ মনোবিজ্ঞানসম্মত ও সুপ্রমাণিত তথ্যের উপর বর্তমান শিক্ষণ পদ্ধতিকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সব দেশেই দেখা দিয়েছে।

সাধারণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান দিক আছে—লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এই সমস্যার সমাধান করবে দর্শনশাস্ত্র। আমরা দেখেছি শিক্ষা জীবনবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। অতএব মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার ব্যক্তিমাত্রেরই বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে সৃষ্টির বিভিন্ন রহস্য সম্বন্ধে তার জীবনদর্শন কি

ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তার উপর। সেই রকম শিক্ষার বিষয়বস্তুও প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর।

শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার পদ্ধতিটি সর্বাংশে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর। শিক্ষার অর্থ কোন বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করা। অতএব শিখন প্রক্রিয়া অপরিহার্য রূপে রয়েছে সব শিক্ষার মূলে। ফলে শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর এবং সেইজন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলাই সম্ভব নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়েও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব আছে। যেমন, যদি কোনও শিক্ষাবিদ্ বলেন যে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বাসনাগুলিকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে বা বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে সেগুলিকে অন্তর্মুখী করা হল শিক্ষার লক্ষ্য, তাহলে মনোবিজ্ঞান প্রতিবাদ জানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একান্ত অবাস্তব এবং কখনই তাকে বাস্তবে পরিণত করা যাবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু যদিও শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনশাস্ত্রের[1] উপর নির্ভর করে, তবুও এগুলি মনোবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দিলেও দেখতে হবে যে সেই লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন কিনা এবং তা বিচারের ভার শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের উপর। শিক্ষার লক্ষ্য যতই কাম্য এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত হোক না কেন যদি সেটি শিক্ষার্থীর আয়ত্তের বাইরে হয় তবে সে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শিক্ষার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা যতটা না থাকে, সে লক্ষ্যের কতটুকু বাস্তবে রূপায়িত হল এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু নির্ণয় করতে পারে এক মাত্র মনোবিজ্ঞানই। শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অভীপ্সিত পরিবর্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্তন স্থায়ী কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানমূলক পরিমাপের সাহায্যেই। শিক্ষার ফল অবশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করা যায় আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। কিন্তু এই পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত পরিমাপ পেতে হলে মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের প্রয়োজন।

1. Educational Philosophy

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞান

সাধারণত শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষার লক্ষ্য বহুলাংশে নির্ভর করে দর্শনশাস্ত্রের উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার বিষয়বস্তু যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন হবে তাই নয়, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তা বিভক্ত ও বণ্টিতও হবে। বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার মানসিক যোগ্যতা বিভিন্ন। তাছাড়া রুচি, আগ্রহ, শিখনশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়েও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকায় শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কোন্ বয়সের পক্ষে কোন্ শ্রেণীর বিষয়বস্তু উপযুক্ত হবে এবং শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশমান দেহমনের বৃদ্ধির সঙ্গে কি করে বিষয়বস্তুটিকে সুসংহত করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই।

পুঁথি থেকে সংগৃহীত মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সম্পূরক রূপে কাজ করতে পারে একমাত্র সেই জ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তা থেকে পাওয়া নতুন নতুন তথ্যাবলী। প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা এবং তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। এ থেকে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে এবং গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান অনেক পরিমাণে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককেই একজন ছোটখাট গবেষক হয়ে উঠতে হবে। সমগ্র বিদ্যালয়টি হবে তাঁর গবেষণাগার আর প্রত্যেকটি ছাত্রই হবে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু।

প্রাচীনপন্থী শিক্ষকেরা উপযুক্ত গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানকেই সার্থক শিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করতেন। তার বাইরে আর কিছুর প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা স্বীকার করতেন না। কিন্তু শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু দুটি, একটি পাঠ্য বিষয় আর একটি ছাত্র নিজে। শিক্ষাবিদ্ অ্যাডামের ভাষায় ইংরাজী 'টিচ' ক্রিয়াপদটির দুটি কর্ম থাকে। একটি শিক্ষার্থী, অপরটি শিক্ষণীয় বিষয়টি। অতএব শিক্ষকের পক্ষে পাঠ্যবিষয়টি জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনই শিক্ষার্থীকেও জানা প্রয়োজন। কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকলেই চলবে না। যে শিখবে তার সম্বন্ধেও শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এখানেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটেছে। শিক্ষার্থীকে ভাল করে জানার জন্য মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। অতএব সার্থক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকেরই মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান

আধুনিক শিক্ষা নানা দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কোন্

কোন্‌ দিক দিয়ে বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

১। ব্যক্তিগত বৈষম্য

সব মানুষ সমান নয়। দৈহিক, মানসিক ও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে মানুষে মানুষে প্রচুর প্রভেদ। ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাও অসমান। ব্যক্তিগত বৈষম্যের এই তত্ত্বটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি বড় অবদান। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই মূল্যবান মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির কোন স্থান ছিল না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর প্রকৃতিগত বৈষম্যের এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়-বস্তুটিকে পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা হয়ে থাকে।

২। শিখনপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে শিখনপ্রক্রিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে যে সাধারণত আমরা সব বিষয়বস্তু একই প্রক্রিয়ায় শিখি না। বরং শিক্ষণীয় বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখি। যেমন, জ্যামিতির উপপাদ্য শেখা ও টাইপ করতে শেখা, দুটিই শিখন কার্য হলেও শিখনের পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এখন শিক্ষক যদি শিখন পদ্ধতির এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকেন তবেই তাঁর শিক্ষণকার্য সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই শ্রমের অকারণ অপচয় হতে বাধ্য।

৩। ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী

শিক্ষা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। নবজাতকের দেহ, মন, বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা প্রভৃতি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। কিন্তু সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণতালাভ করে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা ও গতি এক ত নয়ই বরং এদের প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব ভঙ্গী এবং পথ আছে। শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে এই বিভিন্ন বিকাশভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

৪। বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ

শিক্ষা প্রক্রিয়ার দ্রুততা এবং সাফল্য দুইই বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির উপর। দেখা গেছে যে সব কিছু শেখা, বিশেষ করে চিন্তামূলক কোন কিছু শেখা, নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রা বা পরিমাণের উপর। মনো-

বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে বুদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে বর্তমানে এই বুদ্ধি পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষাদানের অনেক জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে।

৫। মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া প্রক্রিয়াবলী

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তথ্যগুলি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

৬। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের গুরুত্ব

ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার্থীর বহু আচরণের উপর তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সম্বন্ধে শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষণকার্য অপচয়বহুল হতে বাধ্য। তেমনই শিক্ষার সুষ্ঠু সম্পাদন শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নানা নূতন তথ্যের আবিষ্কার করে শিক্ষাকে অধিকতর সার্থক ও সফল করে তুলেছে।

৭। গণ-মনোবিজ্ঞান

গণ-মনোবিজ্ঞানের নানা সূত্র আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। দেখা গেছে যে এককভাবে ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে তার দলগত আচরণের নানা দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষাদান প্রথা দলমূলক, ব্যক্তিমূলক নয়। ফলে স্বভাবতই দলগত মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

৮। সঙ্গতিবিধানঘটিত সমস্যা

সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যাদির সমাধান করা সুষ্ঠু শিক্ষণ কার্যের প্রথম সোপান। সঙ্গতিবিধানের সমস্যা প্রধানত দেখা দেয় যখন শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে কোন কারণে খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়। এই ধরনের শিশুকে অপসঙ্গতিসম্পন্ন বলা হয়। যে সব শিক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তাদের শিক্ষাদান করা সব দিক দিয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যাদি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

৯। মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্র

মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্রগুলি হল সাম্প্রতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। দীর্ঘ গবেষণার ফলে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার বহু নির্ভরযোগ্য যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। তার ফলে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা সহজাত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়েছে। গতানুগতিক ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির স্থানে বিজ্ঞানসম্মত নানা প্রকৃতির শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা[1] উদ্ভাবিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ[2], আগ্রহ[3], মনোভাব[4] প্রভৃতি পরিমাপ করারও যন্ত্র আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির যথাযথ ব্যবহার যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনুশীলনী

১। মনোবিজ্ঞান বলতে কি বোঝ?

২। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের স্থান নির্দেশ কর।

৩। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধটি আলোচনা কর।

৪। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও অবদান বর্ণনা কর। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষকের কাছে কেন অপরিহার্য আলোচনা কর।

৫। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, পরিমাপ ও বিষয়বস্তুর কি সম্পর্ক আলোচনা কর।

1. Educational Test 2. Personality Traits 3. Interest 4. Attitude

দুই

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষা হল নূতন জ্ঞান ও আচরণের আয়ত্তীকরণ। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের প্রকৃতি, গতি ও সংগঠনের বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান। শিক্ষার বিষয়বস্তু হল কেমন করে নূতন আচরণ সম্পাদন করা যায় তা দেখা আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সেই আচরণটির প্রকৃতি কি এবং কি ভাবে সেটি ঘটে তা দেখা। অতএব সার্থক শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্যই।

তাছাড়া শিক্ষা নির্ভর করে শিখন প্রক্রিয়ার উপর। কোন কিছুর শিখন[1] ছাড়া শিক্ষা হয় না। আর সে শিখন হতে পারে দু'রকম বস্তুর, যথা, জ্ঞান[2], এবং দক্ষতা[3]। এ দু'রকম শিখনই নির্ভর করে প্রাণীর মানসিক শক্তির উপর। প্রাণী শিখতে পারে, অথচ জড় বস্তু পারে না। তার কারণ হল প্রাণীর শিখন ক্ষমতা আছে, জড় বস্তুর নেই। শিখনের মাত্রা, উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা সবই নির্ভর করে এই মানসিক শক্তির প্রকৃতি ও সংগঠনের উপর। এই মানসিক শক্তির স্বরূপ বা কর্মদক্ষতা জানতে হলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া শিখন বিশেষভাবে প্রত্যক্ষণ[4], সংবোধন[5], চিন্তন, বিচারকরণ, মনে রাখা, ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল। এগুলি কি ভাবে সংঘটিত হয় এবং এগুলির বৈশিষ্ট্য কি তা জানা সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও শিখন নিবিড়ভাবে জড়িত। যেমন প্রবৃত্তি[6] প্রক্ষোভ[7], আগ্রহ মনোভাব ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে তার বিভিন্ন শক্তি, চাহিদা, অভিরুচি, আগ্রহ এ সমস্ত নিয়ে সমগ্রভাবে জানতে হবে। এক কথায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে।

এই সকল কারণে বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ সুরু করলেন। তাঁদের এই

1. Learning 2. Knowledge 3. Skill 4. Perception 5. Comprehension 6. Instinct 7. Emotion

প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নিল মনোবিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা। এরই নাম হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান[1] অর্থাৎ শিক্ষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে মনোবিজ্ঞান।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

অতএব শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি সেই বিজ্ঞানকে যা সাধারণ মনোবিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সংব্যাখ্যানে ও তার নানা সমস্যাবলীর সমাধানে নিয়োজিত করে এবং ব্যাপক গবেষণা এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও সমাধানের উদ্ভাবন করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবর্তন কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখা দেয় নি। এই সময় মানব অস্তিত্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও মনোবিজ্ঞানের এই অনুপ্রবেশ ঘটে। সর্বত্রই গবেষকরা মনোবিজ্ঞানমূলক বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলেন। কালক্রমে ব্যাপকভাবে মনোবিজ্ঞানের নানা নতুন নতুন প্রয়োগমূলক শাখা গড়ে উঠতে লাগল যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এক কথায় মানব আচরণের সমস্ত অলিগলিতেই মনোবিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর সম্প্রপাত ঘটল। এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান নামে নতুন শাস্ত্রটি গড়ে ওঠে।

মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি মূলত প্রয়োগমূলক। সাধারণত মনোবিজ্ঞান হল মূলত তত্ত্বমূলক, অর্থাৎ মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্রগুলি আবিষ্কার ও সপ্রমাণিত করাই তার কাজ। কিন্তু সেগুলিকে নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন বিশেষধর্মী সমস্যার সমাধান করা এবং সেগুলির প্রকৃত ব্যবহারিক মূল্য আবিষ্কার করাই হল এই নতুন নতুন শাখাগুলির লক্ষ্য। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানও এই ধরনের প্রয়োগমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যখন এতই ঘনিষ্ঠ তখন শিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধানে প্রাচীন কাল থেকেই মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের চেষ্টা হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বর্তমান শতাব্দীর সূত্রপাত থেকেই পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে এবং বর্তমানে সেই সব প্রচেষ্টাকে আশ্রয় করে এই নূতন পূর্ণাঙ্গ মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে।

সুসংহত শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের জন্ম অতি সাম্প্রতিক হলেও এর পরিকল্পনা ও

1. Educational Psychology

সূচনা খুবই প্রাচীন। শিক্ষার পদ্ধতি যে মনোবিজ্ঞান অনুমোদিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে একথা প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করে এসেছেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক
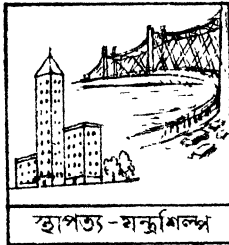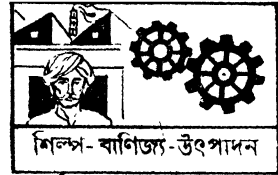
[বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মানব অস্তিত্বের প্রায় সব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ। শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সমাজবিজ্ঞান, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, শিশুপালন, অপরাধতত্ত্ব, শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের সব প্রদেশেই মনোবিজ্ঞানের আধিপত্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। যেমন, সমাজবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সামাজিক মনোবিজ্ঞান। শিশুপালনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিশু মনোবিজ্ঞান। শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিল্পাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান। সেই রকম শিক্ষাকে আশ্রয় করে যে বিশেষ মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে তার নাম শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান।]

দার্শনিক অ্যারিস্টটল সঙ্গীতকে পাঠ্যবিষয়ের একটি প্রধান অঙ্গ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রধান কারণ হল যে তাঁর মতে সঙ্গীত মনের সঞ্চিত আবেগের বোঝাকে লাঘব করে মানসিক সাম্য ফিরিয়ে আনে এবং পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। এ পদ্ধতিটির তিনি নাম দিয়েছেন ক্যাথারসিস[1] বা বিরেচন প্রক্রিয়া। আধুনিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে যাকে অ্যাব্রিকসান[2] পদ্ধতি বলা হয় তার সঙ্গে অ্যারিস্টটলের এই পদ্ধতির প্রচুর মিল আছে। অ্যারিস্টটলের এই নির্দেশকে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

রোমান শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ান শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আরও ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর অনুশাসনগুলির আধুনিকতা সময় সময় আমাদের বিস্মিত করে তোলে। তাঁর মতে শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর আগে দেখতে হবে যে তার কি ধরনের মানসিক দক্ষতা ও সহজাত ক্ষমতা আছে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হবে খেলার মধ্যে দিয়ে। দৈহিক শাস্তিকে শিক্ষার পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে, শিশুর নিজস্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের বহু অধুনা স্বীকৃত তত্ত্বের উল্লেখ কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াসও শিক্ষণের পদ্ধতিকে কেমন করে মনোবিজ্ঞানসম্মত করা যায় তা নিয়ে বিশদ্ আলোচনা করে গেছেন। তিনিই প্রথম 'ছবির বই'র সাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয় দানের প্রথার প্রচলন করেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রুশো তাঁর 'এমিল' বইতে সেই সময়ের শিক্ষা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে নিজের অভিমত দিয়ে গেছেন। যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী, অবাস্তব ও আবেগধর্মী, তবুও বিস্ময়ের কথা এই যে শিক্ষার অনেক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও নির্দেশ বর্তমান মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে প্রগতিশীলতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যায়। যখন তিনি বলছেন যে, 'তোমার ছাত্রদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তবে কাজ সুরু কর। কেননা একথা পরিষ্কার যে তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না।' বা 'কথা কথা কথা…নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যই শিক্ষকেরা প্রাণহীন ভাষাকে শিক্ষার জন্য বেছে নিয়েছেন' কিংবা 'প্রকৃতি চান যে শিশুরা পূর্ণবয়স্ক হবার আগে যেন শিশুই থাকে,' তখন তিনি যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম সূত্রগুলিরই ভিত্তি রচনা করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে যাঁরা সাহায্য করে গেছেন তাঁদের মধ্যে পেস্টালৎসির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনিই প্রথম শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে

1. Catharsis 2. Abreaction

তোলার জন্য আন্দোলন সুরু করেন এবং বাস্তবে সেই আন্দোলনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। মুনস্টারবর্গের ভাষায় পেস্টালৎসি মনোবিজ্ঞানের একজন বড় সমর্থক হলেও প্রকৃতপক্ষে মনোবিজ্ঞানে তাঁর কোন গভীর জ্ঞান ছিল না। ফলে সত্যকারের মনোবিজ্ঞানসম্মত কোন শিক্ষাপ্রণালী তিনি উদ্ভাবন করে যেতে পারেন নি। তবুও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্রষ্টাদের পুরোগামী রূপে তাঁর নাম যে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলেন জার্মানীর জোয়ান হার্বার্ট। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদানের পাঁচটি সোপান শিক্ষক সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং বহু দেশে এখনও আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি রূপে সমাদর লাভ করে আসছে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিচারে হার্বার্টের অনেক সিদ্ধান্তই বর্তমানে বর্জিত হয়েছে।

জার্মানীর আর একজন শিক্ষাবিদ্ ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেলের উদ্ভাবিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও ফ্রয়েবেল প্রধানত দার্শনিকই ছিলেন তবু তাঁর উদ্ভাবিত এই শিশুশিক্ষার ব্যবস্থাটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের একটি আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল।

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত থেকে বহু শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার সমস্যাগুলি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করতে সুরু করেন। তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস পার্কার, ষ্ট্যানলি হল, জন ডিউই, মারিয়া মণ্টেসরি, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের এবং আরও অনেকের সম্মিলিত অবদানে আজ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সাধারণ মনোবিজ্ঞান

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে কোন বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র শাস্ত্র নয়। এটি সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখাবিশেষ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যে সব গবেষণালব্ধ সূত্র সরাসরি শিক্ষার সমস্যা সমাধানে সক্ষম, সেগুলিই এই মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। সেগুলিকে আশ্রয় করে এবং শিক্ষার সমস্যাগুলি সামনে রেখে গবেষণা চালানোর ফলে যে সব নূতন সূত্র ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সুসমৃদ্ধ অবয়বটি সংগঠিত করেছে। শিক্ষাকে সার্থক, আয়াসহীন ও কার্যকর করে তুলতে হলে যে সব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি আবিষ্কার করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ফলে এর গবেষণার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ও বিশেষধর্মী হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ফলিতরূপ নয়, যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই এর জন্ম। কেননা সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেই এর কাজ শেষ হয় নি। বরং সেখানেই হয়েছে এর কাজের সুরু। সেই সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে শিক্ষার সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক গবেষণা সম্পন্ন করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই গবেষণালব্ধ নতুন তথ্যরাশির উপরই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সৌধটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বস্তুত গবেষণাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রাণ। এর বর্তমান রূপ এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সবই নির্ভর করে গবেষণার সাফল্যের উপর। শিক্ষার সমস্যাগুলি সমাধান করে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার প্রয়োজন। কেমন করে শিক্ষার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান আয়াসহীন ও আনন্দদায়ক হতে পারে, কোন্ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর হয়, কোন্ কোন্ সর্ত স্মৃতির সহায়ক ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি

শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির সমস্ত আচরণই জড়িত। অতএব শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী মানব আচরণের সকল সমস্যার ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। নীচে আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১। শিখন প্রক্রিয়া

বলা বাহুল্য শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানোই হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। প্রাণী কি পন্থায় শেখে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাপের সঙ্গে শেখার কার্যকারিতার কি সম্বন্ধ, মানসিক শক্তি, প্রক্ষোভ ও প্রেষণা প্রভৃতির উপর শিক্ষা কতটুকু নির্ভরশীল, কোন্ কোন্ পরিস্থিতি শিক্ষার অনুকূল বা প্রতিকূল ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কাজ।

২। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচিত ও সুবিভক্ত করা হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি কাজ। সেই কারণে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করাও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

৩। মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

যদিও শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কাজ, তবুও শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আরও কতকগুলি বিষয়বস্তু আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গবেষণার অন্তর্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, শিশুর প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভের স্বরূপ, তার চাহিদা ও আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, মনোনিবেশের নিয়মাবলী, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব, শাস্তি ও পুরস্কারের কার্যকারিতা ইত্যাদি মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ নির্ণয়ও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্গত।

৪। বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি

শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হল শিক্ষার্থীর প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি। দেখা গেছে যে শিখনের উৎকর্ষ এবং দ্রুততা দুইই প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। বুদ্ধিমান ছেলে তাড়াতাড়ি শেখে, স্বল্পবুদ্ধির শিখতে দেরী হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষায় সাফল্য নির্ভর করে বিভিন্নধর্মী মানসিক শক্তির উপর। অতএব বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কার্যসূচীর অন্তর্গত।

৫। পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিমাপ

শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার্থী কি পরিমাণে শিক্ষা গ্রহণ করল তা পরিমাপ করাও শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ। স্কুল-কলেজের গতানুগতিক পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি যে নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ, এমন কি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকরও এ সিদ্ধান্ত এখন সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি বড় কাজ হল বিজ্ঞানসম্মত সার্থক পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা। দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজকাল স্কুল কলেজের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা[1] গঠন করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বুদ্ধি, ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার উপযোগী আধুনিক অভীক্ষাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

৬। সামাজিক মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক এতদিন শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছিল। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি অবাস্তব, নিছক তথ্য আহরণে সীমাবদ্ধ। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সামাজিক সমস্যাগুলির

1. Educational Test

পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৭। সুপরিচালনা

ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা ও বৃত্তি সম্বন্ধে যথাযথ পরিচালনা করাও বর্তমানে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে পরিগণিত হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও বৃত্তি বেছে নিতে পারে।

অনুশীলনী

১। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়? শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ও পরিধি দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা কর।

২। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব বিচার কর। কেন শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করা হয়?

৩। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কেন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বল। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর।

৪। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সাধারণ মনোবিজ্ঞানের মধ্যে তুলনা কর।

৬। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ কর।

তিন

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

যদিও স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বহু বৎসর আগে তবুও এতদিন যে মনোবিজ্ঞান সত্যকার বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠতে পারেনি তার প্রধান কারণ হল যে এর অনুসৃত পদ্ধতিগুলি ছিল পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। সে যুগের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে ব্যক্তির কথাবার্তা, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং গঠিত ধারণা থেকেই তার মনের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং এই ধরনের অনুমান-প্রসূত সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনোবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু নিছক অতীতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গঠন করা সিদ্ধান্ত বা ধারণা কখনই অভ্রান্ত হতে পারে না এবং ফলে এই সব মনোবিজ্ঞানী যে সব সিদ্ধান্ত গঠন করতেন সেগুলি প্রায়ই পরস্পরবিরোধী হত এবং সেগুলি থেকে কোন ব্যাপারেই সর্বজনসম্মত তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হত না। ফলে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞান খেয়াল-খুসীভরা জল্পনাকল্পনার গণ্ডী ছেড়ে একপাও এগোতে পারে নি। পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১৮৭৯ সালে জার্মান মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ট[1], লিপজিগে[2] প্রথম মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করেন এবং তারপর থেকেই মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ সুরু হল।

ভুণ্ট এবং তাঁর কৃতী ছাত্ররা মনোবিজ্ঞানমূলক গবেষণার নানা অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে মনোবিজ্ঞানের বহু নতুন নতুন শাখারও সৃষ্টি হয়। তাঁদের সকলের সম্মিলিত অবদানে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের উদ্ভাবিত মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের অভিনব পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানকে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে, প্রচুর প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সত্যকারের যুগান্তর এনেছে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির[3] উদ্ভাবন ও দ্রুত উন্নতি। ইতিপূর্বে দুই একটি পদ্ধতি ছাড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন বলা চলত না। আধুনিক পরিসংখ্যান প্রণালীর আবিষ্কারের ফলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করে প্রায় ত্রুটিহীন এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

---

1. Wundt 2. Leipzig 3. Statistical Method

১। পরীক্ষণ পদ্ধতি

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতির মত আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষণ পদ্ধতি[1] বহুল ব্যবহৃত হয়। কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে অন্য ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতিই হল সর্বাপেক্ষা কার্যকর। আমরা জানি প্রকৃতি এক অবস্থায় একই রকম কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ যদি কোন বিশেষ বিশেষ সর্তের অধীনে কোন একটি ঘটনা ঘটে, আর ঐ বিশেষ বিশেষ সর্তগুলির যদি পুনরাবির্ভাব ঘটানো যায়, তবে ঐ ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটবে। মানব আচরণও এক ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা। অতএব সে ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা সত্য হবে। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সর্ত সৃষ্টি করে ঘটনাটি ঘটনাই ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করি। তার পর ঐ বিশেষ বিশেষ সর্তগুলির মধ্যে যেটির অস্তিত্ব অপরিহার্য অর্থাৎ যেটি না থাকলে ঘটনাটি ঘটতে পারে না সেই সর্তটিকে খুঁজে বার করি। সর্তগুলির সব কটিই ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য নয়, কিন্তু যেটি অপরিহার্য সেটি সাধারণ ক্ষেত্রে অন্যান্য অনাবশ্যক সর্তগুলির সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে সেটিকে সহজে খুঁজে বার করা যায় না। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে এই অপরিহার্য সর্তটিকে খুঁজে বার করার জন্য একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হয়। তার নাম পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন সাধন[2] এই পন্থায় একটি ছাড়া বাকী সর্তগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে ঐ বিশেষ সর্তটিকে পরিবর্তিত বা অপসারিত করে দেখা হয় যে ঐ বিশেষ সর্তটি ঘটনাটির প্রকৃত কারণ কি না। এইভাবে প্রত্যেকটি সর্তকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করে ঘটনাটির প্রকৃত কারণটি বার করা হয়।

এই পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে বহু মানব আচরণের সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যেগুলিকে আমরা পূর্বে কারণ বলে মনে করতাম, পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে এই ধরনের অনেক কারণ আজ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দ্রুত ও সন্তোষজনক পাঠশিক্ষার পক্ষে শাস্তিদান সহায়ক কি না, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান নিম্নলিখিত পন্থায় পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।

দু'দল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হল যাদের শিখনের ক্ষমতা ও বুদ্ধি মোটামুটি একই রকম। এবার তাদের একই পরিবেশে একই পাঠ্য বিষয় একই পদ্ধতিতে শেখানো হল। পার্থক্যের মধ্যে প্রথম দলকে শেখানোর সময় শাস্তির ভয় দেখান হল, দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোনরূপ শাস্তির ভয় দেখান হল না। এখন যদি

1. Experimental Method 2. Varying the circumstances

দেখা যায় যে প্রথম দল অর্থাৎ যাদের শাস্তির ভয় দেখান হয়েছে, দ্বিতীয় দল অর্থাৎ যাদের শাস্তির ভয় দেখান হয় নি, তাদের অপেক্ষা দ্রুত বা ভাল পাঠ শিখেছে তবে বুঝতে হবে যে শাস্তিদান শিক্ষার পক্ষে সহায়ক। আর যদি দেখা যায় যে পাঠ
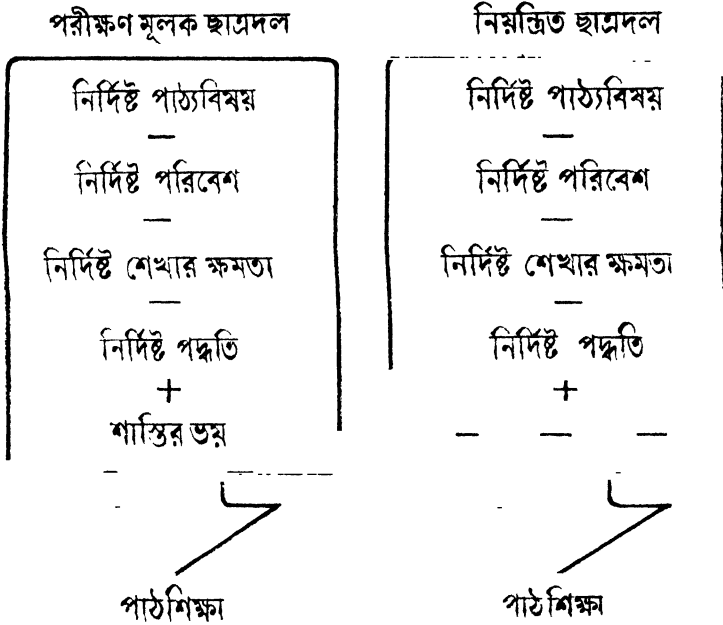
[শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ]

শেখার দিক দিয়ে দু'দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবে বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া বা না দেওয়া সমান। আর যদি দেখা যায় যে প্রথম দলের শিক্ষা দ্বিতীয় দলের শিক্ষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা মন্থর হয়েছে তবে বুঝতে হবে যে শাস্তিদান শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

প্রথম দলটি অর্থাৎ যাদের ক্ষেত্রে শাস্তির ভয় দেখান হল, তাদের বলা হয় পরীক্ষণ-মূলক দল[1] আর দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ যাদের শাস্তির ভয় দেখান হল না, তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল[2]।

যে কোন পরীক্ষণের সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল তিনটি বস্তু। প্রথম, যে ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষণ চালানো হবে (এখানে পাঠ গ্রহণ) তার পুনরাবৃত্তি[3]। পরীক্ষণের বিষয়বস্তুর যদি পুনরাবৃত্তি ঘটানো না যায়, তবে তা নিয়ে পরীক্ষা চালানোই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়, যে ব্যাপারটি পরীক্ষণ করা হচ্ছে (এখানে শাস্তির

1. Experimental Group 2. Control Group 3. Repitition

ভয়) সেটির উপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণের[1] ক্ষমতা থাকা দরকার এবং তৃতীয়, পরীক্ষণের বিষয়বস্তুগুলি পরিবর্তনশীল[2] হওয়া চাই। যে বস্তু সর্বক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে তার উপর পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না।

এখানে পাঠগ্রহণ, শাস্তির ভয় প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল হওয়াতেই পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হল।

২। ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতি

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল ব্যক্তিসত্তার মানসিক ও আচরণগত ক্রমবিকাশের স্বরূপ ও গতিভঙ্গী নির্ণয় করা। ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কি ভাবে কাজ করে, কোন্ অবস্থায় কি পরিবর্তন আনে, কখনই বা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ইত্যাদি জানার জন্য ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিকাশমান দিকগুলির পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্য দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য পর্যবেক্ষণ সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাটাই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নবজাত শিশুর মধ্যে নিতান্ত অঙ্কুরাবস্থায় থাকে। কেমন করে পূর্ণবয়স্কের ক্ষেত্রে সেগুলি সুপরিণত এবং জটিল হয়ে ওঠে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই মূল্যবান তথ্যগুলি পাওয়া গেছে এই ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির[3] প্রয়োগ করে।

৩। কেস স্টাডি পদ্ধতি বা কেস হিস্ট্রি পদ্ধতি

ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে আমরা ব্যক্তির ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর প্রত্যক্ষ করি এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করি। কিন্তু নানা কারণে সব সময়ে ঘটনাগুলির এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন, কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী বা অপরাধপ্রবণ বালক বা অসাধারণ কৃতীমান পুরুষ কেমন করে তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছল জানতে হলে তার অতীত ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পদ্ধতি হল তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলির বিবরণ নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে পরে সেগুলিকে একত্রিত করে তার ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরী করা। এই পদ্ধতিটিকে কেস স্টাডি বা কেস হিস্ট্রি পদ্ধতি[4] বলা হয়।

1. Control 2. Variable 3. Developmental Method 4. Case Study or Case History Method.

ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয় প্রত্যক্ষ-ভাবে, আর কেস ষ্টাডি বা কেস হিস্ট্রি পদ্ধতিতে সেই কাজটিই করা হয় পরোক্ষভাবে। এই ইতিহাসের উপাদানগুলি সংগ্রহ করা হয় নানা পন্থায়—কিছুটা ব্যক্তির নিজের ভাষণ থেকে, কিছুটা তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-প্রতিবেশী প্রভৃতির বিবরণ থেকে, আবার কিছুটা ব্যক্তির পরিবেশ, সমাজজীবন প্রভৃতির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। সাধারণত কেস ষ্টাডিতে কি ধরনের তথ্যাদি সংকলিত করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান, বৃত্তি ইত্যাদি।
২। যে সমস্যার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার বিবরণ।
৩। পরিবার—মা, বাবা, ভাই, বোন, অন্যান্য আত্মীয় প্রভৃতির পরিচয়—বাড়ীতে ব্যক্তির প্রতি অন্য সকলের কি ধরনের মনোভাব।
৪। শিক্ষা—পরিবারের শিক্ষার মান। ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ ও তার পরিবারের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে কি না।
৫। স্বাস্থ্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য। যৌন বিকাশের বিবরণ।
৬। বুদ্ধির মান ও বিকাশ।
৭। প্রক্ষোভগত বিকাশ।
৮। সামাজিক বিকাশ, আচরণমূলক সমস্যাদি।
৯। বৃত্তি—আর্থিক সঙ্গতি।
১০। অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যাদি—বিশেষ আগ্রহ, রুচি ইত্যাদি।

৪। চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি আর একটি মানবহিতকর বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। সেটি হল মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্র[1]। ফ্রয়েড, ইয়ুং[2], অ্যাডলার[3] প্রভৃতি প্রখ্যাত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকগণের দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজ এই নতুন বিজ্ঞানটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ[4] থেকে পাওয়া মানসিক ব্যাধির স্বরূপ সম্বন্ধে এতদিন অজানা বহু মূল্যবান তথ্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে আজ অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত করে তুলেছে। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপরই শিক্ষার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনের দিক দিয়ে অসুস্থ ছাত্রদের ক্ষেত্রে শিক্ষা অবাঞ্ছিত ফলেরই সৃষ্টি করে থাকে। ফলে মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্রে প্রচলিত কতকগুলি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হতে সুরু হয়েছে। যেমন—

1. Psychiatry 2. Jung 3. Adler 4. Psycho-Analysis

ক। ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে তার মনে যে সব চিন্তা বা কথার উদয় হয় সেগুলি চিকিৎসকের কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা যায় যে এভাবে মনের কথা বিনা বাধায় ব্যক্ত করার ফলে মনের গভীর তলদেশে নিহিত অজ্ঞাত যে সব দ্বন্দ্ব থেকে তার মানসিক বিকার বা আচরণ-বৈষম্য দেখা দিয়েছিল সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের কাছে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পক্ষে তখন ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে।

খ। প্রতিফলন অভীক্ষা

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের মূল নীতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তির মনের অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভমূলক জটিলতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বহু অভিনব অভীক্ষা আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যক্তির অপ্রকাশিত ব্যক্তিসত্তাটি এই অভীক্ষা-গুলির মাধ্যমে বাইরে প্রতিফলিত হয় বলে এগুলিকে প্রতিফলন অভীক্ষা[1] বলা হয়। রর্সা ইনকব্লট টেষ্ট[2], কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা[3], শব্দ অনুষঙ্গ অভীক্ষা[4] প্রভৃতি অভীক্ষাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

গ। প্রশ্নগুচ্ছ ও ব্যক্তিসত্তা-নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে গঠিত কতকগুলি প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি পরীক্ষা করে পরীক্ষক ব্যক্তির মানসিক সংগঠন, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৫। পরিসংখ্যান পদ্ধতি

বিংশ শতাব্দীর পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সংগে সংগে শিক্ষাশ্রয়ী মনো-বিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে। ফলে শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান[5] নামে একটি নতুন বিজ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা যেমন এক দিকে মানসিক এবং শিক্ষামূলক পরিমাপ-যন্ত্রগুলিকে বহুলাংশে ত্রুটিহীন করে তোলা হয়েছে, তেমনই আবার উপাদান বিশ্লেষণ[6] নামে নব আবিষ্কৃত গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক কার্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করাও সম্ভব হয়ে উঠেছে।

---

1. Projective Test 2. Rorschach Inkblot Test 3. Thematic Apperception Test 4. Word Association Test 5. Educational Statistics 6. Factor Analysis

৬। অন্তর্নিরীক্ষণ

ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও কার্য পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলা হয়। যেমন, রাগ, দুঃখ বা আনন্দ হলে ব্যক্তির কি ধরনের অনুভূতি হয় কিংবা কোনও সমস্যার সমাধান করতে হলে সে কি ধরনের চিন্তা করে কিংবা অতীতের কোনও কিছু মনে করতে হলে কেমন করে মনের মধ্যে সেগুলিকে সে জাগিয়ে তোলে ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্তর্নিরীক্ষণ নিছক মনের কথা বর্ণনা করা বা গল্পের ছলে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা নয়। সুপরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজের মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত-ভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং যতটা সম্ভব তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই হল সত্যকারের অন্তর্নিরীক্ষণ।

গত শতাব্দীতে অন্তর্নিরীক্ষণই ছিল মনোবিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অন্তর্নিরীক্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁরা অন্তর্নিরীক্ষণ পদ্ধতির কতক-গুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করলেন। যথা, প্রথমত, এই পদ্ধতির উপর ব্যক্তির নিজের প্রভাব এত অধিক থাকে যে এ থেকে লব্ধ তথ্যগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য হয় না। দ্বিতীয়ত, মানসিক ঘটনাটি যখন প্রকৃতপক্ষে ঘটে তখন সেটিকে অন্তর্নিরীক্ষণ করা সম্ভবই হয় না। যাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলা হয় সেটি আসলে মানসিক ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর। অর্থাৎ সেটি হয় প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্‌নিরীক্ষণ[1]। এক কথায় প্রকৃত অন্তর্নিরীক্ষণ বাস্তবে ঘটেই না। সেই কারণেই সমস্ত অন্তর্নিরীক্ষণ অপরিহার্যভাবে ব্যক্তির কল্পনা, অনুমান, অতিরঞ্জন প্রভৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, শিশু, অশিক্ষিত, দুর্বল-ভাষাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্তর্নিরীক্ষণ সম্ভবপরই হয় না।

কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও অন্তর্নিরীক্ষণের উপযোগিতাকে একেবারে তুচ্ছ করা চলে না। মনের বিবিধ প্রক্রিয়াগুলি প্রত্যক্ষভাবে জানার একমাত্র পন্থা হল অন্তর্নিরীক্ষণ। চিন্তা, কল্পনা, প্রক্ষোভের অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, মনে করা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হতে পারে। এই কারণে অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও এগুলি যে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রচুর সাহায্য করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্তর্নিরীক্ষণের ফলাফলকে গবেষণার চরম সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যদিও সম্ভব নয়, তবুও মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী

1. Retrospection

মনোবিজ্ঞানে সেগুলিকে বহুক্ষেত্রে বিকল্প তথ্যরূপে গ্রহণ করা যায় এবং সেগুলির উপর মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

এই সব কারণে অন্তর্নিরীক্ষণকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতি-রূপে গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও অন্যান্য পদ্ধতির সম্পূরক রূপে এটিকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর। অন্তর্নিরীক্ষণকে কি একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলা যায়?

২। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগের উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

৩। টীকা লেখ :—

(ক) চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

(খ) কেস হিস্ট্রি পদ্ধতি বা কেস স্টাডি পদ্ধতি

(গ) মনবিকাশমূলক পদ্ধতি

আচরণের শ্রেণীবিভাগ

প্রতি প্রাণীকেই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান[1] বা খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এই খাপ খাইয়ে নেওয়া বা সঙ্গতিবিধানের যে প্রচেষ্টা তার নামই আচরণ।

প্রাণীর আচরণকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শিক্ষাজাত[2] আর সহজাত[3]। শিক্ষাজাত আচরণ হল সেই সব আচরণ যা প্রাণী তার জন্মের পর পরিবেশের চাপে বা নিজের কোন চাহিদা পূরণের জন্য আয়ত্ত করে। আমাদের আশেপাশের যে কোন ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এই শ্রেণীর অসংখ্য শিক্ষাজাত আচরণের সন্ধান পাব, যেমন, কথা বলা, পোষাক পরা, রান্না করা, বই পড়া, ছবি আঁকা, বিবাহ করা, চাষ বাস করা, খেলা করা, বাড়ীঘর তৈরী করা, তাস খেলা, ভোট দেওয়া, ধর্মাচরণ করা ইত্যাদি। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও শিক্ষাজাত আচরণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সার্কাসের যে কোন জন্তু বা বাড়ীর পোষমানা পশুপাখীদের কথা মনে করলেই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।
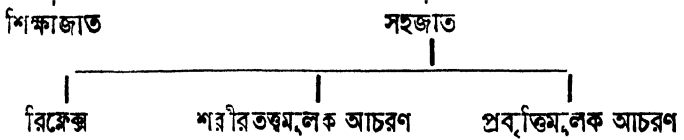
সহজাত আচরণ বলতে সেই সব আচরণকে বোঝায় যেগুলি কোনরূপ শিক্ষা থেকে প্রসূত নয়, অর্থাৎ যে আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা নিয়েই প্রাণী জন্মায় এবং যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই যেগুলি সে সম্পন্ন করতে পারে। সহজাত আচরণ আবার তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথম, রিফ্লেক্স[4], দ্বিতীয়, শরীরতত্ত্বমূলক আচরণ[5] এবং তৃতীয়, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ[6]।

১। রিফ্লেক্স

রিফ্লেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ। সময় সময় কোন বিশেষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র ব্যক্তির কোনরূপ প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই

---

1. Adjustment 2. Learned 3. Unlearned 4. Reflex 5. Physiological Behaviour 6. Instinctive Behaviour

সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বতঃসঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলা হয়। যেমন, চোখের মধ্যে ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনাআপনাই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিল্লীতে কিছু ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি হয়। শ্বাসনালীতে খাদ্যকণা ঢুকলে বিষম লাগে। এই সব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এই কাজগুলি দেহযন্ত্র স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই সম্পন্ন করে। হাই তোলা, বমি করা, হাসা, ঢেকুর তোলা, কাসা প্রভৃতিও রিফ্লেক্সের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা বিশেষ। হাঁটুর ঠিক নিচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম হাঁটু-ঝাঁকানি রিফ্লেক্স[1]। দেহের অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ গ্রন্থির রস নিঃসরণও এক প্রকারের রিফ্লেক্স। যেমন, জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া প্রভৃতি হল রিফ্লেক্স জাতীয় আচরণ।

রিফ্লেক্সও অন্যান্য আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা বিশেষ। কিন্তু অন্যান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

রিফ্লেক্সের শারীরিক সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা 'স্নায়ুতন্ত্র' শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

২। শরীরতত্ত্বমূলক আচরণ

রিফ্লেক্সের সমগোত্রীয় আর এক ধরনের সহজাত আচরণ হল শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াগুলি, যেমন, হৃদ্‌কম্পন, রক্তচলাচল, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। রিফ্লেক্সের মত এগুলিও স্বতঃপ্রণোদিত আচরণ এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন কোন শরীরতত্ত্বমূলক আচরণ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন, আবার কোন কোনটির উপর ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। রক্তচলাচল, হৃদ্‌স্পন্দন, পরিপাচন ক্রিয়া ইত্যাদি শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াগুলির উপর ব্যক্তির কোনরূপ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপ শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন।

৩। সহজাত প্রবৃত্তি

সহজাত আচরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি। এই সহজাত প্রবৃত্তির স্বরূপ ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুদিন ধরে তর্ক-

1. Knee-jerk Reflex

বিতর্ক চলে আসছে এবং এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতবাদ পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাঁর তত্ত্বটিকেই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী মতবাদগুলির প্রতিনিধিস্বরূপ বলা চলে। অতএব এটি ভাল করে জানা হলে প্রাচীন মতবাদগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ জানা যাবে। ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তিবাদ আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা এখানে এই মতবাদটির বিশদ আলোচনা করব।

ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-তত্ত্ব

ম্যাকডুগালের মতে মানুষ এমন কতকগুলি সহজাত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতা নিয়ে জন্মায় যেগুলি হল তার ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত চিন্তা এবং কাজের অপরিহার্য উৎস বা প্রেষণা শক্তি[1]। তিনি এই সহজাত প্রবণতাগুলির নাম দিয়েছেন ইন্স্টিংক্ট বা প্রবৃত্তি।
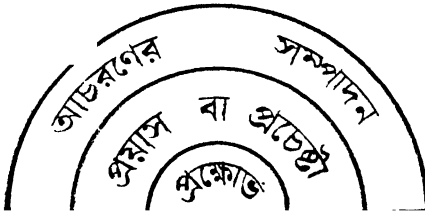
প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রবৃত্তি হল কতকগুলি সহজাত বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন যেগুলি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে থাকে—এমন কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য যেগুলি প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছে এবং মানসিক প্রকৃতির জন্মগত উপাদান হওয়ার জন্য যেগুলিকে কখনই মন থেকে দূর করে ফেলা যায় না এবং যেগুলি কোন উপায়েই প্রাণী তার জীবনকালে আহরণ করতে পারে না।

প্রবৃত্তির এই সংব্যাখ্যানকে ভিত্তি করে ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রবৃত্তি একটি সহজাত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জৈব-মানসিক প্রবণতা[2] যা তার অধিকারীকে প্রবৃত্ত করে (১) কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে বা তাতে মনোযোগ দিতে, (২) সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর কোন বিশেষ প্রকৃতির প্রক্ষোভ[7] অনুভব করতে এবং (৩) সেই বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে বা অন্তত সেভাবে কাজ করার একটা প্রেষণা অনুভব করতে।‡

---

1. Motive power 2. Psycho-physical dispositions

‡ Social Psychology—McDougall

ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির এই সংজ্ঞা থেকে প্রবৃত্তির কার্যপ্রণালীর চারটি স্বতন্ত্র সোপান দেখতে পাওয়া যায়। যথা—

প্রথম সোপানে

প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি জাগাতে পারে এমন একটি উদ্দীপক যা ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে বা যাতে সে মনোযোগ দেয়। যেমন, মনে করা যাক—ব্যক্তি হঠাৎ দেখতে পেল যে, একটা পাগলা কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে। এই সোপানটিকে প্রবৃত্তির উপলব্ধিমূলক বা জ্ঞানমূলক দিক বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় সোপানে

উদ্দীপক প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বিশেষ কোন প্রক্ষোভের অনুভূতি জাগবে। পাগলা কুকুরটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভ জাগল। এটি হল প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক দিক। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে প্রবৃত্তির এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপরিহার্য। ম্যাকডুগালের মতে প্রক্ষোভই প্রবৃত্তিজাত আচরণের পশ্চাতে প্রেষণামূলক শক্তি জোগায়।

প্রথম — উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ — সোপান

উপলব্ধিমূলক COGNITIVE
যেমনঃ পাগলা কুকুরটিকে দেখা

দ্বিতীয় — প্রক্ষোভের জাগরণ — সোপান

অনুভূতিমূলক AFFECTIVE
যেমনঃ মনে ভয়ের সঞ্চার

তৃতীয় — প্রচেষ্টার উৎপত্তি — সোপান

প্রচেষ্টামূলক CONATIVE
যেমনঃ পলায়নের প্রয়াস অনুভব

চতুর্থ — আচরণের সম্পাদন — সোপান
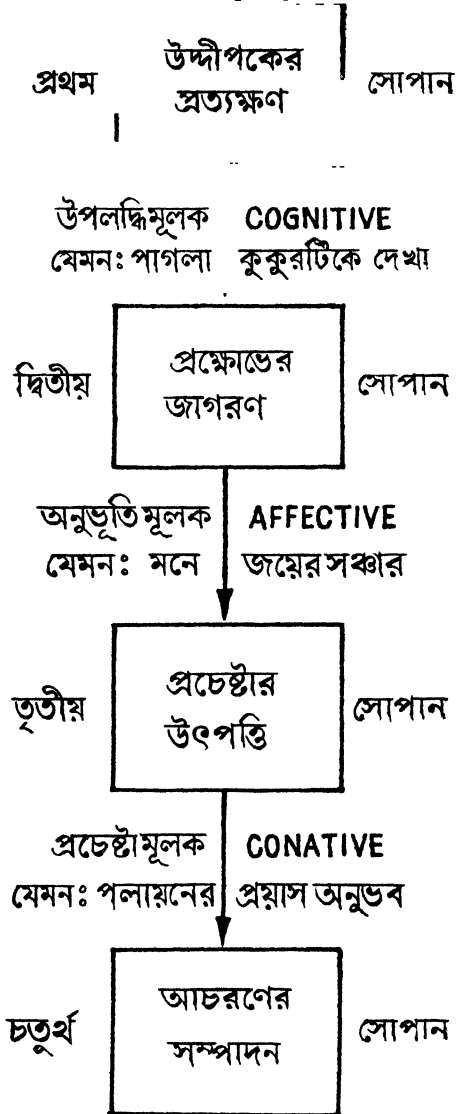
আচরণমূলক : ACTIVE
যেমনঃ পলায়নরূপ আচরণ সম্পাদন

তৃতীয় সোপানে

প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশেষ একটি পদ্ধতিতে কাজ করার তীব্র তাড়না। যেমন, পাগলা কুকুর দেখে ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মনে তীব্র ইচ্ছা হল পালাবার। এটা হল প্রবৃত্তির প্রচেষ্টামূলক বা প্রয়াসমূলক দিক। এই প্রচেষ্টার প্রকৃতি হল মানসিক ও দৈহিক উভয় শ্রেণীর প্রবণতার সংমিশ্রণ।

চতুর্থ সোপানে

ব্যক্তির প্রয়াস বা প্রচেষ্টাটি বাস্তবে আচরণের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ পালাবার তাড়না মনে অনুভব করার পরে যখন ব্যক্তি দৌড়তে সুরু করল তখন সত্যকার প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি সংঘটিত হল। এটি হল প্রবৃত্তির দৈহিক অভিব্যক্তি বা আচরণমূলক দিক।

উপরের উদাহরণে বর্ণিত প্রবৃত্তির নাম পলায়ন-প্রবৃত্তি এবং এর কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির নাম হল ভয় এবং তার আচরণ হল পলায়ন-রূপ কাজটি।

প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে উপরের প্রত্যেকটি সোপানই অপরিহার্য। মাঝে যে কোন একটি সোপান বাদ গেলে সেখানেই প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন, পাগলা কুকুরটি দেখে মনে ভয় না জাগলে পালাবার তাড়না অনুভূত হবে না। আর পালাবার তাড়না অনুভূত না হলে পালান কাজটিও ঘটবে না।

ম্যাকডুগালের মতে কৌতূহল হল এই রকম আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি আর তার কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের নাম হল বিস্ময়। পথে যেতে যেতে এক ব্যক্তি একটি চকচকে জিনিস রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। (প্রথম সোপান—প্রত্যক্ষণ); তা দেখে তার মনে বিস্ময় জাগল (দ্বিতীয় সোপান—প্রক্ষোভের জাগরণ); সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটি কুড়িয়ে নেবার একটি তীব্র ইচ্ছা সে অনুভব করল (তৃতীয় সোপান—ইচ্ছার অনুভূতি); শেষে সেটা সে কুড়িয়ে নিল (চতুর্থ সোপান—আচরণ)।

ম্যাকডুগালের মতে ইনষ্টিংক্ট বা প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি[1]। অর্থাৎ এর কেন্দ্রে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ থাকার ফলে উপযুক্ত উদ্দীপকের আবির্ভাবে সেই কেন্দ্রগত সুপ্ত প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে এবং প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ প্রচেষ্টার সৃষ্টি হয়। ম্যাকডুগালের মতে সেই জন্য প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ। এই প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত বিশেষ প্রক্ষোভটি অনেকটা মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের মত। এটি সচল হলে তবে প্রবৃত্তিরূপ গাড়ীখানা চলবে। যেমন, পলায়ন-রূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল ভয়। কৌতূহল-রূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল বিস্ময়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যে প্রবৃত্তির যে প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভের জাগরণ ছাড়া সেই বিশেষ প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হবে না। অর্থাৎ ভয় ছাড়া পলায়ন-প্রবৃত্তি কাজ করবে না, বিস্ময় ছাড়া কৌতূহল জাগবে না।

1. Affective-Conative Centre

ম্যাকডুগাল আরও বলেন যে সহজাত আচরণটির পরিণতি ঘটতে পারে দু'ধরনের অনুভূতিতে। যদি প্রবৃত্তিজাত আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তার অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পেঁছিতে পারে তবে একটা সুখ এবং তৃপ্তির আনন্দজনক অভিজ্ঞতা অনুভূত হবে। আর যদি সহজাত আচরণটি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে একটা অতৃপ্তির অনুভূতিতে সেই আচরণের পরিণতি ঘটবে।

মানব প্রবৃত্তির তালিকা

ম্যাকডুগাল যখন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা প্রথম প্রস্তুত করেন তখন তিনি মোট ১৪টি প্রবৃত্তির নাম দেন। সেগুলির সহগামী ১৪টি প্রক্ষোভ সমেত সেই ১৪টি প্রবৃত্তির তালিকাটি নীচে দেওয়া হল।[1]

১। পলায়ন **ভয়**

বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতা ভয় জাগার প্রধান কারণ। বিপদ বলতে বোঝায় দৈহিক বা সামাজিক নিরাপত্তার কোনরূপ অভাব। উচ্চ শব্দ, আকস্মিক চীৎকার, শারীরিক ব্যথা, দুর্বোধ্য বা রহস্যময় কিছু, অনিশ্চয়তা প্রভৃতিও ভয় জাগার কারণ। এই প্রবৃত্তিটির আচরণ হল ভয়ের কারণ থেকে ছুটে দূরে চলে যাওয়া এবং নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করা।

২। যুযুৎসা **ক্রোধ**

যে কোনরূপ প্রবৃত্তিজাত আচরণে বাধার সৃষ্টি হলেই মনে ক্রোধ জাগে এবং সেই বাধার কারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ক্ষুধার খাদ্য যদি কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, কিংবা সন্তানসন্ততির প্রতি যদি কেউ কোনরূপ বিদ্বেষজনক আচরণ করে তবে ক্রোধ দেখা দেবে এবং যুযুৎসা প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠবে।

৩। ঘৃণা **বিরক্তি**

নোংরা কিছু স্পর্শ করলে প্রাণীর মধ্যে বিরক্তি জাগে এবং ঐ বস্তুটির প্রতি ঘৃণা জন্মায়। এই প্রবৃত্তির আদিমতম রূপ হল যখন মুখের মধ্যে নোংরা কিছু প্রবেশ করে তখন মুখ থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটিকে বার করে দেওয়া। এই জন্যই থুথু ফেলা যে কোনরূপ ঘৃণা প্রকাশের একটি সর্বজনীন অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তির সঙ্গে পলায়ন প্রবৃত্তির সম্পর্ক খুবই নিকট।

৪। বাৎসল্য **মমতা**

সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, তার ক্ষুধার খাদ্য সরবরাহ করা প্রভৃতি হল বাৎসল্য প্রবৃত্তির প্রকাশ। এর প্রক্ষোভ হল মমতা বা স্নেহ। সাধারণত সন্তানের অসহায় অবস্থা দেখলে বা কাতর চীৎকার শুনলে পিতামাতার মধ্যে এই প্রক্ষোভ

১। প্রবৃত্তির ইংরাজী নামের তালিকাটি পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে।

জাগে। ম্যাকডুগালের মতে মানুষের এই প্রবৃত্তি নানা বিভিন্ন ও পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ পায়।

৫। আবেদন **দুঃখবোধ**

যখন প্রাণী দুঃখ বা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় খুঁজে পায় না এবং নিজেকে অসহায় বলে মনে করে তখন তার মধ্যে আবেদন প্রবৃত্তিটি দেখা দেয়। প্রাণী তার চেয়ে যাকে অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে করে তার কাছে সে দুঃখ বা বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আবেদন জানায়।

৬। যৌনপ্রবৃত্তি **কাম**

সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নারী হল যৌনপ্রবৃত্তির জাগরণের কারণ। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক যৌনবৈশিষ্ট্য বা যৌনচিহ্নও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজ করে থাকে। এই প্রবৃত্তির আচরণও প্রধানত দেহগত। ফ্রয়েডের মতে এই প্রবৃত্তিটিই প্রাণীর সমগ্র জীবনপ্রচেষ্টার মূলে। তিনি এই প্রবৃত্তির নাম দিয়েছেন লিবিডো।[1]

৭। কৌতূহল **বিস্ময়**

কোন কিছু নতুন, দুর্বোধ্য, পূর্বে না দেখা এবং যার স্বরূপটি পুরোপুরি বোঝা যায় না এমন বস্তু প্রাণীর মনে বিস্ময় জাগায় এবং সেটিকে ভাল করে জানার জন্য তার মধ্যে কৌতূহল রূপ প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

৮। বশ্যতা **হীনমন্যতা**

নিজের চেয়ে যাকে বড় বা উন্নত বলে মনে করা যায় এমন কারও সামনে উপস্থিত হলে ব্যক্তির মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা হীনতার ভাব জাগে এবং তার মধ্যে সেই উচ্চতর ব্যক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

৯। আত্ম-প্রতিষ্ঠা **আত্মগরিমা**

এই প্রবৃত্তিটি বশ্যতা প্রবৃত্তির ঠিক বিপরীত। নিজের চেয়ে ছোট বা হীন কারও উপস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে আত্মগরিমা রূপ প্রক্ষোভ জাগে এবং নিজেকে তার কাছে উন্নত ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

১০। যৌথ-প্রবৃত্তি **একাকিত্ববোধ**

প্রাণীর মধ্যে দলবদ্ধভাবে বাস করাটা প্রবৃত্তিমূলক। কোন প্রাণী নিজের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে নিজেকে একা মনে করে এবং তার মধ্যে স্বজাতীয়দের সঙ্গে দল বাঁধার প্রবৃত্তি জাগে। এই প্রবৃত্তিটির কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ হল একাকিত্ববোধ।

১১। খাদ্য-অন্বেষণ **ক্ষুধা**

প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন খাদ্য। সেই জন্য খাদ্য-অন্বেষণ হল

1. Libido

সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যেই অতি প্রবল একটি প্রবৃত্তি। ক্ষুধার অনুভূতি হল এর কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ।

১২। সঞ্চয় স্বত্ব-বোধ

প্রাণীর কোন চাহিদা মেটাতে পারে এমন বস্তু দেখলেই সেটিকে নিজের অধিকারে আনা এবং সঞ্চিত করে রাখার প্রবৃত্তি তার মধ্যে জন্মায়। এর কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ হল বস্তুটির উপর অধিকারের অনুভূতি।

১৩। নির্মাণ সৃজনী-স্পৃহা

প্রাণীর নিজের এবং তার আত্মীয়দের জন্য আবাসগৃহ নির্মাণের স্পৃহা থেকেই এই প্রবৃত্তির উৎপত্তি এবং অন্যান্য বস্তু নির্মাণ করার প্রচেষ্টাতেও এই প্রবৃত্তির প্রয়োগ দেখা যায়। নতুন কিছু সৃষ্টি করার অনুভূতি হল এর কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ।

১৪। হাস্য আমোদ

ম্যাকডুগালের মতে ক্রোধ এবং সহানুভূতি এই দু'য়ের মাঝামাঝি প্রক্ষোভ হল আমোদবোধ। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আমরা ক্রোধ বা সহানুভূতি অনুভব করতে পারি। যখন আমরা এই দু'য়ের একটিও অনুভব করি না তখন আমরা হাসি।

প্রবৃত্তির এই মতবাদটি প্রচারের পর ম্যাকডুগাল তাঁর পরবর্তী বইতে[1] প্রপেনসিটি[2] বা প্রবণতা বলে আর একটি কথার ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা অবশ্য তিনি ইনষ্টিংক্ট কথাটি পরিত্যাগ করেন নি বা তাঁর প্রবৃত্তি মতবাদের মধ্যে কোন বিশেষ নূতনত্ব আনেন নি। সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত যে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি আছে এবং যে কেন্দ্রটির জন্য প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট গতিধারা বা সংগঠন ধরে এগোয় সেই কেন্দ্রটিরই তিনি প্রবণতা বলে স্বতন্ত্র একটি নাম দিয়েছেন।

মানুষের এই সহজাত কর্মপ্রবণতার পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাকডুগাল তাঁর পূর্বের চোদ্দটি প্রবৃত্তির সঙ্গে আরো কয়েকটি নতুন নাম যোগ করেছেন এবং তাঁর এই পরের তালিকা অনুযায়ী মানুষের সহজাত কর্মপ্রবণতার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট সতেরটি। নীচে সেগুলির নাম ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হল।[3]

প্রবণতা	কাজ
১। খাদ্য অন্বেষণ প্রবণতা	খাদ্যসংগ্রহ এবং সঞ্চয় করা।
২। বিরক্তি প্রবণতা	কতকগুলি ঘৃণা-উৎপাদক বস্তু পরিহার করা এবং সেগুলি থেকে দূরে থাকা।
৩। যৌন প্রবণতা	সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কামনা করা এবং তার সঙ্গ করা।

1. The Energies of Man—McDougall 2. Propensity

3. প্রবণতার ইংরাজী নামের তালিকাটি পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে।

৪	ভীতি প্রবণতা	ব্যথা বা আঘাত দিতে সমর্থ এমন কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে পালান এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া।
৫।	কৌতূহল প্রবণতা	নতুন কোন বস্তু বা স্থান পরীক্ষা করা।
৬।	রক্ষণমূলক বা বাৎসল্য প্রবণতা	শিশুকে খাওয়ান, বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং আশ্রয় দেওয়া।
৭।	যৌথ প্রবণতা	সমজাতীয়দের সঙ্গ করা এবং দলভ্রষ্ট হয়ে পড়লে দলে ফিরে আসার চেষ্টা করা।
৮।	আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক প্রবণতা	স্বজাতীয়দের উপর শাসন ও প্রভুত্ব করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা বা জাহির করা।
৯।	বশ্যতামূলক প্রবণতা	অধিকতর শক্তিমানকে সম্মান দেখান, তার অনুসরণ করা এবং তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা।
১০।	ক্রোধ প্রবণতা	কোন প্রবণতার প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হলে রাগ করা এবং সেই বাধা জোর করে দূর করার চেষ্টা করা।
১১।	আবেদন প্রবণতা	নিজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলে সাহায্যের জন্য উচ্চস্বরে চীৎকার করা।
১২।	সৃজনমূলক প্রবণতা	আশ্রয়স্থল ও তৎসংশ্লিষ্ট উপকরণাদি নির্মাণ করা।
১৩।	সঞ্চয় প্রবণতা	প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু সংগ্রহ করা বা নিজের আয়ত্তে আনা এবং তা সংরক্ষণ করা।
১৪।	হাস্য প্রবণতা	অপরের ত্রুটিতে বা অসাফল্যে হাসা।
১৫।	আরাম প্রবণতা	অস্বস্তিকর বা আরামনাশক কোন কিছু থেকে দূরে থাকা।
১৬।	বিশ্রাম বা নিদ্রা প্রবণতা	ক্লান্ত হলে শোওয়া, বিশ্রাম নেওয়া বা ঘুমান।
১৭।	পরিব্রাজন প্রবণতা	নতুন নতুন স্থানে ঘুরে বেড়ান।

উপরের ১৭টি প্রবণতা ছাড়াও ম্যাকডুগালের মতে মানুষের একাধিক অতি সরল এবং সাধারণধর্মী প্রবণতা আছে। এগুলির প্রধান কাজ হল দেহের বিশেষ বিশেষ চাহিদা

মেটান, যেমন, নিশ্বাস ফেলা, কাসা ইত্যাদি। ম্যাকডুগাল যে এগুলিকে রিফ্লেক্স না বলে প্রবণতা বলে বর্ণনা করেছেন তার প্রধান কারণ হল যে তাঁর মতে এগুলির সম্পাদনের পেছনেও প্রচেষ্টা-প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি আছে।

ম্যাকডুগালের দেওয়া এই নতুন প্রবণতার তালিকাটির সঙ্গে আগের দেওয়া প্রবৃত্তি তালিকাটির নামের দিক দিয়ে ছাড়া খুব বড় একটা পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রবৃত্তি কথাটির স্থানে প্রবণতা কথাটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ম্যাকডুগাল একটি বড় সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ বলতে যে বাঁধা-ধরা অপরিবর্তনীয় আচরণ বোঝায় তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। সাধারণত প্রবৃত্তি হল এমন একটি সহজাত অন্ধ শক্তি যার তাড়না প্রতিহত করার মত ক্ষমতা প্রাণীর নেই। প্রবৃত্তির গতিবেগ অদম্য। যেমন, মৌমাছি চাক বাঁধবেই, গুটিপোকা গুটি তৈরী করবেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্ধ অদম্য অমোঘ প্রবৃত্তির কাজ খুব অল্পই দেখা যায়। ম্যাকডুগাল যখন প্রথম তাঁর প্রবৃত্তি মতবাদ প্রচার করেন তখন মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে প্রবৃত্তির কাজের দিক দিয়ে তিনি কোনও প্রভেদ করেন নি। কিন্তু পরে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির পরিবর্তে প্রবণতা কথাটি ব্যবহার করায় তিনি মানব আচরণের অসীম পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য

ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়।

১। প্রবৃত্তি সহজাত, শিক্ষাপ্রসূত নয়। মানব শিশুর ক্ষেত্রে স্তন্যপান করা, হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে সাঁতার কাটা, মুরগীর বাচ্চার ক্ষেত্রে পাথর-কুচি ঠুকরে খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলি কোনরূপ পূর্ব শিক্ষা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২। এই কাজগুলি শিক্ষাপ্রসূত না হলেও এগুলিতে পটুত্বের অভাব হয় না, এবং যে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এগুলির সৃষ্টি সেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এগুলি পর্যাপ্ত। পাখীর বাসা তৈরী করা, মৌমাছির চাক বাঁধা ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্দেশ্যমূলক স্বরূপটি। কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণই উদ্দেশ্যহীন নয় এবং প্রত্যেক আচরণই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে পেঁছানর জন্য সৃষ্ট।

৪। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মূলত প্রাণীর বেঁচে থাকার তাগাদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রবৃত্তি যেন প্রকৃতিদত্ত কতকগুলি অস্ত্র যার সাহায্যে প্রাণী তার পৃথিবীতে টিঁকে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলি অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই তৃপ্ত করতে পারে। যেমন, যদি মানব শিশুকে কেমন করে স্তন্যপান করতে হয় এটা শিখে

নিয়ে স্তন্য পান করতে হত তা হলে তার পক্ষে একদিনও বাঁচা সম্ভব হত না। খাদ্য পেষণ করে হজম করার জন্য মুরগীর ক্ষেত্রে পাথরের কুচি খাওয়া অবশ্য দরকার। এখন যদি মুরগীর বাচ্চাকে ঠুকরে খাওয়ার কাজটা শিখে নিয়ে তারপর এ কাজটা করতে হত তবে সে কোন খাদ্যই হজম করতে পারত না। প্রাণীর বাঁচার জন্য এই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি আগে থেকেই প্রকৃতি প্রাণীকে শিখিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান যাতে জীবন-যুদ্ধের প্রথম পর্বেই সে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়।

৫। প্রাণীকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচতে সাহায্য করা ছাড়াও কতকগুলি প্রবৃত্তির লক্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে টিঁকিয়ে রাখা। যৌন প্রবৃত্তি এবং প্রজনন-মূলক আচরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতিগত সংরক্ষণ। এছাড়া যৌথ-প্রবৃত্তি, বাৎসল্য, নির্মাণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীর জাতিগত সংরক্ষণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৬। প্রবৃত্তি বিশেষ একটি প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীনভাবে বিদ্যমান থাকে। যেমন, মৌমাছি মাত্রেই চাক বাঁধে, সব শুঁয়োপোকাই গুটি তৈরী করে ইত্যাদি।

৭। প্রাণীর সারাজীবনই প্রবৃত্তির প্রভাব অব্যাহত থাকে। তবে সমস্ত প্রবৃত্তিই সারাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, স্তন্যপান প্রবৃত্তি বড় হলে থাকে না। আবার অনেক প্রবৃত্তি বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বদলে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রবৃত্তি আমৃত্যু সক্রিয় থাকে, যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণের প্রবৃত্তি, কৌতূহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

৮। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধিপ্রসূত আচরণের প্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে সেই আচরণ পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিবেশ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আচরণও বদলে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ পূর্ব-নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয় এবং বহুলাংশে যান্ত্রিক। সেইজন্য এর কার্যকারিতা অব্যর্থ ও ত্রুটিহীন। তবে যেহেতু এর মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই সেহেতু যদি একবার এর পরিবেশের নির্দিষ্ট সংগঠনে কোন পরিবর্তন ঘটে তবে প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৯। প্রবৃত্তিজাত আচরণ বিশেষ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের, যদিও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এই অভিব্যক্তি একই প্রকৃতির রূপ গ্রহণ করে থাকে। যেমন, সব বাবুই পাখীই এক প্রকারের বাসা তৈরী করে। সব মৌমাছিদের গড়া মৌচাকেরই গড়ন মোটামুটি অভিন্ন। এই অভিন্নতার পেছনে আছে অবশ্য দৈহিক গঠনের মিল। হাঁসের বাচ্চাদের জলে সাঁতার কাটতে হবে বলে তাদের পায়ের পাতা জোড়া থাকে। মুরগীর বাচ্চাদের ঠুকরে পাথরকুচি খেতে হবে বলে তাদের ঠোঁট লম্বা

ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ একটি প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত করতে হলে যে ধরনের দৈহিক গঠন দরকার প্রাণী সেই বিশেষ দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মায়। আর সেই জন্য প্রাণীদের প্রবৃত্তিও যেমন ভিন্ন তাদের গঠনও সেই রকম ভিন্ন।

১০। প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে আছে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হয় প্রচেষ্টা যা শেষে পর্যবসিত হয় আচরণে। এই প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি আলোড়িত হলে প্রাণীর মধ্যে জাগে একটি অস্বস্তিকর উত্তেজনা[1] এবং এই অস্বস্তিকর উত্তেজনা দূর হয় বিশেষ প্রবৃত্তিজাত আচরণের সফল সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির তুলনা

প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে প্রবৃত্তিজাত এবং বুদ্ধি-প্রসূত আচরণ—এই দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনা করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাই।

প্রথমত, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়ই সহজাত। দুইই ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয়, এর শক্তির উৎস হল এর অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি। বুদ্ধি কিন্তু নিজে একটি শক্তি।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি পরিবর্তনধর্মী, এ থেকে জাত আচরণ বৈচিত্র্যে ভরা। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন আচরণ সম্পাদন করাই হচ্ছে বুদ্ধির প্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। বস্তুত সেই জন্যই বুদ্ধির আবির্ভাব। আর প্রবৃত্তি অপরি-বর্তনধর্মী। এ থেকে জাত আচরণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন এবং যান্ত্রিক। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় খাপ খাইয়ে নেবার সামর্থ্যটুকু মাত্র প্রবৃত্তির আছে। যদি কোনও কারণে সেই পরিবেশ কিছুমাত্র বদলে যায় তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধির কার্যকারিতা পরিবর্তনশীল এবং নতুন পরিবেশেই বিশেষভাবে তার উপযোগিতা প্রমাণিত।

তৃতীয়ত, বুদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তির কর্মপ্রচেষ্টা পূর্ব-নির্ধারিত ও শিক্ষার প্রভাবমুক্ত। অতীত শিক্ষার সাহায্য নেওয়ার ফলেই বুদ্ধিজাত আচরণ এত বিচিত্র ও বিভিন্ন হতে পারে। আর শিক্ষার সাহায্য ছাড়া কাজ করার জন্যই প্রবৃত্তিজাত আচরণ নূতনত্বহীন ও যান্ত্রিক হয়।

চতুর্থত, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, দুইই প্রকৃতি কর্তৃক প্রাণীকে প্রদত্ত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের অস্ত্র বিশেষ। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি হল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণীর আদিমতম হাতিয়ার। আর প্রবৃত্তির তুলনায় মানবজীবনে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে যখন কালক্রমে প্রাণীর পরিবেশ এতই জটিল ও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে যে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির সাহায্যে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা তার পক্ষে

1. Tension

দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অস্ত্ররূপে তার অস্ত্রাগারে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে।

প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু প্রচুর মতভেদ আছে। হবহাউস, ম্যাকডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তি-মতবাদীরা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে রাজী নন। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত আচরণের মধ্যেও নতুন বা পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করার ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধি সর্বত্র অঙ্গীভূত হয়ে আছে। অতএব তাঁদের মতে প্রবৃত্তি আর বুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য করা নিতান্তই অসঙ্গত। ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ সুনিশ্চিত বিরোধিতা নেই। তাঁর মতে যে আচরণে অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা অল্প সে আচরণ প্রবৃত্তি-জাত। আর যে আচরণে এই সম্ভাবনা অধিক সে আচরণ বুদ্ধিজাত।[1]

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে এই বিতর্ক নিতান্ত অর্থহীন। একথা খুবই সত্য যে বাস্তবে প্রাণীর কোন বিশেষ আচরণের কতটুকু প্রবৃত্তিজাত আর কতটুকু বুদ্ধিজাত তার সুনিশ্চিত পার্থক্যীকরণ সম্ভব নয়। কেননা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি দুইই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীর অস্ত্রস্বরূপ। যেখানে প্রবৃত্তি সঙ্গতিবিধানে ব্যর্থ হয়ে যায় সেখানেই বুদ্ধি আসে তার সাহায্যে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলে তাদের আচরণের অধিকাংশ প্রবৃত্তিজাত। তবে তাদের মধ্যেও বহুক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। উচ্চতর প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের আচরণের উপর প্রবৃত্তির চেয়ে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী এবং সেই জন্যই মানুষের আচরণের মধ্যে প্রবৃত্তিসুলভ যান্ত্রিকতার অভাব দেখা যায়। কিন্তু তা বলে মানব আচরণে যে প্রবৃত্তির প্রভাব একেবারে নেই একথা বলা চলে না।

যদিও ব্যবহারিক জীবনে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না তবুও তত্ত্বের দিক দিয়ে এ দুটি যে বিভিন্নধর্মী একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কেননা জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এমন একটি দিন ছিল যখন বুদ্ধি বলে কোন বস্তু প্রাণীর মধ্যে দেখা দেয় নি এবং তখন প্রাণী নিছক প্রবৃত্তিজাত আচরণের সাহায্যেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করত। এমন কি বর্তমানেও নিম্নতম প্রাণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি পরিচালিত আচরণই প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সেইরকম মানুষের মত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে এমন আচরণ বহু দেখা যায় যেগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত। আমাদের ঐ উপরের যুক্তিকে আর কিছু এগিয়ে নিয়ে গেলে আমরা এমন একটি আগামী দিনের কথাও ভাবতে পারি যেদিন মানুষের সব আচরণই সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পুরোপুরি বুদ্ধি-পরিচালিত হয়ে উঠবে।

প্রবৃত্তিজাত আচরণকে যান্ত্রিক বলে বর্ণনা করা হল বলে একথা যেন মনে না করা

1. Instinct in Man : Drever

হয় যে প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ অন্ধ বা উদ্দেশ্যহীন। বরং তার বিপরীতটি ঠিক। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে, নইলে নয়। যেমন, নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেই পালাবার প্রবৃত্তি জাগে। অতএব কখনই পলায়নরূপ কাজটিকে অন্ধ বা উদ্দেশ্যহীন বলা চলে না। তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণকে যান্ত্রিক বলার কারণ হল যে এর মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য বা পরিবর্তনশীলতা নেই। পরিবেশ বদলে গেলেও বা গতানুগতিক আচরণের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি পাল্টায় না, একই ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধিজাত আচরণের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। পরিবেশের পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুদ্ধিজাত আচরণ নিজেকেও পরিবর্তিত করার ক্ষমতা রাখে।

একটি উদাহরণ দিলেই প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্ষুধায় খাদ্যের দিকে ছুটে যাওয়া প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত। মনে করা যাক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের সামনে এক টুকরো মাছ রাখা হয়েছে। মাছটা দেখামাত্রই বিড়ালটি তার দিকে ছুটে যাবে। এই তার প্রবৃত্তিজাত আচরণ। এখন এই মাছ আর বিড়ালের মাঝখানে একটি বড় কাঁচের দেওয়াল রাখা হল। তার ফলে সোজাসুজি খাবারে গিয়ে পৌঁছন আর বিড়ালটির পক্ষে সম্ভব হল না। কিন্তু কাঁচের দেওয়ালটির পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে খাবারে গিয়ে ঠিক পৌঁছন যায়। এখন ক্ষুধারূপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে বিড়ালটি আগের দিনের মত ছুটে যেতেই কাঁচের দেওয়ালে ধাক্কা লাগল এবং তার প্রচেষ্টা প্রতিহত হল। সে কিন্তু এইভাবেই বারবার কাঁচের ভিতর দিয়ে সোজা পথে খাবার পৌঁছনর চেষ্টা করতে লাগল। এটি হল তার পুরোপুরি প্রবৃত্তি-জাত আচরণ এবং এর প্রকৃতি পুরোপুরি যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয়।

বার বার এই ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন সে কাঁচটার চার পাশে ঘোরাফেরা করতে সুরু করল এবং কিছুক্ষণ এই ধরনের প্রচেষ্টার পরই কাঁচটির পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার পথটি সে খুঁজে পেল এবং সেই পথে সে খাবারে গিয়ে পৌঁছল। এই দ্বিতীয় স্তরের আচরণটিকে আমরা বুদ্ধি-পরিচালিত আচরণ বলব। কেননা এর মধ্যে পূর্বের যান্ত্রিকতা নেই এবং এটি পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব আচরণকেই প্রবৃত্তিজাত বলতে চান। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমূলক এবং বুদ্ধির প্রয়োগজনিত আচরণ, এই দুয়ের মধ্যে সীমারেখা এতই স্পষ্ট এবং এবং দুয়ের প্রকৃতিও এত ভিন্ন যে এই পার্থক্যীকরণ একান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। অন্তত প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীলতার দিক দিয়ে প্রবৃত্তিজাত ও বুদ্ধিজাত আচরণের মধ্যে যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে তা অনস্বীকার্য।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক

ম্যাকডুগালের মতবাদ অনুযায়ী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং সেই বিশেষ প্রক্ষোভটি সেই বিশেষ প্রবৃত্তিকে জাগায়। প্রবৃত্তি হচ্ছে বিশেষ একটি আচরণ-প্রবণতা, আর প্রক্ষোভ হচ্ছে প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত প্রেষণাশক্তি। যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ সৃষ্টি ও সম্পন্ন করে ঐ প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত বিশেষ প্রক্ষোভটি। যখন কেন্দ্রস্থিত প্রক্ষোভটি জাগে তখনই প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়। আর যদি প্রক্ষোভটি না জাগে তাহলে প্রবৃত্তিটি নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, পলায়ন প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত প্রক্ষোভ হল ভয়। যখন ভয় জাগে তখনই ব্যক্তির মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে পালায়। আর যদি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও ব্যক্তির মধ্যে ভয় না জাগে তাহলে পলায়ন প্রবৃত্তি জাগবে না এবং ব্যক্তি পালাবেও না। এক কথায় প্রবৃত্তির সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। ম্যাকডুগাল মানুষের ১৪টি প্রবৃত্তি ও সেগুলির কেন্দ্রস্থিত ১৪টি প্রক্ষোভের তালিকা দিয়েছেন।

কিন্তু ম্যাকডুগালের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী, যেমন জন ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি। অবশ্য যদিও ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ম্যাকডুগালের সঙ্গে একমত নন, তবু তাঁদের প্রবৃত্তিঘটিত মতবাদটি মোটামুটি ম্যাকডুগালের মতবাদেরই সমগোষ্ঠী। ড্রেভার বলেন, যে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে তিনটি বস্তু। যথা, প্রথম, একটি অনুভূত মানসিক তাড়না[1], দ্বিতীয়, একটি প্রত্যক্ষিত বস্তু বা পরিস্থিতি এবং তৃতীয়, কোন আগ্রহ বা সার্থকতাবোধের[2] একটি অনুভূতি যা পরিণতি লাভ করে প্রাণীর সন্তুষ্টিতে বা পরিতৃপ্তিতে।

প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে ড্রেভার বলেছেন, যে যদি কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ তার সহজ বাধাহীন পথে এগোয় এবং তার সার্থকতাবোধের অনুভূতিটি পরিতৃপ্ত হয় তবে কোন প্রক্ষোভের জাগরণ ঘটবে না। কিন্তু যদি এই আচরণ কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন একটা মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে এবং এই উত্তেজনাই বিশেষ একটি প্রক্ষোভের রূপ নেবে। ড্রেভার বলতে চান যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের সৃষ্টিকালে যে মানসিক তাড়না অনুভূত হয় সেটা প্রক্ষোভ নয়। সত্যকারের প্রক্ষোভ জাগে তখনই যখন সেই প্রাথমিক তাড়না কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্ষোভের কাজ হল সেই বাধাপ্রাপ্ত তাড়নার পিছনে শক্তি জোগান এবং আচরণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে যাতে বাধাটা অতিক্রম করা যায় তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগার ফলে প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন বা নূতনত্ব দেখা দেয় তাতে প্রাণীর পক্ষে সঙ্গতিবিধানের কাজটি আরও উন্নতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে যদি এই প্রক্ষোভ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় জেগে ওঠে তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সঙ্গতিবিধানে একেবারেই

1. Impulse 2. Worthwhileness

অসমর্থ হয়ে ওঠে। যেমন, বিপদ দেখে প্রাণী পালাবার একটা তাড়না অনুভব করে, কিন্তু তখন তার মধ্যে ভয়রূপ কোন প্রক্ষোভ জাগে না। আর যদি সে বিনা বাধায় পালিয়ে যেতে পারে তবে তার মনে ভয় একেবারেই জাগবে না। কিন্তু যদি সে পালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবেই তার মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভ জাগবে। এই ভয় তার পালাবার তাড়নাকে আরও তীব্র করে তুলবে এবং প্রাণীটি পালাবার জন্য নানা বিভিন্ন রূপ আচরণ করতে থাকবে। কিন্তু ভয় যদি অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তবে তার পালাবার সমস্ত আচরণই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে পালাতে পারে না। যেমন দেখা গেছে যে বাঘ বা অজগরের সামনাসামনি পড়ে হরিণের বাচ্চা এতই ভয় পেয়ে যায় যে সে পালানর সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ড্রেভার প্রবৃত্তিজাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের জাগরণের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন কোন বিশেষ প্রবৃত্তিজাত আচরণ সম্পন্ন হওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সেই বিশেষ আচরণটি যে সেই বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে যথেষ্ট নয় এইটিই প্রমাণিত হয়। তখন সাময়িক ভাবে প্রাণীর প্রাথমিক মানসিক তাড়না বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাতে প্রাণী এই অবকাশে নতুন কোন উন্নত আচরণ উদ্ভাবন করে উঠতে পারে। আর মানসিক তাড়নার এই বাধাপ্রাপ্ত ও আচরণের সাময়িক বিবৃতি থেকে জন্মায় প্রক্ষোভ। এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। প্রাণীকে তার জটিল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে হলে তার জন্মলব্ধ আচরণধারা ক্রমশ বদলাতে হবে। আর যতই সে তার পুরাতন আচরণধারা বর্জন করে সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টা শিখবে ততই তাকে নতুন নতুন প্রক্ষোভের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ। সেই জন্য যে প্রাণীজাতির আচরণ-বৈচিত্র্য যত বেশী, তার প্রক্ষোভের জটিলতা এবং অভিনবত্বও ততই প্রচুর। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ গতানুগতিক ও অপরিবর্তিত পথ ধরে চলে বলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভের বিচিত্রতা খুবই কম। কিন্তু মানুষের আচরণ পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বহুবিধ হওয়ার ফলে তার মধ্যে প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও প্রকাশ যেমনই বিচিত্র তেমনই সেগুলি সংখ্যাতেও অগণিত।

অতএব ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে যে প্রক্ষোভ থাকবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কখন কখন প্রবৃত্তিজাত আচরণটি বিনা বাধায় সম্পন্ন হলে প্রাণী কোনরূপ প্রক্ষোভ একেবারে অনুভব নাও করতে পারে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্ষোভের অনুভূতি না থাকলেও একটা বিশেষ আগ্রহের অনুভূতি বা সার্থকতা-বোধ সমস্ত প্রবৃত্তিজাত আচরণের পেছনেই আছে। ড্রেভারের মতে এই প্রাথমিক অনুভূতিটি প্রক্ষোভজাতীয় নয়, সেটা কেবল একটা জৈব-মানসিক শক্তি বিশেষ। প্রকৃত প্রক্ষোভ দেখা দেয় তখনই যখন এই প্রাথমিক শক্তিটির অভিব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু একথা ড্রেভার স্বীকার করেন যে কতকগুলি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাকডুগালের ব্যাখ্যাটাই সত্য। কতকগুলি প্রবৃত্তিজাত আচরণ প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে ঘটতে পারে না। ড্রেভার এই কারণে প্রবৃত্তিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছেন—বিশুদ্ধ ও প্রক্ষোভধর্মী। বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ যে সকল প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, সেগুলির অন্তর্গত হল সেই আচরণগুলি যেগুলি ব্যক্তি সঙ্গীতিবিধান, মনোনিবেশ, সঞ্চালন[1], বাচনক্রিয়া[2] প্রভৃতির ক্ষেত্রে সম্পন্ন করে। আর প্রক্ষোভধর্মী প্রবৃত্তির অন্তর্গত হল দশটি প্রবণতা যথা, ভয়, ক্রোধ, শিকার, সংগ্রহ, কৌতূহল, যৌথ-প্রবৃত্তি, পূর্বরাগ, আত্মশ্লাঘা, হীনমন্যতা এবং বাৎসল্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি মতবাদের সঙ্গে সামান্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া ড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য নেই।

প্রক্ষোভ ব্যাহতির সূত্র

ড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের একটি সূত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। ড্রেভার দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তিজাত আচরণ যদি সহজ পথে চলতে গিয়ে ব্যাহত হয় তবেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং যদি প্রক্ষোভ অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে আচরণের সহজ অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে যায়। ঘটনাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। পড়া তৈরী করার সময় বা পড়া দেবার সময় যদি কোন কারণে শিক্ষার্থীর সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহত হয় তবে তার মনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রচেষ্টা আরও বেশী করে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে যতটুকু সাফল্য লাভ করা সম্ভব তাও সে লাভ করতে পারে না।

এই জন্য শিক্ষকের দেখা উচিত যে,

প্রথমত, শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতার উপযোগী নয় এমন কোন কাজ যেন শিক্ষার্থীকে করতে দেওয়া না হয়। কারণ এ ধরনের কাজে প্রথমেই ব্যর্থতা আসে এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে কখনও বিদ্রূপ বা নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ এর দ্বারা তার মধ্যে বিরূপ প্রক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠবে এবং তার ফলে তার অক্ষমতার মাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশটিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে সর্বদাই অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রবৃত্তির প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই এই মতভেদটি প্রসূত।

1. Locomotion 2. Vocalisation

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্ প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি সূত্রের কথা বলেছেন। প্রথমটি, প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্র[1], আর দ্বিতীয়টি, প্রবৃত্তির নিরোধের[2] সূত্র।

১। প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্র

প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্রের দ্বারা জেমস বলতে চান যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তি বিশেষ একটি সময়ে পূর্ণতালাভ করে এবং তার পরে ধীরে ধীরে সেটি হীনশক্তি হতে থাকে এবং শেষে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে তা থেকে একটা অভ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে এবং যা পরে ব্যক্তির মধ্যে থেকে যায় তা অভ্যাসটিই, প্রবৃত্তিটি নয়। যেমন, যৌথ-প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে শিশু অপরের সঙ্গ খোঁজে, সমবয়সীদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু বড় হলে এই যৌথ প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দলবাঁধা, সঙ্গ খোঁজা প্রভৃতি আচরণগুলি তার চরিত্রে একটি বিশেষ অভ্যাস রূপে থেকে যায়। আবার যে প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে এ ধরনের কোন বিশেষ অভ্যাসের জন্ম হয়নি, সে প্রবৃত্তিটি কোনরূপ চিহ্ন না রেখেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন, শিশুর স্তন্যপান করার প্রবৃত্তি বড় হলে চলে যায় এবং তা থেকে সাধারণত কোনরূপ বিশেষ অভ্যাস ব্যক্তির মধ্যে থেকে যায় না।

জেমস স্পষ্টতই ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মত প্রবৃত্তিকে অত প্রাধান্য দেন নি। তিনি প্রবৃত্তিকে অনেকটা অভ্যাস গঠনের সোপান বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে অভ্যাস গঠন শেষ হয়ে গেলে প্রবৃত্তির কাজও শেষ হয়ে যায়।

২। প্রবৃত্তির নিরোধের সূত্র

জেমসের দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ হল যে অভ্যাসের দ্বারা কোন বিশেষ প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করা এমন কি রুদ্ধ করাও যেতে পারে। যেমন, বাঘ দেখলে পালান মানুষের প্রবৃত্তিজাত কিন্তু সার্কাসে যারা কাজ করে তারা বাঘ দেখে পালায় না। এখানে পলায়ন-রূপ প্রবৃত্তিজাত আচরণের নিরোধ বা পরিবর্তন সম্ভব হল অভ্যাসের দ্বারা।

জেমসের প্রথম সূত্রটির ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল। তাঁর মতে প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয় এবং অভ্যাসের গঠন হয়ে গেলে সেটি বিলুপ্তও হয়ে যায় না। প্রবৃত্তি মনের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কর্মপ্রবণতা। এ থেকে অভ্যাসের জন্ম হয় একথা সত্য, কিন্তু অভ্যাস সৃষ্টি করার পর এর কাজ শেষ হয়ে যায় না। অভ্যাস গঠনের পরও প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তি যে ক্ষণস্থায়ী নয় তার বহু প্রমাণ প্রাণী জীবনে পাওয়া যায়। যেমন, কোন একটি বন্যপাখীকে আজন্ম একটি ছোট খাঁচায় বন্দী করে রাখার পরে সেটি বেশ বড় হয়ে উঠলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন দেখা গেল যে বন্দীদশার জন্য যে সব প্রবৃত্তিজাত আচরণের বিকাশ ইতিপূর্বে তার মধ্যে একেবারেই ঘটে নি সেগুলি তখন পূর্ণমাত্রায় তার মধ্যে

---

1. Law of Transitoriness 2. Law of Inhibition

প্রকাশ পেল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি চিরস্থায়ী ও অনপনেয়। প্রবৃত্তি যদি সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে পাখীটির ক্ষেত্রে ছাড়া পাবার পর এই প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা অভ্যাসকে এক ধরনের প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জন্মগত অভ্যাস বলে বর্ণনা করেন। এঁদের মতে প্রবৃত্তির যেমন প্রাণীকে বিশেষ একটি কাজে প্রবৃত্ত করার ক্ষমতা আছে, তেমনি অভ্যাসের মধ্যেও সেই রকম একটি প্রেষণামূলক শক্তি আছে এবং সেই জন্য অভ্যাস নিজে থেকেই প্রাণীকে কোন বিশেষ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে।

ম্যাকডুগাল অভ্যাসের এই প্রেষণামূলক শক্তির কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলতে চান যে প্রাণী যখন কোন অভ্যাসগত আচরণ সম্পন্ন করে তখন অভ্যাসের কোন প্রেষণামূলক শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে সে তা করে না। তার সেই আচরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়না থাকে। অর্থাৎ অভ্যাস একটি পুরোপুরি যান্ত্রিক আচরণ। এর নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। অভ্যাস হল কোন প্রবৃত্তি-মূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিছক উপকরণ মাত্র।

উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়তার সূত্র

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে স্বীকার করে নিলেও আমরা অভ্যাস সম্বন্ধে ম্যাকডুগালের উপরের উক্তিটি মেনে নিতে পারছি না। অভ্যাস প্রথমে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে সৃষ্টি হলেও পরে যে তা নিজেই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে এটি মনোবিজ্ঞানের একটি সুপ্রমাণিত তথ্য। উডওয়ার্থ[1] দেখিয়েছেন যে, একটি আচরণ প্রথমে সৃষ্টি হতে পারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে, কিন্তু পরে সেটি নিজেই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে ব্যক্তির প্রেষণাশক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে। যেমন একজন তার স্বল্প আয়ে সংসার চালাবার (উদ্দেশ্য) জন্য মিতব্যয়িতার অভ্যাস (উপকরণ) সুরু করল। কিন্তু পরে যখন তার আয় পর্যাপ্ত হয়ে উঠল, তখনও সে তার মিতব্যয়িতা ছাড়তে পারল না। এখানে অভ্যাসের ফলে উপকরণ নিজেই পরে উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। অলপোর্টের[2] প্রসিদ্ধ 'উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়তার তত্ত্ব'টি[3] এই তথ্যকে ভিত্তি করেই গঠিত!

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রবৃত্তি জন্মগত আর অভ্যাস অর্জিত। প্রবৃত্তিমূলক আচরণ স্বতঃপ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবর্জিত ও স্বশক্তি-চালিত। অভ্যাস ইচ্ছা-নির্ভর ও প্রচেষ্টা-প্রসূত। তবে যদি কোন অভ্যাস বার বার চর্চার ফলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে তখন সেটি নিজেই আচরণের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রবৃত্তি থেকেও আবার অভ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, খাওয়ার অভ্যাসটি

1. Woodworth 2. Allport 3. Theory of Functional Autonomy of Motive

খাদ্য-অন্বেষণ রূপ প্রবৃত্তি থেকে জাত। অভ্যাসের প্রকৃতি ও গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খণ্ডে 'অভ্যাস' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রবৃত্তি তত্ত্বের সমালোচনা

প্রবৃত্তি তত্ত্বটি ম্যাকডুগাল প্রমুখ প্রাচীনপন্থীদের মতবাদ। এই মতবাদটি বহুল প্রচারিত ও সমর্থিত হলেও বর্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটি সর্বজনস্বীকৃত নয়। প্রাণীর আচরণের উপর বিশদ গবেষণার ফলে এমন অনেক নতুন তথ্য হস্তগত হয়েছে যেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি তত্ত্বটি আজ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রবৃত্তি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার মধ্যে কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

(ক) মানুষের কোন একটি বিশেষ আচরণের ব্যাখ্যা রূপে যদি একটি বিশেষ প্রবৃত্তিকে খাড়া করা হয় তবে সেই আচরণের সত্যকারের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। এতে মানব আচরণের মত একটি অতি জটিল বস্তুকে অনুচিতভাবে অতি-সরল করে তোলা হয়।

(খ) প্রবৃত্তি মতবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবণতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানব-আচরণ কেবল মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র নয়। এর একটি সুসংহত ও সামগ্রিক রূপ আছে এবং সেটিকে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক কথায় সম্পূর্ণভাবে মানব আচরণকে ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্তি অক্ষম।

(গ) ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিরই একটি বিশেষ সহগামী প্রক্ষোভ আছে। কিন্তু বাস্তবে এর বহু বিপরীত নিদর্শন দেখা যায়। অবশ্য ড্রেভার, গিনসবার্গ প্রভৃতি মতবাদীরাও একথা স্বীকার করেন।

(ঘ) প্রবৃত্তিগত আচরণ সর্বজনীন নয়। মানুষের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রচলন দেখা যায়। রুথ বেনেডিক্ট[1], মার্গারেট মিড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় মানব-আচরণের মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সভ্য মানুষের মধ্যে মৌলিক আচরণের প্রকৃতি মোটামুটি এক রকমের হলেও অসভ্য মানব সমাজে আচরণ ধারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এমন অনেক মানব-সমাজ আছে যেখানে বাৎসল্য বলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এস্কিমোদের মধ্যে যুযুৎসা প্রবৃত্তি এক প্রকার নেই বললেই চলে।

(ঙ) মানুষের কোন আচরণই অপরিবর্তনীয় এবং যান্ত্রিক হয় না। তবে কেমন করে বলা চলে যে আচরণ প্রবৃত্তি-প্রসূত? বস্তুত ম্যাকডুগালের বর্ণিত সতেরটি প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ আচরণকেই আধুনিক

---

1. Ruth Benedict 2. Margaret Mead

মনোবিজ্ঞানীরা প্রবৃত্তিজাত বলতে রাজী নন। তাঁদের মতে মানুষের ক্ষেত্রে সত্যকারের প্রকৃতিজাত আচরণ ঘটে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন যৌন-আচরণ, খাদ্য-অন্বেষণ, যৌথ-আচরণ ইত্যাদি। অন্যান্য তথাকথিত প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি প্রকৃতপক্ষে এত পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় যে সেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলা চলে না।

(চ) ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের গবেষণা থেকে জানা যায় যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে আমরা আগে সহজাত বলে মনে করতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সহজাত নয়, সেগুলি অর্জিত। অর্থাৎ অনেক আচরণকে আমরা সহজাত মনে করে প্রবৃত্তি-প্রসূত বলে ধরে নিয়ে থাকি, কিন্তু সেগুলি সহজাত বা প্রবৃত্তিমূলক নয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-প্রসূত।

(ছ) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে কোন বৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে আছে বিশেষ কোন শরীরগত সংগঠন। যেমন দেখা যায় রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রবৃত্তির পেছনে কোন শরীরগত বৈশিষ্ট্য নেই, তবে কেমন করে প্রবৃত্তিকে সহজাত বলা চলে? এটি বার্নার্ডের সমালোচনা। এই সমালোচনায় অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শারীরিক সংগঠন ছাড়া কোন কিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না।

(জ) বার্নার্ডের আর একটি সমালোচনা হল যে, যে সব আপাত সরল ও সাধারণ আচরণকে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলা হয় আসলে সেগুলি মোটেই সরল ও অমিশ্র কোন আচরণ নয়, বরং যথেষ্ট জটিল ও একাধিক আচরণের এক একটি মিশ্র রূপ। যেমন, যৌন-আচরণ বা সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য। এ দুটির কোনটিই একটি অমিশ্র আচরণ নয়। এগুলি একাধিক আচরণের সমষ্টি এবং ব্যক্তির চার পাশের সামাজিক পরিবেশ থেকে শেখা। বার্নার্ড অবশ্য প্রবৃত্তিকে একেবারে অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে সত্যকারের প্রবৃত্তিজাত আচরণ কয়েকটি জৈবিক চাহিদা মেটাবার জন্য সম্পাদিত হয়, যেমন নিশ্বাস ফেলা, কাশা ইত্যাদি।

এগুলির কোন সামাজিক গুরুত্ব নেই এবং ব্যক্তির আচরণ নির্ণয়ে এগুলির কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও নেই।

(ঝ) প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানীরা এক মত নন। কারও মতে প্রবৃত্তির সংখ্যা একটি বা দুটি। আবার কারও মতে কম পক্ষে একশটি। বার্নার্ড প্রায় ৫০০ জন প্রবৃত্তিমতবাদীর মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তির সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই।

(ঞ) ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সমস্ত কাজের পেছনে প্রেষণা-শক্তি একমাত্র প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্তির অন্য কোন উৎস নেই। কিন্তু বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন না। অলপোর্টের প্রসিদ্ধ 'উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়তার সূত্র' থেকে জানতে পারি যে কোন অর্জিত আচরণ বা অভ্যাস

নিজে থেকেই উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে এবং আচরণের পেছনে প্রেষণা শক্তি জোগাতে পারে। উডওয়ার্থ এই ঘটনাটিকেই উপকরণের[1] উদ্দেশ্যে[2] পরিণত হওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি ছাড়াও প্রেষণা-শক্তির অন্য উৎস আছে।

প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ : কনরাড লোরেঞ্জ

প্রবৃত্তির উপর আধুনিকতম মতবাদ দিয়েছেন কনরাড লোরেঞ্জ[3] নামে একজন ইউরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ। প্রাণী আচরণের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফলে লোরেঞ্জ প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি ও কার্য সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। লোরেঞ্জ তাঁর এই গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পান। আমরা নীচে তাঁর মতবাদটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

লোরেঞ্জের মতে প্রাণীর সহজাত আচরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন রিফ্লেক্স, ট্যাক্সিস[4] এবং প্রবৃত্তিজাত আচরণ।

রিফ্লেক্স হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে প্রাণীদেহের কোন বিশেষ অঙ্গের বা মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়া। যেমন, লালাক্ষরণ, গ্রন্থির রস নিঃসরণ ইত্যাদি।

ট্যাক্সিস হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য সম্পূর্ণ প্রাণীর সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া। ট্যাক্সিস আচরণে প্রাণী হয় কোন বিশেষ উদ্দীপকের দিকে এগিয়ে যায় নয় তা থেকে দূরে সরে আসে। ট্যাক্সিস সব সময়ে কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত আচরণ বিশেষ। স্রোতের বিরুদ্ধে মাছের সাঁতার কাটা, আলোর দিকে পোকার এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হল ট্যাক্সিসের উদাহরণ।

প্রবত্তিজাত আচরণ কিন্তু রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস থেকে অনেক দিক দিয়ে পৃথক। প্রথমত, বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিজাত কাজ বিভিন্ন হবে। একই রিফ্লেক্স এবং একই ট্যাক্সিস বহু বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু একই প্রবৃত্তিজাত কাজ দুটি বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে দেখা যাবে না। লোরেঞ্জের মতে প্রবৃত্তিজাত আচরণের বৈষম্য দেখে প্রাণীজাতির শ্রেণীবিভাগ করা অনেক সহজ ও নির্ভুল। বস্তুত এই প্রবৃত্তিজাত আচরণের পার্থক্য ও মিল দেখে লোরেঞ্জ প্রাণীর নতুন শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

ট্যাক্সিস ও রিফ্লেক্সের সঙ্গে প্রবৃত্তিজাত কাজের দ্বিতীয় পার্থক্য হল রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস যে কেবলমাত্র উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হয় তাই নয়, যতক্ষণ উদ্দীপকটি থাকে ততক্ষণই তারা সক্রিয় থাকে। উদ্দীপকটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত কাজ উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হলেও উদ্দীপকের দ্বারা তার বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় না। অর্থাৎ একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণটি ঘটতে শুরু হলে তা আর উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল থাকে না। তখন উদ্দীপক বর্তমান

1. Mechanism 2. Drive 8. Conrad Lorenz 4. Taxis

থাকুক আর না থাকুক, প্রবৃত্তিটি তার কাজ ঠিক করে যাবে। বন্দুকের ঘোড়াটি একবার টিপে দিলে যেমন বারুদের ক্যাপটি ফেটে যাওয়া, গুলিটিকে ধাক্কা মারা, গুলিটির বেরিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কাজগুলি পর পর নিজে নিজে ঘটে যায়, সেই রকম একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণ কোন উদ্দীপকের দ্বারা সক্রিয় হয়ে উঠলে তার পরবর্তী ধাপগুলি বন্দুকের ঘোড়া টেপার ক্ষেত্রের মতই পর পর নিজে নিজে ঘটে যাবে। সেই জন্য প্রবৃত্তিজাত আচরণকে বন্দুকের ঘোড়া টেপার[1] সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ট্যাক্সিস ও রিফ্লেক্স উদ্দীপকজাত ও উদ্দীপক-নিয়ন্ত্রিত। আর প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপকজাত বটে কিন্তু উদ্দীপক-নিয়ন্ত্রিত নয়। তবে এই তিন ধরনের আচরণেরই সৃষ্টি উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল।

কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ একবার শুরু হয়ে গেলে উপযুক্ত উদ্দীপক থাকুক আর না থাকুক আচরণটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি যথাযথ চলবে। একবার একটা ষ্টার্লিং পাখীকে বন্দী অবস্থায় পালন করা হয়েছিল এবং তাকে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হত। কিন্তু লোরেঞ্জ দেখলেন যে পাখীটি তা সত্ত্বেও পোকা শিকারের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি—যেমন, পোকাটিকে ধরা, সেটিকে মারা এবং গিলে ফেলা প্রভৃতি কাজগুলি ঠিক পর পর করে যাচ্ছে যদিও তার সামনে কোন পোকারই অস্তিত্ব নেই। লোরেঞ্জ এই ঘটনাটির নাম দিয়েছেন 'শূন্যে সক্রিয়তা'[2]। অতএব দেখা যাচ্ছে যে রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিসের সংঘটন উদ্দীপক-নির্ভর কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণের সম্পাদন উদ্দীপক-নিরপেক্ষ।

প্রবৃত্তিজাত আচরণের বৈশিষ্ট্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটার আগে সেই প্রবৃত্তিটিকে ঘিরে প্রাণীর মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তি[3] সঞ্চিত হয়। যতক্ষণ না উপযুক্ত উন্মোচকের[4] সামনা সামনি প্রাণীটি আসছে এবং যতক্ষণ না কোনও আচরণের মধ্যে দিয়ে ঐ প্রবৃত্তি মুক্তিলাভ করছে ততক্ষণ এই শক্তি প্রাণীর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকবে।

এই প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি সঞ্চয়ের ফলে প্রাণীর মধ্যে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়, প্রথম, প্রাণীর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়, প্রাণীর উদ্দীপক-বিচারের অনুভূতিবোধ ক্রমশ কমে আসে[5]। এই সঞ্চিত শক্তি যতই তীব্র হয়ে ওঠে ততই প্রাণীর উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যখন অতি দুর্বল উদ্দীপকের দ্বারাই প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বন্দুকের ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়াটির মত একেবারে তার শেষ সীমা পর্যন্ত পেঁছে গিয়ে থামে।

লোরেঞ্জের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রবৃত্তিজাত আচরণের কয়েকটি স্তর দেখান যেতে পারে। যথা—

1. Triggered Movement 2. Vacuum Activity 3. Reaction Specific Energy
4. Releaser 5. Lowering of the threshold

প্রবৃত্তি → →	প্রচেষ্টা → →	লক্ষ্য
প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তির সঞ্চয় এবং উত্তেজনার অনুভূতি।	কোন বিশেষ পৌঁছনর বা কোন বিশেষ কাজ করার জন্য অনুভূত মানসিক তাড়নার সক্রিয় বাহ্যিক প্রকাশ।	উপযুক্ত উদ্দীপকের দ্বারা অবরুদ্ধ প্রবৃত্তির মুক্তিলাভ ও তার ফলে উত্তেজনার পরিসমাপ্তি।

এই হল লোরেঞ্জের প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির এই আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন মতবাদের কতকগুলি পার্থক্য আছে।

প্রথমত, আধুনিক মতবাদে প্রবৃত্তিজাত আচরণের একটি পরিষ্কার, নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস জাতীয় অন্যান্য সহজাত আচরণের সঙ্গে কোথায় এবং কতটুকু পার্থক্য তাও পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থী মতবাদগুলিতে প্রবৃত্তিকে একটি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং অপরিমিত শক্তি বা প্রবণতা বলে বর্ণনা করায় প্রবৃত্তির সত্যকারের স্বরূপটি আমাদের নিকট দুর্বোধ্য ও অবাস্তব থেকে গেছল।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদটি প্রাণী আচরণ পর্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে অনুমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য।

তৃতীয়ত, এই মতবাদে প্রবৃত্তির একটি সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ বর্ণনা পাওয়ার ফলে প্রাণী-আচরণের নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া এখন সম্ভব হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীনপন্থীরা যেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে বর্ণনা করে এসেছেন তার কতকগুলিকে লোরেঞ্জ রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস নাম দিয়েছেন, আর কতকগুলিকে প্রকৃতই প্রবৃত্তিজাত বলে স্বীকার করেছেন। আবার অনেকগুলিকেই তিনি শিক্ষা প্রসূত আচরণ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রবৃত্তির এই সুনির্দিষ্ট রূপ এবং আচরণের সীমারেখা জানা না থাকায় এই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের সবগুলিকেই প্রাচীনপন্থীরা প্রবৃত্তিজাত বলে মনে করে এসেছেন।

লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিই তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মানুষের ক্ষেত্রে নিছক প্রবৃত্তিজাত আচরণ খুব অল্পই পাওয়া যায়। মানব-আচরণ এতই বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনধর্মী যে প্রবৃত্তির মত একটি যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তার সত্যকার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়।

প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শিক্ষা

ও শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটা সকল শিক্ষাবিদ্‌ই মেনে নিয়েছেন। শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে এই সম্পর্ক আমরা দু'দিক দিয়ে আলোচনা করব। প্রথম, শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব; দ্বিতীয়, প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব।

শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। বস্তুত শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব যেমন গভীর তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিসত্তা হল দুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। একটি শক্তি হল শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে সেগুলি, এক কথায় যাকে বলা হয় উত্তরাধিকার বা বংশধারা[1]। আর একটি শক্তি হল তার পরিবেশ বা শিক্ষা। এই দু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশুর ব্যক্তিসত্তা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে।

শিশুর এই বংশধারার একটি বড় উপাদান হল তার সহজাত প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিই প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ করে এবং এগুলির সাহায্যেই সে তার জীবনধারণের প্রাথমিক আচরণগুলি সম্পন্ন করে। ক্ষুধায় খাওয়া, দলবদ্ধ জীবনযাপন করা, আত্মপ্রতিষ্ঠা করা, সঞ্চয় করা, নতুন কিছু সৃষ্টি করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলি শিশু সম্পন্ন করে তার প্রবৃত্তির সাহায্যে এবং তার এই আচরণগুলির উপরই তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। যদিও প্রবৃত্তি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান, তবু পরিবেশের বৈষম্য হেতু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সব ক্ষেত্রে সমান হয় না এবং তার ফলে ব্যক্তিসত্তার গঠনের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে ওঠে। অতএব বিনা দ্বিধায় এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শিশুর প্রথম জীবনের সমস্ত আচরণই প্রবৃত্তিজাত এবং সে সময়ে তার ব্যক্তিসত্তা গঠনে এই প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলিই সব চেয়ে শক্তিশালী উপকরণ রূপে কাজ করে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের বিশেষ করে মনঃসমীক্ষণ-বাদীদের মতে শৈশবেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ কাঠামোটি গঠিত হয়ে যায়। তার ফলে শৈশবকালীন প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার উপর যে গভীর প্রভাব রেখে যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই সব কারণেই প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তিবাদীরা প্রবৃত্তির অপরিমিত শক্তির কথা বলে থাকেন। তাঁদের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবই একমাত্র প্রভাব। কেবল তাই নয়, তাঁদের মতে শিশুর আচরণগুলি প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত ত বটেই, এমন কি তার পরিণত জীবনের সমস্ত আচরণই তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলি থেকে প্রসূত। যেমন, শৈশবে কৌতূহল প্রবৃত্তি শিশুর জানার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে নানা

1. Heredity

বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সে যখন বড় হয়ে লেখা পড়া শেখে বা বিজ্ঞানের রহস্যভেদের জন্য গবেষণা চালায় বা দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করে নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে তখন তার আচরণের মূলে আছে সেই কৌতূহল-প্রবৃত্তি, যদিও পরিণত বয়সের আচরণগুলি শৈশবের তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। সেই রকম যৌথ প্রবৃত্তি এবং সংগঠন প্রবৃত্তিও মানুষের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। শিশুর প্রাথমিক সঙ্গলাভের ইচ্ছা এবং কাদা বালি দিয়ে বাড়ী তৈরী করার চেষ্টা পরিণত জীবনে দেখা দেয় ক্লাব, সংঘ, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ার আচরণ রূপে এবং শিল্প-কলা, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা রূপে। এভাবে দেখান যেতে পারে যে ব্যক্তির পরিণত জীবনের সমুদয় আচরণই তার বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রসূত। এক কথায় ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তিই মানব আচরণের একমাত্র উৎস।

প্রবৃত্তির অপরিহার্য সঙ্গী হল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভই ব্যক্তির সকল কাজের পিছনে প্রেষণা জোগায়। অতএব শিশুর ক্রমবিকাশমান ব্যক্তিসত্তার উপাদান বলতে আমরা পাচ্ছি দুটি জিনিষ, একটি তার সহজাত প্রবৃত্তি, অপরটি সেই প্রবৃত্তির সহগামী প্রক্ষোভ। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীদের মতে শিশুর পরিণত জীবনের আচরণ ধারার পূর্ণ সংগঠনটি নির্ভর করছে এই দুটি বস্তুর উপর। যেমন, শিশু বড় হয়ে সৃজনশীল বা সঙ্গীপ্রিয় হবে কিনা নির্ভর করছে তার সংগঠন প্রবৃত্তি বা যৌথ প্রবৃত্তির উপর। সেই রকম শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি এবং তার সহগামী আত্মগরিমার প্রক্ষোভটি যদি যথাযথ বিকাশলাভ করে তবেই শিশু বড় হয়ে সবল ব্যক্তিত্বের লোক হয়ে উঠবে এবং বিপরীতভাবে যদি তার বশ্যতার প্রবৃত্তি ও তার সহগামী হীনমন্যতার প্রক্ষোভটি বৃদ্ধি পায় তবে সে বড় হয়ে দুর্বল লোক বলে পরিগণিত হবে।

এভাবে ম্যাকডুগাল এবং অন্যান্য প্রবৃত্তিবাদীরা ব্যক্তির প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের উপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যক্তিসত্তার সমগ্র সংগঠনটিরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ সংগঠনটিই প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দ্বারা গঠিত। এই দুটি সহজাত উপাদানই শিশুর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠন নির্ধারণ করে থাকে। শিশুর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি যে পথে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যতখানি অভিব্যক্ত হবার সুযোগ পায় তার উপরই তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের গতিপথ নির্ভর করে। এক কথায় প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভই শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের দুটি প্রধান শক্তি। এই দিক দিয়ে প্রবৃত্তিকে ব্যক্তিসত্তার ভিত্তি বা মূল উপাদান বলে বর্ণনা করা চলতে পারে।

প্রবৃত্তিবাদীরা তাঁদের এই মতবাদটি নানা ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন যে সহগামী প্রক্ষোভগুলি নিয়ে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই হচ্ছে ব্যক্তি-সত্তার ভিত্তিস্বরূপ। আবার কেউ বলেছেন যে প্রবৃত্তিগুলিই হচ্ছে চরিত্র গঠনের কাঁচা মাল বা মূল উপাদান[1] ইত্যাদি।

1. Instincts are raw materials of character

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কিন্তু প্রবৃত্তির এই একাধিপত্য আর স্বীকার করা হয় না। শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রবৃত্তিকে শিশুর আচরণের একমাত্র নির্ণায়ক বলে কেউই স্বীকার করেন না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে যে শক্তিটি সবচেয়ে বেশী কাজ করে সেটি হল তার চাহিদা। চাহিদা দু'শ্রেণীর হতে পারে, যথা, জৈবিক বা সহজাত চাহিদা এবং সামাজিক বা অর্জিত চাহিদা। কতকগুলি জৈবিক চাহিদা শিশুর প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন কামনা ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। শিশুর বেশীর ভাগ আচরণই নিয়ন্ত্রিত করে তার অর্জিত বা সামাজিক চাহিদাগুলি। এগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব আংশিক ও সীমাবদ্ধ। অর্জিত চাহিদাগুলি মূলত পরিবেশের দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। শিশু যতই তার পরিবেশের সংস্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে নিত্য নূতন চাহিদার সৃষ্টি হয়। নূতন নূতন সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে শিশু তার এই চাহিদাগুলি পূর্ণ করার চেষ্টা করে এবং তার সেই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই তার বহুমুখী আচরণের জন্ম দিয়ে থাকে। এক কথায় শিশুর পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ভর করে তার এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি বা অতৃপ্তির উপর।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর বৃদ্ধির প্রাথমিক স্তরে প্রবৃত্তির আধিপত্য থাকলেও শিশু একটু বড় হলে তার মধ্যে বহু বিভিন্নধর্মী চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং তখন তার আচরণ এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়। অতএব শিশুর প্রবৃত্তিকে তার আচরণের উৎস বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়। শিশুর আচরণের প্রকৃত উৎস হল তার বহুমুখী সদাপরিবর্তনশীল চাহিদাগুলি।

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার না করলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির ভূমিকা অবহেলার নয়। এ কথাটি অনস্বীকার্য যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক এই তথ্যটিকে শিশুর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সযত্নে কাজে লাগাবেন। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি সংক্রান্ত নীচের তথ্যগুলি অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য।

প্রথমত, শিশুর শিক্ষা প্রবৃত্তিমুখী হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরোধী কোন শিক্ষা তাকে দেওয়া উচিত নয়। প্রবৃত্তির গতিধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে সে শিক্ষা সহজ ও বাধাহীন হবে। যে শিক্ষা শিশুর প্রবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ বা দমিত করে সে শিক্ষা যে কেবল অনর্থক তাই নয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা ক্ষতিকর বটে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে অধিকতর আয়াসহীন ও কার্যকর করে তুলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ,

শিক্ষায় শিশুর মনোযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি শিশুর কৌতূহল রূপ প্রবৃত্তিকে যদি ঠিকমত উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে শিশুর লেখাপড়ায় মনোযোগও স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে। সেই রকম শিশুর যৌথ প্রবৃত্তিকে যথাযথ ব্যবহার করে শিক্ষক শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেন। শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করে সহজেই শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যার সমাধান করা যায়। তেমনই শিক্ষক শিশুর সংগঠন প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে তার সৃজনী স্পৃহাকে বিকশিত করতে পারেন, ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলীর সৃষ্টি করতে পারেন এবং অবাঞ্ছিত প্রবণতাগুলি দূর করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনেকাংশে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও বিশেষ শিক্ষাসূচীর সাহায্যে শিক্ষক প্রবৃত্তিগুলিকে প্রয়োজনমত পরিপুষ্ট বা অবরুদ্ধ করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। যেমন, শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করে তার মধ্যে বিদ্যার্জনের আসক্তি সৃষ্টি করা যায়, তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত অভিব্যক্তির সুযোগ দিয়ে দেশবিদেশের ছবি, ডাক-টিকিট বা মুদ্রা সংগ্রহের মত শিক্ষাপ্রদ হবি তার মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তার সঙ্ঘবদ্ধতার প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিয়ে তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলীর সৃষ্টি করা যায়, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে তার মধ্যে সুপ্ত নেতৃত্বের ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যায়, ইত্যাদি।

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব

উইলিয়ম জেমসের মতে শিক্ষার দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনও ঘটান যায়। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা এই চরম মত গ্রহণ না করলেও এটা স্বীকার করেন যে মানব প্রবৃত্তি যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তনশীল এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

শিক্ষার দ্বারা কেমন করে প্রবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে তার কতকগুলি পন্থার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। অবদমন

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান পন্থা হল অবদমন[1]। এর অর্থ হল যে প্রবৃত্তির বিকাশকে জোর করে রুদ্ধ করা। যখন কোন প্রবৃত্তিকে অবাঞ্ছিত বা অনিষ্টকর বলে মনে হয় তখন সেটির বহিঃপ্রকাশকে বলপূর্বক রুদ্ধ করা যায়। এ উপায়টি মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কার্যকর হয় না। অবদমিত প্রবৃত্তি ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় এবং উপকারের চেয়ে তার অপকারই

1. Repression

বেশী করে। সাধারণত যখন শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় তখন আসলে শিশুর প্রবৃত্তিকে অবদমিতই করা হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা সাধারণত স্থায়ী হয় না এবং যেখানে স্থায়ী হয় সেখানে তা গুরুতর মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠনকেই ক্ষুণ্ণ করে তোলে।

২। উন্নীতকরণ

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পন্থার নাম হল উন্নীতকরণ[1]। এই পন্থায় প্রবৃত্তির গতিধারাকে তার স্বাভাবিক অথচ অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত ও উন্নত পথে পরিচালিত করা হয়। শিশু যুযুৎসাপ্রবৃত্তির প্রভাবে সঙ্গীদের সঙ্গে প্রায়ই মারামারি করে। তার সেই বিপথগমী প্রবৃত্তিকে বক্সিং, কুস্তি, লাঠি খেলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর খেলার মধ্যে দিয়ে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা যায়। যে শিশু আজেবাজে টুকি-টাকি জিনিষ জমিয়ে সময় ও শ্রম নষ্ট করে, তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে শিক্ষাপ্রদ বস্তু সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উন্নীত করে তোলা যেতে পারে। সেই রকম শিশুর অবাঞ্ছিত অর্থহীন কৌতূহলকে বাঞ্ছিত ও শিক্ষাদায়ক জিজ্ঞাসায় এবং তার বিরক্তি ও ঘৃণাকে অপ্রিয় বা অবাঞ্ছিতের প্রতি বিরাগে উন্নীত করা যেতে পারে।

শিক্ষায় উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বহু সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবে শিশুর মধ্যে এমন অনেক আচরণ দেখা দেয় যেগুলি শিশুর নিজের দিক দিয়ে এবং সমাজের দিক দিয়ে কাম্য নয় এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটিকে ত্রুটিপূর্ণ করে তোলে। ফলে সেগুলিকে দূর করা বা নিয়ন্ত্রিত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত সহজাত আচরণগুলি জোর করে অবদমিত করা হত। তার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠত। অবদমনের চেয়ে অনেক উন্নত ও সন্তোষজনক পন্থা হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় অবাঞ্ছিত ও অপকৃষ্ট আচরণগুলিকে উন্নত ও বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা স্বাস্থ্যসম্মত পথে গড়ে ওঠে। এর জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন যে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে তাদের অপকৃষ্ট স্তর থেকে উন্নীত করে উৎকৃষ্ট স্তরে নিয়ে যাওয়া।

৩। বিরেচন

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের তৃতীয় পন্থাটির নাম হল বিরেচন[2]। এই পন্থায় প্রবৃত্তিকে তার সহজ ও কাম্য পথে অভিব্যক্ত হতে দিয়ে শান্ত করা হয়। এই পন্থাটি অবদমন পন্থাটির ঠিক বিপরীত। যে সব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অবদমিত করা হয়েছে এবং যার ফলে ব্যক্তির মানসিক সাম্য নষ্ট হতে চলেছে সে সব ক্ষেত্রে বিরেচন পদ্ধতি গ্রহণ করাই বিজ্ঞানসম্মত। ফ্রয়েড এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন এ্যাব্রিকসান। কিন্তু নানা কারণে সর্বত্র বা সাধারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

1. Sublimation 2. Catharsis

৪। অন্যান্য পন্থা

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের চতুর্থ পন্থাটি হল প্রবৃত্তিটিকে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে প্রবৃত্তিটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি অবশ্য অবদমন প্রক্রিয়ারই একটি প্রকার মাত্র। কিন্তু অবদমনের মত এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আচরণটি দমন করা হয় না। এখানে প্রবৃত্তিটিকে প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সেটিকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়া হয় না। পঞ্চম, পরিবেশের পরিবর্তনও একটি ফলদায়ক পন্থা। অনেক সময় দেখা গেছে যে বিশেষ পরিবেশে হয়ত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন যদি সেই পরিবেশটিকে পরিবর্তিত করা যায় তবে প্রবৃত্তিটি আর কাজ না করতেও পারে। ষষ্ঠ, অনেক সময় বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তিকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে কোন বিশেষ অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিকে শক্তিহীন করে তোলা যেতে পারে। যেমন কোন শিশুর বশ্যতা প্রবৃত্তিকে দূর করতে হলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যাতে বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশুর ঘৃণার ভাবকে দূর করতে হলে তার মনে শ্রদ্ধা বা ভালবাসার ভাব জাগানো একটি ফলপ্রদ উপায়।

অনুশীলনী

১। প্রবৃত্তি বলতে কি বোঝায়? কিভাবে প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান শিক্ষকের কাজে লাগতে পারে?

২। ম্যাকডুগালের তত্ত্ব অনুসারে প্রবৃত্তির প্রকৃতি কি? প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক বর্ণনা কর।

৩। প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও বুদ্ধিগত আচরণের মধ্যে কি পার্থক্য? শিশুদের আচরণ কতটা বুদ্ধিপ্রসূত বল।

৪। অভ্যাস ও প্রবৃত্তির সম্পর্কটি বল।

৫। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিকে কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগান যায় বল।

৬। শিশুর কৌতূহল ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা এই দুটি সহজাত প্রবৃত্তিকে কিভাবে তুমি তার শিক্ষায় ব্যবহার করতে পার?

৭। প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব বর্ণনা কর।

৮। কনরাড লোরেঞ্জের প্রবৃত্তি তত্ত্বটি বর্ণনা কর।

৯। প্রবৃত্তি হল চরিত্রের কাঁচামাল স্বরূপ—ব্যাখ্যা কর।

১০। প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থার বর্ণনা কর

১১। টিকা লেখ:—অবদমন, উন্নীতকরণ, বিরেচন।

পাঁচ

চাহিদা—মানব আচরণের উৎস

মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া অর্থাৎ কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি অন্য কোনভাবে আচরণ না করে একটি বিশেষভাবে কেন আচরণ করে তার কারণ নির্ণয় করা। এর জন্য মানব আচরণের মূল বা উৎস কোথায় তা জানা একান্ত দরকার।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ তথ্যটি জানার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। কেননা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল শিশুকে কতকগুলি বাঞ্ছিত আচরণ শিখতে সাহায্য করা এবং তার প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলি যাতে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তার আয়োজন করা। অতএব শিশুর বিভিন্ন আচরণগুলি কোন্ মূল বা উৎস থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তা প্রথমেই জানতে হবে। এই জন্য মানব-আচরণের উৎস নির্ণয়ই হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচীর প্রথম সোপান।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রাণীর আচরণের প্রকৃত উৎস বলে বর্ণনা করেছেন এবং প্রবৃত্তির দ্বারা প্রাণীর সকল আচরণেরই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনেকখানি সত্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এ মতবাদ প্রায় সম্পূর্ণ অচল। তবে মানব আচরণের প্রকৃত উৎসটি কি?

মানব আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অপরিমিত পরিবর্তনশীলতা ও অপরিসীম বৈচিত্র্য। বিবিধতার দিক দিয়ে মানব আচরণ সকল প্রকার পরিগণনার বাইরে। যে কোন পরিণত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে সে যে আচরণগুলি সম্পন্ন করে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেগুলি যেমন সংখ্যাবহুল, তেমনই প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়। অথচ নবজাত শিশুর আচরণ সে তুলনায় অনেক স্বল্প ও সরল। শিশু যত বড় হয় ততই সে নতুন নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে শেখে এবং ততই তার আচরণ দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল এই শিশুর আচরণ শেখার পিছনে কিসের তাগাদা বা চাপ থাকে? কেন শিশু নিত্য নূতন আচরণ শিখে চলে? এক কথায় এর উত্তর হল যে শিশুর চাহিদাই তার আচরণের প্রকৃত উৎস। চাহিদা কথাটির অর্থ হল অভাববোধ। প্রাণী যখন কোন বিশেষ বস্তুর অভাব বোধ করে তখনই তার মধ্যে সেই বস্তুটির চাহিদা জাগে। আর যখনই সে সেই বস্তুটি পেয়ে যায় তখনই তার অভাববোধ দূর হয়ে যায় এবং তার চাহিদাও আর থাকে না। এই চাহিদার জাগরণ আর চাহিদার তৃপ্তির মধ্যে

কয়েকটি স্তর বা সোপান আছে। প্রাণীর মধ্যে কোনও একটি বিশেষ চাহিদা জাগলে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটিই প্রাণীকে সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ সে তার এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটিই দূর করার জন্য নানা রকম আচরণ করতে সুরু করে। যতই তার এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় ততই তার এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি বেড়ে চলে। ফলে প্রাণীও বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ সম্পন্ন করে চলে এবং তার দ্বারা চেষ্টা করে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও চাহিদাটি মেটাতে। দেখা গেছে যে প্রাণীর কোনও চাহিদা জাগলে তার দেহমনোগত
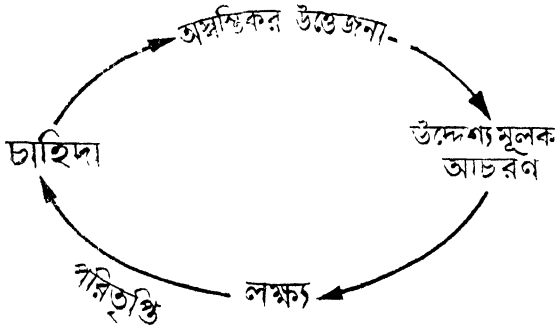
চাহিদা-লক্ষ্য চক্র

[চাহিদার জাগরণ→অস্বস্তিকর উত্তেজনা→আচরণ→চাহিদার পরিতৃপ্তি]

যে সাম্যাবস্থা পূর্বে ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। আর তার ফলে সে নানা রকম প্রচেষ্টা বা আচরণ করতে সুরু করে। উদ্দেশ্য তার পূর্বের সাম্যাবস্থা ফিরে পাওয়া। যতক্ষণ না তার মধ্যে এই সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ তার প্রচেষ্টার শেষ হয় না। আর যে মুহূর্তেই সে তার অভাবের বস্তুটি পেয়ে যায় সেই মুহূর্তেই তার চাহিদা দূর হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে তার অস্বস্তিকর অনুভূতিও চলে গিয়ে তার দেহমনের লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরে আসে।

প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে তার সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। উপরের ছবিটি থেকে এ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষুধা প্রাণী জীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। এটি হল খাদ্যের অভাববোধ। প্রাণীর মধ্যে এই চাহিদা জাগলে দেখা দেয় একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং তা থেকে জন্ম নেয় খাদ্য-অন্বেষণ রূপ আচরণটি। যতক্ষণ না প্রাণীর

১। স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন শরীরতত্ত্বমূলক সংগঠনগুলির মধ্যে একটি সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। তাকে শরীরতত্ত্বের ভাষায় দেহসাম্য (Homoestasis) বলা হয়।

তার সেই খাদ্য পাচ্ছে এবং তার দ্বারা তার ক্ষুধার চাহিদাটি মিটছে ততক্ষণ তার এই আচরণ চলতে থাকে। আর যেই তার চাহিদাটি মিটে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীর সমস্ত আচরণই বলতে গেলে এইভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদাই হল প্রাণীর সমস্ত কাজের প্রেষণা-শক্তি জুগিয়ে থাকে বা এক কথায় চাহিদাই হল প্রাণী-আচরণের প্রকৃত উৎস।

মানব চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

মানব চাহিদাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, শরীরতত্ত্বমূলক বা জৈবিক চাহিদা[1]। আর দ্বিতীয়, মনোবৈজ্ঞানিক বা সামাজিক চাহিদা[2]।

জৈবিক চাহিদা হল সেই সব চাহিদা যেগুলি ব্যক্তিকে তার দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মেটাতে হয়। যেমন, অক্সিজেনের চাহিদা, বিশেষ একটা তাপমাত্রার চাহিদা, খাদ্য-জল প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি প্রধানত দেহের নানা যন্ত্রের অভাব বা প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য দেখা দিয়ে থাকে এবং এ থেকে উদ্ভূত আচরণ প্রকৃতিতে অপেক্ষাকৃত সরল ও সুনির্দিষ্ট। এই চাহিদাগুলি সহজাত এবং সাধারণত যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলে থাকি এই চাহিদাগুলি অনেকটা সেই শ্রেণীর। যেহেতু এই চাহিদাগুলি নিয়ে প্রাণী জন্মায় সেহেতু এগুলিকে মৌলিক চাহিদাও[3] বলা হয়ে থাকে। এই চাহিদাগুলি মোটামুটিভাবে সর্বজনীন প্রকৃতির এবং এগুলি থেকে উদ্ভূত আচরণগুলি সকল শ্রেণীর মানুষেরই মধ্যে প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে।

জন্মাবার পর শিশু যে সকল আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলি এই জৈবিক বা মৌলিক চাহিদাগুলির দ্বারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য কেমন করে তার দেহগত অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে।

কিন্তু শিশু কিছুটা বড় হবার পর থেকেই তার জৈবিক অভাব ছাড়াও আরও কতকগুলি নতুন ধরনের অভাববোধ তার মধ্যে দেখা দেয়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটি বড় পার্থক্য হল যে এই নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচাটা কেবলমাত্র দেহগত অর্থাৎ দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের বাঁচার সমস্যাটা মিটে গেল। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বাঁচাটা দু'রকমের—প্রথম দেহগত, দ্বিতীয় সমাজগত। দেহগত চাহিদাগুলি মেটাতে পারলে তার দেহগত বাঁচার কাজটিই শেষ হয়। কিন্তু সামাজিক বাঁচার জন্য তাকে আরও অনেক রকম চাহিদা মেটাতে হয়। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই সে এই সামাজিক বাঁচার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং ততই তার মধ্যে নিত্যনূতন সামাজিক প্রকৃতির অভাববোধ দেখা দেয়। তার কাছে ক্রমশ জৈবিক

---

1. Physiological or Organic needs
2. Psychological or Social needs
3. Primary needs

চাহিদার চেয়ে এই সামাজিক চাহিদাগুলির গুরুত্ব অধিক হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে এই ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদাগুলি তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। এইরকম একটি সামাজিক চাহিদা হল সহপাঠী বা বন্ধুদের মহলে শিশুর নিজের স্বীকৃতিলাভের প্রয়োজনীয়তা। এই স্বীকৃতিলাভের জন্য শিশু নানা রকম আচরণ সম্পন্ন করতে পারে এবং অনেক সময় স্বচ্ছন্দে তার জৈবিক চাহিদাকেও অবহেলা করে থাকে।

মানুষের সামাজিক চাহিদার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। এগুলি নিয়ত বর্ধমান এবং সদা পরিবর্তনশীল। পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী এগুলির প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সাধারণ সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রচুর মিল বা সমতা থাকার জন্য তাদের পরিবেশের মধ্যে বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য দেখা গেছে যে প্রায় সমস্ত সভ্যসমাজের মানুষের মধ্যেই অনেকগুলি চাহিদা প্রায় একই প্রকৃতির হয়ে থাকে। সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।[1]

১। দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা

এই চাহিদাটি থেকে নানা রকম আচরণের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতি থেকে পালান, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া, খাদ্য-জল অনুসন্ধান করা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল তৈরী করা, ওষুধ আবিষ্কার করা, স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করা, চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ইত্যাদি।

২। স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা

এ থেকে উদ্ভূত আচরণ হল আর্থিক সঙ্গতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানসিক অস্বস্তিকর কিছু এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি অনুসন্ধান করা, অর্থ সঞ্চয় করা ইত্যাদি।

৩। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা

ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সেই সমাজে তার একটি নিজস্ব ও স্বীকৃত স্থান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এর প্রধান অভিব্যক্তি হল অপরের সঙ্গ খোঁজা ও নির্জনতা পরিহার করা। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে পিতামাতা, বাড়ী, স্কুল প্রভৃতির সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বোধ জাগতে থাকে। এটিকে সাধারণত অন্তর্ভুক্তি চাহিদাও বলা হয়। এই চাহিদা থেকেই পরে জন্মায় স্বদেশ, পূর্বপুরুষ, ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধ ও অনুরাগ।

সমাজে স্বীকৃতি লাভের এই চাহিদা থেকে বহু বিভিন্ন ধরনের আচরণের উৎপত্তি

১। চাহিদার ইংরাজী নামের তালিকা পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে।

হতে পারে। সমাজে যাতে ব্যক্তিকে স্বীকার করে নেয় তার জন্য ব্যক্তি সমাজ-সৃষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং সমাজ-নিষিদ্ধ আচরণগুলি সম্পন্ন করা থেকে বিরত থাকে। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি নানা আচরণ এই চাহিদা থেকেই জন্মায়।

৪। আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সম্বন্ধে একটি মূল্যবোধ আছে, সে মূল্য বেশীই হোক আর কমই হোক। অপরের কাছে এই মূল্যের স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছাটাও মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদার জন্যই শিশু পরীক্ষায় নিজের কৃতিত্ব দেখানর চেষ্টা করে। পরিণত জীবনে ঐশ্বর্য লাভের, সম্মান অর্জনের বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এই চাহিদারই অভিব্যক্তি। রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্রজীবন বা ছোট বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে যাঁরা নেতৃত্ব করে থাকেন তাঁদের আচরণ মূলত এই চাহিদা থেকেই জন্মে থাকে। আত্মসম্মানবোধ এই চাহিদারই একটি অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদারই পরিতৃপ্তিতে জন্মায় আত্মশ্লাঘা।

৫। নূতনত্বের চাহিদা

পরিতৃপ্তি মানুষের কাম্য হলেও কোন বস্তুর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই মানুষের মধ্যে সেই পুরাতন বস্তুটির প্রতি বিরাগ দেখা দেয় এবং নতুন বস্তু পাবার আকাঙ্খা জাগে। এই নূতনত্বের আকাঙ্খা ব্যক্তির নানা আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নতুন জামা কাপড় তৈরী করা থেকে নতুন দেশ বিদেশ দেখা, নতুন কিছু সংগ্রহ করা, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা প্রভৃতি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতালাভই এই চাহিদাটির পর্যায়ে পড়ে।

৬। সক্রিয়তার চাহিদা

সক্রিয়তা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম। যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী জন্মায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকায় তার সবটা ব্যয়িত হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তখন প্রকাশ পায় নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। তা ছাড়া মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন শক্তি ও দক্ষতা তার নানা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। এই সক্রিয়তার চাহিদা থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বর্তমান সভ্যতার নানা উপাদান। খেলাধূলা, উৎসব, ভ্রমণ প্রভৃতিও এই চাহিদা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। ছোট শিশুর মধ্যে এ চাহিদাটির অভিব্যক্তি খুব বেশী দেখা যায় এবং এটিকে সৃজন-মূলক পথে সুপরিচালিত করতে পারলে শিশুর সৃজনী-শক্তি সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে বিকাশ লাভ করে।

৭। স্বাধীনতার চাহিদা

ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলা ফেরার আকাংখাও মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। এই স্বাধীনতার চাহিদা থেকে জন্মায় সকল রকম বন্ধন, শাসন, নিয়ম-শৃংখলা, বিধি-নিষেধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি। সাধারণত স্কুলে বা বাড়ীতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রতি সুবিচার করা হয় না এবং শিশুর পরিবেশকে বিধিনিষেধের দ্বারা এমনভাবে শৃংখলিত করে ফেলা হয় যার ফলে শিশুর এই মৌলিক চাহিদাটি অভিব্যক্ত হবার সুযোগ পায় না। এই জন্য অতিরিক্ত শাসনধর্মী বিদ্যালয় বা গৃহ পরিবেশ শিশুমাত্রেই এড়িয়ে চলে এবং সময় সময় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়। অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজে থেকে নতুন কিছু করা, নতুন জিনিস সৃষ্টি করা, কোনও নতুন চিন্তা করা প্রভৃতি আচরণগুলি মূলত এই চাহিদাটিরই অভিব্যক্তি।

৮। যৌনতৃপ্তির চাহিদা

এ চাহিদাটি মূলত জৈবিক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্তিই এই চাহিদাটির লক্ষ্য। যৌনমূলক সকল আচরণই এই চাহিদা-প্রসূত। পূর্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্যজীবন যাপন প্রভৃতি বয়স্কসুলভ আচরণগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে এই চাহিদাটি সাধারণত যৌন-কৌতূহল ও যৌনঘটিত জিজ্ঞাসারূপেই দেখা দেয়।

শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা

আমরা দেখেছি যে চাহিদা থেকে জন্মায় আচরণ এবং সে আচরণের বিরতি ঘটে চাহিদার তৃপ্তিতে। এখন যদি শিশুর কোন বিশেষ চাহিদার তৃপ্তি না ঘটে তবে সেই চাহিদা-জনিত যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তা কখনই দূর হবে না। বরং ক্রমশ বেড়েই চলবে। এর ফলে শিশু তার চাহিদা মেটানোর জন্য আরও নানারকম আচরণ করে চলবে। তার পরিচিত ও অভ্যস্ত আচরণগুলি শেষ হয়ে গেলে সে নানা ধরনের নূতন ও অনভ্যস্ত আচরণ করে দেখবে যে তার দ্বারা সে তার চাহিদা মেটাতে পারে কি না এবং যতক্ষণ না আংশিক বা বিকৃতভাবেও তার চাহিদা সে মেটাতে পারছে ততক্ষণ সে নানাভাবে চেষ্টা করতে ত্রুটি করবে না। ফলে দেখা গেছে যে অতৃপ্ত চাহিদার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে নানারূপ অদ্ভুত বা অবাঞ্ছিত আচরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণত পিতামাতা বা শিক্ষকেরা এই আচরণগুলির যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে দুষ্টবুদ্ধি বা খামখেয়ালের জন্যই শিশু এই ধরনের আচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে যেগুলিকে আমরা সাধারণত সমস্যামূলক আচরণ বলে থাকি সেগুলি এই ভাবেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। বস্তুত শিশু যখন স্বাভাবিক পন্থায় তার চাহিদা তৃপ্ত করতে পারে না তখন সে অস্বাভাবিক পথে তার

চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে এবং তার ফলেই তার মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়। অতএব সমস্যামূলক আচরণগুলি এক দিক দিয়ে সম্পূরক আচরণ[1] ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছান যখন শিশুর পক্ষে
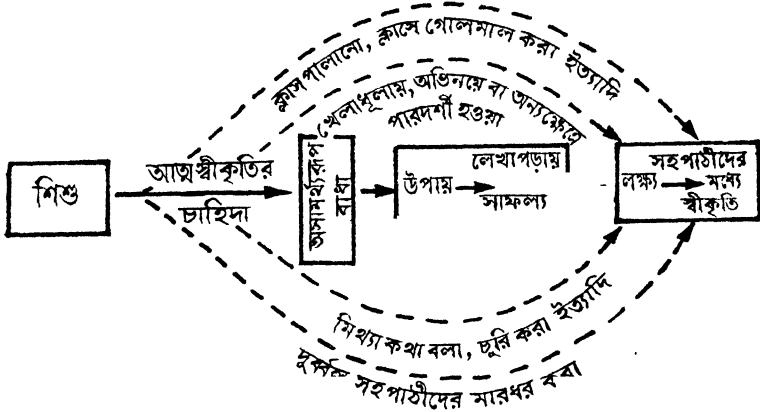
[স্বাভাবিক পথে শিশুর আত্মস্বীকৃতি লাভের চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সে নানাবিধ বিকল্প আচরণের সাহায্যে তার সেই অতৃপ্ত চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে থাকে।]

অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন সে সেই লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য[2] স্থাপন করে নেয় এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছনর মধ্যে দিয়ে নিজের চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে এই খাপ খাওয়াতে না পারা বা সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যকে অপসঙ্গতি[3] বলে এবং এই ধরনের শিশুদের অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু বলা হয়।

যেমন, স্কুল-পরিবেশে সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর আত্মস্বীকৃতি লাভের স্বাভাবিক পথ হল লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখান। এখন কোন কারণে যদি একটি বিশেষ শিশু এ চাহিদাটি তৃপ্ত করতে না পারে তখন সেই শিশু নানা অবাঞ্ছিত বিকল্প আচরণের আশ্রয় নেয়, যেমন ক্লাসে গোলমাল করা, ক্লাস পালান, মারামারি করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি। এই সকল আচরণের দ্বারা যে স্বীকৃতি সে স্বাভাবিক পন্থায় পায় নি সেই স্বীকৃতি সে অস্বাভাবিক পন্থায় পাবার চেষ্টা করে। অবশ্য সব সময়েই যে বিকল্প আচরণটি অবাঞ্ছিত বা মন্দ হয় তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই বিকল্প আচরণ আবার শিশু এবং সমাজের পক্ষে বাঞ্ছিতও হতে পারে। যেমন, যে ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হতে পারল না, সে হয়ত খেলাধুলা, অভিনয় বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখিয়ে তার ঈপ্সিত আত্মস্বীকৃতি আদায় করল। এসব

1. Compensatory Behaviour 2. Substituted Goal 3. Maladjustment

ক্ষেত্রে তার আচরণটি অপসঙ্গতিজাত হলেও প্রকৃতিতে সেটি অসামাজিক বা অবাঞ্ছিত না হওয়ায় সেটিকে সমস্যামূলক আচরণ বলা হয় না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদার সহজ ও স্বাভাবিক তৃপ্তিই হল শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের একমাত্র উপায়। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রথম ও সর্বপ্রধান নির্দেশ হল যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার জন্য যাতে তার মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় তা সর্বাগ্রে দেখতে হবে। এই মহৎ সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক[1] করে তোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

শিশুর চাহিদা ও শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্য

শিশুর বিভিন্ন চাহিদাগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে তৃপ্তিলাভ করে সেদিক দিয়ে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতিদের করণীয় অনেক কিছু আছে। যথা—

প্রথমত, শিশুর চাহিদাগুলি যাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য যে ক্ষেত্রে শিশুর সমস্ত চাহিদার পূর্ণতৃপ্তির আয়োজন করা সম্ভব নয় সে সকল ক্ষেত্রে যাতে শিশু বাঞ্ছিত প্রকৃতির সম্পূরক আচরণ সম্পন্ন করে তার চাহিদার তৃপ্তিসাধন করে সেদিকে যত্ন নিতে হবে এবং তার উপযোগী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব কাজকর্ম সহপাঠক্রমিক কাজ নামে পরিচিত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সেগুলির পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে। কারণ সেই সব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর বহু ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভের সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ, শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। এই চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। বিদ্যালয় পরিবেশটি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যেখানে শিশু সহজভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে সমগ্র পরিবেশের মধ্যে নিজের একটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত স্থান বেছে নেবে। সেই রকম তার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদা। এ চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন ও মানসিক সন্তোষ নির্ভর করে এবং বিদ্যালয়ে এটির যথাযথ তৃপ্তির আয়োজন অবশ্যই করতে হবে। কেবলমাত্র লেখাপড়ায় ভাল হলে স্বীকৃতিদানের যে সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা সাধারণ স্কুলে প্রচলিত আছে তাতে বহু শিশুরই আত্মস্বীকৃতির চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। সেই জন্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছাড়াও

1. Need-centred

অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিয়ে স্বীকৃতিলাভের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সকল প্রকার প্রতিভাসম্পন্ন শিশুই তার প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পায়। সেই রকম শিশুর নূতনত্বের চাহিদা এবং সক্রিয়তার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্তি লাভ করে তার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা শিশুকে দিতে হবে। খেলাধুলা, অভিনয়, অঙ্কন, ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা নূতন ও সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর এই অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদা-গুলি যাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে তার পর্যাপ্ত আয়োজন বিদ্যালয়ে রাখতে হবে।

সবশেষে, মনে রাখতে হবে যে শিশুর সমস্যামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ হল তার চাহিদার অতৃপ্তি। অতএব যদি শিশুর কোন অবাঞ্ছিত আচরণ দূর করতে হয় তবে নিছক তার আচরণের চিকিৎসা না করে যে অতৃপ্ত চাহিদাটি তার মূল কারণ সেটির পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক কালে যে সব শিশু পরিচালনাগার[1] স্থাপিত হয়েছে সেগুলির কর্মসূচী মূলত এই বিশেষ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

অনুশীলনী

১। চাহিদা কাকে বলে? চাহিদা কিভাবে মানব আচরণকে প্রভাবিত করে?

২। কত রকমের চাহিদা দেখা যায় বল।

৩। শিশুর জীবনের প্রধান চাহিদাগুলি কি কি? সেগুলির বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা কর।

৪। চাহিদাই আচরণের উৎস—উক্তিটি উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ কর।

৫। বিদ্যালয় ও পরিবার শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

৫। চাহিদা এবং প্রবৃত্তিতে পার্থক্য কি? মানব আচরণের উপর এ'দুয়ের প্রভাব বর্ণনা কর।

৬। স্বাভাবিক পথে চাহিদার তৃপ্তি না হলে কি ঘটে? সম্পূরক আচরণ বলতে কি বোঝ? অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে তার চাহিদার কি সম্পর্ক?

৭। শিক্ষার সঙ্গে শিশুর চাহিদার সম্পর্ক বর্ণনা কর।

1. Child Guidance Clinic

ছয়

বুদ্ধির স্বরূপ

বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি বিশেষ। অন্যান্য অমূর্ত বস্তুর মত বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, যদিও খ্যাত অখ্যাত বহু মনোবিজ্ঞানীই এর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য বুদ্ধির কোনও সংজ্ঞাই আজ পর্যন্ত সর্ববাদীসম্মত বলে গৃহীত হয় নি। তবে বুদ্ধির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা থেকে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা গঠন করা যেতে পারে। যথা—

১। বুদ্ধির সর্বব্যাপকতা

বুদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বুদ্ধির উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন দার্শনিকেরা মনে করতেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বুদ্ধি মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর জীবতত্ত্ববিদদের আধুনিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাণী-বিকাশের আদিমতম স্তরে বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীর একমাত্র অস্ত্র ছিল তার সহজাত প্রবৃত্তি। খাদ্য অন্বেষণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক কাজগুলি নিছক প্রবৃত্তির দ্বারা সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যতই জটিল হতে সুরু করল ততই প্রবৃত্তিরই কার্যকারিতা কমে আসতে লাগল। এই সময় প্রাণীর জীবনযুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্ররূপে তার মধ্যে দেখা দিল বুদ্ধি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বুদ্ধির প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান কাজ হল জটিল এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য করা। মুখ্যত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বুদ্ধির উৎপত্তি হয়েছিল এবং আজও নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন মানুষের পুরাতন অভ্যস্ত আচরণ তার কার্যকারিতা হারায় তখন বুদ্ধিই তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

প্রবৃত্তির কাজ হল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীকে সাহায্য করা। কিন্তু যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেখানে বুদ্ধি সফল হয়। তার কারণ হল বুদ্ধির ব্যাপক পরিবর্তনশীলতা। প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা যান্ত্রিক এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এর কাজ সীমাবদ্ধ। বুদ্ধির প্রচেষ্টা বৈচিত্র্যধর্মী এবং তার কর্মপরিধি সীমাহীন।

২। নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে সঙ্গতিসাধন

নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রাণীকে সাহায্য করা যে বুদ্ধির

সর্বপ্রথম কাজ এটা সকল মনোবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন। বার্ট[1] বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে দেহ ও মনের মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের সাধারণধর্মী শক্তি বিশেষ। গডার্ড[2] বলেন যে বুদ্ধি প্রাণীকে তার আসন্ন সমস্যার সমাধান করতে ও ভবিষ্যৎ সমস্যার ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। ষ্টার্নের[3] মতে নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।

৩। মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহার

বুদ্ধির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহারে সমর্থ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ্য নিয়ে জন্মায়। যেমন, সংবোধন, চিন্তন, বিচারকরণ, অনুমান, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি। এগুলির উন্নত ব্যবহার থেকে দেখা দেয় পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর সুষ্ঠু এবং কার্যকর সঙ্গতিসাধন। পরিবেশের বহুধর্মী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব সমাধানে নিযুক্ত করতে পারে একমাত্র মনের এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির উন্নত ব্যবহার।

উদাহরণস্বরূপ, চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে এটি আমাদের বাহ্যিক ও মূর্ত আচরণের একটি মানসিক ও অমূর্ত রূপ বিশেষ। অর্থাৎ যখন সত্যকারের 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' কাজটি আমরা মনে মনে সম্পন্ন করি তখনই আমরা বলি যে 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' সম্বন্ধে চিন্তা করছি। অথচ মনে মনে কাজটি সম্পন্ন করার ফলে আমাদের সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে এবং কোনরূপ পার্থিব বাধা আমাদের প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। আর সত্যকারের কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে দীর্ঘ সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে ঐ রকম লক্ষ লক্ষ চিন্তা সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। বুদ্ধিই চিন্তন-প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে লাগাতে পারে। যখন প্রাণী কোনও একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমস্যা সমাধানের যত রকম সম্ভাব্য পন্থা আছে সেগুলি সে চিন্তনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং তার মধ্যে যেটিকে সে সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করে সেটিকে সে তার সমস্যার সমাধানে বাস্তবক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে পারে। একেই বুদ্ধির প্রয়োগ বলা হয়। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে কোন চিন্তাশক্তির ব্যবহার নেই বলেই তার প্রচেষ্টা নূতনত্ব-বিহীন, চিরনির্দিষ্ট এবং যান্ত্রিক। এই রকম বিচারকরণ, অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহারও বুদ্ধির সাহায্যেই সম্ভবপর।

1. Burt 2. Goddard 3. Stern

৪। অমূর্ত চিন্তন

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের[1] ভাষায় বুদ্ধি হল অমূর্ত বা বস্তুবিবর্জিত চিন্তন[2] করার ক্ষমতা। চিন্তনের সময় সাধারণত আমরা ভাষা, প্রতিরূপ প্রভৃতি নানা মূর্ত বস্তুর সাহায্য নিয়ে থাকি। কিন্তু অনেক সময় আমরা এই ধরনের কোন মূর্ত বস্তুর সাহায্য ছাড়াই চিন্তা করতে পারি। যেমন, গণিত বা দর্শনের খুব সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় কোনরূপ মূর্ত বস্তুর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সেখানে বিশেষ ধরনের অমূর্ত বস্তু বা মাধ্যমের সাহায্যে চিন্তন করা হয়। এই ধরনের চিন্তনগুলিকে অমূর্ত চিন্তন বলা হয় এবং বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া এ ধরনের উন্নত প্রকৃতির চিন্তন সম্ভব নয়।

৫। সম্বন্ধমূলক চিন্তন

বুদ্ধির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা সম্বন্ধ-নির্ণয়মূলক চিন্তন করা সম্ভব হয়। দুই বা দুয়ের বেশী বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করার সময় বুদ্ধি সাহায্য অপরিহার্য। সম্বন্ধ যত জটিল হয় বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও তত বাড়ে।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানের[3] দেওয়া বুদ্ধির সংজ্ঞাটিতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কেই বড় করা হয়েছে। তাঁর মতে বুদ্ধি বলতে বোঝায় ত্রিবিধ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি।‡ যথা—

(ক) অভিজ্ঞতার আহরণ
(খ) সম্বন্ধের নির্ণয়ন[4]
(গ) সম-সম্বন্ধ-বোধকের নির্ণয়ন[5]

স্পীয়ারম্যান মনের এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন জ্ঞান-বিকাশের সূত্রাবলী[6]। তাঁর মতে আমাদের জটিল অজটিল সমস্ত জ্ঞানই এ ত্রিবিধ পন্থায় অর্জিত হয়ে থাকে।

৬। উন্নত মানসিক সংগঠন

বুদ্ধির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী দেহ মনের সব চেয়ে ভাল সংগঠন বা সমন্বয়ন সম্পন্ন করা। এর জন্য প্রয়োজন মনের সমস্ত দিকগুলির মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা এবং সেই লব্ধ সমন্বয়নের মাধ্যমে পরিবেশের সব চেয়ে উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি নির্ণয় করা। প্রাণী যখন কোন সমস্যার

---

1. Terman 2. Abstract thinking 3. Spearman 4. Eduction of Relation 5. Eduction of Correlates 6. Noegenetic Laws

‡ Psychology Down the Ages by Spearman

সম্মুখীন হয় তখন বুদ্ধিই তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি করে সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে আসন্ন সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত করে। গেস্টাল্ট মতবাদী[1] মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির এই মানসিক সংগঠন বা সমন্বয় সাধন করার উপরই সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

৭। পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ

বুদ্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারাই পৃথকীকরণ[2] এবং সামান্যীকরণ[3] নামে দুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন বস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদা করে নেওয়ার নাম হল পৃথকীকরণ এবং সেই পৃথকীকৃত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সেই বস্তুর সমশ্রেণীভুক্ত অবশিষ্ট সকল বস্তুর উপর প্রয়োগ করারই নাম হল সামান্যীকরণ। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা[4] গঠন করতে এই প্রক্রিয়া দুটি অপরিহার্য।

৮। বিচারকরণ :: আগমন ও নিগমন

বুদ্ধির আর একটি কাজ হল ব্যক্তিকে বিচারকরণ[5] প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সমর্থ করা। চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান করার নামই বিচারকরণ। বিচারকরণ আবার দু'প্রকারের হতে পারে—আগমন[6] এবং নিগমন[7]। প্রথম পদ্ধতিতে আমরা বিশেষ ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে কোনও একটি সামান্য সত্যে বা সূত্রে পৌঁছই এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি সামান্য সত্য থেকে কোনও একটি বিশেষ সত্যে বা সূত্রে আসি। দু'রকম বিচারকরণ পদ্ধতিই আমাদের নতুন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং উভয় প্রক্রিয়াই আবার বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

৯। মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা

মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততার[8] সঙ্গেও বুদ্ধির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বিচারকরণ, অনুমান, সংবোধন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির দ্রুত সম্পাদন নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। দেখা গেছে যে একই মানসিক প্রক্রিয়া স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেটি তার চেয়ে অনেক কম সময়ে সম্পন্ন করে। যে কোন মানসিক কাজ সম্পন্ন করার দ্রুততা বা ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

---

1. Gestaltist 2. Abstraction 3. Generalisation 4. Concept 5. Reasoning 6. Induction 7. Deduction 8. Speed

১০। **বর্তমান পরিস্থিতিতে অতীত জ্ঞানের প্রয়োগ**

বুদ্ধি এবং জ্ঞান কিন্তু এক নয়। যা প্রাণী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে তার নাম জ্ঞান। কিন্তু বুদ্ধি হল একটি মানসিক শক্তি এবং এটি সহজাত। তবু বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের একটি সম্পর্ক আছে। জ্ঞানের প্রয়োগ একমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমেই সম্ভব এবং বুদ্ধিই অতীতের লব্ধ জ্ঞানকে বর্তমানের সমস্যা-সমাধানে নিযুক্ত করে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সমস্যার-সমাধান করা যায় না, তার যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে না পারলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। বুদ্ধিই অতীতে শেখা জ্ঞানকে বর্তমানে প্রয়োগ করতে পারে।

বুদ্ধির সংজ্ঞা

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধি বলতে আমরা বুঝি এমন একটি **সহজাত মানসিক শক্তি** যা আমাদের সমর্থ করে সম্পন্ন করতে

১। **নূতন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন**

২। **চিন্তন শক্তির উন্নততর ব্যবহার,** যার মধ্যে আবার অন্তর্গত হল

(ক) অমূর্ত[1] চিন্তন,

(খ) সম্বন্ধ-ঘটিত[2] চিন্তন,

(গ) পৃথকীকরণ[3] ও সামান্যীকরণ[4]

(ঘ) বিচারকরণ[5] যা আবার দু'প্রকারের হতে পারে যথা—

(i) নিগমনমূলক[6] ও

(ii) আগমনমূলক[7]

৩। **সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু সংগঠন**

৪। **অতীত জ্ঞানকে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিয়োজন এবং**

৫। **মানসিক কাজের দ্রুত সম্পাদন।**

যদিও প্রচলিত পন্থায় একটি বাক্যে বুদ্ধির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু বুদ্ধির উপরের সংজ্ঞাটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্ব

বুদ্ধি বলতে আমরা যা বুঝি সেটি একটিমাত্র শক্তি না একাধিক শক্তি এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে। সেগুলি হল—

---

1. Abstract 2. Relational 3. Abstraction 4. Generalisation 5. Reasoning 6. Deductive 7. Inductive.

১। রাজতন্ত্রমূলক ধারণা

প্রথম ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি একটি একক শক্তি, যার অধীনে ও পরিচালনায় মনের অন্যান্য অসংখ্য শক্তি কাজ করে থাকে। এখানে বুদ্ধি যেন রাজাবিশেষ এবং অন্যান্য শক্তিগুলি তার প্রজাবৃন্দের মত। এই ধারণাকে বুদ্ধির রাজতন্ত্রমূলক[1] ধারণা বলা চলতে পারে।

২। অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণা

দ্বিতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির সমন্বয় বা সমাবেশ বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি সম্মিলিত ভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই ধারণাটিকে অভিজাত তন্ত্রমূলক[2] ধারণা বলা যেতে পারে।

৩। গণতন্ত্রমূলক ধারণা

তৃতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে এই ধরনের কোন একটি একক শক্তি বা কয়েকটি বিশেষ শক্তির সম্মেলন রূপে গ্রহণ করা হয় নি। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে এবং এগুলির মিলিত শক্তিকেই বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারণাকে বুদ্ধির গণতন্ত্রমূলক[3] ধারণা বলা যেতে পারে।

বুদ্ধি সম্বন্ধে উপরের ত্রিবিধ ধারণা শিক্ষাবিদদের মধ্যে বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে। কিন্তু গবেষণাভিত্তিক না হওয়ার জন্য এই মতবাদগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হত না। কিন্তু আধুনিক কালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়া গেছে সেগুলিকে অনুরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নীচে বুদ্ধির উপর এই তিনটি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হল।

(ক) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব[4]

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানই প্রথম বুদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রসূত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানসিক সক্রিয়তা সম্পন্ন সমস্ত কাজের পেছনেই দু'শ্রেণীর মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ শক্তি[5]। স্পীয়ারম্যান এই শক্তির নাম দিয়েছেন 'g' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোন একটি বিশেষধর্মী শক্তি[6], স্পীয়ারম্যান এটির নাম দিয়েছেন 's'। এই 'g' শক্তিটি সর্বগামী অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, যদিও অবশ্য এই নিয়োজিত 'g'র পরিমাণ সব কাজে সমান হবে না। আর 's' হল কোন বিশেষ কাজের

---

1. Monarchic 2. Oligarchic 3. Anarchic 4. Spearman's Two-Factor Theory 5. General ability 6. Specific ability

উপযোগী একটি বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অন্য কোন কাজে সেই 's'টির প্রয়োগ হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক কাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র 's' আছে। যেমন 'পড়া' কাজের জন্য পড়ার 's', 'অঙ্ক কষা' কাজের জন্য অঙ্ক কষার 's', 'বিচার করা' কাজের জন্য বিচার করার 's' ইত্যাদি। যেহেতু বিবিধতার দিক দিয়ে কাজ অসংখ্য রকমের হতে পারে, সেহেতু সংখ্যার দিক দিয়ে 's'ও গণনাতীত হয়ে থাকে। 'g' কিন্তু সংখ্যায় একটি, যদিও এর অনুপ্রবেশ সর্বত্র এবং অল্পমাত্রায় হোক্ বা অধিক মাত্রায় হোক্ সব কাজেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য।

স্পীয়ারম্যান কল্পনা করেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ যেন 'g'র একটি নিজস্ব ভাণ্ডার নিয়ে জন্মায় এবং কোন কিছু করার সময় তা থেকে সে কিছু পরিমাণ 'g' নেয়, এবং সেই 'g'র সঙ্গে সেই কাজের বিশেষ 's'টি যোগ করে দিয়ে সে সেই কাজটি সম্পন্ন করে। যেমন—

'পড়া' রূপ কাজ করতে লাগে 'g'র কিছুটা + 'পড়া'র 's'
'অঙ্ক কষা' রূপ কাজ করতে লাগে 'g'র কিছুটা + অঙ্ক কষার' 's' ইত্যাদি।

স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদটি নীচের ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝান যায়ঃ
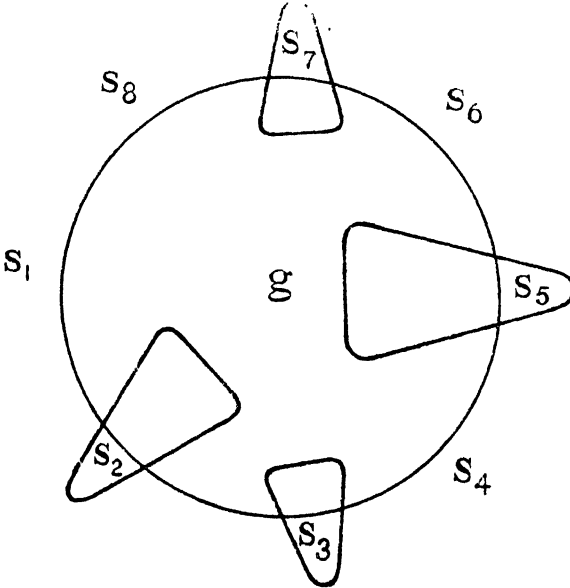
[স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের চিত্ররূপ]

ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের জন্য একটি বিশেষ 's' এবং কিছু পরিমাণ 'g'র

প্রয়োজন হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী ‘s’রও পরিমাণ কম বা বেশী হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে যে স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে দুটি উপাদান[1] বর্তমান। সেই জন্য এই মতবাদটিকে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব বলা হয়।

বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বটির তুলনা করা যায়। কিন্তু প্রচলিত ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের মতটি নিছক অনুমান-প্রসূত নয়। বিভিন্ন মানসিক কাজের ফলাফলের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের[2] মান নির্ণয় করে এবং জটিল গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যেই স্পীয়ারম্যান তাঁর এই প্রসিদ্ধ তত্ত্বটিতে পেঁছতে পেরেছেন। সেই জন্য এই তত্ত্বটি সুপ্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা ও শ্রেণীমূলক শক্তি[3]

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল সেটি হল স্পীয়ারম্যানের প্রাথমিক ব্যাখ্যা। পরবর্তী গবেষণার ফলে এই তত্ত্বটির কিছু অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। স্পীয়ার-ম্যানের মতে মানসিক শক্তি দু'প্রকারের, ‘g’—যা সব কাজের পেছনে থাকে, এবং ‘s’—যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পেছনে থাকে। এর মাঝামাঝি আর কিছুই নেই।
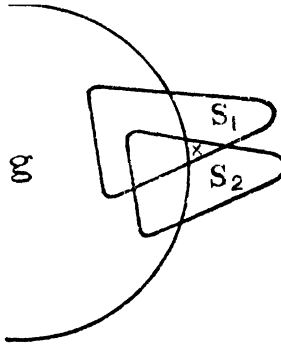
[শ্রেণীমূলক শক্তির চিত্ররূপ]

কিন্তু পরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলি এই দু'ধরনের শক্তির মধ্যবর্তী অর্থাৎ যেগুলি ‘g’র মত সব কাজে লাগে না বটে, তবে ‘s’র মত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজেও সীমাবদ্ধ থাকে না। এই শক্তিগুলিকে বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় দেখা যায় অর্থাৎ এরা ‘g’র মত সর্বজনীনও নয় আবার ‘s’র মত সঙ্কীর্ণও নয়। এক কথায় এরা ‘g’

1. Factor 2. Correlation 3. Group Factor

আর ‘s’র নাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি বিশেষ। যেহেতু বিশেষ এক শ্রেণীর কাজগুলির ক্ষেত্রে এই শক্তিগুলি কার্যকর হয়, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রেণীমূলক শক্তি।[1] এই রকম একটি শ্রেণীমূলক শক্তি হল ভাষামূলক শক্তি[2]। এটিকে ‘g’র মত সব কাজে পাওয়া যায় না বটে তবে ভাষাঘটিত যত রকম কাজ আছে (যেমন পড়া, লেখা, মুখস্থ করা, চিন্তা করা ইত্যাদি) সেগুলির সবের মধ্যেই এটি কিছু না কিছু পরিমাণে থাকে। যেমন, আগের পাতার ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম কাজে $g+s_1$ লেগেছে এবং দ্বিতীয় কাজে $g+s_2$ লেগেছে। কিন্তু তা ছাড়া আরও একটা শক্তি (× চিহ্নিত) এই দু'টি কাজের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। প্রথমটি s_1 যদি ‘লেখা’ রূপ কাজ হয় এবং দ্বিতীয়টি (s_2) যদি ‘মুখস্থ করা’ রূপ কাজ হয় তবে এদের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীমূলক শক্তিরূপে থাকবে ‘v’ বা ভাষামূলক শক্তিটি।

এই রকম আরও কয়েকটি শ্রেণীমূলক শক্তির নাম হল গাণিতিক শক্তি[3], যান্ত্রিক শক্তি[4] ইত্যাদি।

(খ) থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্ব[5]

প্রসিদ্ধ মার্কিন মনোবিজ্ঞানী থার্স্টোন বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক বা প্রাথমিক শক্তির উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

১। ভাষাবোধ (V)।

২। সংখ্যা ব্যবহার (N)।

৩। স্মৃতি (M ।

৪। আগমনমূলক বিচারকরণ (R)।

৫। উপলব্ধিমূলক শক্তি (P)।

৬। অবস্থানমূলক বোধ (S)।

৭। শব্দ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য (W)।

থার্স্টোনের মতে যাকে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি তা আসলে উপরের সাতটি মৌলিক শক্তির সম্মিলিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য সব কটি শক্তিই যে সব কাজেতে দরকার হয় তা নয়। এই সাতটি শক্তির মধ্যে কখনও বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ সম্পন্ন করে। আবার আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্য

---

1. Group Factor 2. Verbal ability or v 3 Numerical ability or n 4. Mechanical ability or m 5. Thurstone's Primary Ability Theory. (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

আর একটি কাজ সম্পন্ন করে ইত্যাদি। নীচে থার্স্টোনের তত্ত্বটির একটি চিত্ররূপ দেওয়া হল।

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ১নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M) এবং উপলব্ধিশক্তি (P), আবার ২নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M) অবস্থান-বোধ (S) এবং বিচার-করণ (R) আবার ৩নং কাজে লাগছে ভাষাবোধ (V), স্মৃতি
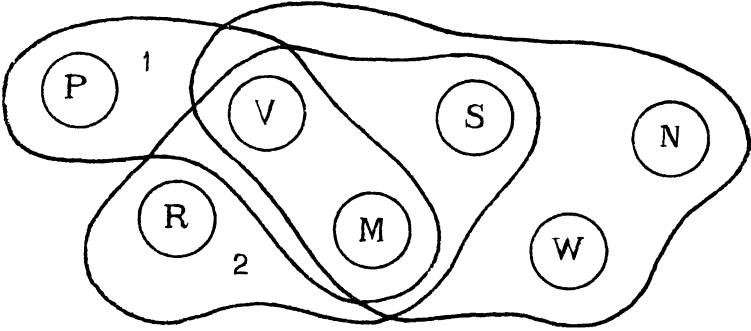
[থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্বের চিত্ররূপ]

(M), অবস্থান বোধ (S), সংখ্যা-ব্যবহার (N) এবং শব্দ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য (W) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কাজটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোন্ কোন্ শক্তি কখন জোট বাঁধবে।

থার্স্টোনের তত্ত্বটি প্রাচীন বুদ্ধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞাততন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে তুলনীয়। তবে থার্স্টোনের তত্ত্বও স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বের মত জটিল গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহু-শক্তি তত্ত্ব[1]

গডফ্রে টমসন নামে একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু উপরের দু'শ্রেণীর ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধির তৃতীয় ব্যাখ্যার জনক। তাঁর মতে বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তি নেই। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে অগণিত শক্তিকণা আছে। এই শক্তিকণাগুলি অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং কোনটিরই পৃথক করে সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যায় না। এগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন আমরা কোন একটি মানসিক কাজ করি, তখন এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একসঙ্গে জোট বাঁধে এবং ঐ কাজটি করতে আমাদের সমর্থ করে। কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ শক্তি কণাগুলি একটি বিশেষ কাজ করার সময়

1. Thomson's Sampling Theory or Thorndike's Multi-factor Theory

জোট বাঁধবে তা নির্ভর করে ঐ কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তি কণাগুলির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উপর। এই জন্য টমসনের এই তত্ত্বটিকে স্যাম্‌প্লিনিং থিয়োরি বা 'বাছাই তত্ত্ব' বলা হয়।
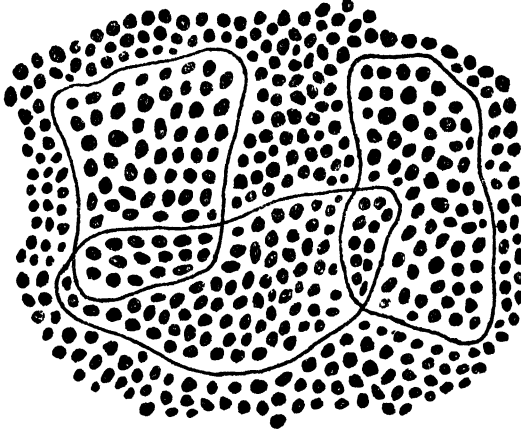
[টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহুশক্তি-তত্ত্বের চিত্ররূপ]

আবার যেহেতু এই তত্ত্বটিতে বহুশক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে সেহেতু প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক একে মাল্টিফ্যাক্টর থিয়োরি বা বহু-শক্তি তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। টমসন ও থর্নডাইকের তত্ত্ব দুটি মূলত অভিন্ন। উপরে টমসনের শক্তিকণা তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহু-শক্তিতত্ত্বের একটি কল্পিত চিত্র দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে যে তিনটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিকণার দল একত্রিত হয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করছে।

অনুশীলনী

১। বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

২। স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। 'জি' (g) ও 'এস' (s) ফ্যাক্টর বা উপাদান বলতে কি বোঝ। 'জি' এবং 'এস' উপাদানের পার্থক্য কিভাবে নির্দেশ করা যায় ব্যাখ্যা কর।

৩। বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্বগুলি আলোচনা কর।

৪। শ্রেণীমূলক শক্তি বা গ্রুপ ফ্যাক্টর কাকে বলে?

৫। থার্স্টোনের প্রাইমারি এবিলিটি থিয়োরি বা প্রাথমিক শক্তিতত্ত্বের বর্ণনা দাও।

৬। টমসনের স্যাম্‌প্লিনিং থিয়োরি বা বাছাই তত্ত্ব এবং থর্নডাইকের মাল্টিফ্যাক্টর থিয়োরি বা বহুশক্তি তত্ত্বের বর্ণনা দাও।

৭। দ্বি-উপাদান তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা বলতে কি বোঝ? কিভাবে এই অসম্পূর্ণতা দূর করা যায়?

বুদ্ধির পরিমাপ

বুদ্ধির স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বুদ্ধির পরিমাপ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন অর্থাৎ কিভাবে বুদ্ধি মাপা যেতে পারে এ সম্বন্ধে বর্তমানে সকলেই প্রায় একমত।

বর্তমানে বহুল প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষার আবিষ্কর্তা হলেন আলফ্রেড বিনে[1] নামে এক ফরাসী মনোবিজ্ঞানী। ১৯০০ সালে প্যারী নগরের একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় শোচনীয় ফল দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে শিক্ষকদের মতে ছেলেমেয়েদের অমনোযোগ ও দুষ্ট বুদ্ধিই এর জন্য দায়ী। আবার কেউ কেউ বললেন যে যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় অনগ্রসরতার কারণ। অপরপক্ষে অভিভাবকেরা শিক্ষকদের অবহেলাকেই এর জন্য দায়ী করলেন। তখন কর্তৃপক্ষ এই সমস্যাটির সমাধানের ভার দিলেন সেই সময়কার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনের হাতে। বিনে দেখলেন যে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই বুদ্ধি পরিমাপের একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার। অনেক গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপের একটি অভীক্ষা[2] তৈরী করলেন। এই অভীক্ষাটি বর্তমানে 'বিনে সাইমন স্কেল'[3] নামে প্রসিদ্ধ। সাইমন[4] ছিলেন বিনের সহকর্মী এবং এই উদ্ভাবনে তাঁর প্রধান সহায়ক।

বিনে সাইমন স্কেলের বৈশিষ্ট্যাবলী

বিনে-সাইমন স্কেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে বর্ণনা করা হল। মোটামুটি-ভাবে বলতে গেলে আজকের দিনের অধিকাংশ বুদ্ধির অভীক্ষার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য-গুলি পাওয়া যায়।

(ক) বিনের অভীক্ষাটি কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে গঠিত। অভীক্ষার্থীকে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমস্যাগুলির সমাধান করতে বলা হয়।

(খ) এই প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি আবার এক শ্রেণীর নয়। নানা ধরনের মানসিক কাজ সম্পাদনের সাহায্যে সেগুলির সমাধান করতে হয়। যেমন, মুখস্থ করা, মনে করা, চিনতে পারা, তুলনা করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, বিচার করা, ভুল বার করা, সংখ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয়। বিনে প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন যে বুদ্ধি একটি বিশেষধর্মী শক্তি

1. Alfred Binet 2. Test 3. Binet-Simon Scale 4. Simon

নয়, এটি একটি সাধারণধর্মী শক্তি। অতএব কোন এক প্রকারের বিশেষধর্মী কাজ সম্পাদনের দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। এটিকে যথাযথ পরিমাপ করতে হলে বহু বিভিন্নধর্মী কাজ ও সমস্যা অভীক্ষাটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোন বিশেষ এক প্রকারের কাজ দিয়ে অভীক্ষাটি তৈরী করা হলে সকল অভীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার করা হবে না। কিন্তু যদি অভীক্ষাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও সমস্যা দেওয়া থাকে তবে সকলের বুদ্ধিকেই পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। এই কারণেই সমস্যা এবং প্রশ্নের বিবিধতা ও বৈচিত্র্যই বিনের অভীক্ষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

(গ) বিনের অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল[1] বলা হয়। যে কোন স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি সমদূরত্ব-সম্পন্ন একক[2] পর পর সাজান থাকে। যেমন, ইঞ্চির স্কেল, সেন্টিমিটারের স্কেল, ওজন করার যন্ত্র ইত্যাদি। বিনের অভীক্ষাতেও তেমনই কতকগুলি একক ক্রমবর্ধমান ধারায় সাজান আছে। এখানে একক হল অভীক্ষার্থীর বয়স। অভীক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী এককগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বা ভাগে বিভক্ত। এই স্কেলে নিম্নতম একক হল তিন বৎসর বয়সের জন্য নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা, তার উপরের এককটি চার বৎসরের জন্য নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা, তার উপরের এককটি পাঁচ বৎসরের জন্য এবং এই ভাবে ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে সর্বোচ্চ ১৫ বৎসরে গিয়ে স্কেলটি শেষ হয়েছে। বিনের অভীক্ষার আধুনিকতম সংস্করণে নিম্নতম একক শুরু হয়েছে দু বৎসর বয়স থেকে এবং প্রতিটি ধাপে প্রথম দিকে ছ'মাস এবং পরে ১ বৎসর করে বেড়ে সব চেয়ে উপরের একক 'উন্নত-বয়স্ক'তে শেষ হয়েছে। বয়স অনুযায়ী এককের বিভাগ থাকার জন্য বিনের অভীক্ষাকে বয়সগত স্কেল[3] বলা হয়।

(ঘ) বিনের অভীক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি ক্রমবর্ধমান দুরূহতার মান[4] অনুযায়ী সাজান থাকে। অর্থাৎ অভীক্ষাটির সর্বপ্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সবশেষের প্রশ্নটি সবচেয়ে দুরূহ এবং এ'দুয়ের মধ্যবর্তী প্রশ্নগুলি ক্রমশ সহজ থেকে দুরূহ হয়ে উঠেছে। এভাবে সাজানর মূলে রয়েছে অতি স্পষ্ট একটি সত্য। সেটি হল এই যে শিশুর মানসিক ক্ষমতাও তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে থাকে।

কোন্ প্রশ্নটির দুরূহতার মান কতটুকু এবং কোন্ বয়সের জন্য সেটি যোগ্য এই অতি জটিল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিনেকে ব্যাপক পরীক্ষণের সাহায্য নিতে হয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ করে তাঁকে সেগুলির দুরূহতার মান নির্ণয় করতে হয়েছে।

(ঙ) বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর মানসিক বয়সের[5] পরিকল্পনাটি। সত্য বলতে কি বিনের মানসিক বয়সের অভিনব পরিকল্পনাটিই

1. Scale 2. Unit 3. Age Scale 4. Graded Difficulty Value 5. Mental Age

আধুনিক কালের বুদ্ধির অভীক্ষার অপরিসীম সাফল্যের জন্য দায়ী। আমরা আগেই দেখেছি যে বিনের অভীক্ষায় বিভিন্ন বয়সের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি (বর্তমান সংস্করণে ছ'টি) প্রশ্ন বা সমস্যা দেওয়া আছে। এখন যদি কোন বালক একটি বিশেষ বৎসরের (ধরা যাক, সাত বৎসরের) জন্য নির্দিষ্ট সব কটি প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারে তবে বলা হবে যে ঐ বালকটির ঐ বৎসরের (অর্থাৎ সাত বৎসরের) মানসিক বয়স আছে, তার আসল বয়স যতই হোক না কেন। সেই রকম কোন বালক আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি উত্তর দিতে পারলে বলা হবে যে তার মানসিক বয়স আট। তেমনই নয় বৎসরের সব প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে তার মানসিক বয়স নয় ইত্যাদি।

(চ) এখন সাধারণভাবে আট বৎসর বয়সের ছেলের উচিত আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারা অর্থাৎ আট বৎসরের ছেলের উচিত আট বৎসরের মানসিক বয়স থাকা। এক কথায় একটি সাধারণ আট বৎসরের ছেলের মানসিক বয়স আট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এখন যদি একটি আট বৎসর বয়সের ছেলে ন'বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে তবে বুঝতে হবে যে তার মানসিক বয়স সাধারণ আট বৎসর বয়সের ছেলের চেয়ে বেশী এবং আর যদি সে আট বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারে তবে বুঝতে হবে যে তার মানসিক বয়স সাধারণ আট বৎসর বয়সের ছেলের চেয়ে কম।

কিন্তু কেবলমাত্র মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়স জানলেই কোন ব্যক্তির বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। কেননা আট বৎসর বয়সের ছেলের পক্ষে বার বৎসর বয়সের মানসিক বয়স থাকাটা যতটা বুদ্ধির পরিচায়ক, এগার বৎসর বয়সের ছেলের পক্ষে ঐ একই মানসিক বয়স থাকা ততটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। অতএব প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ জানার জন্য বিনে মানসিক বয়সকে সময়গত বয়স[1] দিয়ে ভাগ করে এ'দুয়ের একটি অনুপাত[2] বার করলেন। এই অনুপাতটিই ব্যক্তির সত্যকার বুদ্ধিমত্তার সূচক। বিনের প্রবর্তিত এই মানসিক বয়স পরিমাপের পদ্ধতিটি থেকেই বর্তমান বুদ্ধ্যাঙ্ক[3] গণনা করার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। বুদ্ধ্যাঙ্ক গণনা করার সূত্রটি হল—

$$\text{বুদ্ধ্যাঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স} \times ১০০}{\text{সময়গত বয়স}} \left(I.Q. = \frac{MA}{CA} \times 100 \right)$$

উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই ঃ—

যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৭,

$$\text{তার বুদ্ধ্যাঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৭}{৮} = ৮৮$$

1. Chronological Age or CA 2. Rates 3. Intelligence Quotient or I. Q.

অতএব, সে সাধারণ আট বৎসর বয়সের ছেলের চেয়ে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন।
যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়সও ৮,

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৮}{৮} = ১০০$$

অতএব, সে সাধারণ আট বৎসর বয়সের ছেলের সমান বুদ্ধিসম্পন্ন।
আর যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৯,

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৯}{৮} = ১১৩$$

অতএব সে সাধারণ আট বৎসর বয়সের ছেলের চেয়ে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে যে কোন বয়সের ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক হল সেই বয়সের সাধারণ বা গড়[1] ব্যক্তির বুদ্ধির মানের সূচক। কারো ১০০'র কম বুদ্ধ্যঙ্ক হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি কম, আর ১০০'র বেশী বুদ্ধ্যঙ্ক হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী।

(ছ) বুদ্ধির অভীক্ষার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এর সমস্যা বা প্রশ্নগুলি এমন ধরনের হবে যা সমাধান করতে কোন অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। কেননা বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক শক্তি, এটি অর্জিত কোন বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব এমন কোন প্রশ্ন করা চলবে না যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে অর্জিত জ্ঞানের দরকার হবে। যেমন, তাজমহল কে তৈরী করেছিলেন বা ক' ডিগ্রীতে এক সমকোণ হয় ইত্যাদি প্রশ্ন দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি এমন প্রকৃতির হবে যেগুলির সমাধান করতে কেবলমাত্র মনের সাধারণ শক্তিরই প্রয়োগ লাগবে, কোন অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য দরকার হবে না। তবেই হবে সত্যকার বুদ্ধির পরীক্ষা। যেমন "একজন লোক বাড়ী ফিরে এসে দেখল যে চোরেরা তার বাড়ীতে ঢুকে সব চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, তখন তার কি করা উচিত?"—এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে সামান্যই অর্জিত জ্ঞান লাগে। আসলে যা লাগে তাকেই আমরা বুদ্ধি বলে থাকি। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে যতদূর সম্ভব এই ধরনের অর্জিত-জ্ঞান-নিরপেক্ষ প্রশ্ন দেবারই চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা ঠিক হলেও সম্পূর্ণভাবে অর্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষা রচনা করা যায় না। কেননা বুদ্ধি একটি অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি। তাকে প্রকাশ করতে হলে বিশেষ একটি বাহক বা মাধ্যমের প্রয়োজন এবং ভাষা, দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্য বুদ্ধিকে বাইরে প্রকাশ করার জন্য অপরিহার্য।

(জ) অতএব, পুরোপুরি অর্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী

1. Average

সম্ভব হয় না। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতার্থক এবং সমার্থক শব্দ বলা, বাক্যের অর্থ-নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নানা অর্জিত-জ্ঞান-নির্ভর সমস্যা পাওয়া যায়। তবে এই সব বুদ্ধির অভীক্ষায় অভীক্ষানির্মাতাগণ ততটুকু অর্জিত জ্ঞানেরই ব্যবহার করেন, যতটুকু তাঁরা মনে করেন যে অভীক্ষার্থীদের সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান আছে। যেমন ৮ বৎসর বয়সের ছেলেকে বলা হল 'সপ্তাহের দিনগুলির নাম বল'। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সাধারণ সভ্যসমাজে যে কোন আট বৎসর বয়সের ছেলেই সপ্তাহের দিনগুলির নাম জানে। 'বিনে সাইমন স্কেলেও' এই ধরনের অর্জিত-জ্ঞান-নির্ভর বহু সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষা-গুলিতে ভাষাধর্মী অর্জিত জ্ঞানের প্রাচুর্য এত বেশী যে অনেকে এগুলিকে বুদ্ধির অভীক্ষা না বলে বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা[1] নাম দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে এই এই ধরনের ভাষাভিত্তিক ও অর্জিত জ্ঞানমূলক অভীক্ষাগুলির দ্বারা সত্যকারের বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এগুলির দ্বারা এক ধরনের বিদ্যামূলক দক্ষতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে মাত্র।

(ঝ) বুদ্ধির অভীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যকারের বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারি না, আমরা পরিমাপ করি বুদ্ধির বাহ্যিক প্রকাশ বা অভিব্যক্তিটি। অতএব বুদ্ধির অভীক্ষায় আমরা যা পরিমাপ করি এবং সত্যকারের বুদ্ধি, এ দুইই অভিন্ন কিনা তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। তাছাড়া সম্পূর্ণ বুদ্ধিটাকে পরিমাপ করা যায় কিনা তাও নিঃসন্দেহে বলা চলে না। বরং ব্যক্তির মোট বুদ্ধির একটি অংশকেই পরিমাপ করা যায় বলেই মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন।

বুদ্ধির অভীক্ষার দৃষ্টান্ত

বুদ্ধিকে বর্ণনা করা হয়েছে একটি সাধারণধর্মী শক্তিরূপে এবং এটিকে পরিমাপ করতে হলে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্যা অভীক্ষাটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এই জন্যই বিনে স্কেলে এবং অন্যান্য আধুনিক প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষায় বহু বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি সমস্যার বর্ণনা ও উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

১। বস্তু, ছবি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির নাম বলা।

যেমন: একটা ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে বলা হয়, 'এটা কি বলত ?'

২। স্মৃতি

যেমন: একটা বাক্য বা গল্প শোনানর পর অভীক্ষার্থীকে সেটিকে মন থেকে বলতে বলা হয়।

---

1. Scholastic Aptitude Test

৩। সংখ্যা গণনা

যেমন : ৬—৫—৯—৪ এই সংখ্যার সারিটি অভীক্ষার্থীকে শুনিয়ে তাকে সেটি পুনরায় বলতে বলা হয়।

৪। দুটি বস্তু বা ধারণার মধ্যে তুলনা[1]

যেমন : (ক) একটি ক্রিকেট বল ও কমলালেবুর মধ্যে কোথায় কোথায় মিল, আর কোথায় কোথায় পার্থক্য ?

(খ) দারিদ্র্য এবং দুর্দশার মধ্যে মিল এবং অমিল কোথায় কোথায় ?

৫। সংবোধন[2]

যেমন : (ক) আমরা তৃষ্ণার্ত হলে কি করতে বাধ্য হই ?

(ঘ) হারিয়ে গেছে এমন একটি তিন বছরের ছেলেকে হঠাৎ পথে দেখলে তুমি কি করবে ?

৬। বস্তু গণনা

কতকগুলি বস্তু অভীক্ষার্থীর সামনে দিয়ে তাকে সেগুলি গুণতে বলা হয়।

৭। শব্দ-সম্ভার পরীক্ষা—সমার্থক, বিপরীতার্থক ইত্যাদি

যেমন : (ক) কমলালেবু কাকে বলে ?

(খ) 'রোগ' কথাটির আর একটি প্রতিশব্দ বল। (সমার্থক শব্দ)

(গ) 'সাহসী' কথাটির ঠিক বিপরীত অর্থ বোঝায় এমন একটি শব্দ বল। (বিপরীতার্থক শব্দ)

(ঘ) 'ধৈর্য', 'অধ্যবসায়,' 'সংযোগ', 'প্রতিহিংসা' শব্দগুলির অর্থ বল। (অমূর্ত শব্দ)

৮। অসম্ভবতা[3] নির্ণয়

যেমন : (ক) হাত দুটো পিছন থেকে বাঁধা এবং পা দুটো বাঁধা অবস্থায় একটি যুবককে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। লোকে ভাবল যুবকটি নিজেই নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল—এই উক্তিটির মধ্যে এমন কি আছে যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

(খ) একটা অসংগতিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে বলা হয়, এর মধ্যে কোথায় কোথায় ভুল আছে বার কর।

1. Comparison 2. Comprehension 3. Absurdity

৯। উপমান[1]

যেমন ঃ—(ক) 'পাখী ওড়ে, মাছ—' (উঃ—সাঁতার কাটে)

(খ) সূর্য দেয় উত্তাপ, ফুল দেয়—,

(গ) ঋণ হল দায়, আয় হল—

(ঘ) ৯'র সঙ্গে ৬'র যা সম্পর্ক, ন'র সঙ্গে 'কার' সে সম্পর্ক ?

১০। বিচারকরণ[2]

যেমন ঃ—(ক) একটা কাগজকে দু'বার ভাঁজ করার পর তার একটা কোণে একটা ছোট ফুটো করা হল। তার পর প্রশ্ন করা হল, কাগজটা খুললে কটা ফুটো দেখা যাবে ?

(খ) প্রশ্ন করা হল, লোকে চশমা পরে কেন ?— সুন্দর দেখাবে বলে, না চোখ খারাপ বলে, না ফ্যাসানের খাতিরে ?

১১। শ্রেণীবিন্যাস[3]

যেমন ঃ—(ক) টেবিল, বই, চেয়ার, আলমারী—এই ৪টি বস্তুর মধ্য কোন্‌টি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় ?

(খ) বেড়ানো, ওড়া, সাঁতার কাটা, লেখাপড়া করা—এই ৪টি কাজের মধ্যে কোন্‌ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর ?

১২। সংখ্যা সারি

যেমন ঃ—শূন্য স্থানগুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও—

(ক) ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ১১ — —
(খ) ৬ ৯ ১২ ১৫ ১৮ ২১ — —
(গ) ৯ ১২ ১০ ১৩ ১১ ১৪ — —
(ঘ) ১ ৪ ৯ ১৬ ২৫ ৩৬ — —

১৩। বিচ্ছিন্ন বাক্য[4]

যেমন ঃ—নীচের কথাগুলিকে এমনভাবে সাজাও যাতে একটি অর্থবোধক বাক্য হয়।

(ক) খুব যাত্রা উদ্দেশ্যে করলাম গ্রামের ভোরে সুরু।

(খ) সাহসী কাজ লোকে সৎ করে।

১৪। সমস্যা সমাধান

যেমন—একটি ছেলেকে মা নদীতে পাঠালেন ঠিক এক সের জল আনতে। তাকে

1. Analogy 2. Reasoning 3. Classification 4. Dissected Sentence

দিলেন একটি ৩ সেরি পাত্র আর একটি ৮ সেরি পাত্র। এখন ছেলেটি কি করে ঠিক ১ সের জল আনবে দেখিয়ে দাও। মনে রেখো ১ সেরের কম বা বেশী জল আনা চলবে না।

১৫। প্রবাদ[1]

যেমন ঃ—নীচের প্রবাদগুলির কি অর্থ বল—

(ক) অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

(খ) ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

(গ) উলু বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।

(ঘ) দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

১৬। প্রয়োগমূলক সমস্যা[2]

যেমন ঃ—(ক) ফর্ম বোর্ড। একটি কাঠের বোর্ডে বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ প্রভৃতির আকারের কয়েকটি গর্ত কাটা থাকে এবং ঐ মাপের কতকগুলি কাঠের টুকরো দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীকে ঐ গর্তগুলিতে ঠিক মাপ মত কাঠের টুকরোগুলো বসাতে হয়।

(খ) নানা রঙের ও আকৃতির পুঁতি দিয়ে প্রদত্ত কোন নক্সা অনুযায়ী মালা গাঁথতে হয়।

(গ) একটি আয়তক্ষেত্রের বা রম্বসের ছবিকে দু'টুকরো বা তিন টুকরো করে কেটে অভীক্ষার্থীকে দেওয়া হয় এবং তাতে টুকরোগুলি জুড়ে পূর্বের নক্সামত সাজাতে বলা হয়।

(ঘ) গোলকধাঁধায় ঠিক পথটি বার করার সমস্যা বুদ্ধির অভীক্ষায় প্রায়ই দেওয়া হয়।

(ঙ) এছাড়া আঁকা, রেখা টানা প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যাও দেওয়া হয়ে থাকে।

অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা বা বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা

বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা হল এক ধরনের অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা। স্কুলে বা কলেজে কোন ছাত্র একটি বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে কতটুকু শিখল সেটা পরীক্ষা করার জন্যই বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী, ভূগোল বা ইতিহাসের উপর বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষা হল মনের সহজাত সাধারণ শক্তির মান নির্ণয়ের অভীক্ষা। বুদ্ধির পরিমাপের ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে অভীক্ষার্থীর সাফল্যের কোন সম্পর্ক থাকে না, বরং যতটা অর্জিত জ্ঞানকে বাদ দেওয়া যায় ততই বুদ্ধির অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।

---

1. Proverb 2. Practical Problems

বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান নানা কারণে কম বেশী থাকে এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সেই জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ান চলতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধির ভাণ্ডারে ইচ্ছা করলেই বিশেষ পরিবর্তন ঘটান যায় না। অতএব অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা[1] আর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে বুদ্ধির কোন অভীক্ষাই অর্জিত জ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়ে তৈরী করা সম্ভব নয়। কেননা বুদ্ধি একটা অমূর্ত শক্তিবিশেষ এবং তার বাহ্যিক অভিব্যক্তির জন্য কোন বাহক বা মাধ্যম অপরিহার্য। আর কোন না কোন ধরনের অর্জিত জ্ঞানই বুদ্ধির এই বাহক বা মাধ্যম রূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে একটু উন্নত স্তরের অভীক্ষা তৈরী করতে হলে তাতে জটিল সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। আর জটিল সমস্যা মানেই অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ।

প্রকৃতপক্ষে স্কুলে কলেজে যে সব পরীক্ষা গতানুগতিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সেগুলির সবই বিদ্যাবত্তার বা অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা। কিন্তু আধুনিক বিষয়মুখী অভীক্ষাগুলিকেই সাধারণত এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাগুলিকে বাতিল করে সেগুলির স্থানে আজকাল এই নতুন 'বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা'র প্রয়োগ হচ্ছে। এগুলি বর্তমানে শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা[2] নামে পরিচিত।

বিনে স্কেলের সংস্করণ

বিনে তাঁর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম তৈরী করেন ১৯০০ সালে। তাঁর জীবিতকালেই তিনি ১৯০৫, ১৯০৯, ১৯১১ সালে অভীক্ষাটির পর পর তিনবার সংস্কার[3] করেন। বিনে মারা যান ১৯১১ সালে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অভীক্ষাটি খুব শীঘ্রই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ দেশের মনোবিজ্ঞানীই এটিকে বুদ্ধির পরিমাপের সন্তোষজনক যন্ত্র বা মাধ্যম বলে গ্রহণ করেন। বিনের মূল অভীক্ষাটি ছিল ফরাসী ভাষায়। ক্রমশ নানা বিভিন্ন ভাষায় এটির অনুবাদ হতে থাকে। এত পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অভীক্ষাটির মূল রূপ ও সংগঠনের যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়।

ইংরাজী ভাষায় বিনে স্কেলের যতগুলি সংস্করণ হয়েছে তার মধ্যে আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের[4] অধ্যাপক টারম্যানের[5] প্রণীত সংস্করণটিই বিখ্যাত। টারম্যান বিনে স্কেলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে। তিনি ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক মেরিলের[6] সহযোগিতায় টারম্যান-মেরিল স্কেল নামে পরিচিত এর আর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে এই দু'জন মনোবিজ্ঞানীই এটির আর একটি এবং এখনও পর্যন্ত শেষ সংস্করণটি প্রকাশ করেন।

1. Achievement Test 2. Educational Test 3. Revision 4. Stanford Universitv 5. Terman 6. Merril

ষ্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেলের এই সংস্করণটিই বর্তমানে অধিকাংশ ইংরাজী ভাষা-ভাষী দেশে বুদ্ধির অভীক্ষারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টারম্যান-মেরিলের সংস্করণ ছাড়াও গডার্ড[1], বার্ট[2] প্রভৃতি বহু মনোবিজ্ঞানীর প্রণীত বিনের স্কেলের সংস্করণ প্রচলিত আছে।

ষ্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল[3]

বিনের ১৯১১ সালের প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষাটিকে ভিত্তি করে অধ্যাপক টারম্যান ও মেরিল যে অভীক্ষাগুলি তৈরী করেন সেগুলি ষ্ট্যানফোর্ড রিভিসন অফ বিনে স্কেল বা সংক্ষেপে ষ্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল বলা হয়। মূল বিনে-সাইমন স্কেলটি সুরু হয়েছিল সর্বনিম্ন ৩ বৎসর বয়স থেকে এবং সর্বোচ্চ ১৫ বৎসর বয়সে শেষ হয়েছিল। টারম্যান-মেরিলের সর্বশেষ সংস্করণের স্কেলটি সুরু হয়েছে সর্বনিম্ন ২ বৎসর থেকে এবং শেষ হয়েছে সর্বোচ্চ ধাপ উন্নত বয়স্ক(৩)তে। বিনের মূল স্কেলে প্রশ্ন বা সমস্যার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৫টি, টারম্যানের প্রথম ষ্ট্যানফোর্ড সংস্করণে এই সংখ্যা হয় ৯০টি এবং ১৯৩৭ সালের সংস্করণে প্রশ্ন সংখ্যা বেড়ে হয় ১২৯টি।

এই প্রশ্নগুলির বিভাগ হল নিম্নরূপ :

২, ২½, ৩, ৩½, ৪, ৪½, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
১১, ১২, ১৩, ১৪—এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য
৬টি করে প্রশ্ন। =১৬ × ৬ ··· ৯৬টি প্রশ্ন
সাধারণ বয়স্ক[4] স্তরের জন্য ··· ৮টি প্রশ্ন
উন্নত বয়স্ক[5] (১), উন্নত বয়স্ক (২) এবং উন্নত বয়স্ক (৩)
—এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন। =৩ × ৬ ··· ১৮টি প্রশ্ন
প্রথম সাতটি বয়সের জন্য ১টি করে বিকল্প প্রশ্ন ··· ৭টি প্রশ্ন

মোট : ১২৯টি প্রশ্ন

বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণনা

বিনে-স্কেলের প্রয়োগের নিয়ম হল এই। অভীক্ষাথীর সময়গত বয়সের ২ বৎসর নীচে থেকে অভীক্ষাটির প্রয়োগ সুরু করতে হয় এবং দেখতে হয় যে স্কেলের সর্বোচ্চ কোন্ বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থী সব কটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। সেই বয়সটিকে অভীক্ষার্থীর মৌলিক মানসিক বয়স[6] বলে ধরা হবে। তারপর এই মৌলিক বয়সের উপরের কয়েক বৎসরের প্রশ্নগুলি অভীক্ষার্থীকে পর পর দিয়ে দেখতে হবে যে কোন্ বয়সের কটি প্রশ্নের সে নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। যতক্ষণ না অভীক্ষার্থী এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছচ্ছে যখন সে আর একটি প্রশ্নেরও নির্ভুল উত্তর দিতে পারছে না ততক্ষণ পর্যন্ত অভীক্ষাটি তার উপর প্রয়োগ করে যেতে

1. Goddard 2. Burt 3. Stanford-Binet Scale 4. Average Adult
5. Superior Adult 6. Basal Mental Age

হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারলে অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স পাওনা হয়। এই অর্জিত মানসিক বয়সের গণনা করা হয় 'মাসের' হিসাবে। বিভিন্ন বয়সের প্রশ্নের নির্ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্য মানসিক বয়স সমান হয় না। স্কেলের প্রথম ৬ বৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর থেকে ৪½ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে ১ মাস হিসাবে অর্থাৎ একটি প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল হলে প্রাপ্য হবে ১ মাস, ২টি প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল হলে প্রাপ্য হবে ২ মাস ইত্যাদি। তেমনই ৫ বৎসর থেকে সাধারণ বয়স্ক বৎসর স্তরের মধ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর পাওনা হবে ২ মাস করে মানসিক বয়স এবং উন্নত বয়স্ক (১) বৎসরের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৪ মাস করে, উন্নত বয়স্ক (২) বৎসরের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৫ মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বৎসরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৬ মাস করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিস্কার হবে।

মনে করা যাক একটি ছেলে (সময়গত বয়স : ৪ বঃ ৮ মাঃ) ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সব প্রশ্ন পারল। তারপর সে পারল ৪½ বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, ৫ বৎসরের ৩টি, ৬ বৎসরের ২টি এবং ৭ বৎসরের ১টি প্রশ্ন। তার মৌলিক মানসিক বয়স হল ৪ বৎসর এবং পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য তার অর্জিত মানসিক বয়স হল (৪×১)+(৩×২)+(২×২)+(১×২)=১৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হল ৪ বৎসর+১৬ মাস বা ৫ বৎসর ৪ মাস। এখন যেহেতু এই ছেলেটির সময়গত বয়স হল ৪ বৎসর ৮ মাস, সেহেতু তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে

$$\frac{(\text{৫ বঃ ৪ মাঃ})\times \text{১০০}}{(\text{৪ বঃ ৮ মাঃ})}=\text{১১৪}$$

মনে করা যাক আর একজন অভীক্ষার্থী (সময়গত বয়স : ১৩ বঃ ১ মাঃ) ১৩ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত প্রশ্ন পারল। তারপর সে পারল ১৪ বৎসরের ৫টি প্রশ্ন, সাধারণ বয়স্ক বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (১) বৎসরের ৩টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (২) বৎসরের ২টি প্রশ্ন এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বৎসরের ১টি প্রশ্ন। এই অভীক্ষার্থীটির মৌলিক মানসিক বয়স হল ১৩ বৎসর এবং পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য তার অর্জিত মানসিক বয়স হল—(৫×২)+(৪×২)+(৩×৪)+(২×৫)+(১×৬)=১০+৮+১২+১০ +৬ মাস=৪৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হবে ১৩ বৎসর+৪৬ মাস বা ১৬ বৎসর ১০ মাস। এখন যেহেতু এই অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হল ১৩ বৎসর ১ মাস, সেহেতু তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে

$$\frac{(\text{১৬ বঃ ১০ মাঃ})\times \text{১০০}}{(\text{১৩ বঃ ১ মাঃ})}=\text{১২৯}$$

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণনা

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক পরিগণনা করার নিয়ম একটু বিভিন্ন। দেখা গেছে যে ১৫ বৎসরের পর বুদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। সেজন্য মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি ভাবে ১৫ বৎসরেই বুদ্ধির বিকাশের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। অতএব কোন বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বৎসরকে সর্বোচ্চ সময়গত বয়স হিসাবে ধরা হয়, সত্যকার বয়স তার যতই হোক্ না কেন। যেমন, যদি কোন অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স ২৪ বৎসর ২ মাস এবং তার মানসিক বয়স হিসাব করে দাঁড়ায় ১৭ বৎসর ২ মাস, তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\frac{(\text{১৭ বঃ ২ মাঃ}) \times \text{১০০}}{\text{১৫ বঃ}} = \text{১১৪}$$

ষ্ট্যানফোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ২২ বৎসর ১০ মাস এবং সে হিসাবে সর্বোচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক হতে পারে ১৫২।

ষ্ট্যানফোর্ড স্কেলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর থেকে বুদ্ধির অভীক্ষা নিয়ে নানা দেশে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়। ফলে বহু নতুন ও অভিনব বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী হয়। এগুলির অধিকাংশই অবশ্য বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। প্রথম, সমস্যা বা প্রশ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে ভাষামূলক[1] এবং ভাষাবর্জিত[2]—এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। দ্বিতীয়, সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত[3] ও যৌথ[4]—এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা মোট চার রকমের হতে পারে—ভাষামূলক ব্যক্তিগত, ভাষাবর্জিত ব্যক্তিগত, ভাষামূলক যৌথ ও ভাষাবর্জিত যৌথ।

ভাষামূলক অভীক্ষা ও ভাষাবর্জিত অভীক্ষা

ভাষামূলক অভীক্ষাগুলির উপাদান প্রধানত শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি। অভীক্ষার্থীকে লিখিত এবং কথিত ভাষার সাহায্যেই প্রদত্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়। সমস্যাগুলির মধ্যেও প্রচুর ভাষার ব্যবহার থাকে। শব্দ বা বাক্যের অর্থ বলা, সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করা, লিখিত বাক্য পড়া ও তার অর্থ বোঝা ইত্যাদি নানাভাবে ভাষার ব্যবহার এই সব অভীক্ষায় অঙ্গীভূত থাকে।

1. Verbal 2. Non-verbal 3. Individual 4. Group

বিনে-সাইমন্স স্কেলটি একটি ভাষামূলক ব্যক্তিগত অভীক্ষা। তেমনই আর্মি আলফা[1] একটি ভাষামূলক যৌথ অভীক্ষা।

ভাষাবর্জিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে কথিত বা লিখিত ভাষার ব্যবহারকে যতটা সম্ভব (একেবারে সম্ভব নয়) বর্জন করা হয়। এমন অনেক অভীক্ষার্থী আছে যারা ভাষা ব্যবহারে তেমন পটু নয় বা কোন কারণে তাদের ভাষাশিক্ষার মধ্যে দুর্বলতা থেকে গেছে। অতএব ভাষামূলক অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে তাদের বুদ্ধির পরিমাপ করা কখনই যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। বিশেষ করে নিরক্ষর, শিশু ও বিদেশীর ক্ষেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষার ব্যবহার চলতেই পারে না। এই সকল ব্যক্তির জন্যই ভাষাবর্জিত অভীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই শ্রেণীভুক্ত অভীক্ষাগুলি আবার নানা রকমের হতে পারে। আর্মি বিটা[2] একটি ভাষাবর্জিত যৌথ অভীক্ষা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশী সৈন্যদের বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য এই অভীক্ষাটি গঠিত হয়।

সম্পাদনী অভীক্ষা

ভাষাবর্জিত অভীক্ষার প্রথম পর্যায়ে পড়ে সম্পাদনী অভীক্ষা[3]। এগুলিতে নানা আকৃতি ও রঙের কাঠের বা প্লাস্টিকের টুকরোর সাহায্যে প্রদত্ত কোন বিশেষ নক্সার অনুকরণে একটি নক্সা তৈরী করতে হয় বা কোন প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করতে হয়। প্রধানত দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই এই অভীক্ষাগুলির সমাধান করতে হয় বলে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে সম্পাদনী অভীক্ষা। সম্পাদনী অভীক্ষায় সমস্যাটির সমাধানে বা প্রদত্ত নক্সাটির গঠনে সাফল্য এবং দ্রুততার বিচার করে অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে আলেকজাণ্ডারের পাস-এ্যালংগ[4], কোহ্‌'র ব্লক ডিজাইন[5], ডিয়ারবর্নের ফর্মবোর্ড[6], পোর্টিয়াসের গোলকধাঁধা[7], হিলি'র পাজল[8] প্রভৃতির নাম করা যায়। কোন কোন বুদ্ধির অভীক্ষায় ভাষামূলক ও ভাষাবর্জিত দুরকম সমস্যাই দেওয়া হয়ে থাকে। ওয়েক্সলার-বেলেভিউ ইন্টেলিজেন্স স্কেল[9] এই ধরনের একটি মিশ্র প্রকৃতির ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা।

আর একটি প্রসিদ্ধ ভাষাবর্জিত ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা হল গুডএনাফের মানুষ-আঁকার অভীক্ষা। এতে অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি আঁকতে বলা হয়। শিল্প-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে ছবিটির উৎকর্ষের কোনরূপ বিচার করা হয় না। প্রধানত দেখা হয় যে মানুষের দেহের প্রয়োজনীয়

1. Army Alpha 2. Army Beta 3. Performance Test 4. Alexander Pass Along 5. Koh's Block Design 6. Dearborn's Form Board 7. Porteus Maze 8. Healey's Puzzle 9. Wechsler-Bellevue Intelligence Scale or WBIS

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে ঠিকমত আঁকতে পারল এবং কতগুলি পারল না। তাছাড়া বিশেষ করে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ও অবস্থিতির পারস্পরিক সম্বন্ধের দিক দিয়ে অভীক্ষার্থীর ধারণা কতটা নির্ভুল ও বাস্তবধর্মী তা থেকেই অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির একটি পরিমাপ পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। ৪ থেকে ১০ বৎসর বয়সের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষা রূপে গুডএনাফের[1] মানুষ-আঁকার অভীক্ষাটি[2] আজকাল মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গোলকধাঁধায় নির্ভুল পথটি বার করাও একটি অতি প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষা এগুলি নানা রকমের হয়ে থাকে। কখনও কাগজে ছাপা গোলকধাঁধায় পেন্সিল দিয়ে বহির্গমনের পথটি বার করতে বলা হয়, আবার কখনও কাঠের ছোট ছোট দেওয়াল দিয়ে তৈরী গোলকধাঁধায় আঙ্গুল বা ষ্টাইলাস[3] দিয়ে বেরোবার পথটি আবিষ্কার করার সমস্যা দেওয়া হয়। এই নির্ভুল পথ বার করতে যে অভীক্ষার্থী যত কম ভুল করে এবং যত অল্প সময়ে সমস্যাটির সমাধান করতে পারে তার তত বেশী বুদ্ধি আছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়।

সম্পাদনী অভীক্ষা ছাড়াও কাগজে কলমে[4] উত্তর করা যায় এমন অনেক ভাষাবর্জিত অভীক্ষা আছে। আর্মি বিটা অভীক্ষাটি এই ধরনের একটি ভাষাবর্জিত যৌথ অভীক্ষা। ছবি, নক্‌সা ইত্যাদি আঁকার মধ্যে দিয়ে এই অভীক্ষাটির সমাধান করতে হয়।

ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষা

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে তাদের সংগঠন ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষা এবং যৌথ অভীক্ষায় ভাগ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত অভীক্ষা হল সেই সব অভীক্ষা যেগুলি এক সময়ে একজনের বেশী অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষক একজন মাত্র অভীক্ষার্থীর সামনে সমস্যাগুলি একটির পর একটি উপস্থাপিত করেন এবং সেগুলি সম্বন্ধে অভীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে যান। বিনে-সাইমন স্কেলটি এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা।

যৌথ অভীক্ষাতে কিন্তু তা করতে হয় না। একসঙ্গে বহু অভীক্ষার্থীর উপর অভীক্ষক অভীক্ষাটি প্রয়োগ করতে পারেন। সাধারণত ছাপা ছোট পুস্তিকার আকারে পুস্তিকার অভীক্ষাটি তৈরী করা হয়ে থাকে। তাতে সমস্যাগুলি ছোট ছোট এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের আকারে দেওয়া থাকে এবং কেমন করে সেগুলির সমাধান করতে হবে তাও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে। অভীক্ষার্থী সেই নির্দেশমত সমস্যাগুলির

1. Goodenough 2. Man-Drawing Test 3. Stylus 4. Paper-Pencil Test

উত্তর পুস্তিকাটিতে লিখে দেয়। উত্তর দেওয়ার কাজটিও আজকাল খুব সরল ও সহজ করে তোলা হয়েছে। সাধারণত টিক দেওয়া বা নীচে দাগ দেওয়া বা ক্রুশচিহ্ন দেওয়া প্রভৃতি নানা ধরনের অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত কাজের মাধ্যমে অভীক্ষার্থী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষায় কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমত, এর প্রয়োগে অনেক সময় ও পরিশ্রম বাঁচে। একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা প্রয়োগ করতে কম করে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। ফলে স্বভাবতই ব্যক্তিগত অভীক্ষার সাহায্যে একটি ক্লাসের ৫০টি ছেলের বুদ্ধির পরিমাপ করতে বহুদিন লেগে যায়। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার সাহায্যে এক দিনেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সকলের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত অভীক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক না হলে অভীক্ষাটির প্রয়োগই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষায় নির্দেশদান সহজ ও সুনির্দিষ্ট। ফলে এগুলির প্রয়োগের জন্য অভিজ্ঞ বা বিশেষরূপে শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভীক্ষাটি প্রয়োগের কৌশল ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে নিলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও যৌথ অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

কিন্তু আবার নির্ভরশীলতার[1] দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষার মূল্য অনেক বেশী। কেননা অভীক্ষাটির প্রয়োগের সময় অভীক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে কতটা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেটির উপর অভীক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর সঙ্গে অভীক্ষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে বলে তিনি তার মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং সেইমত তার সঙ্গে আচরণ করতে পারেন।

কিন্তু আজকের দ্রুত গতিশীল জগতে সময় সংক্ষেপের দাম অনেক। ফলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যৌথ অভীক্ষার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে নতুন তৈরী অভীক্ষার অধিকাংশই যৌথ অভীক্ষা। যৌথ অভীক্ষার প্রথম ব্যাপক প্রচলন করেন আমেরিকার সামরিক বিভাগ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তাঁরা স্থির করেন যে সামরিক কাজে যাদের নেওয়া হবে তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভীক্ষার মাধ্যমে হাজার হাজার সৈনিক ও কর্মচারীর বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে দুটি যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করা হয়। প্রথমটির নাম আর্মি আলফা অভীক্ষা। এটি ভাষামূলক এবং ভাষার পঠন ও লিখনের মধ্যে দিয়ে এটির সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়। দ্বিতীয়টির নাম আর্মি বিটা অভীক্ষা। এর আগে ওটিস[2] নামে একজন মনোবিজ্ঞানী একটি ভাষাবর্জিত অভীক্ষা গঠন করেন। তাঁরই উদ্ভাবিত

1. Reliability 2. Otis

সেই অভীক্ষার উপর নির্ভর করে এই নতুন অভীক্ষাটি গঠন করা হয়। এই অভীক্ষাটি ভাষাবর্জিত এবং এর অন্তর্ভুক্ত সমস্যাগুলির সমাধানে ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, গোলকধাঁধায় পথ বার করা প্রভৃতি ভাষা-নিরপেক্ষ সমস্যার দ্বারা এই অভীক্ষাটি গঠিত। সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশার্থী অশিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যই এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে 'আর্মি' আলফার অভীক্ষাটির আবার নতুন করে সংস্কার করা হয়। এই নতুন সংস্করণটি আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেসন অভীক্ষা[1] নামে পরিচিত।

বুদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিতা

বর্তমান শতকে নানা কারণে বুদ্ধির অভীক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। বুদ্ধির অভীক্ষা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগে নীচে তার কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল।

(ক) বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যক্তির বুদ্ধির মান নির্ভুলভাবে নির্ণয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ বুদ্ধির সাধারণ মানের চেয়ে যদি কারও বুদ্ধি কম বা বেশী থাকে তা আমরা এই বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারি।

(খ) বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি যে সব মানুষের মানসিক ক্ষমতা সমান নয়। স্কুলের লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ-বুদ্ধিমান ছেলে দ্রুত শেখে, স্বল্পবুদ্ধির শেখার গতি মন্থর। অতএব স্কুলে একই ক্লাসে যদি বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক সঙ্গে রেখে তাদের একই পদ্ধতিতে পড়ানো যায়, তাতে মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে মোটামুটি উপকৃত হলেও, অল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং অধিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন, এই দু'দলেরই বিশেষ কোন উপকার হয় না। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের[2] নীতিটি আজকাল সর্বত্রই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক ক্লাসে না রেখে সাধারণত ভাল, মাঝারি এবং মন্দ এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও সামর্থ্যের বৈষম্য অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এইভাবে বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণী-বিন্যাস করা সম্ভব হয় বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা।

(গ) বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সাফল্যের গণনা করতে সাহায্য করে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের লেখাপড়ায়, বিশেষ করে সাহিত্যধর্মী

1. Army General Classification Test or AGCT 2. Individual Difference

পাঠস্তরে, সাফল্য লাভের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে। আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য এবং বুদ্ধির অভীক্ষায় কৃতিত্বের মধ্যে সহপরিবর্তনের[1] মান বেশ উঁচু (পরিসংখ্যানের ভাষায় '৪০ থেকে '৬০)। ফলে কোন ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক দেখে বলা যায় যে সে ভবিষ্যতে লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জন করবে কিনা এবং করলে কতটুকু করবে। যদি দেখা যায় যে কোন ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশ কম তবে বলা চলতে পারে যে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ায় সে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

(ঘ) এই বৈশিষ্ট্য থেকেই আধুনিক যুগে বুদ্ধির অভীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালনার[2] ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে। অর্থাৎ কোন ছেলের বুদ্ধির মান পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে লেখাপড়ার কোন্ পথে তার যাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক কম তাকে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ার পথে যেতে উপদেশ না দিয়ে কোন ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করা নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশ উঁচু তাকে উন্নত সাহিত্যমূলক পাঠস্তর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া যায়। কার কোন্ শ্রেণীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এটা পূর্বাহ্নে জানা গেলে শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং অনুপযোগী শিক্ষা গ্রহণের ফলে সাধারণত সময়, শ্রম ও উৎসাহের যে অনর্থক অপচয় ঘটে তার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

(ঙ) বৃত্তিমূলক পরিচালনার[3] ক্ষেত্রেও বর্তমানে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এমন বহু বৃত্তি আছে যেগুলিতে সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। যেমন, শিক্ষকতা, আইনজীবিকা, ব্যবসা-পরিচালনা, পরিশাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি, সংবাদপত্র সম্পাদন, ডাক্তারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কার্যাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরীর কাজকর্ম, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য, বয়নশিল্প, যুদ্ধবৃত্তি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বহু জীবিকা আছে যাতে উচ্চমানের বুদ্ধি না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির কোন্ বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর। অবশ্য কেবলমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষাকে ভিত্তি করেই কার পক্ষে কোন বৃত্তি নেওয়া উচিত ও তা সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না। এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে কি কি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি বা দক্ষতা আছে এবং তার আগ্রহ, মনঃপ্রকৃতি ইত্যাদির স্বরূপ কি তাও জানা দরকার হয়। কিন্তু বৃত্তির নির্বাচনের প্রাথমিক সোপান রূপে বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগ যে অপরিহার্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

---

1. Correlation 2. Educational Guidance 3. Vocational Guidance

(চ) বুদ্ধির অভীক্ষার এই সকল উপযোগিতার জন্য আজকাল স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা থেকে সুরু করে বড় বড় অফিস, সেনাবিভাগ ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে কর্মী নিয়োগের সময় বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। আধুনিক যুগে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগের সময় যে সব বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার প্রয়োগ করা হয় বুদ্ধির অভীক্ষা হল সেগুলির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সেনা-নৌ-বিমান প্রভৃতি বিভাগে আজকাল বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়া কোনরূপ কর্মী নিয়োগ করাই হয় না।

(ছ) মানসিক বিকার, ছেলেমেয়েদের সমস্যামূলক আচরণ, কিশোর অপরাধ প্রভৃতির চিকিৎসা করার সময় বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করাটা প্রাথমিক সোপান বলেই সর্বত্র পরিগণিত হয়ে থাকে। কেননা বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে মনের বিকার বা অস্বাভাবিকতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

বুদ্ধির বণ্টন[1]

সকল মানুষের বুদ্ধি যে সমান নয় এটি সর্বজনস্বীকৃত লৌকিক অভিজ্ঞতা। সকলেই কিছু না কিছু বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে একথা যেমন সত্য, আবার সকলের বুদ্ধি যে সমান নয় একথাও তেমনই সত্য। প্রকৃতির বণ্টনে কারও ভাগে বুদ্ধি পড়েছে বেশী, আরও কারও ভাগে কম। এই সত্যটুকু আমাদের জানা থাকলেও এই অসমান বণ্টনের প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের জানা ছিল না। সেটা জানা সম্ভব হয়েছে একমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমে।

এখন জানা গেছে যে বুদ্ধির বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি অধিকাংশ লোকের প্রতি সুবিচারই করেছেন। শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝারি ধরনের বুদ্ধি এবং বুদ্ধ্যঙ্কের গণনায় বলা যায় যে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০র মধ্যে থাকবে। আবার ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন। এরা হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে। এদের এক কথায় বলা চলে ক্ষীণবুদ্ধি। এদের মধ্যে আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। সেই রকম ১১০ বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নতবুদ্ধি। এদেরও মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বুদ্ধির এই বণ্টনটিকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা পর পৃষ্ঠার ছবির মত ঘণ্টার আকৃতিসম্পন্ন একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির মাঝখানটা উঁচু এবং ফোলা। ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকেদের সংখ্যা

1. Distribution of Intelligence

অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির দু'প্রান্ত ক্রমশ নীচু ও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। বুদ্ধি ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে এমন আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির বণ্টনের রেখাচিত্রও
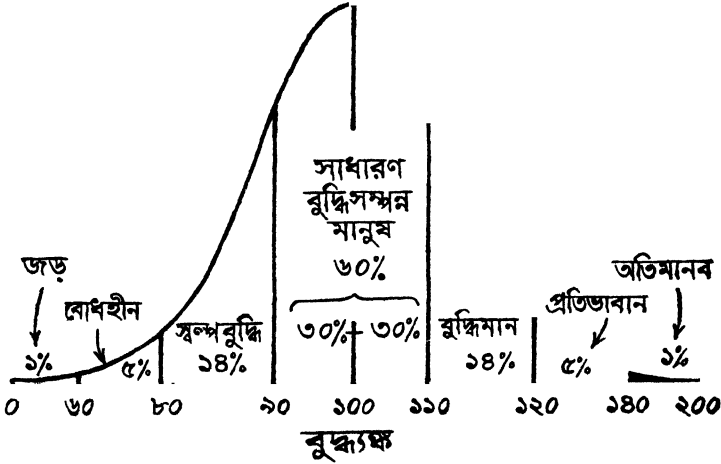
[জনসমাজে বুদ্ধির স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র]

উপরের ছবিটির আকার ধারণ করে বলে এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র[1] বলা হয়। দৈর্ঘ্য, জন্মহার প্রভৃতি অনেক মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বণ্টনও এই চিত্রের মত।

ক্ষীণবুদ্ধি

বুদ্ধির স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র অনুযায়ী প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনেরই বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে কম। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে তাদের ৯০'র কম বুদ্ধ্যঙ্ক। এদের বলা হয় ক্ষীণবুদ্ধি[2]। এদের মধ্যে আবার শতকরা ১৪ জন ক্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি এদের আছে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০'র মধ্যে। এদের আমরা স্বল্পবুদ্ধি[3] বলতে পারি। এরা কোন চিন্তামূলক কাজ করতে পারে না এবং লেখাপড়াতে বেশীদূর এগোনও এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। খুব ঘসামাজা করলে বড় জোর এরা স্কুল ফাইনালের বেড়াটা ডিঙোতে পারে। কিন্তু যত্ন নিয়ে শেখালে এরা হাতের কাজকর্ম ভালই শেখে। সহজ যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন করে।

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা, তাদের বলা হয় বোধহীন[4]। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০

1 Normal Distribution Curve 2. Feebleminded 3. Moron 4. Imbecile

থেকে ৮০'র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা। লেখাপড়া করা দূরে থাকুক ভাল করে নিজেদের মনের ভাবটিও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইটা পড়া, নামটা সই করা ইত্যাদি কাজগুলি এদের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। এরা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে পারে না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ কাজকর্ম এরাও শিখতে পারে। এদের সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ৫ জন।

সবচেয়ে শেষধাপে আছে জড়[1]। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০'র নীচে। এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথা বলতে পারে না, বললেও বোঝে না। এদের পক্ষে একা চলাফেরা বিপজ্জনক। নিজেদের ভাল-মন্দও এরা বুঝতে পারে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের খুব সহজ প্রকৃতির ছোটখাট কাজ করতে শেখানো যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন।

ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা[2]

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানবসমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বা সাধারণ পদ্ধতিতে এদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে পড়ানো সম্ভব হলেও তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্তমানে সব সভ্য দেশেই বোধহীন এবং জড় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের আয়োজন আছে। এই বিশেষ শিক্ষায়তনগুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উন্নতির দ্বারা এদের বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ইটরাড এবং সেঁগুই প্রথম ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য এই ধরনের বিশেষধর্মী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ে ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ চর্চা এবং অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তার ফলে তাদের সাধারণ কর্মদক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেত। ইটরাড ও সেঁগুইর প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণে আজকাল নানা দেশে ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য বিশেষধর্মী বিদ্যালয় গঠিত হয়েছে।

ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটি নিকট সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে যে অনেকেই নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন। পরিণত বয়স্ক অপরাধীদের পরীক্ষা করেও দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে নিম্নবুদ্ধির সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধি স্বল্প থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার ফলে তারা তাদের কাজের ভবিষ্যৎ

---

1. Idiot 2. ক্ষীণবুদ্ধি শিশু ও তাদের শিক্ষা অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

গুরুত্ব বুঝতে পারে না। সেইজন্য তারা সহজেই প্রলোভনে ভুলে যায় এবং যে সব কাজকে সাধারণ সমাজে অপরাধ বা অন্যায় বলে মনে করা হয় সে সব কাজ করতে তারা ইতস্তত করে না।

উন্নতবুদ্ধি[1]

নিম্নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ থেকে ১২০'র মধ্যে তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে। ক্লাসে বা বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমরা চালাক বা বুদ্ধিমান আখ্যা দিয়ে থাকি তারাই এই পর্যায়ে পড়ে।

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানদের দল। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৪০'র মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের স্পষ্টই সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে বেশ পৃথক বলে বোঝা যায়। ১৪০'র উপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচারকরণ, সমস্য-সমাধান প্রভৃতি উন্নত ধরনের কাজে এদের দক্ষতা অনন্যসাধারণ। বিভিন্ন যুগে মানবজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্মদাতা এরাই হয়ে থাকে।

উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্যলাভ করতে পারবে এমন কোন স্থিরতা নেই। পার্থিব কৃতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার তেমনই দরকার শিক্ষার এবং জ্ঞানের। কিন্তু দেখা গেছে নানা কারণে অনেক উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েই লেখাপড়ায় ভাল ফল করতে পারে না। প্রথমত, যে গতানুগতিক প্রথায় আমাদের স্কুল-কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় না। প্রচলিত ক্লাস-গুলিতে সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ীই পড়ানো হয় এবং তার ফলে উন্নতবুদ্ধিদের কাছে সে পড়ার কোনও আকর্ষণ থাকে না। ক্লাসে যা পড়ানো হচ্ছে তা হয় তাদের কাছে অনেক আগেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের অনেক নীচে। ফলে তারা ক্লাস পালায়, দুষ্কর্ম বা নাশকতামূলক কাজের দিকে ঝোঁকে এবং প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শেখে। এই জন্যই দেখা গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখায় তারা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই সাধারণ মানের সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে না।

উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা[2]

এই জন্য আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে উন্নতবুদ্ধিদের পড়ার ব্যবস্থা না করে

1. Gifted Children 2. 'উন্নতবুদ্ধি শিশু ও তাদের শিক্ষা' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

পৃথকভাবে তাদের পড়ানোর পদ্ধতি আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল স্কুলেই প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমান সংস্কৃতির সমৃদ্ধিসাধন এবং নবীন ভাবধারার সৃজনের মাধ্যমে সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে এই উন্নতবুদ্ধিরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক সমাজেরই প্রধান কর্তব্য। এমন কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে পাব্লিক স্কুলগুলি এই ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পাব্লিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। পাব্লিক স্কুলগুলির মাধ্যমে উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষার সমস্যাটির কিছুটা সমাধান করা গেলেও দুটি কারণে এগুলিকে সমর্থন করা যায় না। প্রথম, এগুলির পরিকল্পনা গণতন্ত্রের আদর্শবিরোধী, দ্বিতীয়ত, উন্নতবুদ্ধিদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে একেবারে পৃথক করে রেখে শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত উচ্চতার বোধ ও অসামাজিক মনোভাব তৈরী করা হয়। সেই জন্য এর চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছিত পন্থা হল একই স্কুলে সকলকে রেখে বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ করে সেইমত তাদের শিক্ষা দেওয়া। এই নীতির অনুসরণেই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা পন্থায়[1] শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে।

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা[2]

সাধারণভাবে যে কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বলা হয়। অনেকের ধারণা যে ছেলেবেলায় কেউ বোকা থাকলে পরে বুদ্ধিমান হতে পারে বা ছেলেবেলায় যাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে বড় হলে সে বোকা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অসংখ্য পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে এ ধারণা ভুল। বোকা ছেলে বড় হলে বোকাই থাকে। বুদ্ধিমান ছেলে বড় হলে বোকা হয়ে যায় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়লেও (বুদ্ধির এই বৃদ্ধি আনুমানিক ১৫ থেকে ১৮ বৎসরেই শেষ হয়ে যায়) তার বয়স এবং বুদ্ধির বিকাশের মধ্যে অনুপাত সব সময়েই একই থাকে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তার বুদ্ধ্যঙ্ক বদলায় না। একেই বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা বলা হয়।

আমরা আগেই দেখেছি যে বুদ্ধির বৃদ্ধি সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির মান নানা রকমের পাওয়া যাবে। কিন্তু মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়সের মধ্যে অনুপাত সব সময়ে একই থাকবে এবং তার বয়স এবং বুদ্ধি বাড়লেও তার বুদ্ধ্যঙ্ক বাড়বে না বা কমবে না। পরের পাতার ছবি থেকে এ ব্যাপারটির একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

যদিও মোটামুটিভাবে বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তবুও

1. Three-Stream System 2. Constancy of I. Q.

বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা গেছে। কতকগুলি গবেষণায় বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে বুদ্ধ্যঙ্ক বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের কিছুটা উন্নতিও দেখা গেছে। কিন্তু বুদ্ধ্যঙ্কের এই পরিবর্তন সব সময়ে
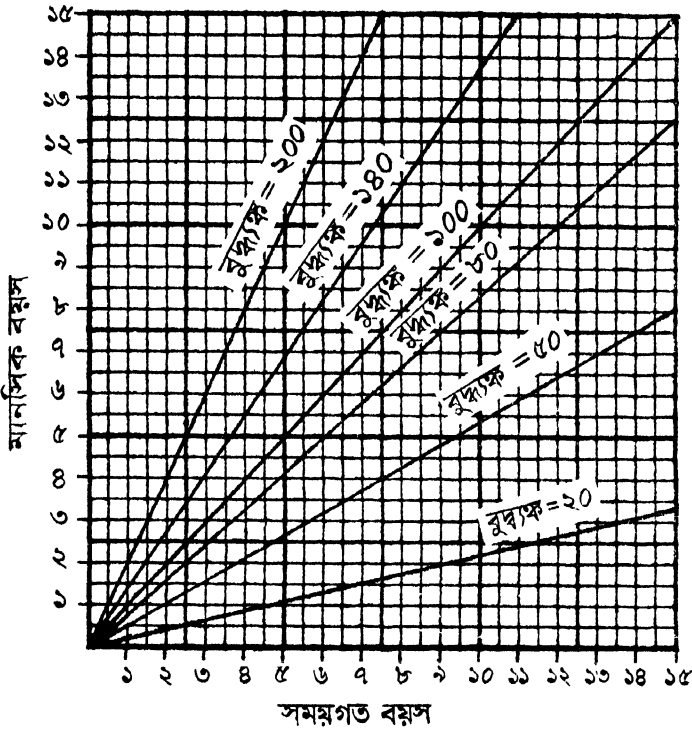
[বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তার চিত্ররূপ]

বা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে আধুনিক বহু মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিবর্তন আনা যায়। এই মতবাদটি এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় নি এবং সেজন্য সাধারণভাবে বুদ্ধ্যঙ্ককে আমরা অপরিবর্তনীয় বলেই ধরে নিতে পারি। যদি চার বছরের কোন ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায় ৬০ তবে নিশ্চিতভাবে এটুকু বলা চলে যে ১০ বা ১২ বৎসর বয়সেও তার বুদ্ধ্যঙ্ক ঠিক ৬০ যদি নাও থাকে, ৭০/৭৫'র মধ্যেই থাকবে, ১০০ বা তার বেশী হবে না।

অনুশীলনী

১। বিনে অভীক্ষার যে কোন একটি সংশোধন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর।

২। বুদ্ধির অভীক্ষা কাকে বলে? শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি?

৩। একটি বুদ্ধির অভীক্ষা বর্ণনা কর এবং কিভাবে বুদ্ধি পরিমাপ করা হয় তা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

৪। বিনে সাইমন স্কেল কাকে বলে? এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

৫। বুদ্ধির অভীক্ষা গঠনে যে সকল উপাদান বা পদ ব্যবহৃত হয় সেগুলির উদাহরণ দাও।

৬। অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা কাকে বলে? বুদ্ধির অভীক্ষার সঙ্গে এই অভীক্ষার পার্থক্য কি?

৭। ষ্ট্যানফোর্ড বিনে স্কেল কাকে বলে? এর বিভিন্ন সংশোধনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৮। বুদ্ধ্যঙ্ক কাকে বলে? ইহা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

৯। যে কোন চারটি বুদ্ধির অভীক্ষার নাম বল।

১০। সম্পাদনী অভীক্ষা কাকে বলে? এই অভীক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

১১। বুদ্ধির বিভিন্ন অভীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইহার উপযোগিতা বর্ণনা কর।

১২। বুদ্ধির বণ্টন বলতে কি বোঝ? কাকে ক্ষীণবুদ্ধি শিশু বলে। উন্নতবুদ্ধি শিশু কারা?

১৩। বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তার অর্থ কি?

১৪। উন্নতবুদ্ধি বলতে কাদের বোঝায়? এদের শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যায়?

১৫। ক্ষীণবুদ্ধি শিশু কাদের বলে? এদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়?

১৬। মানসিক বয়স কাকে বলে?

১৭। বিনে অভীক্ষায় বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক কিভাবে গণনা করা হয়?

১৮। দলগত বুদ্ধি অভীক্ষা কাকে বলা হয়? ব্যক্তিগত অভীক্ষার সঙ্গে এর উপযোগিতা তুলনা কর।

১৯। বুদ্ধির অভীক্ষার কি ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়?

আট

স্মৃতি ও বিস্মৃতি[1]

'মনে করতে' পারাটা প্রাণীমাত্রেরই সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রাণীই পূর্বে শেখা বিষয়বস্তু অল্পবিস্তর মনে করতে পারে। আমাদের এই শক্তিটিই সাধারণ ভাষায় স্মৃতি বা স্মরণ নামে পরিচিত।

স্মৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

স্মৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় তা নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বহু জল্পনা-কল্পনা চলে এসেছে এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী স্মৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। কারও মতে স্মৃতি একটি মানসিক শক্তি, কারও মতে স্মৃতি একটি মনের কাজ, আবার কেউ কেউ স্মৃতিকে কল্পনা করেছেন এমন একটি ভাণ্ডার বা আধাররূপে যেখানে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপ বা প্রতীকগুলি জমিয়ে রাখি। এই ধারণাগুলির মধ্যে স্মৃতির শক্তিতত্ত্বটিই প্রাচীনকালে সব চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেন যে মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি। যেমন চিন্তা করা, কল্পনা করা, বিচার করা, মনোযোগ দেওয়া প্রভৃতি হল মনের এক একটি বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শক্তি। এগুলি নিয়মিত চর্চা বা অনুশীলনের ফলে অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং চর্চা বা অনুশীলনের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁদের মতে স্মৃতিও এই ধরনের একটি মানসিক শক্তি। এই মনোবিজ্ঞানীদের শক্তিবাদী[2] নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক গবেষণার ফলে মনের এই শক্তিবাদ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য আধুনিক উপাদান বিশ্লেষকগণও[3] অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের কতকগুলি শক্তির কল্পনা করেছেন। থার্স্টোনের মতে মনের সাতটি মৌলিক শক্তি আছে এবং স্মৃতি সেই সাতটি শক্তির অন্যতম। কিন্তু আধুনিক কালের এই মানসিক শক্তির পরিকল্পনা প্রাচীন শক্তির পরিকল্পনা থেকে অনেক পৃথক। সুনির্দিষ্ট মানসিক শক্তি বলতে যা বোঝায় অধুনা কল্পিত মানসিক সত্তাগুলি ঠিক সে রকম নয়। প্রথমত, এগুলিকে এক ধরনের মানসিক উপাদান[4] বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে কাজ করে এবং ঐ মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, এগুলির অস্তিত্ব নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সহপরিবর্তন[5] নির্ণয়ের জটিল ও উন্নত গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে।

---

1. Memory and Forgetting 2. Faculty Psychologists 3. Factor Analysts 4. Factor 5. Correlation.

স্মৃতির আধুনিক সংব্যাখ্যান

প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে স্মৃতি একটি মানসিক প্রক্রিয়া নয়, তিনটি স্বতন্ত্র মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। যথা, শিখন[1], সংরক্ষণ[2] এবং স্মরণ[3]।

স্মৃতির প্রথম ধাপে আসে শিখন। যা শেখা হয়নি তা মনে রাখার কথা ওঠে না। অতএব শিখন হল স্মৃতির অপরিহার্য প্রাথমিক সোপান।

স্মৃতির দ্বিতীয় ধাপে আসে শেখা বস্তুটির সংরক্ষণ করা বা মনে রাখা। আমরা যেটি শিখলাম সেটিকে আমরা এই ধাপে মনের মধ্যে ধরে রাখি। এই প্রক্রিয়াটি স্মৃতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। শেখা বস্তুটিকে কি ভাবে মনের মধ্যে ধরে রাখা হয় তার নির্ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। তবে শেখা বস্তুটির একটি বিশেষ প্রতীক[4] যে আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোনভাবে আমরা সংরক্ষিত করে রাখি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতির অংশগুলি পৃথকভাবে মস্তিষ্কের কোন কুঠুরিতে জমা থাকে এবং দরকার পড়লে সেগুলিকে তাদের সেই গুপ্ত আশ্রয় থেকে টেনে বার করে আনা হয়। তাছাড়া স্মৃতির এই বিভিন্ন অংশগুলি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই চিরকাল নিজেদের নির্দিষ্ট সত্তা বজায় রেখে আসে, যদিও সময়ের অতিক্রান্তিতে তারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতির এই ব্যাখ্যা একান্ত ভুল।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মুলার[5] স্মৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর বহু প্রচলিত স্মৃতিছাপের[6] তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই তত্ত্ব অনুযায়ী মস্তিষ্কের কোষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলি কতকগুলি ছাপরূপে সংরক্ষিত হয়। এই ছাপগুলিকে অনেকটা ক্যামেরার প্লেটে বা ফিল্মে সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটি ফটো প্লেট বা ফিল্ম যেমন একটা ত্রি-আয়তন বস্তুর দ্বি-আয়তন ছবি ধরে রাখতে পারে তেমনই আমাদের মস্তিষ্কও সব রকম বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই ছাপরূপে ধরে রাখতে পারে। যখন কোন বস্তু মনে করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা সেই বস্তুটির ছাপগুলিকে জাগিয়ে তুলি এবং সেগুলির সাহায্যেই ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাটিকে পুনরায় সৃষ্টি করি।

কিন্তু নানা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে মুলারের এই স্মৃতিছাপের তত্ত্বটিও ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা কোন বিশেষ নির্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন পৃথক বস্তু নয়। অর্থাৎ প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের কল্পিত স্মৃতির অংশ বা মুলারের পরিকল্পিত স্মৃতিছাপ বলে সুনির্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন কোন বস্তু মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় না। সত্যকার মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা হল

---

1. Learning 2. Retaining 3. Remembering 4. Symbol 5. Muller 6. Memory Trace

মস্তিষ্কের একটি বিশেষ সংগঠন[1]। অর্থাৎ যখনই কোন বিষয়বস্তু আমরা শিখি, সেটি কারও টেলিফোন নাম্বারই হোক্ আর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বই হোক, তখনই আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একটি বিশেষ গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটে। এখন ঐ বিশেষ শেখা বস্তুটি মনে রাখার অর্থ মস্তিষ্কের ঐ পরিবর্তিত সংগঠনটিকে সংরক্ষিত করা। হোয়াগল্যাণ্ড[2] মস্তিষ্কের এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে তারযন্ত্রের বার্তাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি তারে যখন কোন সংবাদ সংরক্ষিত হয় তখন ঐ তারের পরমাণু-গুলির মধ্যে বিশেষ একটি সংগঠনমূলক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ফলে তারের সেই পারমাণবিক পরিবর্তনের রূপে সংবাদটিকে ধরে রাখা হয় এবং দরকার পড়লে সেটিকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। স্মৃতির ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কের এইরকম সংগঠন-ঘটিত পরিবর্তনের রূপে আমরা শেখা বস্তুটিকে সংরক্ষিত করে থাকি। হোয়াগ-ল্যাণ্ডের এই ব্যাখ্যাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটিকে মস্তিষ্কের সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার আধুনিক মতবাদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় বা শেষ ধাপে ঘটে এই মস্তিষ্কে সংরক্ষিত বস্তুটি স্মরণ করার কাজটি। অর্থাৎ যেটি আমরা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করেছি সেটিকে দরকার মত আমরা বাইরে প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করি। হোয়াগল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হয় যে যখন আমরা কিছু স্মরণ করি তখন আমাদের মস্তিষ্কের সংগঠনের মধ্যে আবার একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যাকে আমরা সচরাচর স্মৃতি বলে থাকি সেটির অন্তর্গত প্রক্রিয়াগুলির অনুক্রম হল নিম্নরূপ—

শিখন → → সংরক্ষণ → → স্মরণ

স্মরণ প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করতে আমরা আবার দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর স্মরণের সন্ধান পাই। প্রথম, মনে করা[3] এবং দ্বিতীয়, চেনা[4]।

মনে করা ও চেনা

যখন পূর্বে জানা কোন নাম, সাল বা ঘটনা মনে জাগানোর চেষ্টা করি তখন আমরা আমাদের স্মরণ প্রক্রিয়াটিকে 'মনে করা' নাম দিই। এখানে আমাদের মনে করার কাজটিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের সামনে একটি উদ্দীপক থাকে। কিন্তু সেই উদ্দীপকটির সঙ্গে প্রকৃত বস্তুটির একটা যোগাযোগ বা সম্বন্ধ থাকলেও আমাদের প্রকৃত স্মরণের বস্তু থেকে সেটি পৃথক হয়ে থাকে। কিন্তু 'চেনা'র ক্ষেত্রে প্রকৃত মনে করার বস্তুটিকেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেটি ঠিক সেই বস্তুটি কিনা তাই মনে করতে বা চিনতে বলা হয়।

মনে করার দৃষ্টান্ত : ইংরাজী বর্ণমালার L'র পর কোন্ বর্ণটি আসে ?
চেনার দৃষ্টান্ত : P, O, S, B, M, A—এর মধ্যে কোন্‌টিকে 'এম্' বলা হয় ?

---

1. Brain Structure 2. Hoagland, 3. Recalling 4. Recognising

আমাদের সব স্মরণ প্রক্রিয়াই হয় 'মনে করা', নয় 'চেনা'—এ দুয়ের এক শ্রেণীর হয়ে থাকে।

মনে করা

অতএব মনে করা বলতে বোঝাচ্ছে সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা পূর্বে শেখা যে কোন বস্তু মনে জাগিয়ে তোলা হয়। এই ধরনের মনে করা বস্তু নানা শ্রেণীর হতে পারে, যেমন,

১। কোনও তালিকা, পদ, তথ্য বা উপাদান যা আমরা পূর্বে শিখেছিলাম এখন সেগুলিকে ইচ্ছা করে মনে করছি।

২। কোন পূর্বে শেখা কাজ সম্পন্ন করা। এও এক ধরনের মনে করা।

৩। ইন্দ্রিয়জাত প্রতিরূপগুলিকে মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা।

৪। ইচ্ছা না থাকলেও যে সব কথা বা ধারণা মনে এসে যায়।

৫। কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যখন স্বেচ্ছায় কোন একটি বিশেষ বিষয় মনে করা হয়। যেমন, একটি বাক্য পড়তে গিয়ে তার অর্থটি মনে করার চেষ্টা করা।

৬। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তা করা বা যাকে আমরা বিচারকরণ বলি।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ মনে করা

'মনে করা'কে আবার দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রত্যক্ষ[1] ও অপ্রত্যক্ষ[2]। যখন একটি বস্তু থেকে আমাদের স্মরণ সরাসরি ঈপ্সিত বস্তুটিতে যায় তখন সেই মনে করাকে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যখন মনে করা কাজটি অন্য এক বা একাধিক মধ্যবর্তী বস্তুর মধ্যে দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুতে পৌঁছয় তখন তাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা যায়। যেমন, একজনকে শেখান হল, নীচের শব্দযুগ্মগুলির মধ্যে প্রথমটি শুনলেই দ্বিতীয়টি বলবে। অর্থাৎ তার স্মৃতিতে প্রতি শব্দযুগ্মের মধ্যে একটি করে অনুষঙ্গ[3] স্থাপন করে দেওয়া হল। যেমন—

পৃথিবী—মৃত্যু খাদ্য—সুখ মহাকাব্য—বীর ইত্যাদি।

এখন একদিন বা এক সপ্তাহ পরে শব্দযুগ্মগুলির প্রথমটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করে তাকে দ্বিতীয়টি বলতে বলা হয়। যদি দেখা যায় যে ব্যক্তি সরাসরি কোন বস্তুর কথা না ভেবে প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে পারে তা হলে তার 'মনে করা'কে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যদি প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে মধ্যবর্তী এক বা একাধিক শব্দ বা ধারণার কথা ভেবে তাকে যেতে হয় তাহলে তার মনে করাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা হবে। এই মধ্যবর্তী স্মৃতিগুলি কিন্তু ঈপ্সিত শব্দ না হলেও ঈপ্সিত শব্দে পৌঁছবার পক্ষে সহায়ক। যেমন কারও

1. Direct Recall 2. Indirect Recall 3. Association

'পৃথিবী' শব্দটি শুনে মনে হল 'জন্ম,' বা 'খাদ্য' শব্দটি শুনে মনে হল 'তৃপ্তি', বা 'মহাকাব্য' শব্দটি শুনে মনে হল 'যুদ্ধ'। পরে এই মধ্যবর্তী শব্দ বা ধারণাগুলিই অভীক্ষার্থীকে প্রকৃত শব্দগুলিতে পেঁছিতে সাহায্য করল। অর্থাৎ সে 'জন্ম' থেকে 'মৃত্যু'তে, 'তৃপ্তি' থেকে 'সুখে', যুদ্ধ থেকে 'বীরে' গেল।

মনে করার গতি

মিচোটে[1] এবং পর্টিক[2] শেখা বস্তু মনে করতে কত সময় লাগে তার পরীক্ষণ করেছিলেন। তাঁদের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়—

শেখার ঠিক পরেই	তবে ১'৫ সেঃ পরে	নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায়।
শেখার একদিন পরে	তবে ২'৪ সেঃ পরে	নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায়।
শেখার এক সপ্তাহ পরে	তবে ৩'০ সেঃ পরে	নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায়।

আংশিক ও অসম্পূর্ণ স্মরণ

অনেক সময় দেখা যায় যে কোন বিশেষ নাম বা তারিখ বা নম্বর মনে আসি আসি করেও আসছে না। তখন বুঝতে হবে যে বস্তুটি সম্পূর্ণ মনে পড়ে নি বা আংশিক মনে পড়েছে। সে সময় কোন রকমের একটা ধাক্কা বা ঝাঁকুনি পেলেই হঠাৎ সেটা সম্পূর্ণ মনে পড়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে যে বস্তুটির সঙ্গে আংশিক বা অস্পষ্ট মিলসম্পন্ন কিছু দেখলে বা শুনলেও ব্যক্তির পূর্ণ স্মরণ এসে যায়।

প্রতিরূপ ও স্মরণ

স্মরণের একটি বড় উপাদান হল প্রতিরূপ।[3] প্রতিরূপ হল প্রত্যক্ষিত বস্তুর অস্পষ্ট ছবিমাত্র। শব্দতালিকা বা লিখিত পদ্যাংশ, গদ্যাংশ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষণ চালান সম্ভবপর। কিন্তু প্রতিরূপের সদাপরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্য প্রতিরূপ নিয়ে পরীক্ষণ চালান বেশ দুরূহ। তবু প্রতিরূপ নিয়ে স্মরণের উপর বহু পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

চেনা[4]

'মনে করা'র বিষয়বস্তু যত ব্যাপক, 'চেনা'র বিষয়বস্তু তত ব্যাপক হতে পারে না। চেনা কথাটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ক্ষেত্রে। চেনা প্রক্রিয়াটি মনে করা প্রক্রিয়ার চেয়ে ইন্দ্রিয়ের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল। কেননা চেনা কাজটি সম্পন্ন করতে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগেই। কোন কিছু দেখে, শুনে, বা স্পর্শ করে, বা গন্ধ শুঁকে বা আস্বাদ নিয়েই আমরা বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা চিনি কি না।

1. Michotte 2. Portych 3. Image 4. Recognition

মনে করা এবং চেনার মধ্যে সংগঠনমূলক পার্থক্য হচ্ছে যে মনে করার ক্ষেত্রে ঈপ্সিত বস্তুটি দেওয়া থাকে না খুঁজে নিতে হয়। চেনার ক্ষেত্রে বস্তুটি দেওয়া থাকে। সেটি সেই বস্তু কিনা তাই বলতে হয়। মনে করার ক্ষেত্রে 'ক'কে উপস্থাপিত করে 'খ'কে মনে করতে বলা হয়, যেমন বাবরের নাম করে প্রশ্ন করা হল তার ছেলে কে বল? কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে 'ক'টি দেওয়াই থাকে এবং ঐটিকেই চিনতে বলা হয়। যেমন, আরও দশটা ছবির মধ্যে বাবরের ছবি রেখে বলা হয়, বলত এর মধ্যে বাবর কে? স্পষ্টই 'চেনা' কাজটি 'মনে করার' চেয়ে অনেক সহজ। ২৫টি অর্থহীন শব্দতালিকা একবার ৯৬ জন অভীক্ষাথীকে পরিবেশন করে মনে করা ও চেনা—এই দু'টি পদ্ধতিতে তাদের স্মৃতির পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল যে মনে করা প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ভুল মনে করতে পারল ১২ জন, চেনা প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ভুল মনে করল ৪২ জন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চেনা প্রক্রিয়াটি মনে করা প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিকতর সহজসাধ্য।

চেনা কাজটিতে ভুল হতে পারে যদি উপস্থাপিত উদ্দীপকটির সঙ্গে প্রকৃত উদ্দীপকটির আংশিক মিল থাকে। এই আংশিক মিলের মাত্রা যত বেশী হবে ততই ভুল চেনার হার বাড়বে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রশ্ন করা যায়, যে নীচে সালগুলির মধ্যে কোন্‌টি গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযানের সাল?

১৯০৩ ১৯৩০ ১৯১৩ ১৯৩৯

এখানে প্রকৃত উত্তর হল ১৯০৩। কিন্তু প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে নিছক আকৃতিগত মিল থাকায় অনেকেই ১৯০৩, ১৯১৩ বা ১৯৩৯ও উত্তর রূপে বলতে পারে। অবশ্য যদি পূর্বশিখন অতি দৃঢ় হয় তাহলে এই মিল থাকা সত্ত্বেও চেনা ভুল না হতে পারে।

স্মৃতি ও শিখন

শিখনের সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্মৃতি ছাড়া কোন শেখাই স্থায়ী হয় না। যে ছেলে হামাগুড়ি দিতে শিখল বা যে ছাত্র লিখতে শিখল বা যে কুকুর মুখে করে লাঠিটা আনতে শিখল, সে যদি সেই শেখাটা মনে রাখতে না পারে তা হলে পরের দিন আবার প্রথম থেকে তাকে শেখা সুরু করতে হবে। ফলে কোন দিনই তার শেখা এগোবে না। অতএব স্মৃতিকে শেখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করা যায়। শিক্ষার অগ্রগতির প্রথম সোপানই হলো স্মৃতি।

শেখার বিষয়বস্তুকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—সঞ্চালনমূলক[1] এবং

1. Motor

ভাষামূলক[1]। ভাষামূলক বস্তুর মত সঞ্চালনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকেও আমরা মনে রেখে থাকি, যেমন রান্না করা, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এ সব কাজও আমরা স্মৃতি থেকে সম্পন্ন করে থাকি। বার বার সম্পন্ন করতে করতে অনেক সঞ্চালনমূলক কাজই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজই সঞ্চালনমূলক এবং ভাষামূলক এই দু'শ্রেণীর কাজের মিশ্রণ।

স্মৃতি এক না বহু ?

এটি সুপ্রমাণিত সত্য যে স্মৃতি একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রভাব অনুযায়ী মস্তিষ্কের বিশেষ সংগঠন সৃষ্টির প্রক্রিয়া মাত্র। অতএব এই প্রক্রিয়াটি সর্বক্ষেত্রে যে একইভাবে কাজ করবে তার কোনও অর্থ নেই। কোনও বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কখনও ভাল হয়, আবার কখনও কখনও আশানুরূপ হয় না। যেমন কারও পক্ষে ইতিহাস মনে রাখা সহজ হয়, কিন্তু অঙ্ক মনে রাখা শক্ত হয়। প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কাহিনী, আলোচনা প্রভৃতি অর্থসম্পন্ন বিষয়গুলি মনে রাখতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ইতিহাসের সাল, বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি অর্থহীন বিষয়গুলি মনে রাখা শক্ত হয়। আবার চোখে দেখা জিনিস অনেক বেশী মনে থাকে, কানে শোনা বা বইতে পড়া জিনিসের চেয়ে। এই সব কারণে বলা হয় যে স্মৃতি একটি নয়, স্মৃতি বহু। স্মৃতিগত বৈষম্যের কারণ কিন্তু এ নয় যে মস্তিষ্কে এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি ক্ষেত্রভেদে কম হয় বা বেশী হয়। আসলে এই বৈষম্য নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও শিখন পদ্ধতির উপর। কতকগুলি বিষয় সহজেই মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও মস্তিষ্কের সংগঠনে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারে, আবার কতকগুলি বিষয় তা পারে না। তেমনই শিখনের পদ্ধতি অনুকূল হলে সংরক্ষণ ভাল হয়, আবার কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ দুর্বল হয়।

বার্গসঁর শ্রেণীবিভাগ :: অভ্যাস স্মৃতি ও প্রতিরূপ স্মৃতি

স্মৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নানা চিন্তাবিদ্ স্মৃতির নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসঁর[2] মতে স্মৃতি দু'প্রকারের, অভ্যাস স্মৃতি[3] ও প্রতিরূপ স্মৃতি[4]।

কোন শিক্ষণীয় বস্তুর বার বার চর্চা বা অনুশীলনের ফলে যখন সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেই বস্তুটি মনে করাকে অভ্যাস স্মৃতি বলা চলে। এই ধরনের স্মৃতির মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে না এবং এটি পরিপূর্ণ যান্ত্রিক প্রকৃতির। কোন ছেলে যখন নামতা মুখস্থ বলে বা ভাল করে শিখে কোন কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে তা সম্পূর্ণ অভ্যাস থেকেই করে থাকে। তার শেখা বিষয়-

1. Verbal 2. Bergson 3. Habit Memory 4. Image Memory

বস্তুটির অংশগুলি তার মনে একটি শিকলের মত পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং প্রথমটি মনে পড়লেই একটির পর একটি বাকি অংশগুলি নিজে নিজে মনে এসে যায়। এই ধরনের মনে করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কোনরূপ প্রচেষ্টা করতে হয় না। এই স্মৃতিকে যান্ত্রিক স্মৃতিও বলা হয়।

বার্গস'র মতে অভ্যাস স্মৃতির ঠিক বিপরীত হল প্রতিরূপ স্মৃতি। এই ধরনের স্মৃতির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটি টুকরো টুকরো ভাবে ব্যক্তির মনে আসে না। তার সম্পূর্ণ প্রতিরূপটি এক সঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে। এই শ্রেণীর স্মৃতির ক্ষেত্রে অতীতের কোন ঘটনা মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলার কাজটি প্রকৃতই সংঘটিত হয় এবং এই কাজে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টাও থাকে। এইজন্য এই স্মৃতিকে বার্গস প্রকৃত স্মৃতি[1] নাম দিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র প্রতিরূপমূলক স্মৃতিকেই প্রকৃত স্মৃতি আখ্যা দেওয়া চলে না। কেননা স্মৃতির উপাদান প্রতিরূপ ছাড়াও অন্য অনেক কিছু হতে পারে। যেমন, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা প্রভৃতি বস্তুগুলি বহুক্ষেত্রে স্মৃতির উপাদান রূপে কাজ করে থাকে।

স্মৃতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতির অনেকগুলি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন, যথা—

যান্ত্রিক স্মৃতি

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ বা তার বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি না করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে যান্ত্রিক স্মৃতি[2] বলে। যেমন, নামতা, অর্থহীন শব্দ-তালিকা, গাড়ীর বা টেলিফোনের নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা হল যান্ত্রিক স্মৃতির উদাহরণ।

বিচারমূলক স্মৃতি

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ উপলব্ধি করে বিচারশক্তির সাহায্যে তার অন্তর্নিহিত সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে বিচারমূলক স্মৃতি[3] বলে। যেমন, একটি গদ্যাংশ বা কবিতা পড়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সেটিকে মনে রাখা হল বিচারমূলক স্মৃতির উদাহরণ। যান্ত্রিক স্মৃতির চেয়ে বিচারমূলক স্মৃতি অনেক বেশী সহজসাধ্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি

যখন আমরা একটি বস্তুর সঙ্গে অপর একটি বস্তুকে এমনভাবে মনের মধ্যে সংবদ্ধ করি যাতে একটির কথা বা ছবি মনে হলে অপরটির কথা বা ছবি সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে তখন সেই স্মৃতিকে অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি[4] বলা হয়। সাধারণত কারও নাম, বাড়ীর নম্বর, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা হয় এই ধরনের স্মৃতির

---

1. True Memory 2. Rote Memory 3. Logical Memory 4. Associative Memory

সাহায্যে। যান্ত্রিক স্মৃতি ও অনুষঙ্গমূলক স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয় এবং অনেক যান্ত্রিক স্মৃতিই অনুষঙ্গমূলক। বস্তুত অনুষঙ্গের সাহায্যেই যান্ত্রিক স্মৃতি সৃষ্টি করা এবং সেটিকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন স্থায়ী করা সম্ভব হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া যান্ত্রিক স্মৃতি কষ্টসাধ্য হয় এবং বেশী দিন স্থায়ী হয় না। যান্ত্রিক স্মৃতিকে স্থায়ী করতে হলে অতিরিক্ত মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হয় অর্থাৎ যাতে বিষয়টির অতিশিখন হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। গাড়ীর নম্বর, বাড়ীর নম্বর বা ইতিহাসের সাল ইত্যাদি মুখস্থ করতে গেলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতি

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতির[1] সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য যে আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে স্মৃতিও তত রকমের হতে পারে। যখন চোখে দেখা কোন বস্তুর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আমরা মনে রাখি তখন তাকে চাক্ষুষ স্মৃতি বলা যায়। এই রকম শ্রুতিজ স্মৃতি, স্পর্শজ স্মৃতি, ঘ্রাণজ স্মৃতি, স্বাদজ স্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন একটি সুর বা শব্দ, কোন বিশেষ স্পর্শ, কোন বিশেষ গন্ধ, কোন বিশেষ আস্বাদ ইত্যাদি আমরা খুবই মনে রাখতে পারি। তবে এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতিগুলির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করে থাকি চাক্ষুষ স্মৃতির। তার কারণ হল যে আমাদের আহরিত জ্ঞানের বড় একটা অংশ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই অর্জিত।

প্রতিরূপ

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করি সেগুলিকে যখন আমরা মনের রাখার চেষ্টা করি তখন প্রকৃতপক্ষে তার একটি প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করি। এই প্রতীক নানা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত প্রতীকটির নাম হল প্রতিরূপ[2]। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কিছু পূর্বে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, আঘ্রাণ নেওয়া বা আস্বাদ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা মনে করার চেষ্টা করলে তার একটি অস্পষ্ট ছবি আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। একেই প্রতিরূপ বলে। প্রতিরূপ হল ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার একটি মানসিক ছবি। বলা বাহুল্য আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে প্রতিরূপও তত প্রকারের হতে পারে।

তবে প্রতিরূপই একমাত্র স্মৃতির উপাদান নয়। আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষণ[3] করি, সেগুলির স্মৃতি প্রতিরূপ ছাড়াও অন্যান্য প্রতীকের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হতে পারে। ভাষা, ধারণা[4] সংখ্যা ইত্যাদিও আমাদের স্মৃতির উপাদান

---

1. Sensory Memory 2. Image 3. Perception 4. Concept

হতে পারে। তাছাড়া কোন কাজ করার প্রক্রিয়া, দেহের বিশেষ অঙ্গের সক্রিয়তা যেমন ঝাঁকানি বা পিছলে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি সঞ্চালনমূলক প্রক্রিয়াগুলিও আমরা প্রতিরূপের আকারে মনে রাখতে পারি।

স্মৃতি, কল্পন ও চিন্তন

মনে করা ও কল্পনা করা উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত শেখা বিভিন্ন বস্তুর প্রতীকগুলিকে জাগিয়ে তুলি। তবে পার্থক্য হল, মনে করার বেলায় আমরা যেমনটি শিখেছিলাম প্রতীকগুলিকে হুবহু সেইভাবে মস্তিষ্কে জাগিয়ে তুলি এবং প্রতীকগুলির বিন্যাস ও অনুক্রমে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু কল্পনা করার বেলায় আমরা ঐ প্রতীকগুলিকে খুসীমত সাজিয়ে নতুন একটি অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি। ফলে স্মৃতির ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুলির সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতার কোনও পার্থক্য থাকে না। সেগুলির বিন্যাসের ধারা এবং অনুক্রম সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেমন ছিল স্মৃতিতেও তাই থাকে। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে প্রতীকগুলির সাহায্যে তৈরী করা অভিজ্ঞতা এবং আমাদের অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মিল থাকে না। যেমন, ঘোড়া, পাখীর ডানা, প্যারিস, আইফেল টাওয়ার প্রভৃতির ছবিগুলি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে আনার নাম হল স্মরণ করা। আর এগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে যদি মনে করা যায় যে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আমি উড়ে যাচ্ছি তবে সেটি হল কল্পনা করা। এই জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী স্মৃতিকে পুনরাবৃত্তিমূলক কল্পনা[1] এবং প্রকৃত কল্পনাকে সৃজনমূলক কল্পনা[2] বলে বর্ণনা করেন। এক কথায় স্মৃতি হল পূর্ণভাবে বাস্তব-নির্ভর, আর কল্পনা হল বাস্তব-বিলাসী।

প্রকৃতপক্ষে কল্পন হল চিন্তন-প্রক্রিয়ার[3] একটি বিশেষ শ্রেণী মাত্র। চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ এগুলির প্রত্যেকটিই এক প্রকার মানসিক আচরণ এবং প্রত্যেকটিই স্মৃতির উপর নির্ভরশীল। স্মৃতিও এক প্রকার মানসিক আচরণ, তবে এই আচরণে কোন নূতনত্ব নেই এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য যখন তার মধ্যে নূতনত্ব আনা হয় তখনই সেটা চিন্তন বা কল্পনার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। যা শিখেছি তা যদি হুবহু মনে করি সেটা হল স্মৃতি, আর যখন প্রতীকগুলির সাহায্যে নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি তখন সেটা হল চিন্তন বা কল্পন।

বিস্মরণ

আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে ঠিক সেই সম্বন্ধ।

---

1. Reproductive Imagination 2. Productive Imagination 3. Thinking

অর্জিত অভিজ্ঞতার মস্তিষ্কে সংরক্ষণের নাম স্মৃতি এবং সেই সংরক্ষণের অভাব হল বিস্মরণ বা বিস্মৃতি। কোন কিছু একবার শেখার পর যদি দেখা যায় যে সেটি মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় নি তখন তাকে বিস্মরণ বা বিস্মৃতি[1] বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্মৃতি ও বিস্মৃতি মূলত একটি প্রক্রিয়া। দুটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখার জন্য একই প্রক্রিয়ার দুটি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র। স্মৃতি ও বিস্মৃতির সম্পর্কটি নীচের ছবি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে যদি কেউ দু'দিনে ৩০% মনে রাখে, তবে দু'দিনে সে ৭০% ভোলে, তেমনই যদি ৬ দিনে ২৪% মনে রাখে তবে সে ঐ ৬ দিনে ৭৬% ভোলে, যদি ১ মাসে ২১% মনে রাখে তবে ১ মাসে সে ৭৯% ভোলে ইত্যাদি।

ভুলে যাওয়া মনে রাখার মতই মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ধর্ম। ভুলে যাওয়ার উপযোগিতাও প্রচুর। একটি বস্তু বা তথ্য শিখতে গিয়ে যে ভুলগুলি শিক্ষার্থী
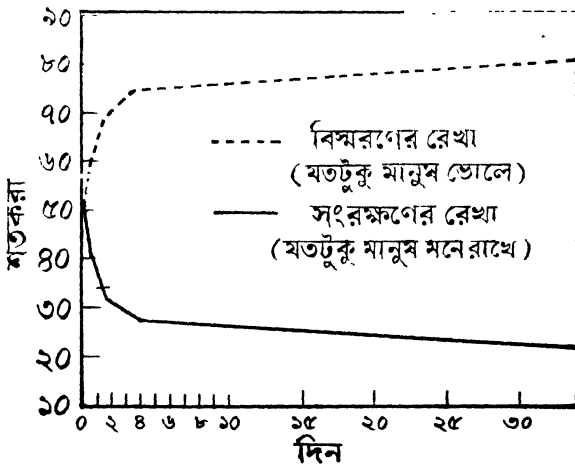
[স্মরণ ও বিস্মরণের রেখা চিত্র]

অসতর্কতাবশত একবার শিখে ফেলে সেগুলি পরে ভুলে না গেলে শুদ্ধ বস্তুটি বা তথ্যটি কখনই সে শিখতে পারে না। স্বভাবতই শুদ্ধ বস্তুগুলি মনে রাখতে হলে অশুদ্ধ বস্তুগুলি প্রথমে তাকে ভুলতেই হবে। অতএব প্রয়োজনীয় বস্তু মনে রাখতে হলে অপ্রয়োজনীয়কে ভুলতে হবে, নির্ভুলকে মনে রাখতে হলে ভুলকে ভুলতে হবে। অতএব ভোলা কেবল মনের স্বাভাবিক ধর্মই নয়, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যও বটে।

1. Forgetting

স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ

স্মৃতি ও বিস্মৃতি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞানী প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন তাঁর নাম এবিংহস[1]। ইনিই প্রথম স্মৃতিকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগারে নিয়ে আসেন। এঁর পরিচালিত পরীক্ষণগুলি থেকে মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত পরীক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

সংরক্ষণ ও বিস্মরণের হার

মানুষ কি হারে ভোলে এবং কতটুকু মনে রাখে, এই বিষয়টি নিয়ে এবিংহস প্রথম পরীক্ষণ করেন এবং মানুষের বিস্মৃতির হার সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরী করেন। যদি একটি অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করার পর কিছু সময়ের ব্যবধানে সেটিকে আমরা মনে করার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে আমরা সম্পূর্ণ তালিকাটি মনে করতে পারছি না, কিছুটা ভুলে গেছি। কত সময় পরে কতটা আমাদের মনে থাকে, আর কতটা আমরা ভুলে যাই তার একটি তালিকা এবিংহস দিয়েছেন। তালিকাটি এইরূপ—

শেখা ও মনে করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান	শতকরা কতটা মনে থাকে	শতকরা কতটা ভুলে যাই
২০ মিনিট	৫৮	৪২
১ ঘণ্টা	৪৪	৫৬
৯ ঘণ্টা	৩৬	৬৪
২৪ ঘণ্টা	৩৪	৬৬
২ দিন	২৬	৭৪
৬ দিন	২৫	৭৫
৩১ দিন	২১	৭৯

এবিংহসের এই তালিকাটিকে পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

এবিংহসের এই গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে কোন কিছু শেখার পর প্রথমেই আমাদের একটি বড় রকমের বিস্মৃতি ঘটে। একে প্রাথমিক বিস্মরণ বলা হয়। উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে বিষয়টি শেখার ২০ মিনিট পরেই ৪২% প্রাথমিক বিস্মরণ ঘটেছে। তারপর ২০ মিনিট থেকে ২ দিন পর্যন্ত বিস্মরণ ঘটে বেশ দ্রুত, আরও ৩০%। কিন্তু ২ দিনের পর থেকে বিস্মরণের গতি মন্থর হতে থাকে এবং ১৫ দিন বা একমাসের পর তেমন উল্লেখযোগ্য বিস্মরণ আর ঘটে না। এই দীর্ঘ

1. Ebbinghaus

সময়ে আরও ৫% বিস্মরণ ঘটে। কিন্তু তারপর আর বিস্মরণ ঘটে না বললেই চলে। এ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। সেটি হচ্ছে যে আমরা কখনও কোন কিছু সম্পূর্ণ ভুলে যাই না। সমস্ত শেখা বস্তুর কিছু না কিছু আমাদের মস্তিষ্কে চিরকাল সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এই জন্য এবিংহসের প্রদত্ত নীচের চিত্রটিকে সংরক্ষণের রেখাচিত্র[1] বলা হয়।
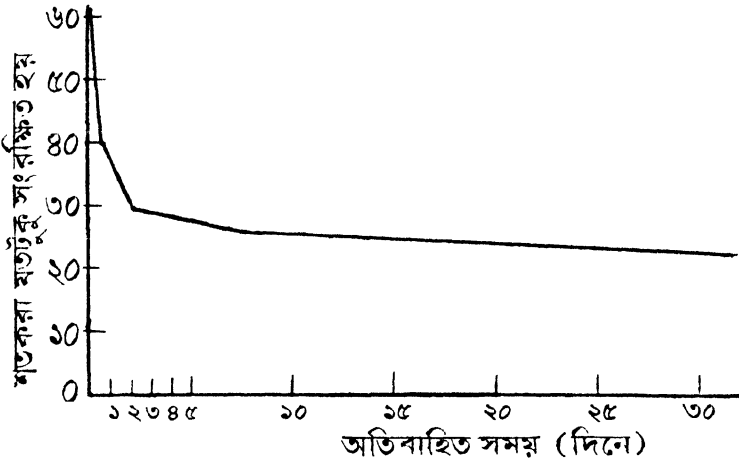
[এবিংহসের প্রসিদ্ধ সংরক্ষণ রেখাচিত্র]

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এবিংহস এই সংরক্ষণের পরীক্ষণগুলি সম্পন্ন করেন অর্থহীন শব্দ তালিকা নিয়ে এবং তাঁর প্রদত্ত এই বিস্মৃতির হার অর্থহীন বিষয়বস্তুরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য অন্য কোন প্রকৃতির বিষয়বস্তুরই ক্ষেত্রে বিস্মৃতির হার অন্য প্রকার হবে।

এবিংহসের পর বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিস্মরণের হার নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত তালিকাগুলি এবিংহসের তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এবিংহসের তালিকার সঙ্গে সেগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। এতে এবিংহসের গবেষণার উৎকর্ষ ও নির্ভরযোগ্যতা আরও বিশেষ করে প্রমাণিত হচ্ছে।

২। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও বিস্মরণের হার

বিস্মরণের হার সম্পর্কে উপরে বর্ণিত পরীক্ষণটি অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিস্মরণের হার সম্পূর্ণ বিভিন্ন হতে দেখা গেছে। সেখানে প্রাথমিক বিস্মরণ যেমন কম তেমনই পরবর্তী বিস্মরণের হারও দ্রুত নয়।

1. Curve of Retention

উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত চারটি বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয় শিখতে দেওয়া হল। তারপর সময়ের ব্যবধানে ঐ বিষয়গুলির কতটুকু তার মনে সংরক্ষিত হয়েছে তার পরীক্ষা করে নীচের তালিকাটি পাওয়া গেল।

	১ দিনে	৫ দিনে	২০ দিনে	৩০ দিনে
১। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা বস্তু	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২। কবিতা	৯০%	৮৬%	৫৬%	৪৫%
৩। গদ্য	৬৮%	৪০%	৩৬%	৩০%
৪। অর্থহীন শব্দতালিকা	৩৪%	২৬%	২৪%	২২%

এই পরীক্ষণের ফলগুলিকে চিত্রে রূপায়িত করলে আমরা নীচের চিত্রটি পাই। এই রেখাচিত্রটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে দ্রুত ও অধিক বিস্মরণ ঘটে অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে। তার পর হয় গদ্যধর্মী বিষয়ে, তার পর হয় কবিতায়। আর
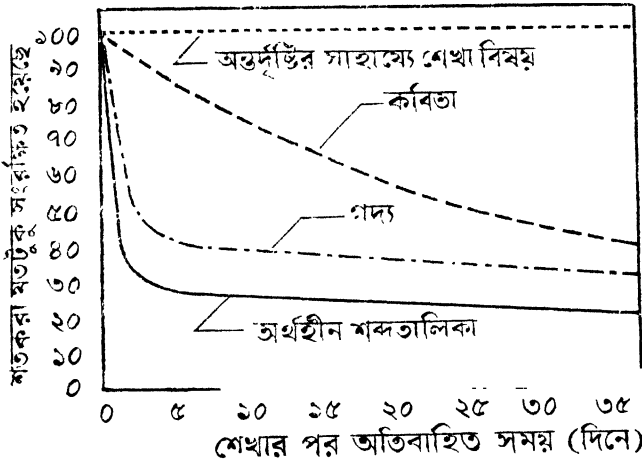
[বিষয়বস্তুর বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী বিস্মরণের হার]

যে বিষয়বস্তুটি ব্যক্তি একবার তার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সেটির ক্ষেত্রে তার বিস্মরণ একেবারেই ঘটে না। সময়ের অতিক্রান্তিতেও সে বস্তুটি তার সম্পূর্ণ মনে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 'একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে দুই সমকোণ'—এই তথ্যটি যদি কাউকে একবার পরীক্ষণের সাহায্যে উপলব্ধি করতে সমর্থ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কখনও সে সেটি ভুলবে না। এই থেকে সংরক্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি কথা বলা চলে যে বিষয়বস্তু যতই অর্থপূর্ণ হবে

ততই সেটি ভালভাবে ও দীর্ঘ দিন মনে রাখা সম্ভব হবে। আর বিষয়বস্তু যত অর্থহীন হবে তত তার সংরক্ষণ অল্প ও দুর্বল হবে। এ জন্য আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ যাতে শিক্ষার্থী ভাল করে বোঝে সেদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া হয়। যান্ত্রিকভাবে বা অর্থ না বুঝে কোন কিছু শেখার যে কোন মূল্য নেই একথা আজ সবাই স্বীকার করেন।

৩। **বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও মুখস্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টা**

সাধারণভাবেই আমাদের জানা আছে যে বিষয়বস্তুর পরিমাণ যত বেশী হবে সেটি মুখস্থ করতে তত বেশী সময় ও প্রচেষ্টা লাগবে। কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিমাণ বাড়ালে মুখস্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টার পরিমাণ কি অনুপাতে বাড়বে সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমাদের কিছু জানা নেই। এবিংহস প্রথম এই ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করে তার ফলাফলের একটি তালিকা তৈরী করেন। তিনি ৭, ১০, ১২, ১৬, ২৪ এবং ৩৬ শব্দ সমন্বিত ৬টি তালিকা তৈরী করেন এবং এই প্রত্যেকটি তালিকা নির্ভুলভাবে মুখস্থ করতে তাঁর কতবার করে 'পড়া'র দরকার হল এবং কতটা করে 'সময়' লাগল তার একটি তালিকা রাখলেন। এই ভাবে মুখস্থ করার পদ্ধতিটির তিনি নাম দিলেন 'শিখন পদ্ধতি'[1]। তারপর তিনি বিভিন্ন তালিকার প্রত্যেকটি শব্দ শিখতে গড়ে কত সময় লাগল তা গণনা করলেন। মোট ফলাফল দাঁড়াল নিম্নরূপ—

তালিকার দৈর্ঘ্য	পড়া'র সংখ্যা	পড়া'র মোট সময়	প্রতিটি শব্দ শেখার গড় সময়
৭	১	৩ সেঃ	০'৪ সেঃ
১০	১৩	৫২ সেঃ	৫'২ সেঃ
১২	১৭	৮২ সেঃ	৬'৮ সেঃ
১৬	৩০	১৯৬ সেঃ	১২.০ সেঃ
২৪	৪৪	৪২২ সেঃ	১৭'৬ সেঃ
৩৬	৫৫	৭৯২ সেঃ	২২'০ সেঃ

[তালিকার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী পড়ার সংখ্যা ও সময় : এবিংহস]

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির হারের তুলনায় পড়ার সময় ও সংখ্যা অনেক দ্রুত হারে বাড়ে। যেমন ৭টি শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে লাগল ১ বার, কিন্তু ১০টি শব্দের তালিকার বেলায় লাগল ১৩ বার, ১২টি শব্দের বেলায় ১৭ বার এবং ২৪টি শব্দের বেলায় ৪৪ বার। সময়ের দিক দিয়েও তেমনই ৭টি শব্দের তালিকাটির একটি শব্দ মুখস্থ করতে লাগল মাত্র ০'৪ সেঃ, কিন্তু ১০টি শব্দের তালিকায় প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ৫'২ সেঃ, ২৪টি শব্দের তালিকায় প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ১৭'৬ সেঃ, ইত্যাদি। অর্থাৎ যে হারে বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও দৈর্ঘ্য বাড়ে তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বাড়ে শেখার সময় ও পড়ার সংখ্যা।

---

1. Learning Method

৪। শিখনের মাত্রা ও সংরক্ষণ

শিখনের মাত্রা নানা রকমের হতে পারে। কোন বিষয়বস্তু শেখার পর যখনই একবার নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করা সম্ভব হয় তখন তাকে যথার্থ বা পূর্ণ শিখন বলা চলে। কিন্তু তারপরও যদি আরও কয়েকবার পড়া যায় তাহলে তাকে অতিশিখন[1] বলা হয়। আর শিখন যখন পূর্ণ শিখনের মাত্রার নীচে থাকে তখন তাকে ন্যূন-শিখন[2] বলা হয়।

কোন বিশেষ একটি বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের উপর ঐ বিষয়বস্তুটির অতিশিখনের কতটা প্রভাব আছে সে সম্বন্ধে এবিংহস একটি পরীক্ষণ করেন। তিনি ১৬টি শব্দের কয়েকটি তালিকা নিলেন এবং প্রত্যেকটি তিনি মূখস্থ করতে সুরু করলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি তালিকার ক্ষেত্রে তিনি শিখনের বিভিন্ন মাত্রা অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ প্রথমটি পড়লেন ৮ বার, দ্বিতীয়টি ১৬ বার, তৃতীয়টি ২৪ বার, এই ভাবে। এইবার ২৪ ঘণ্টা পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে কোনটি কতটা মনে আছে। এই পরীক্ষণ থেকে তিনি যে ফল পেলেন সেটিকে তালিকার আকারে নিয়ে গেলে দাঁড়াল—

প্রথম দিনে পড়ার সংখ্যা	৮	১৬	২৪	৩২	৪২	৫৩	৬৪
২৪ ঘণ্টা পরে সংরক্ষণের শতকরা	৮	১৫	২৩	৩২	৪৫	৫৪	৬৪

এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে যত বেশী বার একটি বিষয়বস্তু পড়া হবে তত বেশী পরিমাণে ঐ বস্তুটি সংরক্ষিত হবে। এক কথায় অতি-শিখনে সংরক্ষণ অধিক হয়।

৫। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হার

সাম্প্রতিক কালে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের হার নিয়ে অনেক পরীক্ষণ হয়েছে। অর্থাৎ দেখা হয়েছে কোন্ পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটা সংরক্ষণ হয়। এই সব পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণের হারও বিভিন্ন। পাঠ্যবিষয়গুলির প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই হল এই সংরক্ষণগত পার্থক্যের কারণ। নীচে একটি বিশেষ পরীক্ষণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হারের তালিকা দেওয়া হল।

সংরক্ষণের হার

	পাঠবর্ষের শেষে	১ বৎসর পরে	৪ বৎসর পরে
উদ্ভিদ্তত্ত্ব	·৬৪	·৩১	·১৬
মনোবিজ্ঞান	·৭৮	·৩৯	·৩০
বীজগণিত	·৮৭	·৫৬	—
রসায়ন বিদ্যা	·৬২	·৪৭	·৩৩
ইতিহাস	·৭১	·৫৬	—

1. Overlearning 2. Underlearning

উপরের পরীক্ষণ এবং আরও অনেক অনুরূপ পরীক্ষণ থেকে একটি মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পাঠবর্ষের শেষে শিক্ষার্থীদের সাধারণত ৭৫%'র মত মনে থাকে। তারপর ১ বৎসর পরে সংরক্ষণ ৪০%'র কাছাকাছি পৌঁছয় এবং ৫ বৎসর পরে এই সংরক্ষণ ২৫%তে দাঁড়ায়। অবশ্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত বৈষম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের হারও পৃথক হয়।

আধুনিক কালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যবিষয়গুলির কোনটিতে শিক্ষার্থীর কি পরিমাণ সংরক্ষণ হয় তাই নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এই সব গবেষণা থেকে লব্ধ ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গরমের ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণ বৃদ্ধির দিকে যায়। বৎসরের শেষের দিকে দেখা যায় যে, যে সব তথ্য দুরূহ প্রকৃতির সেগুলি শিক্ষার্থী বেশী পরিমাণে ভুলতে থাকে, আর যেগুলি সহজ প্রকৃতির সেগুলি সে বেশী মনে রাখতে পারে। যেমন, ইতিহাসের সহজ তথ্যগুলি শিক্ষার্থীরা ভোলে না, কিন্তু উন্নত বা চিন্তামূলক তথ্যগুলি তারা বছরের শেষের দিকে ভুলে যায়। তেমনই গণিতের বেলায় মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে থাকে, কিন্তু উন্নত বা দুরূহ বিষয়গুলি তারা বছরের শেষের দিকে মনে রাখতে পারে না।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা গণিতের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ গরমের ছুটির সময় এবং ৩৩ ভাগ ১ বৎসর পরে ভুলে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত বৈষম্যের জন্য সংরক্ষণেরও বৈষম্য হয়ে থাকে। যেমন, বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যগুলি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োগের বেলায় সংরক্ষণ বেশ উন্নতমানের হয়। কিন্তু রাসায়নিক নামগুলি মনে রাখা এবং সমীকরণ লেখার বেলায় সংরক্ষণ দুর্বল হয়ে দাঁড়ায়। একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা ৬ বৎসর পরে বিদ্যালয়ে শেখা রসায়নশাস্ত্রের তথ্যমূলক বিষয়বস্তুগুলির মাত্র ১৯% মনে করতে পেরেছে।

কলেজ স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞানে প্রচুর বিস্মৃতি ঘটতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চারমাসে ৫০% এবং বৎসরের শেষে ৯৪%'র মত বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কারিগরিমূলক তথ্যের ক্ষেত্রে বিস্মৃতি সবচেয়ে বেশী ঘটে, যদিও সেগুলির অন্তর্নিহিত নীতির বাস্তব প্রয়োগের দক্ষতার কোনও অভাব দেখা যায় না। কলেজের স্তরে চার বৎসর বা তার পরেও যে সব বিষয়ে সব চেয়ে বেশী সংরক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হল আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস, জ্যামিতি এবং সব চেয়ে কম সংরক্ষণ দেখা যায় পদার্থতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রাচীন ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর একটি পরীক্ষায়

কলেজে নবাগত শিক্ষার্থীদের উপর বিশ্ব ইতিহাসের একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেছে যে তাদের সংরক্ষণ একটুও হ্রাস পায় নি।

একদল কলেজের মেয়ের উপর আমেরিকার ইতিহাসের তথ্যমূলক একটি অভীক্ষার প্রয়োগ থেকে দেখা যায় যে তাদের ঐ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বৎসর পরে প্রায় 80% বিস্মৃতি ঘটেছে। উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং শিখনের দুরূহতার উপর নির্ভর করে সংরক্ষণের পরিমাণ। তবে সাধারণ ভাবে বলা চলে যে তথ্যমূলক ও কারিগরি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিস্মৃতি তাড়াতাড়ি ঘটে, আর অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী তথ্যাদি, বাস্তবক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োগ এবং মৌলিকসূত্র শিখনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ অনেক ভাল হয়।

বিস্মরণের কারণাবলী

মানুষ ভোলে কেন, এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। আমরা জানি যে কোন বস্তু ভুলে যাওয়া হল মস্তিষ্কে বস্তুটির সংরক্ষণ না হওয়া। দেখা গেছে যে অনেকগুলি কারণে সংরক্ষণ না হতে পারে। কারণগুলি কখনও পৃথকভাবে আবার কখনও মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। নীচে বিস্মরণের প্রধান কারণগুলির আলোচনা করা হল।

১। চর্চার অভাব[1]

সাধারণত কোন বস্তুর চর্চার অভাবকে আমরা সেই বস্তুটির ভুলে যাওয়ার কারণ বলে মনে করে থাকি। যখন কোন বস্তু আমরা ভুলে যাই তখন ধরে নিই যে সেই বস্তুটি নিয়ে চর্চা বা আলোচনা না করার ফলেই আমরা সেটি ভুলে গেছি। এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন না। প্রথমত, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির যখন কোনরূপ চর্চা করা হচ্ছে না বা মনে করার চেষ্টা করা হচ্ছে না সে সময়েও সেটির সংরক্ষণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েই গেছে, কমা দূরে থাকুক। এই ঘটনাটিকে স্মৃতি-রেশ[2] বলা হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির চর্চাকালেই বিস্মরণ ঘটতে সুরু হয়েছে। তৃতীয়ত, চর্চার অভাবকে বিস্মরণের কারণ বলার অর্থ হল সময়ের অতিক্রান্তিকেই বিস্মরণের কারণ বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু সময়কে কোন ঘটনার কারণ বলা সঙ্গত নয়। কেননা, সময় হচ্ছে সমস্ত ঘটনারই একটি সাধারণ পটভূমিকা বিশেষ। যদিও আমরা বলি যে সময়ে ফলটি পাকে বা সময়ে মানুষ বৃদ্ধ হয় বা সময়ে লোহাতে মরচে পড়ে, তবুও সময়ের অতিক্রান্তি এর কোন ঘটনাটিরই প্রকৃত কারণ নয়। এই ঘটনাগুলির সত্যকারের কারণ হল অন্য। এই জন্যই আমরা চর্চার অভাবকে ভুলে যাওয়ার কারণ বলতে পারি না।

1. Disuse 2. Reminiscence

২। পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ[1]

আমরা যখন একটি বিষয় শেখার পর আর একটি বিষয় শিখি, তখন দেখা যায় যে প্রথম বিষয়টির কিছুটা আমরা ভুলে গেছি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শেখা বিষয়টি পিছন দিকে হটে গিয়ে আমাদের প্রথম শেখা বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ বলা হয়। যেমন, মনে করা যাক একজন একটি বাংলা কবিতা মুখস্থ করল। তারপর সে আবার আর একটি বাংলা কবিতা মুখস্থ করল। এখন যদি সে প্রথম শেখা কবিতাটির কতটা তার মনে আছে তা পরীক্ষা করতে যায় তাহলে সে দেখবে যে সে প্রথম কবিতাটির কিছুটা ভুলে গেছে যদিও দ্বিতীয় কবিতাটি তার সম্পূর্ণ মনে আছে। এক্ষেত্রে প্রথম কবিতাটির এই আংশিক বিস্মরণের কারণ হল পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ। অর্থাৎ দ্বিতীয় কবিতাটির অন্তর্গত শেখা বস্তুগুলি পেছন দিকে হটে গিয়ে ব্যক্তির পূর্বে শেখা প্রথম কবিতাটির বস্তুগুলির সঙ্গে এমন বিভ্রান্তি বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যে তার প্রথম কবিতাটির সংরক্ষণ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রথম কবিতাটির কিছুটা সে ভুলে যায়। দুটি উপায়ে এই পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধের প্রভাবকে দুর্বল বা রুদ্ধ করা যায়। যথা—

প্রথম, যদি প্রথম শেখা বস্তুটি ও দ্বিতীয় শেখা বস্তুটির মধ্যে কিছুটা সময়ের বিরতি দেওয়া হয়, তাহলে এই পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ আর তেমন কাজ করতে পারে না। অবশ্য এই অন্তর্বর্তী বিরতিকালে এমন কোন কাজ করা চলবে না যাতে মস্তিষ্কের পরিশ্রম হয়, অর্থাৎ এই বিরতিকালে মস্তিষ্ককে যতদূর সম্ভব বিশ্রাম দিতে হবে। সেই জন্য দেখা যায় যে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ তখনই কাজ করে যখন দুটি শেখার কাজ পর পর ঘটে এবং তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অতি অল্প থাকে বা একেবারে থাকে না।

দ্বিতীয়, যদি এই দুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে আকৃতিগত মিল থাকে তবেই এই প্রতিরোধ বেশী পরিমাণে ঘটে থাকে। যেমন, প্রথমটি একটি বাংলা কবিতা এবং দ্বিতীয়টিও একটি বাংলা কবিতা। কিংবা প্রথমটি সংখ্যার সারি, দ্বিতীয়টিও একটি সংখ্যার সারি। এসব ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়। কিন্তু যদি প্রথম বিষয়বস্তু ও দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনরূপ আকৃতিগত মিল না থাকে তাহলে প্রতিরোধ অল্প ঘটে বা ঘটে না। যেমন, যদি প্রথমটি ইংরাজী কবিতা এবং দ্বিতীয়টি বাংলা কবিতা বা প্রথমটি বাংলা গদ্য এবং দ্বিতীয়টি সংখ্যাতালিকা হয় তাহলে এই প্রতিরোধ অল্পই ঘটে। কেননা এই ধরনের ক্ষেত্রে দুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনরূপ মিল না থাকার জন্য দুয়ের মধ্যে কোনরকম বিভ্রান্তি বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

1. Retro-active Inhibition

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাশি রাশি বস্তু প্রতিনিয়তই শিখছি। অথচ সেগুলি খুব অল্পই আমাদের শেষ পর্যন্ত মনে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এর প্রধান কারণ হল পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ। যেমন, আমরা প্রথম একটি বস্তু (ক) শেখার পর দ্বিতীয় একটি বস্তু (খ) শিখলাম। তার ফলে প্রথম বস্তুটির (ক)'র কিছুটা ভুলে গেলাম। তারপর আবার যখন তৃতীয় বস্তু (গ) শিখলাম তখন প্রথম (ক)'র আরও কিছু এবং দ্বিতীয় বস্তুর (খ)'র কিছু ভুললাম। আবার যখন চতুর্থ

[পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধের ফলে বিস্মরণ]

বস্তু (ঘ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (ক)'র আরও কিছুটা, দ্বিতীয় বস্তুটির (খ)'র আরও কিছুটা এবং তৃতীয় বস্তুটির (গ)'র কিছুটা ভুললাম। এইভাবে যত নতুন বস্তু আমরা শিখে যাই তত পুরোনো বস্তুর কিছুটা করে ভুলে যাই এবং এইভাবে আমরা প্রথম দিকের শেখা বস্তুগুলি ক্রমবর্ধমান হারে ভুলতে থাকি। এই বিস্মরণ মনের একটি স্বাভাবিক ও অতিপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এই স্বাভাবিক বিস্মরণ যদি না ঘটত তবে আমাদের শেখা সব বস্তুই মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে থাকত এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত এত অসংখ্য বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে ভীড় করত যে আমাদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে উঠত।

৩। শিখনের মাত্রা[1]

শিখনের উৎকর্ষের মাত্রার উপর বিস্মরণ অনেকটা নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তু শেখার একটি সর্বনিম্ন মান আছে, সেখানে পৌঁছলে আমরা বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা শিখেছি। এখন যদি কেউ এই সীমারেখা ছাড়িয়ে কিছুটা বেশী শেখে তবে তার শেখাকে অতি-শিখন বলা হয়। আর তার শিখন যদি পূর্ণ শিখনের সীমারেখার নীচে থাকে তবে তার শেখাকে ন্যূন-শিখন বলা হয়। এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে অতিশেখা বস্তু ন্যূন-শেখা বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী মনে থাকে। অতএব আমরা ন্যূন-শিখনকে ভুলে যাওয়ার একটি কারণ বলতে পারি।

1. Degree of Learning

৪। পরিবর্তিত পরিবেশ[1]

আমরা যখন কোন একটি বিষয় শিখি তখন সেই সময়কার পরিবেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখা এবং মনে করা এ উভয় প্রচেষ্টার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে।[2] তার ফলে আমরা যখন পরে ঐ বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করি তখন পরিবেশের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি সুষ্ঠু স্মরণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এখন যদি কোন কারণে ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশে অনুপস্থিত থাকে তবে দেখা যাবে যে আমাদের মনে করাটাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে এবং ঐ বিষয়টি ভাল করে শেখা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভুলে গেছি। আবার যদি কোন প্রকারে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ঐ বিষয়টি সহজে মনে এসে যাবে। এই জন্যই যখন আমরা কোন বিশেষ পরিবেশে একটি বস্তু শিখি এবং পরে অন্য পরিবেশে সেটি মনে করার চেষ্টা করি তখন আমরা অসুবিধা বোধ করি। কিন্তু সেই পুরোনো পরিবেশে আবার ফিরে গেলে আমাদের মনে করতে আর অসুবিধা হয় না। বাড়ীতে নিজের পড়ার ঘরে ভাল করে তৈরী করা পড়াটি এই কারণেই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রায়ই ভুলে যায়।

৫। প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ[3]

ভয়, রাগ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি কোনও প্রক্ষোভ যদি ব্যক্তির মধ্যে তীব্রভাবে জেগে ওঠে তবে দেখা যায় যে ভাল করে শেখা বিষয়ও তার মনে পড়ছে না। কোনও প্রক্ষোভ সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের মধ্যে অটোনমিক বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীটি[4] সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ব্যক্তির দেহে ও মনে একটা উত্তেজিত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে তার বিস্মৃতিও ঘটে।

৬। আঘাতজনিত বিস্মরণ[5]

সংরক্ষণ হল মস্তিষ্কের একটি প্রক্রিয়া। যদি কোন কারণে মস্তিষ্কে কোনরূপ আঘাত লাগে তবে আংশিকভাবে বিস্মরণ ঘটতে পারে। খেলাধূলা, দুর্ঘটনা, যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে অনেক সময় মাথায় আঘাত লাগার ফলে আঘাতজনিত বিস্মরণ ঘটতে দেখা গেছে।

৭। নেশাকারক বস্তু[6]

মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি নেশাকারক বস্তুগুলি যদি দীর্ঘকাল অতিরিক্ত ব্যবহার করা যায়, তবে সেগুলির প্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি দুর্বল হয়ে ওঠে এবং তা থেকে স্মৃতিভ্রম ঘটতে পারে।

---

1. Altered Environment 2. এটিকে অনুবর্তন বা Conditioning প্রক্রিয়া বলা হয়। শিখনের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 3. Emotional Inhibition 4. Autonomic Nervous System 5. Shock Amnesia 6. Drug

৮। অবদমন ঃঃ ইচ্ছাকৃত বিস্মরণ

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড বিস্মরণের একটি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ভুলে যাওয়া একটি ইচ্ছাকৃত মানসিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যা আমরা ভুলতে চাই, তাই আমরা ভুলি। অবশ্য আমাদের এই ভুলতে চাওয়া বা ভোলার ইচ্ছাটা সচেতন মনের চাওয়া বা ইচ্ছা নয়, সেটি সম্পূর্ণ অচেতন মনের চাওয়া বা ইচ্ছা। তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের মনের অনেকখানি আমাদের কাছে একেবারে অজানা। এই অজ্ঞাত মনটির তিনি নাম দিয়েছেন অচেতন[1] আর যাকে সাধারণত আমরা মন বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, সেটি আসলে আমাদের সম্পূর্ণ মনের একটি অংশ মাত্র। মনের এই জ্ঞাত অংশটুকুর নাম তিনি দিয়েছেন চেতন[2]। এখন যদি আমাদের এই চেতন মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় যা আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, তবে আমরা সেই চিন্তা বা ইচ্ছাটিকে চেতন মন থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে আমাদের অচেতন মনে নির্বাসিত করি। ফলে সেটি আর আমাদের চেতন মনে থাকে না অর্থাৎ আমরা সেটিকে ভুলে যাই। চেতন মন থেকে অচেতন মনে নির্বাসিত করার এই প্রক্রিয়াটির নাম হল অবদমন[3]। অতএব ফ্রয়েডের মতে চেতন মন থেকে কোন চিন্তাকে অচেতন মনে অবদমিত করাকেই আমরা ভুলে যাওয়া নাম দিয়ে থাকি। আর যেহেতু এই অবদমন প্রক্রিয়াটি আমাদের ইচ্ছাকৃত সেহেতু ভুলে যাওয়াকে একদিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত বলা চলে। অর্থাৎ যা আমরা ভুলতে চাই তাই আমরা ভুলি।

এখন প্রশ্ন হল, যদি ভুলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃতই হবে তবে আমরা যে সব বস্তু ভুলতে চাই না (যেমন, কোন দরকারী কাজের কথা বা পরীক্ষার পড়া) সেগুলি ভুলে যাই কেন? আবার অপর দিকে এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমরা ভুলতে চাই (যেমন, কোন দুঃখ, শোক বা লজ্জার স্মৃতি), অথচ সেগুলি ভুলতে পারি না কেন? এর উত্তর হল যে কোন্‌টি আমরা ভুলতে চাই আর কোন্‌টি চাই না তার প্রকৃত নির্ণায়ক কিন্তু আমাদের চেতন সত্তাটি নয়। আমাদের 'আমি' বা অহংসত্তার[4] কিছুটা অংশ চেতন হলেও, এর একটি বড় অংশ অচেতন। ফলে কোন্‌টি আমাদের কাছে বাঞ্ছিত, অতএব মনে রাখতে হবে, আর কোন্‌টি আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, অতএব ভুলে যেতে হবে, সেটি প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের চেতন অহংসত্তাটি ঠিক করে না। বস্তুত আমাদের আচরণের প্রকৃত নিয়ন্তা হল আমাদের অচেতন অহংসত্তাটি। যে বস্তুটি বাহ্যত মনে হচ্ছে আমরা ভুলতে চাই না, অথচ ভুলে যাই, আসলে সেটি আমাদের অচেতন অহংসত্তাটির কাছে বাঞ্ছিত নয়, অতএব সে সেটি ভুলতে চায়। যেমন, পরীক্ষার পড়া তৈরী করা বা বাধ্য হয়ে কোন নীরস কর্তব্য পালন করা বা লৌকিকতার চাপে চিঠি লেখা প্রভৃতি কাজগুলি চেতন মনে আমরা পছন্দ করলেও আমাদের অচেতন মন সেগুলি করতে চায় না এবং ভুলে যেতে চায়। তেমনই আবার কোন দুঃখ, শোক বা

1. Unconscious 2. Conscious 3. Repression 4. Ego

লজ্জার কাহিনী আমরা ভোলার চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না। এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথম আমাদের অচেতন অহংসত্তার কাছে সেগুলি অপ্রিয় হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আমাদের অচেতন সত্তা ভুলতে চায় না যদিও চেতন সত্তা ভুলতে চায়। আর দ্বিতীয় কারণ হল যে ঐ চিন্তা বা কথাগুলি বার বার মনে আনার ফলে ঐগুলির আরও বেশী করে অনুশীলন হয় এবং ফলে স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে পড়ে।

ঘুম

ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটি সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে যে, কোন বিষয় শেখার পর যদি কিছুক্ষণ ঘুমান যায় তবে জেগে থাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল সংরক্ষণ হয়। জেগে থাকলে (কিছু না করলেও) কোনও না কোনও চিন্তা এসে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাবেই, কিন্তু যেহেতু ঘুমিয়ে পড়লে মস্তিষ্ক কোষে কোনরূপ পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না, সেহেতু সংরক্ষণ বিনা বাধায় ঘটে ও বিস্মরণের হারও কম হয়। এইজন্য ঘুমের আগে শেখা বস্তু ভালভাবে ও দীর্ঘকাল মনে থাকে।

স্মৃতিরেশ

মনে করা যাক একজনকে ১৬টি শব্দের একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সে মাত্র ১২টি শব্দ মনে করতে পারছে। অতএব বোঝা গেল যে তার সংরক্ষণ হয়েছে ১৬টি শব্দের মধ্যে ১২টি শব্দ বা শিক্ষণীয় বস্তুটির মোট ৭৫%। কিন্তু পরের দিন যখন তাকে আবার পরীক্ষা করা হল তখন দেখা গেল যে সে ১৪টি শব্দ মনে করতে পারছে। এবার কিন্তু তার সংরক্ষণের পরিমাণ হল ৮৬%। অথচ ইতিমধ্যে সে ঐ শব্দগুলি আর নতুন করে মুখস্থ করেনি। কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানে সংরক্ষণের এই ধরনের যে উন্নতি দেখা যায় তার নাম স্মৃতিরেশ। মনোবিজ্ঞানীরা এই মানসিক ঘটনাটির নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

স্মৃতির উন্নতি

স্মৃতির উন্নতি করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে জানতে সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে। স্মৃতির উন্নতি চায় সকলেই। বিশেষ করে বড় বড় কোম্পানীর অধিকর্তা, ব্যবসাদার, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, সেলসম্যান প্রভৃতি যাঁদের বৃত্তি নির্বাহের জন্য স্মৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়, তাঁরা সকলেই স্মৃতির ক্ষমতা বাড়াতে সর্বদাই ব্যগ্র।

কিন্তু যখনই আমরা বলেছি যে স্মৃতি একটি মানসিক শক্তি নয় বস্তুত তখনই এ প্রশ্নের উত্তর এক রকম দেওয়া হয়ে গেছে। যেহেতু স্মৃতি কোনও একটি বিশেষ শক্তি

নয়, সেহেতু এর কোনরূপ উন্নতি করা সম্ভব নয়। স্মৃতি একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। অতএব একটি প্রক্রিয়ার ক্ষমতার বাড়া বা কমার কথা ওঠে না। স্মৃতির চর্চা করলে স্মৃতির ক্ষমতা বাড়ে, এই ছিল প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মত। কিন্তু প্রথমে উইলিয়াম জেমস্ এবং পরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে স্মৃতির শক্তি চর্চা করলে বাড়ে না।

তবে স্মৃতির পেছনে আছে মস্তিষ্কঘটিত এক বিশেষ প্রক্রিয়া যার নাম হল সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণ নানা কারণে কম বা বেশী মাত্রার হয়ে থাকে। অতএব এই সংরক্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করে স্মৃতির উৎকর্ষ বা অনুৎকর্ষ।

সুষ্ঠু স্মরণের সর্তাবলী

ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বা অবস্থায় সংরক্ষণের কাজটি ভালভাবে হয়। আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বা অবস্থায় তা হয় না। যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ ভালভাবে হয় সেগুলিকে আমরা সুষ্ঠু স্মরণের সর্তাবলী নাম দিতে পারি। একথা ভাবলে অবশ্য ভুল হবে যে এই বিশেষ সর্তগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণের শক্তি সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে তবে ঐ বিশেষ সর্তগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকর বা স্থায়ী হয় মাত্র। যতক্ষণ এই সর্তগুলি বর্তমান থাকবে ততক্ষণই সংরক্ষণের উৎকর্ষও দেখা যাবে, আর সর্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণেরও উৎকর্ষ কমে যাবে। অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে স্মৃতির উন্নয়ন করা যায় না, কিন্তু এমন কতকগুলি অনুকুল সর্ত আছে যেগুলি কোন কিছু শেখার সময় অনুসরণ করলে সংরক্ষণ অধিকতর কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে থাকে। এই সর্তগুলিকে সুষ্ঠু স্মৃতির সর্তাবলী বলা চলে।

এই সর্তগুলিকে আমরা সাধারণভাবে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি যথা, শারীরিক[1], মানসিক[2], প্রক্ষোভমূলক[3], পদ্ধতিমূলক[4] ও পরিবেশমূলক[5]। এই বিভিন্ন শ্রেণীর সর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১। শারীরিক সর্তাবলী

সুষ্ঠু স্মরণ অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার উপর। রোগ বা অসুস্থতা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলিকে ব্যাহত করে এবং তার ফলে অনিবার্য রূপে সংরক্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব শারীরিক সুস্থতা হল সুষ্ঠু স্মরণের প্রথম সর্ত।

২। মানসিক সর্তাবলী

সুষ্ঠু শিখনের মানসিক সর্তগুলিকে আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

1. Physical 2. Mental 3. Emotional 4. Relating to Method 5. Environmental

(ক) প্রেষণা[1] ঃ—মানসিক সর্তগুলির মধ্যে প্রথমে আসে প্রেষণা, বা যা মনে রাখতে হবে তা শেখার আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছা। অনিচ্ছায় বা অর্ধ-ইচ্ছায় শেখা বস্তু মস্তিষ্কে ভালভাবে সংরক্ষিত হয় না। এটি একটি পরীক্ষণ-প্রমাণিত তথ্য যে বিনা প্রেষণায় কোন প্রকারের শিখন সম্ভব নয়। অতএব সুষ্ঠু স্মরণের একটি অপরিহার্য সর্ত হল শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রতি পর্যাপ্ত প্রেষণাবোধ।

(খ) মনোযোগ[2] ঃ—প্রেষণা বা ইচ্ছা যদি থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগের সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হলে বিষয়বস্তুটিতে যাতে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয় সেটি দেখতে হবে। অনেক সময় উপযুক্ত মনোযোগ না দেওয়ার জন্য সংরক্ষণ ঠিকমত হয় না। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতার নোটস্ নেয়। কিন্তু যদি নোটস্ লেখায় মনোযোগ বেশী থাকে তবে বক্তৃতা শোনা যায় না, ফলে অনেক সময় বিষয়বস্তুটি না বুঝেই শিক্ষার্থীরা নোটস্ নেয় এবং পরে সে নোটস্ তাদের কোন কাজেই লাগে না। সেই জন্য বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, নোটস্ মাঝে মাঝে নিতে হয়। কারণ মনোযোগ দিয়ে শোনা বিষয় আমরা সহজে ভুলি না।

(গ) সংবোধন[3] ঃ—শিক্ষণীয় বস্তুটি যে পরিমাণে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তার উপর সংরক্ষণের মাত্রা নির্ভর করে। দেখা গেছে, যে বস্তুটি শিক্ষার্থী যত বেশী বুঝতে পারে তত বেশী সেটি সে মনে রাখতে পারে। আর যে বস্তুর অর্থ না বুঝে যন্ত্রের মত শিক্ষার্থী মুখস্থ করে সে বস্তুটি মনে রাখা তার পক্ষে শক্ত হয়। অবশ্য অর্থ বোঝা না বোঝা অনেকখানি নির্ভর করে বস্তুটির প্রকৃতির উপর।

৩। প্রক্ষোভমূলক সমতা

প্রক্ষোভমূলক সমতা হল মনে রাখার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় সর্ত। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রক্ষোভের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলেই মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াগুলি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। আর যদি কোন কারণে কোন বিশেষ প্রক্ষোভ অস্বাভাবিক মাত্রায় তীব্র হয়ে ওঠে তাহলে স্মৃতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত অবস্থায় কিছু শেখা বা মনে রাখার চেষ্টা করাটা বেশ শক্ত এমন কি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভুলে যাওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রক্ষোভঘটিত প্রতিরোধকে একটি বড় কারণ বলে ধরা হয়েছে। এই জন্যই শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাতে হলে তার মানসিক সাম্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্বপ্রথম দরকার। প্রক্ষোভের দিক দিয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীকে কিছু শেখানো নিরর্থক ও অপচয়মূলক।

---

1. Motivation 2. Attention 3. Comprehension 4. Emotional Equilibrium.

৪। পদ্ধতিমূলক সর্তাবলী

সুষ্ঠু সংরক্ষণ অনেকখানি নির্ভর করে উপযুক্ত পদ্ধতির নির্বাচনের উপর। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মৃতি সবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাছাড়া ভুল পদ্ধতিতে শেখার চেষ্টা করলে শিখতেও যেমন দেরী হয় তেমনই মনে রাখাও কষ্টকর হয়। শিখনের পদ্ধতি নানা প্রকারের হতে পারে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির প্রকৃতির উপর উপযুক্ত পদ্ধতির নির্বাচন নির্ভর করে।

সুষ্ঠু ও স্থায়ী সংরক্ষণের সহায়ক হয় নীচে এমন কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ করা হল।[1]

(ক) সমগ্র পদ্ধতি ঃ অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর।

(খ) অংশ পদ্ধতি ঃ অর্থহীন বিষয়বস্তু, অতিদীর্ঘ বিষয়বস্তু, কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য।

(গ) মধ্যগ পদ্ধতি ঃ অতিদীর্ঘ অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা অংশ ও সমগ্র পদ্ধতির মিশ্রিত এই পদ্ধতিটি অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

(ঘ) আবৃত্তি পদ্ধতি ঃ সাধারণত কোন কিছু মুখস্থ করার সময় পঠন পদ্ধতি ও আবৃত্তি পদ্ধতি, এই দু'রকম পদ্ধতির অনুসরণ করা যায়। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এ তথ্যটি প্রমাণিত হয়েছে যে আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতির চেয়ে মনে রাখার পক্ষে অধিকতর সহায়ক।

(ঙ) সবিরাম পদ্ধতি ঃ কোন কিছু বিরতিহীন পদ্ধতিতে শেখার চেয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শেখা অনেক বেশী কার্যকর এবং তার ফলে সংরক্ষণ সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

(চ) অনুষঙ্গ পদ্ধতি ঃ শেখার বিষয়বস্তুগুলিকে অনুষঙ্গের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তুলতে পারলে সেগুলি তখন মনে রাখা সহজ হয়ে ওঠে। অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় দুটি বিষয়বস্তু বা চিন্তার মধ্যে কোন রকম একটি মানসিক সম্পর্ক বা যোগাযোগের ধারণা। কখনও কখনও এই সম্পর্ক পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত থাকে আবার কখনও এই ধরনের সম্পর্ক চেষ্টা করে তৈরী করা যায়।

(ছ) প্রতিরূপের সাহায্যে শেখার চেষ্টা করলে মনে রাখার কাজটি সুষ্ঠু ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যখন কোন কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তখন তার প্রতিরূপটিকে মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করতে পারলে বিষয়টির সংরক্ষণ সহজ এবং স্থায়ী হয়।

(জ) ছন্দ বা সুরের সাহায্যে শেখা বস্তু মনে রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সুর করে মুখস্থ করা কবিতা, নামতা ইত্যাদি আমাদের বহুদিন মনে থাকে।

---

1. মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(ঝ) কতকগুলি স্মৃতিসহায়ক কৌশল[1] আছে যেগুলি অবলম্বন করলে বস্তু বা ঘটনা মনে রাখা সহজ হয়। এছাড়া শেখা বস্তুর চর্চা বা অনুশীলন[2] বস্তুটিকে মনে রাখতে সাহায্য করে।

(ঞ) পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ নামক প্রক্রিয়াটি ভুলে যাওয়ার একটি বড় কারণ। শিখনের সময় এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাতে এই প্রতিরোধ সবচেয়ে কম হয়। যেমন পড়ার মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া, একই ধরনের বিষয়বস্তু পর পর না পড়া ইত্যাদি পন্থাগুলি অবলম্বন করলে এই পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ কম হয় এবং স্মৃতি সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

৫। পরিবেশমূলক সর্তাবলী

(ক) অনুকূল পরিবেশ: মনে রাখার একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হল যে পড়া বা শেখাটা যেন সব দিক দিয়ে অনুকূল পরিবেশে সম্পন্ন হয়। যদি পরিবেশ প্রতিকূল হয় তাহলে মনোযোগ ও একাগ্রতা ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণের কাজটিও সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হয় না।

(খ) অপরিবর্তিত বা পরিচিত পরিবেশঃ যে পরিবেশে কোন কিছু শেখা হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে সেই বস্তুটি মনে রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। অতএব শিখনের পরিবেশ যতটা অভিন্ন থাকে ততই স্মৃতি স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়।

স্মৃতির বিস্তার[3]

একবার শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন একটি সংখ্যা বা অক্ষরের সারি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এই সংখ্যা বা অক্ষরের সারিটি যদি ক্রমশ দৈর্ঘ্যে বাড়িয়ে যাওয়া হয় তবে এমন একটি সময় আসে যখন একবার শুনে সেটি আর নিখুঁতভাবে আবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সকলেরই স্মৃতির বিস্তার বা পরিধির একটি সীমা আছে। যতটুকু একবার শুনে ব্যক্তি নির্ভুল আবৃত্তি করতে পারে সেইটিকে তার স্মৃতির বিস্তার বলে বর্ণনা করা হয়। কোন ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার পরিমাপ করতে হলে তার সামনে ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্যের সংখ্যার সারি বা অক্ষরের সারি পর পর উপস্থাপিত করে দেখতে হয় যে কতদূর পর্যন্ত সে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। পরের পৃষ্ঠায় এই রকম দুটি সারি দেওয়া হল। প্রথমটি সংখ্যার সারি, দ্বিতীয়টি অক্ষরের সারি।

প্রথম সারিটি সুরু হয়েছে ৪টি সংখ্যা দিয়ে। তারপর একটি করে সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সব শেষের সারিতে আছে ১০টি সংখ্যা। অক্ষরের সারিটিও সেই রকম সুরু

1. Mnemonic Devices 2. Rehearsal 3. Memory Span

হয়েছে ৪টি অক্ষর দিয়ে এবং একটি করে অক্ষর বাড়তে বাড়তে শেষ সারিতে আছে ১০টি অক্ষর।

৯ ৭ ১ ৩	গ চ ম ট
২ ৮ ৩ ৫ ৯	প ক ব জ ট
৬ ৪ ৯ ২ ৭ ১	ত অ ন ব চ হ
৭ ৩ ১ ৯ ৪ ৬ ২	ম হ ফ ব শ দ চ
৫ ২ ৬ ৮ ৫ ৩ ১ ৭	র ধ গ ন ল ব ত স
৮ ৩ ৬ ২ ৭ ১ ৪ ২ ৫	ধ ম ঝ প র ক এ চ ট
১ ৯ ৭ ৪ ১ ৮ ৫ ২ ৪ ৭	ব ন ঠ দ গ হ ঝ ড ন থ
(সংখ্যা সারি)	(অক্ষর সারি)

মনে করা যাক, এক ব্যক্তি সংখ্যা সারির প্রথম ৪টি সারি নিখুঁত বলতে পারল, কিন্তু পঞ্চম সারিটি সম্পূর্ণ বলতে পারল না। ৪র্থ সারিতে ৭টি সংখ্যা থাকায় মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে সংখ্যার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার হল ৭। তেমনই কেউ যদি ষষ্ঠ সংখ্যা-সারিটি পর্যন্ত নির্ভুল বলতে পারে তাহলে তার স্মৃতির বিস্তার হবে ৯। একই ভাবে অক্ষরের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ করা যেতে পারে।

বুদ্ধির অভীক্ষায় ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ প্রায়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার কারণ হল যে স্মৃতির বিস্তারের সঙ্গে মানসিক বিকাশের গভীর সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে যে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির বিস্তারও বাড়ে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার প্রায় ৭'র কাছাকাছি।

অনুশীলনী

১। স্মৃতি কাকে বলে? স্মৃতির বিভিন্ন স্তর ও উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২। স্মরণ করাকে বিশ্লেষণ কর এবং এর প্রকৃতি বর্ণনা কর।
৩। স্মরণের মধ্যে কি কি মানসিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান?
৪। স্মৃতি এক না বহু? এই বিষয়ে তোমার মতামত দাও।
৫। স্মরণের সঙ্গে শিখনের কি সম্পর্ক?
৬। মনে করা (বা পুনরুদ্রেক) এবং চেনা (বা প্রত্যভিজ্ঞা)—এই দুই-এর পার্থক্য কি?
৭। বিস্মৃতি কাকে বলে? বিস্মৃতিকে মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ বলা হয় কেন?
৮। বিস্মরণের বা বিস্মৃতির প্রধান কারণ কি কি?

৯। স্মরণশক্তির উন্নতি সাধন সম্ভব কি? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

১০। স্মৃতির উপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণ বর্ণনা কর। স্মৃতির পরীক্ষায় অর্থহীন শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয় কেন?

১১। পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা শেখা জিনিস মনে করতে পারে না কেন?

১২। উত্তম স্মৃতির লক্ষণ কি কি?

১৩। আমরা যা পড়ি, কখনও কখনও তা ভুলে যাই কেন? এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদগুলি বিবৃত কর।

১৪। স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি?

১৫। যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্বল স্মৃতির অভিযোগ করে তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়?

১৬। স্মৃতির বিস্তার কাকে বলে? কিভাবে ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ করা যায়?

১৭। 'যা আমরা ভুলতে চাই, তাই আমরা ভুলি' বা 'ভুলে যাওয়া একটি ইচ্ছাকৃত প্রক্রিয়া'—আলোচনা কর।

১৮। অতিশিখন ও ন্যূনশিখনের সঙ্গে স্মরণের কি সম্পর্ক?

১৯। টিকা লেখ :—অবদমন ও বিস্মরণ, স্মৃতিরেশ, পরিবর্তিত পরিবেশ ও স্মৃতি।

মনোযোগের স্বরূপ

সাধারণ মানুষ মনোযোগকে মানসিক শক্তি বলে গণ্য করে থাকেন। আবার অনেকে মনোযোগকে মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করেন। প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীরাও মনোযোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে চর্চার দ্বারা মনোযোগের শক্তি বাড়ানো যায়।

কিন্তু এ সব ধারণা যে ভুল এ কথা নানা গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। আমাদের চারপাশে সারাক্ষণই অসংখ্য উদ্দীপক ছড়ানো রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই যেন প্রচেষ্টা আমাদের কাছ থেকে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করা। কিন্তু সেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমরা একই মুহূর্তে একটির বেশী দুটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে পারি না। স্বভাবতই আমাদের এই উদ্দীপকের জনতা থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিতে হবে এবং শুধুমাত্র সেটির প্রতিই সাড়া দিতে হবে। বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি উদ্দীপকের এই মানসিক নির্বাচন ও তার প্রতি সাড়া দেওয়া—এই প্রক্রিয়া দুটির একত্রিত নাম হল মনোযোগ দেওয়া। যেমন এই মুহূর্তে একাধিক উদ্দীপক আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। পাখার হাওয়া, টেবিল ল্যাম্পের আলো, বাইরে মোটর গাড়ীর হর্নের আওয়াজ, পাশের বাড়ীর পিয়ানোর টুং টাং শব্দ, সামনের বাগান থেকে ভেসে আসা হাসনাহানার গন্ধ, আমার সামনে রাখা লেখার প্যাড ইত্যাদি উদ্দীপকগুলি তাদের বহু বিভিন্ন ধরনের আবেদন আমার কাছে এনে হাজির করছে। কিন্তু এতগুলি উদ্দীপকের আবেদন অগ্রাহ্য করে আমি একমাত্র আমার লেখার প্যাডটিকে বেছে নিয়েছি এবং তারই আবেদনে সাড়া দিয়েছি, অর্থাৎ লিখে চলেছি। চারপাশের বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে আমার এই একটি উদ্দীপককে বেছে নেওয়ার কার্জটিকে মনোযোগ দেওয়া বলা হয়। এক কথায় আমি লেখার কাজে মনোযোগ দিয়েছি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোযোগ হল এক ধরনের মানসিক নির্বাচন প্রক্রিয়া।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই।

মানুষের সব আচরণই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা মাত্র। মনোযোগও তাই। যখন বিশেষ একটি উদ্দীপককে বেছে নিয়ে তার প্রতি আমরা

সাড়া দিতে যাই তখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন করে সঙ্গতিবিধান করতে হয় এবং তার ফলে আমাদের অভ্যন্তরে নানারূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেগুলি হল এই—

১। সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন

প্রথমত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন[1] দেখা দেয়। যেমন, বসা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে পরিবর্তন, ঘাড় বাড়িয়ে দেখা বা মাথা হেলিয়ে শোনার চেষ্টা করা ইত্যাদি। বিভিন্ন ভঙ্গীগত পরিবর্তন ছাড়াও শরীরের কতকগুলি বিশেষ পেশীর মধ্যে একটা কাঠিন্যও এই সময় দেখা দেয়।

২। ইন্দ্রিয়ঘটিত পরিবর্তন

দ্বিতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম ইন্দ্রিয়ঘটিত পরিবর্তন[2] দেখা দেয়। যেমন, কোন দৃশ্য বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হলে চোখ ঘোরানো ও যথাস্থানে দৃষ্টি স্থাপন করা ইত্যাদি নানা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ঘটিত আচরণ ব্যক্তিকে সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া এ সময় চোখের মধ্যেও পেশীগত নানা পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও মনোযোগ দেবার সময় অনুরূপ নানা পরিবর্তন দেখা দেয়।

৩। স্নায়ুঘটিত পরিবর্তন

তৃতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক পরিবর্তন[3] সংঘটিত হয়। যখন আমরা মনোযোগ দিই তখন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে নানারকম গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

৪। প্রত্যক্ষণগত পরিবর্তন

মনোযোগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষণের স্পষ্টতা[4] অর্থাৎ যে বস্তুটিতে মনোযোগ দিচ্ছি সে বস্তুটি আগের চেয়ে আমাদের কাছে আরও বেশী পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের প্রত্যক্ষণের গণ্ডীর মধ্যে সব সময়েই বহু বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু তার সবগুলিকে আমরা সব সময়ে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষণ করি না। সেগুলির মধ্যে যে বস্তুটির প্রতি আমরা বিশেষ করে মনোযোগ দিই সেই বিশেষ বস্তুটির প্রত্যক্ষণ আমাদের কাছে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্যগুলি অস্পষ্টই থেকে যায়। যেমন, পাশের ঘরে কারা কথা বলছে যদি আমি সেদিকে মনোযোগ না দিই তবে কি কথা হচ্ছে বুঝতে পারব না, কিন্তু যে মুহূর্তেই ওদিকে মনোযোগ দেব সেই মুহূর্তেই ওদের কথাবার্তা আমার কাছে সুবোধ্য ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

---

1. Motor Changes 2. Sensory Changes 3. Nervous Changes 4. Clarity of Perception

৫। সচেতনতার কেন্দ্রে অবস্থিতি

মনোযোগের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে যখন কোন বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তুটি আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে[1] এসে উপস্থিত হয়। আমাদের সচেতনতায় সব সময়েই বহু বস্তু বর্তমান রয়েছে। কিন্তু সব সময়েই সেই সব বস্তু আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে না। যখন যে বস্তুটির প্রতি আমরা মনোযোগ দিই তখন সেইটিই আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে। আর বাকী সবই থাকে আমাদের সচেতনতার বিভিন্ন প্রান্তভূমিতে ছড়িয়ে এবং সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতাও নানা মাত্রার হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই সেগুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তুটি সচেতনতার প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয় এবং পূর্ণভাবে আমাদের সচেতনতাকে অধিকার করে।

মনোযোগের নির্ধারক বা সর্তাবলী

আমাদের মনোযোগ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এ প্রশ্নটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারপাশে সব সময়েই অসংখ্য উদ্দীপক রয়েছে, অথচ তাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, আবার অন্য আর একটি সমর্থ হয় না। এর কারণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম, অভ্যন্তরীণ নির্ধারক[2] এবং দ্বিতীয়, বাহ্যিক নির্ধারক[3]। এই দু'ধরনের নির্ধারককে এক কথায় মনোযোগের সর্তাবলী[4] বলা হয়।

অভ্যন্তরীণ নির্ধারক

মনোযোগের অভ্যন্তরীণ নির্ধারক বলতে সেই সব বস্তুকে বোঝায় যেগুলি থাকে ব্যক্তির মধ্যে। এই পর্যায়ের নির্ধারকগুলিকে এক কথায় মানসিক প্রস্তুতি[5] নাম দেওয়া যেতে পারে। মানসিক প্রস্তুতি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন একটি বা এক শ্রেণীর উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্য মনের দিক দিয়ে তৈরী হয়ে থাকা। বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। যেমন, কোন একটি নতুন দেশে একজন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্, একজন ভূতত্ত্ববিদ্ এবং একজন মনোবিজ্ঞানী বেড়াতে গেলেন। প্রথম ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের ফুল, ফল, গাছপালা প্রভৃতি। দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের মাটি, পাথর, নদী, শিলাখণ্ড ইত্যাদি। আর তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে দেশের মানুষের আচরণ, প্রচলিত প্রথা, জীবনধারা প্রভৃতি। এই মানসিক প্রস্তুতির বিভিন্নতার পেছনে বহু রকম শক্তি কাজ করে থাকে। যেমন, ব্যক্তির আগ্রহ, কৌতূহল, চাহিদা, রুচি ইত্যাদি।

---

1. Centre of Consciousness 2. Internal Determiners 3. External Determiners 4. Conditions of Attention 5. Mental Set

বাহ্যিক নির্ধারক

মনোযোগের বাহ্যিক নির্ধারক হল সেই সব বৈশিষ্ট্য যা থাকে ব্যক্তির বাইরে, কিন্তু উদ্দীপকের মধ্যে। এগুলিও আবার নানা রকমের হতে পারে, যেমন—

১। **প্রকৃতি**—প্রকৃতিগত কারণের জন্য কোন কোন উদ্দীপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। যেমন, রঙীন জিনিস সাদা জিনিসের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হয়।

২। **তীব্রতা**—উজ্জ্বল আলো, উচ্চ শব্দ, তীব্র ব্যথা প্রভৃতির প্রতি সহজেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

৩। **আকৃতি**—বিরাট আয়তনের কোন বস্তু ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তুর চেয়ে আমাদের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

৪। **পুনরাবির্ভাব**—একটি উদ্দীপককে যদি বার বার আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় তবে আমরা সেটির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হই।

৫। **অবস্থিতি**—কোন কোন বিশেষ অবস্থিতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, বইয়ের পাতার উপরের দিকটাতে নীচের দিকের চেয়ে আগে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। অতএব ঐ বিশেষ অবস্থিতিতে যদি কোন ছবি বা লেখা থাকে তবে সেটি আগেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

৬। **পরিবর্তন**—উদ্দীপকের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে সেটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, একজন লোক চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলেই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে চলে যাবে।

৭। **নূতনত্ব**—যা নতুন, অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক তা স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৮। **গতি**—স্থির বস্তুর চেয়ে গতিশীল বস্তু আমাদের দৃষ্টি অধিক আকর্ষণ করে। যেমন, চঞ্চল বা গতিশীল আলোর বিজ্ঞাপনগুলি নিশ্চল আলোর বিজ্ঞাপনের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়।

৯। **বিচ্ছিন্নতা**—অন্য সকল উদ্দীপক থেকে যদি একটি বিশেষ উদ্দীপককে সরিয়ে রাখা হয় তবে সেই বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ

প্রকৃতির দিক দিয়ে মনোযোগ তিন প্রকারের হতে পারে, যেমন,

১। স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ

২। ইচ্ছা-প্রসূত মনোযোগ

৩। অভ্যাসমূলক মনোযোগ

১। স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ

যখন আমরা নিছক উদ্দীপক বা পরিস্থিতির তাগাদায় মনোযোগ দিতে বাধ্য হই, তখন সেই মনোযোগকে স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ[1] বলা হয়। যেমন, বিদ্যুৎ চমকানো, মটরগাড়ীর টায়ার ফাটার শব্দ, আকস্মিক ব্যথা, তীব্র ইলেকট্রিক শক ইত্যাদির প্রতি আমাদের মনোযোগ স্বতঃপ্রসূত ভাবেই আকৃষ্ট হয়। সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের কোন রকম মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ অনেকটা রিফ্লেক্স জাতীয় এবং এ জাতীয় মনোযোগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকুক আর না থাকুক মনোযোগ আপনা হতেই সেদিকে চলে যাবে।

২। ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ

আর যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি আমরা ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে মনোযোগ দিই তখন সেই মনোযোগকে ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ[2] বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে প্রতিনিয়তই নানা বস্তুতে আমরা এ ধরনের মনোযোগ দিয়ে থাকি। ইচ্ছা-প্রসূত মনোযোগের প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় কোন উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ অধিকার করে থাকে এবং সেই আকর্ষণীয় উদ্দীপকের দাবীকে উপেক্ষা করে অন্য কোনও কম আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। যেমন, একঘেয়ে কোনও আলোচনা বা বক্তৃতা শোনা, নীরস কোনও রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পড়া, ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। অথচ মনের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে আকর্ষণীয় কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া। ফলে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং ততক্ষণই মনোযোগ অটুট থাকে যতক্ষণ এই দ্বন্দ্বে ইচ্ছার শক্তি প্রবলতর থাকে।

৩। অভ্যাসগত মনোযোগ

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার মনোযোগ দেওয়াটা একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এই মনোযোগকে অভ্যাসগত মনোযোগ[3] বলা হয়। এ ধরনের মনোযোগের বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্দীপকের কোনও নিজস্ব সহজ আকর্ষণ না থাকলেও সেটির প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। যেমন, মোটর চালকের ক্ষেত্রে মোটরগাড়ীর হর্ন শোনা, মায়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার কান্না শোনা, প্রুফ রীডারের ক্ষেত্রে বানান ভুল দেখা ইত্যাদি মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি অভ্যাসের স্তরে গিয়ে পৌঁছে যায়। তার ফলে এগুলির প্রতি কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলেও নিছক অভ্যাসের বশে এগুলির প্রতি স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

---

1. Involuntary or Non–Volitional Attention 2. Voluntary or Volitional Attention 3. Habitual Attention

প্রকৃতির দিক দিয়ে স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ আর অভ্যাসগত মনোযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে প্রথম শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে উদ্দীপকের আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে নিছক ব্যক্তির অভ্যাস।

যে সকল বিষয়ে এককালে মনোযোগ দিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হত, অভ্যাসে পরিণত হলে সেই সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই সৃষ্ট হয়ে যায়। স্কুলে পড়ার সময় যে ছেলেকে গণিতের বইতে জোর করে মনোযোগ দিতে হত, বড় হয়ে সে যখন গণিতের অধ্যাপক হয়, তখন অনেক কঠিন গণিতের বইতে মনোযোগ দিতে তার আর কোনরূপ মানসিক প্রচেষ্টা লাগে না। মনোযোগের এই রূপান্তরের মূলে থাকে আমাদের প্রয়োজনবোধ, আগ্রহ, সামাজিক প্রথা, মনোভাব ইত্যাদি।

ক। আরোপিত ও স্বাভাবিক মনোযোগ

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগকে আবার কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, আরোপিত[1] এবং স্বাভাবিক[2]। আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলতে সেই মনোযোগকে বোঝায় যা কোন বিশেষ প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয় এবং ঐ প্রবৃত্তির তাগাদাতেই সক্রিয় থাকে। যেমন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়ার সময় যে মনোযোগ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় সেটি আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ। ক্ষুধারূপ প্রবৃত্তিটিই যেন এই মনোযোগ ব্যক্তির উপর আরোপ করে দিয়েছে এবং যতক্ষণ এই ক্ষুধা প্রবৃত্তিটি সক্রিয় থাকে ততক্ষণ মনোযোগও অব্যাহত থাকে।

স্বাভাবিক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগের মূলে আছে কোন অর্জিত আগ্রহ বা সেণ্টিমেণ্ট। যেমন, ধরা যাক কারও মধ্যে ছবি তোলার প্রতি গভীর আগ্রহ জন্মেছে। তার ফলে ছবিতে বা ছবি-ঘটিত কোন বিষয়ে তার মনোযোগ স্বাভাবিকভাবেই যাবে।

খ। অবিভক্ত ও বিভক্ত মনোযোগ

ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অবিভক্ত[3] এবং বিভক্ত[4]। অবিভক্ত ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগের পশ্চাতে থাকে একটি মাত্র এবং অবিভক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। আর বিভক্ত ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বার বার ও একাধিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। স্পষ্টতই অবিভক্ত মনোযোগ বিভক্ত মনোযোগের তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিকতর কার্যকর হয়।

মনোযোগের বিকাশ[5]

শিশুর মনোযোগের ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করলে তার তিনটি স্তর পাওয়া যায়।

প্রথম, শৈশবে শিশুর মনোযোগ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ থাকে। এ সময়ে উদ্দীপকের

1. Enforced 2. Spontaneous 3. Implicit 4. Explicit 5. Development

প্রকৃতি অনুযায়ীই তার সমস্ত মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছার প্রয়োগ করে কোন কিছুতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভব হয় না। সেই জন্য অতি শৈশবে শিশুকে এমন কোন বিষয় বা তথ্য শেখানোর চেষ্টা করা উচিত নয় যাতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হবে। এই সময় রঙচঙে জিনিসপত্র, ছবিওয়ালা বই প্রভৃতি যে সব বস্তু সহজেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই সব বস্তুর সাহায্যেই তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিশু আর একটু বড় হলে ক্রমশ তার নিজের ইচ্ছার দ্বারা সে তার মনোযোগকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। স্বাভাবিক ভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করে না বা তার কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতিও সে তখন মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। বিশেষ করে আকর্ষণীয় না হলেও স্কুলের নানা কাজ ও পাঠে ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ দিতে সে বাধ্য হয়।

তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়। এই সময় এক কালে যে সব বস্তুতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হত সে সব বস্তুতে সে বিনা আয়াসে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। নিজের কাজ-কর্ম, বৃত্তির চাপ, পরিবেশের চাহিদা, হবি, শখ প্রভৃতি কারণে ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়।

মনোযোগ ও আগ্রহ

কোন কোন উদ্দীপকের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এগুলির ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবার জন্য আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে উদ্দীপক একপ্রকার জোর করে আমাদের মনোযোগ অধিকার করে নেয়, আমাদের মন সেটির প্রতি সাড়া দেবার জন্য তৈরী থাক, আর নাই থাক। এগুলিকে মনোযোগের বাহ্যিক নির্ধারক বলা হয়।

কিন্তু যে সকল উদ্দীপকের এভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যন্তরীণ নির্ধারকের দ্বারা—এক কথায় আমরা যার নাম দিয়েছি মানসিক প্রস্তুতি। এই মানসিক প্রস্তুতির একটি বড় উপাদান হল আগ্রহ। যে বস্তুটির প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেই বস্তুটিতে মনোযোগ দেবার জন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতিও স্বভাবত গঠিত হয়ে যায়।

নানা মনোবিজ্ঞানী আগ্রহের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। হার্বার্টের মতে আগ্রহ হল নতুন কোন জ্ঞান আহরণের জন্য মনের প্রস্তুতি। ডিউইর মতে ব্যক্তির নিজের বিকাশ প্রক্রিয়ার অভিমুখে তার স্বতঃপ্রসূত অগ্রগতিই হল আগ্রহ। আগ্রহকে আমরা যে

ভাবেই বর্ণনা করি না কেন একথা অনস্বীকার্য যে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। মনোযোগ হল মনের উদ্দীপক-নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর পেছনে আছে মনের একটি বিশেষ সংগঠন। এই সংগঠনকেই আমরা মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহ বলে থাকি। এই মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহের জন্যই আমরা আমাদের পরিবেশে অবস্থিত অনেকগুলি উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিই এবং সেটিতে মনোযোগ দিই। যখন এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন তাকে আমরা আগ্রহ বলি, আর যখন সেটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিশেষ একটি মানসিক প্রক্রিয়ার রূপ নেয় তখন তাকে আমরা বলি মনোযোগ। এক কথায় বিশেষ একটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছাটি যখন নিছক ইচ্ছারূপে মনে থাকে তখন সেটি হল আগ্রহ, আর যখন হাজার উদ্দীপকের মধ্যে থেকে ঐ বিশেষ উদ্দীপকটিকে বেছে নিয়ে সেটির প্রতি সাড়া দিই তখন তাকে বলে মনোযোগ। ম্যাকডুগালের ভাষায় আগ্রহ হল সুপ্ত বা নিহিত মনোযোগ এবং মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় অবস্থা।[1]

আমাদের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টির পিছনে থাকতে পারে নানা কারণ, যেমন, জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, কৌতূহল, মনোভাব, অনুকরণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি। যে কোনও কারণের জন্যই আগ্রহ সৃষ্টি হোক না কেন, আগ্রহ একবার সৃষ্টি হলে তা যে একটি শক্তিশালী মানসিক সংগঠন হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগ্রহ কেবলমাত্র ব্যক্তির মনোযোগকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, আগ্রহ ব্যক্তির আচরণধারা, প্রেষণা প্রভৃতি সব কিছুকেই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ

কোন কিছু শিখতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে। পঠনীয় বিষয়টির প্রতি ঠিকমত মনোযোগ দিতে না পারলে সেটি শেখা সম্ভব হয় না। আবার আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধও অঙ্গগত। যা ভিতরে আগ্রহ তাই বাইরে মনোযোগ। অতএব শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্ক যে অতি নিবিড় এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তাহলে একথাও বলা চলতে পারে যে শিক্ষাকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষণীয় বিষয়টির প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে সেটি সর্বাগ্রে দেখতে হবে। এক কথায় শিশুর শিক্ষাকে তার আগ্রহের উপর গড়ে তুলতে হবে। যে শিক্ষায় শিশু আগ্রহ বোধ করে না সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

1. Interest is latent attention and attention is interest in action.—McDougall

এই কারণেই শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলাটা আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান কর্মসূচী। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদ্‌গণ এই নীতির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। জার্মান শিক্ষাবিদ্‌ জোয়ান হার্বার্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ জন ডিউই আগ্রহের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির ঈপ্সিত ক্রমবিকাশের পথে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তার সত্তার এগিয়ে যাওয়ার নামই আগ্রহ। অতএব আগ্রহ হবে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত পথনির্দেশক। তাঁর মতে শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা বলে কোন কথা হতে পারে না। কেননা আগ্রহ হল ব্যক্তির সত্তার বিকাশলাভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, তা বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায় না।

আগ্রহভিত্তিক শিক্ষার প্রকৃত অর্থ

শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করতে হলে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে—এ কথাটির কিন্তু অনেকে ভুল অর্থ করেন। তাঁরা মনে করেন যে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে যা কিছু দুরূহ, কঠিন বা শ্রমসাপেক্ষ তা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে এবং কেবলমাত্র সহজ, রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু দিয়েই শিক্ষাসূচী সংগঠিত হবে। তাঁরা এই কারণে আধুনিক শিক্ষার নীতিকে 'কোমল শিক্ষানীতি'[1] বলে সমালোচনা করেন এবং এই শিক্ষানীতি গ্রহণ করলে শিক্ষার মান অত্যন্ত নীচু হয়ে যাবে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং আগ্রহ কথাটির ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা থেকেই এই ভুল ব্যাখ্যার জন্ম হয়েছে।

শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলার অর্থ এ নয় যে শিক্ষার মানকে নীচু করতে হবে বা শিক্ষাসূচীতে দুরূহ জটিল কোন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। আগ্রহভিত্তিক শিক্ষা বলতে সেই শিক্ষাকে বোঝায় যে শিক্ষায় শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণ করার জন্য শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রচেষ্টা থাকে। শিশুর মধ্যে যদি পাঠগ্রহণের প্রতি যথার্থ আকর্ষণ থাকে তবে সে পাঠ যতই দুরূহ বা কষ্টসাপেক্ষ হোক্‌ না কেন অতি আনন্দের সঙ্গে শিশু তা গ্রহণ করবে, অবশ্য যদি সে পাঠ শিশুর মানসিক সামর্থ্যের অনুপযোগী না হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করার আধুনিক আন্দোলনটি সুপ্রমাণিত মনস্তত্ত্বমূলক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা এই আন্দোলনকে 'কোমল শিক্ষানীতি' বলে সমালোচনা করে থাকেন তাঁরা আসলে এর মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যেখানে মনোযোগ স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছানিরপেক্ষ সেখানে না হয় বলা চলে যে মনোযোগের পিছনে শিশুর আগ্রহ আছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে

1. Soft Pedagogy

শিক্ষাও যে স্বভাবতই আগ্রহের অনুগামী হবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ত আর স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ আসে না। বহু শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী পাঠগ্রহণে স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ দিতে পারে না এবং তাকে জোর করে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা বিষয়বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। সে সকল ক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক বলে বর্ণনা করা যায়?

এর উত্তরে এটুকু বলা যেতে পারে যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও বাহ্যত নীরস পাঠে শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিতে হলে তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয় একথা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সেই পাঠ গ্রহণে তার আগ্রহের অভাব আছে। কিংবা তার মনোযোগ আগ্রহভিত্তিক নয়। বহির্জগতের পরস্পরের প্রতিযোগী অসংখ্য উদ্দীপক থেকে মনোযোগকে সরিয়ে এনে অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় কোন উদ্দীপকের উপর মনোযোগকে নিবদ্ধ করতে হলে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের পিছনে যদি শিক্ষার্থীর সত্যকারের আগ্রহবোধ না থাকে তবে সে মনোযোগ কখনই স্থায়ী হয় না এবং শিক্ষাও কার্যকর হয় না। যখন ক্লাসে শিক্ষার্থী কোনও দুরূহ অর্থনীতি বা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনছে তখন তাকে জোর করে সেই বক্তৃতায় মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে বটে, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির পিছনে নিশ্চয় কাজ করছে ঐ বক্তৃতাটি শোনার সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দৃঢ় বিশ্বাস। একেই আমরা আগ্রহ বলতে পারি। এক কথায় যে বস্তুর শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কোন রকম উপকার হবে বা তার কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মিটবে সেই বস্তুর প্রতিই শিক্ষার্থীর আগ্রহ আছে বলা যায়।

আগ্রহ ও চাহিদা

এই আগ্রহ বা সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতনতার অপর নাম হল চাহিদা বোধ। যে বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদা জন্মায় সেটি পাবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে আগ্রহ দেখা দেয়। প্রাচীন এবং বহু আধুনিক শিক্ষাবিদেরই ধারণা ছিল যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায়। এই বিশ্বাসের বশেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কার দানের প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। শিক্ষক বা পিতামাতারা বিশ্বাস করতেন যে শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে শিশুর মধ্যে আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু এটি একটি বিরাট মনস্তত্ত্বমূলক ভুল। আগ্রহ হল স্বাভাবিক প্রেষণাবোধ। ডিউইর ভাষায় আগ্রহ হল ব্যক্তিসত্তার নিজের বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার স্বতঃপ্রসূত প্রয়াস। অতএব শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় সে আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী, দুর্বল ও কৃত্রিম। তা থেকে স্থায়ী ফল পাবার আশা কখনই করা যেতে পারে না। সেজন্য স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে দেখতে হবে যে শিক্ষণীয় বস্তুটি সম্বন্ধে যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে সত্যকারের চাহিদা

জন্মায়। অর্থাৎ শিক্ষকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত করতে হবে যাতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে তার পূর্ণ সঙ্গতি থাকে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি এতদিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। তার ফলে শিশুর নিজস্ব চাহিদার কাছে শিক্ষার সেই বিষয় ও পদ্ধতি একেবারে অপরিচিত বলে মনে হত এবং শিশু কোনদিনই সেগুলি গ্রহণ করতে আগ্রহ বোধ করত না। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠত শাসনভিত্তিক ও নিপীড়নমূলক।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশমান শিশুর নানা চাহিদাগুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেই চাহিদাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ফলে শিশুর পাঠগ্রহণে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা দেয় এবং অতি সহজে ও স্বল্প আয়াসে শিশু পাঠ শিক্ষা করতে পারে।

মনোযোগের বিস্তার

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে স্মৃতির বিস্তার[1] সীমাবদ্ধ। সেই রকম মনোযোগের বিস্তারেরও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে যে ক'টি দ্রব্য ব্যক্তি নির্ভুলভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এই পরিমাপকে মনোযোগের বিস্তার[2] বা উপলব্ধির বিস্তার[3] বলা হয়।

ট্যাকিসটোস্কোপ[4] নামক যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের বিস্তারের পরিমাপ করা হয়। এই যন্ত্রটিতে ব্যক্তির সামনে কতকগুলি বস্তুর ছবি (যেমন বিন্দু, রেখা, শব্দ, ফুল বা জন্তুর ছবি) মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই বস্তুগুলিকে ঐ অল্প সময়ের জন্য একবার দেখে ব্যক্তিকে বলতে হয় যে সে ক'টি বস্তু দেখেছে। আলোকনের সময়টি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী দু'বার মনোযোগ দেবার সময় না পায়। আলোকিত বস্তুর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় যে সর্বোচ্চ কতসংখ্যক বস্তু ব্যক্তিটি এভাবে একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে নির্ভুলভাবে দেখতে পারে। দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষ ৫টি বা ৬টির বেশী বস্তু একসঙ্গে একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারে না। অতএব এই ৫ বা ৬ হল ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার।

মনোযোগের বিচলন

মনোযোগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এর পরম চঞ্চলতা বা অস্থিরতা। এটি একটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা যে আমাদের মনোযোগ প্রতিনিয়তই এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে সঞ্চালিত হচ্ছে। একটি বস্তুর উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে সেই বস্তু থেকে বার বার মনোযোগ অন্যত্র চলে যাচ্ছে এবং বার বার ফিরে আসছে।

1. পৃঃ ১৩০ 2. Span of Attention 3. Span of Apprehension 4. Tachistoscope

মনোযোগের এই আচরণের নাম দেওয়া হয়েছে বিচলন[1]। আবার দেখা গেছে যে কখনও কখনও দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগ ঘোরাফেরা করে। যেমন, পাশের ঘরে রেডিও চলছে আর আমি নিজের ঘরে একটি বইতে মন দেবার চেষ্টা করছি। দেখা যাবে যে মনোযোগ ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত রেডিও আর বইয়ের মধ্যে আন্দোলিত হতে থাকবে। একে মনোযোগের বিদোলন[2] বলা হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মনোযোগের বিচলনের হার ৫।৬ সেকেণ্ড। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দীপকে ৫।৬ সেকেণ্ডের বেশী আমরা মনোযোগ রাখতে পারি না। স্বভাবতই আপত্তি উঠবে যে সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে আমরা একটি বস্তুতে এর চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারি। যেমন, আমরা একঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে একটি কাজ করতে পারি বা একটি বই পড়তে পারি। এর ব্যাখ্যা হল যে আমরা যখন একটি বইয়ের পাতার উপর মন দিই, আসলে তখন কিন্তু বইটির একটি বিশেষ স্থানে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না। বইটির সমস্ত পাতার মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমাদের মনোযোগ বার বার সঞ্চালিত হয়, যদিও বইপড়া রূপ কাজেই সমস্ত সময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। বস্তুত বৃহৎ আকৃতির কোনও উদ্দীপকে আমাদের মনোযোগ অনেকক্ষণ থাকতে পারে। তার কারণ, ঐ উদ্দীপকটির এক অংশ থেকে আর এক অংশে মনোযোগ ঘোরাফেরা করতে পারে। কিন্তু খুব ছোট উদ্দীপক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মনোযোগ তাতে কখনই ৫।৬ সেকেণ্ডের বেশী নিবদ্ধ থাকতে পারছে না বারবার সরে সরে ঐ উদ্দীপকের বাইরে চলে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে।

মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ

এই জন্য মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয় ক্ষুদ্রতম উদ্দীপক নিয়ে। ক্ষুদ্রতম উদ্দীপক বলতে বোঝায় যে উদ্দীপকটি এত ক্ষুদ্র যে তার চেয়ে ক্ষুদ্র হলে তা আমাদের প্রত্যক্ষণের বাইরে চলে যাবে। যেমন একটি ঘড়ি আমাদের কানের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এমন একটি দূরত্বে রাখা হল যে তার চেয়ে আর একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেই তার টিক্ টিক্ শব্দটি আর শোনাই যাবে না। এখন যদি ঐ দূরত্ব থেকে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটির প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ সেটি শোনা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ একেবারেই শোনা যাচ্ছে না। এর কারণ হল আমাদের মনোযোগের বিচলন। অর্থাৎ ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের উপর আমাদের মনোযোগ কিছুক্ষণ থাকছে আবার কিছুক্ষণ থাকছে না।

আর একটি পরীক্ষণে দৃশ্যমান বস্তুর উপর মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষণে ব্যবহৃত যন্ত্রটির নাম ম্যাসন ডিস্ক ও ম্যাসন ডিস্কটিতে একটি

1. Fluctuation of Attention 2. Oscillation 3. Mason Disc

ইলেকট্রিক মটরের সঙ্গে একটি গোলাকার সাদা চাকা সংলগ্ন থাকে। এই চাকাটির উপর তার কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মোটা ভাঙা ভাঙা সরল কাল রেখা আঁকা থাকে। তার ফলে ঐ কাল রেখাটির মাঝে মাঝে সাদা ফাঁক থাকে। এখন এই চাকাটি যদি ঐ ইলেকট্রিক মটরের সাহায্যে জোরে ঘোরানো যায় তবে ঐ কাল রেখাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তার পরিবর্তে দেখা যাবে কতকগুলি ক্ষীণ ধূসর রঙের ঘূর্ণায়মান বৃত্ত।

আর একটি যন্ত্রের উপর একটি গোলাকার ড্রাম ঘোরে। এই ড্রামটির উপর লাগান থাকে একটি ধূমায়িত[1] কাগজ। এই যন্ত্রটির নাম কিমোগ্রাফ[2]। অভীক্ষার্থীর হাতের কাছে থাকে একটি চাবি এবং এই চাবিটির সঙ্গে একটি ষ্টাইলাস[3] বা লোহার কলম সংযুক্ত থাকে। চাবিটি টিপলে ষ্টাইলাসটি সচল হয়ে ওঠে এবং ঘূর্ণায়মান ধূমায়িত কাগজের উপর দাগ কেটে যায়।

এইবার অভীক্ষার্থীকে ঐ ম্যাসন ডিস্কের উপর ঘূর্ণায়মান যে কোন একটি ধূসর বৃত্তের উপর মনোযোগ দিতে বলা হয়। অভীক্ষার্থী এই চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে যে বৃত্তটি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ পরে আবির্ভূত হচ্ছে। এর কারণ হল যে ঐ ক্ষীণ ধূসর বৃত্তটির উপর তার মনোযোগ কিছুক্ষণের জন্য থাকছে, আবার কিছুক্ষণ থাকছে না। এখন বৃত্তটির আবির্ভাবের সময় ষ্টাইলাসটি টিপে এবং অদৃশ্য হবার সময় সেটি ছেড়ে দিয়ে অভীক্ষার্থী বৃত্তটির আবির্ভাব ও অদৃশ্যভবনের একটি নিখুঁত রেখাচিত্র ঐ কিমোগ্রাফটির উপর এঁকে ফেলতে পারে। ঐ বৃত্তটির আবির্ভাব ও অদৃশ্যভবনের হার থেকেই ব্যক্তির মনোযোগের বিচলনের হিসাব করা হয়ে থাকে।

মনোযোগের বিচলনের এই পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই ধরনের ক্ষুদ্রতম চাক্ষুষ উদ্দীপকে ব্যক্তির মনোযোগ ৫ ৬ সেকেন্ডের বেশী নিবদ্ধ থাকে না।

মনোযোগের বিভাজন

অনেকের ধারণা মনোযোগকে ভাগ[4] করে দুটি বা তার বেশী উদ্দীপকের উপর একই সময়ে প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ অবিভাজ্য। তবে সার্কাসে দেখা যায় যে খেলোয়াড়রা একই সঙ্গে হাত, পা, মুখ দিয়ে তিন চারটি বিভিন্ন কাজ করছে। জুলিয়াস সিজার নাকি একসঙ্গে চারটি চিঠি আবৃত্তি করে যেতেন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চমটি নিজে লিখতে পারতেন। মাইকেল মধুসূদন একই সঙ্গে দু'তিন খানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন ইত্যাদি। মনোযোগ বিভাজনের এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও বহু ক্ষেত্রে আমরা একাধিক কাজ এক সঙ্গে সমাধান করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এগুলির দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত সার্কাসের খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন

1. Smoked 2. Kymograph 3. Stylus 4. Division

কাজগুলি এমন একটি যান্ত্রিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যাঁর ফলে সেগুলি সম্পন্ন করতে তার আর মনোযোগ প্রয়োজন হয় না। সে যদি চারটি কাজ একসঙ্গে করে তবে বুঝতে হবে যে তার তিনটি কাজ যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। আর একটির জন্য তার মনোযোগের প্রয়োজন হচ্ছে।

জুলিয়াস সিজার, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির ক্ষেত্রগুলি কিন্তু মনোযোগের দ্রুত বিদোলনের দৃষ্টান্ত। এঁরা মনোযোগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে মনোযোগকে তাঁরা প্রয়োজন মত সঞ্চালিত করে সব কাজগুলিই একসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ

মনোযোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জানা গেল তা থেকে আমরা মনোযোগের নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে পারি। যাঁরা প্রায়ই মনোযোগের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করেন তাঁরা নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করলে উপকৃত হতে পারেন।

মনোযোগের বিকর্ষক

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোযোগের অভাব ঘটা বা মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মূলে আছে নানা ধরনের বিকর্ষক। মনোযোগকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এই বিকর্ষকগুলি দূর করতে হবে সর্বাগ্রে। কারও কারও ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বিকর্ষক থাকে যেমন, বিশেষ কোনও সমস্যা বা দুশ্চিন্তা, বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। প্রয়োজন হলে যে পরিবেশে বিকর্ষক থাকে সেই পরিবেশ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর যদি বিকর্ষককে পরিবেশ থেকে দূর করা সম্ভব না হয় তবে সেই বিকর্ষকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যেমন, বাড়ীর পাশের কারখানায় হাতুড়ির আওয়াজ বা পাশের বাড়ীর কাঁদুনে ছেলের একঘেয়ে চীৎকার প্রভৃতি বিষয়গুলিকে যখন দূর করা সম্ভব নয় তখন সেগুলিকে অগ্রাহ্য করার অভ্যাস করে নিতে হবে। তবে বিকর্ষকের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে বিকর্ষককে এড়িয়ে যাওয়া ভাল, বিশেষ করে করে যদি বিকর্ষকটি শক্তিশালী হয়। কেননা শক্তিশালী বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে।

দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসিত সমস্যা মনোযোগের বিকর্ষণের একটি বড় কারণ। এই জন্যই অল্পবয়স্কদের অপেক্ষা বয়স্কদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। মনোযোগ দিতে হলে এই ধরনের বিকর্ষণকারী সমস্যাগুলির একটি সাময়িক সমাধান পূর্বাহ্নে করে নিতে হবে।

অতৃপ্ত বাসনাও একটি বড় বিকর্ষক। যেমন, পড়তে বসলে ঘুরে বেড়ানো, গল্প করা, সিনেমায় যাওয়া প্রভৃতি বাসনাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে মনোযোগের বিচলন ঘটে। অতএব পড়ায় মনোযোগ দিতে বসার আগে নিজের মনের সঙ্গে একটা

বোঝাপড়া করে নিতে হবে। এ ধরনের দুটি বা তার বেশী চাহিদা থাকলে সেগুলির মধ্যে কোন্‌ চাহিদাটির আগে তৃপ্তি হওয়া দরকার সেটা প্রথমে স্থির করে নিতে হবে এবং তারপর সেই চাহিদাটিতে মনোযোগ দিতে হবে।

মনোযোগের সবচেয়ে বড় কথা হল প্রেষণার বোধ। যে বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ আসতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় যে ব্যক্তির সত্যকারের চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বিষয়বস্তুর কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকার ফলে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে বৃত্তি অনুসরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল বা অপ্রীতিকর বৃত্তি নির্বাচন করার জন্য মন দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন ব্যক্তির চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী বৃত্তির নির্বাচন। আর দ্বিতীয়ত যদি ঘটনাচক্রে বা বাধ্য হয়েই কোন অনুপযোগী বৃত্তির নির্বাচন করা হয়ে থাকে তবে তাকে অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকে তার নিজের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। তখন দেখা যাবে তার পক্ষে ঐ বৃত্তিতে মনোযোগ দিতে আর অসুবিধা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও প্রথমে দরকার মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া।

মনোযোগ দেবার আর একটি ভাল উপায় হল পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত কাজ করা। যার কাজের মধ্যে যত ভাল পরিকল্পনা এবং শৃঙ্খলা আছে তার পক্ষে কাজে মনোযোগ দেওয়াও তত সহজ।

অনুশীলনী

১। মনোযোগের স্বরূপ কি? ইহার বিভিন্ন নির্ধারক বা সর্তগুলি বর্ণনা কর। মনোযোগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণ দাও।

২। আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে কি সম্পর্ক? কিভাবে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেশী মনোযোগী করে তোলা যায়?

৩। মনোযোগের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নির্ধারক বা সর্তগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং উদাহরণ সহযোগে এগুলির শিক্ষামূলক উপযোগিতা বর্ণনা কর।

৪। উদাহরণের সাহায্যে আগ্রহ ও মনোযোগের সম্পর্কটি বর্ণনা কর।

৫। মনোযোগের বিস্তার কাকে বলে? কিভাবে মনোযোগের বিস্তার পরিমাপ করা যায়?

৬। মনোযোগের বিচলন বলতে কি বোঝায়? কিভাবে এই বিচলন পরিমাপ করা যায়?

৭। মনোযোগের বিকর্ষক কাকে বলে? কি ভাবে মনোযোগের বিকর্ষণ কমানো যায়?

৮। মনোযোগকে নির্বাচনধর্মী আচরণ বলা হয় কেন?

৯। ইচ্ছা-প্রসূত মনোযোগ কাকে বলে?

১০। স্বতঃপ্রবৃত্ত মনোযোগ বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও?

১১। মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক বর্ণনা কর।

১২। ক'টি বস্তুর প্রতি আমরা একই সঙ্গে মনোযোগ দিতে পারি?

১৩। মনোযোগের বিভিন্ন শ্রেণীগুলি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

স্নায়ুতন্ত্র

প্রাণীর প্রত্যেকটা আচরণই হল পারিবেশিক উদ্দীপনার উত্তরে দেওয়া তার সাড়া বা প্রতিক্রিয়া[1]। পরিবেশের যে সব শক্তি আমাদের কাছ থেকে এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করতে পারে সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে উদ্দীপক[2]। উদ্দীপকের কাছ থেকে প্রাণী তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং সেজন্য এগুলির নাম হল গ্রহণেন্দ্রিয়[3]। এই গ্রহণেন্দ্রিয়গুলি আবার সেই উদ্দীপনা পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে এবং প্রাণী তার উত্তরে পেশী, গ্রন্থি, অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে নানা আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। শেষোক্ত দেহযন্ত্রগুলিকে এইজন্য বলা হয় কর্মেন্দ্রিয়[4]।

অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন

কিন্তু উদ্দীপকের ক্রিয়া ও প্রাণীর প্রতিক্রিয়া, এ দুয়ের মাঝখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে। আমরা এটিকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের[5] স্তর বলতে পারি। এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নই প্রাণীর আচরণের প্রকৃতির নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যখন প্রাণী কোন একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখন তার মধ্যে নীচের স্তরগুলি পর পর সংঘটিত হয়। যথা—

উদ্দীপকের ক্রিয়া→→অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন→→প্রাণীর প্রতিক্রিয়া

এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সম্পন্ন করে যে যন্ত্রসমষ্টি তার নাম দেওয়া হয়েছে স্নায়ুতন্ত্র[6]। কোন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কেমন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে স্থির রাখতে হবে, কেমন করে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলিকে সংগঠিত করতে হবে ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করতে প্রাণীকে সমর্থ করে তার স্নায়ুতন্ত্র। যে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র যত উন্নত তার অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটিও তত সুষ্ঠু হয়। এই জন্যই উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী প্রাণীর আচরণ বিশেষধর্মী, সুসংহত এবং উদ্দীপকের উপযোগী হতে পারে। তার সঙ্গতিবিধানের উৎকর্ষও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে জীবনযুদ্ধে টিঁকে থাকার সম্ভাবনাও তার প্রচুর বেড়ে যায়।

স্নায়ুপথ

যখন একটি উদ্দীপক প্রাণীর কোন গ্রহণেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে তখন যে পথের

1. Response 2. Stimulus 3. Receptor 4. Effector 5. Internal Integration 6. Nervous System

মাধ্যমে তার গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে স্নায়ু[1] বলা হয়। স্নায়ুপথ বেয়ে অতি দ্রুতবেগে (মিনিটে প্রায় ৪ মাইল) উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে পেঁছয় এবং তার ফলে প্রাণীর আচরণ সংঘটিত হয়। কিন্তু গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে এই স্নায়ু সংযোগ সরাসরি ঘটে না। এই দুয়ের মধ্যে সংযোগের কেন্দ্ররূপে কাজ করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। সমস্ত স্নায়ুগুলিই হয় মস্তিষ্ক নয় মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে জন্মলাভ করে মস্তিষ্কে পেঁছয় এবং সেখান থেকে উপযুক্ত কর্মেন্দ্রিয়ে পুনরায় প্রেরিত হয় ও তারই ফলে অভীষ্ট আচরণটি সংঘটিত হয়। যেমন আমাকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। এখানে প্রথমে আমার কানের (গ্রহণেন্দ্রিয়) মধ্যে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করল এবং তাই থেকে সঞ্জাত উদ্দীপনা স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে পেঁছল। তার পর মস্তিষ্ক থেকে বিশেষ নির্দেশ নিয়ে উদ্দীপনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে পেঁছল আমার ঘাড়ের মাংসপেশীতে (কর্মেন্দ্রিয়) এবং তারই ফলে আমি মাথাটি ঘোরালাম। যে স্নায়ুগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়, সেগুলির নাম সংবেদক[2] বা অন্তর্মুখী[3] স্নায়ু এবং যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক থেকে কর্মেন্দ্রিয়তে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় সেগুলিকে প্রচেষ্টক[4] বা বহির্মুখী[5] স্নায়ু নাম দেওয়া হয়েছে।

স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তন

বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী ছিল অত্যন্ত সরল। এককোষী প্রাণীদের কোনরূপ স্নায়ুমণ্ডলীই ছিল না। কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চালন ঘটত। কিন্তু এই সঞ্চালন ছিল অত্যন্ত অসংযত ও নানা দিকে বিস্তৃত, কোন নির্দিষ্ট দিকের অভিমুখী বা কোনও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার প্রতি উদ্দিষ্ট ছিল না। অর্থাৎ এক কথায় সে সময় কোন বিশেষ উদ্দীপকের কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া ছিল না। তারপর প্রাণীদেহে দেখা দিল পেশী এবং এগুলি ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। তখন পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রের আবির্ভাব হয়নি। এর পরের স্তরে সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু দেখা দিল। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে বেরিয়ে পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত হল এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে সরাসরি উদ্দীপনা পেশীতে বহন করে নিয়ে যেত। এই স্নায়ুতন্তুর আবির্ভাবকে স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের প্রথম সোপান বলে বর্ণনা করা যায়।

স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের এই প্রাথমিক স্তরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক ধরনের স্নায়ুজাল[6] দেখা দিয়েছিল। পেশীগুলি এই তন্তুজালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা এসে পেঁছত এই স্নায়ুজালে এবং তার ফলে দেহের

1. Nerve 2. Sensory 3. Afferent 4. Motor 5. Efferent 6. Nerve Net

বিভিন্ন পেশীগুলি সক্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিশেষ কোন উদ্দীপনার উত্তরে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাড়া দেওয়া সম্ভব হত না, কেন না সকল উদ্দীপনাই স্নায়ুজালের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত এবং যে কোন ধরনের উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া রূপে দেহের সমস্ত পেশীগুলিই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠত।

কিন্তু উন্নত স্নায়ুতন্ত্রে এই অনির্দিষ্ট বা লক্ষ্যহীন প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে না। সেখানে একটি বিশেষ উদ্দীপনাকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা জেলিফিসের গায়ে গরম কিছু ঠেকলে তার সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের হাতে বা পায়ে গরম কিছু ঠেকলে আমরা হাত বা পা-টাই সরিয়ে নেব, জেলিফিসের মত সমস্ত শরীরটা সরিয়ে নেব না।

স্নায়ুজালের পরের স্তরে দেখা দেয় আধুনিক ও উন্নত স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা বিশেষধর্মী প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব। অর্থাৎ এর দ্বারা বিশেষ উদ্দীপনাকে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাড়া দেওয়া যায়। উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই সুনির্দিষ্ট ও উদ্দীপক-উপযোগী আচরণ করা সম্ভব হয়েছে।

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিলতম। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় সমন্বয়নের ব্যবস্থা। এখানে উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে সরাসরি যায় না, মধ্যবর্তী একটি সমন্বয়ন কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে সংযোগটা স্থাপিত হয়। এই সমন্বয়ন কেন্দ্রটিই হল মস্তিষ্ক এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডও এই সমন্বয়নের কার্জটি সম্পন্ন করে থাকে।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন

আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর সান্নিকর্ষমূলক[1] প্রকৃতি। এটি বুঝতে হলে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনটি ভাল করে জানা দরকার।

স্নায়ুতন্ত্র বলতে বোঝায় ছোট বড় স্নায়ুতন্তুর একটি একত্রিত সমষ্টি। স্নায়ুতন্তুগুলি কেন্দ্রীয় সমন্বয়নস্থল অর্থাৎ মস্তিষ্ক কিংবা মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্তু আবার কতকগুলি অনুতন্তুর সমষ্টি এবং টেলিফোনের তারের মত উপরে একটি আবরণের দ্বারা ঢাকা।

নিউরনের গঠন

স্নায়ুতন্ত্রের একক বলে যে বস্তুটিকে ধরা হয়েছে তার নাম নিউরন।[2] ডোনাল্ডসনের হিসাবে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে ২ বিলিয়ন (২ শত কোটি) নিউরন আছে এবং এদের পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমেই দেহযন্ত্রের সমস্ত কাজ চলে।

---

1. Synaptic 2. Neuron

এক একটি নিউরন অতি সূক্ষ্ম আকৃতির এবং এর মধ্যে আছে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি। যথা—

কোষদেহ

নিউরনের মধ্যে আছে একটি কোষদেহ বা সেল বডি[1] যেখান থেকে নিউরনের কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এটির মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম[2] নামক এক প্রকার তরল পদার্থ এবং এটিই হল প্রাণীর জীবনীশক্তির মূল ধারক।

স্নায়ুকেন্দ্র

নিউরনের এই কোষদেহের কেন্দ্রে আছে স্নায়ুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস[3]। প্রতিটি স্নায়ুকোষের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি এই স্নায়ুকেন্দ্রের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।
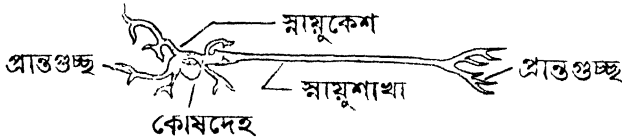
[একটি নিউরনের ছবি। একদিকে স্নায়ুকেশ, আর একদিকে স্নায়ুশাখা। আর মধ্যে হল কোষদেহ। স্নায়ুকেশ ও স্নায়ুশাখা উভয়েরই শেষে রয়েছে প্রান্তগুচ্ছ।]

স্নায়ুশাখা

প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে স্নায়ুশাখা বা এ্যাকসন[4] আছে। এগুলি সময় সময় বেশ লম্বা হয়। এই স্নায়ুশাখার মধ্যে দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা অন্য কোন নিউরনে বা কোন কর্মেন্দ্রিয়ে প্রবাহিত হয়।

স্নায়ুকেশ

কোষদেহের এক দিকে যেমন থাকে স্নায়ুশাখা তেমনই অপর দিকে থাকে স্নায়ুকেশ বা ডেনড্রাইট[5]। স্নায়ুকেশগুলি অন্য নিউরন বা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠিয়ে দেয়।

প্রান্তগুচ্ছ

প্রত্যেক স্নায়ুশাখা বা স্নায়ুকেশের শেষ প্রান্তে আছে প্রান্তগুচ্ছ বা এনড্ ব্রাস[6]। এগুলির মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত বা প্রেরিত হয়।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের এক অংশ থেকে অপর অংশে উদ্দীপনা-সঞ্চালনের পথ রূপে কাজ করে। একটি নিউরনের

1. Cell Body 2. Protoplasm 3. Nucleus 4. Axon 5. Dendrite
6. End Brush

কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা স্নায়ুশাখা বেয়ে প্রান্তগুচ্ছে পেঁছিয়। সেখান থেকে তার সংলগ্ন আর একটি নিউরনের স্নায়ুকেশে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় এবং সেখান থেকে উদ্দীপনা সেই দ্বিতীয় নিউরনটির কোষদেহে গিয়ে পেঁছিয়। সেখান থেকে আবার উদ্দীপনা সেই নিউরনটির স্নায়ুশাখা বেয়ে অপর আর একটি নিউরনে প্রবাহিত হয়। এই ভাবে উদ্দীপনা এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয়ে শরীরের যে কোন অংশে গিয়ে পেঁছিতে পারে।

সন্নিকর্ষ

আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এটি প্রকৃতিতে সন্নিকর্ষমূলক। এর অর্থ হল যে যদিও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হতে পারে, তবু তাদের মধ্যে কোন প্রকৃত অঙ্গগত যোগাযোগ নেই। একটি নিউরনের নির্গমন মুখ অর্থাৎ স্নায়ুশাখা এবং অপর একটি নিউরনের গ্রহণমুখ অর্থাৎ স্নায়ুকেশ পাশাপাশি খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। অথচ তারা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে না। তার ফলে একটি নিউরনের স্নায়ুশাখা থেকে অপর একটি নিউরনের স্নায়ুকেশে যখন যেতে হয় তখন উদ্দীপনাকে মাঝের ফাঁকটুকু একপ্রকার লাফ দিয়ে পার হতে হয়। দুটি নিউরনের মাঝের এই যে ফাঁক বা ব্যবধান তাকে সন্নিকর্ষ বা সাইনাপ্‌স্‌[1] বলে এবং এই ধরনের স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে সন্নিকর্ষমূলক স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়।

বলা বাহুল্য এই সন্নিকর্ষমূলক সংগঠন উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্নায়ুগুলি যদি টেলিফোনের তারের মত অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড হত তাহলে
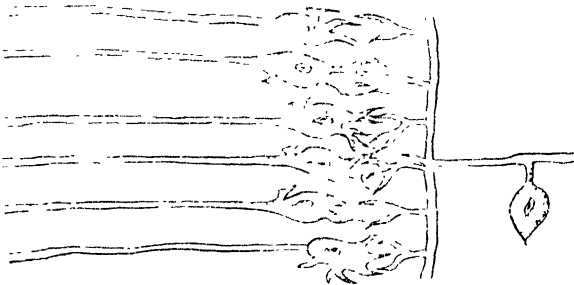
[এখানে একটি সংবেদক নিউরন থেকে একাধিক প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা পরিচালিত হচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে মধ্যবর্তী ব্যবধান বা সন্নিকর্ষের জন্যই।]

সেগুলির কাজের মধ্যে কোনও রকম পরিবর্তনশীলতা থাকত না। মানব আচরণের অসীম বৈচিত্র্যের মূলেই আছে স্নায়ুতন্ত্রের এই সন্নিকর্ষমূলক বৈশিষ্ট্য।

1. Synapse

এই ধরনের সন্নিকর্ষমূলক সংগঠনের বড় উপযোগিতা হল যে, নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে উদ্দীপনার এক নিউরন থেকে অপর নিউরনে যাওয়ার কাজটি কোন চিরনির্দিষ্ট পন্থায় বা যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ উদ্দীপনার কোন একটি বিশেষ নিউরনে যাওয়া না যাওয়াটা নির্ভর করে এই সন্নিকর্ষের উপর। অনেক সময় কোন উদ্দীপনা সন্নিকর্ষে বাধা পেয়ে আর নাও এগোতে পারে। আবার কখনও কখনও অনেকগুলি নিউরন একত্রিত হয়ে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চালনকে সাহায্য করতে বা বাধা দিতেও পারে। আবার কখনও সন্নিকর্ষ একটি উদ্দীপনাকে তার নির্দিষ্ট পথের পরিবর্তন ঘটিয়ে আর এক পথে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়া সন্নিকর্ষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এক নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে হয় উদ্দীপনা সম্পূর্ণ পরিবাহিত হবে, নয় একবারে কিছুই হবে না, মাঝামাঝি মাত্রার বা পরিমাণের কোন সঞ্চালন ঘটার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আংশিক বা হ্রাসপ্রাপ্ত রূপে উদ্দীপনা কখনও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয় না। একে সন্নিকর্ষের 'সম্পূর্ণ বা একেবারে নয়'[1]-র তত্ত্ব বলে বর্ণনা করা হয়।

তাছাড়া নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে আর একটি বড় সুবিধা যে উদ্দীপনা একটিমাত্র নিউরন থেকে একের বেশী নিউরনে বা অনেকগুলি নিউরন থেকে একটি মাত্র নিউরনে একই সময়ে সঞ্চালিত হতে পারে। কেননা প্রত্যেকটি নিউরনের এক্সনের প্রান্তগুচ্ছগুলির কাছেই রয়েছে আরও অনেকগুলি নিউরনের ডেনড্রাইটের কেশগুচ্ছ। ফলে উদ্দীপনাটি স্নায়ুকেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনবোধে একটি বা একাধিক নিউরনে পরিবাহিত হতে পারে। আবার ঠিক একইভাবে অনেকগুলির নিউরনের উদ্দীপনা একই সংগে একত্রিত হয়ে একটি মাত্র নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে।[2]

নিউরনের শ্রেণীবিভাগ

নিউরনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(১) সংবেদক বা অন্তর্মুখী নিউরন। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা নিয়ে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে পেঁছে দেয়, (২) প্রচেষ্টক বা বহির্মুখী নিউরন। এগুলি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা বহন করে কর্মেন্দ্রিয়ে পেঁছে দেয় এবং (৩) অনুষঙ্গ[3] বা সঙ্গতিসাধক[4] নিউরন। এগুলি কেবলমাত্র মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে পাওয়া যায় এবং এগুলির একমাত্র কাজ হল সংবেদক এবং প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে অবস্থিত থেকে তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করা।

---

1. Theory of All-or-None 2. পৃঃ ১৫২ ও পৃঃ ১৫৪ (চিত্র) 3. Association
4. Adjustor

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের প্রক্রিয়াটি নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঘটে থাকে। প্রথমে উদ্দীপক থেকে প্রসূত উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয়ের
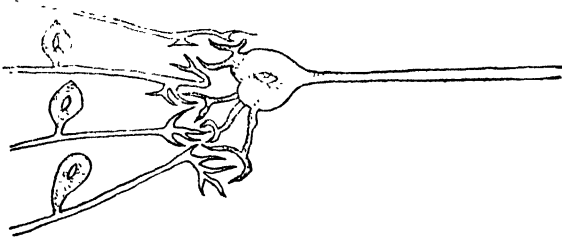
[এখানে সন্নিকর্ষের জন্যই একাধিক সংবেদক নিউরন থেকে একটি প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হচ্ছে]

মাধ্যমে সংবেদক বা অন্তর্মুখী স্নায়ু বেয়ে গিয়ে পেঁছিয় মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে, সেখানে সঙ্গতিসাধক বা অনুষঙ্গ নিউরনের মাধ্যমে উদ্দীপনা প্রচেষ্টক বা বহির্মুখী
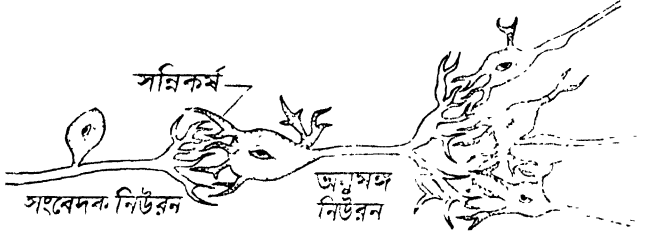
[সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে স্নায়ু-উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছলে সেখান থেকে প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা পরিচালিত হয়। এই পরিচালনা ঘটে মধ্যবর্তী অনুষঙ্গ নিউরন বা সঙ্গতিসাধক নিউরনের মাধ্যমে।]

স্নায়ুতে সঞ্চালিত হয়। সেখান থেকে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে এবং তার ফলে কর্মেন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে যে সমন্বয়সাধনের কাজটি ঘটে সেটির উপরই আচরণের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নির্ভর করে। যেমন, আমায় কেউ ডাকলে আমি তার দিকে তাকাব, না সাড়া দেব, কি দেব না, বা কি ধরনের সাড়া দেব—এ সবই নির্ভর করছে সংবেদক ও প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের সঙ্গতিসাধক নিউরনগুলি কি ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে তার উপর।

রিফ্লেক্স ও তার কার্যপ্রণালী

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের এই প্রতিক্রিয়াটি পূর্ব-নির্ধারিত এবং একপ্রকার সুনির্দিষ্ট করাই থাকে। এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রকারের উদ্দীপনা সৃষ্টি হলে বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই সংঘটিত হয়। যেমন,
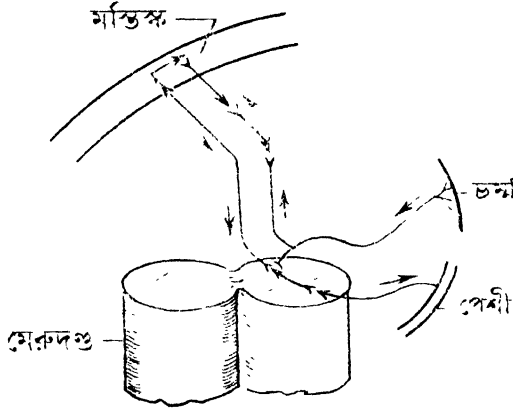
[এই ছবিতে দু'শ্রেণীর সমন্বয়নের কাজ দেখান হয়েছে। দেহের চর্ম থেকে উদ্দীপনা সমন্বয়নের মাধ্যমে পেশীতে পৌঁছচ্ছে। প্রথম সমন্বয়নটি ঘটছে মস্তিষ্কের মাধ্যমে এবং সেজন্য এটি উন্নতপ্রকৃতির এবং দ্বিতীয় সমন্বয়নটি ঘটছে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে এবং সেজন্য এটি অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রকৃতির। মেরুদণ্ডের মাধ্যমে সমন্বয়নের পথটিকে রিফ্লেক্স আর্ক বলা হয়]

আগুনে হাত পড়লে হাতটা তৎক্ষণাৎ সরে আসবে। চোখের মধ্যে কিছু ঢোকার উপক্রম হলে চোখ নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যাবে, ইত্যাদি। এই আচরণগুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সরলতম এবং আগে থেকেই স্থিরীকৃত থাকে। এই ধরনের আচরণকে রিফ্লেক্স বলা হয়।[1]

রিফ্লেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ। সময় সময় বিশেষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনরূপ সচেতন প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বতঃসঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্লেক্স[2] বলে। যেমন চোখের মধ্যে কোন ধুলো বা বালি ঢোকার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনা-আপনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিল্লিতে কিছু ঢুকলে হাঁচি হয়। শ্বাসনালীতে খাদ্যকণা ঢুকলে বিষম লাগে। এই সব জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আমাদের কোনরূপ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এ কাজগুলি দেহযন্ত্র স্বতঃ-

1. Reflex (পৃঃ ৩০—পৃঃ ৩১ দ্রষ্টব্য)

প্রণোদিতভাবে সম্পন্ন করে। হাই তোলা, বমি করা, কাশা প্রভৃতি কাজগুলিও রিফ্লেক্সের উদাহরণ। এর সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা বিশেষ। হাঁটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা'টি সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম 'হাঁটু-ঝাঁকানি' রিফ্লেক্স। অধিকাংশ গ্রন্থির রস-নিঃসরণও এক প্রকারের রিফ্লেক্স। যেমন, জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম বেরোন ইত্যাদি।

রিফ্লেক্সও অন্যান্য আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে অন্যান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণটি দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে সমন্বয়নের কাজটি মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না। মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আচরণটি নিজে নিজেই অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথের মধ্যে সহজতম ও সরলতম সমন্বয় পথটির নাম রিফ্লেক্স আর্ক[1]। এই সংযোগের প্রকৃতিটি পূর্ব-নির্ধারিত থাকে বলেই রিফ্লেক্স আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই এবং সেটি যান্ত্রিক ও পূর্বনির্দিষ্ট। সাধারণ ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স আচরণে মস্তিষ্কের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না বটে, কিন্তু কোন কোন রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মস্তিষ্ক হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং আচরণের প্রকৃতিকেও পরিবর্তিত করতে পারে। যেমন আগুনে হাত পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়া একটি রিফ্লেক্স আচরণ, কিন্তু মস্তিষ্ক ইচ্ছা করলে হাত সরিয়ে না নিতেও পারে। কিন্তু খাদ্য দেখলে লালাক্ষরণ হওয়া একটা রিফ্লেক্স এবং মস্তিষ্কের সেখানে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই।

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

যদিও আমাদের স্নায়ুতন্ত্রটি একটি সুসংবদ্ধ একক যন্ত্ররূপে কাজ করে তবু কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী এটির কয়েকটি প্রধান বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র[2]। এতে আছে মস্তিষ্ক

1. Reflex Arc পৃঃ ১৫৫ (চিত্র দ্রষ্টব্য) 2. Central Nervous System

ও মেরুদণ্ড। সাধারণত রিফ্লেক্স জাতীয় সরল সমন্বয়নের কাজগুলি সংঘটিত হয় মেরুদণ্ডে এবং উচ্চস্তরের সমন্বয়নের কাজগুলি সাধিত হয় মস্তিষ্কে।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র

দ্বিতীয় বিভাগটির নাম হল প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র[1]। এই বিভাগের মধ্যে পড়ে সেই সকল স্নায়ুতন্ত্র যেগুলি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলির মধ্যে ৩১ জোড়া স্নায়ুতন্ত্র বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকে এবং ১২ জোড়া মস্তিষ্ক থেকে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র

তৃতীয় বিভাগটির নাম হল স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র[2]। এই বিভাগটি মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র প্রভৃতি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। কোন প্রক্ষোভের জাগরণ ও সক্রিয়তার সময় এই অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে। সমস্ত প্রক্ষোভমূলক আচরণের পেছনেই আছে এই বিশেষ স্নায়ুতন্ত্রের সক্রিয়তা। অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের আবার দুটি বিভাগ আছে, সিম্‌প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক।

মস্তিষ্ক

অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের[3] ভূমিকা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সকল রকম আচরণের চরম নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্কের সমন্বয়সাধক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রাণীজাতির উন্নতির একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে মস্তিষ্কের আকৃতির ক্রমবৃদ্ধি। প্রাণী যত উন্নত হচ্ছে ততই তার মস্তিষ্কের আকৃতি বাড়ছে। অবশ্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক যে সব চেয়ে বড় তা নয়। হাতি এবং তিমি মাছের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড়। মানুষের মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় ১ সের, হাতির ৬ সের এবং তিমির ৫ সের। কিন্তু দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের অনুপাত বিচার করলে মানুষের মস্তিষ্কই সব চেয়ে বড়। যেমন, তিমি মাছের দেহ ও মস্তিষ্কের অনুপাত হল ১০০০০ : ১, হাতির ৫০০ : ১ এবং মানুষের হল ৫০ : ১।

1. Peripheral Nervous System 2. Autonomic Nervous System 3. Brain

মাছ থেকে মানুষ ঃ মস্তিষ্কের ক্রম-বিবর্তন
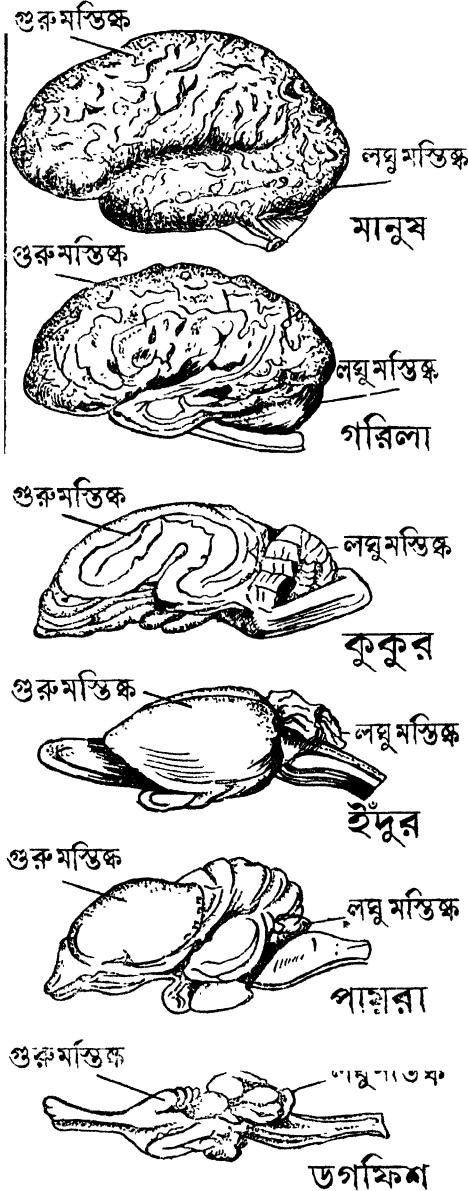
[বিবর্তনের ফলে প্রাণী যত উন্নত হতে থাকে গুরুমস্তিষ্কের আয়তন লঘু মস্তিষ্কের আয়তনের তুলনায় ততই বড় হতে থাকে ।]

মস্তিষ্কের সঙ্গে মেরুদণ্ডের অনুপাতও প্রাণীর অগ্রগতির একটা বড় লক্ষণ। একটা ব্যাঙের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ওজনের সমান, বাঁদরের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ১৫ গুণ। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ৫৫ গুণ বড়।

শরীরের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তিষ্কের কাজ সব চেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত গ্রহণেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্যান্য দেহাংশের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজ করছে মস্তিষ্ক। ফলে প্রাণীর দেহ যত আকৃতিতে বড় হতে থাকে ততই মস্তিষ্কের উপর কাজের চাপ বাড়তে থাকে। এইজন্যই দেহের অনুপাতে মস্তিষ্কের আয়তনের উপর প্রাণীর উন্নত কাজের ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে।

মানুষেরও মস্তিষ্ক প্রথম প্রথম ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু যতই পরিবেশ জটিলতর হতে থাকে ততই মানুষকে বাধ্য হয়ে চিন্তন, বিচার-করণ, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি উন্নত জটিল প্রকৃতির কাজগুলি করতে হয় এবং ফলে ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্ক আয়তনে বাড়তে থাকে।

মস্তিষ্ক আধারের[1] সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে এই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতিটি সরলপথে এবং অবাধে বাড়তে পারে না এবং তার ফলে নানা স্থানে তার গায়ে ভাঁজ পড়তে থাকে। তার ফলেই মানুষের মস্তিষ্ক বহু ভাঁজ এবং গভীর বলিরেখায় পূর্ণ।

কিন্তু কেবল আয়তনে বাড়াটাই মস্তিষ্কের উৎকর্ষের লক্ষণ নয়। জটিল উন্নত ধরনের সমন্বয়ন সাধনের ক্ষমতাই মস্তিষ্কের উৎকৃষ্টতার প্রকৃত পরিচায়ক। নিম্নশ্রেণীর অনেক প্রাণীর যথেষ্ট বড় মস্তিষ্ক থাকা সত্ত্বেও তাদের মস্তিষ্ক কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরের পূর্বনির্দিষ্ট যান্ত্রিক সমন্বয়নের কাজগুলিই করতে পারে। ফলে তাদের মস্তিষ্ক আয়তনে বড় হলেও সেগুলির কার্যকারিতা উচ্চ স্তরের নয় এবং তাদের পক্ষে কোন উন্নত আচরণ করা সম্ভব হয় না। যেমন দেখা যায় হাতি বা তিমি মাছের ক্ষেত্রে।

গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্ক

কিন্তু মানুষ এবং কিছু কিছু উন্নত প্রাণীর মধ্যে উচ্চ ও জটিল ধরনের সঙ্গতিবিধানের কাজ করার উপযোগী মস্তিষ্ক গড়ে উঠেছে এবং তার জন্যই তারা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান। মস্তিষ্কের যে অংশটুকু এই উন্নত সঙ্গতিবিধানের কাজের উপযোগী তাকে নতুন মস্তিষ্ক[2] বলা হয়। এই অংশটি গুরুমস্তিষ্ক[3] নামে পরিচিত। যে অংশটুকু প্রধানত দৈহিক সঙ্গতিবিধানের কাজ করে থাকে তাকে বলা হয় পুরানো মস্তিষ্ক। এই অংশটুকুর নাম লঘুমস্তিষ্ক[4]। ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাণী যত উন্নত হতে থাকে ততই তার গুরুমস্তিষ্কের আয়তন লঘুমস্তিষ্কের আয়তনের চেয়ে বড় হতে দেখা যায়।[5]

গুরুমস্তিষ্ক সমগ্র মস্তিষ্ক সংগঠনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। মস্তিষ্ক-আধারের সীমাবদ্ধ অপরিসর স্থানের মধ্যে গুরুমস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এর গায়ে অসংখ্য ভাঁজ[6] এবং ফাটল[7] দেখা দিয়েছে।[8] গুরুমস্তিষ্কের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল বহিঃপ্রদেশটি, যার নাম দেওয়া হয়েছে মস্তিষ্ক আস্তরণ[9]। এই আস্তরণে কোটি কোটি স্নায়ু আছে। এগুলি দেখতে ধূসর বর্ণের। উন্নত সমন্বয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন সঙ্গতিসাধক নিউরনগুলি থাকে এখানেই। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্ক-আস্তরণ অতি সরল বলে তারা জটিল মানসিক কাজ করতে পারে না। মানুষের মস্তিষ্ক-আস্তরণ জটিল, অসংখ্য ভাঁজসম্পন্ন এবং তার ফলেই তার পক্ষে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়েছে।

গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুটি ফাটলের নাম রোলাণ্ডো ফাটল[10] এবং সিলভিয়াস

1. Skull 2. New Brain 3. Cerebrum 4. Cerebellum 5. পৃঃ ১৫৮ (চিত্র) 6. Convolution 7. Fissure 8. পৃঃ ১৬০ (চিত্র) 9. Cerebral Cortex 10. Fissure of Relando

ফাটল[1]। এ দুটি ফাটল সমগ্র গুরুমস্তিষ্কটিকে চারটি ভাগে ভাগ করে।
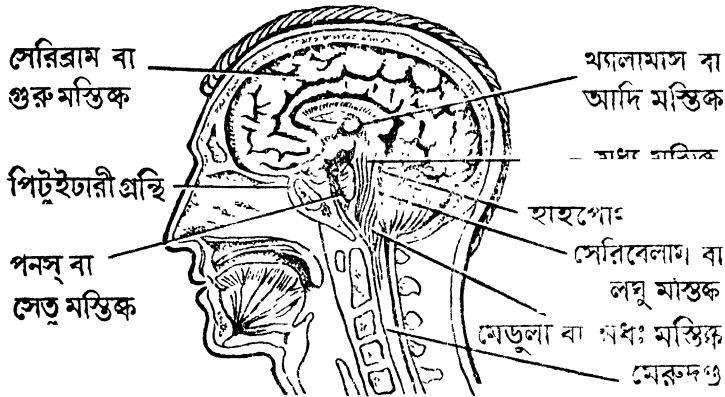
[মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগগুলির ছবি]

(১) সম্মুখ ভাগ[2], (২) মধ্য ভাগ[3], (৩) পশ্চাদ্ ভাগ[4] এবং (৪) নিম্নভাগ[5]। গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্ক ছাড়া মস্তিষ্কের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা ঃ—

সেতুমস্তিষ্ক[6]

এটি মস্তিষ্কের নিম্নাংশের একটা বর্ধিত ভাগ। এই অংশটি গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। দৈহিক ভারসাম্য ও প্রচেষ্টামূলক সমন্বয়ন বহুলাংশে এই মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল।

অধঃমস্তিষ্ক[7]

সেতু মস্তিষ্কের নীচে অধঃমস্তিষ্কের স্থান। শ্বাসক্রিয়া, রক্তচাপ প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি এই অংশের উপর নির্ভরশীল। এর প্রধান কাজ হল মেরুদণ্ড ও উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা।

থ্যালামাস[8]

এটি মস্তিষ্কের প্রাচীনতম অংশ। এর অবস্থান ঠিক মস্তিষ্কের উপরে। এটির কাজ অনেকটা সুইচবোর্ডের মত। সমস্ত সংবেদনজাত উদ্দীপনাকে মস্তিষ্ক আস্তরণের যথোপযুক্ত স্থানে পরিচালিত করার কেন্দ্রস্থল হল এই থ্যালামাস।

1. Fissure of Sylvius 2. Frontal Lobe 3. Parietal Lobe 4. Occipital Lobe 5. Temporal Lobe 6. Pons 7. Medulla 8. Thalamus

হাইপোথ্যালামাস

এটির স্থান থ্যালামাসের নীচে এবং সেতুমস্তিষ্কের উপরে। আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপোথ্যালামাসটি প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়ার জাগরণের কেন্দ্র স্থল এবং এখান থেকেই সমস্ত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়।

গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের কাজ

মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান ভাগ আছে, যথা—গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। এগুলির প্রত্যেকটিই মানব শরীরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

গুরুমস্তিষ্কের কাজ

গুরুমস্তিষ্কটি চারটি বিভাগে বিভাগে বিভক্ত। যথা, সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ পশ্চাদ্ভাগ, এবং নিম্নভাগ। প্রতিটি ভাগেরই কাজ সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র।
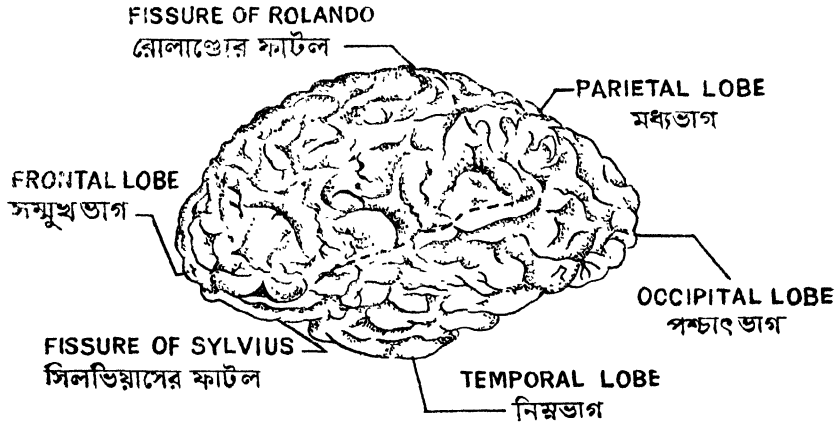
[মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন ফাটল ও ভাগগুলির ছবি]

এর মধ্যে সম্মুখ ভাগটি মানুষের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী উন্নত। বিচারকরণ, যুক্তিধর্মী চিন্তন, উদ্ভাবন, পরিকল্পন ইত্যাদি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি এই সম্মুখ ভাগ থেকে সৃষ্ট হয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। ব্যথা প্রভৃতি কতকগুলি সংবেদন উপলব্ধি করার ক্ষমতাও এই অংশটি থেকে জন্মায় এবং যাকে আমরা প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বলি সেগুলিও এই সম্মুখভাগের কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে বলে মনোবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। গুরুমস্তিষ্ক ও থ্যালামাস নামক অংশ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং দেখা গেছে যে এই দু'য়ের মধ্যে সংযোগটা যদি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তবে সংবেদনটি আনন্দের কি দুঃখের তা নির্ণয় করার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে না। তাছাড়া যদি সম্মুখভাগের

সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তবে ব্যক্তির বিচার করা বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের শেষাংশটি ইচ্ছাপ্রসূত দেহসঞ্চালনের কাজগুলি নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় অনির্দিষ্ট সাধারণ প্রকৃতির সংবেদনগুলি। স্পর্শ, অবস্থিতির উপলব্ধি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি বিভিন্ন সংবেদনের উৎস হল এই মধ্যভাগটি।

গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগটি কেবলমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও তার সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি চাক্ষুষ সংবেদনের উৎসস্থল।

গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল শ্রবণমূলক সংবেদনের উৎসস্থল। বস্তুত, মস্তিষ্কের সক্রিয়তার প্রকৃত উৎস হল মস্তিষ্কের উপরের ধূসরবর্ণের বহিঃপ্রদেশটি। একে মস্তিষ্কের আস্তরণ[1] বা কর্টেক্স বলা হয়। মস্তিষ্কের মধ্যভাগ, পশ্চাৎভাগ ও নিম্নভাগের উপরের আস্তরণের একটা বড় অংশকে অনুষঙ্গ ক্ষেত্র[2] নাম দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রটিতে অসংখ্য অনুষঙ্গ নিউরন[3] বা সঙ্গতিসাধক নিউরন[4] আছে। মস্তিষ্ক আস্তরণের এই অংশেই বিভিন্নধর্মী সংবেদন গৃহীত, সংব্যাখ্যাত ও অতীত বা বর্তমানের অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়ে থাকে। চাক্ষুষ, শ্রবণমূলক, স্পর্শমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন স্মৃতিরও বাসভূমি বোধ হয় এই অংশটিই। এই বিভিন্ন স্মৃতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা কথা বলা, পড়া, লেখা, হিসাব করা, বাঁ ডান দিক ঠিক করা, শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখান, দিক মনে রাখা, পথ খুঁজে পাওয়া, সুর চিনতে পারা, বাজনা বাজানো, রঙের পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদি বিশেষধর্মী কাজগুলি করতে পারি।

লঘুমস্তিষ্কের কাজ

লঘুমস্তিষ্ককে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বলা হয়। প্রাণীর বিভিন্ন গতির মধ্যে সমন্বয় আনা এবং সূক্ষ্ম দেহসঞ্চালনগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পেছনে আছে মস্তিষ্কের এই অংশটি। লঘুমস্তিষ্ক না থাকলে আমাদের চলাফেরা হয়ে উঠতে শ্রীহীন, অপটু ও ঝাঁকুনিপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখায় লঘুমস্তিষ্কের ভূমিকা প্রচুর। কানের মধ্যে যে ভেষ্টিবুলার জলপথের মাধ্যমে আমাদের দেহের অবস্থিতির সংবেদন গৃহীত হয় তার সঙ্গে লঘুমস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কি ঘুরে দাঁড়াচ্ছি, কি হেঁট হচ্ছি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি আমরা জানতে পারি লঘুমস্তিষ্কের সাহায্যেই। আমাদের ইচ্ছাজাত দেহসঞ্চালনের উপর লঘুমস্তিষ্কের প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে।

---

1. Cortex 2. Association Areas 3. Association Neuron 4. Adjustment Neuron

মেরুদণ্ডের কাজ

আমাদের মেরুদণ্ডের দুটি প্রধান কাজ আছে। প্রথমটি হল মস্তিষ্ক এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মধ্যবর্তী সংযোগ-কেন্দ্র রূপে কাজ করা। বস্তুত মস্তিষ্ক থেকে নির্গত স্নায়ু উদ্দীপনাগুলিকে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠান এবং ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য দেহাংশ থেকে আগত স্নায়ু উদ্দীপনাগুলিকে মস্তিষ্কে চালিত করা—এই মূল্যবান কাজগুলি সম্পন্ন হয় মেরুদণ্ডের মাধ্যমে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনাগুলি মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পেঁছিয় এবং সেখান থেকে আবার মেরুদণ্ডের বিভিন্ন প্রচেষ্টক নিউরনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উপস্থিত হয় এবং প্রাণীর মধ্যে নানা ধরনের আচরণ সৃষ্টি করে।

মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রিফ্লেক্সের কেন্দ্ররূপে কাজ করা। রিফ্লেক্সমূলক আচরণের সময় সংবেদক স্নায়ু ও প্রচেষ্টক স্নায়ুর মধ্যে সংযোগটি মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না, হয় মেরুদণ্ডে। যেমন, গরম কিছুতে হাত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হাতটি সরে আসে। এই রিফ্লেক্স আচরণটির পেছনে মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হয় না এবং আচরণটি নিছক মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে অন্যান্য অংশগুলির বর্তমানে কি ধরনের অবস্থিতিগত সম্পর্ক রয়েছে তার ধারণাও সৃষ্ট হয় কতকগুলি মেরুদণ্ডের নিউরনের সাহায্যে। হাত ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যথা, পেশী মুচড়ে যাওয়ার ব্যথা প্রভৃতি গভীর শারীরিক বেদনার অনুভূতি এবং স্পর্শ, শৈত্য ইত্যাদির ধারণাও মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা

নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন আচরণ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগটি আমাদের সকল প্রকার সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ করে। সেই জন্য এই অংশটিকে সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র[1] বলে বর্ণনা করা হয়। আবার এই অংশেরই বিভিন্ন স্থানের দ্বারা পা, উদর, বুক, গলা, বাক্‌যন্ত্র, মুখ প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যভাগটি হল স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের কেন্দ্র, নিম্নভাগটি ঘ্রাণ ও আস্বাদনের কেন্দ্র, দক্ষিণ পার্শ্বটি শ্রবণ কেন্দ্র এবং সম্মুখভাগের নিম্নাংশটি হল বাক্‌কেন্দ্র। তাছাড়া ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে আমাদের বিভিন্ন

1. Motor Area

অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় স্পর্শের উপলব্ধি, অবস্থিতির অনুভূতি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি সংবেদনগুলি। গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগটি চাক্ষুষ সংবেদনের উৎসস্থল। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গগত সঞ্চালনের মধ্যে সমন্বয়নের কাজ করে থাকে লঘুমস্তিষ্কটি। দেহের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের কাজও করে এই লঘুমস্তিষ্কটি। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষমতার এই বণ্টনকেই মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা[1] বলা হয়ে থাকে। এটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত তবু এই বিভিন্ন অংশগুলিকে একেবারে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন সত্তা বলে মনে করলে বিরাট ভুল হবে। মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের
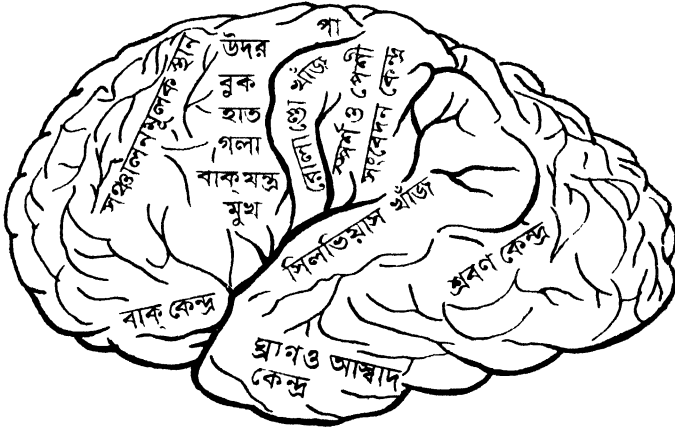
[মস্তিষ্কের বিভিন্ন ক্ষেত্র দেহের বিভিন্ন অংশ ও প্রাণীর বিভিন্ন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। একে বলে মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা।]

সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। প্রত্যেকটি অংশের কাজের উপর অন্যান্য অংশগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে এবং প্রয়োজন হলে একটি অংশের কাজ অপর অংশটিকে সম্পন্ন করতে দেখা গেছে। প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিদ্ ল্যাসলে[2] মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ নিয়ে নানা পরীক্ষণ করেছেন। তাঁর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যদিও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে, তবু প্রয়োজনের সময় এই বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবেও কাজ করতে পারে। ল্যাসলের পরীক্ষণ থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে যদি কোন কারণে মস্তিষ্কের কোন একটি বিশেষ অংশ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলি সেই অংশটির কাজের ভার নিজেদের উপর তুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ

1. Localisation of Brain 2. Lashley

সন্তোষজনক ভাবেই সেই কাজটি সম্পন্ন করে। এই বৈশিষ্ট্যটিকে মস্তিষ্কের সমকর্ম-ক্ষমতা[1] বলে বর্ণনা করা হয়।

অনুশীলনী

১। অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন বলতে কি বোঝায়? এটি কিভাবে সংঘটিত হয়?

২। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৩। মানুষের গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বিশেষ বিশেষ কাজগুলি বর্ণনা কর।

৪। মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা কাকে বলে?

৫। মনের শারীরিক ভিত্তি সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লেখ।

৬। রিফ্লেক্স কি? সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কি?

1. Equipo entiality of Brain

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

যখন কোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা পাঠায় তখন আমাদের শরীর নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেই উদ্দীপনার উদ্দেশ্যে সাড়া দেয়। যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমাদের শরীর এই সাড়া দেয় বা প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে সেগুলিকে আমরা প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র[1] বা কর্মেন্দ্রিয়[2] নাম দিয়ে থাকি। গ্রন্থি[3] হল এই ধরনের একটি প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র বা কর্মেন্দ্রিয়।

অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয়ের তুলনায় গ্রন্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি থেকে এক ধরনের রাসায়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং এই তরল পদার্থ আমাদের শরীরের উপর নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্রন্থি-রসের প্রকৃতিও যেমন বিভিন্ন, তেমনই শরীরের উপর তাদের প্রভাব ও কাজও বিভিন্ন। যেমন কোন গ্রন্থিরস আমাদের খাদ্য হজমে সাহায্য করে, কোন কোনটি আবার শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখে। হৃৎস্পন্দন, রক্তসঞ্চালন, দূষিত পদার্থের নিঃসরণ, যৌন-কার্য, শরীরের বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় কাজের মূলে গ্রন্থিরসের প্রচুর প্রভাব আছে। আমাদের বিশেষ বিশেষ আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক সমন্বয়নও বিশেষভাবে গ্রন্থিরসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

আমাদের শরীরে দু'শ্রেণীর গ্রন্থি পাওয়া যায়, যথা - সছিদ্র[4] গ্রন্থি এবং নিশ্ছিদ্র[5] গ্রন্থি। সছিদ্র গ্রন্থিগুলির মধ্যে নলের মত গঠন থাকে এবং সেই নল বেয়ে গ্রন্থিরস এসে শরীরের নানা অংশে পৌঁছয়। লালাগ্রন্থি[6], পরিপাচক গ্রন্থি[7], অগ্ন্যাশয়[8], যকৃৎ[9], মূত্রগ্রন্থি[10], ঘর্মগ্রন্থি[11], অশ্রুগ্রন্থি[12] ইত্যাদি হল সছিদ্র গ্রন্থির দৃষ্টান্ত। এগুলি থেকে সরু নল বেয়ে গ্রন্থিরস নির্গত হয় এবং এই গ্রন্থিরস আমাদের শরীরের বহু প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলি থেকে গ্রন্থিরস সরাসরি রক্তস্রোতে গিয়ে পড়ে এবং তার জন্য কোন নলের সাহায্য লাগে না। এই গ্রন্থিরসগুলিকে হরমোন[13] নাম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ অভ্যন্তরীণ, সেইহেতু এগুলিকে এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড[14] বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়ে থাকে।

আমাদের শরীরে কতগুলি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে এবং শরীরে সেগুলির অবস্থিতি কোথায় কোথায় তার একটি বিবরণ পরপৃষ্ঠার ছবিটি থেকে পাওয়া যাবে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে যে সব হরমোন নির্গত হয় সেগুলি সরাসরি গিয়ে আমাদের রক্তস্রোতে পড়ে এবং শরীরের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। তার ফলে এই

---

1. Reacting Mechanism 2. Effector 3. Gland 4. Duct 5. Ductless 6. Salivary Gland 7. Gastric Gland 8. Pancreas 9. Liver 10. Kidney 11. Sweat Gland 12. Tear Gland 13. Hormon 14. Endocrine Gland

হরমোনগুলি শরীরের সমস্ত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্রগুলির মধ্যে সমন্বয় আনতে এবং সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির এই নিয়ন্ত্রণকে রাসায়নিক সমন্বয়ন[1] নাম দেওয়া হয়েছে। এই
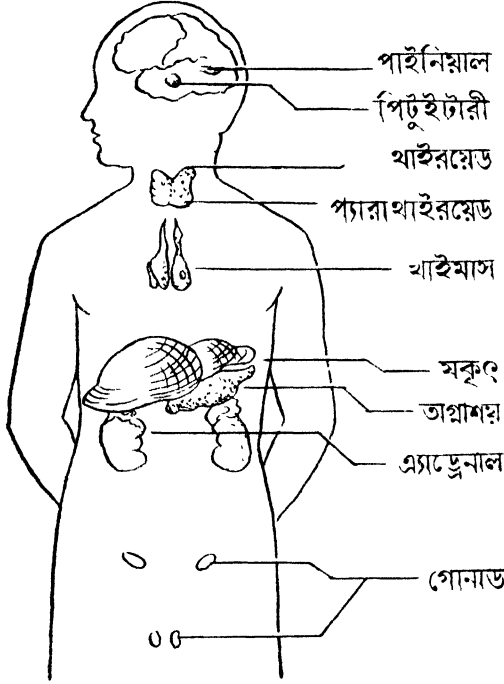
(দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থিতি)

সমন্বয়নের কাজ ছাড়াও শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, প্রক্ষোভমূলক আচরণ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজও এই গ্রন্থিগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বিশেষ বিশেষ কাজের একটি বিবরণ দেওয়া হল।

পিটুইটারি গ্রন্থি[2]

মাথার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় মস্তিষ্কের নীচে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। গ্রন্থিটির দুটি প্রধান অংশ আছে। সম্মুখ অংশ ও পশ্চাৎ অংশ। পিটুইটারির সম্মুখ অংশ থেকে একটি বিশেষ হরমোন নিঃসৃত হয় যা আমাদের শরীরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে।

1. Chemical Integration 2. Pituitary Gland

যদি এই হরমোনটি অধিকমাত্রায় নিঃসৃত হয় তবে শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। অসাধারণ দৈর্ঘ্য, অতিকায় আকৃতি, বিরাট হাত পা ইত্যাদি শারীরিক অস্বাভাবিকতাগুলি এই পিটুইটারি হরমোনের আতিশয্য থেকে দেখা দেয়। আবার যদি এই হরমোনটি অল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয় তাহলেও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। হাত পা গুলি ছোট হয়ে ওঠে, শরীর খর্বাকার হয় এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও অস্বাভাবিক ভাবে ছোট হয়ে যায়।

পিটুইটারির পশ্চাৎ অংশ থেকে যে হরমোনটি নিঃসৃত হয় তার দ্বারা আমাদের শরীরের মসৃণ পেশীগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই হরমোন অন্ত্র, মূত্রাশয়, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে।

থাইরয়েড গ্রন্থি[1]

গলার মধ্যে শ্বাসনালীর দু'পাশে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এ থেকে যে হরমোনটি নিঃসৃত হয় তার নাম হল থাইরক্সিন। শরীরের সামগ্রিক বিকাশে এই গ্রন্থিটির কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবে এই গ্রন্থিটি থেকে যদি হরমোন নিঃসরণ যথেষ্ট পরিমাণে না ঘটে, তবে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বৃদ্ধিই বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে ওঠে। ফলে যে রোগটি দেখা দেয়, তার নাম ক্রেটিনতা[2]। বাইরে থেকে থাইরক্সিন হরমোন প্রয়োগ করলে বহু ক্ষেত্রে এই রোগ সেরে যায়। আর যদি পরিণত বয়সে থাইরক্সিনের নিঃসরণ কম হয় তবে মিক্সেডেমা[3] নামে ব্যাধি দেখা দেয়। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া পুরু ও স্ফীত হয়ে ওঠা, শরীরের রাসায়নিক কাজ মন্থর হয়ে যাওয়া, মেদ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি হল এই রোগের লক্ষণ। তাছাড়া উৎসাহের অভাব, বিষণ্নতা ইত্যাদি উপসর্গগুলিও এই রোগে দেখা দেয়।

আবার যদি থাইরক্সিনের নিঃসরণ অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তবে শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলিও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নাড়ীর স্পন্দনের দ্রুততা, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্রুতভবন ইত্যাদি পরিবর্তন দেখা দেয় এবং অস্থিরতা, অতিরিক্ত উৎসাহ, স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব হয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি[4]

এই গ্রন্থিটির প্রধান কাজ হল আমাদের শরীরের চুণের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা। রক্তের মধ্যে চুণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনার তীব্রতা। এই গ্রন্থিটি অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে স্নায়বিক অস্থিরতা, অনুভূতি-প্রবণতা, অন্তর্মুখিতা ইত্যাদি উপসর্গগুলি দেখা দেয়।

এ্যাড্রেনাল গ্রন্থি[5]

প্রতিটি মূত্রাশয়ের উপরের একটি করে এ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আছে। প্রতিটি গ্রন্থির

---

1. Thyroid Gland 2. Cretenism 3. Myxedema 4. Parathyroid Gland 5. Adrenal Gland

আবার দুটি অংশ আছে। অন্তঃকেন্দ্র বা মেডুলা এবং বহিঃস্তর বা করটেক্স। বহিঃস্তর থেকে যে রসটি নিঃসৃত হয় তার নাম কোর্টিন[1]। এই গ্রন্থিরসটি আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই রসটির নিঃসরণ কম হলে রক্তচাপের হ্রাস, পেশীমূলক দুর্বলতা, পরিপাচনঘটিত গোলযোগ, অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং প্রতিরোধশক্তির অবনতি ইত্যাদি দেখা দেয়। যৌনমূলক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থিরসটির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

শৈশবে এই রসটির অতি-নিঃসরণ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে পুরুষোচিত ভাবের সৃষ্টি করে এবং মেয়েদের নারীসুলভ ক্রিয়াগুলিকে ব্যাহত করে তোলে।

এ্যাড্রেনালের অন্তঃকেন্দ্র থেকে নির্গত হয় এ্যাড্রেনালিন[2] নামে গ্রন্থিরসটি। আজকাল এই রসটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে এ্যাড্রেনিন[3]। মনোবিজ্ঞানে এই গ্রন্থিরসটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রক্ষোভের বিকাশ ও অভিব্যক্তির সঙ্গে এই গ্রন্থিরসটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উত্তেজনা বা প্রক্ষোভের জাগরণের সময় এই গ্রন্থিরসটি প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হতে সুরু করে। হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠা, রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়া, যকৃৎ থেকে সঞ্চিত শর্করা ক্ষরিত হওয়া, পরিপাচন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফুসফুসে বাতাস যাওয়ার পথ স্ফীত হয়ে ওঠা এবং প্রচণ্ড ধরনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিবর্তন এই এ্যাড্রেনালিনের অতি-নিঃসরণের জন্যই ঘটে থাকে।

গোনাড গ্রন্থি[4]

এগুলি হল যৌনমূলক গ্রন্থি এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের শরীর ও মনের যৌনমূলক বিকাশের পিছনে এই গ্রন্থিগুলির প্রধান ভূমিকা থাকে।

অগ্ন্যাশয়[5]

এই গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন[6] নামে গ্রন্থিরসটি নিঃসৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থ নিঃসৃত শর্করার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় এই গ্রন্থিরসটির দ্বারা।

পাইনিয়াল[7]

এই গ্রন্থিটি শৈশবেই সক্রিয় থাকে এবং যৌবনাগমের পর এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যৌনবিকাশের কাজে এই গ্রন্থিটির বিশেষ প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়।

থাইমাস[8]

এই গ্রন্থিটিও যৌবনাগমের পর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে। এর কাজের প্রকৃত স্বরূপ ঠিক জানা যায় নি।

যকৃৎ[9]

এই গ্রন্থিটি পরিপাচন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তা ছাড়াও

---

1. Cortin 2. Adrenalin 3. Adrenin 4. Gonad Glands 5. Pancreas 6. Insulin 7. Pineal 8. Thymus 9. Liver

এটি থেকে এক বিশেষ ধরনের হরমোন নির্গত হয়। কিন্তু তার কাজের প্রকৃত স্বরূপ এখনও অজ্ঞাত।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির কাজের প্রকৃতি বিভিন্ন এমন কি সময় সময় পরস্পর-বিরোধীও হয়ে থাকে। একটি গ্রন্থি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন অপরটির কাজ তার দ্বারা ব্যাহত হয়। আবার কখনও কখনও একটি গ্রন্থির সক্রিয়তা অপর গ্রন্থিটিকে সক্রিয় করে তোলে। এই জন্য গ্রন্থিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া শক্ত।

তবে গ্রন্থিগুলির প্রকৃতি ও কাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেগুলির মধ্যে একটি সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার ভাব অনেক সময় দেখা যায়। যেমন, থাইরয়েডের কাজে সহায়তা করে এ্যাড্রেনাল, আবার গোনাড গ্রন্থির কাজের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয় পিটুইটারির সম্মুখ ভাগটি। এইভাবে দেখা যায় যে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও গ্রন্থিগুলি কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। তাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই একটি পারস্পরিক একত্ববোধ ও সামগ্রিক সমন্বয়ন বর্তমান। শরীরতত্ত্ববিদেরা এই ব্যাপারটিকেই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য[1] নাম দিয়েছেন।

অনুশীলনী

১। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির প্রকৃতি ও কাজ বর্ণনা কর। এগুলিকে নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি বলা হয় কেন

২। মানবদেহে এ্যাড্রেনালিন, থাইরক্সিন ও কোর্টিন-এর প্রভাব বল।

৩। ক্রেটিনিজম্ কেন হয়? মিক্সেডেমা রোগটি কখন হয়?

৪। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য কাকে বলে?

1. Balance of Endocrine Glands

বার

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

জড়বস্তু এবং প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল যে জড়বস্তু তার বাইরের কোন বস্তুর অস্তিত্ব জানতে পারে না কিন্তু প্রাণী তা পারে। এর জন্য প্রাণীর দেহের মধ্যে এমন সব বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে যা অ-প্রাণীর মধ্যে নেই। এই বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের সাহায্যে প্রাণী বাইরের জগতের কোন উদ্দীপককে তার স্নায়ু উদ্দীপনার রূপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে এবং তার সাহায্যে ঐ উদ্দীপক সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারে।

প্রাণীর যে কোন ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি স্তর দেখতে পাই। প্রথম, বাইরের উদ্দীপকের দ্বারা প্রেরিত উদ্দীপনা থেকে প্রসূত একটি স্নায়ুমূলক অনুভূতি এবং দ্বিতীয়, সেই অনুভূতিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণা বা এক কথায় সেই অনুভূতিটির সংব্যাখ্যান। যেমন ঘুম থেকে চোখ খুলে তাকাতেই এক ঝলক আলো চোখের মধ্যে দিয়ে অক্ষিপটে পড়ল এবং সেখান থেকে উদ্দীপনা সৃষ্ট হয়ে অক্ষিমূলক স্নায়ু[1] বেয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ হল। এই অনভূতিটি কিসের বা কি প্রকৃতির বা তার কি নাম ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই আমাদের জ্ঞান হয় যে ঐ অভিজ্ঞতাটি এক ঝলক আলোর এবং সেটা খুব উজ্জ্বল সাদা, ঈষৎ উষ্ণ এবং সূর্য থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি। এই পরবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হল। এই প্রথম স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় সংবেদন[2] এবং দ্বিতীয় স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ[3]।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূলে আছে সংবেদন। সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ। আর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে সেই সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। অতএব সংবেদন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষণ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়াও সংবেদন হতে পারে। তবে বাস্তবে কারও পক্ষে বিশুদ্ধ সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ-বর্জিত সংবেদন লাভ করা সম্ভব হয় না। কেননা যে মুহূর্তে সংবেদনটির সৃষ্টি হবে সেই মুহূর্তেই তার একটি সংব্যাখ্যান মস্তিষ্ক তৈরী করে নেবে। তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে একমাত্র সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ সংবেদন হওয়া সম্ভবপর, কেননা তার সংবেদনের সংব্যাখ্যান করার মত কোনও পূর্বজ্ঞান তখনও তার মস্তিষ্কের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সংবেদনকে প্রত্যক্ষণে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা এবং ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে পূর্ব আহরিত বিভিন্ন তথ্যাদি। তাছাড়া

1. Optic Nerve 2, Sensation 3. Perception

পরিবেশের প্রভাবও প্রত্যক্ষণের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা, পূর্বজ্ঞান, পারিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি একযোগে আমাদের অর্থহীন সংবেদনকে অর্থময় করে তোলে। সংবেদন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্র। প্রত্যক্ষণে সেই উপাদান পূর্ণাঙ্গ ও অর্থসম্পন্ন জ্ঞানের রূপ ধারণ করে।

সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ

সংবেদন জন্মায় উদ্দীপনা থেকে এবং উদ্দীপনা জন্ম নেয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সক্রিয়তা থেকে। যখনই আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে তখনই আমাদের দেহের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং সেই উদ্দীপনা থেকে সংবেদন সৃষ্ট হয়। সেই জন্য আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ধরা হয়েছে পাঁচটি। যথা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। আর এগুলির মাধ্যমে যে সকল সংবেদন আমরা অর্জন করে থাকি সেগুলির নাম হল চাক্ষুষ[1], শ্রুতিমূলক[2], স্পর্শজ[3], ঘ্রাণজ[4] এবং স্বাদজ[5] সংবেদন। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষাবিদদের মতে ইন্দ্রিয়বোধের সংখ্যা পাঁচটি হলেও বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলি ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়বোধ আছে। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্থিরতা বা ভারসাম্য বোধ[6] এবং পেশী সঞ্চালনের বোধ[7]। স্পর্শের বোধকে আমরা এতদিন এক প্রকারের সংবেদন বলে মনে করে এসেছি। কিন্তু তার মধ্যেও বিশেষধর্মী ও বিভিন্ন প্রকৃতির চারটি পৃথক সংবেদন পাওয়া গেছে, যথা ব্যথা, চাপ, শৈত্য এবং উষ্ণতা। দেখা গেছে যে ব্যথার সংবেদন সৃষ্ট হয় চর্মের নীচে অবস্থিত অসংখ্য ব্যথাস্থল থেকে। আর সাধারণ স্পর্শবোধ উদ্ভূত হয় চর্মের নীচে অবস্থিত অনুরূপ অসংখ্য স্পর্শস্থল থেকে। অর্থাৎ স্পর্শের ইন্দ্রিয় এবং ব্যথার ইন্দ্রিয় দুটি বিভিন্ন এবং সেইজন্য স্পর্শের সংবেদন দুটিও বিভিন্ন। তেমনই শরীরের কোনও অংশে চাপ দিলে যে সংবেদন জাগে তা সাধারণ স্পর্শের সংবেদন থেকে স্বতন্ত্র একটি সংবেদন। এই রকম শৈত্যের সংবেদন এবং উষ্ণতার সংবেদন দুটিও স্পর্শের সংবেদন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি সংবেদন।

দেহজ সংবেদন

এ ছাড়া দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির সক্রিয়তা থেকে আর এক শ্রেণীর স্বতন্ত্র প্রকৃতির সংবেদন উদ্ভূত হয়। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে দেহজ সংবেদন।[8] আমাদের শারীরিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতি-গুলি পরিপাচনক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ

1. Visual 2. Auditory 3. Tactual 4. Olfactory 5. Gustatory 6. Static Sense 7. Muscle Sense or Kinaesthesis 8. Organic Sensation

সম্পন্ন করে থাকে সেগুলি থেকে যে সব সংবেদন জন্মায় সেগুলিকেই দেহজ সংবেদন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার সময় শরীরের মধ্যে যে ধরনের শারীরিক অনুভূতি হয় তাকে সাধারণ স্পর্শবোধের পর্যায়ে ফেলা চলে না। তেমনই ক্ষুধা বা তৃষ্ণার তৃপ্তিতে এক ধরনের সর্বদৈহিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়। শরীরতত্ত্ববিদেরা এগুলিরই নাম দিয়েছেন দেহজ অনুভূতি। এই অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং এগুলির কোন নির্দিষ্ট নাম দেওয়া সম্ভব নয়। পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে কোনও রূপ ক্ষত বা টিউমার সৃষ্টি হলে যে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির সংবেদন দেখা দেয় সেটিও এই দেহজ সংবেদন শ্রেণীর অন্তর্গত।

সংবেদনের ধর্মাবলী

উদ্দীপক এবং তা থেকে প্রসূত সংবেদনের দিক দিয়ে চার রকমের ধর্ম বা লক্ষণের কথা বলা যায়, যথা, গুণ[1], তীব্রতা[2], ব্যাপ্তি[3] এবং স্থিতি[4]।

সংবেদনের গুণ

আমাদের যে বস্তুটির সংবেদন হচ্ছে তাকেই সংবেদনের গুণ বলা হয়। যেমন, চাক্ষুষ সংবেদনের গুণ হল যে রঙটি দেখছি সেটি, শ্রাবণ সংবেদনের গুণ হল যে ধ্বনিটি আমরা শুনছি সেটি, স্বাদজ সংবেদনের গুণ হল যে তিক্ততা বা মিষ্টতা বা অন্য কোন স্বাদ আমরা পাচ্ছি সেটি ইত্যাদি।

গুণের দিক দিয়ে সংবেদনের মধ্যে দু'রকমের পার্থক্য হতে পারে। জাতিগত[5] ও উপজাতিগত[6]। চাক্ষুষ সংবেদন ও শ্রাবণ সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা জাতিগত, কেননা এ দুটি সংবেদনই দুটি বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত। কিন্তু লাল রঙের সংবেদন ও নীল রঙের সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটি উপজাতিগত। কেননা এ দুটি সংবেদন একই জাতির অন্তর্গত কিন্তু তারা উপজাতির দিক দিয়ে বিভিন্ন।

সংবেদনের তীব্রতা

সংবেদনের তীব্রতা বলতে বোঝায় সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রা। উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভর করছে সংবেদনের তীব্রতা। যেমন, একটি ২০০ বাতির আলোর সংবেদনের তীব্রতা ১০০ বাতির আলো থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার চেয়ে অনেক বেশী। তেমনই একটু জোরে চীৎকার করলে যে সংবেদন অনুভূত হবে তার তীব্রতা সাধারণ কণ্ঠস্বর থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার চেয়ে বেশী।

সংবেদনের ব্যাপ্তি

সংবেদনের ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় যে সংবেদনটি কতটা জায়গা জুড়ে আছে। যেমন, হাতের উপর একটি পিন ঠেকালে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তি হাতের উপর একটি বই রাখলে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক কম। এক বালতি জলে

1. Quality 2. Intensity 3. Extensity 4. Duration 5. Generic 9. Specific

একটা আঙ্গুল ডোবালে যে সংবেদন হবে তার চেয়ে বেশী ব্যাপক সংবেদন হবে সম্পূর্ণ হাতটা ডোবালে। তেমনই একটি পোষ্টকার্ডের চাক্ষুষ সংবেদন একটি খবরের কাগজের চাক্ষুষ সংবেদনের চেয়ে অনেক কম ব্যাপক, যদিও গুণের দিক দিয়ে দুটি সংবেদনই অভিন্ন।

স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য[1]

কোন ব্যাপ্তিসম্পন্ন সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বহু ছোট ছোট বিশেষধর্মী সংবেদন নিয়ে সমগ্র সংবেদনটি গঠিত। এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি সব দিক দিয়ে এক হলেও তাদের অবস্থিতির বিভিন্নতার দিক দিয়ে তারা পৃথক। এই অবস্থিতির বৈষম্যকে সংবেদনগুলির স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বলা হয়। এর অর্থ হল এই যে যদিও এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি একই ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত, তবুও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা থেকে সেগুলির জন্ম বলে সেগুলির মধ্যে স্থানগত একটা স্বতন্ত্রতা বা পার্থক্য থাকে। যেমন, যদি পিঠের উপর কেউ হাত রাখে তবে আমরা চোখে না দেখেও বলতে পারি যে পিঠের কোন্ জায়গায় হাত রাখা হয়েছে। যদিও হাত রাখার সংবেদনগুলি সব জায়গায় এক, তবু তাদের স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রতার জন্যই প্রত্যেকটি বিভিন্ন জায়গার স্পর্শকে পৃথকভাবে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। স্পর্শজ এবং চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেই এই স্থানগত পার্থক্যটি বিশেষভাবে জানা যায়। বস্তুত সংবেদনের এই ব্যাপ্তি থেকেই আমাদের মধ্যে 'স্থান' সম্বন্ধে ধারণা জন্মে থাকে।

সংবেদনের স্থিতি

সংবেদনের স্থিতি বলতে বোঝায় যে সংবেদন কতটা সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে। কোন সংবেদন মুহূর্তের জন্য ঘটতে পারে, কোনটি আবার কিছুকাল ধরে থাকতে পারে, আবার কোনটি বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারে। সংবেদনের এই স্থায়িত্বমূলক ধর্ম থেকেই আমাদের 'সময়' সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে থাকে।

স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ

কেমন করে আমরা স্থান ও কাল প্রত্যক্ষ করি তা নিয়ে বহু জল্পনাকল্পনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর মত এ দুটি বস্তু প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। স্থান বলে প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু নেই। বরং কোন বস্তুর অস্তিত্বের অভাবকেই স্থান বলা হয়। সাধারণত আমরা দু'ধরনের স্থানের উল্লেখ করে থাকি, পূর্ণ স্থান[2] এবং শূন্য স্থান[3]। পূর্ণ স্থান প্রকৃতপক্ষে স্থান নয় কেননা সেখানে কোন একটি বস্তু স্থানটি অধিকার করে থাকে। প্রকৃত স্থান হল শূন্যস্থান এবং যেহেতু সেটি অভাবাত্মক বস্তু, সেহেতু সেটি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না। তেমনই সময় বলে কোন দৃশ্যমান বস্তু নেই এবং কোন

---

1. Local Characters or Signs 2. Filled Space 3. Empty Space

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সময়কে প্রত্যক্ষণ করা যায় না। কিন্তু তবু আমরা এ দুটি বস্তুরই প্রত্যক্ষণ করে থাকি। এখন প্রশ্ন হল স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ কেমন করে সম্ভব হয়।

স্থানের ধারণার সৃষ্টি সম্বন্ধে দু' শ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে, সৃজনমূলক[1] এবং সহজননমূলক[2]। সৃজনমূলক মতবাদ অনুযায়ী স্থানের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নিয়ে শিশু জন্মায় না। তার জন্মের পর পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে স্থান সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করে। বিশেষ করে সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকেই স্থানের ধারণাটির সৃষ্টি হয়। সহজননমূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর জন্মের সময় থেকেই স্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় নিহিত থাকে এবং পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই অবিকশিত ধারণাটি পূর্ণতা লাভ করে।

স্থানের ধারণা অর্জিতই হোক আর সহজাতই হোক্ সংবেদনের ব্যাপ্তি যে এই ধারণার বিকাশের প্রধানতম উপকরণ সে বিষয়ে সকল মনোবিজ্ঞানীই একমত।

যখন আমরা একটি লম্বা সরল রেখার দিকে তাকাই তখন আমাদের সেই চাক্ষুষ সংবেদনটির মধ্যে আছে অনেকেগুলি সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত বিন্দুর সংবেদন। এই সংবেদনগুলির বিভিন্ন স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের অবস্থিতির পার্থক্যটি আমরা জানতে পারি এবং এই জ্ঞান থেকেই স্থানের প্রসার বা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মায়। আর একটি ধারণা আমাদের স্থানের প্রত্যক্ষণের সাহায্য করে। সেটি হল গতি বা অঙ্গসঞ্চালনের সংবেদন। আমাদের ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি থেকে আমরা পূর্ণস্থানের ধারণা পেয়েছি এবং অব্যাহত গতি থেকে পেয়েছি শূন্যস্থানের ধারণা। তাছাড়া হাত-পা নাড়া, চলাফেরা করা থেকে দূরত্ব ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি।

সে রকম আমাদের মধ্যে সময়ের প্রত্যক্ষণও সৃষ্টি হয়ে থাকে সংবেদনের স্থিতি থেকে। কোন সংবেদন অল্পক্ষণ থাকে, আবার কোন সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। সংবেদনের স্থিতির এই বিভিন্নতা থেকেই আমাদের মধ্যে সময় সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সংবেদনটি কিছুক্ষণ আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেই সংবেদনটি থেকে আমরা অতীতের ধারণা পেয়েছি যে সংবেদনটি এখন এই মুহূর্তে ঘটে চলেছে সেই সংবেদনটি আমাদের মধ্যে বর্তমান সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করেছে। সেই রকম যে সংবেদনটি বর্তমান মুহূর্তের পরে ঘটবে সেই সংবেদনটি আমাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে থাকে।

দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ[3]

আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তখন সেই বস্তুটি থেকে আলো আমাদের চোখের মধ্যে রেটিনা বা অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সেখানে ঐ বস্তুটির একটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়। এখন এই প্রতিকৃতিটি বইয়ের পাতায় ছাপা ছবি বা

1. Genetic 2. Nativistic 3. Perception of Distance, Depth and Three Dimension

সিনেমার পর্দায় প্রতিফলিত ছবির মত দ্বি-আয়তন-বিশিষ্ট, অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, কিন্তু গভীরতা নেই। কিন্তু বাস্তবে আমরা প্রকৃতপক্ষে বস্তুটির তিনটি আয়তনই প্রত্যক্ষ করে থাকি। আমার সামনে রাখা মোটা অভিধানটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা, এ তিনটি আয়তনই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার দুটি চোখের অক্ষিপটে ঐ বইটির যে ছবিটি প্রতিফলিত হয়েছে সে ছবিটির মাত্র দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে কিন্তু কোন গভীরতা নেই।

অতএব প্রশ্ন হল যে আমাদের অক্ষিপটে প্রতিফলিত ছবিটির যদি কোন গভীরতা না থেকে থাকে এবং সেটি যদি কেবলমাত্র দ্বি-আয়তনবিশিষ্ট ছবি হয় তবে আমরা দূরত্ব, গভীরতা ও বস্তুর ত্রি-আয়তন কেমন করে দেখি?

এই দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন দেখার কারণগুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা, এক-চক্ষুমূলক কারণাবলী[1] ও দ্বি-চক্ষুমূলক কারণাবলী[2]।

এক-চক্ষুমূলক কারণাবলী

যখন আমরা একটিমাত্র চোখের ব্যবহার করি তখন নিম্নলিখিত কারণগুলি আমাদের গভীরতা এবং ত্রি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুলিকেই একচক্ষুমূলক কারণ বলা হয়। এগুলি যে দ্বি-চক্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে তা বলাই বাহুল্য।

১। বস্তুর আন্তরালবর্তিতা[3]

একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করলে যে বস্তুটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে
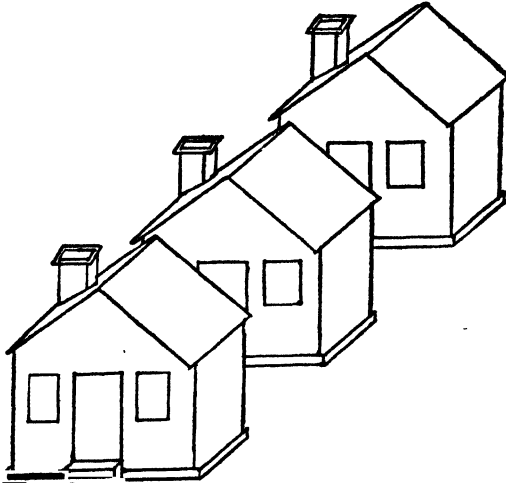
[বস্তুর অন্তরালবর্তিতার জন্য দূরত্বের ধারণার সৃষ্টি হয়]

সেটি নিকটে এবং যেটি আংশিক দেখা যাচ্ছে সেটি দূরে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া

1. Monocular Factors 2. Binocular Factors 3. Interposition of Objects

হয়। যেমন পূর্বপৃষ্ঠার ছবিটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাড়ী দুটি আংশিক আবৃত থাকার জন্য অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে এবং প্রথম বাড়ীটি সম্পূর্ণ অনাবৃত থাকার জন্য আর দুটির তুলনায় ঐটি নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছে।

২। রেখামূলক চিত্রানুপাত[1]

দূরের বস্তু সব সময় ছোট ও সঙ্কুচিত দেখায়, কাছের বস্তু বড় দেখায়। পাশে রেল লাইনের ছবিটিতে কোন্ থামটি কাছে কোন্‌টি দূরে তা ঐ থামগুলির আকৃতি দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে। রেল লাইনের ক্ষেত্রে লাইনের রেখাগুলি বিস্তৃত থেকে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে দূরত্বের ধারণার সৃষ্টি করেছে।
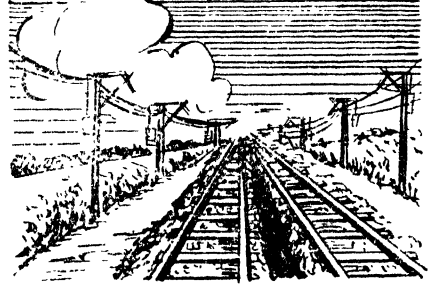
[রেখামূলক চিত্রানুপাত]

৩। বায়বীয় চিত্রানুপাত[2]

যে বস্তুটি দূরে থাকে সেটি নিকটবর্তী বস্তুর চেয়ে অস্পষ্ট ও ঝাপসা দেখায়। এর কারণ যে বস্তুটির দূরত্ব যত বেশী হবে সেটির মধ্যবর্তী বাতাসের পরিমাণ তত বাড়বে এবং ফলে তত ধূলো বাষ্প ইত্যাদি দ্বারা আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত হবে।

৪। আলো ও ছায়া

যেখানে গর্ত বা নীচু জায়গা থাকে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সমতল জায়গা আলোকিত দেখায়। ফলে আলোছায়ার বিভিন্ন সমাবেশ স্থানটির দূরত্ব ও গভীরতা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

৫। লম্বন[3]

একটি চোখ বন্ধ রেখে যদি ধীরে ধীরে মাথাটিকে একপাশে সরানো যায় তবে দেখা যাবে যে সামনের বস্তুগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সরতে সুরু করেছে। তবে যেগুলি কাছের বস্তু সেগুলি যেদিকে মাথাটি সরানো হচ্ছে তার বিপরীত দিকে চলবে, আর যেগুলি দূরের বস্তু সেগুলি মাথা যেদিকে সরানো হচ্ছে সেদিকেই চলতে থাকবে। দূরত্বের মাত্রা অনুযায়ী চোখের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর এই বৈষম্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লম্বন বলে। আমরা সব সময়ই অল্পবিস্তর মাথা নাড়িয়ে থাকি, ফলে আমাদের

1. Linear Perspective 2. Aerial Perspective 3. Parallax

সামনে অবস্থিত বস্তুগুলির সঞ্চালনের প্রকৃতি থেকে সেগুলির দূরত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি ধারণা গড়ে ওঠে।

৬। উপযোজন[1]

দূরের জিনিস দেখার সময় চোখের মধ্যবর্তী লেন্সটি সিলিয়ারী পেশীগুলির চাপে আরও সমতল হয়ে ওঠে। আর কাছের জিনিস দেখার সময় লেন্সটি আরও গোলাকার হয়ে ওঠে। সিলিয়ারী পেশীর এই উপযোজন প্রক্রিয়া থেকে আমাদের মস্তিষ্ক বস্তুটির দূরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নেয় বলে মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

দ্বি-চক্ষুমূলক কারণাবলী

দূরত্ব, গভীরতা ও বস্তুর ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি কেবলমাত্র দ্বি-চক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে সেগুলিকে দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ বলা হয়। সেগুলি হল এই—

১। কেন্দ্রীভবন[2]

যখন কোন বস্তুকে ভাল করে দেখতে হয় তখন বস্তুটিকে আমাদের দুটি চোখের ফোভিয়ার সমরেখায় আনতে হয়। ফলে চোখের গোলক দুটিকে ঘুরিয়ে এমন একটি অবস্থানে আনতে হয় যাতে বস্তু দুটি ফোভিয়ার[3] কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়। কাছের বস্তু দেখার সময় চোখের গোলক দুটি পরস্পরের দিকে সরে আসে এবং দূরের জিনিস দেখার সময় গোলক দুটি প্রায় সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত হয়ে যায়। এই
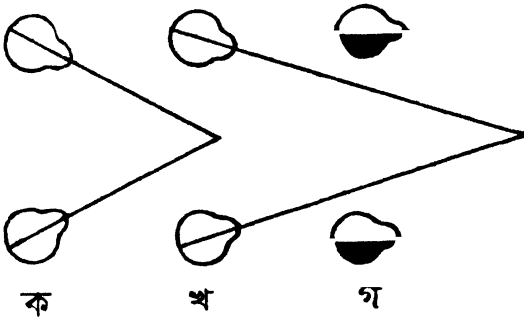
[কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে দূরত্ব অনুযায়ী চক্ষুগোলকদ্বয়ের বিভিন্ন অবস্থা]

কেন্দ্রীভবনের ফলে চক্ষুগোলক দুটির অবস্থিতির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তা থেকে মস্তিষ্ক দূরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নেয়।

1. Accommodation 2. Convergence 3. Fovea

২। অক্ষিপটমূলক বৈষম্য

আমাদের চোখ দুটির মধ্যে অবস্থানগত কিছুটা পার্থক্য থাকার ফলে দুটি রেটিনা বা অক্ষিপটে কোন দৃষ্ট বস্তুর যে দুটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয় সে দুটির প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ এক হয় না। সে দুটির প্রতিকৃতি প্রায় এক রকম হলেও একবারে অভিন্ন হয় না এবং তাদের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য থাকেই। বাঁ চোখটি বন্ধ করে সামনের কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে, আবার ডান চোখ বুজিয়ে ঠিক সেই বস্তুটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে দু'বারে ঐ বস্তুটির যে দুটি প্রতিকৃতি দেখা গেল সে দুটি একেবারে অভিন্ন নয়। তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। এই বৈষম্যের কারণ হল আমাদের চোখ দুটির অবস্থিতিগত পার্থক্য। এই পার্থক্যের জন্য দুটি রেটিনায় প্রতিফলিত কোন বস্তুর প্রতিকৃতি দুটির মধ্যে যে বৈষম্য দেখা দেয় তার নাম অক্ষিপটমূলক বৈষম্য[1]। প্রতিকৃতির এই বৈষম্যের ফলে আমাদের মস্তিষ্কে দুটি অক্ষিপট থেকে জাত কিছুটা বিভিন্ন রকমের স্নায়ু-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্ক সেই দুটি বিভিন্ন স্নায়ু-উদ্দীপনার মধ্যে একটি বোঝাপড়া করে নেয় এবং ধরে নেয় যে দৃশ্যমান বস্তুটি গভীরতাবিশিষ্ট বা ত্রি-আয়তন সম্পন্ন হওয়ার ফলেই এই বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে মস্তিষ্ক প্রকৃতপক্ষে দূরত্ব, গভীরতা বা বস্তুর ত্রি-আয়তন সরাসরি প্রত্যক্ষণ করে না। মস্তিষ্ক একই বস্তুর ঈষৎ পৃথক দুটি দ্বি-আয়তনমূলক প্রত্যক্ষণ থেকে দূরত্ব, গভীরতা বা ত্রি-আয়তনের অনুমান করে নেয়।

ষ্টিরিওস্কোপ

অক্ষিপটমূলক বৈষম্যের এই ঘটনাটি ষ্টিরিওস্কোপ[2] নামক যন্ত্রের সাহায্যে
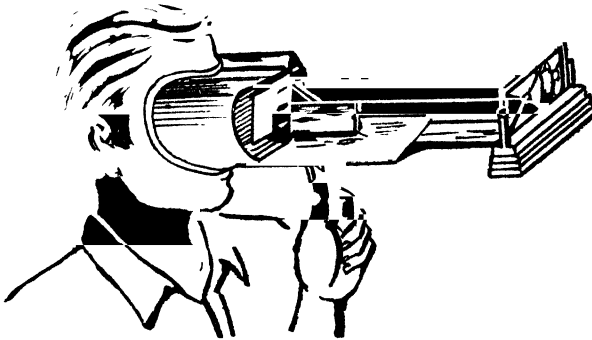
[ষ্টিরিওস্কোপ]

প্রমাণিত করা যায়। প্রথমে একই বস্তুর দুটি দ্বি-আয়তন বিশিষ্ট সমতল ছবি

1, Retinal Disparity 2. Stereoscope

নেওয়া হয়ে থাকে—ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম একটি ছবি এবং বাঁ চোখ দিয়ে বস্তুটিকে দেখলে যেমন দেখায় সেই রকম আর একটি ছবি। এইবার দুটি ছবি ষ্টিরিওস্কোপ নামক যন্ত্রটিতে পাশাপাশি এমনভাবে রাখা হয় যাতে প্রথম ছবিটি ঠিক ডান চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং দ্বিতীয় ছবিটি ঠিক বাঁ চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে। তার ফলে এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখলে ছবি দুটি পরস্পরের উপর অভিস্থাপিত হয়ে একটি মাত্র ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং দৃষ্ট বস্তুটিকে পরিষ্কার ত্রি-আয়তনসম্পন্ন বলে মনে হয়।

ভ্রান্ত-বীক্ষণ ও অলীক-বীক্ষণ

কখনও কখনও আমাদের প্রত্যক্ষণের বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যেরূপ ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষণ না করে, সেটিকে অন্য কোনরূপে আমরা প্রত্যক্ষণ করি। এই ধরনের প্রত্যক্ষণকে ভ্রান্ত-বীক্ষণ[1] বলা হয়। যেমন, সন্ধ্যায় অন্ধকারে দড়িকে সাপ বলে মনে করা, লোডশেডিং'এর রাত্রে অপরিচিত ব্যক্তিকে পুরানো বন্ধু বলে মনে করা, অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টকে ভুত ভেবে ভয় পাওয়া ইত্যাদি। ভ্রান্তবীক্ষণ এক ধরনের প্রত্যক্ষণ, তবে ভুল প্রত্যক্ষণ।

এছাড়া আর এক ধরনের ভুল প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। তাকে অলীকবীক্ষণ[2] বলা হয়। অলীকবীক্ষণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষণ নয়। সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং নিজের মন-গড়া অবাস্তব কিছু দেখাকে অলীক-বীক্ষণ বলা হয়। ম্যাকবেথ যখন তার চোখের সামনে শূন্যে দোলায়মান রক্তময় ছুরিকা দেখেছিলেন বা কোন শোকজর্জরিত ব্যক্তি যখন তার মৃত প্রিয়জনকে জীবিত দেখতে পান বা তার সঙ্গে কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে এগুলি অলীক-বীক্ষণেরই উদাহরণ। ভ্রান্ত-বীক্ষণ ও অলীক-বীক্ষণ দুইই ভুল প্রত্যক্ষণ। তবে পার্থক্যের মধ্যে হল এই যে, ভ্রান্ত-বীক্ষণের ক্ষেত্রে কোন একটি বাহ্যিক ও বাস্তব উদ্দীপক অবশ্যই থাকবে, কিন্তু অলীক-বীক্ষণ পুরোপুরি ব্যক্তির মনোজাত অভিজ্ঞতা এবং সেক্ষেত্রে কোনও বাস্তব ও বাহ্যিক উদ্দীপক থাকে না। যেমন দড়ি না থাকলে ব্যক্তি সাপ দেখে না, ল্যাম্পপোস্ট না থাকলে ভুত দেখা যায় না। কিন্তু অলীক-বীক্ষণে এই ধরনের কোন বাহ্যিক উদ্দীপক থাকে না যা থেকে প্রত্যক্ষণটি সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে অলীকবীক্ষণ ব্যক্তির মনের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির বহির্জগতে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়।

ভ্রান্তবীক্ষণ একটি স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। নানা কারণে ব্যক্তির ভ্রান্তবীক্ষণ ঘটতে পারে। কতকগুলি ভ্রান্তবীক্ষণ আছে যা সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। কিন্তু অলীক-বীক্ষণ অস্বাভাবিক মনের ধর্ম। রোগশোক, মানসিক আঘাত, মনোবিকার

1. Illusion 2. Hallucination

প্রভৃতি নানা কারণে স্বাভাবিক অবস্থার এমন অবনতি ঘটতে পারে যার ফলে ব্যক্তির অলীকবীক্ষণের অভিজ্ঞতা ঘটে।

ভ্রান্ত-বীক্ষণকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, বহিঃকারণজাত ও অন্তঃকারণজাত। যখন বস্তুর বহিঃস্থিত কোন কারণের জন্য ভ্রান্তবীক্ষণ ঘটে, তখন তাকে বহিঃকারণজাত ভ্রান্তবীক্ষণ বলা যেতে পারে। যেমন দড়িকে সাপরূপে দেখাটা একটি বহিঃকারণজাত
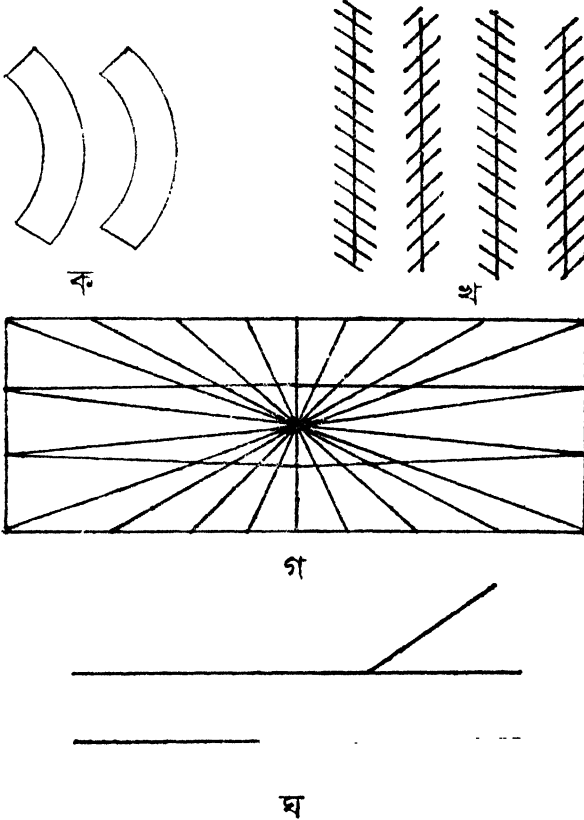
[কয়েকটি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের উদাহরণ]

(ক) ভুণ্টের ভ্রান্তবীক্ষণ। (গ) হেরিংএর ভ্রান্তবীক্ষণ।

(খ) জোলনারের ভ্রান্তবীক্ষণ। (ঘ) পগেনডর্ফের ভ্রান্তবীক্ষণ।

ভ্রান্তবীক্ষণের দৃষ্টান্ত। কেননা এই ভ্রান্ত-বীক্ষণের কারণ দড়ির মধ্যে নেই আছে বাইরে। এখানে অন্ধকার, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, তার পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কারণের জন্যই দড়িকে সাপ বলে ভুল হয়ে থাকে।

কিন্তু কোন কোন ভ্রান্তবীক্ষণের কারণ বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন কারণের জন্য এই ভ্রান্তবীক্ষণ ঘটে না। যেমন, নীচের ছবিতে ক´খ´ রেখাটিকে কখ রেখাটির চেয়ে বড় দেখাচ্ছে কিন্তু মেপে দেখলে দেখা যাবে যে দুটি রেখাই একই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এই ভ্রান্তবীক্ষণটি অন্তঃকারণজাত অর্থাৎ এর কারণটি রেখা দুটির নিজস্ব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। বস্তুত, রেখাদুটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে সে দুটি দৈর্ঘ্যে সমান হলেও একটিকে অপরটির চেয়ে
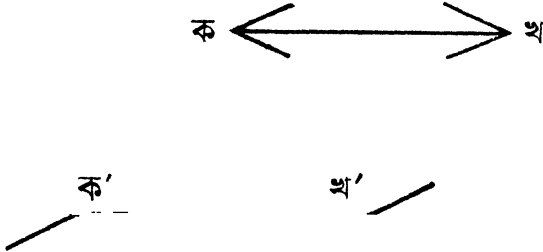
[মূলার-লায়ার ভ্রান্তবীক্ষণ]

বড় দেখায়। তার ফলে সকলেই এই ভুলটি দেখে থাকে। এই জ্যামিতিক ভ্রান্তবীক্ষণটি মুলার-লায়ার ভ্রান্তবীক্ষণ[1] নামে পরিচিত। এই ধরনের বহু জ্যামিতিক চিত্র আছে যে গুলির ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তিই ভুল দেখে থাকে। এই ক্ষেত্রগুলিকে সর্বজনীন ভ্রান্তবীক্ষণের উদাহরণ বলা চলে। আগের পাতায় এইরূপ কতকগুলি চাক্ষুষ ভ্রান্ত-বীক্ষণের ছবি দেওয়া হল। এর সবগুলির ক্ষেত্রেই বস্তুর যা প্রকৃত স্বরূপ তা আমরা দেখি না, দেখি কিছুটা অন্যরকম।

অনুশীলনী

১। সংবেদন কাকে বলে? প্রত্যক্ষণের সঙ্গে এর পার্থক্য কি?

২। সংবেদনের বিভিন্ন বিভাগগুলি কি কি?

৩। সংবেদনের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

৪। আমরা কিভাবে দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষণ করি আলোচনা কর। আমাদের স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ কি ভাবে ঘটে?

৫। ভ্রান্ত-বীক্ষণ ও অলীক-বীক্ষণ-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

৬। টীকা লেখ :—রেখামূলক চিত্রানুপাত, লম্বন, কেন্দ্রীভবন, ষ্টিরিওস্কোপ।

1. Muller-Lyer Illusion

মানব বংশধারা

ব্যক্তির আচরণের সুরু তার জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে। জন্ম বলতে যেদিন শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় সেদিনটিকেই সাধারণত বোঝায়। কিন্তু শিশুর সত্যকারের জন্ম হয় তার অনেক আগে, প্রায় ৯ মাস আগে, যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে প্রাণের সূচনা হয় পিতৃকোষ ও মাতৃকোষের সম্মিলনে। সেই দিনই সত্যকারের প্রথম যাত্রা সুরু হয় পৃথিবীর একটি নতুন মানুষের।

কোষ-বিভাজন

পিতৃকোষটি মাতৃকোষের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি কোষ মিলে একটি কোষে পরিণত হয়। এই নতুন কোষটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এই দুটি কোষের প্রত্যেকটি আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে, ৪টি কোষ আবার ৮টি কোষে, ৮টি কোষ আবার ১৬টি কোষে—এইভাবে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শীঘ্রই সেই একটি প্রাথমিক কোষের স্থানে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই সময় ঐ কোষসমষ্টি ধীরে ধীরে, একটি নল বেয়ে মাতৃ-জরায়ুতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কোষ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। প্রথম প্রথম এই নতুন কোষগুলির মধ্যে বাহ্যিক কোনও পার্থক্য থাকে না, কিন্তু প্রায় দুসপ্তাহের পর থেকে কোষগুলি ক্রমশ বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং প্রায় ৩ মাসের পর থেকে কোষগুলি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতি ধারণ করতে সুরু করে। প্রায় পুরোপুরি ৯ মাস ধরে এই ভাবে ক্রমান্বয় কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।

প্রাণীজন্মের সমস্ত রহস্য নিহিত রয়েছে এই কোষ নামক অদ্ভূত বস্তুটির ভিতর। প্রাণের মৌলিক উপাদান এবং ক্রমবিকাশের প্রয়াস, দেহমনোগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিসত্তা, স্বাতন্ত্র্য, এ সবই বীজাকারে লুকিয়ে থাকে এই কোষের ভিতর। অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই তার ভবিষ্যৎ সত্তার মৌলিক রূপটি নির্ধারিত হয়ে যায় পিতৃকোষ ও মাতৃকোষের মিলনের সময়। কেমন করে সেটি হয় তা একটু জানা দরকার।

কোষ ও ক্রোমোজোম

প্রত্যেকটি কোষের[1] আকৃতি অনেকটা গোলাকার। তার চারধারে পাতলা চামড়ার মত একটা দেওয়াল থাকে। কোষের মধ্যে থাকে কোষকেন্দ্র[2]। এই কোষকেন্দ্রের

1. Cell 2. Nucleus

চারপাশে থাকে এক ধরনের তরল জেলির মত পদার্থ, নাম প্রোটোপ্লাজম[1]। কোষ-কেন্দ্রটি হল কোষের প্রাণস্বরূপ। পিতৃকোষ এবং মাতৃকোষ, দুটিই এক একটি এই ধরনের কোষ। পিতৃকোষের আকার অনেকটা কীটের মত, আর মাতৃকোষ ডিম্বাকৃতি সম্পন্ন। এই দু'রকম কোষেরই কেন্দ্রে সুতোর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি বস্তু আছে। এগুলির নাম ক্রোমোজোম[2] বা কোষতন্তু। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মাতৃ-পিতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল ২৩টি। মাতৃ-জনন কোষ এবং পিতৃ জনন কোষের মিলনে যে নতুন কোষটি তৈরী হয় তার ক্রোমোজোমের সংখ্যা হয় ২৩ জোড়া বা মোট ৪৬টি। প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে পিতার কোষ থেকে আর একটি আসে মাতার কোষ থেকে। যখন এই আদিম কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হয় তখন নতুন কোষ দুটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৩টি এই রকম ক্রোমোজোম। এই নতুন কোষ দুটি আবার যখন বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়, তখন সেই নতুন কোষগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেও থাকে ২৩ জোড়া করে মোট ৪৬টি এই রকম ক্রোমোজোম। এইভাবে পরে যতগুলি কোষের সম্মিলনে মানব দেহের সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটিতে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম। এখানে প্রশ্ন হল, যদি মানবদেহের প্রত্যেকটি কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে তবে পিতৃজনন কোষে বা মাতৃজনন কোষে কেমন করে কেবলমাত্র ২৩টি করে ক্রোমোজোম এল। এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে কেবলমাত্র পিতৃজনন কোষ ও মাতৃজনন কোষ গঠিত হবার সময় ক্রোমোজোমগুলি স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হয়ে যায় না অর্থাৎ সেখানে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকলেও তা থেকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম-সম্পন্ন কোষ তৈরী হয় না। সে ক্ষেত্রে একটি ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের সমষ্টি ভেঙ্গে দুটি ২৩টি ক্রোমোজোম-সম্পন্ন কোষ উৎপন্ন হয়। এই অস্বাভাবিকতা ঘটে কেবলমাত্র পিতার জননকোষ এবং মাতার জননকোষের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। এই জন্যই পিতৃজনন কোষেএবং মাতৃজনন কোষে কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু অন্য যে কোন কোষে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম।

জীন

মানব শরীরে যেখানে যত কোষ আছে সব কোষের মধ্যে (অবশ্য জননকোষ-গুলি ছাড়া) ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি এক জোড়া ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাবে যে এর প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম দেখতে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গঠনের কতকগুলি পুঁতির মত বস্তু দিয়ে গাঁথা বা ভাঁজ খাওয়া একটি মালার মত। এই গোলাকার বস্তুগুলি আসলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি মাত্র। এগুলির নাম জীন[3]। এই জীনই হল প্রাণীর বংশধারার[4] একক। জীনের ক্ষমতা এক

1. Protoplasm 2. Chromosome 3. Gene 4. Heredity

রকম অসীম এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া। আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে জীনের মৌলিক উপাদান হল ডি. এন. এ[1] নামক এক ধরনের পদার্থ যেগুলির বিভিন্ন গঠন-বৈশিষ্ট্য জিনের বংশধারামূলক চরিত্র নির্ধারিত করে থাকে। জীন সবসময় জোড়ায় কাজ করে। এই জোড়ার একটি আসে মাতৃজনন কোষ থেকে আর একটি আসে পিতৃজননকোষ থেকে। যদিও প্রত্যেক জোড়া জীনের একটি আসে পিতার ক্রোমোজোম থেকে, আর একটি আসে মাতার ক্রোমোজোম থেকে, তবুও সময় সময় তারা প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়। তখন তাদের মিলিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যেমন, যদি মা ও বাবা দু'জনেরই ক্ষেত্রেই নীলচক্ষুর জীন জোড় বাঁধে, তবে সেই জীনদের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে নবজাতকের চোখ নীল হবে। কিন্তু সময় সময় মিলিত জীন দুটি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হতে পারে। তখন সাধারণত দুটি জীনের একটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অপরটি নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। দুটি জীনের মধ্যে যে জীনটি সক্রিয় হয়ে ওঠে তার বৈশিষ্ট্যই নবজাতকের মধ্যে দেখা যায়। এই জীনটিকে সক্রিয় জীন[2] বলা হয়। অপর জীনটি এই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় রূপে অবস্থান করে। এই জীনটিকে নিষ্ক্রিয় জীন[3] বলা হয়। যেমন মা ও বাবা দুজনের জীন দুটির একটি যদি নীলচক্ষু জীন হয় এবং অপরটি যদি কটাচক্ষুর জীন হয়, তবে দ্বিতীয়টি সক্রিয় হবে এবং প্রথমটি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে এবং তার ফলে নবজাতকের চোখ হবে কটা রঙের। এই ক্ষেত্রে নীলচক্ষুর জীনটি নিষ্ক্রিয় বলে তার কোন প্রভাব নবজাতকে দেখা যাবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে মানবের দৈহিক সংগঠন, মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলী, আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যাদি এ সবই নির্ধারিত হয় ক্রোমোজোম এবং জীনের জোড়বাঁধার প্রকৃতির উপর। সাধারণভাবে মানুষের ক্রোমোজোম এবং জীনগুলি মোটামুটি একই রকমের হয় বলে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের মধ্যে এত বেশী দেহগত ও আচরণগত মিল পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি মানুষের জননকোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সম্মেলন একান্তভাবে নিজস্ব যা সে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে তার জন্মের সময় উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। এই পাওয়ার মধ্যে আকস্মিকতার ভূমিকা অনেকখানি। প্রথমত, যে পিতৃকোষ এবং মাতৃকোষের সম্মিলনে একটি বিশেষ শিশু জন্মায় সেই কোষ দুটির অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনটি যে কি প্রকৃতির হবে তা আকস্মিকতার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, এই জননকোষ দুটির মিলনের সময় কোন্ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোন্ ক্রোমোজোমটি জোড় বাঁধবে এবং তারপরে আবার প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম জোড়ার অন্তর্গত কোন্ জীনের সঙ্গে কোন্ জীনটি জোড় বাঁধবে, এই দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। এই জোড়বাঁধা প্রক্রিয়াটি যে কোনও

1. DNA 2. Dominant Gene 3. Recessive Gene

ভাবে ঘটতে পারে। ফলে দু'টি জননকোষের মিলনে উৎপন্ন নতুন কোষটি বিভিন্নতার দিক দিয়ে গণনাতীত সংখ্যক হতে পারে। এই জন্যই জন্মগত উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে দুটি বিভিন্ন পিতামাতার সন্তান একেবারে অভিন্ন হবে এটা তত্ত্বের দিক দিয়ে অসম্ভব না হলেও বাস্তবে তা এক কোটিতেও একটি ঘটার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এই অসম্ভব ঘটনাটি আর এক প্রকারে সম্ভব হতে পারে। সেটি হল যখন সন্তান দুটি সমকোষী অভিন্ন যমজ[1] রূপে জন্মগ্রহণ করে।

বংশধারার সঞ্চালন

পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের বা একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে যে নানারকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাও ঐ ক্রোমোজোম বা জীনের মিলের জন্য। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকবেই, কেননা সন্তানসন্ততি যে ৪৬টি ক্রোমোজোম পিতামাতার কাছ থেকে পায়, সেগুলির মধ্যে ২৩টি পিতার নিজস্ব, ২৩টি মাতার নিজস্ব। পিতা আবার তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে এই রকম ৪৬টি ক্রোমোজোম পেয়েছিলেন এবং তা থেকে তিনি ২৩টি ক্রোমোজোম দিয়েছেন তাঁর সন্তানকে। অতএব পিতামহ-পিতামহীর ২৩টি ক্রোমোজোম কিছুটা তাঁদের পৌত্র-পৌত্রীর মধ্যে সরাসরি চলে আসে। সেই জন্যই পিতামহ-পিতামহীর সঙ্গে পৌত্র পৌত্রীর কিছুটা মিল প্রায়ই থাকে। ভাইবোনদের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাও একই কারণে। পিতৃকোষে এবং মাতৃকোষে যথাক্রমে পিতা এবং মাতার মোট ৪৬টি ক্রোমোজোমের অর্ধেক অর্থাৎ ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। যদিও বিভিন্ন পিতৃকোষে এবং মাতৃকোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে, তবুও কিছু কিছু ক্রোমোজোম বিভিন্ন পিতৃকোষে বা মাতৃকোষে অভিন্ন হবেই। ফলে যদিও ভাইবোনেরা পিতৃকোষ ও মাতৃ-কোষের ক্রোমোজোমের বিভিন্ন সম্মেলন থেকে জন্ম লাভ করে, তবুও তাদের মধ্যে কিছুটা মিল সব সময়ই থাকে।

সমকোষী যমজ ও ভিন্নকোষী যমজ

অবশ্য সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য চরম প্রকৃতির হয়ে থাকে সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানেরা একই পিতৃকোষ এবং মাতৃকোষের সম্মিলন থেকে উদ্ভূত হয়। সাধারণত পিতৃকোষ ও মাতৃকোষের মিলনে যে একটি কোষের সৃষ্টি হয় তা প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। পরে ঐ কোষ দুটি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। কিন্তু অভিন্ন যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে এই দ্বিধাবিভক্ত কোষ দুটি পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পরে কোষ বিভাজনের ফলে দুটি কোষ থেকে দু'টি বিভিন্ন শিশু জন্মলাভ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অভিন্ন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি সম্পূর্ণ একই

1. Identical Twins

কাছ থেকে পান ২৩টি করে ক্রোমোজোম,

অর্থাৎ মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম

সন্তান জন্মের সময় এঁরা প্রত্যেকে তাকে নিজের অর্ধেক ক্রোমোজোম দেন

২৩ ২৩ ২৩ ২৩

বাবার কাজ কেবল নিজের অর্ধেক ক্রোমোজোম সন্তানের দেহে সঞ্চালিত করা

২৩, ২৩
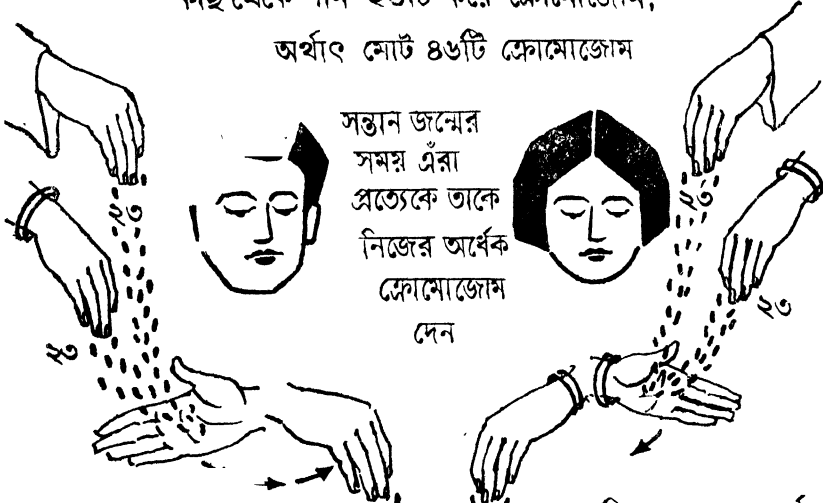
মা যদিও সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন তবু তিনিও তাকে নিজের অর্ধেক ক্রোমোজোমের বেশী আর কিছুই দেন না

৪৬

এই ৪৬টি ক্রোমোজোমই একত্রে শিশুর বংশধারার নির্ণায়ক সমস্ত উপাদানই ধারণ করে

. বংশধারা কিভাবে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে নবজাতকে সঞ্চালিত হয় তার চিত্র ।

থাকে এবং সেইজন্য তাদের বংশধারাও সম্পূর্ণ এক হয়। কিন্তু ভিন্নকোষী[1] বা সাধারণ যমজ সন্তানেরা সাধারণ ভাইবোনের মতই বিভিন্ন পিতৃকোষ বা মাতৃকোষের মিলনে উৎপন্ন হয়। পার্থক্যের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে পিতৃকোষ বা মাতৃকোষ দুটির মিলন একই সময় ঘটে থাকে। সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বংশধারার যতটুকু সাদৃশ্য থাকতে পারে তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য এই ধরনের যমজ সন্তানের মধ্যে থাকতে পারে না। অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে হয় দুটিই ছেলে হবে, নয় দুটিই মেয়ে হবে, একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ যমজের ক্ষেত্রে একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে খুবই হতে পারে। তাছাড়া তাদের মধ্যে শারীরিক আকৃতি, চেহারা, মানসিক শক্তি প্রভৃতির দিক দিয়েও যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু অভিন্ন যমজদের মধ্যে এসব দিক দিয়েই অদ্ভুত মিল দেখা যায়। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে যমজ সন্তানদের পর্যবেক্ষণ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলে তাদের আচরণের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ বা শিক্ষার প্রভাব কতটুকু এবং কিভাবেই বা তা কার্যকর হয় তা জানা সম্ভব হয়। কেননা জন্মের সময় অভিন্ন যমজদের জন্মগত উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ এক হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে যেটুকু বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তা অবশ্য সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রসূত। কিন্তু সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে কিংবা সাধারণ যমজদের মধ্যে বংশধারা অভিন্ন নয় বলে তাদের মধ্যে পার্থক্য বংশধারা প্রসূতও হতে পারে, আবার শিক্ষাপ্রসূতও হতে পারে। সেইজন্য তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব এবং বংশধারার প্রভাব, এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

বংশধারাব স্বরূপ

বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের মুহূর্তে তার পিতামাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে।

বংশধারা হল সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলী অথাৎ এগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। শিশু জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকেই নানা নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সুরু করে। যেহেতু শিশু তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে সেহেতু সেগুলি নিছক শিক্ষার দান এবং সেগুলি থেকে বংশধারাকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করতে হবে।

সাধারণত প্রচলিত ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র পিতামাতার সঙ্গে শিশুর যেটুকু সাদৃশ্য আছে সেটুকুকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সাদৃশ্যগুলি যেমন শিশুর বংশধারার অন্তর্গত, তেমনই বৈসাদৃশ্যগুলিও তার বংশধারার একটা অপরিহার্য

1. Fraternal Twins

অঙ্গ। কেননা পিতামাতার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই শিশু তার উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া ক্রোমোজোম এবং জীনের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

বংশধারার শ্রেণীবিভাগ

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যথা,—১। দেহগত[1], ২। মানসিক[2] এবং ৩। মনঃপ্রকৃতিগত[3]।

দেহগত বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আকৃতি, গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রন্থিগত[4] বৈশিষ্ট্যগুলি। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির কার্যধারার উপর দেহের বৃদ্ধি ও মনের সংগঠন অতি ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করে।

মানসিক বংশধারার মধ্যে পড়ে নানা মানসিক বৈশিষ্ট্য। প্রথম আসে ব্যক্তির প্রক্ষোভগত সংগঠন এবং সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হল তার চিন্তন, কল্পন, ইচ্ছন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল ব্যক্তির সহজাত বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তিগুলিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং নানা বিশেষ-ধর্মী শক্তিসমূহ। বিশেষধর্মী শক্তি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন কাজে বা ক্ষেত্রে পারদর্শিতা বা দক্ষতা দেখানোর ক্ষমতা, যেমন, গাণিতিক শক্তি, ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি ইত্যাদি।

মনঃপ্রকৃতি বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য—যাকে আমরা চলিত ভাষায় মুড বা মেজাজ বলে থাকি। দেখা গেছে যে মনের মৌলিক কাঠামোটির সংগঠন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন।

পরিবেশের স্বরূপ

পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্ব। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে আমরা পরিবেশকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। বস্তুত, পরিবেশের প্রকৃত গণ্ডী ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বটুকুর বাইরে আরও অনেক দূরে বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষা-বিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টিকে যা ব্যক্তির উপর কোন না কোন রূপে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে কিছু মাত্রায় বদলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী কোন প্রত্নতত্ত্বিবদের সত্যকার পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোন বিস্মৃত প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে, তেমনই কোন জ্যোতির্বিদের পরিবেশ দু-পাঁচশো আলোকবর্ষ দূরের কোন অজ্ঞাতনামা

1. Physical 2. Mental 3. Temperamental 4. Glandular

নীহারিকাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এক কথায় পরিবেশ হল সেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়।

জন্মের মুহূর্ত থেকে শিশু কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে এবং সেই পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন শক্তি তার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করে দেয়। শিশুকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নতুবা তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতিবিধান বলা হয়। আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে আচরণের যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা। অতএব পরিবেশের প্রভাব এবং শিক্ষাকে আমরা অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি।

পরিবেশ বড়, না বংশধারা ?

পরিবেশ ও বংশধারা নিয়ে একটি জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে। সে বিতর্কটি হল, ব্যক্তির জীবন গঠনে বংশধারা বড়, না পরিবেশ বড়। এ নিয়ে বহু গবেষণাও হয়েছে।

বংশধারাবাদী

একদল শিক্ষাবিদ্ বলেন যে শিশুর জীবনগঠনে বংশধারাই সব, পরিবেশের মূল্যই নেই। শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সে বংশধারাই সম্পূর্ণভাবে তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তার পরিবেশ যেমনই হোক্ না কেন। অর্থাৎ পরিবেশ ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ার কোন মূল্যই নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। এঁদের আমরা বংশধারাবাদী[1] বলে বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না' বা ইংরাজী প্রবাদ 'শুয়োরের কান থেকে সিল্কের থলি তৈরী হয় না' ইত্যাদি উক্তিগুলি এই বংশধারাবাদেরই সমর্থক। বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব খুবই কম। তারা যখন বংশধারাকে অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ বলে ধরে নিয়েছেন তখন স্পষ্টই তাঁরা শিক্ষার প্রভাব বা ভূমিকার বিশেষ কোন মূল্য দিচ্ছেন না। তাঁদের মতে শিক্ষা শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

পরিবেশবাদী

তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁরা ব্যক্তির জীবনে বংশধারার কোন মূল্য দিতে চান না। তাঁদের কাছে পরিবেশই সব। এঁদের মতে উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে খুশীমত গড়ে তোলা যায়, তা তার বংশধারা যাই হোক্ না কেন। এঁদের আমরা পরিবেশবাদী[2] বলতে পারি। প্রসিদ্ধ আচরণবাদী

1. Hereditarian 2. Environmentalist

ওয়াটসন একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে তাঁকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং যদি তিনি নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন তবে তিনি সেই শিশুটিকে তাঁর খুশীমত যে কোন শ্রেণীর মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারেন—ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, ব্যবসাদার এমনকি, ভিক্ষুক, চোর রূপেও। শিশুটির পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ্য, বৃত্তি, জাতি ইত্যাদি যাই হোক্ না কেন, তাতে কিছু এসে যাবে না।

বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার বিশেষ মূল্য নেই, পরিবেশবাদীদের কাছে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। পরিবেশবাদীরা বংশধারার বিশেষ কোন মূল্য দেন না। তাঁদের কাছে শিক্ষাই সব, অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী।

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নানা শ্রেণীর গবেষণা বহুদিন হতেই চলে আসছে।

বংশধারামূলক গবেষণা :: কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের[1] নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীদের পূর্বতন কয়েক পুরুষের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা নির্ধারিত হয় তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা। কার্ল পিয়ার্সন[2] গ্যাল্টনের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণের কাজটি পরে আরও চালিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর প্রাপ্ত ফলাফল মোটামুটিভাবে গ্যাল্টনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন ডাগডেল[3]। তাঁর প্রসিদ্ধ ইয়ুক্স[4] পরিবারের পর্যবেক্ষণ বংশধারাবাদীদেরই স্বপক্ষে যায়। কুখ্যাত অপরাধী ইয়ুক্সের পরিবারে নিম্নমনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আধিক্য দেখে ডাগডেল সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তিসত্তা গঠনে বংশধারার প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। গডার্ডের[5] কালিকাক[6] পরিবারের পর্যবেক্ষণটিও বংশধারাবাদীদের স্বপক্ষে একটি বড় প্রমাণ বলে উল্লেখ করা যায়। গত আমেরিকা বিপ্লবের সময় এক ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন স্থানে দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সঙ্গে বসবাস করে। তাদের মধ্যে একজন ছিল উন্নতবুদ্ধি এবং উচ্চবংশজাত। অপরটি স্বল্পবুদ্ধি এবং সমাজের নিম্নস্তর থেকে প্রসূত। কালক্রমে এই দুটি নারীকে অবলম্বন করে ঐ ব্যক্তির দুটি বিভিন্ন বংশশাখা গড়ে ওঠে। গডার্ড এই দুটি বংশশাখা পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে,

1. Francis Galton 2. Karl Pearson 3. Dugdale 4. Jukes 5. Goddard 6. Kalikak

উন্নতবুদ্ধি মেয়েটির বংশে উন্নতস্তরের ছেলেমেয়েই বেশী জন্মেছে এবং স্বল্পবুদ্ধি মেয়েটির বংশের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই সমাজের নিম্নস্তরে বাস করছে। এছাড়া গডার্ড আরও ৩২৪টি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৫৪টির বংশধরই তাদের পূর্বগামীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষীণবুদ্ধিতা লাভ করেছে।

পরিবেশের প্রভাব

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশের প্রভাব কি প্রকৃতির এবং কতটুকু তা নির্ণয়ের জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জন্মের মুহূর্ত থেকে বিভিন্ন পরিবেশের শক্তিগুলি কিভাবে শিশুর বংশধারাকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে।

গর্ভস্থিত অবস্থায় পরিবেশের প্রভাব

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশ যে একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর আলো দেখার আগে প্রতিটি শিশুকে প্রায় দশমাসের মত সময় মাতৃগর্ভে কাটাতে হয়। সেই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ অনেকগুলি পারিবেশিক শক্তির উপর নির্ভর করে। সেগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) মায়ের বয়স (২) মায়ের পূর্বের গর্ভসংখ্যা (৩) মায়ের ব্যাধি ও অসুস্থতা (৪) মায়ের পুষ্টি (৫) সংক্রামক ব্যাধি (৬) ওষুধের ব্যবহার (৭) বিশেষ ধরনের শারীরিক ঘটনা এবং (৮) মায়ের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা।

বহু পরীক্ষণ থেকে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই পারিবেশিক কারণগুলি গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর শারীরিক গঠন, ওজন, উচ্চতা, বিভিন্ন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, এমন কি প্রক্ষোভমূলক এবং মানসিক সংগঠনও এই শক্তিগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

যমজ পর্যবেক্ষণ

ব্যক্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যমজসন্তান পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যমজ সন্তান দু'শ্রেণীর হতে পারে— সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ। সমকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে দুটি শিশুই এক এবং অভিন্ন মাতৃ পিতৃকোষ থেকে জন্মেছে এবং ভিন্নকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে দুটি সন্তান দুটি বিভিন্ন মাতৃ-পিতৃকোষ থেকে জন্মলাভ করেছে। সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়। এখন যদি সমকোষী যমজ

শিশু দুটিকে তাদের জন্মের পর থেকে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ করা হয় এবং পরে তাদের পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখা যায় যে তাদের পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই প্রকৃত শক্তিশালী, পরিবেশের শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু অপরপক্ষে যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা দিয়েছে তবে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাবই সত্যকারের গুরুত্বপূর্ণ।

ভিন্নকোষী যমজ সন্তানের জন্মের হার প্রতি হাজারে দশ থেকে বার। আর সমকোষী যমজ সন্তানের জন্মের হার প্রতি হাজারে তিন থেকে চার। যেহেতু সমকোষী যমজেরা পিতা ও মাতার জীনের একই সমাবেশ থেকে জন্মায় সেহেতু তাদের বংশধারা অভিন্ন হয়। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন সমকোষী যমজের ক্ষেত্র খুবই কম পাওয়া যায়। থর্নডাইক, মেরীম্যান, নিউম্যান, ফ্রীম্যান, হলজিনগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া সমকোষী যমজ সন্তান নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষণ চালান। নিউম্যান, ফ্রীম্যান ও হলজিনগার কর্তৃক ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত টুইনস্ নামক বহুখ্যাত যমজ পর্যবেক্ষণের বিবরণীতে এই ধরনের ১৯টি যমজের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরেও নিউম্যান এবং মুলার আরও ১০টি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানেরা ঘটনার বৈচিত্র্যে দুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে। সুইসনগার[1] এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফলগুলির একটি সারাংশ রচনা করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার যমজ সন্তান দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হলেও তাদের পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে না। তার ফলে তাদের দৈহিক আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি এক রকমেরই হয়। কিন্তু যেখানে পরিবেশের মধ্যে সত্যকারের বৈষম্য থাকে সেখানে দুজনের মধ্যে সব দিক দিয়ে কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যমজ সন্তানদের এক জন আর একজনের চেয়ে উচ্চতায় এবং ওজনে কম বা বেশী হয়েছে। তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে আস্বাদনের ক্ষমতা, রোগপ্রবণতা প্রভৃতির দিক দিয়েও সমকোষী যমজদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা গেছে। সমস্ত পর্যবেক্ষকদের মতেই উচ্চতা, আকার, মাথার আকৃতি, মনোবিকারমূলক প্রবণতা ইত্যাদির উপর পরিবেশ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মোটামুটিভাবে একই রকম পরিবেশে অভিন্ন যমজ সন্তানেরা মানুষ হলে তাদের মধ্যে অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। সেখানে পরিবেশ স্বতন্ত্র হলেও তাদের প্রকৃতিগত অভিন্নতার জন্য যমজদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। নীচের ক্ষেত্রটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নিউম্যান নামক একজন মনোবিজ্ঞানী এড্‌উইন[2] ও ফ্রেড[3] নামে দুটি অভিন্ন যমজ

1. Schwesinger 2. Edwin 3 Fred

সন্তানের সন্ধান পান। এরা খুব অল্প বয়সেই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়। এদের বয়স যখন ২৬ তখন নিউম্যান তাদের আবিষ্কার করেন। তাদের পরীক্ষা করে তিনি দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের মিল দেখতে পান। চোখের ও চুলের রঙ, দাড়ি গোঁফ, গায়ের রঙ, কানের গঠন, সাধারণ আকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য ছিল না। উচ্চতা ও ওজনও দু'জনের প্রায় একই রকম ছিল। তাদের দু'জনেরই বিদ্যুৎসংক্রান্ত কাজে আগ্রহ জন্মেছিল এবং দু'জনেই তাদের নিজের নিজের সহরে কোন টেলিফোন কোম্পানীর মেরামতি বিভাগে কাজ করত। দুজনেই বিয়ে করেছিল একই বয়সের এবং একই প্রকৃতির দুটি মেয়েকে এবং একই বছরে। প্রত্যেকেরই একটি করে ছেলে জন্মেছিল এবং প্রত্যেকেই একটি করে ফক্স টেরিয়ার কুকুর পুষেছিল এবং সবচেয়ে মজার কথা তার নামও তারা একই দিয়েছিল—ট্রিক্সি।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে মানুষের উপর বংশধারার প্রভাবই বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যদিও ফ্রেড ও এডুইন দুটি বিভিন্ন সহরে ও বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছিল, তাদের পরিবেশ বলতে গেলে একপ্রকার অভিন্নই ছিল। সেজন্য এক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবজনিত কোন বৈষম্য তাদের মধ্যে দেখা যায় নি।

কিন্তু যখনই সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে অভিন্ন যমজ সন্তানেরা মানুষ হয় তখনই তাদের উপর পরিবেশজনিত পার্থক্য বেশ ভালভাবেই দেখা দেয়। নীচের অভিন্ন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্ল্যাডিস[1] এবং হেলেন[2] নামে দুটি সমকোষী যমজ ঘটনাচক্রে ১৮ মাস বয়সে পৃথক হয়ে যায়। হেলেনের পালিকা মাতা নিজে শিক্ষিত না হলেও হেলেনকে স্কুলে-কলেজে পড়িয়ে বি এ পাশ করান। হেলেন পাশ করে শিক্ষিকার কাজ নেয় এবং একজন শিক্ষিত আসবাব ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করে। লেখাপড়া শিখে হেলেনের মধ্যে যথেষ্ট মার্জিত হাবভাব সৃষ্টি হয়। লোকের সঙ্গে সামাজিক আচরণে তার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা ছিল না এবং নারীসুলভ আকর্ষণও তার মধ্যে যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু গ্ল্যাডিসের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত ঘটে। অতি শৈশবেই তার লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়। ক্যানাডার নির্জন রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং বিভিন্ন মিল ও কারখানায় জীবিকার জন্য তাকে কাজ করে বেড়াতে হয়। হেলেনের স্বাস্থ্য মোটের উপর সব সময়ই ভাল ছিল। কিন্তু গ্ল্যাডিস ছিল ক্ষীণস্বাস্থ্য ও প্রায়ই রোগে ভুগত। ৩৫ বছর বয়সে যখন তাদের দুজনকে আবিষ্কার করা হল তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য। উচ্চতা, ওজন, চুলের রং প্রভৃতি দিক

1. Gladys 2. Helen

দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ না থাকলেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেল। মুখের ভাব, চেহারার বাঁধুনি, নারীসুলভ সৌন্দর্য্য ইত্যাদির দিক দিয়ে হেলেন গ্ল্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। তাছাড়া হেলেন ছিল আত্মবিশ্বাসী, মার্জিতা, মাধুর্যময়ী এবং আচরণে আক্রমণধর্মী। গ্ল্যাডিস কিন্তু ছিল দুর্বলচেতা, অমার্জিতা, অস্থিরচিত্তা ও সৌন্দর্যহীনা।

মানসিক শক্তি এবং বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার দিকও দিয়ে হেলেন গ্ল্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত বলে প্রমাণিত হল। হেলনের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১১৬, আর গ্ল্যাডিসের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ৯২, মোট ২৪ পয়েন্টের তফাৎ। হাতের লেখার ধাঁচের দিক দিয়েও দুজনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেল। হেলেনের হাতের লেখা বেশ পরিণত, কিন্তু গ্ল্যাডিসের হাতের লেখা ১৪।১৫ বৎসর বয়সের মেয়েদের মত কাঁচা। ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যে এই দুই যমজের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে সমকোষী যমজেরা মানুষ হলে তাদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য, আচরণ, অভ্যাস, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ, মানসিক শক্তি ইত্যাদি সব দিক দিয়েই বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা দিতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষায় হেলেন এবং গ্ল্যাডিসের মধ্যে যে ২৪ পয়েন্টের পার্থক্য দেখা গেছে তা গুরুত্বের দিক দিয়ে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এর দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষে বংশধারার উপর পরিবেশের প্রভাব যে সত্যই কার্যকর তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

বংশধারা ও বুদ্ধি

বুদ্ধির দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তা-নির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর অভিমত। সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান, এক পিতামাতার সন্তান, এক গোষ্ঠীভুক্ত ভাইবোন প্রভৃতির উপর প্রদত্ত বুদ্ধির অভীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে যে অভীক্ষাথীদের মধ্যে বংশধারার সমতা যত বেশী, বুদ্ধির অভীক্ষার ফলও তত কাছাকাছি। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের বিচারে এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সহপরিবর্তনের মানের[1] তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

সমকোষী যমজ	·৯০
ভিন্নকোষী যমজ	·৭৫
এক পিতামাতার সন্তান	·৫০
এক গোষ্ঠীভুক্ত ভাইবোন ...	·২৫
সম্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে	·০০

1. Coefficient of Correlation

পূর্বপৃষ্ঠার পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেশী নিকট হয় তাদের বুদ্ধির ক্ষমতার মধ্যেও তত বেশী মিল থাকে।

এ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক মর্যাদারও একটা নিকট সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে, যে সকল ব্যক্তি উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অনুসরণ করে তাদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন হয় আর যারা ছোটখাট ব্যবসা, কেরানিগিরি, মিস্ত্রিগিরি ইত্যাদি সাধারণ স্তরের পেশা অনুসরণ করে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা যায়। বুদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাব যে উল্লেখযোগ্য তা এই থেকে প্রমাণিত হয়।

বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তার উপর পরিবেশের প্রভাব

বুদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাবকে সর্বাধিক ধরে নিলেও এমন অনেক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে যেখানে পরিবেশের বৈষম্যের জন্য বুদ্ধির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। নিউম্যান, ফ্রিম্যান প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য সমকোষী যমজদের মধ্যেও ১০ থেকে ২০ পয়েণ্ট পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০ পয়েণ্টেরও পার্থক্য পাওয়া গেছে। হেলেন ও গ্ল্যাডিসের ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের তফাৎ ছিল ২৪ পয়েণ্টের।

এই থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে বংশধারার প্রভাব অনস্বীকার্য হলেও পরিবেশেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। ১৯.০ সালে নিউম্যান, ফ্রিম্যান, হলজিনগার একই পরিবেশে পালিত ৫০টি ভিন্নকোষী যমজ এবং ৫০টি সমকোষী যমজ এবং ভিন্ন পরিবেশে পালিত ১৯টি সমকোষী যমজ পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশধারার প্রভাব বড় হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই বড় হয়ে ওঠে। যেমন উদাহরণস্বরূপ, দেখা গেল যে খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও একটি ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০'র বেশী উঠল না। বুঝতে হবে যে এখানে বংশধারা পরিবেশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী। আবার একটি ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পন্ন ছেলে ভাল পরিবেশের সাহায্য পাওয়ায় ১২০ বা ১৩০ বুদ্ধ্যঙ্কে উঠে গেল। এখানে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাব বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করেছে।

বুদ্ধির উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে মতভেদের কারণ থাকলেও ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকগুলির উপর যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এক রকম একমত। এ্যাভিরনের[1] বন্যবালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত

1. Aveyron

নেকড়ে-পালিত মানবশিশু প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা ব্যক্তিসত্তার উপর পরিবেশের অসীম প্রভাবের প্রমাণ পাই। সাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন এই শিশুগুলি কেবল উপযুক্ত পরিবেশের অভাবেই স্বাভাবিক মানুষ হয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে নি। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সকল প্রকার মানসিক শক্তিই উপযুক্ত সংস্কৃতিমূলক ও সামাজিক পরিবেশের সাহায্য ভিন্ন পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।

ইংলণ্ডের ক্যানাল বোটের ছেলেমেয়ে, জিপ্সী ছেলেমেয়ে বা সুদূর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ছেলেমেয়ে প্রভৃতি যারা শৈশবে উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় না তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে সাধারণ শহরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে তারা অনেক দিক দিয়ে বেশ পশ্চাদ্‌পদ থেকে যায়।

আয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের[1] শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটিতে শিশুদের উপর নার্সারি স্কুলে যোগদানের প্রভাব নিয়ে যে দীর্ঘ গবেষণা চালান হয়, তা থেকে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সকল ছেলেমেয়ে নার্সারি স্কুলে সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের চেয়ে মানসিক শক্তির দিক দিয়ে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে। পরিবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্মিদ্‌টের[2] আর একটি পরীক্ষণ থেকে পরিবেশের অসীম ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। স্বল্পবুদ্ধি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এমন ২৫৪টি ছেলেমেয়েকে উন্নত এবং সুপরিকল্পিত পরিবেশে রেখে দেখা গেল যে তিন বছরের মধ্যে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। লেখাপড়ার দিক দিয়ে তারা অদ্ভুত উন্নতি ত করলই, এমন কি তিন বছর পরে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাত্র ৭·২% ছেলেমেয়ে স্বল্পবুদ্ধি বলে প্রমাণিত হল। এ থেকে যদিও প্রমাণিত হচ্ছে না যে পরিবেশই এই ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির উন্নতির একমাত্র কারণ, তবুও এ পর্যবেক্ষণ থেকে একথা অবশ্যই বলা চলে যে বুদ্ধিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে এবং অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াকে সুপরিণত করতে পরিবেশ যথেষ্টই সাহায্য করে থাকে।

শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব

বংশধারা ও পরিবেশের উপর এই সকল গবেষণা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি বড় এবং কোন্‌টি ছোট, এ বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন ও অর্থহীন। কেননা, যেমন কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তুলতে পারে না, তেমনই কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশসাধন করতে পারে না। ব্যক্তিসত্তা হল

1. Iowa University 2. Schimdt

এ দু'য়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা যোগায় কাঁচামাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পরিণত রূপটি।

আবার কেবলমাত্র বংশধারা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই ব্যক্তিসত্তা বলে ধরে নিলে ভুল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করলে কেবল খানিকটা বংশধারা আর খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে যে তাও নয়। এ দুয়ের পারস্পরিক সংঘর্ষে দুইই বদলে যায় এবং তাদের মধ্যে থেকে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্যক্তিসত্তা।

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার ভূমিকার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা নিয়ন্ত্রিত করে দেবে। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি স্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টানা হবে এই সব মূল্যবান তথ্য নির্ধারিত করে দেবে শিশুর বংশধারা।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণ-ভাবে দৈহিক আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবিত করে না। তবে এ কথা সত্য যে যদি শিশুর কোন শারীরিক ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকে তবে তা শিশুর শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অ্যাডলারের[1] পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে তীব্র হীনমন্যতার[2] বোধ জন্মায় এবং তাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিক সংগঠন এবং আচরণ-বৈশিষ্ট্য এই মনোভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

মানসিক বংশধারা শিশুর শিক্ষাকে সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে শিশুর শিক্ষায় বুদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে স্কুল কলেজে সাফল্য অনেকখানি (সহপরিবর্তনের মান বা $r = \cdot৬০$) নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী এই তথ্যের উপর তার শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলেই সাধারণভাবে মনোবিজ্ঞানীরা ধরে নেন। এই ব্যাপারটা বুদ্ধ্যঙ্কের অপরি-বর্তনীয়তা নামে পরিচিত।[3] এই সূত্রটি অনুযায়ী শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে এই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিরোধিতা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে কখন কখন বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তনও ঘটান যায়। তবে এই মতবাদটি এখনও সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নি। বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক শক্তি ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে এবং সেগুলি শিশুর

1. Adler 2. Sense of Inferiority 3. পৃঃ ১০১

শিক্ষাকে রীতিমত প্রভাবিত করে থাকে। ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষধর্মী শক্তিগুলি শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

এই সকল তথ্য থেকে আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর বিভিন্ন মানসিক শক্তি সহজাত ও একরকম অপরিবর্তনীয়। অতএব শিশুর শিক্ষা এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনঃপ্রকৃতির বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই মনঃপ্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ধারিত করে এবং তার ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি গড়ে তোলে। শিশুর মানসিক সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মনঃপ্রকৃতি বা মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার প্রকৃতির উপর শিক্ষার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে এবং মনঃপ্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের উপর।

কিন্তু তা বলে একথা ভাবলেও ভুল হবে যে ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিপথ এবং সীমারেখা নির্ধারিত করে দেয়। কিন্তু শিক্ষার মূল অবয়বটি গড়ে ওঠে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে গড়ে তোলে। হাতুড়ির ঘায়ে যেমন আকৃতিহীন লোহার তাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারাটি সাবয়ব হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর শিক্ষা একদিক দিয়ে যেমন বংশধারাব উপর নির্ভরশীল তেমনই আবার নির্ভরশীল পরিবেশের বিভিন্নধর্মী শক্তিসমষ্টির উপর।

পরিবেশ ও বংশধারার ভূমিকা এবং শিক্ষকের কর্তব্য

এই আলোচনা থেকে আমরা আর একটি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। শিশুর শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্তা গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন এতখানি নির্ভর করে তখন এ দিক দিয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না বা তার সঙ্গে কিছুটা যোগ করেও দিতে পারেন না, এ কথা সত্য। কিন্তু বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করাটা বহুলাংশে শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার বিকাশের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ভর করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধারা স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

পেতে পারে এবং যথাসময়ে তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে। বস্তুত বংশধারা থাকে অবিকশিত সম্ভাবনা-বৈচিত্র্যের রূপে শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায়। একমাত্র উপযুক্ত পারিবেশিক শক্তিসমূহই সেই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে জাগাতে এবং পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে।

সেদিক দিয়ে শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সুবিবেচক শিক্ষকের কি কি করা উচিত তার একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিশুর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষা প্রক্রিয়াটির পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা এবং যাতে শিক্ষার্থী সার্থক ও কার্যকর শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা।

৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই মত শিক্ষার বিষয়বস্তুকে বহুমুখী ও শিক্ষার্থীর উপযোগী করে তোলা।

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে তাদের আচরণগত সমস্যাগুলির সমাধান ও প্রয়োজন হলে তাদের মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা।

৫। স্কুলে স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা। ক্লাসঘরগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং আলো-বাতাসময় করা। খেলাধুলা এবং অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা।

৬। শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার করা। সেই সঙ্গে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা।

৭। শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, সুষম খাদ্যের আয়োজন করা, প্রয়োজনমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিনিষেধ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করা।

৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। যে সকল শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ তাদের অসাফল্যের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা এবং সেগুলি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া।

৯। সু-পরিচালনা ও সুমন্ত্রণার সাহায্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপযোগী কর্মসূচী অনুসরণ করতে সাহায্য করা।

বংশধারার তত্ত্বাবলী

কেমন করে বংশধারা পিতামাতার কাছ থেকে তাঁদের সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চালিত হয় তার মোটামুটি একটি চিত্র আমরা পেয়েছি। প্রকৃতির এই সৃজন রহস্য সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বহুদিন অত্যন্ত সীমিত ছিল। বর্তমানে নানা গবেষকদের ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে প্রাণীর সৃষ্টিরহস্যের বহু মূল্যবান তথ্য আজ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মেণ্ডেলবাদ[1]

বংশধারার অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন গ্রেগরি মেণ্ডেল নামে একজন অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক। ১৮৮৬ সালে তিনি শুঁটি, মৌমাছি প্রভৃতির বংশবিস্তার নিয়ে পরীক্ষণ চালান এবং তা থেকে যে কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করেন, সেগুলির উপরেই আধুনিক কালের বংশধারা সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী গবেষণার ফলে মেণ্ডেলের তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু তাহলেও মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত মৌলিক সূত্রগুলি আজও একপ্রকার অপরিবর্তিতই আছে বলা যায়।

বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্র

মেণ্ডেলবাদের সবচেয়ে বড় অবদান হল বংশধারা-এককের[2] পরিকল্পনাটি। এই তত্ত্বটির অর্থ হল যে প্রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি পায় সেগুলির পেছনে বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট বংশধারা-এককের ভূমিকা আছে। অর্থাৎ প্রাণীর সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি সুনির্দিষ্ট ও অখণ্ড সত্তাসম্পন্ন। বংশধারার এই তত্ত্বটিকে বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্র[3] বলে বর্ণনা করা হয়। এই বৈশিষ্ট্য বা বংশধারার এককগুলির আধার হল জনন-কোষের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমগুলি বা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জীনগুলি। যেমন শিশুর কটা চোখ হওয়ার পেছনে আছে বাবা-মার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের জীনটি। সেই রকম শিশু স্বল্পবুদ্ধি হওয়াব পেছনে আছে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া স্বল্পবুদ্ধির জীনটি ইত্যাদি।

সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় জীনের তত্ত্ব

মেণ্ডেলবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় জীনের[4] পরিকল্পনাটি। অর্থাৎ শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে যে বংশধারা-একক বা জীনটি পায় সেটি সক্রিয়ও হতে পারে, আবার নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে। জীনটি যদি সক্রিয় হয় তবে তার বৈশিষ্ট্যটি নবজাতকে প্রকাশ পাবে, আর নিষ্ক্রিয় হলে তার কোনরূপ প্রভাবই নবজাতকে দেখা যাবে না।

1. Mendelism 2. Heredity Units 3. Law of Unit Character 4. Dominant-Recessive Genes

প্রথম শ্রেণীর জীনকে সক্রিয় জীন বলা হয়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জীনকে নিষ্ক্রিয় জীন বলা হয়। যেমন, যদি কটা চোখের জীন নীল চোখের জীনের সঙ্গে জোট বাঁধে তবে শিশু কটা চোখের অধিকারী হয়। কেননা কটা চোখের জীন হল সক্রিয় জীন আর নীল চোখের জীন হল নিষ্ক্রিয় জীন। তার ফলে নবজাতক নীল চোখের অধিকারী না হয়ে কটা চোখের অধিকারী হবে। তবে নীল চোখের জীনটি শিশুর ক্ষেত্রে

[মেণ্ডেলবাদের চিত্ররূপ]
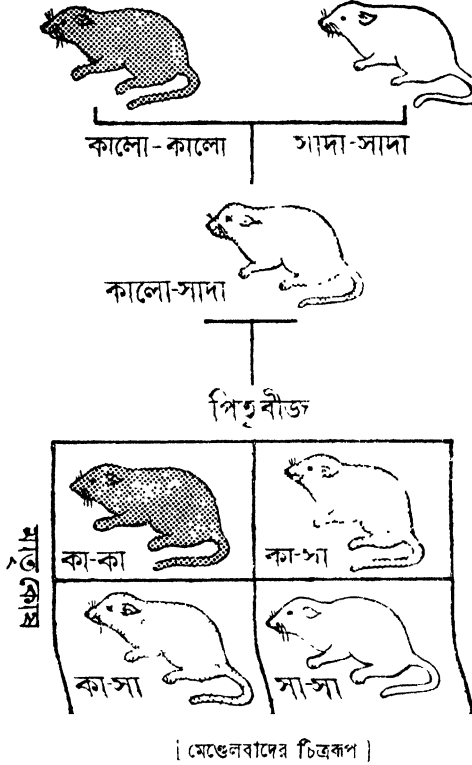
নিষ্ক্রিয় হলেও সেটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। সেটি সুপ্ত অবস্থায় ঐ ব্যক্তির মধ্যে নিহিত থাকে এবং তার পরবর্তী বংশধরের ক্ষেত্রে সক্রিয় জীন রূপে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির পরবর্তী কোন বংশধর নীল চোখের অধিকারী হয়ে জন্মাতে পারে।

জীনের এই সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও বিশেষ একটি নিয়ম দেখতে পাওয়া

১। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে জীনের অভ্যন্তরে ডি-এন-এ (DNA) নামক একটি পদার্থ-শৃঙ্খল থাকে যা এই বংশধারার বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রকৃত বাহক।

যায়। যেমন, কালো ইঁদুর এবং সাদা ইঁদুরের মিলনের ফলে সমস্ত বাচ্চা হবে কালো রঙের। এখানে কালো রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন—এ'দুয়ের মধ্যে কালো রঙের জীন হল সক্রিয় এবং সাদা রঙের জীন হল নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য সব বাচ্চাই হল কালো রঙের। কিন্তু বাচ্চাগুলি কালোরঙের হলেও তারা হল মিশ্র প্রকৃতির জীন সম্পন্ন অর্থাৎ তাদের জননকোষে কালো রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন দুই-ই পাশাপাশি রইল যদিও কালো রঙের জীন সক্রিয় বলে তাদের সকলের গায়ের রঙ কালো হল।

এখন এই মিশ্রজীনসম্পন্ন ইঁদুরদের থেকে যে বাচ্চা হবে তাদের মধ্যে ০·৭৫ অংশ হবে কালো ইঁদুর, আর ০·২৫ অংশ হবে সাদা ইঁদুর। আবার এই ০·৭৫ অংশের কালো ইঁদুরের মধ্যে ০·২৫ হবে কেবল কালো রঙের জীনসম্পন্ন এবং তাদের বাচ্চারা সবই কালো হবে। বাকী ০·৫০ অংশ কালো ইঁদুর হবে সঙ্করজাতীয় ও মিশ্রজীনসম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বাচ্চাদের মধ্যেও ঠিক ঐ রকম ৩ : ১ অনুপাতে কালো ও সাদা রঙের বাচ্চা জন্মাবে। আর বাকী ০·২৫ অংশ সাদা ইঁদুরের বাচ্চারা কেবল সাদাই হবে।

মোটামুটি মেন্ডেলবাদের প্রধান সূত্রগুলি উপরে বর্ণিত হল। মেণ্ডেলের পর বহু প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বংশধারার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যাবলী থেকে জানা গেছে যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত বংশধারার মধ্যেও প্রচুর পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে।

সাধারণত জীনের প্রকৃতি অনুযায়ী সন্তানসন্ততির বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়ে থাকে। কিন্তু দুটি কারণে এই প্রত্যাশিত উত্তরাধিকারের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। প্রথমটি হল জীনের সংবিকৃতি[1] এবং দ্বিতীয়টি পরিবেশের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

১। সংবিকৃতি

কখনও কখনও জীনের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তার ফলে সন্তানসন্ততির উত্তরাধিকারের মধ্যেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। একে জীনের সংবিকৃতি[1] বলা হয়। এই ধরনের জীনের সংবিকৃতির জন্য প্রাণীর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এখন যদি এই আকস্মিক পরিবর্তনটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে টিঁকে থাকতে না পারে তা হলে ঐ বিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণীটি যদি তার এই বিকৃতি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং বংশসৃষ্টি করে যেতে পারে তবে এই বিকৃতি তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং ঐ সংবিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী একটি নতুন স্বতন্ত্র শাখা রূপে বেঁচে থাকে। কালো ভেড়া, অস্বাভাবিকভাবে শ্বেতবর্ণ প্রাণী, ছ-আঙুল-ওয়ালা হাত বা পা সম্পন্ন

1. Mutation

মানুষ ইত্যাদি হল এই ধরনের সংবিকৃতির উদাহরণ যেগুলি প্রাণীর মধ্যে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রাণী বেঁচে থাকতে পেরেছে। আবার প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে এমন অনেক সংবিকৃতি প্রাণীর মধ্যে ঘটেছে যা পরিবেশের সঙ্গতিবিধানের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ফলে ঐ সংবিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী স্বল্পকাল অবস্থানের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক্সরের সাহায্যে অনেক প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষণ-মূলকভাবে এই ধরনের বিকৃতির সৃষ্টি করা গেছে।

২। পারিবেশিক পরিবর্তন

কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও জীনের প্রকৃতি ও সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার ফলে প্রাণীর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলের মাছি নিয়ে মরগ্যান যে পরীক্ষণ করেন তাতে দেখা গেছে যে যদি অপেক্ষাকৃত কম তাপে মাছিগুলির জন্ম দেওয়া যায় তবে তাদের অতিরিক্ত পা'র আবির্ভাব হয়। কোন কোন স্যালামান্ডারের কানকো সারা জীবন থেকে যায় এবং তারা জলেই বাস করে। কিন্তু তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের ফলে ঐ কানকোগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঐ জাতীয় স্যালামান্ডারেরা তখন ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং সেখানেই বাস করতে থাকে। তাদের বাচ্চাদের যদি ঐ পরিবেশে রেখে দেওয়া যায় তবে তারা বহু বংশ ধরে ডাঙ্গার প্রাণী হয়েই বাস করে।

অনুশীলনী

১। শিশুর বংশধারা বলতে কি বোঝ? বংশধারার সঞ্চালন কিভাবে হয়?

২। শিশুর জীবনে বংশধারা ও পরিবেশ এই দুটির তুলনামূলক প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। শিক্ষা ক্ষেত্রে বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিখ্যাত গবেষণার উল্লেখ কর।

৪। শিশু প্রকৃতি ও পরিবেশের যুগ্ম প্রভাবে বিকশিত হয়—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৫। প্রকৃতি ও পরিবেশ বলতে কি বোঝ? প্রকৃতি ব্যক্তির জীবনকে বিভিন্ন দিক দিয়ে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি—এই ধারণাটি বিস্তৃত কর।

৬। মেণ্ডেলবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। বংশধারা ও পরিবেশের মধ্যে কোনটির প্রভাব শিশুর জীবন ও শিক্ষায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বল। তোমার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

অনুষঙ্গের সূত্র

চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে 'মনে করা' কাজটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল প্রতীকের সাহায্যে আমরা চিন্তন প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করি সেগুলি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পেয়ে থাকি এবং সেগুলি কোন না কোন রূপে আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। চিন্তনের সময় সেগুলিকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তুলি অর্থাৎ লৌকিক ভাষণে সেগুলিকে আমরা 'মনে করি'।

এই মনে করা কার্জটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে যে মানসিক প্রক্রিয়াটি তার নাম অনুষঙ্গ[1]। অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় দুটি বস্তুর মধ্যে এমন একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক যার দ্বারা একটি আর একটির কথা মনে জাগাতে পারে। যেমন, দুই ভাইকে যদি দেখতে এক রকম হয় তবে একজনকে দেখলে আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। অনুষঙ্গ যে কোন দুটি প্রতীকের মধ্যে স্থাপিত হতে পারে। যেমন দুটি ধারণার মধ্যে বা দুটি প্রতিরূপের মধ্যে বা একটি ধারণা এবং একটি প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্ট হতে পারে। তেমনই আবার একটি প্রত্যক্ষিত বস্তু এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও অনুষঙ্গ সৃষ্ট হতে পারে অর্থাৎ কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখে আমাদের মনে একটি ধারণা বা প্রতিরূপের উদয় হতে পারে। যেমন, হিমালয় দেখে মনে একটা প্রশান্তির ধারণা জন্মাতে পারে, বুদ্ধমূর্তি দেখে অহিংসার অনুভূতি জাগতে পারে।

অনুষঙ্গ আবার আর একদিক দিয়ে দু'শ্রেণীর হতে পারে। যেমন, সর্বজনীন এবং ব্যক্তিগত। কতকগুলি ব্যাপারে একটি বিশেষ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে একই প্রকারের অনুষঙ্গ গঠিত হতে পারে। যেমন চরকা দেখলে প্রত্যেক ভারতীয়ের মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ে বা সেবাধর্মের কথা উঠলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ একবারে নিছক ব্যক্তিগত হতে পারে, যেমন রেলগাড়ী দেখলে কারও তার জন্ম গ্রামটির কথা মনে পড়ে যায় বা ছোট ছেলে দেখলে কারও মৃত পুত্রের কথা মনে পড়তে পারে।

অনুষঙ্গের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি প্রধান সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা, (১) সাদৃশ্যের সূত্র[2] (২) সান্নিধ্যের সূত্র[3] এবং (৩) বৈসাদৃশ্যের সূত্র[4]।

---

1. Association 2. Law of Similarity 3. Law of Contiguity 4. Law of Contrast

১। সাদৃশ্যের সূত্র

যখন দুটি বস্তুর মধ্যে আকারগত বা প্রকৃতিগত বা অন্য কোনরূপ সাদৃশ্য থাকে তখন একটির প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা অপরটির স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে, যেমন কারও ছবি দেখলে সেই ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে যায়, ছেলেকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে, ইত্যাদি। তাছাড়া কাব্যে, সাহিত্যে বা দৈনন্দিন ভাষণে আমরা যে সকল উপমা ও রূপকের ব্যবহার করে থাকি সেগুলির মূলে এই সাদৃশ্যসূচক অনুষঙ্গ প্রচুর পরিমাণে আছে যেমন, পুরুষ-সিংহ, চন্দ্রানন, শোকসমুদ্র, হরিণ-চক্ষু ইত্যাদি।

২। সান্নিধ্যের সূত্র

যখন দুটি বস্তু একসঙ্গে বা পর পর আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় তখন দুয়ের মধ্যে এমন একটি অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে একটির প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা অপরটির স্মৃতিকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন গীতাঞ্জলীর নাম করলে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়, পণ্ডিচেরীর কথা বললে শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে হয় বা কুইনাইনের নাম করলে তিক্ততার কথা মনে হয় ইত্যাদি। সান্নিধ্য আবার দুপ্রকারের হতে পারে স্থানগত ও কালগত। কখনও কখনও দুটি বস্তুর মধ্যে তাদের স্থানগত সমতা বা সান্নিধ্যের জন্য অনুষঙ্গ স্থাপিত হতে পারে, যেমন ফুল দেখলে গন্ধের কথা মনে পড়ে। আবার কখনও সময়গত একতা বা সান্নিধ্যের জন্য একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। যেমন কোন গানের প্রথম কলিটি মনে এলে পরের কলিগুলি পর পর মনে এসে যায়।

৩। বৈসাদৃশ্যের সূত্র

দুটি বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য থাকলেও একটির কথা মনে হলে অপরটির কথা মনে পড়ে যায়, দুঃখের মধ্যে সুখের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। পরিণত বয়সের তিক্ত দিনগুলিতে ছেলেবেলার নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলির কথা মনে আসে, বড়লোকের বাড়ীতে অপচয়ময় ভোজের দিনে পথবাসী অনাহারী ভিক্ষুকের কথা মনে পড়ে যায় ইত্যাদি।

যদিও অনুষঙ্গের এ তিনটি সূত্রের পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবু এদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং অনেক দিক দিয়ে এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

সান্নিধ্যের মধ্যে সাদৃশ্য

যখন দুটি বস্তুর কথা তাদের সান্নিধ্যের জন্য আমাদের মনে উদিত হয় তখন সাদৃশ্যও তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা কাজ করে থাকে। যেমন ফুল দেখে গন্ধের

কথা মনে পড়ে। অর্থাৎ বর্তমানে প্রত্যক্ষিত ফুলটি প্রথমে আমাদের মনে পূর্বে প্রত্যক্ষিত গন্ধসম্পন্ন একটি ফুলের কথা মনে জাগায়। তারপর সেই ফুল থেকে সান্নিধ্যের জন্যই আমাদের গন্ধের কথা মনে পড়ে। অতএব সান্নিধ্যের অনুষঙ্গে প্রথমে আসে সাদৃশ্যসূচক অনুষঙ্গ, তারপর আসে সান্নিধ্যসূচক অনুষঙ্গ।

সাদৃশ্যের মধ্যে সান্নিধ্য

তেমনিই সাদৃশ্যের অনুষঙ্গের মধ্যে সান্নিধ্য আছে। সাদৃশ্য মানে কিছুটা মিল কিছুটা অমিল। মিলটুকু মনে আসে সাদৃশ্যের জন্য, কিন্তু তারপর দুয়ের মধ্যে যেটুকু অমিল সেটুকু মনে আসে সান্নিধ্যের জন্য। যেমন এক ভাইকে দেখে অপর ভাইটির কথা মনে পড়ে। এখানে প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাইয়ের যেখানে যেখানে মিল সেটুকু মনে এল সাদৃশ্যের জন্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনে এল তাদের মধ্যে অমিলটুকু। এখানে দ্বিতীয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম ভাইয়ের মিলটুকু তাদের মধ্যে অমিলটুকুকেও আমাদের মনে জাগিয়ে তুলল এবং সেটি হল সান্নিধ্যের জন্যই।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সূত্র দুটির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। দুটি বস্তুর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের সূত্র তখনই কাজ করে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণীগত বা জাতিগত অভিন্নতা থাকে। দুঃখের অভিজ্ঞতা সুখের স্মৃতি জাগায় বা গরমের দিনে আমাদের শীতের দিনের কথা মনে পড়ে। এখানে দুঃখ-সুখ, গরম-শীত ইত্যাদি অভিজ্ঞতাগুলি একই শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত। নইলে একটি অপরটি কথা মনে করাতে পারত না। তাছাড়া বৈসাদৃশ্যের চিন্তার মধ্যে সান্নিধ্যও কাজ করে থাকে। সাধারণত একটি বস্তুর প্রকৃতিকে ভাল করে বোঝার জন্য তার বিপরীত প্রকৃতির বস্তুটিকে আমরা তার পাশাপাশি রাখি এবং দু'য়ের মধ্যে তুলনা করে থাকি। সেজন্য যখনই একটি বস্তু দেখে তার বিপরীত বস্তুটি মনে পড়ে তখনই এই সান্নিধ্যসূচক অনুষঙ্গটি কাজ ক র থাকে। অতএব বৈসাদৃশ্যের সূত্রটি সাদৃশ্য এবং সান্নিধ্য এই দুয়ের উপর নির্ভরশীল।

অনেক মনোবিজ্ঞানী এই তিনটি সূত্রের পরিবর্তে একটিমাত্র সূত্র গঠনের পক্ষপাতী। বেন, জেমস্ প্রভৃতি সান্নিধ্যের সূত্রটিকেই মৌলিক সূত্র বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের মতে অপর দুটি সূত্র এই সূত্রটিরই অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সাদৃশ্যের সূত্রকেই মৌলিক সূত্র বলে বর্ণনা করে থাকেন।

সমষ্টিকরণের সূত্র

হ্যামিলটনের মতে সমষ্টিকরণের সূত্রটিকে[1] অনুষঙ্গের মৌলিক সূত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং সান্নিধ্য, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য এ সবগুলিকেই এই সূত্রটির

1. Law of Redintegration

বিভিন্ন রূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সূত্রটির অর্থ হল যে একটি বিশেষ সমষ্টির যদি একটি অংশকে আমাদের মনের সামনে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা হবে বাকী অংশগুলিকে জাগিয়ে তুলে ঐ সমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ ফুলের আকৃতি, গন্ধ, গঠন সমস্ত নিয়েই আমাদের মনে তৈরী হয়ে আছে ফুল সম্বন্ধে একটি সমষ্টিগত বা সমগ্র ধারণা। এখন যদি সমগ্র ধারণার একটা অংশ, যেমন ফুলের আকৃতি বা গন্ধ আমাদের মনে আসে তাহলে আমাদের মনের চেষ্টাই হবে ফুলের বাকী বৈশিষ্ট্যগুলি জাগিয়ে তুলে ফুলটির সমগ্র ধারণাটিকে মনের মধ্যে সৃষ্টি করা। অনুষঙ্গের এই সংব্যাখ্যানটি বেশ সুসঙ্গত এবং আধুনিক গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুষঙ্গ তত্ত্বের সমালোচনা

এক সময় মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীদের প্রধান উপকরণ ছিল অনুষঙ্গের পরিকল্পনাটি। অনুষঙ্গবাদীরা[1] মনে করতেন যে সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি মানসিক একক এবং সেগুলির একটির সঙ্গে আর একটিকে জুড়ে আমাদের স্মৃতি, চিন্তা, কল্পনা, বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি সৃষ্টি হয়েছে। এই মানসিক এককগুলির তাঁরা শ্রেণীবিভাগ করলেন, যেমন সংবেদন, ধারণা, প্রতিরূপ ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা রূপে তাঁরা গঠন করলেন অনুষঙ্গের সূত্রগুলি। তাঁদের মতে সংবেদন, ধারণা, প্রভৃতির প্রতিরূপগুল নানারূপ অনুষঙ্গের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের মনে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনুষঙ্গবাদীরা মানসিক প্রক্রিয়ার এই ব্যাখ্যাকে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করেন।

কিন্তু পরবর্তী বহু মনোবিজ্ঞানী অনুষঙ্গবাদীদের এই অতি সহজ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁদের মতে অনুষঙ্গ মানসিক প্রক্রিয়ার সংগঠনের বর্ণনামাত্র, ব্যাখ্যা নয়। মানসিক প্রক্রিয়াকে ঐভাবে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করতে গেলে তার প্রকৃত সত্তাটিই নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব মানসিক প্রক্রিয়ার যথার্থ ব্যাখ্যা হবে সমগ্রধর্মী, অংশধর্মী নয়। অনুষঙ্গবাদীদের মানসিক প্রক্রিয়ার এই বিশ্লেষণ প্রথাকে তাঁরা মানসিক রসায়ন[2] বলে সমালোচনা করেন। আধুনিক কালে মানসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং তার সম্পূর্ণ গঠনটিকে ভিত্তি করেই তার স্বরূপের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়।

অবশ্য অনুষঙ্গমূলক বর্ণনার দ্বারা মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারা গেলেও অনুষঙ্গের তত্ত্বটি থেকে মনের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ ও প্যাভলভের

1. Associationist 2. Mental Chemistry

অনুবর্তন প্রক্রিয়ার তত্ত্বটিকে[1] শিখন-প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক সংব্যাখ্যানের আধুনিক রূপ বলা যেতে পারে।

শিক্ষা ও অনুষঙ্গ

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের সূত্রগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। আমাদের স্মৃতির সংগঠনে অনুষঙ্গের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনুষঙ্গকে ভিত্তি করে আমাদের অধিকাংশ স্মৃতিই গড়ে ওঠে। অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করার সময় দেখা গেছে যে অনুষঙ্গের সাহায্যে আমরা মনের মধ্যে একটি শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দকে গ্রন্থিবন্ধ করে থাকি। আমাদের বহু ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব, অনুরাগ ও বিরাগ নিছক অনুষঙ্গ থেকেই জন্মলাভ করে। শব্দের অর্থ এবং নামও আমরা শিখে থাকি অনুষঙ্গের সাহায্যে।

সাধারণত আমাদের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অনেকটা যান্ত্রিক পন্থায়। যাকে আমরা অনুবর্তন প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করে থাকি সেই প্রক্রিয়াতেই আমাদের চিন্তা ও ধারণাগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় যেমন, রক্তকে লাল রঙের দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে রক্ত এবং লাল রঙের মধ্যে একটি অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে যায় এবং তার ফলে লাল কিছু দেখলে আমাদের রক্তের কথা মনে পড়ে।

আবার কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ বস্তুর ধারণা আমাদের মনে রাখতে হলে আমাদের আগে থেকেই মনে আছে বা সহজে আমরা ভুলিনা এমন কোন একটি বস্তুর স্মৃতির সঙ্গে সেটিকে গ্রন্থিবন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে এবং এইভাবে গ্রন্থিবন্ধ হলে আমরা এই নতুন বস্তুটিও সহজে ভুলি না। যখন কোন নতুন বিষয়বস্তু আমরা মুখস্থ করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সেটিকে আমাদের পূর্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপন করে মনে রাখার চেষ্টা করি। অর্থাৎ মুখস্থকরণ মানেই হল নতুন অনুষঙ্গ স্থাপন। বিষয়বস্তু যত অর্থহীন এবং কৌশলধর্মী হবে ততই অনুষঙ্গ যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম হবে। আর বিষয়বস্তু যত অর্থপূর্ণ হবে তত অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ও আয়াসহীন হবে। অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপ্রসূত প্রচেষ্টার সাহায্যে অনুষঙ্গ স্থাপন করতে হয় এবং বারবার অনুশীলনের সাহায্যে সেই অনুষঙ্গকে দৃঢ়বন্ধ করতে হয়। শিক্ষক এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন। যে সব বিষয়বস্তু দুরূহ বা সহজে মনে রাখা যায় না সেগুলিকে শিক্ষক অনুষঙ্গের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে গ্রন্থিবন্ধ করে দিতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত সান্নিধ্যমূলক অনুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া

1. Conditioning

হয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে কৃত্রিম অনুষঙ্গের সাহায্যে মনে রাখা প্রায়ই কষ্টকর ও অল্পস্থায়ী হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। অনুষঙ্গের সূত্রগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ।
২। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের সূত্রগুলির প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
৩। সমষ্টিকরণের সূত্র কাকে বলে?
৪। অনুষঙ্গের বিভিন্ন সূত্রগুলি বর্ণনা কর এবং কিভাবে এরা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বল।

পনেরো

শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশ

কেমন করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কোষ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্ষম মানুষে পরিণত হয়, এ ঘটনাটি চিরকালই জীবতত্ত্ববিদদের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে। শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিশুর শারীরিক বিকাশের পূর্ণ বিবরণী জানা অপরিহার্য। কেননা শিক্ষা বলতে আজকাল নিছক মনের উৎকর্ষসাধন বা কোন বিশেষ জ্ঞানের আহরণকে বোঝায় না। শিক্ষা হল শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং শিশুর মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিকগুলিরই বিকাশ তার শারীরিক বিকাশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

গর্ভস্থকালীন আচরণ

শিশুর শারীরিক বিকাশকে যদিও আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে থাকি, প্রকৃতপক্ষে শারীরিক বিকাশ একটি অবিচ্ছিন্ন একক ঘটনা এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এর বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব বোঝা যায় না। তাছাড়া যদিও ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকেই শিশুর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তবু তার প্রকৃত শারীরিক বিকাশ সুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে তার প্রকৃত জন্ম হয় ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় দশ মাস আগে। সেইজন্যই আধুনিক জীবতত্ত্ববিদরা শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বিকাশ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণেরও উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। অবশ্য সে সময় সে যে সাড়া দেয় তা সে দেয় তার সমস্ত দেহ দিয়ে এক ধরনের সামগ্রিক প্রকৃতির প্রক্রিয়ার[1] রূপে এবং কোন বিশেষধর্মী সাড়া তখন সে দিতে পারে না। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে শিশুর গর্ভস্থকালীন আচরণ কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রতিক্রিয়ার[2] সমষ্টি মাত্র। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি একেবারেই বিশেষধর্মী নয়। সেগুলি এক ধরনের বিশিষ্টতাবর্জিত সাধারণধর্মী আচরণ। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণগুলি ধীরে ধীরে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে।

উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি

ব্যক্তির আচরণ ও সঙ্গতিবিধানের স্বরূপ নির্ণয়ে তার শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের[3] প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। শিশু যেমন বড় হতে থাকে তেমনই তার

1. Mass Activity 2. Specific Reaction 3. Physical and Motor Development

উচ্চতা এবং ওজনও বৃদ্ধি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন দৈহিক অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে এবং তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি লাভ করে। এই শেষোক্ত ঘটনাটি শিশুর আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

শিশুর জীবনের সুরুতে তার শারীরিক বৃদ্ধির হার বেশ দ্রুত থাকে কিন্তু যতই সে পরিণতির[1] দিকে এগিয়ে যায় ততই এই বৃদ্ধির হার কমে আসতে থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রাপ্তযৌবনদের[2] ক্ষেত্রে। ছেলেমেয়েদের যখন যৌবন দেখা দেয় তখন তাদের শরীরের কোন কোন অঙ্গ অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে উচ্চতা ও ওজনের ক্ষেত্রে হঠাৎ বাড় বা আকস্মিক বৃদ্ধি[3] দেখা দেয়। কিন্তু মাতৃগর্ভে জন্ম নেবার সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্যন্ত তার উচ্চতা প্রায় ৫২ সেণ্টিমিটারে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর প্রথম দুবৎসর উচ্চতা দ্রুত বাড়তে থাকে, কিন্তু দু'বৎসরের পর থেকে উচ্চতার বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে। ৫ বৎসর বয়সের সাধারণ শিশু ৫২ সেঃ মিঃ উচ্চতা থেকে প্রায় ১০৬/৭ সেঃ মিঃ উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছয় এবং সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সে তার উচ্চতা ১৭৪ সেঃ মিঃ তে দাঁড়ায়। এই বয়সের পর উচ্চতার আর বিশেষ বৃদ্ধি হয় না।

উচ্চতা বৃদ্ধির এই বিবরণটি অবশ্য পাশ্চাত্যদেশের ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া। কয়েকটি উপজাতি ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয়দের উচ্চতা পাশ্চাত্য-বাসীদের উচ্চতার চেয়ে জাতিগতভাবেই কিছু কম। ফলে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন বয়সের এই উচ্চতার মাপ কিছুটা ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক ধারণা

শিশুর আচরণের উপর তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানা দিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা এবং অপরের মনে সে যে ধারণার সৃষ্টি করে—এ দুটি ব্যাপার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় শিশুর নিজের শরীরের আয়তন ও দৈহিক শক্তির দ্বারা। প্রথম শৈশবে শিশু বয়স্ক লোকেদের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকে। তারপর যতই তার শারীরিক আকৃতি ও শক্তি বাড়তে থাকে ততই সে নিজেকে তার চেয়ে যারা ছোট তাদের চেয়ে এবং অতীতে সে নিজে যা ছিল তার চেয়ে বড় বলে মনে করতে থাকে। এই ভাবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তার নিজের সম্বন্ধে 'ছোট' বা 'বড়'র ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত করে। নিজের সম্বন্ধে এই 'ছোট' বা 'বড়'র ধারণা থেকেই অনেক সময় কোন্ কাজ শিশুর পক্ষে করা উচিত এবং কোন্ কাজ তার করা উচিত নয় এ সম্বন্ধেও একটা মূল্যবোধ তার মধ্যে জন্মায়। যেমন, সে বোঝে যে যখন সে 'ছোট' ছিল তখন সে যে কাজ করতে পারত সে কাজ সে 'বড়' হয়ে উঠলে আর করতে পারে না। শিশুর

1. Maturity 2. Adolescent 3. Spurt

এই উচিত-অনুচিতের বোধকেই যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে তার মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি ও অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

আবার শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বয়স্কদের মনে শিশুর সম্বন্ধে ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যেমন, যে শিশু শারীরিক আকৃতির দিক দিয়ে ছোট তাকে সাধারণত আমরা অসহায়, দুর্বল ইত্যাদি মনে করে তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিই। তেমনই আবার যে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তার বয়সের তুলনায় বেশী তাকে আমরা বিশেষভাবে দেখাশোনা করার দরকার আছে বলে মনে করি না এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে রীতিমত স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি বয়স্কদের এই মনোভাবের বৈষম্য তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

উচ্চতা বৃদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সে উচ্চতার বৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পেঁছয়।

আবার দেখা গেছে যে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রকৃতিও সব সময়ে সমান হয় না। যেমন, যে সব মেয়ের রজঃসৃষ্টি দেরীতে হয়, তাদের চেয়ে যে সব মেয়ের অল্পবয়সে রজঃসৃষ্টি হয় তারা বেশী লম্বা হয়।

বৃদ্ধির হার এবং ধারা বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলির মধ্যে একটা মিল ও সমতা দেখা যায়। যেমন, যে সব মেয়ের রজঃসৃষ্টি একই বয়সে হয়ে থাকে তাদের বৃদ্ধির হার প্রায় একই রকম হতে দেখা যায়। বিভিন্ন বয়সে যেমন বৃদ্ধির হারের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তেমনই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির হারের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। যেমন হাত বা পায়ের বৃদ্ধির হার মাথার বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী।

মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা দ্রুত। অর্থাৎ ৮ বৎসরের একটি মেয়ে ৮ বৎসরের একটি ছেলের চেয়ে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অধিক পরিণত। এর একটি কারণ হল যে মেয়েদের যৌনপরিণতি ছেলেদের চেয়ে বেশ কিছু আগে ঘটে থাকে।

কঙ্কালগত বয়সের[1] সাহায্যে বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির গতি ও হার নির্ণয় করা যায়। কঙ্কালগত বয়স বলতে বোঝায় বিভিন্ন সময়ে দেহের অভ্যন্তরস্থ কঙ্কালের বৃদ্ধির স্তর বা পর্যায়। বহু ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে সময়গত বয়স এবং কঙ্কালগত বয়সের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়।

আমাদের সামাজিক জীবনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই শারীরিক ও যৌনবৃদ্ধির দ্রুততার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন স্বামী-স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বেশ

1. Skeletal Age

কিছুটা ব্যবধান রাখাটা আমাদের দেশে বহুদিনের অনুসৃত প্রথা। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনারও কিছুটা প্রভাব আছে। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে যে মেয়ে সে ঐ শ্রেণীতে পঠনরত ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী যৌনসচেতন হয় এবং সেটা তার আচরণেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যৌবনাগমে শারীরিক পরিবর্তনের প্রভাব

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে তারা শরীর মন সব দিক দিয়ে পরিণত ব্যক্তি হবার পথে এগিয়ে যায়। তাদের মনে নানা দিক দিয়ে এমন সব পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবিধানের পন্থাগুলি একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তখন তারা নতুন করে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পন্থা শিখতে বাধ্য হয়।

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের আয়তনের এবং বিশেষ করে কয়েকটি বিশেষ অঙ্গের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিতান্ত আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। এই সময় ছেলেমেয়েরা প্রজনন শক্তির অধিকারী হয় এবং পূর্ণবয়স্ক জননক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শরীরের এই আকস্মিক বৃদ্ধি মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তারপর থেকেই এই বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে। তাছাড়া এই সময় বিভিন্ন গৌণ যৌন লক্ষণগুলি[1] ছেলেমেয়েদের দেহে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

যৌবনাগমের এই আকস্মিক শারীরিক বৃদ্ধিতে ছেলেমেয়েরা এক বৎসরে প্রায় ১০ থেকে ১২·৭ সেঃ মিঃ বেড়ে যায় এবং ওজনও একবৎসরে ১০/১২ কিলোগ্রামের মত বেড়ে থাকে। তাছাড়া হাত, পা ও নাক এগুলো সব আকারে বড় হয়ে ওঠে। এই সব আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে আশে পাশের জনগণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের বেশ অসুবিধা হয়। যে শরীরটাকে সে এতদিন বেশ সুনিপুণভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে আসছিল, সেই শরীর যেন হঠাৎ অসংহত ভাবে ইতস্তত বেড়ে গিয়ে তার হাতের বাইরে চলে গেল। যতদিন না সে এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেকে আবার নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে ততদিন সে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটায়।

শারীরিক বৃদ্ধির বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে যৌনপরিণতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনপরিণতি বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। এর ফলে শরীরের আয়তন ও উচ্চতার দিক দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ত দেখা দেয়ই, তাদের আচরণের মধ্যেও বেশ বৈষম্য প্রকাশ পায়। যে সব ছেলে বা মেয়ের যৌনপরিণতি আগে আগে দেখা দেয় তারা অন্যান্য ছেলে বা

1. Secondary Sexual Characters

মেয়ের চেয়ে মনের দিক দিয়ে অনেক বেশী পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে, স্কুলে, লাইব্রেরীতে বা খেলার মাঠে তারা তাদের সমবয়সী সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না।

যৌনপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনে অপরিহার্যভাবে দেখা দেয় যৌনবিষয়ে আগ্রহ। এই আগ্রহ নানারূপে প্রকাশ পায়। সাধারণত ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ ও মনোযোগের রূপ নিয়েই এই আগ্রহ দেখা দেয়। যৌনবিষয়ে কৌতূহলও এই সময়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য যৌন সচেতনতা যৌবনাগমেই যে প্রথম দেখা দেয় তা নয়, বাল্যকালে বহুক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অনুযায়ী অতি শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি সক্রিয়ভাবে দেখা দেয়। তবে প্রকৃতির দিক দিয়ে এই শৈশবকালীন যৌনবোধের সঙ্গে পরিণত বয়সের যৌনবোধের প্রচুর পার্থক্য থাকে।

প্রাপ্তযৌবনদের এই আকস্মিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং যৌনতার পূর্ণ পরিণতি তাদের শিক্ষার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলির পরিবর্তন এই একই সময় দেখা দেয়। তার ফলে এসময় তাদের মধ্যে কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না হয় তাহলে তা থেকে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

যৌবনাগমে যে সব যৌনমূলক আকাঙ্খা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় সেগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করার মত বিশেষ কোন আয়োজন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। সাধারণ পরিবারে বা প্রচলিত শিক্ষায়তনে প্রাপ্তযৌবনদের এই সব চাহিদাকে এক রকম এড়িয়ে যাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানা কঠোর সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা তাদের এই স্বাভাবিক চাহিদাগুলিকে অবদমিত করা হয়। এর ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় প্রাপ্তযৌবনদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাদের সমস্ত শিক্ষা, মনোভাব ও ব্যক্তিসত্তার সংগঠন এই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রভাবে গুরুতরভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে। উপযুক্ত শিক্ষক চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনদের এই গুরুতর জীবন সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। ভালো ভালো বই, প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা, নানারকম সক্রিয়তা ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষক তাদের চাহিদাগুলির তৃপ্তির আয়োজন করে তাদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশ সাধনে সাহায্য করতে পারেন।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর হাত, পা, পেশী ইত্যাদির সঞ্চালনের শক্তি, গতি এবং ত্রুটিহীনতা বৃদ্ধি পায়। একেই আমরা সঞ্চালন-

মূলক বৃদ্ধি[1] নাম দিয়ে থাকি। শিশুর মানসিক বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে তার এই সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর। হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়, তার কৌতূহল তৃপ্ত করে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। তেমনই সামাজিক মনোভাবেরও পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় অপরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে এবং তাও অনেকাংশে নির্ভর করে তার সঞ্চালন-মূলক বৃদ্ধির উপর। শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশও প্রচুর পরিমাণে তার এই সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। শিশুর সামর্থ্য, গতি, কৌশলশিক্ষা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়সাধন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিশুর জীবনের ব্যর্থতা বা সাফল্য। অতএব তার মানসিক বিকাশের প্রকৃতিও তার এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয়। এক কথায় শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঞ্চালনমূলক দিকগুলির বিকাশের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ এবং তার সঞ্চালনমূলক বিকাশের মধ্যে প্রায়ই মিল থাকে না। কোন শিশু হয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে বেশ উন্নত, কিন্তু সঞ্চালনমূলক কৌশলে সে পশ্চাদ্‌পদ হতে পারে। আবার কেউ হয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে তেমন উন্নত নয় কিন্তু সঞ্চালনমূলক কৌশলে সে বেশ দক্ষ। অর্থাৎ যে শিশুর জ্ঞানমূলক শক্তির দিকটা (যেমন, বুদ্ধি, ভাষামূলক শক্তি ইত্যাদি) দুর্বল সে সঞ্চালনমূলক শক্তির দিক দিয়ে তার সেই অক্ষমতাকে পূরণ করার চেষ্টা করে। আবার যে সঞ্চালনমূলক কাজে অপটু সে তার জ্ঞানমূলক শক্তি দিয়ে তার সেই অভাবটা মেটাতে চায়। শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সামগ্রিক আচরণ ও বিশেষধর্মী আচরণ

শিশুর প্রথম শৈশবে তার বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন থাকে নিতান্তই এলোমেলো, সমন্বয়হীন এবং অসংহত। তার হাত পা নাড়ার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই এবং সেগুলির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যও থাকে না। তারপর ধীরে ধীরে সেই অসংহত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমন্বিত হয়ে ওঠে। ক্রমশ শিশুর চোখ ও হাতের মধ্যে সমন্বয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিশু হাতে করে জিনিষপত্র তুলে ধরতে শেখে।

তার চলাফেরাও ঠিক এই ভাবে প্রথম শৈশবের অসংহত ও অসংযত অঙ্গসঞ্চালন থেকে সুসংহত ও সুসমন্বিত আচরণে পরিণত হয়। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশু ২ মাসে থুতনিটা মাটি থেকে তুলতে পারে, ৪ মাসে কেউ ধরলে বসতে পারে, ৬ মাসে চেয়ারে বসিয়ে দিলে একা বসতে পারে এবং সামনে কিছু

1. Motor Development

দোলালে হাত দিয়ে তা ধরতে পারে, ৭ মাসে একা একা বসতে পারে, ৮ মাসে সাহায্য পেলে দাঁড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে, ১০ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১১ মাসে অপরের হাত ধরে চলতে পারে, ১৩ মাসে একা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, ১৪ মাসে বিনা অবলম্বনে দাঁড়াতে পারে এবং ১৫ মাসে একা একা চলতে পারে।[1]

শিশুর এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের মুখ্য বৈশিষ্ট্যটি হল সাধারণধর্মী আচরণ থেকে বিশেষধর্মী আচরণে যাওয়া। প্রথম শৈশবে তার সমস্ত আচরণই থাকে সাধারণধর্মী, কোন বিশেষ সুনির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা তখন তার হয় না। কিন্তু যত সে বড় হয় তার এই সাধারণ প্রকৃতির আচরণগুলি ধীরে ধীরে বিশেষ প্রকৃতির আচরণে পরিণত হয়। তখন সে সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ প্রকারের কাজ করতে সমর্থ হয়, যেমন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শেখে, চলতে শেখে, বুড়ো আঙ্গুলের ব্যবহার শেখে, ইত্যাদি।

সে যখন আরও বড় হয় তখন এই বিশেষধর্মী আচরণগুলি জটিলতর ও মিশ্রধর্মী হতে সুরু করে। শিশু প্রথম দিকে বিশেষধর্মী আচরণগুলি স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্নভাবে আয়ত্ত করে, তার ক্রমবিকাশের পরের ধাপে ঐ আচরণগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং শিশু জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণ করতে সমর্থ হয়। যেমন, প্রথমে শিশু 'দৌড়ান' রূপ বিশেষধর্মী আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। আবার সে 'বল ছোঁড়া' রূপ বিশেষধর্মী কাজটিও স্বতন্ত্রভাবে শিখল। পরের ধাপে, সেই শিশু এই দুটি বিশেষধর্মী কাজকে একত্রিত করে ক্রিকেট খেলার সময় 'দৌড়তে দৌড়তে বল ছোঁড়া' রূপ জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল।

ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য

সঞ্চালনমূলক বিকাশের দিক দিয়ে ছেলেরা সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যায়। ছেলেরা যত বড় হয় ততই শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কৌশলে মেয়েদের চেয়ে বেশী পটুতা দেখায়। এর কারণ হল যে, ছেলেরা সঞ্চালনমূলক আচরণের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্মায় এবং মেয়েদের শারীরিক সংগঠনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা দ্রুত অঙ্গসঞ্চালনে অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া আমাদের প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা অনুযায়ী শিশুকাল থেকেই ছেলেদের দৌড়ঝাঁপ ও নানা প্রকৃতির খেলাধুলায় উৎসাহিত করা হয়ে থাকে এবং মেয়েদের ঐ ধরনের সঞ্চালনমূলক আচরণ থেকে বিরত রাখারই চেষ্টা করা হয়। স্বভাবতই এই সব কারণে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে সঞ্চালনমূলক আচরণে এগিয়ে যায়। কিন্তু জটিল সঞ্চালনমূলক সব কাজের ক্ষেত্রেই যে

১। পৃঃ ২১৮ঃ চিত্র দ্রষ্টব্য

[শিশুর সঞ্চালনমূলক ক্রমবিকাশ ঃ পৃঃ ২১৬—পৃঃ ২১৭]

ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে থাকে তা নয়। দেখা গেছে, যে সব জটিল কাজের সম্পাদনে নিছক দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সে সব কাজ ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যে সব জটিল কাজ নিছক দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে না সে সব কাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা ক্ষিপ্রতায় ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়। ম্যাকফারলেনের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে একটা কাঠের চাকার বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ চাকা তৈরী করার কাজে ছেলেরা দ্রুততায় মেয়েদের ছাড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু একটি পোষাকের বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ পোষাকটা তৈরী করার কাজটা মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারল।

খেলা ও সঞ্চালনমূলক বিকাশ

শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখা দেয়। তার বিভিন্ন বয়সের সঞ্চালনমূলক আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খেলারও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন, প্রথম শৈশবে কেবলমাত্র হাত পা নাড়া, মুখে শব্দ করা ইত্যাদিতেই তার খেলা সীমাবদ্ধ থাকে। একটু বড় হলে, যখন তার বিভিন্ন সঞ্চালন-মূলক কাজের মধ্যে সমন্বয় দেখা দেয়, তখন দৌড়ান, লাফান, টানাটানি করা, ধাক্কা মারা, ছোঁড়াছুঁড়ি করা এই সব কাজই খেলার রূপ নেয়। এর পরের ধাপে তার খেলার মধ্যে জটিল এবং মিশ্রিত সঞ্চালনমূলক আচরণ দেখা যায়, যেমন, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি। যৌবনাগমের সময় থেকে যৌথ ও সংগঠনমূলক খেলায় সে বেশী আনন্দ পায়।

শিশুর বৃদ্ধির প্রথম দিকে বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খেলার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কিন্তু ৮/৯ বৎসর বয়স থেকে দেখা যায় যে খেলার সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। এর অর্থ এ নয় যে, বয়স বাড়তে থাকলে শিশুর খেলার সময় কমে আসে বা সে কম খেলে। বস্তুত যা হয় তা হল খেলার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কমে যায়। একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ৮ বৎসর বয়সে ছেলেরা ৪০ রকমের খেলা খেলে, ১৪ বৎসর বয়সে ২৫ রকম এবং ২২ বৎসর বয়সে ১৭ রকম। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এইভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার প্রকৃতিগত বিচিত্রতার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসে।

বাঁ হাত ও ডান হাতের ব্যবহার

এক বৎসর বয়সের সময় বহু ছেলেমেয়ের মধ্যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বড় হলে তাদের অধিকাংশই আর সকল ছেলেমেয়ের মত ডান হাতের উপর নির্ভর করতে সুরু করে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে

করেন যে এই সব শিশুর বাঁ হাত থেকে ডান হাতে পরিবর্তন করাটা তাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক প্রভৃতিদের চাপে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যদি এই চাপ না দেওয়া হত তাহলে পৃথিবীতে ন্যাটা বা বামহস্ত-নির্ভর মানুষের সংখ্যা আরও বেশী হত। তাঁদের মতে যে সব শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায় তাদের চাপ দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করতে বাধ্য করা মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ক্ষতিকর। এই কারণে যে সব শিশুর মধ্যে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায় তাদের চাপ দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজ

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজগুলির মধ্যে বিশেষ কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। যদি কেউ কোন একটি বিশেষ সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষ হয় তাহলে সে যে অন্য একটি সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এইজন্য বিদ্যালয়ে কতকগুলি সীমাবদ্ধ খেলাধুলার আয়োজন রাখলে শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা মিটবে না। যাতে শিশু বিভিন্ন ধরনের সঞ্চালনমূলক কাজের অনুশীলন করতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়ে নানা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুশীলনী

১। শিশুর শারীরিক এবং সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

২। যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। সঞ্চালনমূলক বিকাশ বলতে কি বোঝ? এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণ দাও।

৪। টীকা লেখ:—সামগ্রিক ও বিশেষধর্মী আচরণ; গর্ভস্থকালীন আচরণ, কঙ্কালগত বয়স, বামহস্তনির্ভরতা।

ষোল

মানসিক বিকাশ

নবজাতক মানবশিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পরম অসহায়তা ও অপরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। বয়স্কদের সাহায্য ও যত্ন ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। বাঁচার জন্য যা কিছু আচরণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য সেগুলির অধিকাংশই তার অজানা থাকে এবং পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তাকে সেগুলি ধীরে ধীরে শিখতে হয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বাঁচার উপযোগী অধিকাংশ আচরণই তাদের জন্ম থেকে শেখা থাকে এবং তার ফলে তাদের ক্ষেত্রে শিখনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম।

কিন্তু যদিও মানবশিশু জন্মের সময় নিতান্ত অসহায় ও পরনির্ভরশীল থাকে তবু সে কতকগুলি সহজাত আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এগুলিকে রিফ্লেক্স নাম দেওয়া হয়েছে—যেমন, চমকে ওঠা, গিলে ফেলা, কোন জিনিস ধরা, হাঁচা, কাসা ইত্যাদি। তাছাড়া পরিপাচন ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি শরীরতত্ত্বমূলক আচরণগুলিও এ পর্যায়ে পড়ে। রিফ্লেক্স ছাড়াও আরও কতকগুলি সহজাত আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে শিশু জন্মায় এবং সেগুলি প্রবৃত্তিজাত আচরণ নামে পরিচিত।

কিন্তু কেবলমাত্র এই সহজাত আচরণগুলিই শিশুর বাঁচার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য তাকে বহু নতুন আচরণ ও কৌশল শিখতে হয় এবং সেই সব শেখার উপযোগী যথেষ্ট মানসিক শক্তি ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিয়েই সে জন্মায়। অর্থাৎ এক কথায় শিশুমাত্রেই শিখনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এই শিখনের ক্ষমতাই হল শিশুর মনের একটা বড় উপাদান এবং শিশুর মানসিক বিকাশ[1] প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশ।

এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝতে হলে শিশুর চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবিকাশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এই সঙ্গে আর একটি বস্তুরও পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। সেটি হল শিশুর বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ। এই পরিচ্ছেদে আমরা শিশুমনের এই বৈশিষ্ট্যগুলিরই আলোচনা করব। মানসিক শক্তি ছাড়াও মনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নানা প্রকৃতির প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি। সেই দিকটির বিকাশ সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

---

1. Mental Development

অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তর ঃ ঃ সংবেদন থেকে প্রত্যক্ষণ

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপৃথিবীর বিভিন্ন বাহ্যিক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে শিশু তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব প্রাথমিক অনুভূতি আহরণ করে মনোবিজ্ঞানীরা সেগুলির নাম দিয়েছেন সংবেদন[1]। এই সংবেদন নিছক শিশুর শারীরিক অভিজ্ঞতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অতি শীঘ্রই এই সংবেদন প্রত্যক্ষণে[2] পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং মানসিক অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। সংবেদন থেকে প্রত্যক্ষণের এই সৃষ্টিকেই শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম সোপান বলা চলে।

প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায় সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। প্রথম স্তরে শিশুর সমস্ত সংবেদন একটি অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার রূপে থাকে। কিন্তু ক্রমশ শিশু মনে মনে তার সংবেদনগুলির একটা ব্যাখ্যা বা অর্থ করে নেয় এবং তারই সাহায্যে সে একটি সংবেদন থেকে আর একটি সংবেদনকে পৃথক করে নিতে পারে। এই স্তরকে আমরা শিশুর অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তর বলতে পারি। মানসিক বিকাশের এই স্তরে শিশু ক্রমশ বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতাগুলির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে তার মনের পরিধি বা বিস্তার বাড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম প্রথম বিভিন্ন রঙ বা শব্দ তার মধ্যে একই ধরনের প্রত্যক্ষণ সৃষ্টি করত। কিন্তু যত তার মানসিক পরিধি বাড়তে থাকে তত সে বিভিন্ন রঙ বা বিভিন্ন শব্দ থেকে জাত প্রত্যক্ষণগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া প্রথম শৈশবে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণভাবে কর্মক্ষম থাকে না। ফলে তার অভিজ্ঞতাগুলিও তখন থাকে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার অভিজ্ঞতাগুলি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ ধারণ করে। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের স্তরে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি যতই সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হতে থাকে ততই সেগুলি ধীরে ধীরে সাধারণধর্মী থেকে বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে।

শিখন

এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তরে শিশু তার পুরাতন অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে শেখে। এই সময় থেকেই হয় শিশুর শিখনের[3] সুরু। শিশু যত ছোট থাকে তত তার প্রতিক্রিয়া বর্তমানের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যত সে বড় হয় ততই সে সময় ও স্থান উভয়ের দিক দিয়ে দূরবর্তী ঘটনার প্রতি সাড়া দিতে পারে। যেমন অতীতে মায়ের বকুনির কথা ভেবে শিশু হয়ত কাঁচের আলমারিতে হাত দেওয়া বন্ধ করল কিংবা প্রবাসী পিতার ছবি দেখে হয়ত আনন্দ প্রকাশ করল, ইত্যাদি। শিশু যখন আরও বড় হয় তখন ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও তার আচরণকে

1. Sensation 2. Perception 3. Learning

একইভাবে প্রভাবিত করে। যেমন পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে প্রশংসা পাবার প্রত্যাশায় সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে। এই ভাবে শিশুর সময়গত ও স্থানগত ধারণার পরিধি ক্রমশ বাড়তে থাকে।

প্রতীক-ব্যবহারের স্তর

শিশুর মন যত পরিণতি লাভ করে তত সে বিভিন্ন উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করে। সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে অনুপস্থিত ঘটনা বা বস্তুর প্রতি সাড়া দেওয়া থেকে সে শেখে তার সামনে অনুপস্থিত বস্তুকে কোন বিশেষ প্রতীক[1] দিয়ে বোঝাতে। যেমন, ক্ষুধায় ক্রন্দনরত শিশু মাকে দেখেই কান্না থামায়। এখানে মা নিজে তার খাদ্য নন। মা হলেন তার খাদ্যের প্রতীক মাত্র, কেননা সে জানে যে মা দেখা দিলেই খাবার আসবে। এইভাবে প্রতীকের ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়াটা তার মানসিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বস্তুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও নতুন আচরণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতীক ব্যবহার একটি অপরিহার্য উপকরণ।

শিশু যে কেবল প্রতীকের প্রতি সাড়া দিতে শেখে তাই নয়, প্রতীকের সাহায্যে সে আচরণ করতেও শেখে। ইতিপূর্বে সে মূর্ত বস্তুর ব্যবহার ছাড়া চিন্তা করতে পারত না। এখন থেকে সে তার চিন্তায় অমূর্ত বস্তু ব্যবহার করতে শেখে। যেমন, ছুটি পেলে কিভাবে সে দিনটা কাটাবে তার পরিকল্পনা সে এখন মনে মনে করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই ধরনের পরিকল্পনার ক্ষমতা শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং দূরস্থিত কোন লক্ষ্যকে উদ্দিষ্ট করে সে কাজ করার ক্ষমতাও অর্জন করে।

এই সব মানসিক বিকাশগুলি ঘটার অবশ্য কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই বা সেগুলি আকস্মিকভাবেও শিশুর মধ্যে দেখা দেয় না। প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়া নিতান্ত অঙ্কুর অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। বলা বাহুল্য সকল শিশুর ক্ষেত্রেই নানা কারণে সব মানসিক প্রক্রিয়াই সমানভাবে পরিণতি লাভ করে না এবং সেই জন্যই মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে প্রভেদ দেখা যায়।

ভাষার বিকাশ

শিশুর মানসিক অগ্রগতির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপটি হল তার ভাষার বিকাশ। শিশুর ভাষার বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যেমন রিফ্লেক্স স্তর, অনুকরণ-পুনরাবৃত্তির স্তর, অর্থবোধের স্তর, ভাষাসচেতনতার স্তর, বাক্য-কথন স্তর এবং লিখন পঠনের স্তর। জন্মের প্রথম বৎসর থেকেই শিশু অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে সুরু করে এবং তারপর তার সেই অর্থহীন শব্দগুলি ধীরে ধীরে তার

1. Symbol

পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, কাজ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়ে তার কাছে নানা অর্থবহ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বৎসরেই সে বয়স্কদের ব্যবহৃত বহু শব্দ নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে নেয় এবং তিন বৎসর বয়সেই সে বেশ ভালভাবেই কথা বলতে শেখে। আরও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জটিলতর বাক্য, বাগ্‌ধারা[1], প্রবাদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে সমর্থ হয় এবং পরিবেশ থেকে সুযোগমত শব্দ চয়ন করে তার ক্ষুদ্র শব্দ-ভাণ্ডারটি ক্রমশ সে সমৃদ্ধ করে তোলে। পড়তে পারা, চিত্রমূলক ভাষা (যেমন, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি) ব্যবহার করা প্রভৃতি জটিলতর কাজগুলি শিশু শেখে আরও কয়েক বৎসর পরে। এগুলি পুরোপুরি শিশুর মানসিক বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে না, অনেকখানি নির্ভর করে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতির উপর। তবে সাধারণত সমস্ত সভ্যসমাজে শিশু ছ'বৎসর বয়স থেকে পড়তে এবং সাত আট বৎসর বয়স থেকে লিখতে শেখে।

ধারণার বিকাশ ঃ পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল তার মধ্যে ধারণার বিকাশ। উন্নত চিন্তনের ক্ষেত্রে ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য। ধারণা বলতে বোঝায় কোন একটি বস্তুর জাতি বা শ্রেণী সম্পর্কে একটা সামগ্রিক বোধ। যেমন, শিশু জ্ঞান হবার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি, রঙ, ও প্রকৃতি বিশিষ্ট কয়েকটি গরু দেখল। সেগুলি প্রথম দিকে তার কাছে কতকগুলি বিভিন্ন ও পৃথক পৃথক প্রাণীরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু যখন গরুর জাতি বা শ্রেণী সম্বন্ধে তার মধ্যে একটা সামগ্রিক বোধ জন্মায় তখন সে সেই বিভিন্ন জন্তুগুলিকে 'গরু' এই একটি কথার দ্বারা বোঝাতে সমর্থ হয়। এই জাতি বা শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণা গঠনের পিছনে থাকে দুটি মানসিক প্রক্রিয়া, যথা, পৃথকীকরণ[2] ও সামান্যীকরণ[3]। শিশুর মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি প্রক্রিয়াও সুপরিণত হয়ে ওঠে এবং শিশু নানা জটিল ধারণা গঠন করতে সমর্থ হয়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ ধারণা এই সময় শিশুর মনে তৈরী হয়। সেগুলি হল কার্য ও কারণের ধারণা, সময়ের ধারণা এবং স্থানের ধারণা। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তরে শিশু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিশু শেখে আরও পরে। বিশেষ করে শিশু দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখনই যখন তার মধ্যে উন্নত চিন্তার ক্ষমতা দেখা দেয়।

সর্বপ্রাণবাদ

প্রথম শৈশবে শিশুর কাছে সব কিছুই প্রাণসম্পন্ন ও সজীব থাকে। সে সমস্ত ঘটনারই ব্যাখ্যা করে তার এই সর্বপ্রাণবাদমূলক[4] ধারণার দ্বারা। যেমন বলটা মাটিতে গড়াচ্ছে, বেলুনটা উড়ছে, বইটা টেবিল থেকে পড়ে গেল, আকাশে মেঘ উড়ে

---

1. Idiom Concept 2. Abstraction 3. Generalisation 4. Animistic

চলেছে—এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা করার সময় শিশু বল, বেলুন, বই, মেঘ ইত্যাদি বস্তুগুলিকে জীবন্ত বলে মনে করে। কিন্তু শিশু আরও একটু বড় হলে, প্রায় ৫/৬ বৎসর বয়স থেকে তার এই সর্বপ্রাণবাদমূলক ধারণা কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সে বিবিধ ঘটনার ব্যাখ্যা করতে শেখে। দুৎসের[1] পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কিণ্ডারগার্টেনের বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। তবে শিশু সত্যকারের যুক্তিভিত্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখা দিতে পারে সেই সব ঘটনারই যেগুলি তার বোধশক্তির পরিসীমার মধ্যে পড়ে।

সময় ও স্থানের ধারণা

কাকে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে এ ধরনের বিভিন্ন সময় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা বা জ্ঞানগুলি বিভিন্ন সময়বোধক কাজ থেকেই শিশু আহরণ করে থাকে। যেমন, সে চলে গেছে, সূর্য ডুবে গেছে, পরে যাব, এখন যাচ্ছি, বিশেষ করে 'তখন', 'এখন', 'পরে' এই সব কালবোধক উক্তি ও শব্দগুলি বিভিন্ন সময় সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানসৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে ন'দশ বৎসর বয়সের আগে ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে তার আরও বেশী সময় লাগে। সাধারণত বিদ্যালয়ে ইতিহাসের সাল, তারিখ বা তাম্রযুগ, প্রস্তরযুগ ইত্যাদি ঐতিহাসিক যুগবিভাগ শিশুদের মুখস্থ করতে বাধ্য করা হয় বটে কিন্তু এ সবের ধারণা তাদের কাছে নিতান্তই অর্থহীন থেকে যায়। বস্তুত সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর আগে শিশুদের যে সব ইতিহাস পড়ান হয় সেগুলি তাদের কাছে গল্পকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে বেশী অর্থপূর্ণ বলে বোধ হয় না। পিস্টরের[2] একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ঐতিহাসিক সময়ানুক্রম সম্পর্কে ধারণার বিকাশ বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর দৈনিক অভিজ্ঞতা কতখানি তার মনকে পরিণত করতে পারল তার উপর। স্থান সম্পর্কেও শিশুর ধারণার সৃষ্টি হতে সুরু হয় বেশ শৈশবকাল থেকে। স্থানের ধারণা সাধারণত জন্মায় গতি বা সঞ্চালন থেকে এবং যে দিন থেকে শিশু চলাফেরা করতে সুরু করে সেদিন থেকেই অস্পষ্টভাবে তার মধ্যে জন্ম নেয় স্থানের ধারণা। পরে ধীরে ধীরে সে অধিকৃত স্থান এবং শূন্য স্থানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

সামাজিক সচেতনতা

প্রথম শৈশবে শিশু থাকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক এবং একান্তভাবে নিজের ব্যাপারেই ব্যাপৃত। এক বৎসর বয়স থেকে অপরের প্রতি তার অনুরাগ জন্মাতে সুরু করে। কিন্তু বিদ্যালয় জীবন সুরু হওয়া থেকেই তার মধ্যে প্রকৃত সামাজিক দল সম্বন্ধে

---

1. Deutsche 2. Pistor

ধারণা জম্মায় এবং আর সকলের সঙ্গে সে দল বাঁধতে শেখে। কিন্তু প্রথম দিকে সে যে সব দল বাঁধে সেগুলি থাকে আকারে ছোট। তার প্রধান কারণ হল যে এই সময় সঙ্ঘ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনগুলি সম্বন্ধে তার কোন পরিষ্কার ধারণা জম্মায় না।

কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন

চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। আমরা চিন্তনের সময় মূর্ত বস্তুর পরিবর্তে তার কোন না কোন প্রতীকের ব্যবহার করি। শিশু বেশ শৈশব থেকেই চিন্তা করতে পারে। কিন্তু সে চিন্তা মূলত প্রতিরূপ[1] দিয়ে গঠিত। প্রতিরূপও এক ধরনের প্রতীক, মূর্ত বস্তুর এক ধরনের মানসিক ছবি। প্রথম দিকে শিশু প্রধানত এই প্রতীক বা মানসিক ছবির সাহায্যে চিন্তা করে। এই ধরনের নিছক প্রতিরূপধর্মী-চিন্তনকেই কল্পনা[4] বলা হয়। অতএব শিশুর প্রাথমিক চিন্তন হল প্রতিরূপমূলক এবং কল্পনাধর্মী। এই সময়েই শিশুর মনোজগৎ জুড়ে থাকে দিবা-স্বপ্ন[2] ও অলীক কল্পনা[3]। দিবা-স্বপ্ন দেখার অভ্যাস শিশুর মধ্যে যৌবনাগম পর্যন্ত বেশ তীব্রভাবেই বর্তমান থাকে এবং বহু ব্যক্তির ক্ষেত্রে সারাজীবনই থেকে যায়। দিবা-স্বপ্ন ও অলীক কল্পনা শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় আনে এবং তার মধ্যে প্রক্ষোভমূলক সমতার সৃষ্টি করে। শিশু তার বহুবিধ অপূর্ণ চাহিদার অংশিক তৃপ্তি এই ধরনের অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে লাভ করে এবং তা থেকে তার বাস্তব জীবনের নানা ধরনের খেলা ও আচরণ জম্ম নেয়। সময় সময় দিবাস্বপ্ন শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়নে সাহায্য করে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সংঘর্ষে আসার আগে প্রাথমিক প্রস্তুতি রূপেও দিবাস্বপ্ন শিশুকে সাহায্য করে থাকে।

চিন্তনের বিকাশ

শিশু প্রকৃত চিন্তন করতে পারে তখনই যখন থেকে সে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে। ভাষা হল চিন্তন প্রক্রিয়ার একটি শক্তিশালী বাহন। ভাষা ব্যবহারের পরের ধাপে শিশু শেখে ধারণা গঠন করতে এবং যখন থেকে সে ধারণা গঠনে সমর্থ হয় তখন থেকেই সে উন্নত ধরনের চিন্তন করতে পারে। চিন্তনের মধ্যে শিশু যত বেশী ধারণার ব্যবহার করতে পারে ততই তার চিন্তন জটিল ও উন্নত হয়ে ওঠে। ভাষা ও ধারণার ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তনের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসতে থাকে।

বিচারকরণের বিকাশ

বিচারকরণ হল সমস্যামূলক চিন্তন। সাধারণ চিন্তন প্রক্রিয়া বেশ পরিণতি

1. Image 2. Imagination 3. Day-dream 4. Make-believe

লাভ করলে বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেয়। শৈশবে দু'চারটি ছোটখাট সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা থাকলেও যাকে আমরা যুক্তিসম্মত বিচারকরণ বলি তা শিশুর মধ্যে ৭।৮ বৎসর বয়সের আগে দেখা দেয় না।

বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি

শিশুর সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার পিছনে যে সাধারণধর্মী মানসিক শক্তিটি কাজ করে তার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির স্বল্পতা বা প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতার মান ও মাত্রা। চিন্তন, বিচারকরণ, ধারণাগঠন প্রভৃতি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা বিশেষভাবে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর।

এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে সকল শিশু সমান মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না। মানসিক প্রক্রিয়া বা কাজ সম্পন্ন করার শক্তির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে আছে বুদ্ধির দিক দিয়ে ব্যক্তিগত
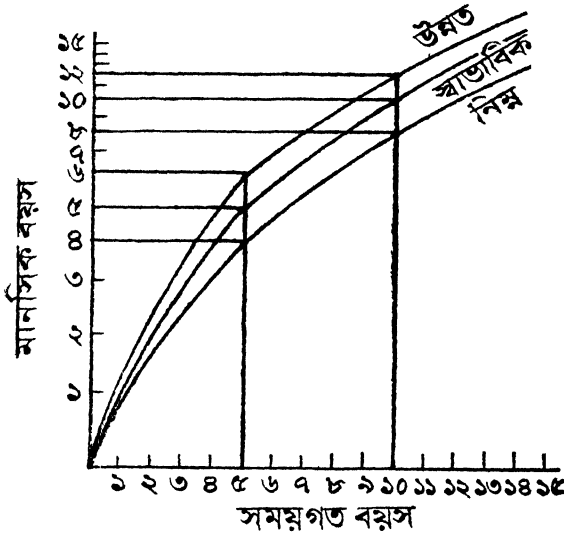
[নিম্ন, স্বাভাবিক ও উন্নত, এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির বিকাশের কাল্পনিক রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ৫ বৎসর বয়সের স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের মানসিক বয়স ৫, কিন্তু ঐ বয়সের নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের মানসিক বয়স ৪, আবার উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের মানসিক বয়স ৬]

বৈষম্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি পরিমাপের নির্ভরযোগ্য যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার সাহায্যে বর্তমানে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করা এবং

তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

বুদ্ধির বিকাশের একটি বিশেষ গতিপথ ও সীমারেখা আছে। বহু পর্যবেক্ষণ থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে সাধারণভাবে ১৫ থেকে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধি বাড়ে এবং তার পরেই বুদ্ধির বৃদ্ধিতে ছেদ ঘটে। অর্থাৎ সেই সীমারেখার পর আর বুদ্ধি বাড়ে না।

অবশ্য বুদ্ধির বিকাশের হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হার স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হারের চেয়ে অনুপাতে কম থাকে। কিন্তু পরে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ যখন বন্ধ হয়ে যায় তার পরেও উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ অব্যাহত থাকে। অবশ্য কোন বয়সেই স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধি উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির চেয়ে প্রকৃতপক্ষে বেশী হয় না (২২৭ পাতার চিত্র দ্রষ্টব্য)। আর মধ্যবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বা যাকে আমরা সাধারণ বা গড় শিশু বলি তার বুদ্ধির বিকাশের হার এই দুই শ্রেণীর বুদ্ধির বিকাশের হারের মধ্যবর্তী বা মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। শিশুর মানসিক বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।
২। শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা, ধারণা এবং বুদ্ধির ভূমিকা বর্ণনা কর।
৩। শিশুর বুদ্ধির বিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৪। শিশুর বিচারকরণ প্রক্রিয়ার বিকাশ বর্ণনা কর।
৫। শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিখনের ভূমিকা কি?
৬। টীকা লেখ—সর্বপ্রাণবাদ, দিবাস্বপ্ন এবং অলীক কল্পনা, প্রতীকের ব্যবহার।

সতেরো

প্রাক্ষোভিক বিকাশ

ইংরাজী ইমোসন[1] কথাটি এসেছে, ল্যাটিন ধাতু ইমোভেয়ার[2] থেকে, যার অর্থ হল উত্তেজিত হওয়া বা প্রক্ষুব্ধ হওয়া। অতএব ইমোসন বা প্রক্ষোভ বলতে বোঝায় এমন একটি মানসিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে উত্তেজিত বা ক্ষুব্ধ করে তোলে। বস্তুত যখন কোন ব্যক্তি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সে দেহে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

এই প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা যেমন তার কাজের পেছনে শক্তি জোগায় তেমনই তার আচরণের প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত মানব আচরণের স্বরূপ বুঝতে হলে তার বিভিন্ন প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শিক্ষার অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ—এ সবই বিশেষভাবে নির্ভর করে তার প্রক্ষোভের সুষম বিকাশের উপর।

সাধারণত রাগ, ভয়, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে সব উত্তেজিত বা বিচলিত মানসিক অবস্থাকে বোঝায় সেগুলিকেই আমরা প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে প্রাক্ষোভিক আচরণ অগণিত প্রকারের হতে পারে। এমন অনেক জটিল প্রক্ষোভধর্মী অনুভূতি আছে যেগুলির কোন সুনির্দিষ্ট নাম দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি।

প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতামাত্রেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণ। প্রক্ষোভের মানসিক দিকটি হল বিশেষ একটি মানসিক অনুভূতি, যেমন, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি। আর এর শারীরিক দিকটি হল ব্যক্তির শরীরের উপর অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্র বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে বিশেষ একটি স্নায়ুগুচ্ছের কাজ থেকে জাত নানা ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়া, যেমন বিশেষ বিশেষ গ্রন্থিরসের নিঃসরণ, রক্ত সঞ্চালনের দ্রুততা, হৃৎস্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি, দেহের শর্করাক্ষরণের হারের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোভ

নবজাত শিশু কি ধরনের এবং ক'টি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এ নিয়ে দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই গবেষণা করে আসছেন। ডেকার্ট[3] বিস্ময়, ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা, আনন্দ ও দুঃখ—এ ছ'টি মৌলিক প্রক্ষোভের[4] উল্লেখ করেছেন।

1. Emotion 2. Emovere 3. Descarte 4. Primary or Basic Emotion

অন্যান্য দার্শনিকেরাও মৌলিক প্রক্ষোভের অনুরূপ তালিকা ইচ্ছামত পেশ করেছেন। কিন্তু সেগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত, বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষণের সাহায্যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভগুলি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। ওয়াটসনের মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে তিনটি—ভয়, রাগ এবং ভালবাসা। ভয় জাগে মাত্র দুটি কারণ থেকে, উচ্চশব্দ এবং আকস্মিক পতন। রাগ জাগে শিশুর স্বাভাবিক দেহ সঞ্চালনে কোন বাধার সৃষ্টি করা হলে এবং ভালবাসা বা আনন্দ জাগে শিশুকে যখন আদর করা হয়। ওয়াটসন তাঁর একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলি উপনীত হন। শারমান[1] কিন্তু ওয়াটসনের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি কয়েকটি পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত করেন যে শিশুর প্রক্রিয়াগুলি এতই সাধারণধর্মী যে কোন্ প্রক্ষোভের কোন্‌টি প্রতিক্রিয়া তা বাইরে থেকে কখনই বোঝা যায় না।

শৈশবে প্রক্ষোভমূলক আচরণ যে নিতান্তই সাধারণধর্মী থাকে এ সিদ্ধান্ত আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই সমর্থন করেন। ক্যাথারিন ব্রিজেস[2] একাধিক পরীক্ষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এক ধরনের সাধারণ প্রকৃতির উত্তেজনা-মূলক অবস্থাকেই শিশুর প্রক্ষোভ বলে বর্ণনা করা যায়। দেখা গেছে যে শিশুর উপর যে কোন শ্রেণীর উদ্দীপক প্রয়োগ করা হোক না কেন শিশুর উত্তেজিত হওয়ার প্রকৃতিটি প্রায় সবক্ষেত্রে একই প্রকারের হয়ে থাকে।

শিশুর জন্মের প্রথম দিনগুলিতে চেঁচান, কাঁদা, হাত-পা ছোঁড়া ইত্যাদি আচরণগুলি দেখলে মনে হয় যে সেগুলির পেছনে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রভাব আছে। কিন্তু এই আচরণগুলি এতই সাধারণধর্মী যে এগুলি থেকে শিশুর অনুভূত প্রক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না। বস্তুত এটা একটা বিরাট মনোবৈজ্ঞানিক ভুল হবে যদি আমরা রাগ, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি বয়স্কসুলভ প্রক্ষোভগুলির দ্বারা শিশুর আচরণগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

প্রক্ষোভের বিশেষীভবন

শিশু যত বড় হয় তত তার আচরণগুলি বিশেষায়িত হতে থাকে। এই সময় থেকে শিশুর প্রাথমিক আচরণধর্মী উত্তেজনার অনুভূতিটি পর্বত-অবতীর্ণা স্রোতঃস্বতীর মত নানা বিশেষধর্মী প্রক্ষোভরূপ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রক্ষোভের এই বিশেষায়িত হয়ে যাওয়াটা শিশুর বিভিন্ন বাহ্যিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। গুডএনাফের[3] একটি পরীক্ষণে দেখা যায় যে দশমাস বৎসর বয়সের একটি শিশুর মুখের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখে বিভিন্ন প্রক্ষোভের অস্তিত্বের অনুমান করা যায়।

1. Sherman 2. Katherine Bridges 3. Goodenough

ব্রিজেসের মতে তিনমাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হতে সুরু করে। তার এই মৌলিক সাধারণধর্মী উত্তেজনা থেকে প্রথমে দুটি বিভিন্ন প্রক্ষোভপ্রবাহ জন্ম নেয়—আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য। ৬ মাসের সময় আনন্দ রূপ প্রক্ষোভটি বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাসের[1] রূপ নেয়। আর অস্বাচ্ছন্দ্য রূপ প্রক্ষোভটি ৪ মাস বয়সে বিশেষায়িত হয়ে রাগে, ৫ মাসে বিরক্তিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে পরিণত হয়। ৯।১০ মাসের সময় শিশুর আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে প্রথমে বড়দের প্রতি ভালবাসার রূপ নেয় এবং তারপর ১৫ মাসের সময় তার সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। আবার ১৬ মাসের সময় থেকে শিশুর মনে হিংসারূপ প্রক্ষোভটিও দেখা দেয়। ব্রিজেসের মতে এটি অস্বাচ্ছন্দ্যরূপ প্রক্ষোভ প্রবাহ থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে।

[সাধারণধর্মী উত্তেজনা থেকে নানা বিভিন্ন প্রক্ষোভের বিশেষীভবনের চিত্র]

শিশুর মধ্যে প্রথমে যে নির্দিষ্ট প্রক্ষোভমূলক আচরণটি দেখা যায় তা হল তার পরিচিত কোন মানুষের মুখ দেখে হাসা। পরে এই নীরব হাসি উচ্চ হাসির রূপ

1. Elation

গ্রহণ করে। গেসেলের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে ১ মাস বয়স থেকেই শিশুর ক্ষুধা, ব্যথা ইত্যাদি জনিত কান্নার মধ্যে পার্থক্য ধরা যায়।

শিশুর এই প্রক্ষোভমূলক আচরণ যতই বিশেষায়িত হতে থাকে ততই তার প্রক্ষোভের প্রকাশও সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম দিকে শিশুর রাগের প্রকাশ থাকে কতকগুলি অনির্দিষ্ট ও সমন্বয়হীন আচরণের সমষ্টিমাত্র রূপে এবং যে উদ্দীপকটি তার রাগ সৃষ্টির কারণ রূপে কাজ করে সেটির সঙ্গে কার্যকর সঙ্গতিবিধানের পক্ষে আচরণগুলি মোটেই উপযোগী হয় না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত তার রাগের অভিব্যক্তি উদ্দিষ্ট বস্তু বা পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে ওঠে। সেই রকম আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি অন্যান্য প্রক্ষোভের অভিব্যক্তিগুলিও ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট, সুসংহত ও লক্ষ্য-উপযোগী হয়। কিন্তু প্রক্ষোভ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন সকল বয়সের ব্যক্তির আচরণই অসংহত, অসংযত ও সমন্বয়হীন হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ হয় না।

বাহ্যিক অভিব্যক্তি

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। শিশু যত মনের দিক দিয়ে পরিণত হয় তত তার বাহ্যিক অভিব্যক্তির তীব্রতা কমে আসে এবং তার আচরণও যথেষ্ট পরিমাণে সংযত ও মার্জিত হয়ে ওঠে। যেমন ৪।৫ বৎসরের শিশু রেগে গেলে চিৎকার করে কাঁদে, হাত পা ছোঁড়ে, উদ্দাম আচরণ করে, কিন্তু ৭।৮ বৎসর বয়সে রাগের সময় সে আর চীৎকার করে কাঁদে না বা ঐ ভাবে হাত পা ছোঁড়ে না। আরও বড় হলে সে একেবারেই কাঁদে না এবং তার দৈহিক প্রকাশও অনেক বেশী মার্জিত ও সংযত হয়ে ওঠে।

সামাজিক দৃষ্টান্ত, অপরের নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি পারিবেশিক শক্তির চাপে এবং তার নিজের অতীত অভিজ্ঞতার জন্যই শিশু তার প্রক্ষোভের বাহ্যিক অভিব্যক্তি দমন করতে শেখে। সে নিজে বুঝতে পারে যে এই ধরনের অসংযত ও উদ্দাম আচরণের দ্বারা তার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না এবং সেই জন্য সে তার আচরণকে সংযত ও সুসংহত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া বিশেষ করে তার চারপাশের বয়স্ক সমাজের নিন্দা ও সমালোচনার ভয়ে সে তার প্রক্ষোভের অসংযত প্রকাশকে সংযত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে শিশু যতই বড় হয়, প্রক্ষোভের বাহ্যিক অভিব্যক্তিও ততই সে দমন করতে থাকে এবং দেখা গেছে যে ৭।৮ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অপরের কাছ থেকে গোপন করতে পারে। এর ফলে পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি বয়স্কদের পক্ষে শিশু কি ধরনের প্রক্ষোভ কখন অনুভব করল তা বুঝতে পারা একান্তই দুরূহ হয়ে ওঠে।

প্রক্ষোভের বাহ্যিক অসংহত অভিব্যক্তি দমন করা যে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অপরিহার্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যদি সকল মানুষ তাদের সমস্ত প্রক্ষোভ বিনা দ্বিধায় পূর্ণভাবে বাইরে প্রকাশ করত তাহলে পৃথিবী মোটেই একটি আকর্ষণীয় বাসস্থান হয়ে উঠত না। কিন্তু একথাও যেমন সত্য তেমনই প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার যে একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর দিক আছে সে কথাও তেমনই অনস্বীকার্য। বহু ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার ফলে মনের উপর তার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। প্রক্ষোভকে বাইরে অভিব্যক্ত করতে পারলে মনের মধ্যে তার অবাঞ্ছিত প্রভাব আর থাকে না। যেমন দুঃখের সময় কাঁদলে মনটা হাল্কা হয়ে যায়। রাগ প্রকাশ করে ফেললে পরে আর রাগ থাকে না। এরই নাম বিরেচন প্রক্রিয়া[1]। আর দুঃখ, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ যদি দমন করা হয় তবে সেগুলি মনের মধ্যে অবদমিত অবস্থায় থেকে যায় এবং মানসিক সাম্যকে স্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ সম্পর্কিত এই তথ্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ীতে ও স্কুলে প্রায়ই দেখা যায় যে বয়স্কদের শাসন বা নিন্দার ভয়ে শিশুরা তাদের প্রক্ষোভগুলি দমন করতে বাধ্য হয়। এর ফলে তাদের বাহ্যিক আচরণ প্রকাশ্যে ত্রুটিহীন ও বাঞ্ছিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই অবদমন তাদের মধ্যে গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের ভবিষ্যৎ আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে। অনেক সময় এই অবদমিত প্রক্ষোভ এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে এবং তা থেকে নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, প্রক্ষোভ গোপন বা দমন করার ফলে শিশু অনেক সময় অন্যান্য ব্যক্তিদের ভুল বোঝে এবং বিনা কারণে মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে। যেমন, কোন বিশেষ ব্যাপারে সে যদি অসুবিধা অনুভব করে এবং যদি তার মনের ভাব সে অপরের কাছে প্রকাশ করতে না পারে, তবে তাকে নীরবে সেই অসুবিধা সহ্য করতে হয় এবং তার ফলে সে আর সকলের প্রতি একটা রাগের ভাব মনে মনে পোষণ করে চলে।

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিশুর মনে ভয়, রাগ, দুঃখ ইত্যাদি প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শিশু যদি সে সময় তার প্রক্ষোভ দমন বা গোপন না করে কারও কাছে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে তাহলে তার প্রক্ষোভের মিথ্যা কারণটি দূর হয়ে যেতে পারে এবং তার মানসিক সাম্য ফিরে আসতে পারে।

এই সব কারণে কঠোর বিধিনিষেধ ও অনুশাসনের চাপে শিশুর প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি যাতে প্রতি পদে ব্যাহত না হয় এবং যাতে তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ সহজ ও

1. Catharsis

স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সুশিক্ষার কার্যসূচীর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি-প্রবণতার পরিবর্তন

শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রক্ষোভের প্রকাশের মধ্যে যেমন পরিবর্তন দেখা দেয়, তেমনই তার প্রক্ষোভের অনুভূতি-প্রবণতার মধ্যেও বেশ পরিবর্তন আসে। শৈশবে তার এই অনুভূতি-প্রবণতার পরিধি থাকে সীমাবদ্ধ এবং বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট কতকগুলি উদ্দীপক ছাড়া তার মনে প্রক্ষোভ জাগে না। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধি শক্তি, মানসিক সামর্থ্য, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিধি ইত্যাদি বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে তার প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি-প্রবণতারও পরিধি প্রসারিত হয়।

আগে যে সব উদ্দীপক সরাসরি শিশুর উপর কাজ করত, শিশু সেগুলি সম্বন্ধেই কেবলমাত্র প্রক্ষোভ অনুভব করত, দূরবর্তী বা বর্তমানে অনুপস্থিত কোন উদ্দীপক তার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই অতীতের কোন ঘটনা এবং বর্তমানে অনুপস্থিত কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, সে তার অতীতের কোন কাজের জন্য অনুশোচনা বা গর্ব বোধ করতে পারে বা ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা বা চিন্তা তার মনে আনন্দ বা দুঃখ সৃষ্টি করতে পারে।

শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের অনুভূতি প্রধানত দৈহিক নিরাপত্তা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্য কোন চিন্তা বা ধারণা তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ইত্যাদি কারণগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং এই সব কারণেও তার মনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেমন, কারও নিন্দায় সে দুঃখ পায়, কারও প্রশংসায় আনন্দিত হয়, নিজের ব্যর্থতার চিন্তায় ভয় পায়, দেশের বা বংশের গৌরবে গর্ব বোধ করে, অন্যায় কাজ করলে অপরাধবোধ অনুভব করে ইত্যাদি।

তাছাড়া শিশুর দেহের ও মনের পরিণতি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র উদ্দীপকের প্রকৃতির দ্বারাই তার প্রক্ষোভের স্বরূপ ও তীব্রতা নির্ধারিত হয় না. তার মানসিক সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ প্রবণতাই তার প্রক্ষোভের জাগরণ, স্বরূপ ও তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন আগে হয়ত পাহাড় বা ঝরণা দেখলে শিশুর মনে কোন ভাবোদয় হত না, কিন্তু এখন ঐ সব দেখলে শিশুর মনে বিস্ময় বা আনন্দ জেগে ওঠে। তেমনই কোন শিশু হয়ত খেলাধূলায় কৃতিত্ব দেখিয়ে আনন্দ পায়। আবার অন্য একটি শিশু খেলাধূলায় ভাল না করতে পারলে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু

পরীক্ষায় দু'নম্বর কম পেলে দুঃখে ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই অনুভূতিগত প্রবণতার পরিবর্তনের পেছনে প্রধানত কাজ করে শিশুর পরিবেশের প্রকৃতি, তার শিক্ষা-দীক্ষা ও তার বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিণতি।

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তার প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ জানা যে অত্যন্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তার আচরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে হলে তার আচরণের পেছনে কি ধরনের প্রক্ষোভ কাজ করছে তা জানা অত্যাবশ্যক। শিশুর আপাত অর্থহীন অনেক আচরণই তার প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য বয়স্করা শিশুর প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ না জানতে পেরে প্রায়ই তাকে ভুল বোঝেন এবং তার আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করেন। যেমন, দেখা গেল যে কোন শিশু সকল ব্যাপারেই অনাসক্ত ও উদাসীন, কোন কিছু নিয়ে দাবী বা ঝগড়া করে না। পিতামাতা, শিক্ষকেরা তাই থেকে মনে করলেন যে শিশুর এই উদাসীন আচরণ তার অনাসক্ত ও সংযত মনের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এমন হতে পারে যে শিশু মোটেই উদাসীন বা অনাসক্ত নয়। তার প্রতি আর সকলের আচরণ থেকে তার মনে হয়ত এমন ধারণা জন্মেছে যে সকলে তার প্রতি অবিচার করছে এবং সেই কারণে তার মনে সকলের প্রতি রাগ ও অসন্তোষ জেগেছে এবং তাই থেকে সমস্ত কাজের প্রতিই অনাসক্তি দেখা দিয়েছে। শিশুর আচরণের এই ধরনের ভুল ব্যাখ্যার জন্য সমস্ত শিক্ষা প্রচেষ্টাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

অনুশীলনী

১। শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

২। শিশুর প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে কি বোঝ? কিভাবে সেগুলি বিশেষায়িত হয়ে যায়?

৩। প্রক্ষোভের অনুভূতিগত প্রবণতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় বর্ণনা কর।

সামাজিক বিকাশ

সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় শিশুর পরিপার্শ্বের নানা ব্যক্তি, বিভিন্ন দল, সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে না-সামাজিক, না-অসামাজিক প্রকৃতির। তখনও পর্যন্ত সে কোন মানুষের সংস্পর্শে আসে না এবং সে জন্য তার সামাজিক বা অসামাজিক হবার কথা ওঠেই না। কিন্তু শীঘ্রই সে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসতে থাকে, ছোট বড় নানা রকমের দলে যোগ দেয় এবং আরও পরে নানা বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এইভাবে সে ক্রমশ একটি অপরিণত সমাজ চেতনাহীন শিশু থেকে একটি পূর্ণ সামাজিক মনোভাবসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে এক কথায় সামাজিকীভবন[1] নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

সহজাত উপাদান

যদিও জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ বা মনোভাব বলতে কিছু থাকে না, তবু তার মধ্যে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক আচরণ সম্পন্ন করার শক্তি জন্ম থেকেই বিদ্যমান থাকে। যে সব মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানব আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁরা যূথবদ্ধতা বা যৌথ প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন[2] এবং তাঁদের মতে শিশুর সামাজিকীকরণের পেছনে এই প্রবৃত্তির ভূমিকাই সবচেয়ে শক্তিশালী। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মানবশিশুর মধ্যে যে সামাজিক জীবন যাপন করার একটা সহজাত প্রবণতা আছে একথা তাঁরা অস্বীকার করেন না। তাছাড়া সামাজিক আচরণের উপযোগী মানসিক সংগঠন, নির্ভরপ্রবণতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, দয়া ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানব-শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই নিহিত থাকে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে।

পারিপার্শ্বিক উপাদান

শিশুর সামাজিকীভবনের ক্ষেত্রে সহজাত প্রবণতা ও সমাজধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশই যে সবচেয়ে বড় শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা গেছে যে জন্ম থেকে শিশু যদি সমাজধর্মী পরিবেশে মানুষ না হয় তাহলে সে একটি অসামাজিক জীব রূপে গড়ে ওঠে। এ্যাভিরনের[3] বন্য বালক, ভারতের বনে

1. Socialisation 2. পৃঃ ১৬ 3. Avyron

প্রাপ্ত নেকড়েপালিত শিশু প্রভৃতির কাহিনী থেকে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায় যে সামাজিক পরিবেশে যদি শিশু মানুষ না হয় তবে সে সামাজিক আচরণ বা রীতিনীতি শেখে না। সে জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিকীভবন প্রক্রিয়াকে মূলত সামাজিক অভ্যাস গঠন বলেই বর্ণনা করে থাকেন। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ প্রথা, রীতি-নীতি, আচরণ-বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ প্রচলিত আছে। বস্তুত এগুলি শেখা এবং আয়ত্ত করার উপরই শিশুর সামাজিকীভবন নির্ভর করে। এ দিক দিয়ে সামাজিকীভবন এক প্রকারের শিখন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আর সকল শিখন-প্রক্রিয়ার মতই সামাজিকীভবন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি, অন্তর্দৃষ্টি, অনুবর্তন, অনুষঙ্গ, অনুশীলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

জন্মের সময় থেকেই শিশু থাকে আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনিমগ্ন। আহ্লের[1] ভাষায় শিশু জীবন সুরু করে অহংসর্বস্ব[2] রূপে। প্রথম দিকে তার চারপাশের পৃথিবীকে সে স্বার্থপরের মত তারই একান্ত নিজস্ব পৃথিবী বলে মনে করে এবং এই পৃথিবী থেকে অনেক কিছু পাবার প্রত্যাশা করে। কিন্তু শীঘ্রই তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে সুরু করে। সমাজ এবং তার নিজেদের সত্তার মধ্যে যে ব্যবধানের দেওয়ালটা গড়ে উঠেছিল সেটি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে এবং এমন একদিন আসে যখন শিশু সেই সমাজেরই একজন হয়ে ওঠে। এই অহংসর্বস্ব স্বার্থপর শিশু থেকে সমাজচেতন, সঙ্গকামী ও পারস্পরিক আদানপ্রদানে অভ্যস্ত পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির ক্রমবিবর্তনের নামই সামাজিকীভবন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ

শিশুর এই মানসিক বিকাশের প্রথম ধাপটির আমরা নাম দিতে পারি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ[3]। এই সময় শিশুর অহংসত্তা জন্ম নেয়। সে নিজেকে 'আমি' বলে জানতে শেখে। কিন্তু তখনও তার মধ্যে 'তুমি' বলে কোন ধারণার সৃষ্টি হয় না। সে ভাবে, আমার খেলনা আমার। কিন্তু 'তোমার খেলনা'র কথা তখনও সে ভাবতে শেখে না।

সামাজিকীভবন

এর পরের ধাপে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ থেকে ধীরে ধীরে দেখা দেয় সামাজিকীভবন। এই ধাপেই সে 'আমি'র বিপরীত 'তুমি'কে চিনতে শেখে। কিন্তু এ ধাপেও সে 'আমি' এবং 'তুমি'র মধ্যে কোন আদানপ্রদানের সম্পর্ক স্থাপন করে না। সে ভাবে 'আমার খেলনা আমার, তোমার খেলনা তোমার।'

কিন্তু এর পরে আরও বড় হলে শিশু অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে সুরু করে এবং খেলনার আদান-প্রদান করে। তখন সে ভাবতেও শেখে, 'আমার খেলনা তোমারও।'

1. Uhl 2. Egoist 3. Individualisation

এই ধাপে শিশুর সত্যকারের সামাজিক বিবর্তন সুরু হয়। তবে সামাজিকীভবনের সময় শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের কাজ বন্ধ থাকে ভাবলে ভুল হবে। দুটি প্রক্রিয়াই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একসঙ্গে চলে। নিজের অহংসত্তা সম্বন্ধে শিশুর সুনির্দিষ্ট জ্ঞান সৃষ্টি না হলে তার সামাজিক সচেতনতার কোন অর্থই হয় না। তেমনই সামাজিক বোধ যদি অপরিণত থাকে তবে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সঙ্কীর্ণ ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অতএব, দুটি প্রক্রিয়ার সুষম অগ্রগতি শিশুর সুস্থ ব্যক্তিসত্তা গঠনে অপরিহার্য।

ঠিক কোন্ সময় থেকে শিশুর সামাজিক আচরণ সুরু হয় একথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে দেখা গেছে যে জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অপরের প্রতি মনোযোগ দেয় না। কিন্তু ৫/৬ মাস থেকেই হাসা, শব্দ ও ভঙ্গীর অনুকরণ করা, নিজের প্রতি অপরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা ইত্যাদি আচরণ দেখে মনে হয় যে শিশুর মধ্যে এই সময় থেকেই সামাজিক সচেতনতা ধীরে ধীরে জাগতে সুরু করে। প্রথম প্রথম তার এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতিই মনোযোগ দানে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে অবশ্য ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

ইতিপূর্বে শিশু প্রাণহীন ও প্রাণবান এ দুয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বুঝতে পারত না এবং দুয়ের প্রতি তার আচরণ একই ধরনের ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে শীঘ্রই সে প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারে এবং দুয়ের প্রতি তার আচরণের ধারা ও প্রকৃতি বদলে যায়। দেখা যায় যে বড়দের কারও মুখ কাছে আনলে শিশু হেসে ওঠে কিন্তু জড় বস্তু দেখে সে ওভাবে হাসে না। প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা শিশুর সামাজিক বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য সোপান।

প্রায় এক বৎসর বয়স থেকেই শিশুর দৃষ্টি তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু মিলেমিশে খেলার স্তর আসে দুই বা আড়াই বৎসর বয়স থেকে। বস্তুত ২ বৎসর বয়সের আগে পর্যন্ত শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা বেশ তীব্র থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা ছাড়া সে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সামাজিক মনোভাবের পরিচয় দেয় না। এমন কি ৪।৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে বেশ নির্জনতাপ্রিয় ও আত্মমুখী রূপেই দেখা যায়।

স্কুলে প্রবেশ করার সময় থেকে সত্যকারের সামাজিক হওয়ার কাজের সুরু হয়। এই সময় শিশুরা স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি বড় বড় সংগঠনের মধ্যে থাকলেও সেগুলির মধ্যেই আবার ছোট ছোট দল বাঁধে এবং এই সব ছোট দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। সে যত বড় হয় তত সে আরও বেশী করে যৌথ

কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং বৃহত্তর দল বা গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। তার নিজের মানসিক শক্তি ও সংগঠন অনুযায়ী সে কখনও দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, আবার কখনও দলের নেতার অনুগামী হয়।

এই দল বাঁধা, মেলামেশা ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক[1] প্রবণতাও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ বন্ধুর নির্বাচন, বিশেষ ধরনের খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ, ছোট ছোট দলের মধ্যে নিজের সঙ্গকামিতাকে সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাবেরও যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে।

আট দশ বৎসর বয়স থেকে শিশুর সামাজিক মনোভাব বেশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় থেকে বৃহত্তর দল গঠনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ যায় এবং বড় বড় সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে সে ইচ্ছুক হয়। ফারফে'র[2] পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে দশ বৎসর বয়স থেকে শিশুদের মধ্যে দল সম্বন্ধে মর্যাদাবোধ, দল আনুগত্য ইত্যাদি ধারণাগুলি যথেষ্ট পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে সমাজপ্রীতি শিশুর আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের স্থান অধিকার করে।

এই সময় আরও দেখা যায় যে খেলা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক বা বিনোদনমূলক সম্মেলন ইত্যাদি যৌথ-প্রচেষ্টামূলক বৃহত্তর উদ্যোগে শিশু সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করে। তার ফলে দলবিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলি যেমন একদিকে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনই উপযুক্ত ক্ষেত্রে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেবার মত ব্যক্তি তৈরীর কাজও সুরু হয়ে যায়।

শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আর একটি বস্তু। সেটি হল আচরণের ক্ষেত্রে সমাজের অনুমোদিত মূল্যবোধ বা মান সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রায় ২।৩ বৎসর বয়স থেকে সুরু করে, বিশেষ করে ৬।৭ বৎসর বয়সের পর থেকে ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ সম্বন্ধে বয়স্করা যে মূল্যবোধ ধার্য করেন শিশু সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী তার নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে।

শিশুর সামাজিক বিকাশকে এই সময় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার যৌনচেতনার জাগরণ। ৯।১০ বৎসর বয়সের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই খেলতে ভালবাসে এবং বিপরীত দলের সঙ্গে মেলামেশার কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। কিন্তু যৌবনাগমের সূচনা থেকেই তাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় থেকে কোন কোন ছেলে সুযোগ পেলে মেয়েদের দলে যোগ দিয়ে খেলে এবং মেয়েরাও ছেলেদের দলে মিশে খেলতে চায়। সাধারণত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদির চাপে তারা সব সময় এ ধরনের সুযোগ পায় না। মেয়েদের

1. Individualistic 2. Furfey

যৌবনাগম ছেলেদের আগে হয় বলে তাদের মধ্যে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ আগেই দেখা দেয়।

সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন শক্তির কাজ

শিশুর সামাজিক বিকাশ বহু বিভিন্নধর্মী শক্তির সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফল রূপে দেখা দেয়। এই শক্তির কতকগুলি বংশধারার অন্তর্ভুক্ত বা সহজাত, আর কতকগুলি পরিবেশের বৈশিষ্ট্য থেকে সঞ্জাত বা অর্জিত। নীচে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

পরিণমন

সহজাত শক্তিগুলির মধ্যে প্রথম হল শিশুর পরিণমন[1] প্রক্রিয়াটি। সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে আচরণের উপর এবং সেই আচরণ নির্ভর করে শিশুর দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি দিকগুলির পরিণমনের উপর। ডেনিসের[2] একটি পরীক্ষণে জন্মের পর থেকে দুটি শিশুকে সাত মাস বয়স পর্যন্ত এমন একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রাখা হল যেখানে কেউ তাদের সামনে হাসত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে যখন ঠিক সময় এল দুটি শিশুই অপরের কোনরূপ উৎসাহদান বা প্রচেষ্টা ছাড়াই হাসতে সক্ষম হল।

সামাজিক আচরণ যে পরিণমনের উপর নির্ভরশীল অনেক পরীক্ষণ থেকে এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। ধরা যাক একটি দু'বৎসরের ছেলেকে চার বৎসর বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণ শেখান হল এবং আর একটি ছেলেকে বিশেষ কোন আচরণ শেখান হল না। যখন দু'জনেরই চার বৎসর বয়স হল তখন দেখা গেল যে দ্বিতীয় ছেলেটি নিজে নিজেই চার বৎসর বয়সের উপযোগী আচরণগুলি করতে সমর্থ হয়েছে এবং প্রথম ছেলেটির সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। এই থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে শিশুর বিভিন্ন বয়সের সামাজিক আচরণ তার সেই বয়সের পরিণমনের উপর নির্ভরশীল।

বুদ্ধি

আর একটি সহজাত বস্তুর উপর শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেটি হল শিশুর বুদ্ধি। আমরা জানি যে সব শিশুই সমান বুদ্ধির অধিকারী হয় না এবং সকলের বুদ্ধির বিকাশের হারও সমান নয়। ফলে বিভিন্ন সামাজিক আচরণ সকলের পক্ষে সমানভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এমন অনেক জটিল সামাজিক আচরণ আছে যেগুলি উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা চটপট আয়ত্ত করে নেয় এবং সামাজিক সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি হওয়ার জন্য আর একটি ছেলের পক্ষে হয়ত সেই একই আচরণ যথাযথভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হল না এবং তার ফলে সে তার ঈপ্সিত সামাজিক সাফল্য ও প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হল। অবশ্য

1. Maturation 2. Dennis

সাধারণ স্তরের সামাজিক আচরণগুলি আয়ত্ত করতে অতিরিক্ত বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধির সাধারণ মান শিশুর সামাজিকীভবনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সাধারণ মানের চেয়ে যদি কোন শিশুর বুদ্ধি কম থাকে তবে তার পক্ষে সামাজিক আচরণ শেখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়।

পরিণমন প্রক্রিয়া, বুদ্ধি ইত্যাদি ছাড়া আরও অনেক সহজাত উপাদানের উপর সামাজিক বিকাশ নির্ভরশীল। সেগুলি হল শিশুর মনঃপ্রকৃতি, জন্মগত প্রবণতা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি।

শিখন

পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এই পর্যায়ে প্রথম পড়ে শিখন[1]। সামাজিক আচরণ শিশু আয়ত্ত করে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শিখন সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এছাড়া অনুকরণ, অভিভাবন ইত্যাদি পন্থাতেও শিশু নানা আচরণ শিখে থাকে।

শিখন আবার নির্ভর করে বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের উপর। যে পরিবেশে শিশু বড় হয় সেই পরিবেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিই শিশুর সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারিত করে দেয়। এই কারণেই বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন শিশুদের সামাজিক বিকাশের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

শিশু যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের সংস্কৃতি, প্রথা, প্রচলিত রীতিনীতি প্রভৃতি শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি-সম্পন্ন সমাজে মানুষ হওয়া দুটি ছেলের বা দুটি মেয়ের,—যেমন একটি আমেরিকান ছেলের এবং একটি ভারতীয় ছেলের কিংবা একটি বাঙালী মেয়ের এবং একটি নেপালী মেয়ের সামাজিক আচরণের মধ্যে তুলনা করলে এই তথ্যটির যথার্থ্য প্রমাণিত হবে। আবার একই সাংস্কৃতিক পরিবেশে অথচ বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের সামাজিক বিকাশের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, যে ছেলেটি সাধারণ শ্রমিকের ঘর থেকে এসেছে তার খেলাধুলা মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া, মেসিন চালান ইত্যাদি ধরনের আচরণে সীমাবদ্ধ থাকে। আর যে ছেলেটি কোন শিক্ষক পরিবার থেকে এসেছে তার খেলা প্রকাশ পায় লেখাপড়া করা বা পড়ানোর রূপে।

সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থা

শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে শিশুর পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা। একই সমাজের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের দিক দিয়ে প্রচুর বিভিন্নতা দেখা যায়। এই বিভিন্ন স্তরভুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ীর আবহাওয়া ও

1. Learning

পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। তার ফলে শিশুদের সামাজিক বিকাশের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন, যে শিশু নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে এসেছে তার পক্ষে অপরের সঙ্গে সহজ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। প্রায়ই তার ব্যবহারে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা যায় এবং নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন থাকার ফলে সে নিম্নতাবোধে[1] ভোগে। তার ফলে সেই শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। তেমনই আবার উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক আচরণ শিখতে তাদের অসুবিধা হয় না। অপর দিকে নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনয়, ভদ্রতা, স্বাবলম্বন, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি তৈরী হয় এবং উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক সময় ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা, আলস্য, অমনোযোগ প্রভৃতি দোষগুলি দেখা যায়। যে সব পিতামাতার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় তাঁদের ছেলেমেয়েরা নানা প্রয়োজনীয় কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে এবং মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যদি তারা উৎকর্ষের অধিকারী নাও হয় তাহলেও তারা অনেক সময় ব্যবহারিক দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে উল্লেখযোগ্য সামাজিক সাফল্য লাভ করে। আবার নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েরা সরাসরি মায়েদের হাতে লালিত পালিত হওয়াতে তাদের বিকাশ প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিশেষ কৃত্রিমতা দেখা যায় না। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এবং বেতনভুক্ ধাত্রী ও পরিচারিকাদের হাতে মানুষ হয় এবং সেই কারণে বহু ক্ষেত্রেই তাদের মানসিক সংগঠনে গুরুতর অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে এই সব ছেলেমেয়েরা ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের আঘাত সহ্য করতে বাধ্য হয়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য শিশুদের নৈতিক মূল্যবোধকে বহুক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সাধারণত দেখা গেছে যে মধ্যবর্তী ঘর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে উচিত-অনুচিত এবং করণীয়-অকরণীয় সম্বন্ধে একটি বেশ সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা থাকে। উচ্চবিত্তসম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ততটা সুনির্দিষ্ট নীতিবোধ জন্মায় না এবং প্রায়ই ভালমন্দের বিচারে তারা উদার প্রকৃতির হয়ে থাকে। তবে খুব নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে আবার দুর্নীতির প্রভাবও মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং মধ্য বা উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় তারা ছোটখাট অপরাধ করতে ইতস্তত বা কুণ্ঠা বোধ করে না।

1. Sense of inferiority

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে তার পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই-জন্য শিশুর মনোভাব, আচরণ, প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ইত্যাদি নির্ভুলভাবে জানতে হলে তার পরিবার ও বাড়ীর পটভূমিকা ভাল করে জানা একান্তই প্রয়োজন।

সামাজিক আচরণে বৈষম্য

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে বিশেষ কতকগুলি শক্তি ও উপাদান। এই সব শক্তি ও উপাদান বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তার ফলে শিশুর সামাজিক আচরণের মধ্যে প্রচুর বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, কোন শিশু সঙ্গপ্রিয় ও মিশুকে হয়, কোন শিশু আত্মকেন্দ্রিক ও লাজুক প্রকৃতির হয়, আবার কোন শিশু আক্রমণধর্মী[1] এবং কর্তৃত্বপ্রিয় হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

কোন কোন শিশুর মধ্যে বন্ধুতা ও সহযোগিতার মনোভাবের প্রবণতা বেশী দেখা যায়, আবার কারও আচরণে প্রতিরোধ[2] খুব প্রবল মাত্রায় প্রকাশ পায়। বন্ধুত্বমূলক আচরণও বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। খুব শৈশব থেকেই এই দু'ধরনের আচরণ শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে এবং সামাজিক বিকাশ স্বাভাবিক ও সহজ পথে অগ্রসর হলে শিশুর মধ্যে বন্ধুতামূলক আচরণের মাত্রাই দিন দিন বেড়ে ওঠে এবং সেগুলি শিশুকে আর সকলের সঙ্গে সুস্থ সমাজজীবন যাপনে সাহায্য করে। কিন্তু নানা প্রতিকূল পারিবেশিক কারণে অনেক সময়ে শত্রুতামূলক আচরণও শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে এবং পরে সেই শিশু একজন অসামাজিক ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। তবে মেনজার্টের[3] একটি পরীক্ষণে প্রকাশ পায় যে সাধারণ শিশুর ক্ষেত্রে বন্ধুতামূলক আচরণ শত্রুতামূলক আচরণের চেয়ে সংখ্যায় প্রায় চার গুণ বেশী।

সমানুভূতি

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচরণের মধ্যে সমানুভূতির[4] গুরুত্ব প্রচুর। অপরের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করার নাম সমানুভূতি। এই আচরণটি ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গতিবিধানের জন্য যেমন অত্যন্ত প্রয়োজন তেমনই তার সমাজজীবন গঠনেও এর সহায়তা অপরিহার্য। বস্তুত সমস্ত সমাজজীবনের ভিত্তি ও সংগঠন, দুইই সমানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমানুভূতিমূলক আচরণ করার প্রবণতা ও শক্তি নিয়ে শিশুমাত্রেই জন্মে থাকে। কিন্তু এই আচরণের মাত্রা ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিশুর পরিবেশ ও প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের উপর।

1. Aggressive 2. Resistance 3. Mengert 4. Sympathy

তাছাড়া সমানুভূতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিশুর অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর। সমানুভূতিমূলক আচরণমাত্রের মধ্যে আছে অভেদীকরণ[1] নামে একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি অপরের সুখ বা দুঃখের সময় তার সঙ্গে নিজেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে করে। এই অভিন্নতাবোধ যত বেশী হবে সমানুভূতির মাত্রা ও তীব্রতাও তত বাড়বে। বলা বাহুল্য যে কারও দুঃখে বা সুখে সমানুভূতি প্রকাশ করতে হলে ব্যক্তির নিজের সেই ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাটা অপরিহার্য। স্বাভাবিকভাবেই খুব ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে সমানুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, কেননা দুঃখ বা সুখের বিভিন্ন লক্ষণ বা চিহ্নগুলির সঙ্গে তারা তখনও পরিচিত হয়ে ওঠে নি। কেউ জোরে কেঁদে উঠলে শিশুও কেঁদে উঠতে পারে। কিন্তু কারও হাত পা ভেঙ্গে গেলে বা কোন জায়গা ফুলে উঠলে ব্যক্তি যে দুঃখ বোধ করে সে দুঃখে ছোট শিশুরা দুঃখ অনুভব করে না। কেননা তারা জানেই না যে এগুলি দুঃখ বা ব্যথার লক্ষণ। কিন্তু যত তারা বড় হয় ততই নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা এই সব লক্ষণ ও চিহ্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অভেদীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল রকম সমানুভূতিমূলক আচরণ করতে সমর্থ হয়।

সমানুভূতিমূলক আচরণগুলি যাতে শিশুর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্গত। কেননা সমাজের আর দশজনের সঙ্গে শিশু কি প্রকার সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে এই আচরণটির উপর। যদি তার সমানুভূতি স্বাভাবিক পথে বিকশিত হয় তবে তার সঙ্গতিবিধানের কাজটাও সুষ্ঠু ও আয়াসহীন হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশও স্বাস্থ্যময় এবং সুষম হয়ে উঠবে। আর যদি শিশুর মধ্যে সমানুভূতি সুবিকশিত না হয়, তবে তার সঙ্গতিবিধান প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশও ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠবে।

সমানুভূতিমূলক আচরণ প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে শেখান যায় না। কেননা শিশুর সমানুভূতিমূলক বোধ ও আচরণ নির্ভর করে অসংখ্য বস্তুর উপর। তবে শিশুর চারপাশের বয়স্কেরা তাঁদের আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামনে সমানুভূতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন এবং পরোক্ষভাবে তাকে সমানুভূতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করতে পারেন। তা ছাড়া রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি সমানুভূতির বিরোধী প্রক্ষোভগুলি যাতে শিশুর মধ্যে অধিক মাত্রায় না সৃষ্টি হয় সে দিকেও যত্ন নেওয়া আবশ্যক। প্ররোচনা, আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যেও সময় সময় শিশুর মধ্যে সমানুভূতি জাগান যায়।

1. Identification

বন্ধুত্ব

শিশুর মধ্যে ভালবাসার প্রক্ষোভ জাগার সময় থেকে বন্ধুত্বমূলক আচরণও দেখা দেয়। দু'বৎসর বয়স থেকেই শিশু বন্ধুত্ব[1] পাতাতে সুরু করে এবং যত সে বড় হয় তত তার বন্ধুত্বমূলক আচরণের পরিধি বাড়াতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বন্ধু নির্বাচনের মাপকাঠিও বদলে যায়। নিজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশু তার বন্ধু নির্বাচন করে। সাধারণত বন্ধুদের মধ্যে উচ্চতা, ওজন, বুদ্ধি, পড়াশোনা, খেলাধুলা, হবি ইত্যাদির দিক দিয়ে মিল থাকে। যদিও বন্ধুদের মধ্যে এইগুলির সব ক্ষেত্রেই মিল দেখা যায় না তবে এ কথাটি সত্য যে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মিল থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং ঐ মিলটির স্থায়িত্বের উপরই বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। একই স্থান বা একই সামাজিক সংগঠনের মধ্যে থাকার জন্যও শিশুতে শিশুতে বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। তা ছাড়া বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে শিশুদের পরিবারের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

প্রতিরোধ

অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা যায়। ছোট শিশুকে স্নান করাতে বা জামা পরাতে গেলে সে প্রতিরোধ[2] করে। প্রতিরোধের প্রাথমিক অভিব্যক্তি হল হাত-পা শক্ত করা, চীৎকার করে কাঁদা ইত্যাদি। বড় হয়েও শিশুর এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা দেখা দেয় অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমির রূপে। তাকে কোন কিছু করতে বললে সে তা করে না। এই প্রতিরোধমূলক মনোভাবের চরম অবস্থা থেকেই নেতিমূলক[3] আচরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যৌবনাগমের[4] সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই নেতিমূলক আচরণ বিশেষভাবে দেখা যায়।

প্রতিরোধমূলক আচরণের প্রথম কারণ হল যে শিশু প্রচলিত সামাজিক আচরণগুলির প্রকৃত স্বরূপটি ভাল করে জানতে চায় এবং সেই সঙ্গে নিজের শক্তিরও একরকম যাচাই করে নিতে চায়। দ্বিতীয়ত, পিতামাতা বা অন্যান্য বয়স্করা শিশুর সঙ্গে আচরণের সময় তার ইচ্ছা বা চাহিদাটি ঠিকমত ধরতে পারেন না বা ধরার চেষ্টাও করেন না। এজন্য তাঁরা প্রায়ই তার অমনোমত কাজ করে থাকেন এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা দেয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজনেতা প্রভৃতি ব্যক্তির নির্দেশগুলি শিশু ঠিকমত বুঝতে পারে না এবং সেগুলিকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে প্রতিরোধমূলক আচরণ করে। চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে তার সামর্থ্যের অতীত কোন কাজ

1. Friendship 2. Resistance 3. Negative 4. Adolesence

করতে দিলে তার মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা দেয়। যে শিশু অঙ্কেতে কাঁচা তাকে অঙ্ক করতে বললে সে স্বভাবতই প্রতিরোধ করবে। কিন্তু যদি তাকে ভাল করে অঙ্ক শেখান যায় তাহলে তার মধ্যে প্রতিরোধ আর থাকবে না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতিরোধমূলক আচরণ নানা কারণে কমে আসে। প্রথমত, শিশুর সামাজিক সচেতনতা ও দলপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং সে নিজে থেকেই সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অনুশাসন ইত্যাদি মানতে ইচ্ছুক হয়। দ্বিতীয়ত, তার বুদ্ধি ও সংবোধনের শক্তি বাড়ার ফলে আগে যে সব নির্দেশ ও উপদেশকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করত এখন সেগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা সে নিজে বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, বহুক্ষেত্রে মনে মনে আপত্তি থাকলেও অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার জন্য কাজটির বা নির্দেশটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সে কোনরূপ প্রতিরোধ প্রকাশ করে না। অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিবেশ, বয়স্কদের বিবেচনাহীন আচরণ প্রভৃতি কারণে কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা বড় হওয়া পর্যন্ত থেকে যায় এবং তার ফলে তাদের সামাজিক সম্পর্কের সুষ্ঠু বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

আক্রমণধর্মিতা

আক্রমণধর্মিতা[1] ও প্রতিরোধের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বর্তমান। আক্রমণধর্মী আচরণের মধ্যে অপরের প্রতি প্রতিরোধের প্রবণতা থাকে। উপরন্তু তাকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত রাগ থেকেই এই আচরণ জন্মায় এবং শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে এই আচরণ দেখা যায়। শিশু বড় হলে মারামারি করা, যুদ্ধ করা, ঝগড়া করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তার এই আচরণ প্রকাশ পায়। আরও বড় হলে এই ধরনের বাহ্যিক অভিব্যক্তিগুলি কমে আসে। কিন্তু নানা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত আচরণের মধ্যে দিয়ে তার আক্রমণধর্মী মনোভাবটি প্রকাশ পায়। পরিণত জীবনে আক্রমণধর্মিতা দৈহিক আক্রমণের স্তর ছেড়ে মনোবৈজ্ঞানিক আক্রমণের স্তরে উন্নীত হয় এবং নিন্দা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, সমালোচনা, অপরের ত্রুটি নিয়ে বিদ্রূপ, কেউ আঘাত পেলে বা বিপদগ্রস্ত হলে হাসা, কারও কাজ বা কথার জন্য উপহাস করা ইত্যাদি আচরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির এই মনোভাবটি অভিব্যক্ত হয়।

স্থূল আক্রমণের ইচ্ছাকে মার্জিত আক্রমণমূলক আচরণে পরিবর্তিত করাকে উন্নীতকরণ[2] বলা হয়। সমাজের প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি, শালীনতাবোধ, অপরের সুদৃষ্টান্ত, রুচিবোধ ইত্যাদির প্রভাবে শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আক্রমণধর্মিতার অভিব্যক্তিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে ফেলে। এই পরিবর্তনের কাজে শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতি তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। শিশুর এই আক্রমণধর্মিতা যাতে সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হতে পারে তার জন্য শিশুকে উপযুক্ত

1. Aggression 2. Sublimation

সুযোগ দিতে হবে। যেমন, নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় শিশুকে অংশগ্রহণ করতে দিলে তার আক্রমণধর্মিতা অসামাজিক পন্থায় অভিব্যক্ত না হয়ে সমাজ-অনুমোদিত পন্থায় অভিব্যক্ত হতে পারে।

প্রতিরোধমূলক এবং আক্রমণধর্মী আচরণের একটা ভাল দিক আছে। অল্পমাত্রায় প্রতিরোধমূলক আচরণপ্রবণতা সকলের মধ্যেই থাকা দরকার। কেননা কারও নির্দেশ মত কোনও আচরণ করার আগে যেমন আচরণটির প্রকৃতি বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন, তেমনই সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য মানসিক প্রতিরোধেরও প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক পরিবেশে সাফল্য লাভের জন্য সংযত মাত্রায় আক্রমণধর্মিতা অপরিহার্য।

প্রতিযোগিতা

শিশুদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ জাগার পর থেকেই তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার[1] আচরণ দেখা যায়। সাধারণত স্কুল জীবনের সুরু থেকেই শিশুরা অপরের কাছ থেকে নিজেদের কাজের সমর্থন ও প্রশংসা পাবার জন্য উৎসুক হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলে এবং বলতে গেলে সারাজীবনই অব্যাহত থাকে।

শিশু যাতে তার কাজে যথাসাধ্য শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে তার জন্য আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলে শ্রেণী উন্নয়ন, পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি প্রথাগুলি শিশুর প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে তীব্র করে তোলে এবং তার ফলে শিশু অপরের কাছে নিজের মূল্য প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। বাড়ীতেও পিতামাতারা নানা পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মনোভাবকে তীব্রতর করার চেষ্টা করেন। যেমন, কোন শিশুর কাজের সমালোচনা করার সময় তাকে অন্য কোন শিশুর সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করা হয়ে থাকে।

প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্যে শিশুকে কাজে উৎসাহিত করা সম্ভব হলেও এই ধরনের মনোভাবের সাহায্য নেওয়ার একটা অত্যন্ত বিষময় দিক আছে। যে সব বাড়ীতে বা স্কুলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় সেখানে শিশুদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। তার ফলে স্বাস্থ্যময় সমাজজীবন গঠনের প্রথম উপকরণ যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতিময় সম্পর্ক, তারই অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। ফলে শিশুরা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, স্পষ্টতই কোন প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে সকলের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। যারা প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয় তাদের মনের উপর

1. Competition

অত্যন্ত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আশাভঙ্গ, লজ্জা ও আত্মগ্লানি তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয় এবং বহুক্ষেত্রে এই ধরনের শিশুদের মধ্যে জটিল সমস্যামূলক আচরণ সৃষ্টি হয়। সেইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিযোগিতার দ্বারা শিশুদের পরিবেশকে কখনও বিষাক্ত হতে দেওয়া উচিত নয়।

সহযোগিতা

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের পরিবেশে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার[1] আবহাওয়া সৃষ্টি করা সব দিক দিয়ে ভাল। সহযোগিতামূলক আচরণের ক্ষেত্রে শিশুরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে দলগত উন্নতিকে বড় করে দেখতে শেখে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যলাভই হল তার প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সাফল্য হল তার সকল প্রচেষ্টার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই দলের একজন সদস্যরূপে সেই সাফল্যের সে একজন অংশীদার মাত্র। শিশুদের মনে এই দলগত আদর্শ সৃষ্টি করতে পারলে স্বভাবতই তাদের পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হবে এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ার চেয়ে সহযোগিতার আবহাওয়াতে শিশুর কোন অংশে কম অগ্রগতি হবে না। অপর পক্ষে সহযোগিতামূলক পরিবেশে শিশুদের মধ্যে তিক্ত রেষারেষি, ঈর্ষা, ঘৃণা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত মনোভাবের সৃষ্টি হবে না। বরং তাদের সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি, ঐক্য ও সমানুভূতির মনোভাব তৈরী হবে। তা ছাড়া সহযোগিতামূলক পরিবেশে ব্যক্তিগত সাফল্য বা উৎকর্ষের কোন স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয় না বলে সকলেরই সাফল্যের চাহিদা অল্পবিস্তর পরিতৃপ্ত হয় এবং তার ফলে সমাজ জীবন অধিকতর একতাবদ্ধ ও স্থায়ী হয়।

অনুশীলনী

১। শিশুর সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি বর্ণনা কর।

২। শিশুর সামাজিক বিকাশ কোন্ কোন্ উপাদান ও শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় বল।

৩। কোন্ কোন্ সামাজিক আচরণ শিশুর সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে?

৪। সামাজিক বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ কিভাবে যুক্ত বল।

৫। সামাজিকীভবন বলতে কি বোঝ?

৬। ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক বিকাশের স্তরগুলি বর্ণনা কর। এই বিকাশে কিভাবে সাহায্য করা যায় আলোচনা কর।

1. Cooperation

উনিশ

জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর

প্রত্যেক মানুষই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী নানারকম দৈহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু তার জন্মের সময় সেগুলি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। তারপর যতই দিন যেতে থাকে ততই সেগুলি এক অভ্যন্তরীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং শেষে এমন একদিন দেখা দেয় যখন সেগুলি তাদের পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছয়। মানব-সত্তার এই জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি। যেমন, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, বয়ঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি। ব্যক্তির বিকাশ প্রক্রিয়ায় এই ধরনের স্তরগত বিভাজন সম্পূর্ণ কল্পনাজাত এবং এগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ডক্টর আরনেষ্ট জোনসের মতে শৈশব থাকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত, বাল্যকাল বার বৎসর বয়স পর্যন্ত, যৌবনাগম বার থেকে আঠার এবং তারপর আসে বয়ঃপ্রাপ্তি। আবার কারও কারও মতে শৈশব থাকে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত, বাল্যকাল সাত থেকে চোদ্দ, যৌবনাগম চোদ্দ থেকে একুশ এবং একুশে দেখা দেয় পূর্ণ পরিণতি। এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই স্তরগুলির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

শৈশব

জন্মের আগে গর্ভাবস্থাতেই শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া অনেকখানি সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, শিশুর পূর্ণপরিণতিপ্রাপ্ত মস্তিষ্কের প্রায় চার ভাগের একভাগ তার জন্মের সময়ই তৈরী হয়ে থাকে। গেসেল[1] এবং ম্যাকগ্র[2] শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, দৈহিক, ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক এবং ব্যক্তিগত-সামাজিক।

শারীরিক বৃদ্ধি

দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি[3] শৈশবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। একমাসে শিশু মাথা তুলতে পারে, দু'মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, পাঁচ মাসে কোন কিছুর উপর ভর দিয়ে বসতে পারে, আট-ন মাসে দাঁড়াতে পারে, দশ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, এগার মাসে কারও হাত ধরে চলতে পারে, তেরো মাসে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, পনেরো মাসে একা চলতে পারে এবং দেড় বৎসরে দৌড়তে পারে।[4] শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে মাথার বৃদ্ধি এই সময় অনেক দ্রুত হয়ে থাকে। চলাফেরা করার ক্ষমতা শরীরের নানা

1. Gesell 2. Mcgraw 3. Physical Growth 4. পৃঃ ২১৮

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতির উপর নির্ভর করে, যেমন মেরুদন্ড শক্ত হওয়া, হাড় ও পেশী সবল হওয়া ইত্যাদি। শৈশবে শরীর গঠনের এই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে।

ভাষা

শিশু প্রথম ছ'মাস অস্পষ্ট আওয়াজ, দু'একটা অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু এক বৎসর বয়স থেকেই সে কথা বলতে শেখে। কোন্ বয়সে কত কথা শিশু শেখে স্মিথ[1] তার একটা হিসাব দিয়েছেন। যথা—

বয়স	১ বৎ	২ বৎ	৩ বৎ	৪ বৎ	৫ বৎ	৬ বৎ
শব্দসংখ্যা	৪	২৭২	৮৯৬	১৫৪০	২০৭২	১৫,০০০

প্রক্ষোভ

প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্রকৃতির। এই সময় সামান্য কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অল্পেই প্রক্ষোভের প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রক্ষোভের এই অসংযত অবস্থা বর্তমান থাকে। কিন্তু চার বৎসর বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের চাপে এই অসংযত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে সুসংযত ও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

শৈশবের এই সময়েই শিশুর নিজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এই ধারণার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে তার আশেপাশের আর সকলে তার প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে তার উপর। শিশুকে যদি তার কাজে প্রশংসা বা উৎসাহিত করা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং সে ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হয়ে ওঠে। আর তাকে যদি সর্বদা নিন্দা বা শাসন করা হয় তবে সে দুর্বল ও আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়। আর যদি তাকে তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা হয় তাহলে সে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক প্রকৃতির। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে শৈশবেই ব্যক্তির পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি তৈরী হয়ে যায় এবং এই সময়ে সে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলিই তার ভবিষ্যৎ মনোভাব ও জীবনদর্শনের প্রকৃত রূপদান করে এবং তার পরিণত জীবনের আচরণকে সব দিক দিয়েই প্রভাবিত করে। অতএব শিশু তার পরিবেশের কাছ থেকে কি ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা দরকার। বিশেষ ভাবে দেখা উচিত যে শিশু যেন উত্তেজনাপূর্ণ বা আঘাতাত্মক কোন অভিজ্ঞতার[2] সম্মুখীন না হয়। এই ধরনের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা তার বিকাশমুখী মনে গভীর ছাপ রেখে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বৃদ্ধিকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে তোলে।

1. Smith 2. Trauma

প্রবৃত্তি

শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে সে নতুন নতুন জিনিস ও কাজ শিখতে সুরু করে এবং সেই সময় থেকেই তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি তার শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। অতএব এই সময় শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে তা যেন তার সহজাত প্রবণতার সমাভিমুখী ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

কৌতূহল

মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার কৌতুহল। সে তার চারপাশে যা দেখে তাই তার কাছে নতুন। অতএব তার জিজ্ঞাসার আর শেষ থাকে না। আবার কেবল প্রশ্ন করেই সে ক্ষান্ত হয় না, অনেক কিছু সে নিজে পরীক্ষা করে, অনুসন্ধান করে এবং স্বহস্তে নাড়াচাড়া করে দেখে। শিশুর এই জানার এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে তার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে শিশু স্বাভাবিকভাবেই এবং অতি সহজেই শেখে।

নির্ভরশীলতা

শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর নির্ভরশীলতার মনোভাব। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিশু অপরের উপর নির্ভর ত করেই, মনের দিক দিয়েও সে চায় সকলের মনোযোগ ও ভালবাসা। সে নিজেকে আর সকলের অনুরাগের একমাত্র কেন্দ্ররূপে দেখতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদিও স্বাভাবিক ভাবে এই পর-নির্ভরতার ভাবটি কেটে যায় এবং শিশু আত্মনির্ভর হতে শেখে, তবুও ভালবাসার আকাংখাটি কিন্তু একেবারে চলে যায় না। শিশুকে এই সময় নানা বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কখনও কখনও সে এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে যেখানে সে খুব ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করে উঠতে পারে না। ফলে তার আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবে ধাক্কা খায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার মধ্যে হীনতাবোধ, ভীতি ইত্যাদি জাগে। তখন সে নানা প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলা একটা এই ধরনের প্রচেষ্টা। খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু সেই বিশেষ পরিস্থিতিটি কল্পনা করে নেয় এবং সেটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। একটা কাজ বার বার করাও শৈশবের একটি বিশেষ লক্ষণ। ফ্রয়েডের মতে এই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিশু কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রত্যুত্তর দেয় এবং যে পরি-স্থিতিটিকে সে বাস্তবে আয়ত্ত করতে পারেনি সেটিকে সে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

যৌনতা

শৈশবকালীন যৌনতার[1] মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। আগে মনে করা হত যে শিশুর কোনরূপ যৌন সচেতনতা থাকে না এবং বেশ কিছু বয়স হলেই

1. Sexuality

তবে তার মধ্যে যৌনবোধ দেখা দেয়। কিন্তু ফ্রয়েডের ব্যাপক গবেষণা থেকে এই ধারণা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে অতি শৈশব থেকেই বেশ গভীর ও প্রবল যৌনবোধ শিশুর মধ্যে সক্রিয় থাকে এবং তার আচরণ ও বিকাশধারাকে বহু দিক দিয়ে প্রভাবিত করে।

শিশুর যৌনবোধ এবং পরিণত ব্যক্তির যৌনবোধের মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য হল এই যে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন অনুভূতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রচলিত মাপকাঠি অনুযায়ী 'অস্বাভাবিক' প্রকৃতির হয়ে থাকে। স্বাভাবিক যৌনতা বলতে বোঝায় সেই যৌনবোধকে যা ব্যক্তিকে প্রজননমূলক আচরণ করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু শিশুর যৌনতার সঙ্গে প্রজননমূলক উদ্দেশ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। শিশুর ক্ষেত্রে যৌনশক্তি—ফ্রয়েড যার নাম দিয়েছেন লিবিডো—নানা অস্বাভাবিক পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং যৌবনের সুরুতে সেটি তার স্বাভাবিক আশ্রয়স্থলটি খুঁজে পায়। তখন থেকে প্রজননমূলক আচরণের মধ্যেই তার যৌনতা সীমাবদ্ধ থাকে। ফ্রয়েডের মতে পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যৌনতার লক্ষ্য হল প্রজনন। কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে সেটি কেবলমাত্র দৈহিক আনন্দলাভেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং নিজের দেহের যে অঙ্গ বা যে প্রক্রিয়া থেকেই যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাতেই আকৃষ্ট হয়। এইজন্য শিশুর যৌনতাকে স্বরতিমূলক[1] বলা হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুর যৌনবোধ নিজের দেহ ছেড়ে অন্যের দেহের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই সময় ছেলেদের আসক্তির পাত্রী হন তাদের মা, মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বাবা। ফ্রয়েডের মতে এই আসক্তি যৌনধর্মী এবং এই যৌনপ্রবণতাটির নাম তিনি দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স[2]। শিশুর মধ্যে যখন এই কমপ্লেক্স দেখা দেয় তখন মার প্রতি তার ভালবাসার ক্ষেত্রে সে তার বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং তাই থেকে বাবার প্রতি তার মনে একটা শত্রুতার ভাব জন্মায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত ঘটে। বাবার প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্র করে মার সম্পর্কে মেয়ের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দেয়।

ফ্রয়েডের মতে শিশুর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষের সঙ্গে শিশুর মনে দেখা দেয় একটি প্রচণ্ড ভীতি। তার ভয় হয় পিতা বুঝি তার উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য তার যৌনাঙ্গছেদন বা অন্য কোন দৈহিক ক্ষতি করবেন। একে ফ্রয়েড কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স[3] নাম দিয়েছেন। এই ভয় পরে ধীরে ধীরে কমে যায় যখন সে দেখে যে এই পিতাই তার প্রয়োজন-তৃপ্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। এই থেকে পিতার প্রতি বিদ্বেষের পাশাপাশি দেখা দেয় তাঁর প্রতি ভালবাসাও। পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও ভালবাসার এই মিশ্র মনোভাবকে ফ্রয়েড যুগ্মানুভূতি[4] বলে বর্ণনা করেছেন। মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভীতি থেকে শিশুর মধ্যে জন্মায় তাঁদের প্রতি প্রতিবাদহীন আনুগত্য ও শৈশবকালে আরোপিত

1. Auto-erotic 2. Oedipus Complex 3. Castration Complex
4. Ambivalence

নানা অনুশাসন ও বিধিনিষেধ মেনে চলার অভ্যাস। এই কারণে শিশুর এই শৈশব-কালীন আনুগত্য ও বাধ্যতাকে আমরা ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকে সঞ্জাত বলতে পারি। শিশু যখন বড় হয় তখন তার এই ভীতিময় আনুগত্য ও বাধ্যতা থাকে না। তার জায়গায় দেখা দেয় যাকে আমরা বলি বিবেক বা নীতিবোধ। ফ্রয়েড এই মানসিক সংগঠনটির নাম দিয়েছেন অধিসত্তা[1]। অধিসত্তা বা বিবেককে ঈডিপাস কমপ্লেক্সের অবদান বলা হয়।

ফ্রয়েডের মতে এই শৈশবকালীন যৌনতার বিকাশ পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত চলে তারপর আসে যৌনতার প্রসুপ্তিকাল[2]। প্রসুপ্তিকালে কোন যৌন আচরণ শিশুর মধ্যে বাহ্যত দেখা যায় না। এ সময় সমস্ত যৌনবিকাশ শিশুর মধ্যে নিহিত অবস্থায় ঘটে থাকে। এই প্রসুপ্তিকাল থাকে যৌবনাগম পর্যন্ত। যৌবনাগমে যৌনতা তার সুপরিণত ও স্বাভাবিক রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে।

সর্বপ্রাণবাদ

শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তার সর্বপ্রাণবাদের[3] বৈশিষ্ট্যটি। জড়ই হোক আর প্রাণীই হোক সকল বস্তুকেই শিশু প্রাণবান বলে মনে করে। চেয়ারটা যখন পড়ে যায় বা বলটা যখন মাটিতে গড়ায় তখন শিশু সেগুলিকে জীবন্ত বলে মনে করে। ৫-৬ বৎসর বয়স থেকে শিশুর এই সর্বপ্রাণবাদ কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে সে সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে শেখে।

শিশু খুব ছোট বয়স থেকেই চিন্তা করতে পারে। কিন্তু প্রথম দিকে তার চিন্তা প্রধানত প্রতিরূপের উপরই নির্ভরশীল থাকে। শিশুর প্রাথমিক চিন্তন প্রতিরূপ-মূলক ও কল্পনাধর্মী। এই সময় থেকে দিবাস্বপ্ন ও অলীককল্পনা শিশুর মন অধিকার করে এবং এ অভ্যাস যৌবনাগম পর্যন্ত অতি তীব্র মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

চিন্তন ও ধারণা

শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন তার চিন্তন অধিকতর ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে। তার পরের ধাপে সে তার চারপাশের বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে শেখে। ধারণা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সব দিক দিয়ে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু সত্যকারের বিচারকরণের ক্ষমতা ৭।৮ বৎসর বয়সের আগে দেখা দেয় না।

বাল্যকাল

শৈশবের সঙ্গে বাল্যকালের একটা বিস্ময়কর পার্থক্য দেখা যায়। শৈশবে সব কিছুই থাকে অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত, যৌন-মূলক সকল দিক দিয়েই শৈশব যেন একটা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলতার প্রতিমূর্তি।

1. Super Ego 2. Latent Period 3. Animism

প্রসুপ্ত যৌনতা

কিন্তু বাল্যকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও সংযত ভাব কোথা থেকে যেন দেখা দেয়। ৮।১০ বৎসরের একটি ছেলে বা মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে কোনরূপ মানসিক অস্থিরতা বা প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি নেই। সে তার পরিবেশের সঙ্গে সব দিক দিয়েই বেশ সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মতই তার মানসিক স্থৈর্য ও সুসংহত আচরণ। এই জন্য আর্নেস্ট জোন্স বয়ঃপ্রাপ্তিকে 'বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি'[1] বলে বর্ণনা করেছেন। বাল্যকালে এই বয়ঃপ্রাপ্তিসুলভ পরিণতির একটা ব্যাখ্যা ফ্রয়েডের প্রসুপ্ত-কালের[2] তত্ত্বটিতে পাওয়া যায়। ফ্রয়েডের মতে শৈশব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু বাল্যকালে তার যৌনতা অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনও দিক দিয়েই তার কোন বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখা যায় না। তার অর্থ এই নয় যে এ সময় তার যৌনতার বিকাশ বন্ধ থাকে। বস্তুত বাল্যকালে তার যৌনতার কোন বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলেও অন্তর্নিহিত অবস্থায় তা তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। এইজন্য বাল্যকালকে যৌনতার প্রসুপ্তকাল নাম দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে শিশুর যৌনতা অপ্রকাশিত থাকে বলে তার মধ্যে কোনরূপ প্রক্ষোভমূলক চাঞ্চল্য দেখা যায় না এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানেও সে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

সামাজিকবোধের পরিণতি

বাল্যকালের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সামাজিকবোধের পরিণতি। শৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক। যত বড় হয় ততই তার সামাজিকবোধ বন্ধু-প্রীতি ও দলবাঁধার প্রচেষ্টা রূপে দেখা দেয়। এই সময়ে সে আর একা থাকতে বা একা খেলতে চায় না। সকল সময়েই সে তার সমবয়সীদের সঙ্গ খোঁজে। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা একেই যৌথপ্রবৃত্তি[2] বলে বর্ণনা করেছেন।

বাল্যকালে যৌনতা প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকার ফলে ছেলেদের এ সময় মেয়েদের প্রতি বা মেয়েদের ছেলেদের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা যায় না বরং ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে এবং খেলতে ভালবাসে। ১০।১১ বৎসর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপর পক্ষের প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে দেখা দেয়।

সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ

এই দলপ্রিয়তা থেকে জন্ম নেয় শিশুর সামাজিক অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। এই সময় বাড়ীর এবং বাড়ীর অধিবাসীদের বন্ধন অনেকটা ছিন্ন করে সে বাইরের জগৎকে ভালবাসতে শেখে। সে বোঝে যে দলে থাকতে হলে তাকে দলের সমস্ত

1. Recapitulation of Childhood 2. Gregarious Instinct

নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। সমাজের আর সকলের নিন্দা প্রশংসাকে সে ধীরে ধীরে মূল্য দিতে শেখে। এইভাবে তার মধ্যে জন্মায় সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, এক কথায় সমাজের মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য। এই সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই আবার বিকশিত হয় শিশুর নৈতিক বোধ। কোনটি করণীয় কোনটি বর্জনীয় সে শিক্ষারও সুরু হয় এই সময় থেকে। নীতিজ্ঞান গঠনের পেছনে সামাজিক শাস্তি-পুরস্কার, নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতি উদ্বোধকগুলির প্রচুর প্রভাব থাকে।

দল-বিশ্বস্ততা

বাল্যকালের শেষের দিকে, যাকে আমরা কৈশোর[1] বলতে পারি, সেই সময় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দল-প্রীতি অতি তীব্রভাবে দেখা দেয়। এইজন্য এ সময়টিকে দলবাঁধার কালও[2] বলা হয়। এই সময় দলবিশ্বস্ততা সকল প্রকার চিন্তা ও বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং অত্যন্ত গভীরভাবে শিশুর মনকে প্রভাবিত করে। দলের প্রতি আনুগত্য সময় সময় এতই তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে দলের সম্মান রক্ষার জন্য দলের প্রত্যেকটি কিশোর সদস্যই সকল রকম আত্মত্যাগ করতে, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার[3] আকাঙ্খা তাদের বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিকার করা, যুদ্ধ করা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা নিজেদের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। মেয়েরাও সাজসজ্জা, নাচ-গান, অভিনয় এবং ঘরকন্নার পুতুল খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে আর সকলের দৃষ্টিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলাকে এই জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী শিশুর জীবন প্রস্তুতির প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করে থাকেন। তবে খেলা যে এই সময় শিশুর নানা মানসিক চাহিদা ও আকাঙ্খাকে অভিব্যক্ত করে তাতে সন্দেহ নেই।

সৃজনশীলতা

এই বয়সের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা। কাঠের বা মাটির জিনিস তৈরী করা, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, প্রভৃতি কাজের প্রতি এ সময় ছেলেমেয়েরা একটা সহজ আকর্ষণ বোধ করে এবং সুযোগ সুবিধা পেলেই কোন কিছু সৃষ্টি করার আনন্দে তারা মেতে ওঠে। কিন্তু সাধারণত এই সময় উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের উৎসাহ চলে যায় এবং একটু বড় হলেই তাদের এই অতি মঙ্গলকর প্রবণতাটি পরিপোষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

1. Later Childhood 2. Gang Period 3. Self-Assertion

সেইজন্য যাতে এই বৈশিষ্ট্যটি সময়োচিত সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক, পিতা, মাতা, প্রভৃতি সকলের সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শৈশবের মত বাল্যকাল এবং কৈশোরের চিন্তাতেও প্রতিরূপের আধিক্য একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গ্যাল্টনের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সকল রকম মানসিক কাজেই ছোট ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী প্রতিরূপের সাহায্য নিয়ে থাকে।

মনোযোগের বিস্তারের পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণত ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি কিশোর অপেক্ষা একবার দেখে বা শুনে অনেক বেশী সংখ্যক বিষয় একসঙ্গে মনে রাখতে পারে।

বুদ্ধি ও বিচারকরণের বিকাশ

বুদ্ধির বিকাশের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে বুদ্ধি শৈশব থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১৫/১৬ বৎসর বয়সে তার পূর্ণ পরিণতিতে পেঁছয়। তারপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বুদ্ধি সাধারণত আর বাড়ে না।

বিচারকরণের শক্তি শৈশবে খুব কমই থাকে এবং সাত আট বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েরা সহজ ও সাধারণ সমস্যা ছাড়া শক্ত কিছুর সমাধান করতে পারে না। ১১/১২ বৎসর বয়স থেকে শিশুর মধ্যে সত্যকারের বিচার ক্ষমতা জন্মায় এবং আরও কিছু বয়স বাড়লে তার পক্ষে জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

যৌবনাগম

যৌবনাগমের সুরু যৌন-পরিণতিতে[1]। যৌন পরিণতি বলতে ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বোঝায়। ছেলেমেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতালাভ ঘটে ও দেহে নানারূপ যৌনসূচক চিহ্নের আবির্ভাব হয়। এগুলিকে গৌণ যৌন চিহ্ন[2] বলা হয়।

পীড়ন ও কষ্টের কাল

কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই যৌবনাগম নানাদিক দিয়ে একটি বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। কোন কোন প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের কাল[3] বলেও বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এই সময়টিকে অপরাধপরায়ণতার কাল বলে বর্ণনা করে থাকেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু এ ধরনের চরমধর্মী বর্ণনাকে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জন বলে মনে করে থাকেন। তবে একথা সত্য যে যৌবনাগম ব্যক্তির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রাপ্তযৌবনদের[4] জীবনে দেখা দেয় এবং এগুলি তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

---

1. Puberty 2. Secondary Sexual Characters 3. Period of Stress and Strain
4. Adolescent

সঙ্গতিবিধানের সমস্যা

যৌবনাগমকে আর্নেষ্ট জোনস শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলে[1] বর্ণনা করেছেন। শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত ও যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক চরম অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের আগমনে সে অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যৌবনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই শৃঙ্খলা ও সংহতি আকস্মিকভাবে আবার লোপ পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও যৌনমূলক জগতে এক বিরাট বিপর্যয় দেখা দেয়। শৈশবে যেমন তাকে এক নতুন জগতের অপরিচিত শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও সেইভাবে আবার তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন নতুন পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য বার বার তাকে অসুবিধা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও তেমনি তার পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যের জন্য তাকে প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশা বরণ করতে হয়। এই দিক দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমের একটা খুব বড় মিল আছে।

আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তন

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় ছেলেমেয়ে উভয়ের দেহেই আকস্মিকভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যেগুলি পরিবার বা বাইরের আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। অনেক ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তরা ছেলেমেয়েদের এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে ভালভাবে নেন না এবং কখনও কখনও সেগুলি নিয়ে উপহাস, বিদ্রূপ এবং বিরূপ মন্তব্যও করেন। তার ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও অস্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাদের আচরণ সঙ্কোচপূর্ণ ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় তারা গুরুতর মানসিক আঘাত পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নেয়।

মানসিক শক্তিসমূহের পরিণতি

বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। তবে এই সময় বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি তাদের সহজ বৃদ্ধি প্রচেষ্টার ফলে পূর্ণতালাভ করে। ফলে মননশক্তি, বোধশক্তি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানসিক শক্তিগুলির দিক দিয়ে ছেলেমেয়েরা পরিণত

1. Adolescence is the recapitulation of infancy : Jones

ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। এই নবলব্ধ শক্তিগুলি সম্বন্ধে তাদের মনে সচেতনতা দেখা দেয় এবং পরিবার বা সমাজের আর দশ জনের মত তারাও ছোট বড় সমস্যার সমাধানে নিজেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণত তাদের এ হস্তক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপক্কতা বলে মনে করেন এবং ধমক দিয়ে তাদের দূরে সরিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। তার ফলে এই ছেলেমেয়েরা নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে এবং তাদের মধ্যে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়।

বিরাট প্রক্ষোভগত পরিবর্তন

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের প্রক্ষোভের রাজ্যে। বলতে গেলে সেখানে একটা ছোটখাট বিপ্লব ঘটে যায়। দেহের আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি, মানসিক শক্তির পূর্ণতালাভ, বাইরের জগতের উপর এগুলির প্রতিক্রিয়া, এসবে মিলে প্রাপ্তযৌবনের মনে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তার এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্ষোভের সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। নিজের বহুমুখী পরিপূর্ণতার নতুন উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তার মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ দেখা দেয় তেমনই তার সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও অবহেলা তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর ফলে অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনকেই অন্তর্মুখী[1] বা আত্মকেন্দ্রিক[2] হয়ে উঠতে দেখা যায়।

নিপীড়ন ও বিদ্রোহের মনোভাব

বয়স্কদের অবহেলার ফলে এই সময় বাইরের জগতের প্রতি প্রাপ্তযৌবনদের মনে একটা বিক্ষোভের ভাব জাগে এবং অনেকেই মনে করে যে তাদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হচ্ছে না, বরং সকলে মিলে অন্যায়ভাবে তাদের নিপীড়ন করছে। পরিবার বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা প্রাপ্তযৌবনদের এই বিশেষ চিন্তাধারা অনুসরণ করতে না পেরে অনেক সময় তাদের প্রতি সত্যিই যথেষ্ট অবিচার করে থাকেন এবং তার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের নিপীড়নমূলক মনোভাব[3] তীব্র হয়ে ওঠে।

এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে জন্ম নেয় বিদ্রোহের প্রবণতা। সহজেই কোন কিছু স্বীকার করতে বা মেনে নিতে সে চায় না। তার পরিণত বুদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমতা তাকে জোগায় তার বিদ্রোহের পেছনে আত্মবিশ্বাস। সে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, ধর্মীয় বা সামাজিক মান প্রভৃতি সবেরই বিরোধিতা করে। সে নিজে সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। তবে সমাজের যা কিছু প্রাচীন যা কিছু প্রতিষ্ঠিত সে সব ভাঙ্গার মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তখন তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

---

1. Introvert 2. Self-centred 3. Persecution Mentality

যৌনতার পূর্ণ বিকাশ

যৌবনপ্রাপ্তিতে যৌনতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে যৌন চাহিদাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সত্যকারের যৌনচাহিদা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বা তীব্র রূপ ধারণ করে না। বরং এই সময়ে যৌনঘটিত আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর বিস্ময়রূপে দেখা দেয় এবং তাদের যৌনচাহিদা মূলত প্রণয়ঘটিত কল্পনা ও চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গভীর ভাববিলাসময় ও আবেগপূর্ণ প্রেমের নানা ঘটনা এ সময় ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে।

যৌন কৌতূহল কিন্তু এ সময় তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং যৌনঘটিত রহস্য জানার জন্য প্রাপ্তযৌবনদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাপ্তযৌবনদের সেই কৌতূহল হয় অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় অবাঞ্ছিত স্থান থেকে তাদের অর্ধসত্য ও বিকৃত সত্য আহরণ করতে হয়। তার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তিপূর্ণ ও সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে।

অবাস্তব কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন

যৌবনপ্রাপ্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অবাস্তব কল্পনা[1] ও দিবা স্বপ্নের[2] আধিক্য। সর্বতোমুখী পরিণতি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে সকল নতুন প্রয়োজনের সৃষ্টি করে সেগুলি সব বাস্তবে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ফলে সে সেগুলিকে পূর্ণ করতে দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনার সাহায্য নেয়। প্রাপ্তযৌবনদের দিবাস্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দুশ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়, প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক বা আত্মগৌরব-মূলক স্বপ্ন। যেমন, প্রাপ্তযৌবন স্বপ্ন দেখে যে সে পড়াশোনায় প্রথম হচ্ছে বা খেলায় সব চেয়ে সেরা স্থান অধিকার করছে বা কোন দুঃসাহসিক কাজ করছে ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন হচ্ছে প্রণয়মূলক। যেমন সে তার আকাঙ্খিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে লাভ করেছে। প্রাপ্তযৌবনদের অধিকাংশ দিবাস্বপ্নই তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনের অলীক কল্পনার সাহায্যে সে তার অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তি সাধন করে। সে দিক দিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্নের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এগুলি প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখে। কিন্তু অতিরিক্ত ও অতি-অবাস্তব দিবাস্বপ্ন সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় সে কথাও খুবই সত্য।

1. Fantasy 2. Day-Dreaming

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্যা

যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের দেহে, মনে, চিন্তায়, ধারণায় ও অনুভূতিতে, এক কথায় তাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দেয়। এই বহুমুখী পরিবর্তন তাদের পূর্বতন সঙ্গতিবিধানের সমস্ত পন্থাকে অক্ষম করে তোলে এবং তাদের ক্ষেত্রে তখন পরিবেশের সঙ্গে নতুন করে আবার সঙ্গতিবিধান করার প্রয়োজন হয়। তাদের নিজেদের চাহিদার মধ্যেও এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সব নানা পরিবর্তনের ফলে তাদের দৈহিক, প্রক্ষোভমূলক ও চিন্তামূলক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। বাল্যকালে তাদের চাহিদা মূলত শারীরিক ও কতকগুলি সরল মানসিক চাহিদায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনাগমে তাদের মনের রাজ্যের আরও অনেক নতুন নতুন দরজা খুলে যায়। ধর্মাধর্ম, বৃহত্তর সমাজের আবেদন, ভালমন্দের বিচার, যৌনস্পৃহা, জীবনরহস্য সম্পর্কে কৌতূহল, নতুন নতুন ধারণা ও অনুভূতি তাদের মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তাদের মধ্যে নব নব চাহিদা উত্তুঙ্গ তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন তাদের এই নব অনুভূত চাহিদাগুলি বাস্তবে অতৃপ্ত থেকে যায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় তাদের এই সব চাহিদা পুরাতন পরিচিত পরিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোন সুযোগ পায় না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং সেই অতৃপ্তি থেকে সৃষ্টি হয় অপসঙ্গতি[1]। অপসঙ্গতি বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য। প্রাপ্তযৌবনদের চারপাশে যে সব বিভিন্নধর্মী শক্তি আছে সেগুলির সঙ্গে তারা ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না এবং এই অপসঙ্গতি থেকেই তাদের মধ্যে জন্মায় নানারকম অবাঞ্ছিত প্রবণতা, দুষ্কৃতিপরায়ণতা এবং সমস্যামূলক আচরণ।

ষ্ট্যানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা নিয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে তাদের চাহিদাগুলির নানা বিবরণী দিয়েছেন। তাঁদের সেই সব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন পরিবর্তনের গুরুত্ব বিচার করে তাদের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। যথা—

১। মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা

এই সময় ছেলেমেয়েদের সর্বদেহে একটা আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। এই দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সক্রিয়তার সুযোগ এবং মুক্ত বাতাস ও রোদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের অবকাশ। খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ, ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে

1. Maladjustment

প্রাপ্তযৌবনদের এই মূল্যবান চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে। সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন প্রকৃতির সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্তি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

২। স্বাধীনতার চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তিতে যে চাহিদাটি ছেলেমেয়েদের মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় সেটি হল আত্মনির্ভরতার চাহিদা। জন্মাবধি তারা সব দিক দিয়ে পরের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ সেই পরনির্ভরতা থেকে তারা মুক্তি খোঁজে এবং সমাজের স্বাধীন সদস্যরূপে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সে নিজে থেকেই নানা গুরুকর্মের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাদের মনের স্বাভাবিক পরিণতির ফল। মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জাগে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তরা প্রাপ্তযৌবনদের এই মনোভাবকে ভাল চোখে দেখেন না। ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা রকম আচরণ-বৈষম্য দেখা দেয়।

৩। সমাজ জীবনের চাহিদা

যৌবনাগমের পূর্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্তই উদাসীন ছিল। তার নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দূরতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না। কিন্তু যৌবনাগমে তার মনের দরজায় বৃহত্তর পৃথিবীর নানা আবেদন এসে পৌঁছয়। নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের গণ্ডীর বাইরে মানব সমাজের সঙ্গে একাত্মতার এক অনুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে অপরের সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হয়, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর স্বার্থে বিলিয়ে দেয়। স্কুল, ক্লাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই সমাজ জীবনের চাহিদাটি তৃপ্ত হয়।

৪। যৌনতৃপ্তির চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকেই যৌনসচেতনতা পরিণতি লাভ করে। শৈশবে যৌনবোধ নিতান্তই অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। বাল্যকালে যৌনতা থাকে সুপ্ত বা অবদমিত অবস্থায়। কিন্তু যৌবনাগমে এই যৌনবোধ পরিণত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করে

তোলে। এই পরিণত যৌনসচেতনতা প্রকাশ পায় ছেলেদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনীর জন্য এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্য কামনার রূপে। এই সময় ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশায় আনন্দলাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামনা ছাড়াও যৌনচাহিদা আর একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন কৌতূহল। এই সময় যৌনঘটিত বিষয় ও যৌন রহস্য সম্পর্কে জানবার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের এ চাহিদা তৃপ্ত করার জন্য সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌন শিক্ষাদানের আয়োজন থাকা একান্ত প্রয়োজন। যে সব সমাজে যৌন শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সে সব ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনেরা নানা উৎস থেকে যৌন বিষয় সম্পর্কে অর্ধসত্য ও বিকৃত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ফলে তাদের যৌনজীবন অস্বাভাবিক ও অনেক সময় বিষময় হয়ে ওঠে।

৫। নতুন জ্ঞানের চাহিদা

প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণতা লাভ করে এবং বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি তাদের পরিণতিতে পৌঁছয়। ফলে তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল অতি তীব্র হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞানলাভের প্রতি তাদের আকাঙ্খা দেখা দেয়। মানব অস্তিত্বের বহুমুখী ভাবধারার প্রতি তারা ক্রমশ আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় প্রাপ্তযৌবনদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানলিপ্সাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার উপর তাদের সার্থক জীবন-প্রস্তুতি নির্ভর করে।

প্রাপ্তযৌবনদের প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি প্রধানত নিজেদের অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। লেখাপড়া, খেলাধূলা, সঙ্গীত, অভিনয়, সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোন্মুখ সত্তাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজের আর সকলের কাছে নিজেদের মূল্য প্রতিষ্ঠিত করতে। এই চাহিদার তৃপ্তি প্রাপ্তযৌবনদের সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। যে সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তারা ভবিষ্যতে দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও জীবন সংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ওঠে।

৬। নীতিবোধের চাহিদা

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বোধগুলিও সুপরিণত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বস্তু বা কাজ সম্পর্কে নৈতিক মূল্যবোধ তাদের মধ্যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট আকারের ছিল। যৌবনাগমে তাদের

এ সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা দেখা যায়। নিজের বা পরের সকলের কাজই এই নীতিবোধের মাপকাঠিতে সে পরিমাপ করে এবং নিজে যদি কখনও তার এই নৈতিক মূল্যবোধের বিরোধী কাজ করে তাহলে সে তীব্র অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পায়।

৭। আত্মনির্ভরতার চাহিদা বা বৃত্তির চাহিদা

এ সময়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে দেখা যায় এবং কেমন করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সে সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নানা পরিকল্পনা তারা মনে মনে রচনা করে। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জনের পন্থার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। এই জন্য অনেকে এই চাহিদাটিকে বৃত্তির চাহিদা বলেও বর্ণনা করে থাকেন।

৮। জীবনদর্শনের চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তিতেই প্রথম ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও বহির্জগত সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে। মানুষের জীবনের অর্থ কি, কিসেই বা জীবনের সার্থকতা বা এই সৃষ্টির রহস্য কি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তাদের মনকে বার বার দোলা দিয়ে যায়। এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর তারা সর্বত্র সন্ধান করে এবং সেগুলি সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারে ততটুকু নিয়ে তারা মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তোলে। এ সময় দরকার হল তাদের মধ্যে এমন একটি সন্তোষজনক জীবনদর্শন গড়ে তোলা যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীকে সুনির্দিষ্ট ও অর্থময় করে তুলতে পারবে।

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা

প্রাপ্তযৌবনদের এই চাহিদাগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না হয় তাহলে তাদের সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে নানারকম অবাঞ্ছিত মানসিক জটিলতা ও আচরণমূলক বৈকল্য দেখা দেয়। ফলে তাদের ক্রমবিকাশের সুষ্ঠু অগ্রগতি নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। যারা দুঃসাহসী তারা তাদের অতৃপ্ত চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য অসামাজিক ও অমঙ্গলকর পন্থা গ্রহণ করে এবং সমাজে অপরাধপ্রবণ[1] বলে কুখ্যাত হয়। যারা তা পারে না তারা তাদের চাহিদার আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে কিংবা তাদের চাহিদা দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনই দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাদের অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি খোঁজে। এর কোনটিই স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল নয় এবং স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তার

1. Delinquent

সৃষ্টিতে বিশেষ বাধাস্বরূপ। অতএব পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই কর্তব্য হল যাতে প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে এবং তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখা না দেয় সে দিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া।

যৌবনপ্রাপ্তি—ঝড়ঝঞ্ঝা ও অপরাধপ্রবণতার কাল কি?

যৌবনপ্রাপ্তির সময় অপরিহার্যভাবেই যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় একথা সত্য নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক সচেতনতার পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটে এবং এক উন্নত আদর্শবোধ কম বেশী সব প্রাপ্তযৌবনের মনকেই প্রভাবিত করে থাকে। তবে যদি বিকৃত পরিবেশে বৈষম্যমূলক আচরণের দ্বারা প্রাপ্তযৌবনদের মন বিষাক্ত করে তোলা হয় তাহলে তাদের অনুভূতিশীল মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং অস্বাভাবিক আক্রমণধর্মিতা তাদের মধ্যে জাগতে পারে। এই সব প্রাপ্তযৌবনদের পক্ষে তখন অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অপরের কাছ থেকে তারা যে মনোযোগ ও সহানুভূতি স্বাভাবিক পন্থায় পায় না কোন অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদনের দ্বারা তারা সেই মনোযোগ ও স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। গুরুতর ক্ষেত্রে তারা পেশাদার দুষ্কৃতিকারীদের দলে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে কুখ্যাত অপরাধী হয়েও উঠতে পারে। কিন্তু এই পরিণতি একান্ত অস্বাভাবিক পরিবেশেই ঘটতে পারে। সাধারণ স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে অপরাধী হবার কোনও প্রবণতা দেখা যায় না—এটি পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য।

অনেক প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী যৌবনপ্রাপ্তিকে 'ঝড়ঝঞ্ঝার কাল বা অপরাধ-প্রবণতার কাল' বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত বহু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এ মন্তব্যগুলি অতিশয়োক্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তযৌবনদের মনে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয়, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অনেক সময় উদ্দামতা দেখা দিলেও এগুলিকে সত্যকারের ঝড়ঝঞ্ঝা বলে বর্ণনা করা চলে না। তাছাড়া এ সময় যেটুকু বিপর্যয় ও অসঙ্গতি দেখা দেয় তা স্থায়ীও নয়। বস্তুত এই ধরনের সাময়িক অপসঙ্গতি তখনই সৃষ্টি হয় যখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি যথাযথ তৃপ্ত হয় না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগ, সুবিবেচনা ও সহানুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন আচরণমূলক সমস্যা দেখা দেয় না এবং সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হয়ে তারা বড় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে এ সময় তাদের মধ্যে যে সব বহুমুখী চাহিদা দেখা দেয় সেগুলির তৃপ্তির আয়োজন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য

প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশ প্রচেষ্টা যাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমস্যাগুলির যাতে যথাযথ সমাধান হয় তার জন্য পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রাপ্তযৌবনদের সর্বতোমুখী বিকাশকে স্বাস্থ্যময় ও সুষম করে তুলতে হলে পিতামাতা শিক্ষকদের কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। সেগুলি হল—

প্রাপ্তযৌবনদের সঙ্গে সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। তাদের শারীরিক পরিবর্তনগুলি সহজভাবে নিতে হবে এবং যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে আচরণ বা চিন্তার সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে।

তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদাকে তৃপ্তিদানের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। সংসারের ছোটখাট দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে তৃপ্ত করতে হবে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রাপ্তযৌবনদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি তার চাহিদা ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে তাহলেই তার ব্যক্তিগত সার্থকতা বোধ পরিতৃপ্ত হবে, নতুবা ব্যর্থতা বা আংশিক সাফল্য তার আত্মবিশ্বাসকে ক্ষীণবল করে তুলবে। এই জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বহুমুখী পাঠক্রমের প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এমন সব বিভিন্নধর্মী পাঠ্য বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে যেগুলিতে প্রাপ্তযৌবনদের বিকাশমান বহুমুখী সম্ভাবনা ও চাহিদাগুলি পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। ভারতের নব প্রবর্তিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচলিত গতানুগতিক একমুখী পাঠক্রমকে পরিত্যাগ করে নানা বিভিন্নধর্মী ও বৃত্তিমূলক পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে। তার ফলে প্রাপ্তযৌবনদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি যে কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্তি লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাপ্তযৌবনদের সর্বতোমুখী বৃদ্ধিকে পূর্ণতালাভের সুযোগ দেবার জন্য পাঠক্রমে প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্রমণ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিসত্তার সব দিকগুলি যাতে অবাধে অভিব্যক্তি লাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এই সময়ে ছেলেমেয়েরা যাতে একটি উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে সেদিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতার সক্রিয় ও সযত্ন সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। তাদের ভাল ভাল বই পড়ার সুযোগ দেওয়া, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে তাদের

সঙ্গে আলোচনা করা, সেগুলি সম্বন্ধে সন্তোষজনক ধারণা গঠনে তাদের সাহায্য করা, প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ দিয়ে তাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা ইত্যাদি পন্থার সাহায্যে জীবন সম্বন্ধে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে ছেলেমেয়েদের সমর্থ করা উচিত। সুপরিকল্পিত প্রকৃতিবীক্ষণও কল্পনাশক্তি বিকাশের পক্ষে খুব সহায়ক এবং ভ্রমণ, পিকনিক, স্কাউটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা যাতে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসতে পারে তার আয়োজন করা দরকার। তাছাড়া নানা দেশ ভ্রমণের ফলে প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীও প্রসারিত হয় এবং তারা উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে।

যৌন বিষয় সম্বন্ধে প্রাপ্তযৌবনদের নবজাত কৌতূহল তৃপ্ত করার জন্য তাদের পাঠক্রমে যৌনশিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখা একান্ত দরকার। নারীপুরুষের যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে যাতে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারে তার আয়োজন সর্বস্তরের পাঠক্রমেই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

১। শৈশব থেকে যৌবনাগম পর্যন্ত জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি বর্ণনা কর।

২। ছেলেমেয়েদের যৌবনাগম স্তরের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলি কি? উক্ত চাহিদাগুলি পূরণ না হলে তার পরিণাম কি হতে পারে নির্দেশ কর। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক ও পরিবারের কি কর্তব্য বল।

৩। যৌবনাগমকে 'ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল' বলা হয় কেন? ঐ সময় ছেলেমেয়েদের পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

৪। প্রাপ্তযৌবনদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলি উল্লেখ কর। কিভাবে সেগুলির সমাধান করা যায়?

৫। যৌবনাগমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি বল। কেন এই স্তরকে প্রথম জীবনের পুনরাবৃত্তির স্তর বলা হয়?

৬। যৌবনাগমকে পীড়ন ও কষ্টের কাল বলা হয় কেন?

৭। বয়স্করা প্রাপ্তযৌবনদের বিদ্রোহী বিবেচনা করে কেন?

৮। প্রাপ্তযৌবনরা দিবাস্বপ্নে বিভোর হয় কেন?

৯। প্রাপ্তযৌবনদের কয়েকটি প্রধান প্রধান মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার উল্লেখ কর। কিভাবে বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে দিয়ে এই চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করা যায়?

১০। প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নিপীড়ন ও বিদ্রোহের মনোভাব কেন সৃষ্টি হয়?

১১। যৌবনাগম হল শৈশবকালের পুনরাবৃত্তি—আলোচনা কর।

কুড়ি

ব্যক্তিগত বৈষম্য

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিশদ গবেষণার ফলে সাম্প্রতিক কালে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্বটি। এই তত্ত্বটির মূল কথা হল যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নানা দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। অবশ্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বৈষম্যের ধারণাটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের জানা। কিন্তু তার নিখুঁত ও যথার্থ স্বরূপটি আজ মনোবিজ্ঞানই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

স্কুলের একই ক্লাসে পড়ে এমন একদল সমবয়সী ছেলেকে পরীক্ষা করলে আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্বটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। দেখা যাবে যে দেহের গঠন, ওজন, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ, চোখের রঙ, প্রভৃতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। কেউ দীর্ঘ, কেউ খর্ব। কারও স্বাস্থ্য খুব ভাল, কেউ চিররুগ্ন, কারও চোখের রঙ কাল, কারও বা কটা ইত্যাদি। তেমনি আবার স্বভাব, হাবভাব, অভ্যাস ইত্যাদির দিক দিয়েও তাদের মধ্যে বৈষম্যের অন্ত নেই। কেউ হয়তো শান্ত, কেউ অশান্ত, কেউ নিষ্ঠুর, কেউ কোমল, কেউ বাস্তবধর্মী, কেউ বা স্বপ্নবিলাসী। পড়াশোনার দিক দিয়েও তাদের মধ্যে প্রচুর অমিল। কেউ হয়ত সহজেই পড়া শেখে, কারও শিখতে বেশ সময় লাগে। কেউ অতি সহজেই একের পর এক পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে এগিয়ে যায়, কেউ আবার নিম্নতম পরীক্ষাতেই ব্যর্থ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে দেখা যাবে যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা নীচের বৈষম্যগুলির সন্ধান পাই। যথা—(১) দেহগত[1], (২) মানসিক শক্তিগত[2] (৩) মনঃপ্রকৃতিগত[3] (৪) প্রক্ষোভগত[4] (৫) সাংস্কৃতিক[5] (৬) সমাজগত (৭) শিক্ষাগত ইত্যাদি।
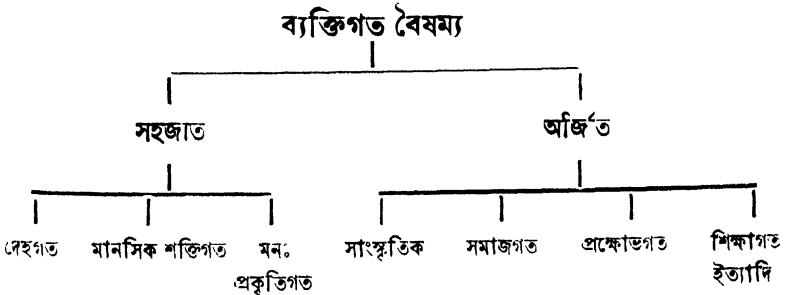
এই বৈষম্যগুলিকে আমরা আবার আর এক দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে

1. Physical 2. Intellectual 3. Temperamental 4. Emotional 5. Cultural

পারি, যথা, সহজাত[1] এবং অর্জিত[2]। সহজাত বৈষম্যগুলিকে আমরা মৌলিক বৈষম্য বলে বর্ণনা করতে পারি। কেননা এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তি জন্ম থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে এবং সেজন্য সেগুলির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য স্বভাবত থাকবেই। কিন্তু অর্জিত বৈষম্যগুলি ব্যক্তি এবং পরিবেশের সংঘাতে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির জন্য পরিবেশের পার্থক্যই প্রধানত দায়ী। পরিবেশ যতই একরকম হয়ে ওঠে ততই এই অর্জিত বৈষম্যের পরিমাণও কমে যায়। অবশ্য এই অর্জিত বৈষম্য কখনও একেবারে লোপ পেতে পারে না, এমন কি পরিবেশ সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে উঠলেও নয়। তার কারণ হল এই যে অর্জিত বৈষম্যগুলির পেছনে পরিবেশের শক্তি প্রধানত কাজ করলেও ব্যক্তির সহজাত নিজস্ব শক্তিরও অবদান সেখানে থাকবেই এবং এই সহজাত শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হওয়ার ফলে সেগুলির সামগ্রিক ফল বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবেই।

উপরে বর্ণিত বৈষম্যগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ দেহগত, মানসিক, শক্তিগত ও মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্যগুলি হল সহজাত মৌলিক বৈষম্য। আর বাকীগুলি যেমন সাংস্কৃতিক, প্রক্ষোভগত, সমাজগত ইত্যাদি বৈষম্যগুলি হল অর্জিত। অর্থাৎ, এই বৈষম্যগুলি শিশুর মধ্যে জন্মের সময় থাকে না, কিন্তু পরে পরিবেশের প্রভাবের বিভিন্নতা হেতু তার মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সহজাত বৈষম্যগুলি নিয়েই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

অবশ্য কোন বৈষম্যকেই সম্পূর্ণ সহজাত বা সম্পূর্ণ অর্জিত বলা চলে না। বিভিন্ন অর্জিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সহজাত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবও যথেষ্ট থেকে থাকে। আবার অনেক সহজাত বৈশিষ্ট্য অর্জিত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। তবু আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান শ্রেণীবিভাগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

সহজাত বৈষম্য ও বংশধারা

সহজাত বৈষম্যগুলি শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ। বংশধারা বলতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলি শিশু তার পিতামাতা ও পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে জন্মের সময় পেয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার তার পিতামাতা তাঁদের পিতামাতাদের (অর্থাৎ শিশুর পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীদের) কাছ থেকে পেয়েছেন। তাঁরা আবার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের পিতামাতাদের (অর্থাৎ শিশুর প্রপিতামহ-প্রপিতামহী প্রমাতামহ-প্রমাতামহীদের) কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এভাবে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে শিশু যে বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে পায় সেগুলির মধ্যে তার পূর্বপুরুষদের সকলেরই কিছু না কিছু অবদান আছে।

1. Inherited 2. Acquired

এখন এই বংশধারা বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে পিতা-মাতার কাছ থেকে শিশুর মধ্যে আসে ? এটি জানতে হলে প্রাণী-সৃষ্টির রহস্য কিছুটা জানা দরকার।[3]

শিশু যখন জন্মায় তখন মাতৃগর্ভে দুটি কোষের সম্মিলন ঘটে। একটি আসে পিতার কাছ থেকে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে পিতৃকোষ, আর একটি আসে মাতার কাছ থেকে, তাকে বলা যেতে পারে মাতৃকোষ। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে থাকে তেইশটি করে সুতোর মত পদার্থ যাকে বলা হয় কোষতন্তু বা ক্রোমোজোম[1]। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে আবার চল্লিশ থেকে একশাটর করে অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যাকে বলা হয় জীন[2]। এই জীনই হল প্রকৃত পক্ষে উত্তরাধিকারের বাহক। শিশুর জন্মের সময় পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জীনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাদের এই মিলনের উপর শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। শিশুর দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, উচ্চতা, চোখের রঙ, নাকমুখ-চোখের আকৃতি, বুদ্ধি, মনের প্রকৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত করে এই পিতা ও মাতার মিলিত জীনগুলি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পিতৃ-মাতৃকোষের জীনগুলির মাধ্যমেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে তার সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি লাভ করে এবং এই বৈশিষ্ট্য-গুলির সমষ্টিকে এক কথায় আমরা বংশধারা নাম দিয়ে থাকি।

জীন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও এটুকু জানা গেছে যে জীনের ক্ষমতা অসীম। মানুষের দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক, সকল রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া। জীন সবসময় জোড়ায় কাজ করে যায়, একটি আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটি আসে পিতৃকোষ থেকে। জীনের এই জোড়বাঁধার উপরেই শিশুর বংশ-ধারার প্রকৃতি পূর্ণভাবে নির্ভর করে। প্রত্যেক পিতামাতার নিজস্ব জীনের গুণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্ম পিতামাতার বিভিন্ন জীনের সম্মেলন থেকে হয় বলে একই পিতামাতার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। একমাত্র সমকোষী যমজ ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে জীনগুলি একই থাকে এবং সেজন্য তাদের বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়।

ত্রিবিধ সহজাত বৈষম্য

এই বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকৃতির দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা, দৈহিক, মানসিক ও মনঃপ্রকৃতিগত। দৈহিক বংশধারার মধ্যে পড়ে ব্যক্তির দেহের গঠন, উচ্চতা, নাক, মুখ, চোখের রঙ ও নানাপ্রকার অন্তর্দৈহিক বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থিগত পার্থক্যও এই পর্যায়ে পড়ে। মানসিক বংশধারার মধ্যে প্রধানত পড়ে নানাবিধ মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি। সবশেষে আসে

1. Chromosome 2. Gene 3. পৃঃ ১৮৩—পৃঃ ১৮৬

মনের মৌলিক প্রকৃতি বা স্বরূপ, যাকে ইংরাজীতে টেম্পারামেণ্ট[1] বলা হয়। দেখা গেছে যে টেম্পারামেণ্ট বা মনঃপ্রকৃতিটিও ব্যক্তি জন্ম থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে থাকে।

এই তিন শ্রেণীর বংশধারার বৈশিষ্ট্য থেকেই তিন শ্রেণীর সহজাত বৈষম্যের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যথা দেহগত বৈষম্য, মানসিক-শক্তিগত বৈষম্য ও মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য।

দেহগত বৈষম্য

দেহগত বৈষম্য নানা শ্রেণীর এবং মাত্রার হতে পারে। জাতিগত বিভিন্নতা অনুযায়ী দৈহিক গঠন ও শরীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তির বংশধারার বিভিন্নতার জন্যও মানুষে মানুষে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। একটি নিগ্রো ছেলের পাশে একটি ইউরোপীয় ছেলেকে বা একজন চীনদেশীয় ছেলের পাশে একটি রাজপুত ছেলেকে দাঁড় করালে দেহগত বৈষম্যের স্বরূপটি জানা যাবে। সুস্বাস্থ্য বা কুস্বাস্থ্য কিন্তু সহজাত নয়, পরিবেশের প্রভাব থেকে অর্জিত। তবে বিভিন্ন শারীরিক প্রবণতা, যাকে আমরা ইংরাজীতে কনষ্টিটিউশান[2] বলি, সেগুলি সহজাত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেহগত বৈষম্যের মূল্য আজকাল খুব বেশী নয়। বর্তমান জগতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া দেহগত বৈষম্যের মূল্য বিশেষ কোথাও দেওয়া হয় না। তবে অঙ্গহীনতা বা শারীরিক কোন খুঁত থাকলে তা ব্যক্তির মনোভাব এবং ব্যক্তিসত্তা গঠনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অ্যাডলারের[3] পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে যে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ[4] প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

মানসিক শক্তিগত বৈষম্য

মানসিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য দেখা যায় তার গুরুত্ব কিন্তু সব দিক দিয়েই বেশী।

মানসিক শক্তিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, সাধারণ শক্তি ও বিশেষ শক্তি। সাধারণ শক্তি হল সেই শক্তি যা আমাদের সকল প্রকার কাজ করার পিছনেই থাকে। একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি নাম দিয়ে থাকি। আর বিশেষ শক্তি হল সেই শক্তি যা ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজে দক্ষতা দান করে।

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় প্রকার শক্তির দিক দিয়েই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়।

---

1. Temperament 2. Constitution 3. Adler 4. Sense of Inferiority

সকল মানুষের যে বুদ্ধি সমান নয় এটি একটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা। কিন্তু কার কত বুদ্ধি, বেশী হলে কত বেশী, কম হলে কত কম, এ সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে জানা এতদিন সম্ভব হয় নি। সেটি বর্তমান কালে জানা সম্ভব হয়েছে অধুনা আবিষ্কৃত বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে। বুদ্ধির অভীক্ষা হল বুদ্ধি পরিমাপ করার এক ধরনের যন্ত্র বা উপকরণ। এর দ্বারা কে কতটা বুদ্ধির অধিকারী তা নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায়। যে সংখ্যার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাণ সূচিত হয় তাকে বুদ্ধ্যঙ্ক বলে। সাধারণ বা গড় মানুষ অর্থাৎ যার বুদ্ধি সাধারণ মানের চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়, তার বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০। যার বুদ্ধি সাধারণ বা গড় মানুষের বুদ্ধির চেয়ে কম তার বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০'র কম এবং বুদ্ধি যত কম হবে বুদ্ধ্যঙ্কও তত কমে যাবে। তেমনই যার বুদ্ধি সাধারণ বা গড় মানুষের বুদ্ধির চেয়ে বেশী তার বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০'র বেশী এবং বুদ্ধি যত বেশী হবে তত বুদ্ধ্যঙ্কও বেড়ে যাবে। কোন্ মানুষের কতটা বুদ্ধি তা নির্ণয় করা হয় এই বুদ্ধ্যঙ্কের গণনার সাহায্যে।[1]
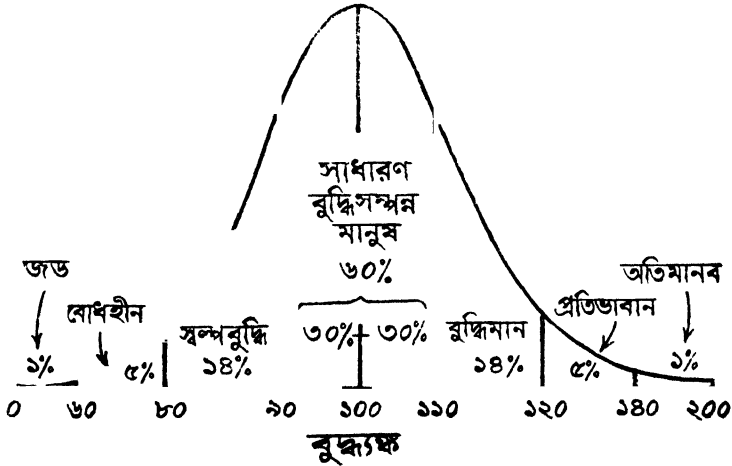
[জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টনের আদর্শ চিত্ররূপ]

এই পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে যে প্রকৃতি বুদ্ধির বণ্টনে অধিকাংশ লোকের প্রতিই সুবিচার করেছেন। শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝামাঝি বুদ্ধি এবং বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে বলা যায় যে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০'র মধ্যে। আবার ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন মানুষ। এরা হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে। এদের এক কথায় বলা হয় ক্ষীণবুদ্ধি। এদের মধ্যেও আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে নানা শ্রেণী বা স্তর আছে। ১১০ বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও সেইরকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এদের নাম

১। পৃঃ ৮২

দেওয়া যায় উন্নতবুদ্ধি। এদেরও বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজের এই বণ্টনকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা পূর্বপৃষ্ঠার ছবির মত ঘণ্টার আকৃতিসম্পন্ন একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির মধ্যভাগ উঁচু এবং ফোলা। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকেদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির দুপ্রান্ত ক্রমশ নীচু ও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র বলা হয়।

ক্ষীণবুদ্ধি

আমরা দেখেছি যে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনের বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়েও কম। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০'র কম। এদের বলা হয় ক্ষীণবুদ্ধি। এদের মধ্যে আবার ১৪ জন ক্ষীণবুদ্ধি[1] হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি এদের আছে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০'র মধ্যে। এদের স্বল্পবুদ্ধি[2] বলতে পারি। এরা কোন চিন্তামূলক কাজ করতে পারে না বা লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পারে না। খুব ঘসামাজা করলে বড় জোর প্রবেশিকা পরীক্ষার বেড়াটা এরা ডিঙোতে পারে। কিন্তু শেখালে এরা হাতের কাজ ভালভাবেই শেখে। সহজ প্রকৃতির যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনযাপন করে থাকে।

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা থাকে তাদের বলা চলে বোধহীন[3]। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ থেকে ৮০'র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা। লেখাপড়া করা দূরে থাকুক ভাল করে নিজের মনের ভাবটাও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইটা পড়া, নাম সই করা ইত্যাদি অতি সহজ কাজগুলি এদের দ্বারা হতে পারে। এরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে পারে না। তবে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সহজ হাতের কাজ এরাও শিখতে পারে। এদের সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ৫টি।

সব চেয়ে শেষ ধাপে আছে জড়[4]। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০'র নীচে। এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথাও বলতে পারে না, বললেও বোঝে না। এরা একা চলাফেরা করতে পারে না। নিজেদের ভালমন্দও বোঝে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাজ করতে শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন।

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানব-সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে এদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে পড়ানো চললেও

1 Feebleminded 2. Moron 3. Imbecile 4. Idiot

তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন এবং জড় ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আধুনিক সব দেশেই আছে। এই বিশেষ শিক্ষায়তনগুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুপরিকল্পিত পন্থা নেওয়া হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উন্নয়নের দ্বারা বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে যে অনেকেই নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে নিম্নবুদ্ধির সংখ্যাই বেশী। বুদ্ধি অল্প থাকার ফলে এই সব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার জন্য তারা তাদের কৃতকর্মের গুরুত্ব বা ভবিষ্যৎ ফলাফল বুঝতে পারে না। ফলে তারা সহজেই প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং গুরুতর প্রকৃতির অপরাধ করতেও ইতস্তত করে না।

উন্নতবুদ্ধি

নিম্নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ থেকে ১২০'র মধ্যে তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে একধাপ উপরে। ক্লাসে বা বাড়ীতে যাদের আমরা সাধারণত চালাক বা বুদ্ধিমান আখ্যা দিয়ে থাকি তারাই এই পর্যায়ে পড়ে।

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের দল। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৫০'র মধ্যে। আচারব্যবহারে, লেখাপড়ায় এদের নিঃসন্দেহে সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। ১৪০'র উপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের পর্যায়ে ফেলা চলতে পারে। এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচারকরণ, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি কাজে এদের দক্ষতা অকল্পনীয়। সাধারণত এরাই নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্ম দিয়ে থাকে।

উন্নতিবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। পার্থিব কৃতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার, তেমনই দরকার শিক্ষা এবং জ্ঞানের। কিন্তু দেখা গেছে যে নানা কারণে অনেক ক্ষেত্রে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত গতানুগতিক যে প্রথায় আমাদের স্কুলে কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সু-বিচার করা হয় না। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা-দানের ফলে উন্নতবুদ্ধিদের কাছে সেই লেখাপড়ার কোন আকর্ষণ থাকে না। ক্লাসে যা পড়ানো হয়, তা হয় তাদের কাছে অনেক আগে থেকেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের নীচে। ফলে তারা ক্লাস পালায়, অপরাধ করার দিকে ঝোঁকে

এবং প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। সেই জন্য দেখা গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখিয়েছে তারা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে নি।

এই জন্য আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে এদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রচলিত হয়েছে। এমন কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর প্রথা কোন কোন দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পাবলিক স্কুলগুলি এই ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পাবলিক স্কুল খোলা হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা[1] পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মাধ্যমেও এই সমস্যার একটা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়া বিশেষ মানসিক শক্তির দিক দিয়েও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ থাকতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন শিশু বিশেষ একটি দক্ষতা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই বিষয়ে সে বিনা আয়াসেই যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখাতে সমর্থ হচ্ছে। যেমন খুব শিশুকাল থেকেই কোন ছেলে হয়ত ভাল অঙ্ক করতে পারে বা কোন মেয়ে ভাল গান গাইতে পারে, আবার কেউ কেউ যন্ত্রপাতির কাজ কর্মে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায় ইত্যাদি। এগুলির মূলে আছে নানা বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি। এই বিশেষ মানসিক শক্তিগুলি নানা শ্রেণীর হতে পারে, যেমন— ভাষামূলক শক্তি[2], গাণিতিক শক্তি[3], যন্ত্রমূলক শক্তি[4], অবস্থানমূলক শক্তি[5] ইত্যাদি।

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় ধরনের মানসিক শক্তিই যে প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে কথা বলা বাহুল্য। সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখা যায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কম তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারে না এবং যারা বোধহীন বা জড় তারা লেখাপড়াই করতে পারে না। লেখাপড়া ছাড়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও বুদ্ধির প্রয়োজন যথেষ্ট। যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনার কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে বেশ উন্নত মানের বুদ্ধির দরকার। তাছাড়া সকল প্রকার মানসিক কাজের সুসংগঠন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দ্রুতচিন্তন, বিচারকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারাই উৎকর্ষ দেখাতে পারে যাদের বুদ্ধির মান সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী। এই সকল কারণে বৃত্তিমূলক জীবনে বুদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর।

বিশেষধর্মী মানসিক শক্তিগুলিও ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

---

1. Three-stream 2. Verbal Ability or v 3. Numerical Ability or n
4. Mechanical Ability or m 5. Spatial Ability or s

যে বিষয়ে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক শক্তি আছে সে বিষয়টিকে যদি সে তার বৃত্তিরূপে বেছে নেয় তবেই তার জীবনে সাফল্যপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য

মনঃপ্রকৃতি[1] বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা চলতি কথায় মেজাজ বা মুড বলে থাকি। দেখা গেছে যে মনের মৌলিক কাঠামোটির গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি কোমল প্রকৃতির, আবার কেউ নিষ্ঠুর স্বভাবের, কারও মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অমায়িকতা দেখা যায়, কারও আচরণ অতিমাত্রায় রুক্ষ, কেউ বা আক্রমণধর্মী হয়ে থাকে, আবার কেউ বা বশ্যতাপ্রিয় হয়। এই ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তামূলক বৈশিষ্ট্যগুলির সৃষ্টিতে পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও সহজাত মনঃপ্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে এগুলির মৌলিক ভিত্তিরূপে কাজ করে থাকে।

অর্জিত বৈষম্য ও পরিবেশ

সহজাত বৈষম্যের মূলে যেমন আছে বংশধারা, তেমনই পরিবেশ আছে অর্জিত বৈষম্যের পেছনে। ব্যক্তিমাত্রেই জন্ম থেকেই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। পরিবেশহীন অস্তিত্ব কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সাধারণ ভাষণে পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চার পাশে যে সব বস্তু বা ব্যক্তি আছে সেগুলিকেই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে পরিবেশের আরও ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বলতে সেই শক্তিসমষ্টিকেই বোঝায় যা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কোন না কোন রূপ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুদূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি কিংবা অতীতের এমন কি ভবিষ্যতের কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাও আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত হতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারে এবং ফলে নানারূপ ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা দেয়, যথা, সংস্কৃতিগত বৈষম্য, সমাজগত বৈষম্য, প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য, শিক্ষাগত বৈষম্য, নীতিগত বৈষম্য, অভ্যাসগত বৈষম্য ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

সব শিশু এক পরিবেশে মানুষ হয় না। বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশও বিভিন্ন। এস্কিমোরা সারা বছর বরফের গুহায় কাটায় আবার আফ্রিকার লোকেরা সারা বছরই সূর্যের প্রখর আলোর তলায় বসবাস করে। বঙ্গদেশের

1. Temperament

লোকেরা শস্যশ্যামল সমতলভূমিতে নিরায়াস জীবনযাপন করে, আবার পার্বত্য নাগারা পাহাড়ের রুক্ষ পরিবেশে কঠোর পরিশ্রমে দিন কাটায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার পর আসে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতা। প্রাচীন মানবের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের বিভিন্ন জাতি ও সমাজ। প্রত্যেক জনসমাজেরই আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার, রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতির বহুদিনের সযত্ন সঞ্চিত নিজস্ব একটি ভাণ্ডার আছে এবং সেই বিশেষ সমাজে যে শিশু জন্মায় সে সেই জাতিগত ভাবধারা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারটির অধিকারী হয়। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রচুর মৌলিক ঐক্য থাকলেও ভাবধারা, আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদির দিক দিয়ে অমিলও বিরাট। এই জাতিগত ভাবধারা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে জন্ম নেয় সাংস্কৃতিক বৈষম্য, যেমন দেখা যায় একদল ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বা একদল বেদুইন ও আমেরিকানের মধ্যে।

সমাজগত বৈষম্য

জাতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য যেমন সাংস্কৃতিক বৈষম্যের মূলে আছে তেমনই শিশু যে সমাজে মানুষ হয়, সেই সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহার, প্রথা, পদ্ধতি, আইন কানুন প্রভৃতির বিভিন্নতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমাজগত বৈষম্যের সৃষ্টি করে থাকে। জন্ম থেকে সুরু করে পরিণতবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত শিশু ছোট বড় অনেকগুলি সমাজের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটায়। এর প্রত্যেকটি সমাজেরই অল্পবিস্তর প্রভাব তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সর্বপ্রথম যে সামাজিক সংগঠনটি তার চিন্তা, আচরণ ও মনোভাবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সেটি হল তার পরিবার। প্রত্যেক পরিবারের কতকগুলি নিজস্ব ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা আছে এবং পরিবারের শিশুমাত্রেই সেই ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা অনুযায়ী মানুষ হয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় যে দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছে এমন দুটি শিশুর মধ্যে বয়স, বুদ্ধি ইত্যাদি অভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে চিন্তামূলক ও আচরণগত বৈষম্য প্রচুর থাকে। পরিবারের পরে আসে স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, অফিস ইত্যাদি। এই বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলি শিশুর ভাবধারা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব, ভাষা, আচরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য দেখা যায়।

প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য

যে কোন দু'জন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির প্রক্ষোভের স্বরূপ ও সংগঠন পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সেদিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একজন হয়ত

অল্পতেই রেগে যান বা আনন্দিত হন, আবার আর এক ব্যক্তির হয়ত রাগ বা আনন্দ দুয়েরই প্রকাশ যথেষ্ট বিলম্বিত। একজনের প্রক্ষোভ হয়ত তীব্র অথচ স্বল্পস্থায়ী আর একজনের প্রক্ষোভ অগভীর কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। একজন হয়ত প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে অনিচ্ছুক, অপর এক ব্যক্তি হয়ত প্রক্ষোভের প্রকাশে কোনরূপ দ্বিধা বা ইতস্তত করেন না। তাছাড়া প্রক্ষোভের বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। যে বস্তুতে বা বিষয়ে একজন আনন্দিত হন অপর ব্যক্তি হয়ত সেই বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন, আর একজন হয়ত সেই বস্তুতে বা বিষয়ে বিরক্তি বোধ করেন। আনন্দ, দুঃখ, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি যখন কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে সুসংগঠিত হয় তখন তাকে সেণ্টিমেণ্ট[1] বলে। সংগঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সেণ্টিমেণ্টের মধ্যেও অপরিসীম পার্থক্য দেখা দেয়।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য থাকে তার মূলেও আছে প্রধানত পরিবেশের প্রভাব। শিশু যখন জন্মায় তখন নিতান্ত সরল ও স্বল্প কয়েকটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভের সেই সরল সংগঠনটি জটিল আকার ধারণ করে। বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হওয়ার ফলেই তাদের প্রক্ষোভগত সংগঠনও পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। প্রক্ষোভগত বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে শিশুর পরিবার, স্কুল, সঙ্গীসাথী প্রভৃতির সম্মিলিত প্রভাব। অনুবর্তন[2] নামক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রক্ষোভের বিস্তার ঘটে এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির উপর নির্ভর করে এই অনুবর্তনের প্রকৃতি ও রূপ।

শিক্ষাগত বৈষম্য

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে যে কোন অর্জিত বৈষম্যকেই শিক্ষাগত বৈষম্য বলা যেতে পারে। কেননা পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণগত বা চিন্তাগত পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই শিক্ষা বলে। কিন্তু সাধারণ ভাষণে আমরা শিক্ষাকে একটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে থাকি। এই অর্থে কোন বিশেষ বিষয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত জ্ঞান অর্জনকেই শিক্ষা বলা হয়। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম সন্তোষজনক ভাবে আয়ত্ত করাকেই শিক্ষা নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর শিক্ষাগত প্রভেদ দেখা যায়। কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত, কেউ অল্প শিক্ষিত, আবার কেউ বা একেবারেই নিরক্ষর। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এই বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধার উপর। যে সকল দেশে শিক্ষাদান এখনও রাষ্ট্রদায়িত্বের অন্তর্গত

---

1. Sentiment 2. Conditioning

হয়নি সে সকল দেশে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রচুর। প্রগতিশীল দেশগুলিতে বিশেষ একটি মান পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করে তোলার ফলে সেখানে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য কম। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। তার কারণ হল যে সকল প্রকার উচ্চশিক্ষাই ব্যয়বহুল ও পর্যাপ্ত মানসিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। আর বিত্তগত সঙ্গতি ও মানসিক শক্তি উভয় দিক দিয়েই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য খুব বেশী দেখা যায় বলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যও প্রচুর হয়ে থাকে। বিত্তগত বৈষম্যের কারণেই ভারত প্রভৃতি অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষার সর্বস্তরেই বৈষম্য এত বেশী।

তাছাড়া শিক্ষা এখন বহুমুখী হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষাগত বৈষম্যের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। সাধারণ সাহিত্যধর্মী বিদ্যা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প, অঙ্কন, পূর্তবিদ্যা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্রবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় আজকাল পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষাগত পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য অর্জিত বৈষম্য

অর্জিত বৈষম্যের তালিকা এতেই শেষ হল না। উপরে উল্লিখিত প্রধান প্রধান অর্জিত বৈষম্যগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি গৌণ বৈষম্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, নীতিগত বৈষম্য[1], মনোভাবগত বৈষম্য[2], অভ্যাসগত বৈষম্য[3] ইত্যাদি। নীতিগত বৈষম্য বলতে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধারণার যে বিভিন্নতা দেখা যায় তাকেই বোঝায়। একজনের কাছে যেটা উচিত অপরের কাছে সেটা অনুচিত হতে পারে। এই নীতিগত বৈষম্য থেকেই জন্মায় আদর্শগত বৈষম্য।

মনোভাবগত বৈষম্যের গুরুত্বও কিন্তু কম নয়। প্রায়ই দেখা যায় কোন একটি বিশেষ বস্তু, ব্যাপার বা ঘটনা সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট মনোভাব আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। এই মনোভাব যেমন বিরূপ বা অনুকূল হতে পারে তেমনি আবার মাত্রা বা তীব্রতার দিক দিয়েও কম বা বেশী হতে পারে। যেমন, বাল্য-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সহশিক্ষা প্রভৃতি বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাবটি বহুলাংশে পরিবেশের দান, তবে এর উপর সহজাত মনঃপ্রকৃতিরও কিছুটা প্রভাব আছে। এই মনোভাবের দিক দিয়ে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায় এটা সর্বজনবিদিত সত্য। আমাদের আচরণের স্বরূপ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের এই মনোভাব।

বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তি অভ্যাস আহরণ করে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি গরম দেশে থাকে, সে দৈনিক স্নান করে, এমন কি একাধিক বারও করে। আর যে ব্যক্তি শীতল দেশে বাস করে তার কাছে স্নান করাটা নিত্যকর্ম নয়। এই রকম বিভিন্ন পরিবেশে

1. Ethical Difference 2. Attitudinal Difference 3. Habitual Difference

বাস করার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাস গড়ে ওঠে। একে বলে অভ্যাসগত বৈষম্য।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব

ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্বটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবদান। এই তত্ত্বটি নানা দিক দিয়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রাকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। দুটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির ভূমিকা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সে দুটি হল – শিক্ষা এবং বৃত্তিনির্বাচন।

শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্ব

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় সকল শিক্ষার্থীরই মানসিক ক্ষমতা এক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে একই পদ্ধতিতে সকলকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধারণা ও ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়েছে দলগত শিক্ষাদানের প্রথা অর্থাৎ বহু শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে একটি ক্লাসে রেখে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। শিক্ষক যখন একটি ক্লাসে পড়ান তখন তিনি ধরে নেন যে ক্লাসের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা সমান এবং তার ফলে তিনি তাঁর শিখনপ্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের জন্য কোনরূপ তারতম্য করেন না।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি থেকে জানা গেছে যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, মনোভাব, রুচি ইত্যাদিও বিভিন্ন। কেউ হয়ত একবার শুনেই একটি পড়া বুঝতে পারে, আবার হয়ত কেউ একই কথা বার বার না শুনলে বুঝতে পারে না। কারও হয়ত সাহিত্য পড়তে ভাল লাগে, আবার কারও হয়ত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে মন চায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ধরনের মৌলিক পার্থক্যের জন্য আজকাল দলগত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয়েছে। এই থেকেই আমাদের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথমত, বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত একই ধরনের সাহিত্যধর্মী পাঠক্রমের স্থানে বহুমুখী পাঠক্রম পৃথিবীর সব দেশেই আজ প্রবর্তিত হয়েছে। তার ফলে যে সব ছেলেমেয়ের সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তারা তাদের রুচিমত ও সামর্থ্যাধীন শিক্ষালাভ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক প্রগতিশীল দেশে গতানুগতিক ক্লাসের বৈষম্যহীন শিক্ষাদানের পরিবর্তে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডাল্টন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান ও উইনেটকা প্ল্যান। এগুলিতে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদার প্রতি যতদূর সম্ভব সুবিচার করার চেষ্টা হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একই ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি অনুযায়ী তিনটি দলে ভাগ করে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রথা প্রচলিত আছে। একে ত্রিধারা প্রথা

বলা হয়। তৃতীয়ত, পূর্বে কেবলমাত্র সাহিত্য, ভাষা এবং কয়েকটি অমূর্তধর্মী[1] বিষয়-বস্তু ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্গত করা হত না। ফলে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েই শিক্ষায় প্রকৃত পারদর্শিতা দেখাতে পারত। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্বটি গৃহীত হওয়ার ফলে সাহিত্যধর্মী বিষয়গুলি ছাড়াও বহু ব্যবহারিক বিষয়কে এখন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যন্ত্রশিল্প, পূর্তশিল্প, নানা কারিগরি বিদ্যা, অঙ্কন, সঙ্গীত, বিপণন, বাণিজ্য ইত্যাদি যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় পূর্বে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত, আজ সেগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে এবং সেগুলিকে ব্যাপকভাবে স্কুলকলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি

বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বৃত্তি বলতে বোঝায় এমন কোন বিশেষ ধরনের কাজ যার সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। এক দিক দিয়ে যেমন কাজটির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সম্পাদন দরকার, তেমনি দরকার ব্যক্তির নিজস্ব সন্তুষ্টি বা তৃপ্তিবোধ। যেখানে এ দুটি বস্তু এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে বুঝতে হবে সেখানেই ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচন সফল হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যক্তি এমন একটি বৃত্তি বেছে নিয়েছে যেটির প্রতি তার স্বাভাবিক অনুরাগ বা আসক্তি নেই এবং যেটি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে তাকে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ফলে কিছুদিন পরে একঘেয়েমি, যান্ত্রিকতা, বিরক্তি, অতৃপ্তি ও হতাশায় ব্যক্তির বৃত্তি-মূলক জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাজের দিক দিয়েও এ ধরনের ব্যক্তির কাছ থেকে পূর্ণ ও সুষ্ঠু সম্পাদন কখনই আশা করা যেতে পারে না। ফলে নিয়োগকারী ও নিযুক্ত ব্যক্তি দুজনেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার যদি বৃত্তির নির্বাচন ব্যক্তির পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী হয় তবে সে বৃত্তি সম্পন্ন করে ব্যক্তি যেমন নিজেও সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করে, তেমনই নিয়োগকারীকে তার কাজের দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারে। এক কথায় বৃত্তিমূলক সঙ্গতিবিধানের[2] পিছনে আছে ব্যক্তির নিজের সামর্থ্য ও আগ্রহ। বৃত্তির অপ-নির্বাচনের অর্থ হল এই অতিপ্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধানের অভাব এবং তা থেকে দেখা দেয় নিয়োগকারীর ক্ষতি, ব্যক্তির নিজস্ব অতৃপ্তি ও হতাশা এবং সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের অবনতি।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির বৈষম্য দেখা যায় সেগুলির মধ্যে মানসিক শক্তির বৈষম্য সব চেয়ে বেশী ব্যক্তির বৃত্তিনির্বাচনকে প্রভাবিত করে। সহজ ও নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি শিল্পমূলক কাজ ছাড়া অধিকাংশ বৃত্তির সম্পাদনেই বুদ্ধির সাধারণ মান (যাকে আমরা ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক বলে বর্ণনা করেছি)[3] এক প্রকার অপরিহার্য।

1. Abstract 2. Vocational Adjustment 3. পৃঃ ৮২

যাদের বুদ্ধির মান এর চেয়ে কম তারা সাধারণ ও প্রচলিত কোন বৃত্তিমূলক কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। বৃত্তিটি যতই জটিল ও সূক্ষ্মধর্মী হতে থাকবে বুদ্ধির মানও ততই উন্নত হওয়া দরকার। কোন কোন বৃত্তিতে সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। যেমন, আইন বিদ্যা, শিক্ষকতা, ব্যবসা পরিচালনা, প্রশাসনঘটিত কার্যাদি, সংবাদপত্র-সম্পাদনা, ডাক্তারী প্রভৃতি বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করতে হলে উচ্চমানের বুদ্ধি অত্যাবশ্যক। তেমনই আবার মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কার্যাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরীর কাজ, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য, বয়নশিল্প, সৈনিকবৃত্তি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি নানা জীবিকা আছে যেগুলিতে উচ্চমানের বুদ্ধি না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলে।

বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক শক্তির পর আসে মনের বিশেষ শক্তি। যারা লেখাপড়ার কাজে থাকতে চায় বা সাহিত্য চর্চা, শিক্ষকতা, সংবাদপত্র সম্পাদনা ইত্যাদিকে পেশা করতে চায় তাদের মধ্যে ভাষামূলক শক্তি বিশেষভাবে থাকা একান্ত আবশ্যক। যারা আবার অঙ্কশাস্ত্র-ঘটিত বৃত্তি যেমন, এ্যাকাউণ্টেন্সী, পরিসংখ্যান, ব্যাঙ্ক-বীমা-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতির কাজে যেতে চায় তাদের গাণিতিক শক্তি বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক। তেমনই যারা যন্ত্রপাতিঘটিত বৃত্তি গ্রহণ করার ইচ্ছা রাখে তাদের যন্ত্রমূলক শক্তি থাকা অপরিহার্য। উপযুক্ত বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির অধিকারী না হয়ে যারা এই ধরনের কোন বিশেষ প্রকৃতির বৃত্তি নির্বাচন করে তাদের পক্ষে বৃত্তির ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা নিতান্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। সাধারণত দেখা যায় যে পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা যখন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন করেন, তখন তাঁরা ছেলেমেয়েদের পছন্দ বা সামর্থ্যের কথা ভাবেন না এবং প্রায়ই তাঁরা নিজেদের পছন্দ, অতৃপ্ত বাসনা, সমাজের চাহিদা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ইত্যাদি অবাস্তব কারণগুলির দ্বারা পরিচালিত হন।

বৃত্তির ক্ষেত্রে মানসিক শক্তি ছাড়া মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রভাবও যথেষ্ট। কোন কোন বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের মানসিক সংগঠন থাকা অপরিহার্য এবং দেখা গেছে যে অন্যান্য গুণ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অনুপযোগী মানসিক সংগঠনের জন্য ব্যক্তি তার কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। যেমন, যে ব্যক্তিকে কোন একটি বহু-বিভাগসম্পন্ন দোকান পরিচালনা করতে হবে বা বড় কোন হোটেলের অভ্যর্থকের কাজ করতে হবে বা কোন বিরাট কারখানায় শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তার মনঃপ্রকৃতি হওয়া উচিত ধীর, স্থির ও শান্ত। এখন এই ধরনের বৃত্তি অনুসরণকারী ব্যক্তি অন্যান্য গুণের অধিকারী হয়েও যদি রুক্ষ মেজাজের বা মাথাগরম প্রকৃতির লোক হয় তবে তার পক্ষে বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠবে।

কোন উদ্দীপকের আবির্ভাবের পর তার প্রতি আমাদের সাড়া দিতে বা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হবেই। একে প্রতিক্রিয়া কাল[1] বলা

---

1 Reaction Time or RT

হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল বিভিন্ন—কারও কম, কারও বেশী। যারা রেলগাড়ী বা বড় বড় মেসিন চালানোর কাজ করতে চায় তাদের প্রতিক্রিয়া কাল কম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যাদের প্রতিক্রিয়া কাল বেশী তারা হঠাৎ একটি কাজ দ্রুত-গতিতে সম্পন্ন করতে পারে না। চলন্ত মটর বা রেলগাড়ীর সামনে হঠাৎ অতর্কিতে একজন পথচারীকে এসে পড়তে দেখে চালক যত তাড়াতাড়ি ব্রেক কষতে পারবে ততই পথচারীটির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যে চালকের প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্রেক কষতে দেরী হবে। অতএব যে সকল বৃত্তিতে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাটা দরকার সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল যত অল্প হয় ততই ভাল এবং যাদের প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তাদের এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা কখনই উচিত নয়।

প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্য বৃত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ একটি পরিবেশে মানুষ হওয়ার পর যদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তবে তার প্রক্ষোভমূলক ও আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সেই নতুন পরিবেশের প্রায়ই সংঘাত লাগে এবং তার বৃত্তিমূলক সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য ব্যক্তির স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই তার বৃত্তির নির্বাচন যত সীমাবদ্ধ থাকে ততই তার পক্ষে মঙ্গলকর। তবে যেহেতু প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্যগুলি অর্জিত সেজন্য পরিবেশের চাপে সেগুলি প্রয়োজনমত পরিবর্তিতও হয়ে যেতে পারে।

বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব এত বেশী বলে আধুনিক কালে বৃত্তিমূলক পরিচালনা[1] বা নির্দেশ দান যে কোন উন্নত সমাজব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়াও ব্যক্তির বিশেষধর্মী শক্তি ও বিভিন্ন আগ্রহের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য নানা বিশেষধর্মী অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। এই অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে ব্যক্তির পক্ষে কোন্ বৃত্তিটি নির্বাচনীয় সে সম্বন্ধে ছাত্র অবস্থাতেই তাকে আজকাল মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। ব্যক্তিগত বৈষম্য বলতে কি বোঝ? শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। বিদ্যালয়ে কোন কোন দিক থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় বল। শিক্ষায় কি ভাবে এর প্রভাব পড়ে?

৩। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়? শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনায় এর কি প্রভাব দেখা যায় বল।

৪। সহজাত বৈষম্য বলতে কি বোঝ? কত রকমের সহজাত বৈষম্য দেখা যায়?

৫। অর্জিত বৈষম্য বলতে কি বোঝ? এর কারণ কি? কত রকমের অর্জিত বৈষম্য হয়?

৬। বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বর্ণনা কর।

৭। টীকা লেখ :— ক্ষীণবুদ্ধি, উন্নতবুদ্ধি, মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য।

1. Vocational Guidance

শিখন প্রক্রিয়া

প্রত্যেক প্রাণীকেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের সদাপরিবর্তনশীল বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তার জন্যই তাকে সম্পন্ন করতে হয় নানাবিধ আচরণ। প্রকৃতি অবশ্য প্রাণীমাত্রকেই কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা আগে থেকেই দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান এবং সেগুলির সাহায্যে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক চাহিদা তৃপ্ত করতে পারে। এগুলিকে আমরা প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে বর্ণনা করেছি।

শিখনের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলির সংখ্যাও যেমন অল্প, তেমনই পরিবেশের বৈচিত্র্যময় ও অসংখ্য শক্তিগুলির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাওয়ানর পক্ষেও সেগুলি নিতান্তই অপর্যাপ্ত। ফলে যখনই পরিবেশ পরিবর্তিত ও জটিল হতে থাকে তখনই প্রকৃতিদত্ত এই সহজাত আচরণের ভাণ্ডারটি নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং প্রাণীকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তখনই সুরু হয় প্রকৃত জীবনযুদ্ধ। যে প্রাণী পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে সেই টিঁকে থাকে, আর যে পারে না সে সরে দাঁড়ায়। পরিবেশের উপযোগী এই নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকেই আমরা শিখন নাম দিয়ে থাকি।

শিখনের জীবন-ব্যাপকতা

শিখনের সুরু জন্ম থেকে, এমন কি শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানর জন্য গর্ভস্থ শিশুকেও নতুন ও পরিবর্তিত আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। শিখনের স্থায়িত্বও সারা জীবনব্যাপী, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। যতই ক্রমবিবর্তনের উন্নততর ধাপে যাওয়া যাবে ততই শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা দেখা যাবে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রভাব বেশী হলেও শিক্ষা-প্রসূত আচরণেরও দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাব গভীরতম। যে কোন মানুষের দৈনন্দিন আচরণের তালিকাটি পরীক্ষা করলে শিখনের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। এই তালিকা থেকে যদি শিক্ষাজাত আচরণগুলি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় তবে রক্ত সঞ্চালন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, পরিপাচন প্রভৃতি নিছক

মৌলিক শরীরতত্ত্বমূলক আচরণগুলি এবং খাওয়া, ঘুমান, চলাফেরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সাধারণ প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এই জন্য এক কথায় বলা চলে যে শিখন প্রক্রিয়া ও মানব অস্তিত্ব পরস্পর সমব্যাপী।

শিখনের স্বরূপ

শিখন প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমরা কতকগুলি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেই প্রকৃত শিখন সংঘটিত হয়। সেগুলি হল ঃ—

১। আচরণের পরিবর্তন

শিখনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা ব্যক্তি কোন নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করে। যেমন, একটি ছোট ছেলে হঠাৎ গরম দুধের বাটিতে হাত দিতে তার হাতটা পুড়ে গেল এবং সে ব্যথা পেল। পরে দেখা গেল যে সে আর কিছুতেই দুধের বাটিতে হাত দিচ্ছে না। এই যে পুরাতন আচরণের পরিবর্তন এবং তার জায়গায় নতুন আচরণের সম্পাদন একেই শিখন বলা হয়।

২। নূতন অভিজ্ঞতা

আচরণের পরিবর্তন আবার নির্ভরশীল আর একটি বৈশিষ্ট্যের উপর। সেটি হল ব্যক্তির একটি নতুন অভিজ্ঞতা। ব্যক্তির এই পুরাতন আচরণের পরিবর্তে নতুন আচরণ সম্পাদনের পিছনে আছে নতুন একটি অভিজ্ঞতা, যেমন শিশুটির ক্ষেত্রে গরম দুধের বাটিতে হাত দেওয়াটি হল নতুন একটি অভিজ্ঞতা। অতএব শিখনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত আচরণের পরিবর্তন বা নতুন আচরণ সম্পাদনের নামই শিখন।

৩। বিশেষ গতিপথ

শিখনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনঘটিত আচরণের একটি বিশেষ গতিপথ থাকবে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিখন থেকে আচরণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা একটা বিশেষ গতিপথ অনুসরণ করে এবং সেই গতিপথ প্রাণীর মধ্যে সঞ্জাত চাহিদার বা প্রেষণার তৃপ্তি এনে দেয়। যেমন, আদিম মানুষ ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য পশু শিকার, মাছ ধরা, কৃষিকার্য প্রভৃতি একের পর এক নতুন আচরণ শিখেছিল। এই আচরণগুলি এমন একটি নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে এগিয়েছিল যার দ্বারা মানুষের খাদ্য সংগ্রহরূপ চাহিদার তৃপ্তি হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

৪। আচরণের উৎকর্ষসাধন

শিখনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণ শুধু যে বদলে যায় তাই নয়, তার উৎকর্ষসাধনও ঘটে। যখন প্রাণীর বর্তমান আচরণটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে অপর্যাপ্ত বা অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয় তখনই তার সেই পুরাতন আচরণটিকে বাতিল করে উন্নত আচরণ শেখার দরকার হয়। অতএব পুরাতন সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টার উৎকর্ষসাধনকে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বলা চলে। শিখনকে এই দিক দিয়ে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও বলা হয়।

৫। অভ্যাস বা অনুশীলন

শিখনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অভ্যাস বা অনুশীলন থাকবেই। পুরাতন অনুপযোগী আচরণকে বাতিল করে নতুন উপযোগী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস বা বার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়। যেমন সাঁতার কাটা, পড়া তৈরী করা, টাইপ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কাজ বার বার করতে হয়। এদিক দিয়ে শিখনকে 'অভ্যাসের মাধ্যমে আচরণের বা কাজের পরিবর্তন' বলে বর্ণনা করা যায়। শিখনের এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন ম্যাকগেওক।[1] অভ্যাসের সাহায্যে অনুপযোগী, অসংহত, অপ্রয়োজনীয় ও অপটু আচরণকে সুসংহত, উপযোগী ও কার্যকর করে তোলা হয়। অবশ্য এমন কতকগুলি শিখনের ক্ষেত্র দেখা যায় যেখানে অনুশীলন বা অভ্যাসের কোন প্রয়োজন হয় না। যে সব বস্তু আমরা প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শিখি সেগুলি আয়ত্ত করতে অভ্যাস বা অনুশীলন অপরিহার্য। যেমন টাইপ করতে শেখা, সাঁতার কাটতে শেখা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভ্যাস ও অনুশীলন না হলে শিখন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে সব বস্তু আমরা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখি সেগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন অভ্যাস বা অনুশীলনের দরকার হয় না। যেমন, কোন কবিতা বা নিবন্ধের অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অভ্যাস বা অনুশীলন ছাড়াই শিখন সম্ভব হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য শারীরিক স্তরে অনুশীলন না থাকলেও মানসিক স্তরে অনুশীলন থাকতে পারে।

৬। নূতনত্ব

প্রত্যেক শিখনেরই আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল নূতনত্ব। যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির শিখন ঘটে সেটি যেমন প্রকৃতিতে নূতন তেমনই সেই অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণ দেখা দেয় সেটিও পূর্বের আচরণের তুলনায় আংশিক বা পূর্ণভাবে নূতন হয়ে থাকে।

৭। পরিণমন

পরিণমন[2] হল ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফল। শিখন হল ব্যক্তির

1. Learning is modification of behaviour through practice—Mcgeoch
2. Maturation

একটি দেহগত ও মনোগত প্রক্রিয়া। অতএব শিখনের সম্পাদন দেহ ও মন উভয়ের পরিণতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উপযুক্ত পরিণমন না ঘটলে অনেক ক্ষেত্রে শিখন সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন ছবি আঁকতে হলে বা কিছু লিখতে হলে ব্রাশ বা পেন্সিল যেভাবে ধরতে হয় শিশুর আঙ্গুলগুলি এক বৎসর বয়সের আগে সেভাবে পরিণত হয়ে ওঠে না। তেমনই তর্কশাস্ত্র বুঝতে হলে বিচারকরণের শক্তির দরকার। কিন্তু ১০/১১ বৎসর বয়সের আগে শিশুর মধ্যে প্রকৃত বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেয় না।

৮। প্রেষণা

প্রেষণা[1] শিখনের আর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। প্রেষণা হল প্রাণীর অভ্যন্তরীণ স্পৃহা বা চাহিদা। এই স্পৃহা বা চাহিদা থাকলেই তবে শিখন হবে, নতুবা নয়। বিনা প্রেষণায় কোন শিখনই সম্ভব নয়।

৯। সমস্যা

শিখনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রত্যেক শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই একটা সমস্যামূলক পরিস্থিতি অবশ্যই থাকবে এবং সেই সমস্যামূলক পরিস্থিতির চাপেই প্রাণীকে

[শিখনে সমস্যার অপরিহার্যতা]

বর্তমান আচরণের পরিবর্তন করে নতুন আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। সমস্যা হল শিখনের একটা অপরিহার্য সর্ত। বিনা সমস্যায় কোন কিছু শেখার কথা ওঠে না। সমস্যামূলক পরিস্থিতি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে পুরাতন বা অভ্যস্ত আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছন আর সম্ভব হয় না এবং তার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ ও সুষ্ঠু সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। তখন তার পক্ষে সেই পুরাতন আচরণকে বর্জন করে পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ আবিষ্কার ও আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন বা অভ্যস্ত আচরণের দ্বারা সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয় ততক্ষণ কোন সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু যেই সেই আচরণ তার পরিবেশের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে ওঠে তখনই তার পক্ষে নতুন আচরণের আশ্রয় নেওয়ার বা এক কথায় শিখনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সমস্যা যত জটিল হবে তার উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করা ততই দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে। সমস্যা ও তার

1. Motivation

উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করার দুরূহতার মাত্রার বিচার করেই আমরা কোন শিখন প্রক্রিয়াকে সরল বা জটিল বলে বর্ণনা করে থাকি।

শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি সোপান

উপরে বর্ণিত শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আমরা শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি সোপান বা স্তরের উল্লেখ করতে পারি। যথা—

১। সমস্যার প্রত্যক্ষণ।

২। উপযোগী আচরণের আবিষ্করণ।

৩। সেই আচরণের আয়ত্তীকরণ।

ব্যক্তি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই তার শিখনের সূত্রপাত হয়। সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অর্থই হল ব্যক্তির বর্তমান আচরণটি তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিকে তখন তার পুরাতন আচরণের জায়গায় নতুন ও অধিকতর কার্যকর কোন আচরণ সম্পন্ন করতে হবে। অতএব দ্বিতীয় সোপানে ব্যক্তিকে এই নতুন বা পরিবর্তিত আচরণটি খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করলেই শিখন শেষ হয় না। সেই নব আবিষ্কৃত আচরণ ব্যক্তিকে আয়ত্ত করতেও হবে। এইটিই হল শিখনের তৃতীয় সোপান। এই সোপানই অভ্যাস বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। অবশ্য অভ্যাস বা অনুশীলন কতটা প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে শিখনের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির উপর।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্ত্বের দিক দিয়ে শিখনের এই সোপানগুলি অপরিহার্য হলেও এগুলিকে সব সময় পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না। প্রায়ই দেখা যায় যে এই সোপানগুলি পরপর এত দ্রুত সংঘটিত হয়ে যায় যে একটি থেকে আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় না।

শিখন ও পরিণমন

একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে প্রথমেই যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল তার বৃদ্ধি বা বিকাশ। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে শিশু ক্রমশ বাড়ছে। এই বৃদ্ধি বলতে অবশ্য অনেক কিছু বোঝায় যেমন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি, মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি, আচরণের উন্নতি বা বিশেষীভবন, নতুন আচরণ সম্পাদন, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি।

এই বৃদ্ধি বা বিকাশের পিছনে আছে দুটি প্রক্রিয়া :—শিখন[1] ও পরিণমন[2]। উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই শিশুর বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং উভয় প্রক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে কোন কোন মনোবৈজ্ঞানিক দুটিকে অভিন্ন প্রক্রিয়া বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু দুটি প্রক্রিয়ার ফল মূলত এক হলেও দুটির মধ্যে যথেষ্ট প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।

পরিণমন বলতে বোঝায় সেই সব স্বাভাবিক স্বতঃপ্রসূত পরিবর্তন যেগুলি ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলরূপে নিজে নিজে দেখা দেয় এবং যেগুলির জন্য চর্চা, অনুশীলন, শিক্ষাদান ইত্যাদি কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শিখন এই ধরনের কোন অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার ফল থেকে জন্মায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা, অনুশীলন, আয়ত্তীকরণ ইত্যাদি বিশেষ সর্ত বা ঘটনা। যেমন, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হলেও দেখা গেছে যে সকল শিশু একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। এর কারণ হল যে ঐ আচরণটি সম্পন্ন করতে পারার পিছনে আছে বিশেষ বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ যা সকল শিশুর ক্ষেত্রেই একই সময়ে ঘটে থাকে। কিন্তু শিখন নির্ভর করে বিশেষধর্মী প্রচেষ্টা ও পারিবেশিক শক্তিসমূহের প্রকৃতির উপর এবং এগুলি বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন শিশুর শিখনের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক শিখনই বিশেষ একটি অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায় এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য অনুযায়ী শিখনও পৃথক হয়। কিন্তু পরিণমন কোনরূপ অভিজ্ঞতানির্ভর না হওয়াতে এবং পূর্ণভাবে শরীরের অভ্যন্তরীণ বিকাশ থেকে প্রসূত হওয়ার ফলে সকল শিশুর ক্ষেত্রে তা মোটামুটিভাবে একই প্রকৃতির হয়ে থাকে।

যেমন, ১৫ মাসে সাধারণত শিশু একা চলতে পারে। এটি একটি পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল। সেই জন্য সব দেশের ছেলেমেয়েরা—তা তারা যে ধরনের সামাজিক ও শিক্ষামূলক পরিবেশেই মানুষ হোক্ না কোন, ১৫ মাসের সময় একা একা চলতে পারবেই। কিন্তু সাঁতার কাটতে পারা বা গাছে উঠতে পারা বা পড়তে লিখতে পারা ইত্যাদি হল শিখনের উদাহরণ। এই সব আচরণগুলি আয়ত্ত করতে হলে বিশেষ পরিস্থিতি, প্রচেষ্টা, অনুশীলন ইত্যাদির প্রয়োজন এবং ঐ বিশেষ বিশেষ সর্তগুলি উপস্থিত না থাকলে শিশুর পক্ষে এগুলি শেখা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঐ বিশেষ সর্তগুলি উপস্থিত থাকলেও সেগুলির প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। সেইজন্যই এই সব আচরণের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়।

পরিণমন ও বিশেষ শিক্ষণ

পরিণমন ও শিক্ষণের[3] মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বহুবিধ

1. Learning 2. Maturation 3. Training

পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এই পরীক্ষাগুলির মূল উদ্দেশ্য হল, দেখা যে শিক্ষণের দ্বারা পরিণমনের কাজ সম্পন্ন করা কিংবা পরিণমনের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায় কিনা।

হিলগার্ড[1] একদল ছেলেমেয়েকে (পরীক্ষণমূলক দল)[2] বোতাম লাগান, কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটা, সিঁড়িতে চড়া প্রভৃতি কাজগুলি ১২ সপ্তাহ ধরে নিপুণভাবে শেখালেন। আর একটা দলকে (নিয়ন্ত্রিত দল)[3] কোন রকম শিক্ষণই দিলেন না। ১২ সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে পরীক্ষণমূলক দলটি নিয়ন্ত্রিত দলের চেয়ে এই কাজগুলিতে সর্বদিক দিয়ে বেশ উন্নত হয়ে উঠেছে। তারপর ১ সপ্তাহ ধরে নিয়ন্ত্রিত দলকে ঐ কাজগুলি শেখান হল এবং ১ সপ্তাহ শিক্ষণের শেষে দেখা গেল যে নিয়ন্ত্রিত দলটিও ঐ কাজগুলিতে পরীক্ষণমূলক দলটির সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, পরীক্ষণমূলক দলটি ১২ সপ্তাহের বিশেষ শিক্ষণের ফলে যা শিখেছিল নিয়ন্ত্রিত দলটি তা ১ সপ্তাহে শিখে ফেলল। এর কারণ হল যে ঐ কাজগুলি সম্পন্ন করতে যে সব শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজন সেগুলি যখনই স্বাভাবিক পরিণমন প্রক্রিয়ার ফলে দেখা দিল তখনই শিশু স্বাভাবিকভাবেই ঐ আচরণগুলি সম্পন্ন করতে সমর্থ হল। বিশেষভাবে শিক্ষা দিলে কোন শিশু ঐ আচরণগুলি আগে শিখতে পারে বটে, কিন্তু যে শিশু কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা আগে লাভ করেনি সে শিশুও যথাসময়ে পরিণমনের ফলে ঐ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুর সমকক্ষ হয়ে উঠবে। অবশ্য উপরের পরীক্ষণটিতে ব্যবহৃত আচরণগুলি পুরোপুরি পরিণমনজাত নয় বলেই নিয়ন্ত্রিত দলের ক্ষেত্রেও কিছুটা শিখনের প্রয়োজন হয়েছে।

ষ্ট্রেয়ার[4] তাঁর একটি পরীক্ষণে দেখেন যে সমকোষী যমজের একটিকে ৩৫ দিন ধরে শিক্ষা দেওয়ার ফলে যে শব্দমালায় সে উৎকর্ষ লাভ করতে পারল অপরটি মাত্র ২৮ দিনের শিক্ষায় তার সমকক্ষ হয়ে গেল। দুজনে সমকোষী যমজ বলে দুজনেরই শিখনের শক্তি অভিন্ন। অতএব দ্বিতীয় যমজের ক্ষেত্রে শিখনের স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রথম যমজের সমান হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল।

ম্যাকগ্র[5] অনুরূপ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখেছেন যে হামা দেওয়া, চলা, হাত-পা নাড়া প্রভৃতি যে সব প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর নির্ভরশীল সে সব প্রক্রিয়া চর্চা বা অনুশীলনের দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না এবং শিখনের সাহায্য ছাড়াই যথাসময়ে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, সাধারণত ১৫ মাসে ছেলেমেয়েরা চলতে শেখে। এখন ধরা যাক, একটি ১২ মাসের ছেলেকে বিশেষ শিক্ষণের সাহায্যে চলতে শেখান হল। কিন্তু অপর একটি ১২ মাসের ছেলেকে কোনও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হল না। কিন্তু দু'জনেরই যখন ১৫ মাস বয়স হবে তখন দেখা যাবে যে দ্বিতীয় ছেলেটি কোনরূপ শিক্ষণ ছাড়াই প্রথম ছেলেটির মতই চলতে পারছে।

1. Hilgard 2. পৃঃ ২৪ 3. পৃঃ ২৪ 4. Strayer 5. Mcgraw

কিন্তু যে সব আচরণ স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত নয় সে সব আচরণে শিখনের প্রভাব যথেষ্টই থাকে। যেমন সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, লেখা, পড়া নৃত্য করা ইত্যাদি আচরণগুলি সম্পন্ন করা শিখনের উপর নির্ভর করে।

এই সব পরীক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে পরিণমন প্রক্রিয়া শিখন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া এবং শিখনের সাহায্যে পরিণমন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই এবং তার দ্বারা সময় ও শ্রমের অযথা অপব্যয়ই হয়ে থাকে।

আবার অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে শিখন প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কেননা যে আচরণ শিশুকে শেখান হবে তার জন্যে যে সকল শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সহায়তা অপরিহার্য সেগুলি পূর্বে না ঘটে থাকলে শিখন সম্ভবই হতে পারে না। যেমন, সাঁতার কাটা শেখার জন্য বিশেষ কতকগুলি দৈহিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে পারা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না শিশু স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলে এই বিশেষ আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করছে ততক্ষণ তার পক্ষে সাঁতার কাটতে শেখা সম্ভব নয়।

পরিণমন ও বয়স

আবার এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিশুর বয়সের নিকট সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বয়সে শিশুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং তার ফলে শিশু বিশেষ বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। অতএব এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে প্রত্যেকটি আচরণ শেখার বিশেষ বিশেষ সময় বা বয়স আছে।

শিশু যত বড় হয় তত তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি বিকাশলাভ করতে থাকে এবং সে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর আচরণ করতে সমর্থ হয়। এ কথা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার আচরণের ক্ষেত্রেই সত্য। যেমন, শিশুর যত বয়স বাড়ে তত তার বিচারকরণের শক্তিও বাড়তে থাকে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুরা ৮ থেকে ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধে বুঝতে শেখে।

শিশুর শিখনের সাধারণ ক্ষমতাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। সেই জন্য তার বিভিন্ন বয়সের সাধারণ ক্ষমতার মান অনুযায়ী তার পাঠক্রম নির্ধারিত করা উচিত। তা বলে এ কথা ভাবা ভুল যে, শৈশবে শিক্ষাদানের কোন উপযোগিতা নেই। বরং বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে পরবর্তীকালে শিক্ষাদানের চেয়ে প্রথম শৈশবে শিক্ষাদানের ফল অপেক্ষাকৃত অধিক ও স্থায়ী হয়।

পাঠক্রম ও মানসিক বয়স

পাঠক্রমে কোন্ বয়সে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নির্ণয় করা

উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়সের বিচার করে। বিশেষ করে অমূর্ত বিষয় শিখন, সমস্যা সমাধান, প্রতীক ব্যবহার ইত্যাদি আচরণগুলি শেখার উপযোগী সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সময়গত বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স অনেক নির্ভুল মাপকাঠি। একটি পরীক্ষণে ফস্টার[1] বিভিন্ন মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কয়েকটি গল্প পড়ে শোনালেন। গল্পগুলি একবার করে শোনাবার পর দ্বিতীয়বার পড়ার সময় একটি গল্পের এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি তাদের ঐ গল্পটি নিজে থেকে শেষ করতে বললেন। দেখা গেল যে যাদের মানসিক বয়স ৩ বৎসরের কম তারা মোটেই গল্পটি মনে রাখতে পারে নি। আর যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক বয়স ৩ বৎসরের উপর থেকে সুরু করে প্রায় ৬ বৎসর পর্যন্ত তাদের গল্প মনে রাখার ক্ষমতা আছে তবে তা বিভিন্ন মাত্রার।

মরফেট[2] এবং ওয়াসবার্ন[3] পরীক্ষণের সাহায্যে কত মানসিক বয়সে ছেলেমেয়েদের পঠন সুরু করা উচিত তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ৫ থেকে ৮ বৎসরের মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ৬ সপ্তাহ ধরে পঠনের শিক্ষা দেবার পর তাদের পরীক্ষা করে নির্ণয় করেন যে কোন্ বয়সে শতকরা কতজন ছেলেমেয়ে সাফল্যজনকভাবে পঠনে সমর্থ হল। এই পরীক্ষণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ৫ বৎসরের কম মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা পঠনে সমর্থই নয়। আর সাড়ে পাঁচ বৎসর মানসিক বয়সের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে, ৬ বৎসরের মানসিক বয়সসম্পন্নদের ৫০% এবং সাড়ে ছয় বৎসরের ৭০%'রও বেশী ছেলেমেয়ে সাফল্যজনকভাবে পঠনে সমর্থ হয়। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্কুলে পঠন সুরু করার উপযুক্ত মানসিক বয়স হল সাড়ে ছয় বৎসর। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিখনের উপযুক্ত মানসিক বয়সও এইভাবে নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে। এই সব পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে বড় বড় যোগ অঙ্ক কষার সবচেয়ে উপযোগী মানসিক বয়স হল ৮ বৎসর ২ মাস, দশমিকের ভাগ কষার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১৩ বৎসর ৫ মাস, ক্ষেত্রফলের অঙ্ক কষার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১২ বৎসর ৩ মাস, ইত্যাদি।

বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

যদিও অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি বা পরিণমনের কাজ শিখনের উপর নির্ভরশীল নয়, তবু বহু পরীক্ষণ থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণমনের সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করতে পারলে মোটের উপর ফল ভালই হয়ে থাকে। বিশেষ করে এমন অনেক আচরণ আছে যেগুলি যৌথভাবে শিখন ও পরিণমনের উপর নির্ভর করে। সেই সব আচরণ শেখার ক্ষেত্রে যদি পরিণমন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করা যায় তাহলে আচরণটি অনেক দ্রুত ও ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়।

ডুসেনবেরী[4] একটি পরীক্ষণ থেকে দেখতে পান যে ছেলেমেয়েরা কতদূরে একটি

---

1 Foster 2. Morphett 3 Washburne 4. Dussenberry

বল ছুঁড়তে পারে তা নির্ভর করে তাদের বয়স এবং শিক্ষণ উভয়ের উপর। দুটি ৩ থেকে ৭ বৎসর বয়সের ছেলের দলকে বল ছুঁড়তে দিয়ে দেখা হল কত দূরে তারা বলটি ছুঁড়তে পারে। তারপর একটি দলকে (পরীক্ষণমূলক দল) ৩ সপ্তাহ ধরে বল ছোঁড়া শেখানো হল এবং অপর দলটিকে (নিয়ন্ত্রিত দল) কোন শিক্ষণই দেওয়া হল না। তারপর আবার ঐ দুটি দলকেই বল ছুঁড়তে দেওয়া হল এবং দেখা গেল যে শিক্ষণ-প্রাপ্ত দলটি অপর দলের চেয়ে ভালভাবে বল ছুঁড়তে পারছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে বল ছোঁড়া কাজটি পরিণমনের উপর নির্ভরশীল হলেও উপযুক্ত শিক্ষণ তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারে। হিক্‌স[1] অনুরূপ একটি পরীক্ষণ থেকে এই একই ধরনের সিদ্ধান্তে আসেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণমনের গুরুত্ব অনেকখানি। শিশুর শিক্ষা এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যে তার পরিণমনজনিত বৃদ্ধির সঙ্গে যেন তার শিক্ষার পূর্ণ সংহতি থাকে। শিখন প্রক্রিয়া শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। অতএব যদি শিশুকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যা তার পরিণমন বা স্বাভাবিক বৃদ্ধির আয়ত্তের বাইরে তবে সে শিক্ষা যে কেবলমাত্র ব্যর্থই হবে তাই নয় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হবে।

শিখন ও প্রেষণা

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। বিনা প্রেষণায় কোন শিখন হতে পারে না। ছোটই হোক্‌ আর বড়ই হোক্‌ সব শিখনই জন্মায় প্রাণীর প্রচেষ্টা থেকে, আর প্রচেষ্টামাত্রেই সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় একটা অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যম। এই অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যমকে আমরা প্রেষণা নাম দিতে পারি। প্রেষণা কোন বাইরের বস্তু নয় যা শিক্ষার্থীকে শিখতে বাধ্য করার জন্য তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রেষণা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বস্তু এবং শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য উপকরণ।

প্রেষণাকে আমরা ব্যক্তির একটি বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে বর্ণনা করতে পারি। প্রেষণা দুশ্রেণীর হতে পারে—মানসিক ও শরীরতত্ত্বমূলক। ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থাটি যখন দেখা দেয় তখন তার মধ্যে একটি উত্তেজনা জাগে এবং যতক্ষণ না তার সেই উত্তেজনা দূর হয় ততক্ষণই সেই উত্তেজনা ব্যক্তিকে বিশেষ পথে নিয়ে যায় এবং বিশেষভাবে আচরণ করতে তাকে বাধ্য করে। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে সব দিক দিয়ে একটা শান্ত সমতাপূর্ণ অবস্থা থাকে। তাকে সাম্যাবস্থা[2] বলা হয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রেষণা জাগে তখন তার এই অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে দেখা দেয় একটি অস্বস্তিকর ও উত্তেজনাকর অবস্থা। ব্যক্তি তখন প্রেষণার তৃপ্তির দ্বারা তার সেই লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে

1. Hicks 2. Homoeostasis

চেষ্টা করে। ম্যাকগেওকের ভাষায় প্রেষণা হল ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা যা বিশেষ একটি কাজের অনুশীলনের দিকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে বা তাকে কাজটির সঙ্গে পরিচিত করে এবং যা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের পর্যাপ্ততার এবং কাজটির সম্পাদনের একটা সংজ্ঞাদান করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির সমস্ত আচরণের পেছনেই অপরিহার্যভাবে আছে এই প্রেষণার ভূমিকা।

শিখন ও উদ্‌বোধক

কেবলমাত্র প্রেষণা থাকলেই আবার শিখন হয় না। প্রেষণার সঙ্গে আর একটি বস্তুর থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেটি হল উদ্‌বোধক। উদ্‌বোধক হল সেই বস্তু বা অবস্থা যা পেলে বা যেখানে পৌঁছতে পারলে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন, ক্ষুধা হল প্রেষণা, খাদ্যবস্তু হল উদ্‌বোধক। খাদ্য পেলে ক্ষুধারূপ প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বস্তু যখন একসঙ্গে মিলিত হয় তখনই শিখন ঘটতে পারে, নইলে নয়। এইজন্য বলা হয় যে শিখন সম্ভব হয় একমাত্র প্রেষণা-উদ্‌বোধকের মিলিত পরিস্থিতিতেই।

অভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক

শিখনের বিষয়বস্তু যখন শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় তখন শিক্ষার্থী সেটি শেখার জন্য স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে। সেই বস্তুটি শেখার জন্য সে নিজে থেকেই প্রচেষ্টা করে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সেটি শেখে। এ ক্ষেত্রে কোন বাহ্যিক বস্তুর সাহায্যে তার মধ্যে প্রেষণা জাগানোর প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এখানে শিক্ষণীয় বস্তুটি নিজেই শিক্ষার্থীর কাছে উদ্‌বোধক রূপে কাজ করে। একেই বলে অভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক[1]।

অভ্যন্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বস্তুটিই হল একমাত্র উদ্‌বোধক এবং শিক্ষণীয় বস্তুটির জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাও স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে।

বাহ্যিক উদ্‌বোধক

কিন্তু নানা কারণেই দেখা যায় যে প্রায়ই শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ প্রেষণার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ তখন সে শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার জন্য কোন স্বাভাবিক চাহিদা বোধ করে না। ফলে তাকে শিক্ষাদানের জন্য নানারূপ বাহ্যিক উদ্‌বোধকের[2] সাহায্য নিতে হয়। প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত এই ধরনের কয়েকটি বাহ্যিক উদ্‌বোধকের বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

---

1. Intrinsic Incentive 2. External Incentive

নিন্দা ও প্রশংসা ঃ এই বাহ্যিক উদ্‌বোধক দুটির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিখতে প্ররোচিত করার পন্থা অতি প্রাচীন ও সর্বদেশেই প্রচলিত। শিক্ষক ও অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রশংসা পাওয়া ও তাঁদের নিন্দা এড়ানোর জন্য শিক্ষার্থী নিজে ইচ্ছা অনুভব না করলেও চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

শাস্তি ও পুরস্কার ঃ এই উদ্‌বোধক দুটি নিন্দা ও প্রশংসারই মূর্তরূপ। এদের ব্যবহারও বহু প্রাচীন ও সর্বজনীন। তবে আধুনিক ব্যাপক গবেষণায় দেখা গেছে যে শাস্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্যকর।

প্রতিযোগিতা ঃ অন্যান্য সঙ্গীদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার স্পৃহা শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণা সৃষ্টি করে এবং বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিযোগিতার চাপে শিক্ষার্থী নতুন কিছু শিখতে অনুপ্রাণিত হয়। এই উদ্‌বোধকটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিংসা, রাগ, ঘৃণা প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে।

সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতা ঃ নিজের সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতাও অনেক ক্ষেত্রে শিখনের উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে থাকে। বহু গবেষণা থেকেও দেখা যায় যে শিক্ষার্থী যতই নিজের সাফল্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ততই তার শিক্ষায় আগ্রহ বেড়ে যায়।

এ ছাড়া সামাজিক সমর্থন, আত্মস্বীকৃতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লাভের চাহিদা, নতুন কিছু সৃষ্টি করার আগ্রহ, জয় করার স্পৃহা এমন কি যৌন বা বাৎসল্যের অনুভূতিও অনেক সময় শিখনের উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে থাকে।

অসংখ্য গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বাহ্যিক প্রেষণা সকল সময় কার্যকর হয় না এবং তা থেকে প্রসূত শিক্ষা প্রায়ই যান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। বিশেষ করে নিন্দা-প্রশংসা, শাস্তি-পুরস্কার, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলি সন্তোষজনক শিখনের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। একমাত্র অভ্যন্তরীণ প্রেষণাই অর্থাৎ শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে পারে। এইজন্যই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় সকল প্রকার বাহ্যিক উদ্‌বোধককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেষণার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শিক্ষায় প্রেষণার ত্রিবিধ কাজ

শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

১। প্রেষণা আচরণের পিছনে উদ্যম বা শক্তি যোগায়।

২। প্রেষণা ব্যক্তির আচরণ প্রবণতার নির্বাচন বা নির্ধারণ করে।

৩। প্রেষণা ব্যক্তির আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে।

প্রত্যেক আচরণের সম্পাদনেই প্রয়োজন উদ্যম বা শক্তি। প্রেষণার প্রথম কাজ হল ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ উদ্যমকে জাগান এবং পরিবেশের উপযোগী আচরণ সৃষ্টি করা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জৈবিক প্রেষণা শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিকে সক্রিয় করে তোলে এবং ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আচরণটি সম্পন্ন করতে প্রবৃদ্ধ করে।

বিভিন্ন বাহ্যিক উদ্দীপক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে এবং তার অভ্যন্তরস্থ প্রেষণার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করে এবং তার কাজের প্রকৃতি নির্ধারিত করে। বিশেষ করে প্রশংসা, নিন্দা, ভৎর্সনা, পুরস্কার, শাস্তি, অর্থ, খাদ্য ইত্যাদি হল এমন কয়েকটি উদ্‌বোধক যা সব সমাজে ব্যবহৃত হয় ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা উদ্বুদ্ধ করার জন্য। অবশ্য ব্যক্তি কতটা এই সব উদ্‌বোধকের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, বিচারকরণ, প্রত্যাশা, অনুমান প্রভৃতির উপর।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই উদ্যম সৃষ্টি করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। শিক্ষার স্বাভাবিক প্রেষণার অভাব দেখলে প্রায়ই পুরস্কার, শাস্তি, প্রশংসা, নিন্দা ইত্যাদি নানা শক্তিশালী উদ্‌বোধকের সাহায্য নেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষানীতি। এই সব উদ্‌বোধক দ্বারা সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্যম সৃষ্টি করা গেলেও সে উদ্যম কখনও স্থায়ী হয় না। কিন্তু অপরপক্ষে যদি শিক্ষণীয় বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর কাছে সত্যকারের আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে সেই বস্তুটিই তার কাছে উদ্‌বোধকরূপে কাজ করবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থায়ী প্রেষণা সৃষ্টি করবে। শিক্ষণীয় বস্তুটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার পন্থা হল বস্তুটির অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যাতে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত স্কুলে পরীক্ষায় পাশ মার্ক পাওয়া, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি উন্নত স্থান অধিকার করা, পুরস্কার, বৃত্তি পাওয়া প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এগুলি দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচেষ্টার সৃষ্টি করা যায় বটে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বস্তুটি বা কাজটি যদি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় বা সার্থকতাসম্পন্ন বলে মনে না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সে শিক্ষা সত্যকারের কার্যকর হয় না। গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামনে প্রকৃত লক্ষ্যটি (অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তু বা কাজটি) উপস্থাপিত না করে পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পাওয়া, শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকার করা, পুরস্কার পাওয়া ইত্যাদি নানা কৃত্রিম লক্ষ্য স্থাপন করা হয় এবং তার ফলে সে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা যান্ত্রিক ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রেষণার দ্বিতীয় কাজ হল আমাদের আচরণ প্রবণতার নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রেষণাই আমাদের নির্দেশ দেয় যে কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া দেব আর কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া দেব না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত তাও নির্ধারিত করে দেয় আমাদের প্রেষণা। এর অর্থ হল যে যখনই আমাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রেষণার সৃষ্টি হয় তখনই কেবল যে আমরা অভ্যন্তরীণ উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির চাপে সক্রিয় হয়ে উঠি তাই নয়, আমরা যে সব কাজ সে সময় সম্পন্ন করি সেগুলিও আমাদের কাছে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। আমাদের কর্মপ্রবণতার এই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে আছে আমাদের এ বিশেষ প্রেষণাটি।

মানব আচরণের প্রকৃতি হল নির্বাচনধর্মী। অর্থাৎ আমরা যে সব আচরণ করি সেগুলি আগে থেকেই সুনির্বাচিত থাকে। বিভিন্ন লোক যখন একই খবরের কাগজ পড়ে তখন তারা প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে কাগজের বিভিন্ন অংশ পড়ে। বিভিন্ন লোক যখন একটা সিনেমার ছবি দেখে বা একটি দৃশ্য উপভোগ করে তখন তারা ছবিটি বা দৃশ্যটির বিভিন্ন অংশ বা দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই নির্বাচনমূলক আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতার পেছনে আছে আমাদের প্রত্যেকের প্রেষণার বিভিন্নতা।

অতএব যখন ক্লাসে শিক্ষক সব ছেলেকে একটি পড়া দেখিয়ে বলেন যে এটা পড় তখন তার এই নির্দেশটি স্পষ্টই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা এই ধরনের নির্দেশের ফলে এবং প্রেষণার বৈষম্যের জন্য পাঠ্যবিষয়টির বিভিন্ন অংশের প্রতি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ যাবে এবং যদি শিক্ষক পরিষ্কারভাবে পঠনীয় বস্তুটিকে সুনির্দিষ্ট করে না দেন তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন বস্তু শিখবে এবং তার ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

প্রেষণার এই আচরণ নির্বাচনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অতীত শিখনের উপর। ছোট ছেলে ক্ষুধার্ত হলে বাড়ীর যেখানে খাবার থাকে সে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তার কারণ হল যে সে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছে যে ঐ বিশেষ জায়গায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে।

প্রেষণামূলক নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী তার চাহিদার তৃপ্তির জন্য নানা বিভিন্ন প্রকারের আচরণ করে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যে আচরণের ফলে তার চাহিদাটির তৃপ্তি হয় সেই আচরণটাই সে গ্রহণ করে, বাকী আচরণগুলি সে পরিত্যাগ করে।

প্রেষণার তৃতীয় কাজ হল ব্যক্তির আচরণকে বিশেষ পথে পরিচালিত করা। কোন বিশেষ লক্ষ্যে পেঁছিতে হলে কেবলমাত্র আচরণ সম্পন্ন করলেই হবে না, সেই আচরণকে এমন পথে নিয়ে যেতে হবে যাতে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পেঁছান যায় এবং তা থেকে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন কোন ব্যক্তির মধ্যে তৃষ্ণা জাগার ফলে সক্রিয়তা দেখা দিল এবং সে জন্য সে আচরণ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু তার পক্ষে অনির্দিষ্ট ব

অপরিকল্পিত আচরণ করলেই চলবে না। তার আচরণ যদি জলের দিকে যথাযথ পরিচালিত না হয় তাহলে তার তৃষ্ণা কখনই মিটবে না। সে জন্য ব্যক্তির চাহিদার বাঞ্ছিত তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্যের অভিমুখী আচরণ সম্পন্ন করতে শেখা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এ তথ্যটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন তার লক্ষ্যটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে। লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ ও স্পষ্ট ধারণা থাকলেই শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় আচরণ সম্পন্ন করে সে সময় ও শ্রমের অপব্যয় করবে না।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে যা শেখান হয় তার লক্ষ্য সম্বন্ধে তার মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। যেমন, নামতা মুখস্থ করান, শব্দরূপ, ধাতুরূপ মুখস্থ করান, বানান শেখান, ব্যাকরণের নিয়মকানুন আয়ত্ত করান, বিভিন্ন গাণিতিক ফরমুলো মুখস্থ করান ইত্যাদি প্রচলিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগুলি তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে এতই সুদূর ও সম্পর্কহীন যে শিক্ষার্থীরা এগুলি শেখার প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণাই করতে পারে না। তার ফলে তারা এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে যন্ত্রের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে। শিক্ষার্থীকে যখন কোন বিশেষ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয় বা কোন গদ্যাংশের সারমর্ম লিখতে বলা হয় তখনও শিক্ষার্থীর কাছে এই কাজগুলির প্রকৃত লক্ষ্য কি তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় না। আবার অনেক সময় শিক্ষাপ্রক্রিয়াগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব লক্ষ্যের কথা বলা হয় যেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে নিতান্তই অস্পষ্ট, অবাস্তব এবং তার বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট ও পূর্ণ না হওয়ার ফলে তার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলি অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এই ত্রুটি দূর করতে হলে যখনই শিক্ষাকে কোনরূপ প্রচেষ্টা বা কাজ সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হবে তখনই তার প্রকৃত লক্ষ্যটি কি সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে সাহায্য করতে হবে। এই কারণেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে কোন অর্থহীন ও বিচ্ছিন্ন আচরণ করতে না দিয়ে সমগ্র কাজটিই তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় যাতে সে তার সমস্ত প্রচেষ্টারই প্রকৃত লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ ও পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে।

কেবলমাত্র লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরী হলেই হবে না। শিক্ষার্থী যাতে সেই লক্ষ্যের উপযোগী আচরণ করতে পারে সেটা দেখাও সমানভাবে প্রয়োজন। অনেক সময় এমন হয় যে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও কোন্ আচরণের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পেঁছান যায় সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না এবং তার ফলে সে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো আচরণ করে চলে। এই জন্য শিক্ষকের কর্তব্য হল

বিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থী যাতে সর্বাপেক্ষা কার্যকর আচরণটি বেছে নিতে পারে সে সম্বন্ধে তাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া। ডিউইর মতে যাতে শিশুর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সে দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষকের প্রধানতম কর্তব্য।

বিদ্যালয়ে প্রেষণা ও উদ্‌বোধকের স্থান

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের পেছনে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব দেখা যায়। এই বিভিন্ন প্রেষণাগুলির কিছু সহজাত, কিছু অর্জিত। শিশু যখন জন্মায় তখন সে কতকগুলি জৈবিক চাহিদা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু যত সে বড় হতে থাকে তত তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা দেখা দেয়। যেমন, আত্ম অভিব্যক্তির চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, ব্যক্তিগত আগ্রহ, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ, আদর্শবোধ ইত্যাদি। এইগুলিই তার সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রাথমিক বা মৌলিক প্রেষণাগুলি থেকে কালক্রমে নানা বিশেষধর্মী প্রেষণা ও উদ্‌বোধক শিশুর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এই ধরনের অসংখ্য প্রেষণা ও উদ্‌বোধক। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রচেষ্টাকে প্রধানত নিম্নলিখিত প্রেষণা ও উদ্‌বোধকগুলি প্রভাবিত করে থাকে।

(ক) জ্ঞান, উপলব্ধি ও কৌশল আহরণ করে নিজের আগ্রহের তৃপ্তিসাধন করার ইচ্ছা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী প্রেষণা রূপে কাজ করে। এই জন্যই শিশু আর সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে বা নিজে থেকেই পড়াশোনা করে বা কোন শিল্প বা চারুকলার মধ্যে দিয়ে নিজের সৃজনীশক্তি প্রকাশ করে।

(খ) অতীত শিখনকে নিজের আগ্রহতৃপ্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাস্তবে প্রয়োগ করা শিক্ষার্থীর মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেষণা। যেমন, কোন শিশু লিখতে শিখে তার বন্ধুকে একটি চিঠি লিখল বা নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা গবেষণার উপর কোন ব্যক্তি কোন প্রবন্ধ লিখল।

(গ) কোন দুরূহ কাজ আয়ত্ত করা বা কোন শক্ত সমস্যা সমাধান করার ইচ্ছাও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক শক্তিশালী প্রেষণা। এই প্রেষণায় প্রবুদ্ধ হয়েই শিক্ষার্থীরা কঠিন বিষয়বস্তু বুঝতে চেষ্টা করে, গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে বা কোন শক্ত কাজ বা প্রকল্প শেষ করে। শিক্ষার্থীর এই প্রেষণাকে শিক্ষকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। তবে তাঁদের একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে শিক্ষার্থীকে যে সকল কাজ করতে দেওয়া হবে সেগুলি যেন তার শক্তি ও সামর্থ্যের উপযোগী হয়।

(ঘ) শিক্ষাথী যে জ্ঞান ও কৌশল আহরণের দিক দিয়ে প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে এই সচেতনতাও শিক্ষাথীর মধ্যে একটা প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে। যদি শিশু বোঝে যে পড়ায় বা হাতের লেখায় বা কোন শিল্পকাজে সে উন্নতি করে চলেছে তাহলে স্বভাবতই তার সেই কাজে সে উৎসাহ পাবে এবং আরও বেশী করে সে চেষ্টা করবে।

(ঙ) শিক্ষাথী যে তার নিজের অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও শক্তির বৃদ্ধির দ্বারা নিজেকে আরও ভালভাবে অভিব্যক্ত করতে পারছে এবং সেই সঙ্গে সমাজেরও উপকার করছে এই অনুভূতি শিক্ষাথীর মধ্যে নতুন করে প্রেষণার সৃষ্টি করে। এই ধরণের প্রেষণা বিশেষভাবে দেখা দেয় যখন শিক্ষাথী কোন বিশেষধর্মী কাজে পারদর্শিতা লাভ করে।

(চ) কৌতূহল এবং তার চারপাশের পৃথিবীকে জানার আকাংখাও শিক্ষাথীদের মধ্যে একটা প্রবল প্রেষণা রূপে কাজ করে। এই প্রেষণার পরিতৃপ্তি হয় বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে এবং নানা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে।

(ছ) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাথী যাঁকে ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে তাঁর সঙ্গে নিজের অভেদীকরণ[1], নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বোধ ইত্যাদিও শিক্ষাথীর মধ্যে প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে।

(জ) সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির প্রশংসা ও অনুমোদন পাবার ইচ্ছাও একটি শক্তিশালী প্রেষণা।

(ঝ) তেমনই সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির নিন্দা ও সমালোচনা এড়াবার ইচ্ছা আর একটি শক্তিশালী প্রেষণা।

(ঞ) ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ইচ্ছা শিক্ষাথীদের মধ্যে প্রবল প্রেষণারূপে কাজ করে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে নানা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পুরস্কারের প্রলোভনের দ্বারা প্রেষণাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

(ট) দলগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার আকাংখাও বহুক্ষেত্রে সমান কার্যকর প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে।

(ঠ) বিদ্যালয়ে নিজের স্থান, সাফল্য ও প্রাপ্য সমাদর শিক্ষাথীর মধ্যে একটা নিরাপত্তার অনুভূতি এনে দেয় এবং তার সকল প্রচেষ্টার পিছনে এই অনুভূতি প্রেষণা জুগিয়ে থাকে।

(ড) তেমনই আবার যদি বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে শিক্ষকের দৃষ্টিতে শিক্ষাথী তার নিজের স্থান বজায় রাখতে না পারে তবে সে তার এই নিরাপত্তার বোধ হারাবে। এই নিরাপত্তার বোধ হারাবার ভয়ই শিক্ষাথীকে নিন্দনীয় এবং অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

---

1. Identification

(চ) প্রচলিত বিদ্যালয়ে শাস্তিদানও একটি শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে। শারীরিক শাস্তি থেকে সুরু করে ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া, ভৎর্সনা, বিদ্রূপ, সমালোচনা ইত্যাদি নানা মনোবৈজ্ঞানিক শাস্তিও শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

উপরে যে প্রেষণাগুলির বর্ণনা দেওয়া হল সেগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই বিশেষ করে দেখা যায়। প্রেষণাগুলির প্রকৃতি দেখলেই বোঝা যাবে যে বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি থেকেই এই প্রেষণাগুলির উদ্ভব হয় এবং শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে এই প্রেষণাগুলিই।

প্রেষণা ও শিক্ষকের কর্তব্য

অতএব সুশিক্ষকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল এই প্রেষণাগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত কর্মপ্রচেষ্টা সৃষ্টি করা। এমন কতকগুলি প্রেষণা আছে যেগুলিকে অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষার্থীর মানসিক সাম্য বা ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন, বিদ্যালয়ে তার নিজস্ব স্থান বা সহপাঠীদের কাছে মর্যাদা বা শিক্ষকদের সমাদর হারাবার ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে তার সাধ্যমত প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এই সব ভয় যদি অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষার্থীর মনে জাগান যায় তাহলে দুশ্চিন্তা, দুর্বলতা, দ্বিধা, সন্দেহ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কর্ম প্রচেষ্টা ও মানসিক সাম্য বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে যে সব শিক্ষার্থী নিজেদের সামর্থ্যে পূর্ণ বিশ্বাসী নয় তাদের মধ্যে এই ধরনের ভয় থেকে নিম্নতাবোধ ও আত্মগ্লানি দেখা দেয়। কিন্তু অপরপক্ষে যদি শিশুর নিরাপত্তার অনুভূতিকে সযত্নে উদ্বুদ্ধ করা যায় অর্থাৎ যদি শিক্ষকদের স্নেহ, সহপাঠীদের সমর্থন, স্কুলে তার নিজস্ব অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে তার সচেতনতা এবং আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যায় তাহলে একদিক দিয়ে যেমন তাকে প্রচেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে তেমনই তার মধ্যে মানসিক পরিতৃপ্তিও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। পুরস্কার ও শাস্তি এবং সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

শিখনের শ্রেণীবিভাগ : জ্ঞান ও কৌশল

আমাদের শিখনের বিষয়বস্তুকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করতে পারা যায়, যথা, জ্ঞান[1] এবং কৌশল[2]। জ্ঞান বলতে সেই সব বিষয়বস্তুকে বোঝায় যেগুলি শিখতে প্রধানত মানসিক শক্তিরই প্রয়োজন হয়, দৈহিক শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প বা প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। যেমন, কোন ভাব বা ধারণা,[3] চিন্তা[4] বা তথ্য[5] শেখার সময় আমাদের প্রধানত উপলব্ধি বা বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয়। দৈহিক

1. Knowledge 2. Skill 3. Idea 4. Thought 5. Fact

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার সেখানে নামমাত্র। কোন কবিতা পড়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, কোন গদ্যের সারাংশ লেখা, কোন তত্ত্বের অর্থ বোঝা বা কোন ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা—এ সবই জ্ঞানমূলক শিখনের পর্যায়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে চোখ, মুখ, কান ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্য প্রয়োজন হলেও শিখন কাজটির অধিকাংশই আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। এইজন্য এই শ্রেণীর কাজগুলিকে কেন্দ্রীয় আচরণ[1] বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তেমনই শিকার করা, কাপড় বোনা, ঘর তৈরী করা, দৌড়ান, সাঁতার কাটা, ক্রিকেট খেলা, টাইপ করা ইত্যাদি অসংখ্য কাজের নাম করা যায় যেগুলির শেখা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের উপরই বিশেষ করে নির্ভর করে এবং যেগুলিতে কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত অল্প বললেই চলে। এই কাজগুলি স্নায়ুতন্ত্রের প্রান্তস্থিত বিভিন্ন অংশ-গুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে এগুলিকে সাধারণত আমরা প্রান্তীয় আচরণ[2] বলে বর্ণনা করে থাকি।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে এমন কোন কাজ নেই যা পুরোপুরি মানসিক বা পুরোপুরি দৈহিক। সব কাজ সম্পন্ন করতেই আমাদের দেহ মন দু'য়েরই সাহায্য লাগে, তবে কোনটিতে হয়ত দৈহিক সক্রিয়তার পরিমাণ বেশী, আর কোনটিতে মানসিক সক্রিয়তা বেশী পরিমাণে থাকে।

এখন শিখন বলতে বোঝায় আমাদের আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন। জ্ঞানমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক বা কৌশলমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক যখনই আমাদের বর্তমান আচরণের স্থানে আমরা নতুন কোন আচরণ সম্পন্ন করি তখনই তাকে শিখন বলা হয়। অতএব সে দিক দিয়ে জ্ঞানমূলক শিখন এবং কৌশল-মূলক শিখন উভয়ের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই।

তবে দু'ধরনের শিখনের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। জ্ঞানমূলক কিছু শিখনের সময় বিষয়বস্তুটির অন্তর্নিহিত অর্থ ও তার বিভিন্ন অংশগুলির সম্পর্ক উপলব্ধি করাটাই প্রধানতম কাজ এবং ফলে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই এ ধরনের শিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে। অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগের সময় আমাদের দুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়—পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ। জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নিয়ে সেগুলি থেকে সামান্য সত্য বা সূত্র গঠন করাই হল এই ধরনের বিষয়বস্তু শেখার প্রকৃত পদ্ধতি।

তেমনই কৌশলমূলক শিখনের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগের অবকাশ অল্প। সেখানে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন আনাটাই শিখনের মূল কাজ। সেইজন্য কৌশল শিখনের সময় আমাদের প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির[3] উপরই

1. Central Activity 2, Peripheral Activity 3. Trial-and-error Method

বিশেষ নির্ভর করতে হয়। যেমন, সাঁতার কাটা, মোটর চালান, টাইপ করা ইত্যাদি ধরনের কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে গেলে বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে আমাদের এগোতে হয়।

তবে কৌশল শেখার সময় অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ যে একেবারেই নেই তা মনে করা ভুল। নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের কৌশল ছাড়া আর সকল প্রকার কৌশলের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা কৌশলটি ভালভাবে আয়ত্ত করার পক্ষে অপরিহার্য। সেই জন্য জটিল ও উন্নত স্তরের কৌশল শেখার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির সংমিশ্রণ দ্রুত ও সার্থক শিখন এনে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করার মত মানসিক শক্তি পরিণত নয় তাদের সমস্ত কৌশলই নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে শিখতে হয় এবং তার ফলে দীর্ঘ সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রয়োজন হয়।

জ্ঞানমূলক বিষয় শেখার সময়ও মাঝে মাঝে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যেখানে বিষয়বস্তুটি পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা যায় না বা যেখানে বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি কোন গঠনমূলক অসম্পূর্ণতার জন্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না, সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি। যারা প্রয়োজনীয় মাত্রায় বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু আহরণ করতে পারে না। আর যে সব ক্ষেত্রে তারা পারে সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্যেই সে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এ ধরনের জ্ঞান ভবিষ্যতে যান্ত্রিক, নিরর্থক ও উপযোগিতাহীন হয়ে দাঁড়ায়।

তা ছাড়া জ্ঞান ও কৌশলের শিখনের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অনুশীলনের বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। কেননা সমস্ত কৌশলই ব্যক্তিকে কোন না কোন প্রকারের দৈহিক আচরণের সাহায্যে আয়ত্ত করতে হয় এবং বার বার চর্চা বা অনুশীলন ছাড়া দৈহিক আচরণ স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করা যায় না। জ্ঞানমূলক শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কম। অবশ্য যে সব জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুতে তথ্যের পরিমাণ বেশী সেখানে বার বার অনুশীলন বা চর্চা অপরিহার্য।

তথ্য আহরণের জন্য জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু শেখানোর সময় শিক্ষকদের দেখা উচিত যে শিক্ষার্থী যেন তার অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগের দ্বারাই বস্তুটি শেখার চেষ্টা করে, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির প্রয়োগ করে যেন অযথা সময় ও শ্রমের অপব্যয় না করে। অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার্থীকে পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ এ'দুটি মানসিক

প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভাল করে অবহিত হতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সুপরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন।

তেমনই কৌশল শেখার সময়ও নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজন মত অন্তদৃষ্টির প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য ও পরিচালনা করাও শিক্ষকের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষা

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে শিখনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিশুর শিক্ষা শিখন-প্রক্রিয়ার উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিখন প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান সর্বাগ্রে করতে হবে। বস্তুত এই কারণেই শিখন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি বৃহৎ অংশ গড়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

১। শিখনের স্বরূপ বর্ণনা কর। শিখনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। পরিণমন বলতে কি বোঝ? শিখন ও পরিণমনের মধ্যে সম্পর্কটি বর্ণনা কর।

৩। শিশুর শিক্ষায় শিখন ও পরিণমন পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করে—আলোচনা কর।

৪। শিখন হল প্রেষণা-উদ্‌বোধকের মিলিত পরিস্থিতির ফল—আলোচনা কর।

৫। প্রেষণা কাকে বলে? শিখনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কি? প্রেষণার মুখ্য কাজগুলি আলোচনা কর।

৬। বিদ্যালয়ে সাধারণত কোন ধরনের প্রেষণা ব্যবহৃত হয়? শিশু ও বিদ্যালয়ের উন্নতিতে এগুলি কি ভাবে কাজে লাগানো যায় বল।

৭। উদ্‌বোধক কাকে বলে? প্রেষণার সঙ্গে উদ্‌বোধকের কি সম্পর্ক? উদ্‌বোধক কত প্রকারের হয় বর্ণনা দাও।

৮। শিখনের বিষয় রূপে জ্ঞান ও কৌশলের পার্থক্য বল। কিভাবে এগুলি শেখা যায়?

৯। টীকা লেখ:—

(ক) উদ্‌বোধক

(খ) শিখনের সোপান

(গ) পাঠক্রম ও মানসিক বয়স

বাইশ

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব

শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদের বিশেষ অবকাশ না থাকলেও শিখন-প্রক্রিয়াটি কি ভাবে সম্পন্ন হয় এ সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ পাওয়া যায়। এই পুস্তকে আমরা শিখনের প্রধান তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রথমে চারটি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরও চারটি তত্ত্বের আলোচনা করব।

অনুষঙ্গবাদ ও গেষ্টাল্টবাদ

মনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত থেকে যে বিশেষ মতবাদটি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও প্রক্রিয়ার সংব্যাখ্যান ও সূত্রগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে সেটি অনুষঙ্গবাদ[1] নামে পরিচিত। পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর একটি বড় অংশ এই অনুষঙ্গবাদ মনোবিজ্ঞানের উপর একপ্রকার একাধিপত্য করে এসেছে বলা চলে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই অনুষঙ্গবাদের সম্পূর্ণ একটি বিপরীত মতবাদ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদটিকে গেষ্টাল্ট মতবাদ নাম দেওয়া হয়ে থাকে। মৌলিক নীতির দিক দিয়ে অনুষঙ্গবাদ ও গেষ্টাল্ট মতবাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। অনুষঙ্গবাদের মতে আমরা শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্দীপককে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই। গেষ্টাল্ট মতবাদের ব্যাখ্যায় শিখনের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিকে আমাদের সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে সাড়া দিই, বিচ্ছিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই না। শিখনের প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে এই পর্যায়ে আমরা চারটি প্রধান তত্ত্বে আলোচনা করব। সেগুলি হল—

১। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ[2]

২। গেষ্টাল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন[3]

৩। প্যাভলভের অনুবর্তনবাদ[4]

৪। শিখনের 'ফিল্ড মতবাদ'[5]

এই চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি অনুষঙ্গবাদের উপর ভিত্তি করে গঠিত। প্রথম মতবাদটি সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন অনুষঙ্গবাদের মৌলিক নীতির অনুসরণে পরিকল্পিত। তৃতীয়টিও যে অনুষঙ্গবাদভিত্তিক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তবে

---

1. Associationism. 2. Thorndike's Connectionism 3. Insightful Learning Theory of the Gestalists. 4. Pavlov's Theory of Conditioning 5. Field Theory of Learning.

এই মতবাদে যান্ত্রিক অনুষঙ্গের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ তত্ত্ব দুটি আবার সম্পূর্ণভাবে গেষ্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়ক্ষেত্রেই গেষ্টাল্টবাদের মৌলিক নীতিটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে চতুর্থ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং পুরাতন গেষ্টাল্টতত্ত্বের উন্নত রূপ বিশেষ এই চারটি শিখনের তত্ত্ব নীচে বর্ণনা করা হল।

১। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ[1]

থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনই হল শিখন। যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক। আর কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তরে আমরা যে সাড়া দিই তাই হল প্রতিক্রিয়া। থর্নডাইকের ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তার উত্তরে দেওয়া সাড়া বা প্রতিক্রিয়া—এই দুটির মধ্যে যখন নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয় তখনই শিখন হয়। যেমন, মনে করা যাক, আমার সামনে একটি বোর্ডে ৪টি সুইচ আছে। আর আছে একটা আলো। বলা হল যে ঐ ৪টি সুইচের মধ্যে বিশেষ একটি সুইচ টিপলে আলোটি জ্বলে উঠবে। আমি প্রথম সুইচটি টিপলাম আলো জ্বলল না। দ্বিতীয়টি টিপলাম, তখনও জ্বলল না। কিন্তু যেই তৃতীয়টি টিপলাম আলোটি জ্বলে উঠল। এবার আমি জানলাম তৃতীয় সুইচটি টিপলে আলোটি জ্বলে। অর্থাৎ আমি শিখলাম কিভাবে আলোটি জ্বালাতে হয়। এটি একটি শিখনের সরলতম দৃষ্টান্ত। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিখন হল না, কেননা সেখানে উদ্দীপকের (আলো) সঙ্গে নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার (তৃতীয় সুইচটি টেপার) সংযোজন হয় নি। কিন্তু তৃতীয়বারে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোজন হয়েছে এবং সেইজন্য সে ক্ষেত্রে শিখনও সম্ভব হয়েছে।

উপরের উদাহরণটি শিখনের সরলতম ক্ষেত্র। একটি অপেক্ষাকৃত জটিল উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক একটি ছেলেকে একটি বীজগণিতের অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়েছে। অঙ্কটি বিশেষ একটি ফরমুলা প্রয়োগ করে করা যায়। ছাত্রটি তার জানা ফরমুলাগুলি একটির পর একটি প্রয়োগ করতে করতে ঠিক ফরমুলাটি প্রয়োগ করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঠিক ফরমুলাটির প্রয়োগ করেনি ততক্ষণ তার উদ্দীপক (অঙ্কটি) ও প্রতিক্রিয়ার (ঠিক ফরমুলাটির প্রয়োগ) মধ্যে নির্ভুল সংযোজন হয়নি। আর যেই সে নির্ভুল ফরমুলাটি প্রয়োগ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজনও নির্ভুল হল এবং তার শিখনও ঘটল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি সংযুক্ত হবে তখনই শিখন ঘটবে। আর যতক্ষণ উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার

1. Thorndike's Connectionism

সংযোগ ঘটবে না ততক্ষণ শিখনও ঘটবে না। এইজন্যই থর্নডাইকের মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ-স্থাপন[1] ছাড়া আর কিছু নয়।

এই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মাধ্যমে শিখনের যে তত্ত্বটি থর্নডাইক দিলেন সেটি যে অনুষঙ্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনুষঙ্গবাদের মৌলিক নীতিটি হল যে আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষণ, সংবেদন, প্রতিরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। থর্নডাইকের সংযোজনবাদে শিখনও এই ধরনের মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়।

উপরের বর্ণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই থর্নডাইক তাঁর শিখন পদ্ধতির নাম দিলেন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রাণী শেখে বার বার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে। কোন কিছু শিখতে হলে উদ্দীপকের উপযোগী নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে প্রাণীকে খুঁজে বার করতে হয়। যেমন, সুইচ টিপে আলো জ্বালার বেলায় একটির পর একটি সুইচ টিপে দেখতে হয়েছে কোন্ সুইচটিতে আলো ঠিক জ্বলে বা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে ছেলেটিকে পর পর বিভিন্ন ফরমুলা প্রয়োগ করে কোন্ ফরমুলাটি প্রয়োগ করলে অঙ্কটি ঠিক হয় তা খুঁজে বার করতে হয়েছে। যথার্থ নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় একটি, অথচ ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় অগণিত। এই অগণিত ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে যেটি নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সেটিকে খুঁজে বার করতে হলে বার বার তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তার ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই সে বার বার ভুল করবে। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে এবং ভুল করতে করতে যখনই সে নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে পারবে তখনই তার শিখন সম্ভব হবে। সেই জন্য থর্নডাইকের মতে সব শেখাই হল প্রচেষ্টা ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা।

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের দৃষ্টান্ত হিসাবে থর্নডাইকের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হল। খাঁচাটার দরজায় এমন একটি ছিটকিনি লাগান ছিল যাতে আস্তে চাপ দিলেই দরজাটা নিজে নিজে খুলে যায়। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারে পৌঁছনর জন্য বার বার চেষ্টা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃংখলভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনির উপর তার পা পড়ে যায় এবং তার ফলে দরজাটা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবারে পৌঁছয়। দ্বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক ঐভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং বাইরে খাবার রেখে দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি ঐভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবারে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু দেখা যায় যে দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের তুলনায় মোট ভুল প্রচেষ্টার

1. Stimulus Response Bond or S→R Bond

সংখ্যা কম হয় এবং খাঁচা থেকে বেরোবার সময়ও কম লাগে। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একই ভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং ঐভাবে তার সামনে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হয়। সেদিনও ঐ একই ভাবে কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা করার পর বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরোতে সমর্থ হয়। তবে তৃতীয় দিনে তার খাঁচা থেকে
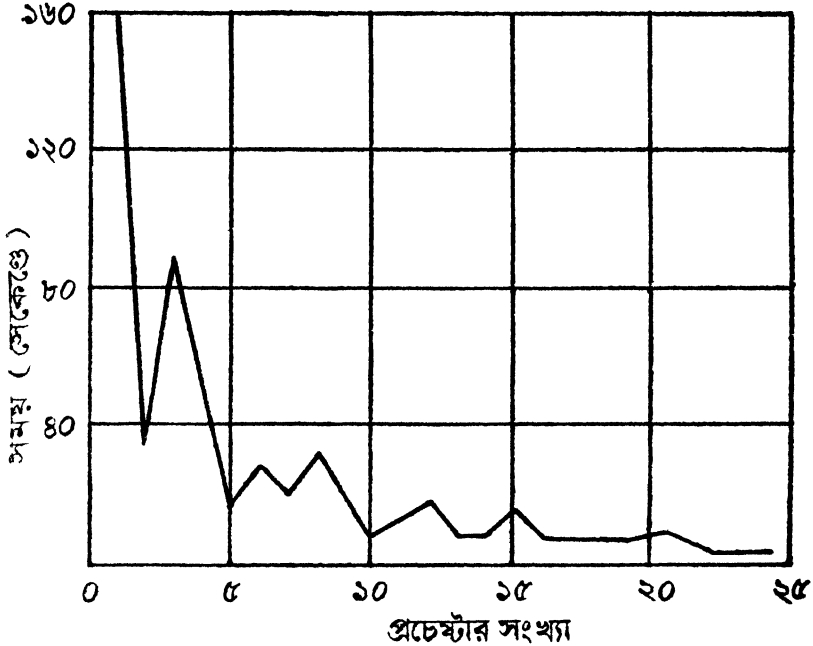
[প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের চিত্ররূপ]

বেরোতে দ্বিতীয় দিনের চেয়ে কম সময় লাগে এবং ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যাও কম হয়। এইভাবে পরীক্ষণটি চালিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যায় যে যতই দিন যাচ্ছে ততই বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয়ে আসছে এবং খাঁচা থেকে বেরোতে আগের দিনের চেয়ে তার সময়ও কম লাগছে। শেষকালে এমন একদিন এল যখন দেখা গেল যে বিড়ালটি আর একটিও ভুল প্রচেষ্টা করল না। খাঁচায় তাকে বন্ধ করা মাত্রই সে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে খাবারে পেঁছিল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির শিখন সম্পূর্ণ হল। বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন করতে সমর্থ হল।

বিড়ালটির এই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের অগ্রগতির একটা আনুমানিক চিত্ররূপ উপরে দেওয়া হল।

থর্নডাইকের শিখনের সূত্রাবলী

থর্নডাইক শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে শিখনের কতকগুলি সূত্র উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর দেওয়া সূত্রের সংখ্যা আটটি, তিনটি মুখ্য সূত্র[1] এবং পাঁচটি গৌণ সূত্র[2]।

শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র

থর্নডাইকের মতে শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র হল—১। প্রস্তুতির সূত্র[3]। ২। অনুশীলনের সূত্র[4] এবং ৩। ফললাভের সূত্র[5]। নীচে এই সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। প্রস্তুতির সূত্র

শিখনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ একটি উদ্দীপকের সঙ্গে তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি। যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে তখন শিখন সন্তোষ আনে, আর যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে না তখন শিখন অতৃপ্তির সৃষ্টি করে। এই জন্যই শিশু যখন কোন কাজ করতে উন্মুখ হয় তখন যদি তাকে বাধা দেওয়া হয় সে তাতে বিরক্ত হয়। আবার যে কাজ করতে তার মন চায় না সে কাজ তাকে জোর করে করাতে গেলে তার বিরক্তি আসে। কিন্তু যে কাজ করার জন্য সে দেহ মনে প্রস্তুত সে কাজ তাকে করতে দিলে সে আনন্দ পায় এবং সেটি সে দ্রুত সম্পন্ন করে।

২। অনুশীলনের সূত্র

একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে যদি বার বার সংযুক্ত করা যায় তবে সে দুটির মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন সৃষ্টি হবে। বিপরীত ক্রমে একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে যদি বেশ কিছুদিন সংযোজন না করা হয় তবে এ দুয়ের মধ্যে পূর্ব স্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসবে। এক কথায় অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে দৃঢ় করে, অনুশীলনের অভাব তাকে শিথিল করে তোলে।

৩। ফললাভের সূত্র

উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক হবে, নয় অতৃপ্তিকর হবে। যদি সংযোজনের ফল সন্তোষজনক হয় তবে সে সংযোজন দৃঢ়বদ্ধ

1. Major Laws 2. Minor Laws 3. Law of Readiness 4. Law of Exercise 5. Law of Effect

হবে। আর সংযোজনের ফল যদি অতৃপ্তিকর হয় তবে সে সংযোগ দুর্বল হয়ে উঠবে। যেমন, বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টাগুলির ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল তার কাছে অতৃপ্তিকর হয়েছিল, কেননা সেগুলির দ্বারা সে তার অভীষ্ট খাদ্য পায় নি। সেজন্য ভুল প্রচেষ্টার একটিও সে ভবিষ্যতে শিখল না। কিন্তু দরজা-খোলা-রূপ নির্ভুল প্রচেষ্টাটির ফল তার কাছে সন্তোষজনক হয়েছিল। সেইজন্যই ঐ ক্ষেত্রে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনটি তার কাছে স্থায়ী শিখন হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ সে দরজা খুলতে পারার কৌশলটি স্থায়ীভাবে শিখল। থর্নডাইকের মতে এই ফললাভের সূত্রটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিখনের পাঁচটি গৌণ সূত্র

শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও পাঁচটি সূত্র গঠন করেন। এগুলি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বলে এগুলি শিখনের গৌণ সূত্র নামে পরিচিত। সেগুলি হল—

১। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার সূত্র[1]

অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি নির্ভুল প্রতিক্রিয়াকে বেছে নেওয়াই হল শিখন। অতএব শিখনের জন্য প্রাণীর একটি বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে নানা বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা চাই। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যত বাড়বে ততই তার পক্ষে জটিল শিখন আয়ত্ত করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

২। মানসিক অবস্থা বা মনোভাবের সূত্র[2]

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না অতৃপ্তিকর তাও নির্ধারিত হয় তার দেহমনের তৎকালীন অবস্থার দ্বারা।

৩। আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র[3]

কখনও কখনও উদ্দীপক বা শিখন-পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে।

৪। সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র[4]

পূর্ব-পরিচিত শিখন পরিস্থিতির অনুরূপ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে প্রাণী সাধারণত পূর্বে সম্পন্ন প্রতিক্রিয়ারই অনুকরণ করে থাকে।

1. Law of Multiple Response to same Stimulus 2. Law of Attitude, Set or Disposition 3. Law of Partial Activity 4. Law of Assimilation or Analogy

৫। অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র[1]

সময় সময় যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিয়া সেই উদ্দীপক থেকে অন্য আর একটি উদ্দীপকে সেই প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে। যেমন, কোন কিছু খাবার সময় জিভে লালাক্ষরণ হওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু খাবার দেখলে বা খাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ্ প্যাভলভ এই প্রতিক্রিয়ার নাম দিয়েছেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া[2] এবং তার উপর দীর্ঘ গবেষণার ফলে তিনি এই ধরনের অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। 'অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া'কে আমরা শিখনের স্বতন্ত্র মতবাদরূপে গ্রহণ করেছি এবং যথাযথ আমরা এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। 'অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া'র তত্ত্বটি আবিষ্কারের সম্মান সর্বসম্মতিক্রমে প্যাভলভকে দেওয়া হলেও একথা অনস্বীকার্য যে থর্নডাইক প্যাভলভের আগেই এই তত্ত্বটির শিখনমূলক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদ

থর্নডাইকের বর্ণিত শিখনের সূত্রগুলি থেকে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এমন কতকগুলি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। সেগুলি হল এই—

প্রথমত, শিখন নির্ভর করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির উপর। প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভঘটিত প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির একটা সামগ্রিক উন্মুখতা। যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই প্রস্তুতি আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম, জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি অর্থাৎ যে বস্তুটি শিক্ষার্থী শিখতে চলেছে সেটি শেখার উপযোগী পূর্বজ্ঞান তার থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যে ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য শেখান হচ্ছে দেখতে হবে যে সে কোণ, ত্রিভুজ ইত্যাদি কাকে বলে তা আগে থেকে জানে কি না। দ্বিতীয় হল প্রক্ষোভঘটিত প্রস্তুতি। শিখন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভ থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, শিখনের ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হয়। অতৃপ্তিকর শিখন স্থায়ী হয় না। একমাত্র সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর বলে প্রমাণিত হয় এবং একমাত্র সেই শিক্ষার জন্যই শিক্ষার্থী স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে। এইজন্য এমনভাবে শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দ লাভের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে না হয়। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি

1. Law of Associative Shifting 2. Conditioned Response

সুদীর্ঘ হয় তবে সেটিকে একসঙ্গে শিখতে দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যের আনন্দ পাওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে এবং ফলে তার প্রচেষ্টাও বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে সেটিকে এমনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে নিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ পায় এবং তার ফলে তার শিখন সুখকর ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, অনুশীলনের উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। সেজন্য শিখনের বিষয়বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুবিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অনুশীলন করতে অযথা কোন অসুবিধা না হয়। মনে রাখতে হবে যে এই বার বার প্রচেষ্টা বা অনুশীলনের একটা বড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সম্বন্ধে তৃপ্তিবোধ।

চতুর্থত, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিখনকে ত্বরান্বিত করে তোলে। অতএব যাতে শিক্ষার্থী গতানুগতিক ও পুরাতন প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর না করে এবং যাতে সে নতুন ও বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করতে পারে, সেজন্য তাকে উৎসাহ ও যথাযথ নির্দেশ দিতে হবে।

পঞ্চমত, শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই নিয়ন্ত্রিত করে এবং যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্যাটিকে সহজ সমাধান করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকলে শিখন কার্য অল্পায়াসে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবন করতে শেখে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের সমালোচনা

নানা মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর শিখনের সূত্রগুলির বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই থর্নডাইকের সূত্রগুলিকে শিখনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে সূত্রগুলি যদিও বাহ্যত প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তবুও ভাল করে বিচার করলে সেগুলির মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। তাঁদের সমালোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথমত, থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্র অনুযায়ী কোন কিছু বার বার অভ্যাস বা চর্চা করলে সে বস্তুটির শিখন স্থায়ী হয়। একথা আংশিকভাবে সত্য। কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চর্চা করলেই স্থায়ী শিখন হতে পারে না। তার সঙ্গে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা দরকার। আর যেখানেই এই

অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির অভাব সেখানে নিছক অভ্যাস মোটেই কার্যকর হয় না। এক কথায় অনুশীলনের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য বস্তুর প্রভাব এবং এগুলির একটার অভাবেই হাজার অনুশীলন সত্ত্বেও শিখন সফল না হতেও পারে। আবার অপর দিকে বিন্দুমাত্র অভ্যাস বা চর্চা ছাড়াই বহু অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। যেমন আনন্দের, শোকের বা উত্তেজনাপূর্ণ কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে যখন আমরা অর্থপূর্ণ কিছু শিখি তখন কোনরূপ অনুশীলনের সাহায্যই লাগে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অনুশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের স্বপক্ষে প্রায়ই শিখনের একটা শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপনই হচ্ছে শিখন। থর্নডাইক যাকে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলেন শরীরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সেটি হল মস্তিষ্কের দুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। সাধারণত দুটি নিউরনের সন্নিকর্ষ স্থলে[1] এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাধা দেবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। কিন্তু বার বার একই কাজ অনুশীলন করলে এই বাধা দূর হয়ে যায় এবং দুটি নিউরনের মধ্যে একটি স্থায়ী স্নায়ুমূলক সংযোজন স্থাপিত হয় এবং তারই ফলে শিখন সংঘটিত হয়।

শিখনের এই শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই মানতে রাজী নন। ল্যাসলে[2], ফ্রানজ[3], ক্যামেরন[4] প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে স্নায়ুমূলক সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটির নানারূপ সমালোচনা হয়েছে। এই সূত্র অনুযায়ী আচরণের ফল তৃপ্তিকর হলে সে আচরণটি দৃঢ়বদ্ধ হয়, আচরণের ফল অতৃপ্তিকর হলে সে আচরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা[5] এই সূত্রটির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার কারণ হল যে এই সূত্রটিতে শিখন প্রক্রিয়াটির পেছনে ব্যক্তির মানসিক অনুভূতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু আচরণবাদীরা মানসিক অনুভূতির সাহায্যে কোন কিছুরই ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী নন। তাঁরা থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের স্থানে অনুশীলন[6] এবং আচরণের সাম্প্রতিকতা[7]—এই দুটি সূত্রের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা ফললাভের সূত্রটির বিরোধিতা করেন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। তাঁদের মতে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি যদি কোন আচরণের শিখন বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে সে অনুভূতিটি নিশ্চয়ই ঐ আচরণটির সম্পাদনের

---

1. Synapse পৃঃ ১৫২ 2. Lashley 3. Franz 4. Cameron 5. Behaviourist 6. Exercise 7. Recency

পূর্বে ঘটবে। কেননা, কারণ সর্বদাই কার্যের আগে ঘটে থাকে। অথচ এই ক্ষেত্রে শিখন-রূপ আচরণটি ঘটছে আগে, তার পরে ঘটছে দুঃখ বা সুখের অনুভূতিটি। অতএব এখানে সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকে শিখন হওয়া বা না হওয়ার কারণ বলা চলে না।

তাছাড়া দুঃখের অনুভূতি যে সব সময়েই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথাও ঠিক নয়। নানা পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বহু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাও খুব স্বাভাবিক ভাবেই এবং দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সন্নিবদ্ধ থাকে। এই সকল আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে শিখন এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতির মধ্যে যদিও সম্পর্ক আছে তবুও এই দুয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না।

অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে থর্নডাইকের সূত্রগুলি কেবল ত্রুটিপূর্ণই নয়, সেগুলিতে শিখন প্রক্রিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। যেমন, শিখনের একটি বড় অঙ্গ হল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সচেতনতা। কিন্তু থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে তার কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়াতে প্রক্ষোভের ভূমিকাও একটি বড় স্থান অধিকার করে থাকে, কিন্তু তারও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে পাওয়া যায় না।

থর্নডাইক নিজেও তাঁর সূত্রগুলির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেইজন্য পরে তাঁর প্রদত্ত তিনটি সূত্রের সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করে দেন। এই সূত্রটির নাম হল অন্তর্ভুক্তির সূত্র[1]। এই সূত্রের অর্থ হল যে শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তির একটি সম্বন্ধ থাকবে অর্থাৎ যখন দুটি ঘটনাই বিশেষ একটি সম্বন্ধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। থর্নডাইকের এই সূত্রটি নানা দিক দিয়ে বেশ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ও অস্পষ্ট।

গেস্টাল্টবাদী মনোবিজ্ঞানীরা থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। থর্নডাইকের মতে শিখন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার মিলন ঘটানো। প্রাণী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপক বেছে নেয় এবং একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া দিয়ে তার সাড়া দেয়। এইভাবে সাড়া দিতে দিতে হঠাৎ ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন ঘটে যায় এবং তখনই শিখন সংঘটিত হয়। একেই বলা হয়েছে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজন।

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের এই ব্যাখ্যাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা[2] বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সাড়া দিই না। আমরা শিখনের

1. Law of Belongingness 2. Psychological Atomism

সমগ্র পরিস্থিতিটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে থাকি। এই সাড়া দেবার সময় আমরা ঐ পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলিকে পুনরায় সংগঠিত করে নিই। গেস্টাল্টবাদীদের মতে সমস্যাটির এই অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নিরূপণ এবং উদ্দীপকগুলির সংগঠনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিখন ঘটে থাকে।

২। শিখনের গেস্টাল্ট তত্ত্ব[1]

গেস্টাল্ট কথাটি জার্মান শব্দ। এর অর্থ হল গঠন বা কাঠামো বা সম্পূর্ণ আকার[2]। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই মতবাদটি 'মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা'র প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা সত্তাগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ প্রক্রিয়া বা সত্তাগুলির প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় বলে যে সব মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন তাঁদেরই গেস্টাল্টবাদীরা মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতাবাদী বলে সমালোচনা করে থাকেন। বলা বাহুল্য অনুষঙ্গবাদী মনোবিজ্ঞানীরাই তাঁদের এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। অনুষঙ্গবাদীরা মানব মনের প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রতিরূপ প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক এককের পরিকল্পনা করেন এবং এই মানসিক এককগুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াটির যথার্থ স্বরূপ জানা যায় বলে তাঁরা দাবী করেন।

কিন্তু গেস্টাল্টবাদীদের মত অনুযায়ী আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সর্বদাই এমন একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তা যাকে বিশ্লেষণ করলে বা যার অংশগুলিকে পৃথকভাবে বিচার করলে আমরা সেই সমগ্র সত্তাটিকে কখনই জানতে পারি না। কারণ, সমগ্র সত্তাটি কেবলমাত্র অংশগুলির যোগফল নয়, যোগফলের উপরেও অতিরিক্ত আরও কিছু। যেমন, মনে করুন, আপনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন। এই দৃশ্যটির অন্তর্গত গাছপালা, ফুল, পাখী, পশুগুলিকে পর পর যোগ করে দিলেই আপনার ঐ অভিজ্ঞতার সমগ্র সত্তাটিকে পাওয়া যাবে না। ঐ অংশগুলি ত আপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে অতিরিক্ত আরও কিছু। সমগ্র সত্তার এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁরা মনে করেন যে বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন[3] থেকে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি দেখা দেয়। এক কথায় বিশেষ কোন শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলি যে নিজেদের মধ্যে একটি সংগঠনের সৃষ্টি করে সেইটিকে গেস্টাল্টবাদীরা গঠন বা কাঠামো বা পূর্ণ আকার নাম দিয়ে থাকেন।

অতএব কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে জানলেই চলবে না, ঐ অংশগুলির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সংগঠনটি

---

1. Gestalt Theory of Learning 2. Form or Structure or Configuration
3. Organisation

আছে তারও যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হবে। থর্নডাইক যে বলেছেন উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে আমরা সমস্যার সমাধানে পৌঁছই এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে যা ঘটে তা ঠিক তার বিপরীত। যখন আমরা কোনও শিখন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তখন আমরা সমগ্র সমস্যাটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই এবং এই সাড়া দেবার সময় পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংগঠন সৃষ্টি করি তারই ফলে সমস্যার সমাধান দেখা দেয় এবং আমাদের শিখন সম্পন্ন হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গেষ্টাল্টবাদীদের মতে থর্নডাইক বর্ণিত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াটি আসলে অবাস্তব। অবশ্য শিখনের সময় যে প্রাণী অন্ধ ও অর্থহীন প্রচেষ্টা করে না, তা নয়। কিন্তু সেই সব বিচ্ছিন্ন ও অন্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃত শিখন ঘটে না। প্রকৃত শিখন ঘটে তখনই যখন প্রাণী সামগ্রিক ও লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট প্রচেষ্টা সম্পন্ন করে। বস্তুত সকল শিখনের ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রচেষ্টা সব সময়েই সমগ্র পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে প্রসূত এবং সেগুলির কোনটিই বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া নয়। প্রকৃতপক্ষে শিখনের সময় প্রাণী তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে একটি সমগ্র প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

থর্নডাইক খাঁচায় বন্ধ বিড়ালের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে পরিস্থিতিটি এমন ছিল যে বিড়ালের পক্ষে সমস্যাটির সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। ফলে অন্ধ উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টা করা ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু যদি পরিস্থিতিটি প্রাণীর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে তবে সে কখনই অন্ধ, যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা করবে না। তখন তার প্রচেষ্টা স্বভাবতই সামগ্রিক, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রসিদ্ধ গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানী কোহ্‌লার[1] শিম্পাঞ্জীর শিখন নিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ করেন এবং তিনি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে কোন যান্ত্রিক বা অন্ধ পদ্ধতিতে প্রাণী কখনই কিছু শেখে না। তাঁর বহু প্রখ্যাত পরীক্ষণগুলির মধ্যে নীচে একটির বর্ণনা দেওয়া হল।

একটি শিম্পাঞ্জীকে বড় একটি খাঁচায় বন্ধ করে খাঁচার বাইরে কিছু কলা রাখা হল। খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটি বাঁশের টুকরো। কলাগুলি খাঁচা থেকে এতটা দূরে রাখা হল যাতে কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বা কোন একটিমাত্র বাঁশের টুকরো দিয়ে সেগুলির নাগাল পাওয়া যায় না! কিন্তু বাঁশের একটি টুকরোর মধ্যে যদি আর একটি টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে তা থেকে যে লম্বা বাঁশের টুকরোটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে কলাগুলির নাগাল সহজেই পাওয়া যাবে। বাঁশের টুকরো দুটিও

1. Kohler

এমনভাবে কাটা হয়েছিল যে একটি আর একটির মধ্যে ঢুকে যায়। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে এবং পরে বাঁশের টুকরো দুটি পৃথকভাবে ব্যবহার করে নানা উপায়ে কলাগুলির নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেভাবে কিছুতেই সে কলাগুলির নাগাল পেল না। তখন সে বাঁশের টুকরো দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সুরু করল এবং এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি টুকরোর মধ্যে আর একটি টুকরো ঢুকে গেল এবং টুকরো দুটি জুড়ে গিয়ে একটি লম্বা বাঁশে পরিণত হল। মুহূর্তের মধ্যে শিম্পাঞ্জীটির মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে আর তখন বিন্দুমাত্র ইতস্তত বা উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা না করে সেই লম্বা বাঁশটির সাহায্যে কলাগুলি হস্তগত করল।[1]

৩। অন্তর্দৃষ্টি

সমস্যাটির সমাধানের এই যে হঠাৎ উপলব্ধি, কোহ্লারের এর নাম দিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টি[2]। তাঁর মতে সমস্যার সমাধান বা শিখন প্রক্রিয়া অনেকটা বিদ্যুৎ চমকানোর মত প্রাণীর মনকে হঠাৎ আলোকিত করে তোলে এবং তখন প্রাণীর সেই সমাধানটি আয়ত্ত করতে আর বিন্দুমাত্র সময় লাগে না এবং এইভাবে তার যে শিখন হয় তা সে পরে সহজে ভোলেও না। শিখনের সময় ভুল প্রচেষ্টা বা অন্ধ প্রতিক্রিয়া যে একেবারে ঘটে না তা নয়। কিন্তু কোহ্লারের মতে তা থেকে সত্যকারের শিখন ঘটে না। শিখন ঘটে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাবে এবং তাতে ভুল প্রচেষ্টাগুলির কোনও অবদান বা ভূমিকা থাকে না। অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ সম্বন্ধে গেষ্টাল্টবাদীরা শিখন পরিস্থিতির সংগঠন ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে যখনই প্রাণী শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কধারা নির্ণয় করতে পারে এবং তাদের সামগ্রিক প্রকৃতি অনুযায়ী সংগঠন করে উঠতে পারে তখনই দেখা দেয় অন্তর্দৃষ্টি।

সাধারণত শিখন পরিস্থিতিটি নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তু দিয়ে আবৃত থাকে। যখনই শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে এবং সেগুলিকে একটি অর্থপূর্ণ সংগঠনে রূপান্তরিত করতে পারে তখনই অপ্রাসঙ্গিক বস্তুগুলি নিজে নিজেই দূরে সরে যায় এবং সমস্যার সমাধানটিও শিক্ষার্থীর কাছে তখন উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে।

গেষ্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের জন্য দুটি মানসিক প্রক্রিয়ার বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। সে দুটি হল পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ[3]। শিখন পরিস্থিতির মধ্যে যেগুলি অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বেছে নেওয়ার নাম পৃথকীকরণ এবং

---

1. পৃঃ ৩২১ চিত্র দ্রষ্টব্য। 2. Insight 3. Abstraction and Generalisation : পৃঃ ২২৪

পরে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে কোন সামান্যধর্মী সূত্র তৈরী করার নাম সামান্যীকরণ। শিখন পরিস্থিতি থেকে যখন শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণের সাহায্যে অন্তর্নিহিত সাধারণ সূত্রগুলি উপলব্ধি করতে পারে তখনই অন্তর্দৃষ্টি জাগে এবং শিখন সংঘটিত হয়।

গেষ্টাল্টবাদীদের মতে শিখন প্রক্রিয়া কতকগুলি সোপানের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়। সেগুলি হল এই—

প্রথম, শিক্ষার্থী সমস্যাটির সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে।

দ্বিতীয়, সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্য সে সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

তৃতীয়, সমস্যাটির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সে একটি সংগঠন তৈরী করে এবং তার জন্য তাকে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিজে, তার লক্ষ্য এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী বাধা—এ তিনটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

চতুর্থ, সমস্যাটি বা বিষয়টির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রটি শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ এবং সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে উপলব্ধি করে। এই ধাপেই সমস্যার সমাধানটি শিক্ষার্থীর মনে বিদ্যুৎ চমকের মত দেখা দেয় এবং একেই গেষ্টাল্টবাদীরা অন্তর্দৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে গেষ্টাল্ট-বাদীরা সার্থক শিখনের জন্য প্রত্যক্ষণ, সম্বন্ধনির্ণয়, সংগঠন, পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ এ কয়টি প্রক্রিয়ার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

শিক্ষায় গেষ্টাল্ট তত্ত্বের প্রয়োগ

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই নতুন ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিখন পদ্ধতির সংস্কারসাধন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকাল গেষ্টাল্ট মতবাদের মৌলিক তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নীচে শিক্ষায় গেষ্টাল্ট মতবাদের প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

প্রথমত, স্কুল কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় এতদিন অনুসৃত বিশ্লেষক বা অংশমূলক পদ্ধতির[1] স্থানে সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতির[2] ব্যাপক প্রচলন সুরু হয়েছে। আগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীকে ঐ অংশগুলি পৃথকভাবে শেখানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। এরই নাম ছিল বিশ্লেষক পদ্ধতি। এতে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর সমগ্র রূপটি দেখতে পেত না এবং তার প্রচেষ্টা হত সম্পূর্ণ শিক্ষক পরিচালিত, অন্ধ এবং যান্ত্রিক। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ একটি সমস্যার সমাধান করতে না দিয়ে প্রথমেই

1. Analytic or Part Method 2. Synthetic or Whole Method

কতকগুলি ফরমুলা তাকে শেখান হত। ফরমুলাগুলি যেহেতু সমগ্র সমস্যাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে অর্থ-হীন এবং অবাস্তব বস্তু বলে মনে হত। আধুনিক সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে আগে সম্পূর্ণ সমস্যাটি তুলে ধরা হয় এবং তারপর সেই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার সময় প্রয়োজনীয় ফরমুলাগুলি শেখান হয়ে থাকে। অর্থাৎ আগে বিশ্লেষণ থেকে যাওয়া হত সংশ্লেষণে। আজকাল সংশ্লেষণ থেকে যাওয়া হয় বিশ্লেষণে, তারপর আবার সংশ্লেষণে। অর্থাৎ সংশ্লেষণ→বিশ্লেষণ—পুনঃসশ্লেষণ, এই হল আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অনুক্রম। আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত—এ সবই শেখানোর সময় প্রথমে পাঠ্যবস্তুটির একটি সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হয় এবং পরে সেটিকে ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা করা হয়। সব শেষে সেই বিভিন্ন অংশগুলিকে সংযুক্ত করে বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক রূপটি তার সামনে আবার উপস্থাপিত করা হয়। আধুনিক যুগের শিক্ষণ পদ্ধতির এই আমূল পরিবর্তনের মূলে আছে গেস্টাল্টবাদীদের প্রদত্ত শিখন প্রক্রিয়ার এই নতুন সংব্যাখ্যানটি।

দ্বিতীয়ত, গেস্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা আসে অন্তর্দৃষ্টি থেকে। অন্তর্দৃষ্টি দেখা দেয় সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের উপলব্ধি থেকে। অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভালভাবে বিকশিত হয় সেটি সর্বাগ্রে দেখতে হবে। তার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রদত্ত সমস্যাটির বিভিন্ন অংশ-গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে এবং তাকে এই সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে শিক্ষক তার শিখনকে সহজ ও দ্রুত করে তুলবেন।

তৃতীয়ত, গেস্টাল্টবাদীদের মতে সম্পর্ক নির্ণয় ছাড়াও পৃথকীকরণ ও সামান্যী-করণ প্রক্রিয়া দুটি অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পৃথকীকরণের অর্থ হল শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সাধারণধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং সামান্যীকরণের অর্থ হল সেই পৃথকীকৃত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে সামান্য বা সর্বজনীন তত্ত্ব বা সূত্র গঠন করা। অতএব শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে এই অত্যাবশ্যক মানসিক প্রক্রিয়া দুটি সম্পন্ন করতে শেখাতে হবে।

চতুর্থত, শিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে যে অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা থেকে শিখন হয় না। শিখন হল অন্তর্দৃষ্টি থেকে সঞ্জাত এক ধরনের মানসিক উপলব্ধি বিশেষ। অতএব শিক্ষার্থী যাতে অনর্থক অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা করে উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমত, শিখনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মধ্যে পূর্ণ সচেতনতা থাকবে। অতএব শিখনের পরিস্থিতিটি যেন শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে যাতে সে তার শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে।

ষষ্ঠত, শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সুষমভাবে সংহতিসম্পন্ন থাকে। শিখনের সাফল্য নির্ভর করে সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধির উপর। অতএব শিখনের প্রক্রিয়াটি এমন গতিতে সংঘটিত হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ সহজ হয়ে ওঠে।

অবশেষে আসে শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। প্রথম, শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য তার নিজের পূর্বার্জিত জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার মত যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান যেন তার মধ্যে থাকে। দ্বিতীয়, অনুভূতি বা প্রক্ষোভের দিক দিয়েও সে যেন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ যদি শিক্ষার প্রতিকূল হয় তবে তার শিখন বিলম্বিত বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখনের সকল পরিস্থিতিতেই শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সব সময় সামগ্রিক ধরনের হয়ে থাকে এবং সে যে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে তা সে করে তার সামগ্রিক অস্তিত্ব বা সত্তা দিয়ে। অতএব সুষ্ঠু শিখনের জন্য তার দেহমনের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজন।

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের তুলনা

থর্নডাইকের প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং গেস্টাল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক প্রকৃতির পার্থক্য আছে। দুটিই শিখন পদ্ধতি হলেও মৌলিক নীতি, অন্তর্নিহিত সংগঠন এবং গতিধারার দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। যথা—

প্রথমত, অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখনের পরিস্থিতিটিকে বা সমস্যাটির প্রতি সমগ্রভাবে সাড়া দেয়। কিন্তু প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে শিখন পরিস্থিতি বা শিখন সমস্যাটির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলির প্রতি শিক্ষার্থী বিচ্ছিন্ন ও পৃথক ভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। গেস্টাল্টবাদীদের মতে সমগ্র শিখন পরিস্থিতিটির যথাযথ সংগঠন থেকেই সার্থক শিখন দেখা দেয়। কিন্তু প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে উদ্দীপকের সঙ্গে নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটলেই শিখন হয়। একেই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজন[1] বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি হয় অন্ধ, যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন। বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করতে করতে প্রাণী আকস্মিকভাবে নির্ভুল

আচরণটি সম্পন্ন করে ফেলে এবং তার ফলেই সমস্যাটির সমাধান দেখা দেয়। অতএব এই তত্ত্ব অনুযায়ী ঐ বিশেষ একটি আচরণ ছাড়া প্রাণীর আর সব আচরণই অর্থহীন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন পরিস্থিতিতে প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই সুপরিকল্পিত, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ।

তৃতীয়ত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীকে শিখতে হয় একটি বন্ধ পরিস্থিতিতে[1]। বন্ধ পরিস্থিতির অর্থ হল যেখানে প্রাণী সমগ্র শিখন পরিস্থিতিটি দেখতে পায় না। তার কাছে শিখন পরিস্থিতিটির মাত্র একটি অংশ উদ্ঘাটিত থাকে। যেমন খাঁচায় বন্ধ বিড়ালটির ক্ষেত্রে হয়েছিল। এক কথায় তার শিখন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যটিই তার কাছে অজ্ঞাত বা অনুদ্ঘাটিত থাকে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী শেখে একটি উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে[2]। এখানে শিক্ষার লক্ষ্যটি শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত ও জ্ঞাত থাকার জন্য তার পক্ষে যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যহীন আচরণ সম্পন্ন করার কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং তার ফলে তার প্রচেষ্টা-মাত্রেই লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়।

চতুর্থত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে কোনরূপ উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয় না। নিছক বার বার প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই বিষয়টি শিখনে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে কতকগুলি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য অপরিহার্য। যেমন, সমস্যাটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ন, পৃথকীকরণ, সামান্যীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে সেখানে সমস্যার সমাধান করা হয়। এই উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির জন্যই অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন অনেক দ্রুত এবং অল্প আয়াসে সম্পন্ন হয়। অপর পক্ষে প্রচেষ্টা ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাগুলি নিছক শারীরিক স্তরে সংঘটিত হয় বলে সময় এবং পরিশ্রম দুইই প্রচুর পরিমাণে লাগে।

পঞ্চমত, অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বলে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কার্যকর। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য সেই জন্য তাদের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিরই ব্যবহার অধিক দেখা যায়।

৩। অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদটি[3] সম্পূর্ণ শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ প্যাভলভকে এই মতবাদের স্রষ্টা বলা চলে, যদিও এ তত্ত্বটির সঙ্গে প্রাচীন অনুষঙ্গবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন এবং মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনায় বহু বিভিন্ন রূপে ও ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বটির সাক্ষা

1. Closed Situation 2. Open Situation 3. Theory of Conditioned Respons

[সিম্পাঞ্জীটি দুটি ছোট বাঁশের টুকরো নিয়ে খাঁচার বাইরে রাখা কলার ছড়ার নাগাল না পেয়ে টুকরো দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে]
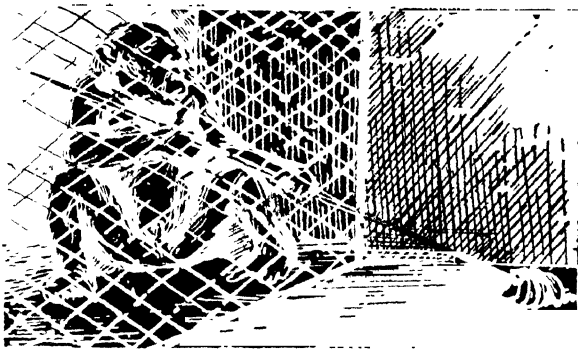
[বাঁশের ছোট টুকরো দুটি হঠাৎ একসঙ্গে জুড়ে একটি বড় বাঁশের টুকরোতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তা দিয়ে সিম্পাঞ্জীটি কলার ছড়াটা টেনে আনছে]

অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের উপর কোহ্‌লারের পরীক্ষণ

[পৃঃ ৩১৫—পৃঃ ৩১৬]

পাওয়া যায়। থর্নডাইকের 'অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের'[1] সূত্রটি মূলত এই তত্ত্বটির সঙ্গে অভিন্ন। প্যাভলভের পূর্বে বেকটেরেভ[2] নামে একজন রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী অনুবর্তন প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। কিন্তু প্যাভলভই প্রথম তাঁর সুপরিকল্পিত গবেষণার মাধ্যমে অনুবর্তনের মৌলিক তত্ত্বাবলী ও সূত্রসমূহের সুনির্দিষ্ট গ্রন্থনা ও সংব্যাখ্যান করেন বলে তাঁর নামের সঙ্গেই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার তত্ত্বটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ উদ্দীপককে কতকগুলি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা জন্ম থেকেই থাকে। এই উদ্দীপকগুলিকে আমরা স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করতে পারি। যেমন, ক্ষুধার্ত কুকুরের ক্ষেত্রে খাবার দেখলে লালাক্ষরণ হওয়াটা হল একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। তেমনই ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চশব্দ শুনলে ভয় পাওয়া বা যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই আচরণগত বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদি হল এই রকম স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ। এই প্রতিক্রিয়াগুলি সহজাত ও পূর্বনির্দিষ্ট এবং অর্জিত বা শিক্ষাপ্রসূত নয়। এখন যদি ঐ ধরনের একটি স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক আগে বা ঠিক পরে একটি কৃত্রিম উদ্দীপককে বার বার উপস্থাপিত করা হয় তবে ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি দ্বিতীয় বা কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছাড়াই ঐ কৃত্রিম উদ্দীপক ঐ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটাতে সমর্থ হবে। মনে করা যাক স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ ঘটে থাকে। এখন যদি কৃত্রিম উদ্দীপক

[স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২'তে অনুবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।]

উ-২ (যার প্রতিক্রিয়া হল কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্র-২) বার বার ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র সঙ্গে উপস্থাপিত করা যায়, তবে দেখা যাবে যে স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১ ছাড়াই কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২'র উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ সম্পন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত বা অনুবর্তিত হল।

1. Law of Associative Shifting 2. Bechterev

এইভাবে কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওয়াই হল এক প্রকারের শিখন প্রক্রিয়া। প্যাভলভ এই ধরনের শিখনের নাম দিয়েছেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া[1]।

কুকুরের লালাক্ষরণ নিয়ে প্যাভলভ প্রতিক্রিয়া-সঞ্চালনের উপর যে গবেষণা সম্পন্ন করেন, তা তাঁকে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। খাদ্য দেখলে কুকুরের স্বাভাবিক ভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং ঘণ্টার শব্দ শুনলে চঞ্চলতা বা অস্থিরতা
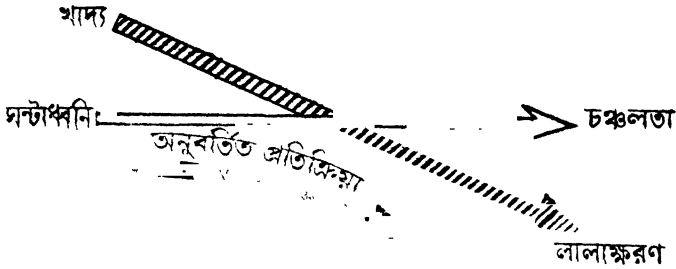
[খাদ্যরূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া 'লালাক্ষরণ' ঘণ্টাধ্বনি-রূপ উদ্দীপকে অনুবর্তিত হয়ে যাচ্ছে]

রূপ কোন অনিশ্চিত প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা দেয়। এখন যদি কুকুরটিকে খাদ্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজান হয় তাহলে দেখা যাবে যে কিছুকাল পরে খাদ্য না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই লালাক্ষরণ হতে সুরু করেছে। এখানে লালাক্ষরণ-রূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাবাজা-রূপ কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত

[প্যাভলভের কুকুরের উপর অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার প্রসিদ্ধ পরীক্ষণ]
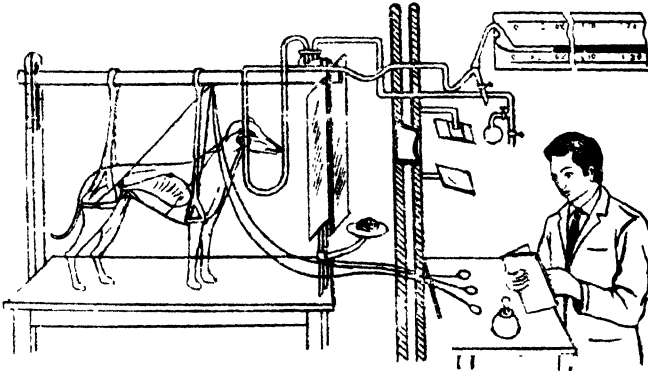
হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটির এই স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে সঞ্চালিত হওয়াকে 'অনুবর্তন'[2] বলা হয় এবং যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটল তাকে 'অনুবর্তিত'[3] প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এই

1. Conditioned Response 2. Conditioning 3. Conditioned

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের দ্বারা সকল প্রকার শিখনপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

তাঁদের মতে ব্যক্তির অভ্যাস, অপছন্দ, মনোভাব, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি সবই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্মলাভ করে থাকে। শিশুর অতি সরল প্রক্ষোভের কাঠামোটি পরিণত অবস্থায় যে অতিজটিল প্রক্ষোভের সংগঠনে পরিণত হয় তার মূলেও এই অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি।

প্রক্ষোভের অনুবর্তন[1]

বস্তুত প্রক্ষোভ গঠনের ক্ষেত্রে অনুবর্তনের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রাথমিক প্রক্ষোভ সংখ্যায় যেমন অল্প, তেমনই সংগঠনের দিক দিয়েও অতি সরল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির প্রক্ষোভ সংখ্যাতীত এবং অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রক্ষোভের এই বহুধাভবন ও জটিলতাপ্রাপ্তি অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই ঘটে থাকে। প্রক্ষোভের অনুবর্তন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা সম্পন্ন করেন বিখ্যাত আচরণবাদী ওয়াটসন। নীচে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হল।

ওয়াটসনের অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপর পরীক্ষণ

ওয়াটসন তাঁর নানা পরীক্ষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতকের ভয় জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক—উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া। কিন্তু সে যখন বড় হয় তখন দেখা যায় যে তার ভয় কেবল ঐ দুটি উদ্দীপকে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বহু নতুন ও বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যায়। তার প্রক্ষোভের এই জটিলতার বৃদ্ধি ও বিস্তার সংঘটিত হয় অনুবর্তন প্রক্রিয়াটির দ্বারাই। আর্থার নামে একটি ছোট
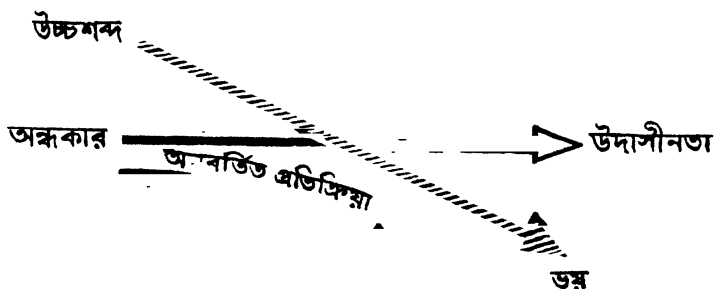
['উচ্চশব্দ' রূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া 'ভয়' অনুবর্তন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 'অন্ধকার' রূপ উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছে।]

ছেলেকে একটি লোমওয়ালা খেলনা কুকুর দিয়ে দেখা গেল যে সে একটুও ভয় পায় না বরং হাত দিয়ে সেটি সে ধরে। কিন্তু উচ্চ শব্দ শুনলেই সে স্বাভাবিকভাবে

1. Conditioning of Emotion

ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। এইবার তাকে লোমওয়ালা খেলনা কুকুরটি দেবার সময় পেছন থেকে খুব জোরে শব্দ করা হল। আর্থার তখন কুকুরটি হাতে ধরেই ভয়ে ফেলে দেয় এবং কেঁদে ওঠে। এই রকম আর্থার যতবারই কুকুরটি নিতে হাত বাড়ায় ততবারই পেছন থেকে জোরে একটি শব্দ করা হয় আর সেই শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। শেষে দেখা গেল যে শব্দ করা না হলেও কেবলমাত্র ঐ লোমওয়ালা খেলনা কুকুরটি কাছে আনলেই আর্থার ভয় পেয়ে কেঁদে উঠছে। অর্থাৎ উচ্চশব্দ থেকে সৃষ্ট ভয়-রূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি অনুবর্তিত হয়ে কৃত্রিম উদ্দীপক লোমওয়ালা কুকুরে সঞ্চালিত হয়ে গেছে।

বস্তুত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ভয় এইভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বস্তু থেকে বহু বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধকারকেও ছোট শিশু প্রথম প্রথম ভয় করে না। কিন্তু পরে অনুবর্তনের ফলে উচ্চশব্দ থেকে তার ভয় অন্ধকারেতে সঞ্চালিত হয়ে যায়। রাত্রে অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কোন উচ্চ শব্দ শুনে ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভেঙে যায় এবং সে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। ফলে অন্ধকারের মধ্যে উচ্চ শব্দ শুনে ভয় পাওয়া থেকে শিশু অন্ধকারকেই পরে ভয় করতে সুরু করে। এখানে ভয় রূপ প্রতিক্রিয়াটি তার উচ্চ-শব্দ রূপ স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে সঞ্চালিত হয়ে অন্ধকার রূপ কৃত্রিম উদ্দীপকে অনুবর্তিত হয়ে গেল। একটি অনুবর্তিত বস্তু থেকে ভয় আবার আর একটি নতুন বস্তুতে অনুবর্তিত হতে পারে। সেখান থেকে আবার আর একটি নতুন বস্তুতে। এই ভাবে এক বস্তু থেকে অসংখ্য বস্তুতে শিশুর ভয় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কেবল ভয় নয়, শিশুর ঘৃণা, বিরক্তি, সন্তুষ্টি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি মনোভাব-গুলিও এই ভাবে অনুবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। যেমন, গণিত শিক্ষার পদ্ধতি বা গণিতের শিক্ষকের আচরণ যদি শিশুর কাছে বিরক্তিকর হয় তবে ঐ পদ্ধতি বা
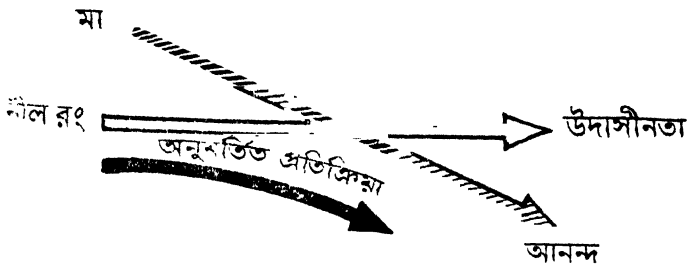
[মা'র প্রতি অনুভূত স্বাভাবিক আনন্দবোধ কালক্রমে মা'র পরিহিত কাপড়ের নীলরঙে অনুবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।]

শিক্ষকের প্রতি বিরাগ গণিতশাস্ত্রে (যার প্রতি আগে তার বিরাগ ছিল না) সঞ্চালিত

হয়ে যায় এবং শিশু পরে গণিতকে এড়িয়ে চলে। শিশুর আনন্দ, ভালবাসা, প্রীতিও এইভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে সঞ্চালিত হয়ে যায়। যেমন, শৈশবে শিশুর মা প্রায়ই নীলরঙের কাপড় পরতেন এবং সেই পরিচ্ছদেই শিশুর আদর, যত্ন, পরিচর্যা করতেন। ফলে দেখা গেল যে মায়ের প্রতি অনুভূত শিশুর স্বাভাবিক আনন্দবোধ কালক্রমে মার পরিহিত কাপড়ের নীলরঙে সঞ্চালিত হয়ে গেছে এবং সে বড় হয়ে নীল রঙ পছন্দ করতে সুরু করেছে।

অপানুবর্তন[1]

কোন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কৃত্রিম উদ্দীপকে অনুবর্তিত হবার পর নানা কারণে সেই অনুবর্তন লোপ পেতে পারে। অর্থাৎ তখন কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি আর প্রকাশ পায় না। যেমন, কুকুরের ক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দে লালাক্ষরণ হওয়া রূপ অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি পরে কোন কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তখন ঘণ্টাধ্বনি শুনে কুকুরের লালাক্ষরণ আর না হতে পারে। অনুবর্তন একবার ঘটার পর এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে অপানুবর্তন বলা হয়।

অনুবর্তনের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি দীর্ঘ কাল কৃত্রিম উদ্দীপক থেকে বিচ্যুত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যদি কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে দীর্ঘকাল উপস্থাপিত না করা হয় তাহলে ক্রমশ অনুবর্তন শিথিল হয়ে যেতে থাকে এবং শেষে এমন একটি সময় আসে যখন অনুবর্তনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। যেমন খাবার দেওয়া আর ঘণ্টা বাজানো একসঙ্গে সম্পন্ন করার ফলে দেখা গেল যে কিছুকাল পরে খাবার ছাড়াই কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই কুকুরটির লালাক্ষরণ হয়। অর্থাৎ লালাক্ষরণ রূপ প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে অনুবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে লালাক্ষরণের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটি সময় এসেছে যখন ঘণ্টা বাজালে আর লালাক্ষরণ হয় না। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াটির অনুবর্তন লুপ্ত হয়েছে বা এক কথায় তার অপানুবর্তন ঘটেছে।

পুনরুপস্থাপনের সূত্র[2]

কিন্তু যখন লালাক্ষরণ এইভাবে কমে আসে তখন যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপক অর্থাৎ খাদ্য দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আবার আগের মতই লালাক্ষরণ হতে সুরু হয়েছে। অর্থাৎ অনুবর্তন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি সক্রিয় থাকার সময় যদি কৃত্রিম উদ্দীপকটির সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে মাঝে মাঝে উপস্থাপিত করা যায় তবে অনুবর্তনের দৃঢ়তা বজায় থাকে এবং অপানুবর্তন ঘটে না। অনুবর্তনকে বজায় রাখার জন্য প্যাভলভ কৃত্রিম উদ্দীপকের পরিবর্তে স্বাভাবিক উদ্দীপকটির মাঝে

1. Deconditioning 2. Law of Reinforcement

মাঝে এই উপস্থাপনের নাম দিয়েছেন পুনরুপস্থাপন প্রক্রিয়া। বস্তুত থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র এবং প্যাভলভের পুনরুপস্থাপনের সূত্র দুটি মূলত অভিন্ন। শিখনের স্থায়িত্ব যে প্রাণীর তৃপ্তিবোধের উপর নির্ভর করে এই মূলকথাই উভয় সূত্রের বক্তব্য।

শিক্ষায় অনুবর্তন প্রক্রিয়া

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব যে কত গভীর তা আমরা সহজে ধারণা করতে পারি না। বস্তুত শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশে অনুবর্তনের ভূমিকা যেমন ব্যাপক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, শিশুর ভাষাশিক্ষায় অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর। শিশু তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার রাজ্যের বিভিন্ন বস্তুর নাম শেখে অনুবর্তন প্রক্রিয়ারই মাধ্যমে। প্রথম প্রথম শিশু কেবলমাত্র অর্থহীন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে। কিন্তু ক্রমশ সে দেখে যে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তার প্রতি সাড়া দেয় বা বিশেষ বিশেষ বস্তু তার কাছে এগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন মা-মু-মু বললে মা তার কাছে আসেন, জ-জ বললে তাকে জল দেওয়া হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই ঐ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে ঐ বিশেষ বিশেষ শব্দ শিশুর কাছে সংশ্লিষ্ট বা অনুবর্তিত হয়ে যায়। পরে ঐ ব্যক্তিকে বা বস্তুটি দেখলে বা বোঝাতে গেলে তার ঐ শব্দটি মনে হয় এবং সে তখন ঐ শব্দটি উচ্চারণ করে। এইভাবেই সে মাকে 'মা' বলতে, জলকে 'জল' বলতে শেখে। শিশু যে তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর নাম শেখে তা এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই এবং এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিশু বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের অর্থ ও ব্যবহার শিখে থাকে।

দ্বিতীয়ত, শিশুর বহু মৌলিক আচরণ অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফলজাত। যে সকল অভ্যাস শিশু অজ্ঞাতে আহরণ করে সেগুলির অধিকাংশ যে অনুবর্তনের মাধ্যমে অর্জিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা বা শুতে যাওয়া, ইত্যাদি। তাছাড়া সামাজিক আদব-কায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আচরণগুলিও অনুবর্তনের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে।

তৃতীয়ত, প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অনুবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বহু ক্ষেত্রে কোন কিছুর প্রতি অপছন্দ, ভয়, ঘৃণা, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি অনুবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। স্কুলের বহু ছেলেমেয়ের কাছে গণিত এবং ইংরাজী প্রায়ই বিশেষ বিরাগ এবং ভীতির বস্তু হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। এই প্রতিকূল মনোভাব নিছক অনুবর্তনের ফল। প্রথম যখন শিশু বিষয় দুটি শিখতে যায় তখন তার মধ্যে যথেষ্টই স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি বা শিক্ষকের অতিরিক্ত শাসন বা শাস্তিদান প্রভৃতি থেকে যে স্বাভাবিক বিরাগ এবং ভীতি শিশুর মনে জন্মায়, সেগুলি

কিছুকাল পরে ঐ বিষয়টিতে অনুবর্তিত হয়ে যায় এবং পরে সে ঐ বিষয় দুটিকে ভয় করতে শেখে এবং এড়িয়ে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়াটা নির্ভর করছে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপর। সুতরাং যাতে শিক্ষণ-পদ্ধতির ত্রুটি বা কোন অ-প্রাসঙ্গিক কারণ থেকে সঞ্জাত প্রতিকূল প্রক্ষোভ শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক, স্কুল প্রভৃতির প্রতি অনুবর্তিত হয়ে ঐগুলির প্রতি শিশুর মনকে বিরূপ না করে তোলে সেদিকে পিতামাতা ও শিক্ষকমাত্রেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। বিদ্যালয়ের পরিবেশে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত বিদ্যালয়ের উপর, এমন কি লেখাপড়ার উপরও শিশুর বিরাগ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।

সু-অভ্যাসের মত কু-অভ্যাসও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবর্তন থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অসতর্কতা, অমনোযোগ, বানান ভুল প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাদের মূলেও অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রচুর প্রভাব আছে। আমরা নিজেরাই সময় সময় অজ্ঞতাবশত শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত অনুবর্তন সৃষ্টি করে থাকি। যেমন, শিক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় কোন ভুল করলে আমরা লাল কালির দাগ দিয়ে থাকি। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঐ ভুলটির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সাধারণভাবে লাল রঙের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভীতি (এও অবশ্য আর একটি অনুবর্তনের ফল)। ফলে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ ভুলগুলি শিশুর কাছে ভীতির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে নিজের অজ্ঞাতেই ঐ ভুলগুলি শোধরাবার চেষ্টা না করে সেগুলি এড়িয়ে যায়। যাতে শিশুর মধ্যে এই শ্রেণীর অবাঞ্ছিত অনুবর্তনের সৃষ্টি না হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। অপর পক্ষে শিক্ষক পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত অনুবর্তনও সৃষ্টি করতে পারেন। সমাজজীবনের রীতি-নীতি, ভদ্রতা, লৌকিকতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, উদার মনোভাব, মনোযোগের অভ্যাস, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বস্ততা প্রভৃতি নানা বাঞ্ছিত গুণ সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত অনুবর্তনের মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে।

৪। শিখনের ফিল্ড তত্ত্ব[1]

অতি সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি মনীষী-মহলে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে সেটি 'ফিল্ড সাইকোলজি' নামে খ্যাত। জার্মান মনোবিজ্ঞানী কার্ট লুইন[2] মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির জন্মদাতা। প্রকৃতির দিক দিয়ে ফিল্ড তত্ত্বটি আধুনিক গেষ্টাল্ট মতবাদের সমগোত্রীয় এবং মৌলিক ধারণার ক্ষেত্রে

1. Field Theory of Learning 2. Kurt Lewin

এ দুটি তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। তবু মানব আচরণের সংব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ফিল্ড তত্ত্বের এমন কতকগুলি অভিনবত্ব আছে যার জন্য এটিকে একটি স্বতন্ত্র মত-বাদরূপে আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই গ্রহণ করে থাকেন। কার্ট লুইন অবশ্য শিখনের উপর কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব দিয়ে যান নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ এবং বিশেষ করে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, প্রেষণা প্রভৃতি সমস্যা নিয়েই তিনি বিশদ গবেষণা করেন। বরং শিখন সম্বন্ধেই কোন আলোচনা তাঁর পুস্তকে স্থান পায়নি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের[1] যে পরিকল্পনাটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন সেটিকে ভিত্তি করে আমরা শিখনের একটি সুসংহত 'ফিল্ড তত্ত্ব' গঠন করতে পারি।

মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের স্বরূপ

শিখনের ফিল্ড তত্ত্ব বুঝতে হলে কাকে ফিল্ড বলে তা বোঝা সব আগে দরকার। ফিল্ড বলতে কার্ট লুইন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বুঝিয়েছেন যার মধ্যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। এক কথায় ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত বিভিন্ন শক্তিগুলি নিয়ে যে পরিবর্তনশীল মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেত্রটি রচিত হয়ে থাকে সেইটিকেই 'ফিল্ড' বলা হয়।

ফিল্ডের পরিসীমা এবং ব্যক্তির পরিবেশের পরিসীমা পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন। তবে পরিবেশর বলতে ব্যক্তির চারপাশে যে বস্তুসমষ্টি আছে তাকেই বোঝায় না। পরিবেশ বলতে সেই সব বস্তু ও শক্তির সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তির বর্তমানের চাহিদা, উপলব্ধি ও আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তির পরিবেশে এমন অনেক বস্তু থাকতে পারে যেগুলির সঙ্গে ব্যক্তির এই মুহূর্তে কোন সম্পর্ক নেই। অতএব সেই বস্তুগুলি তার মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র সেই সব বস্তু ও শক্তি দিয়েই ব্যক্তির এই মুহূর্তের ফিল্ডটি তৈরী হবে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ফিল্ড তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির সমস্ত আচরণই এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড থেকে সৃষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণভাবে ফিল্ডটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ ঐ মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির অন্তর্গত ব্যক্তি নিজে এবং তার সঙ্গে যে সব বস্তু অবস্থিত সে সবই একসঙ্গে মিলে ব্যক্তির আচরণের জন্ম দেয়। ব্যক্তির জীবন সংশ্লিষ্ট অতীতের কোন শক্তি বা ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা তার বর্তমান আচরণকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত করে না। তার সমস্ত আচরণ পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বর্তমান কালের ঐ মনোবিজ্ঞান-মূলক ফিল্ডটির দ্বারা।

অস্তিবাচক শক্তি ও নেতিবাচক শক্তি[2]

কোন বস্তু ব্যক্তির ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ভর করে বস্তুটি ব্যক্তির চাহিদার

1. Psychological Field 2. Positive Valence and Negative Valence

সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তার উপর। যে বস্তুগুলি ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে সক্ষম সেগুলিকে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু, আর যেগুলি তার চাহিদা মেটাতে পারে না সেগুলিকে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়। এ দু'ধরনের বস্তু ব্যক্তির মধ্যে দু'ধরনের আচরণ সৃষ্টি করে। অস্তিবাচক শক্তি সম্পন্ন বস্তু ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে 'আকর্ষণ', অর্থাৎ ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে যায় আর নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে 'বিকর্ষণ', অর্থাৎ ব্যক্তি সেই বস্তু থেকে দূরে সরে আসে। ব্যক্তির কাছে তার লক্ষ্যে পৌঁছনর পথে যে কোন বাধাই হল এই রকম নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু। তবে ব্যক্তি যতক্ষণ না বাধাটির সম্মুখীন হচ্ছে বা সেটিকে দূর করার চেষ্টা করছে ততক্ষণ সেটির মধ্যে কোন নেতিবাচক শক্তির সৃষ্টি হয় না। যখন ব্যক্তি তার লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য বাধাটি দূর করার চেষ্টা করে তখন সেটি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

শিখনের ফিল্ড[1]

শিখনের পরিস্থিতিও এই ধরনের একটি বিশেষধর্মী মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের সৃষ্টি করে। এই ফিল্ডে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে। কিন্তু এক বা একাধিক বাধা তার লক্ষ্যে পৌঁছনর পথে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। এখানে লক্ষ্যটি হল এমন বস্তু যা তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারে। অতএব সেটি হল তার কাছে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন এবং ফিল্ডের অন্তর্গত যে সকল বস্তু তার ঐ লক্ষ্যে পৌঁছনর প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য করে সেগুলি তার কাছে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন। এই বস্তুগুলি ব্যক্তির মধ্যে 'আকর্ষণমূলক' আচরণ সৃষ্টি করে। কিন্তু যে বস্তু বা বস্তুগুলি তার সেই লক্ষ্যে পৌঁছনর পথে বাধার সৃষ্টি করে সেই বস্তুটি বা বস্তুগুলি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই বস্তু বা বস্তুগুলি ব্যক্তির মধ্যে 'বিকর্ষণমূলক' আচরণের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তি সেগুলি দূর করার চেষ্টা করে বা সেগুলি এড়িয়ে যায়। এই বিভিন্নধর্মী শক্তিগুলির সমন্বয়ে যে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিলডটি তৈরী হয় সেই ফিলডটিই ব্যক্তির শিখনমূলক আচরণধারার জন্ম দেয়।

ফিল্ডের পুনর্গঠন[2]

লুইনের মতে যখন একটি বিশেষ ধরনের আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে তার লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব হয়ে উঠছে না অর্থাৎ বর্তমান ফিল্ডটি যখন তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারছে না তখন সে সেই ফিল্ডের পুনর্গঠন করে। অর্থাৎ ফিল্ডের শক্তিগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয় এবং তারই ফলে ফিল্ডের অন্তর্গত নেতিবাচক শক্তিগুলিকে হয় সে পরাভূত করে, নয় সাফল্যের সঙ্গে এড়িয়ে যায়। ফিল্ডের এই পুনর্গঠন থেকেই আসে শিখন বা সমস্যার সমাধান।

---

1. Field of Learning 2. Restructure of Field

একটি শিখনের সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে ফিল্ডের এই পুনর্গঠনের ঘটনাটি বোঝান যায়। শিশুর সামনে একটি টেবিলে রয়েছে চকোলেট আর মাঝখানে রয়েছে একটি বেঞ্চ। এখানে চকোলেটটি শিশুর চাহিদা মেটাতে সমর্থ, অতএব অস্তিবাচক শক্তি-সম্পন্ন এবং শিশু সেটির দিকে এগিয়ে যাবার আকর্ষণ বোধ করছে। কিন্তু মাঝখানের বেঞ্চটি তার পথে বাধার সৃষ্টি করছে এবং সেইজন্য সেটি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই যে ফিল্ডটি (চিত্র—১) তৈরী হয়েছে এতে শিশুর পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ তার শিখন সম্ভব হচ্ছে না।

শিখন পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন
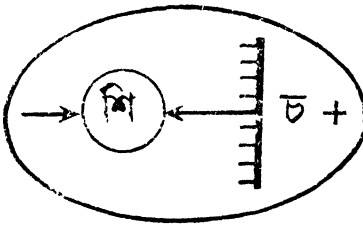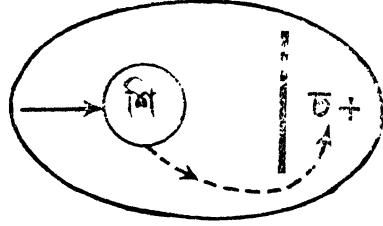
চিত্র—১ চিত্র—২

প্রথম চিত্রে শিশু চকোলেটের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। কিন্তু মধ্যবর্তী বেঞ্চটি তার উপর নেতিবাচক শক্তির প্রয়োগ করে তার আচরণকে প্রতিরুদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় চিত্রে শিশু তার ফিল্ডের পুনর্গঠন করেছে। তার ফলে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বেঞ্চটিকে এড়িয়ে সে তার লক্ষ্য চকোলেটে পৌঁছেছে।

কিন্তু শিশু কিছুক্ষণ সোজাপথে চকোলেটে পৌঁছবার চেষ্টা করার পর (এখানে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি থাকতে পারে) হঠাৎ চকোলেটে যাবার ঘোরাপথটি আবিষ্কার করে এবং সেই পথে চকোলেটে পৌঁছয় (চিত্র—২)। এইভাবে সে তার সমস্যার সমাধান করে এবং তার শিখন ঘটে। এখানে প্রকৃতপক্ষে শিশুটি তার পূর্বের মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির পুনর্গঠন এবং নতুন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের সৃষ্টি করে এবং তাই থেকেই সমস্যার সমাধান দেখা দেয়। বলা বাহুল্য এই সমাধানটি আসে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। অতএব আমরা বলতে পারি যে মনো-বিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন থেকেই শিখন আসে।

শিখনের এই ফিল্ড তত্ত্বটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে। প্রথম, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রেষণা জাগলে ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তার ফলেই ব্যক্তি আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, মনোবিজ্ঞান-মূলক ফিল্ডের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সোপান হল অনুসন্ধান ও

পর্যবেক্ষণ এবং এই প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন থেকেই ফিল্ডের পুনর্গঠন হয়। এই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি থাকতে পারে। এখানে গেষ্টাল্ট তত্ত্বের সঙ্গে ফিল্ড তত্ত্বের একটি বড় পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। গেষ্টাল্টবাদীরা শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের ভূমিকাকে একেবারেই স্বীকার করেন না। তবে ফিল্ডের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে যে সমস্যার সমাধান দেখা দেয়, তার মূলে আছে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ। এই ক্ষেত্রে অবশ্য গেষ্টাল্ট তত্ত্ব ও ফিল্ড তত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ন

শিখনের যে তত্ত্বগুলি আমরা আলোচনা করলাম সেগুলির সমর্থকগণ দাবী করেন যে একমাত্র তাঁদের সমর্থিত পদ্ধতিটির মাধ্যমেই শিখন সংঘটিত হয় এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে শিখন হয় না। যেমন, থর্নডাইকের মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমেই সব শিখন হয়। গেষ্টাল্টবাদীদের মতে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সব শিখন হয়, আবার আচরণবাদীরা বলেন যে সকল শিখনই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে। প্রকৃত পক্ষে আলোচিত এই তিনটি পদ্ধতিতেই শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির ব্যবহার হয়। আর কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ পদ্ধতিটি কার্যকর হবে তা নির্ভর করে তিনটি বস্তুর উপর। প্রথমত, শিখনের বিষয়বস্তুটির স্বরূপ। দ্বিতীয়ত, শিখন-পরিস্থিতির প্রকৃতি এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা।

অতি প্রাথমিক, সরল এবং সহজ প্রকৃতির শিখন কাজগুলি প্রাণী শেখে অনুবর্তনের মাধ্যমে। শিখন পদ্ধতিরূপে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক, স্বতঃপ্রসূত এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাণীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণী নতুন আচরণ, অভ্যাস, মনোভাব, ভাবধারা প্রভৃতি তার অজ্ঞাতসারে শিখে থাকে।

যে সকল ক্ষেত্রে শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বদ্ধ ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং যেখানে শিখনের লক্ষ্যটি স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখে থাকে। কিন্তু যখন শিখন পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত এবং লক্ষ্যটি তার কাছে পূর্ণ ভাবে জ্ঞাত থাকে তখন শিক্ষার্থী শেখে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। সকল প্রকার কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটি বদ্ধ প্রকৃতির হওয়ায় ব্যক্তিকে সেগুলি আয়ত্ত করতে হয় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে। যেমন, টাইপ করা, মটর গাড়ী চালান, সাঁতার কাটা, কোন শিল্প কাজ করা প্রভৃতি কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয় এবং বার বার ভুল করার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়। আধুনিক

মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শেখা—এ দুটি পদ্ধতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুবই অল্প। তাঁরা বলেন যে প্রথম ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়াটি মূর্ত, প্রকাশিত এবং বাহ্যিক আচরণের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়াটিই সংঘটিত হয়, তবে তা থাকে অমূর্ত, অপ্রকাশিত এবং মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ।

এই সত্যটি শিখনের ফিল্ড তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রমাণিত হয়। ফিল্ডের পরিবর্তন বা পুনর্গঠনের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু যে মুহূর্তে ফিল্ডটি পুনর্গঠিত হয়ে যায় তখনই অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ ঘটে। এই জন্য ফিল্ড তত্ত্বকে একদিক দিয়ে আমরা প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতির সমন্বয় বলে বর্ণনা করতে পারি।

প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখনের পদ্ধতি অনেকখানি নির্ভর করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কাজটি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সম্পন্ন করে, অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি সেই একই কাজ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। কোন মানুষ পথে যেতে যেতে যদি সামনে কোন বাধা দেখে তবে সে ইতস্তত না করে সেটা ঘুরে পার হয়ে যাবে। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী সেই ক্ষেত্রে বার কয়েক সেই বাধায় ধাক্কা খেয়ে তার পরে সেই বাধাটা সে ঘুরে যায়। এখানে মানুষের উন্নত বিচার শক্তি থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্য নিতে হল না, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের উন্নত মানসিক ক্ষমতা না থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে শিখতে হল।

ওয়াসবার্নের শিখনের সমন্বয়ন তত্ত্ব

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবার্ন[1] শিখনের তিনটি বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় করে একটি শিখন তত্ত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে যদি শিখন প্রক্রিয়াটিকে তার উৎপত্তি বা সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে আমরা পরম্পরা-সম্পন্ন বা অনুক্রমিক কতকগুলি ঘটনা বা সোপান পাব। সেগুলি হল—

১। পরিচয়স্থাপন[2]
২। পরিবেশ পরীক্ষণ[3]
৩। সম্প্রসারণ[4]
৪। পরিস্ফুটন[5]
৫। সরলীকরণ[6]
৬। যান্ত্রিকীকরণ[7]
৭। পুনঃ পরিচয়স্থাপন[8]

পরিচয়স্থাপন বলতে বোঝায় সমস্যাটির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা। এইটি শিখন প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। তার পরের সোপানে ব্যক্তি সমস্যাটির সমাধানের জন্য বিভিন্ন সম্ভাব্য পন্থা ও উপায়গুলি পরীক্ষণ করে। তৃতীয় সোপানে সমস্যা সম্বন্ধে

1. Washburne 2. Orientation 3. Exploration 4. Elaboration 5. Articulation 6. Simplification 7. Automatisation 8. Reorientation

সে নিজের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করে এবং তার সমাধানের পদ্ধতিকে উন্নত করে তোলে। চতুর্থ বা পরিস্ফুটনের স্তরে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছনর পন্থাটিকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সংগঠিত করে। সরলীকরণের স্তরে অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সে বাদ দেয়। যান্ত্রিকীকরণের স্তরে সমস্যা সমাধানের উপযোগী আচরণটি বার বার সম্পন্ন করে সেটিকে সে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে। শেষ স্তরে ব্যক্তি তার নতুন শেখা আচরণ ও অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যাটির অন্তর্নিহিত সাধারণ সূত্রগুলি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করে এবং সমস্যাটির সঙ্গে তার নতুন করে পরিচিতি ঘটে।

এখন ওয়াসবার্নের মতে যে সব মনোবিজ্ঞানী উপরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এই সামান্যীকরণ বা পরিচয়স্থাপন প্রক্রিয়াটির উপর জোর দেন তাঁরাই বলেন যে সব শিখনই সম্পন্ন হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। আর যে সব মনোবিজ্ঞানী পরিবেশ পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ, পরিস্ফুটন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তাঁরা শিখনকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে থাকেন। আর যাঁরা সরলীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তাঁরা শিখনকে নিছক অনুবর্তন প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেন।

শিখনের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব : মাওরার[1]

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি – এই দু'শ্রেণীর শিখন মূলগত-ভাবে অভিন্ন বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী শিখনের কেবলমাত্র দুটি মৌলিক শ্রেণী-বিভাগকে স্বীকার করে থাকেন। যেমন, মাওরার সমস্ত শিখনকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) অনুবর্তন বা উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন[2] এবং (২) সমস্যা সমাধান বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন[3]। অনুবর্তনের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবর্তিত হয়ে নতুন উদ্দীপক তার স্থান নেয়। যেমন, লালাক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রথমে উদ্দীপক ছিল 'খাদ্য' পরে অনুবর্তনের ফলে উদ্দীপক হয়ে গেল 'ঘন্টাধ্বনি'। সেইজন্য অনুবর্তনকে উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন বা একটি উদ্দীপকের স্থানে আর একটি উদ্দীপকের স্থাপনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

'সমস্যা সমাধান' নামক শিখন বলতে মাওরার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি উভয়কেই বুঝিয়েছেন। এ দু'ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক একই থাকে, কিন্তু পুরাতন প্রতিক্রিয়ার বদলে নতুন একটি প্রতিক্রিয়া তার জায়গা নেয়। যেমন, বিড়াল বা শিম্পাঞ্জী উভয়ের ক্ষেত্রেই 'খাদ্যই' ছিল একমাত্র উদ্দীপক। কিন্তু শিখনের ফলে এই উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বদলে নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সেজন্য এই শ্রেণীর শিখনকে প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন বা একটি

1. Mowrer's Two-Factor Theory of Learning 2. Stimulus Substitution
3. Response Substitution

প্রতিক্রিয়ার স্থানে আর একটি প্রতিক্রিয়ার স্থাপন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের শিখনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্যে একটা সমস্যা বিদ্যমান থাকে এবং সেই সঙ্গে প্রাণীর সে সম্বন্ধে সচেতনতাও থাকে।

মাওরারের মতে অভ্যাস, জ্ঞান, ভাষার বোধ, দৈহিক কৌশল ইত্যাদি ইচ্ছামূলক কাজগুলি সমস্যা-সমাধান-রূপ শিখনের পর্যায়ে পড়ে। এই কাজগুলি সাধারণত আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকি।

অনুবর্তনধর্মী শিখনের পর্যায়ে পড়ে সমস্ত প্রক্ষোভমূলক শিখন, যেমন, ভালবাসা, রাগ, ভয়, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদির সৃষ্টি। তাছাড়া আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ, মনোভাব ইত্যাদিও ব্যক্তি অর্জন করে অনুবর্তনের মাধ্যমে।

অনুবর্তনধর্মী শিখনের ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন হয় সান্নিধ্যের সূত্রটি[1] তেমনই সমস্যা সমাধানমূলক শিখনের ব্যাখ্যা করতে ফললাভের সূত্রটির[2] সাহায্য অপরিহার্য।

'টাটল'-'এর শিখনের শ্রেণীবিভাগ

টাটল[3] নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানীও শিখনকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা (১) জ্ঞানমূলক শিখন—এতে পড়ে কৌশল শিক্ষা, তথ্য মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি এবং (২) প্রক্ষোভমূলক শিখন—এর অন্তর্গত হল মনোভাব, কাজের প্রেষণা, আগ্রহ, নৈতিকবোধ, সৌন্দর্যবোধ, রুচি ইত্যাদির গঠন। টাটলের এই বিভাজনটি অনেকটা মাওরারের বিভাজনেরই অনুরূপ।

শিখনের অন্যান্য তত্ত্বাবলী

স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন তত্ত্ব, গুথরির সান্নিধ্যমূলক অনুবর্তনের তত্ত্ব, টোলম্যানের চিহ্নমূলক শিখনের তত্ত্ব এবং হাল'র সুসংবদ্ধ আচরণ শিখনের তত্ত্ব, এই চারটি শিখন তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে।

কার্যকর শিখনের সর্তাবলী[4]

শিখনের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ আলোচনা করে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সমস্ত শিখন প্রচেষ্টাই সব সময়ে কার্যকর হয় না। শিখনের কার্যকারিতা নানা বিভিন্ন সর্তের উপর নির্ভর করে। আর যদি সেই বিশেষ সর্তগুলি পূর্ণ না হয় তাহলে সময় ও পরিশ্রমের অযথা অপচয় হয়, সার্থক শিক্ষা ঘটে না। মনোবিজ্ঞানীরা যে যে সর্তগুলি কার্যকর বা সার্থক শিখনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন সেগুলির একটা তালিকা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

---

1. Law of Contiguity 2. Law of Effect 3. Tuttle 4. Conditions of Effective Learning

১। প্রস্তুতি

প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার যে স্তর বা মান অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে তার জন্য পর্যাপ্ত মানসিক পরিণতি, অন্যান্য উপযোগী ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতা। এই হল জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। এছাড়াও প্রয়োজন প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার উপযোগী অনুকূল প্রক্ষোভ শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা চাই।

২। প্রেষণা

কার্যকর শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রেষণাই শিখনের প্রচেষ্টাকে জাগায়, তাকে সক্রিয় রাখে, তার গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং তার তীব্রতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত প্রেষণা শিক্ষামাত্রেরই অপরিহার্য সর্ত। অবশ্য প্রেষণার সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষার্থীর নিজের সাফল্য বা ফলাফল সম্বন্ধে সচেতনতা। বস্তুত, প্রেষণা এবং শিখনের ফল সম্বন্ধে সচেতনতা—এই দুটি বস্তু এক সঙ্গে মিলিত হয়ে শিখন প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত করে।

৩। শিখন পরিচালনা

যাতে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যটি ভাল করে চিনতে পারে, তার প্রতি মনোযোগ দেয় এবং তাতে পেঁছিনর চেষ্টা করতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে যথাযথ পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া লক্ষ্যে পেঁছিনর জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অনুযায়ী তার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করাও শিখন পরিচালনার অন্তর্গত। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে শিক্ষার্থী ভুল প্রচেষ্টা করতে পারে এবং তার ফলে তার শিখন বিলম্বিত, এমন কি না ঘটতেও পারে।

৪। অনুকূল পরিবেশ

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কোনও পরিস্থিতির অন্তর্গত সর্বজনীন বা মৌলিক তত্ত্বটি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থী আহরণ করে। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে বর্তমান সমস্যার উপযোগী প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় এবং শিক্ষার্থীর পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতা যদি সমস্যা সমাধানের উপযোগী না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কার্যকর শিখন লাভ করা সম্ভব হয় না।

৫। অনুশীলন

সমস্যার বিশ্লেষণ, বিভেদীকরণ, অধিকতর কার্যকর প্রতিক্রিয়ার উদ্ভাবন ও

সেগুলির মধ্যে সমন্বয়নের জন্য লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা বার বার সম্পন্ন বা অনুশীলন করা কার্যকর শিখনের অন্যতম সর্ত।

৬। ফলের প্রত্যক্ষণ

নিজের প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলাফল প্রত্যক্ষণ করা এবং পূর্বগামী প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে অনুগামী প্রচেষ্টার ত্রুটি সংশোধন করা সার্থক শিখনের জন্য অপরিহার্য।

৭। শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থা

পূর্বের শিখন পরিস্থিতি থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সেগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করাও সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৮। সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাদান

সমস্যার অর্থ ও স্বরূপ, শিখনের তত্ত্ব ও পদ্ধতির তুলনামূলক উপযোগিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সার্থক শিখনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত।

৯। মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি

আত্মবিশ্বাস, প্রফুল্লতা, মানসিক সাম্য, উদ্বেগহীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিও কার্যকর শিখনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। মানসিক অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা, বিকৃত মনোভাব, ইত্যাদি সার্থক শিক্ষার পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এইজন্য আধুনিক কালে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষাসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ বলে গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন সর্তাবলীর গুরুত্ব ও প্রয়োগ : শিক্ষকের কর্তব্য

বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত সার্থক শিখনের সর্তগুলি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, কেবল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। সে শিক্ষা সত্যই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কার্যকর হল কিনা তা দেখাও তাঁর একান্ত কর্তব্য। এইজন্য যাতে শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে উপরের সর্তগুলি ঠিকমত পালিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে শিখনের এই সর্তাবলীর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগিতা বোঝান যায়।

শিখনের সর্তাবলীর প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত

ধরা যাক, শিক্ষার্থীকে 'সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ' পড়ান হচ্ছে। এ বিষয়টির সুষ্ঠু শিখনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। অর্থাৎ মানব সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ ও মূল্য হৃদয়ঙ্গম করার উপযোগী মানসিক পরিণতি শিক্ষার্থীর আছে কিনা তা আগেই পরীক্ষা করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ তার শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল কিনা তারও বিচার করতে হবে। এক কথায় শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করার মত মানসিক ও প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতি শিক্ষার্থীর আছে কিনা শিক্ষককে তা প্রথমে দেখতে হবে। এই উভয় প্রকার প্রস্তুতি থাকলেই শিখন কার্যকর হবে নইলে নয়।

দ্বিতীয় ধাপে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী ঐ বিশেষ বিষয়বস্তুটি শেখার জন্য যথেষ্ট প্রেষণা বা আগ্রহ অনুভব করছে কিনা। মানবগোষ্ঠীর একজন সদস্যরূপে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিবরণ জানার ইচ্ছা যাতে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয় তার আয়োজন করতে হবে শিক্ষককেই।

তৃতীয় সর্তটি হল যথাযথ শিখন-পরিচালনা। কি ভাবে, কোন্ পথে এবং কোন্ কোন্ উপাদানের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে জানতে পারবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থী তার সমস্যা সমাধানের উপযোগী প্রচেষ্টা করতে সমর্থ হবে। সিন্ধুসভ্যতার অবস্থিতি, সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য, তাদের ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও সামগ্রী থেকে শিক্ষার্থী সে যুগের অধিবাসীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর বার বার প্রচেষ্টা বা অনুশীলনেরও প্রয়োজন হবে। একই বস্তু বার বার দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বগুলি অনুশীলন করতে হবে এবং বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলির প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক সূত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

এই প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী দেখতে পাবে যে অনেক নতুন নতুন তত্ত্বের সঙ্গে সে পরিচিত হচ্ছে এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য সে শিখতে পারছে। তার ফলে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রচেষ্টার ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। যত নতুন তথ্য সে জানবে ও শিখবে ততই তার মধ্যে আরও বেশী করে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখা দেবে। তার লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি থেকে তিন প্রকারের শিখন সঞ্চালন হতে পারে, যথা—বর্তমান ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করা, নতুন শেখা ধারণাগুলি থেকে সামান্য সূত্র গঠন করা এবং বর্তমান শিখনকে পরবর্তী শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা।

শিখনের সার্থকতা সব শেষে নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যকর মনোভাবের উপর।

অনুশীলনী

১। সংযোজনবাদ বলতে কি বোঝ? এই তত্ত্ব অনুযায়ী কি ভাবে শিখন ঘটে বল।

২। থর্নডাইক প্রদত্ত ভুল-ও-প্রচেষ্টার পদ্ধতির তত্ত্ব অনুসারে কিভাবে শিখন ঘটে? বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতির কি প্রভাব আছে বল।

৩। থর্নডাইকের দেওয়া শিখনের প্রধান সূত্রগুলি বর্ণনা কর এবং এগুলির সাহায্যে কিভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা যায় বল।

৪। মানব শিশুর শিখনে ভুল-ও-প্রচেষ্টার পদ্ধতি ও অন্তর্দৃষ্টি পদ্ধতির তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫। শিখনের গেস্টাল্ট মতবাদটি বর্ণনা কর। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অর্থবোধক বিষয়াদি কিভাবে শেখা যায় বল।

৬। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে কিভাবে শিখন ঘটে বর্ণনা কর। এই পদ্ধতির স্বপক্ষে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। বিদ্যালয় শিক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। সমালোচনা সহযোগে শিখন প্রক্রিয়ার ফলভোগের সূত্রটি আলোচনা কর।

৮। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে শিখন ঘটে প্যাভলভের বিখ্যাত পরীক্ষণটির সাহায্যে বর্ণনা কর। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রভাব আলোচনা কর।

৯। অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া কাকে বলে? প্রক্ষোভ কিভাবে অনুবর্তিত হয় বল। এই সংক্রান্ত একটি পরীক্ষণ বর্ণনা কর।

১০। শিখনের ফিল্ড তত্ত্বটি আলোচনা কর। মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড বলতে কাকে বোঝায়? কিভাবে এই তত্ত্বটি অন্যান্য তত্ত্বের থেকে উন্নত বর্ণনা কর।

১১। ওয়াসবার্ন কিভাবে শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির সমন্বয় করেছেন আলোচনা কর। তাঁর দেওয়া শিখনের প্রকৃতিটি বর্ণনা কর।

১২। শিখনের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি বর্ণনা কর।

১৩। কার্যকর শিখনের সর্তাবলীগুলি বর্ণনা কর। এই সর্তাবলী অনুযায়ী শিখন প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষকের কর্তব্য আলোচনা কর।

১৪। টীকা লেখ :—

(ক) অন্তর্দৃষ্টি (খ) অপানুবর্তন (গ) পুনরুপস্থাপনের সূত্র (ঘ) ফিল্ডের পুনর্গঠন (ঙ) টাটল-এর শিখনের শ্রেণীবিভাগ (চ) শিখনের উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া সংযোজনের মতবাদ (ছ) মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা

তেইশ

শিখনের আরও কয়েকটি তত্ত্ব

আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে শিখনের প্রধান কয়েকটি তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এই পর্যায়ে আমরা শিখনের আরও কয়েকটি বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

১। স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন তত্ত্ব[1]

শিখন তত্ত্বের আলোচনার সময় প্যাভলভের অনুবর্তন প্রক্রিয়ার তত্ত্বটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। স্কিনার এই অনুবর্তন প্রক্রিয়ারই একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। স্কিনারের প্রদত্ত এই নতুন অনুবর্তন তত্ত্বটি প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বেশ পৃথক।

প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্বটি বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বলে এটিকে অনুবর্তনের প্রাচীন তত্ত্ব[2] বলা হয়। সেদিক দিয়ে স্কিনারের অনুবর্তন তত্ত্বটিকে অনুবর্তনের সাম্প্রতিক তত্ত্ব বলা চলে।

স্কিনারের তত্ত্বটি বুঝতে হলে প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বটির একবার পুনরাবৃত্তি করে নেওয়া দরকার।

প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্ব

প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী কয়েকটি উদ্দীপকের স্বাভাবিক বা সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে। অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর কোন উদ্দীপক দেখা দিলে প্রাণী একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এই ধরনের উদ্দীপককে আমরা প্রাথমিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াকে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছি। যেমন, চোখে আলো পড়লে আমরা দেখি, কানে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করলে শুনি, জিভে খাদ্য স্পর্শ করলে লালাক্ষরণ ঘটে ইত্যাদি। এখন যদি এই ধরনের প্রাথমিক উদ্দীপকের সঙ্গে দ্বিতীয় একটি গৌণ উদ্দীপককে (গৌণ উদ্দীপক বলার কারণ হল যে এর কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া নেই) সংযুক্ত করা যায় অর্থাৎ ঐ প্রাথমিক উদ্দীপকের উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে ঐ গৌণ উদ্দীপকটিকে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কিছু সময় পরে ঐ গৌণ উদ্দীপকের উত্তরে ঐ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে। যেমন, খাদ্য রূপ প্রাথমিক উদ্দীপকের উত্তরে লালাক্ষরণ রূপ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। এখন যদি খাদ্য উপস্থাপনের সঙ্গে

---

1. Skinner's Theory of Operant Conditioning
2. Classical Theory of Conditioning

ঘণ্টা বাজান হয় তাহলে দেখা যাবে যে কিছুদিন পরে কেবল ঘণ্টা বাজান হলেই এবং খাদ্য না দেওয়া হলেও কুকুরের লালাক্ষরণ হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ গৌণ উদ্দীপকের উত্তরে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার এই এক উদ্দীপক থেকে আর এক উদ্দীপকে সঞ্চালনকে অনুবর্তন প্রক্রিয়া বলা হয়েছে। এই হল প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

যেহেতু প্রাথমিক উদ্দীপকটি নিজে অনুবর্তিত হচ্ছে না সেহেতু এটিকে অননুবর্তিত উদ্দীপকও[1] বলা হয়। আর যে উদ্দীপকটি প্রাথমিক উদ্দীপকের সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়, অর্থাৎ যেটিকে আমরা দ্বিতীয় বা গৌণ উদ্দীপক নাম দিয়েছি সেটিকে অনুবর্তিত উদ্দীপক[2] বলা হয়। কেননা, সেই উদ্দীপকের সঙ্গেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটি অনুবর্তিত হয়ে যায়। আর সেই কারণেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটিকে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া[3] বলা হয়।

পুনরুপস্থাপন

অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর একটি প্রক্রিয়া খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেটি হল রি-ইনফোর্সমেণ্ট[4] বা পুনরুপস্থাপন। দেখা গেছে যে গৌণ বা অনুবর্তিত উদ্দীপকটির উত্তরে প্রাথমিক বা অনুবর্তিত প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হওয়ার কাজটি কিছুদিন পর থেকে দুর্বল হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসে যখন অনুবর্তন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ অনুবর্তিত উদ্দীপকটির উত্তরে ঐ অনুবর্তিত প্রক্রিয়াটি আর ঘটে না। তখন যদি আবার সেই প্রাথমিক বা অননুবর্তিত উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করা যায় তাহলে অনুবর্তন আবার ফিরে আসে। যেমন, খাদ্যের সঙ্গে ঘণ্টা বাজানর ফলে কিছুদিন পরে দেখা গেল যে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই লালাক্ষরণ হচ্ছে। কিন্তু এই অনুবর্তন বেশী দিন রইল না। কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজানর ফলে লালাক্ষরণের মাত্রা ক্রমশ কমে আসতে থাকে এবং এমন একটা দিন এল যখন ঘণ্টা বাজালে আর লালাক্ষরণ ঘটল না। এখানে অনুবর্তন বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ অপানুবর্তন[5] ঘটল। কিন্তু আবার যদি কিছুদিন ঘণ্টা বাজানর সঙ্গে খাদ্য দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে খাদ্য ছাড়াই ঘণ্টা বাজানর উত্তরে লালাক্ষরণ প্রক্রিয়াটি আবার ঘটতে সুরু হয়েছে। অর্থাৎ আবার অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি ঘটছে। এখানে এই পুনরায় খাদ্য দেওয়া রূপ কাজটিকে পুনরুপস্থাপন প্রক্রিয়া বলা হয় এবং 'খাদ্য'কে অর্থাৎ যেটিকে আমরা ইতিপূর্বে অননুবর্তিত উদ্দীপক বলেছি সেটিকে পুনরুপস্থাপনমূলক উদ্দীপক[6] বলা হয়। ঘণ্টা বাজান রূপ কাজটি হল অনুবর্তিত উদ্দীপক এবং লালাক্ষরণ রূপ কাজটি হল অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া।

---

1. Unconditioned Stimulus 2. Conditioned Stimulus 3. Conditioned Response 4. Reinforcement 5. Deconditioning 6. Reinforcing Stimulus

রেসপণ্ডেণ্ট বা প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ এবং অপারেণ্ট বা স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণ

স্কিনারের অনুবর্তন তত্ত্বটি বুঝতে হলে পূর্বেই দুটি নামের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। স্কিনার প্রাণীর প্রতিক্রিয়া বা আচরণের মধ্যে দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যথা, রেসপণ্ডেণ্ট বিহেভিয়ার[1] বা প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ এবং অপারেণ্ট বিহেভিয়ার[2] বা স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণ। ওয়াটসন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মতবাদ অনুযায়ী প্রাণীর সব আচরণই উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। উদ্দীপক না থাকলে আচরণও ঘটবে না। কিন্তু স্কিনারের মতে প্রাণী এমন অনেক আচরণ সম্পন্ন করে যার কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক পাওয়া যায় না। নিছক একটি পরিস্থিতিতে পড়ে প্রাণী এমন আচরণ করতে পারে যেগুলিকে কোন বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রসূত বলা চলে না। এইজন্য স্কিনার প্রাণীর প্রতিক্রিয়া বা আচরণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক, যেগুলি উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ এবং দুই, যেগুলি কোনও বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট নয় অর্থাৎ স্বতঃসৃষ্ট আচরণ। যেমন, চোখে আলো পড়লে চোখের মাংসপেশীর যে সঙ্কোচন ঘটে বা মুখে খাবার দিলে জিহ্বা থেকে যে লালাক্ষরণ হয় এগুলিকে প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ বলা হবে। কিন্তু ঘরে টেলিফোন বাজলে ব্যক্তি টেলিফোন তুলতে পারে, না তুলতেও পারে আবার দেরীতে তুলতে পারে ইত্যাদি আচরণগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলা হবে। কেননা এখানে আচরণটি 'টেলিফোন বাজার' দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রসূত হচ্ছে না। উদ্দীপকটি অবশ্য ব্যক্তির ঐ পরিস্থিতির একটি অঙ্গ রূপে থাকছে। কিন্তু আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করছে সামগ্রিক পরিস্থিতিটি, কেবল মাত্র উদ্দীপকটি নয়। সেজন্য এই ধরনের আচরণকে স্বতঃসৃষ্ট আচরণ বলা হয়। অপারেণ্ট কথাটির অর্থ হল যে আচরণটি স্বতঃক্রিয়াশীল বা নিজে থেকেই পরিস্থিতির উপর কার্যকর হয়।

অতএব রেসপণ্ডেণ্ট বা প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ এবং অপারেণ্ট বা স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণের মধ্যে পার্থক্য হল ঃ—

প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ উদ্দীপকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণ কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট হয় না, যদিও উদ্দীপকটি প্রাণীর পরিস্থিতির একটি অঙ্গ রূপে কাজ করে থাকে। প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণের মাত্রা ও তীব্রতা উদ্দীপকের মাত্রা ও তীব্রতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের মাত্রা ও তীব্রতার উপর আচরণের তীব্রতা বা মাত্রা নির্ভরশীল নয়।

প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের শক্তির পরিমাপের দ্বারা আচরণের

---

1. Respondent Behaviour 2. Operant Behaviour

শক্তির পরিমাপ করা যায়। কিন্তু স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দীপক না থাকার জন্য উদ্দীপকের শক্তির দ্বারা আচরণের শক্তির পরিমাপ করা যায় না। বরং এখানে প্রতিক্রিয়ার শক্তি বা তীব্রতার পরিমাপের দ্বারা উদ্দীপকের শক্তির বা তীব্রতার পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হয়।

আচরণকে যখন দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হল, অনুবর্তনও তখন দু'প্রকৃতির হবে। প্যাভলভ যে অনুবর্তনের তত্ত্বটি দিয়েছেন সেটি রেসপণ্ডেণ্ট বা প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন প্রাথমিক উদ্দীপকের ক্ষেত্রে যে সুনির্দিষ্ট আচরণটি ঘটে এই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াটি অন্য একটি গৌণ বা সাধারণ উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেমন ঘণ্টা বাজানোর ফলে কুকুরের লালাক্ষরণ ঘটল।

স্কিনারের পরীক্ষণ—স্কিনার বক্স[1]

কিন্তু স্কিনারের বর্ণিত অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি তাঁর অনুবর্তনের এই তত্ত্বটি প্রমাণ করেছেন একটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত পরীক্ষণের দ্বারা। তিনি একটি বিশেষ ধরনের বাক্স তৈরী করেন যেটি স্কিনার বক্স নামে পরিচিত। এই বাক্সের মধ্যে একটি লিভার বা হাতল থাকে। আর থাকে খাদ্যের একটি পাত্র এবং প্রাণীর সামনে তাকে উত্তেজিত বা সক্রিয় করার একটি যান্ত্রিক আয়োজন। বাক্সটির বাইরে একটি খাদ্যের ভাণ্ডার থাকে যেখান থেকে বাক্সের ভেতরের হাতলটি টিপলে একটি খাবারের খণ্ড বা গুলি বেরিয়ে এসে খাঁচার ভিতরের ঐ খাদ্যের পাত্রে পড়বে।[2]

এই পরীক্ষণে প্রথমে বাইরে থেকে উত্তেজকের সাহায্যে প্রাণীকে সক্রিয় বা উত্তেজিত করা হল। ধরা যাক একটা আলো জ্বালা হল। তার ফলে প্রাণীটি বাক্সের ভিতর হাতলটি টিপল। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো খাদ্য এসে বাক্সের মধ্যস্থিত খাদ্যপাত্রে পড়ল। প্রাণী সেটি খেল। খাদ্য পাবার ফলে সে উৎসাহিত হয়ে আবার হাতলটি টিপল, আবার আর এক টুকরো খাদ্য পেল। এই ঘটনা বার বার ঘটার ফলে প্রাণীটির মধ্যে হাতল টেপা এবং খাদ্য পাওয়ার মধ্যে অনুবর্তন স্থাপিত হল।

দেখা যাচ্ছে যে এখানে পুনরুপস্থাপনমূলক বা অননুবর্তিত উদ্দীপকটি (অর্থাৎ খাদ্য) অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াটিকে (অর্থাৎ হাতলে চাপ দেওয়া) সৃষ্টি করছে না, যা প্যাভলভের বর্ণিত রেসপণ্ডেণ্ট বা প্রতিক্রিয়ামূলক অনুবর্তনের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এখানে বরং বিপরীতটাই ঘটছে অর্থাৎ অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ হাতলে চাপ দেওয়া রূপ কাজটি পুনরুপস্থাপনমূলক বা অননুবর্তিত উদ্দীপকটির অর্থাৎ খাদ্যের উপস্থাপনকে সৃষ্টি করছে। সেইজন্য এটিকে স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন নাম দেওয়া হয়েছে।

---

1. Skinner Box 2. পৃঃ ৩৫৪ :: চিত্র দ্রষ্টব্য।

যেহেতু হাতলটি টিপলে খাদ্য উপস্থাপিত হচ্ছে সেহেতু হাতলটিকে উপকরণ রূপে বর্ণনা করা যায় এবং এই ধরনের আচরণকে উপকরণমূলক আচরণও[1] বলা হয়।

এইবার আমরা স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন ও প্যাভলভের প্রতিক্রিয়ামূলক অনুবর্তনের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারব। প্যাভলভের বর্ণিত অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই পুনরুপস্থাপনমূলক বা অননুবর্তিত উদ্দীপকের সঙ্গে অনুবর্তন প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দীপকটির উপস্থাপনের মাত্রা, স্থায়িত্ব ইত্যাদির উপর অনুবর্তনের আবির্ভাব, মাত্রা ও স্থায়িত্ব সরাসরিভাবে নির্ভরশীল এবং অনুবর্তনের সৃষ্টিও হচ্ছে এই উদ্দীপকটির উপস্থাপনের দ্বারা। যেমন খাদ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ, উপস্থাপনের কাল ইত্যাদির উপর লালাক্ষরণের পরিমাণ, দ্রুততা ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং খাদ্যের উপস্থাপনের দ্বারাই অনুবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু অপারেণ্ট বা স্বতঃক্রিয়াশীল অনুবর্তনের ক্ষেত্রে পুনরুপস্থাপনের ঘটনাটি অনেকটা বিপরীতভাবে ঘটছে। এখানে পুনরুপস্থাপনমূলক বা অননুবর্তিত উদ্দীপক থেকে প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং প্রতিক্রিয়াটিই পুনরুপস্থাপনমূলক উদ্দীপকটিকে সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ খাদ্যের উপস্থাপন হাতল টেপা রূপ কাজটি সৃষ্টি করছে না। বরং হাতল টেপা রূপ কাজটিই খাদ্যের উপস্থাপন ঘটাচ্ছে।

সেইজন্য প্যাভলভের অনুবর্তন প্রক্রিয়াটিকে টাইপ-এস[2] বা উ-শ্রেণীভুক্ত এবং স্কিনারের অনুবর্তন প্রক্রিয়াটিকে টাইপ-আর[3] বা প্র-শ্রেণীভুক্ত অনুবর্তন বলা হয়। এখানে 'উ' অক্ষরটি উদ্দীপকের জন্য এবং 'প্র' অক্ষরটি প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

স্কিনারের এই স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাণীর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের উত্তরে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্র খুবই সীমিতসংখ্যক। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আচরণই অপারেণ্ট বা স্বতঃক্রিয়াশীল প্রকৃতির। অর্থাৎ বিশেষ কোন উদ্দীপকের উত্তরে তার আচরণগুলি সংঘটিত হয় না। তার চার পাশে যে পরিবেশটি থাকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে সে আচরণ সম্পন্ন করে। সেই কারণে তার আচরণটি যে কি প্রকৃতির হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকে না। যেমন খাবার খাওয়া, গাড়ী চালান, চিঠি লেখা, টেলিফোন ধরা ইত্যাদি কোন কাজটিই রেসপণ্ডেন্ট বা প্রতিক্রিয়াধর্মী নয়। অর্থাৎ এগুলি বিশেষ কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের উত্তরে সম্পন্ন হয় না। আচরণটি করার সময় ব্যক্তির পরিবেশ যে প্রকৃতির থাকে তার দ্বারাই আচরণটির প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

এই ধরনের আচরণের অনুবর্তন ঘটে তখনই যখন কোনও আচরণের সম্পাদনের ফলে বিশেষ কোন একটি পুনরুপস্থাপনমূলক উদ্দীপক আবির্ভূত হয়। তখন সেই

1. Instrumental Act 2. Type-S 3. Type-R

আচরণটি আবার ঘটার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যেমন, টেলিফোন ধরলে যদি কোন প্রিয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায় তাহলে টেলিফোন ধরা-রূপ কাজটি আবার ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং যত বেশী ক্ষেত্রে এই পুনরুপস্থাপন দেখা দেবে তত এই অনুবর্তিত আচরণটি দৃঢ়বদ্ধ ও অধিকসংখ্যক হবে।

মানুষের বিভিন্ন আচরণ যদি পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে এই ধরনের অপারেণ্ট কণ্ডিসানিং বা স্বতঃক্রিয়াধর্মী অনুবর্তনের ক্ষেত্র অসংখ্য পাওয়া যাবে।

২। গুথরির সান্নিধ্যমূলক অনুবর্তন তত্ত্ব[1]

মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুগত্যের দিক দিয়ে এডউইন গুথরি একজন আচরণবাদী ছিলেন।

মনোবিজ্ঞানী জন ওয়াটসনকে আচরণবাদ[2] নামক মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের জনক বলা হয়। এই মতবাদের মূল বক্তব্যটি সরল করে বললে দাঁড়ায় যে যে সব বস্তু বাহ্যত পর্যবেক্ষণ করা যায় সেই সব বস্তুর পর্যবেক্ষণ, সংব্যাখ্যান ইত্যাদির উপরই মনোবিজ্ঞানের সমস্ত সূত্র গঠিত হবে। অমূর্ত বা পর্যবেক্ষণের পরিসীমার বহির্ভূত কোন বস্তু যেমন আত্মা, মন, সচেতনতা ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ থেকে মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গঠন করা চলবে না। এই কারণে ওয়াটসন থর্নডাইকের উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া-সংযোজনের[3] মাধ্যমে শিখন ঘটে—এই তথ্যটি পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিলেও এবং তাঁর প্রদত্ত শিখনের অনুশীলনের সূত্র এবং প্রস্তুতির সূত্র দুটি গ্রহণ করলেও তাঁর ফললাভের সূত্রটি তিনি গ্রহণ করেন নি।[4] তার কারণ এই সূত্রে মানসিক তৃপ্তিলাভকে শিখনের স্থায়ীভবনের একটি কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূত্রটির পরিবর্তে তিনি সাম্প্রতিকতা ও পুনরনুষ্ঠানের সূত্রটির সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। গুথরি প্রথম পর্যায়ের আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের একজন ছিলেন। তিনি ওয়াটসনের মত অনুবর্তন প্রক্রিয়াকে প্রাণীর শিখনের সংব্যাখ্যান রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না। তিনি নিছক সান্নিধ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর শিখনের তত্ত্বটি গঠন করেছিলেন।

গুথরি তাঁর শিখনের সূত্রটি খুব সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যথা, যদি কোন বিশেষ উদ্দীপক-সমাবেশের সঙ্গে কোন প্রক্রিয়া বা ঘটনা সংযুক্ত থাকে তাহলে ঐ বিশেষ উদ্দীপক-সমাবেশের পুনরাবৃত্তি ঘটলে ঐ প্রক্রিয়া বা ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

এছাড়া গুথরি শিখন প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যার জন্য আর একটি সূত্রও দিয়েছেন। সেটি হল—কোন উদ্দীপক সমাবেশের সঙ্গে যদি কোন প্রতিক্রিয়ার সংযুক্তি ঘটে তাহলে

1. Guthrie's Contiguous Conditioning Theory 2. Behaviourism 3. S-R Bond
4. পৃঃ ৩১২

প্রথম বারেই দুয়ের মধ্যে একটি অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ উদ্দীপক-সমাবেশটি দেখা দিলেই প্রতিক্রিয়াটি দেখা দেয় এবং দুয়ের মধ্যে যে সংযোজন তা প্রথম বারেই ঘটে যায়। গুথরির প্রদত্ত শিখনের তত্ত্বটি উপরের দুটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপরের দুটি সূত্র থেকেই দেখা যাচ্ছে যে গুথরির মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সান্নিধ্যের জন্যই দুয়ের মধ্যে সংযোজন স্থাপিত হয়ে থাকে অর্থাৎ শিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে। একটি বিশেষ উদ্দীপক-সমাবেশ বা উদ্দীপক-সমষ্টির সঙ্গে যখন কোন ঘটনা বা প্রতিক্রিয়া একসঙ্গে ঘটে তখনই তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় এবং প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি ঘটে থাকে। এক কথায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সান্নিধ্যই তাদের মধ্যে সংযোজন স্থাপনের একমাত্র সর্ত। দেখা যাচ্ছে যে গুথরি তাঁর দ্বিতীয় সূত্রটিতে শিখনের ক্ষেত্রে অভ্যাসের ভূমিকাকে স্বীকার করছেন না। কেননা তাঁর মতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজন থেকেই তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে যায়।

অনুবর্তনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনুবর্তিত উদ্দীপক এবং অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া এ দুয়ের মধ্যে সময়ের পার্থক্য থাকে এবং এই সময়ের পার্থক্যের দৈর্ঘ্যের উপর অনুবর্তনের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এ সব ক্ষেত্রে গুথরির সান্নিধ্যের সূত্রটি কি ভাবে প্রযুক্ত হবে ?

যে সব উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সময়ের পার্থক্য দেখা যায় গুথরি সে সব ক্ষেত্রগুলির এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। যখন উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করা হয় তখন প্রাণীটির মধ্যে একটি সঞ্চালন বা সক্রিয়তা সৃষ্টি হয়। এই সঞ্চালন বা সক্রিয়তা থেকে প্রাণীর মধ্যে এক ধরনের সঞ্চালনমূলক উদ্দীপক[1] সৃষ্টি হয় এবং সেই উদ্দীপক থেকে প্রতিক্রিয়াটি ঘটে। অতএব উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সময়গত পার্থক্য দেখা যায় সেটি মূলত প্রাণীর মধ্যে সঞ্চালন সৃষ্টি হওয়ার জন্যই দেখা দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমকালীনতা[2] ঠিকই থাকে।

গুথরির এই সঞ্চালন-প্রসূত উদ্দীপকের তত্ত্বটির দ্বারা প্রাণীর বহু আচরণের বেশ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এমন অনেক ক্ষেত্র দেখা যায় যখন বাহ্যিক উদ্দীপকের সঙ্গে প্রাণীর আচরণের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাওয়া যায় না। তখন এই অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন-প্রসূত উদ্দীপকের দ্বারা এই ধরনের আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

গুথরির তত্ত্বটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি প্রাণীর সঞ্চালনকেই শিখনের বিষয়বস্তু বলে ধরেছেন, সঞ্চালনের কোন ফলাফলকে নয়।

থর্নডাইক তাঁর শিখনের তত্ত্বে কোন বিশেষ কাজে প্রাপ্ত স্কোর বা শেখা পদের

1. Kinaesthetic Stimulus 2. Simultaneity

সংখ্যা বা নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা ইত্যাদির বিচার করে শিখনের ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু গুথরি শিখন বলতে প্রাণীর মধ্যে সৃষ্ট সক্রিয়তা বা সঞ্চালনকে বুঝিয়েছেন তা সে সক্রিয়তা বা সঞ্চালনের ফল ভুলই হোক আর নির্ভুলই হোক। এইজন্য অনুশীলন থেকে যে শিখনের উৎকর্ষ বাড়ে, এ কথাটি গুথরির শিখনের তত্ত্বে প্রযোজ্য নয়। অভ্যাস বা অনুশীলনের মূল্য তখনই স্বীকার করা হবে যখন প্রাণীর সক্রিয়তা বা সঞ্চালনের বিচার করা হবে, নতুবা নয়।

সাধারণ অনুবর্তনভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার মতবাদে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের পার্থক্য দুটি জায়গায়। প্রথম, এঁরা প্রধানত মানসিক তৃপ্তিলাভকে অনুবর্তন সৃষ্টির পিছনে একটি বড় শক্তিরূপে গ্রহণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়, এঁরা অভ্যাস বা অনুশীলনের উপর শিখনের স্থায়িত্বভবন নির্ভর করে বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু গুথরি এদুটি ঘটনাকেই শিখনের সংঘটন বা স্থায়িত্বভবনের কারণরূপে বাতিল করে দিয়েছেন। এক কথায় তিনি থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্র এবং ফললাভের সূত্র—এ দুটিকেই অস্বীকার করেছেন।

তিনি শিখনের ক্ষেত্রে একমাত্র সর্তরূপে গ্রহণ করেছেন সান্নিধ্য বা সমকালীনতাকে ; অর্থাৎ পুনরুপস্থাপনমূলক উদ্দীপকের সঙ্গে যে উদ্দীপকটি সমকালীন বা সান্নিধ্য-সম্পন্ন হয়ে থাকে সেটির সঙ্গে অনুবর্তনের ফলে প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্রাণীর শিখন ঘটে। তাছাড়া অনুশীলন বা চর্চার ভূমিকাকেও গুথরি স্বীকার করেন না। শিখনের ক্ষেত্রে সান্নিধ্য বা সমকালীনতাই একমাত্র এবং প্রধান শক্তি। অর্থাৎ প্রাণীর শিখনের সঙ্গে সান্নিধ্যসম্পন্ন বা সমকালীন উদ্দীপকই আচরণের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে।

এই সূত্রটি থেকে এই তত্ত্বের একটি শিক্ষামূলক দিকের আমরা সন্ধান পাই। শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন নতুন আচরণ তৈরী করতে হলে বা কোন অবাঞ্ছিত আচরণ দূর করতে হলে তার ঐ আচরণের সমকালীন উদ্দীপকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মনে করা যাক একটি ছেলে এমন একটি আচরণ করে যেটিকে তার মধ্যে থেকে দূর করতে হবে। তাহলে দেখতে হবে যে ছেলেটির ঐ আচরণটি সম্পন্ন করার ঠিক পরবর্তী বা সমকালীন উদ্দীপক কোনটি এবং সেই উদ্দীপকটির নিয়ন্ত্রণ করলেই তার ঐ অবাঞ্ছিত আচরণটি বন্ধ হয়ে যাবে। তেমনই তার মধ্যে কোন নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে হলে আচরণটির অনুবর্তনের ঠিক পূর্বে বা একই সময়ে এক বা একাধিক সুপরিকল্পিত উদ্দীপক উপস্থাপিত করার আয়োজন করলে ঐ ঈপ্সিত আচরণটি যথাযথভাবে সৃষ্ট হবে।

গুথরি শিশুপালন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁর এই তত্ত্বের প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনা করেছেন।

৩। টোলম্যানের চিহ্নমূলক শিখন তত্ত্ব[1]

মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের দিক দিয়ে টোলম্যান একজন আচরণবাদী ছিলেন। কিন্তু ওয়াটসন, প্যাভলভ, গুথরি প্রভৃতি আচরণবাদীদের তত্ত্ব থেকে তাঁর মতবাদ উল্লেখযোগ্য ভাবে ভিন্ন।

টোলম্যানের লিখিত বইটির নাম হল মানুষ এবং প্রাণীর উদ্দেশ্যমূলক আচরণ[2]। এই বইতে তিনি যে আচরণবাদের বর্ণনা দিয়েছেন তাকে উদ্দেশ্যমূলক আচরণবাদ বলা হয়। পরে তিনি তাঁর মতবাদের নাম দেন সাইন-গেস্টাল্ট থিয়োরি[3]। বাংলায় বলা যায় চিহ্নমূলক সামগ্রিক সংগঠনের তত্ত্ব। টোলম্যানের তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে শিখনের সাইন থিয়োরি বা শিখনের চিহ্নমূলক তত্ত্ব বলা হয়।

টোলম্যানের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল প্রাণীর জ্ঞান, চিন্তা, পরিকল্পনা, অনুমান, উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছার সঙ্গে আচরণতত্ত্বের কি সম্পর্ক তা নির্ণয় করা। তিনি প্রায়ই প্রেষণা, অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

বলা বাহুল্য গোঁড়া আচরণবাদীদের উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার পুনরুপস্থাপনমূলক তত্ত্বের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যাকে টোলম্যান পরিত্যাগ করেন।

টোলম্যানের মতে প্রাণীর সব আচরণই লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। কোন কিছুতে পেঁছনর উদ্দেশ্যে কিংবা কোন কিছু থেকে সরে আসার উদ্দেশ্যেই সব আচরণ সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রাণীর আচরণের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে যে প্রাণী যে বিশেষ কাজ বা আচরণটি করছে তার অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য আছে। খাঁচায় বন্ধ বিড়াল যে সব আচরণ করছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে খাঁচা থেকে বেরোতে চায়। একজন ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে দ্রুত চলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য অফিস যাওয়া। কবি কবিতা লিখছেন তাঁর উদ্দেশ্য মনের তৃপ্তি পাওয়া কিংবা বাইরের দশজনের কাছে সুনাম কেনা। অর্থাৎ এক কথায় প্রাণীর সব আচরণেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে সে সবেরই একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। প্রাণীর আচরণকে বিশ্লেষণ করে তার এক একটি অংশের বিচার করলে তার আচরণের এই সামগ্রিক রূপটির সন্ধান পাওয়া যাবে না। যেমন বেড়ালের খাঁচা থেকে বেরোনোর চেষ্টার বিভিন্ন টুকরো টুকরো কাজগুলি থেকে বেড়ালের আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না যদি না আমরা তার আচরণটিকে সামগ্রিক ভাবে দেখি।

প্রাণীর অধিকাংশ আচরণই জটিল প্রকৃতির এবং বহু খণ্ড খণ্ড কাজের সমষ্টি। কোন নাটকে একজন অভিনেতা যখন কোন বাক্য উচ্চারণ করেন তখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ঐ বাক্য উচ্চারণের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট কাজ আছে, যেমন

---

1. Tolman's Theory of Sign Learning 2. Purposive Behaviour in Animals and Men 3. Sign-Gestalt Theory

ঠোঁট, জিভ, দাঁত, মুখগহ্বর প্রভৃতির সক্রিয়তা থেকে সুরু করে শব্দের বিন্যাস, উচ্চারণের কৌশল, বাক্যগঠনের নিয়মাবলী প্রভৃতির প্রয়োগ। এগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে ধরলে অভিনেতার বাক্য উচ্চারণের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। কিন্তু যদি এই সব কাজগুলিকে এক করে নিয়ে বিচার করা যায় তাহলেই অভিনেতার বাক্যটি উচ্চারণ করার প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। এক কথায় টোলম্যানের মতে আচরণটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে এবং সেটির সম্পাদনের পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে তা দেখতে হবে।

টোলম্যানের তত্ত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী তার লক্ষ্যে পেঁছবার জন্য আচরণের মধ্যে কোন বিশেষ পারিবেশিক উপকরণের সাহায্য নেয়। এটিকে লক্ষ্যের উপকরণ বলে বর্ণনা করা যায়। যেমন, কোহ্লারের পরীক্ষণে শিম্পাঞ্জীটি কলার নাগাল পাবার জন্য লাঠির সাহায্য নিল। ঘরের ওপরের তাক থেকে কিছু পাড়বার জন্য আমরা একটি টুল আনলাম, ইত্যাদি। টোলম্যানের মতে আমাদের পরিবেশে নানা পন্থা, উপায়, উপকরণ, প্রতিবন্ধক ইত্যাদি ছড়ান আছে। আমাদের লক্ষ্যে পেঁছবার জন্য এগুলিকে মনে মনে সাজিয়ে নিতে হয় এবং যেটিকে যেভাবে ব্যবহার করলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পেঁছতে পারব সেইটিকে সেইভাবে ব্যবহার করে থাকি। টোলম্যানের বর্ণনায় প্রাণী তার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে এইভাবে একটি জ্ঞানমূলক মানচিত্রের আকারে সাজিয়ে নেয় এবং সেই মানচিত্র অনুযায়ী তার আচরণ সম্পন্ন করে। নিছক কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে তার আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়, টোলম্যানের মতে এই সব পারিবেশিক উপায় বা পন্থাগুলির মধ্যে যেটি আমাদের দ্রুত ও সহজে লক্ষ্যে পেঁছতে সমর্থ করে সেটিকে আমরা যেটি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এবং কষ্টসাধ্য উপায়ে লক্ষ্যে পেঁছতে সমর্থ করবে তার চেয়ে বেশী পছন্দ করি।

চতুর্থ, আচরণটি যদি ব্যাপকধর্মী[1] হয় তাহলে সেটি পরিবর্তনশীল এবং সহজেই অপরকে শেখান যায়। কিন্তু যদি আচরণটি যান্ত্রিক বা আণবিক[2] প্রকৃতির হয় তাহলে সেটি অপরিবর্তনীয় হবে এবং তার মধ্যে কোনও স্থিতিস্থাপকতা থাকবে না। যেমন, আমাদের রিফ্লেক্সগুলি।

সাধারণ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাণীর প্রতিক্রিয়া তার সম্মুখস্থ উদ্দীপকের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যখন প্রাণী অনেকগুলি আচরণের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ আচরণ বেছে নেয় এবং সেটি সম্পন্ন করে তখন সে তা করে তার সামনে যে উদ্দীপকটি থাকে তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে এবং

1. Molar 2. Molecular

তার যে প্রকৃত লক্ষ্য তার সঙ্গে তার এই আচরণের কোন সম্পর্ক থাকে না। একেই উ-প্র সংযোজন[1] বলা হয়।

টোলম্যান কিন্তু প্রাণীর আচরণের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাণী তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনই থাকে এবং জানে যে একটি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া ঘটার পর আবার কোন্ উদ্দীপকটি দেখা দেবে। অর্থাৎ টোলম্যানের মতে প্রাণী উ$_1$-প্র$_1$ সংযোজনের পর পরবর্তী উদ্দীপক বা উ$_2$ সম্বন্ধে সচেতন থাকে। যেমন দরজার বাইরে বোতাম (উ$_1$) টিপলে (প্র$_1$) ভেতরে ঘণ্টা বাজল (উ$_2$)। এই ঘণ্টা বাজা রূপ উদ্দীপকটি সম্বন্ধে কিন্তু ব্যক্তি আগে থেকেই সচেতন ছিল। অর্থাৎ সে জানে বোতাম টিপলে ঘণ্টাটা বাজবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রচলিত ওয়াটসনীয় উ$_1$-প্র$_1$'র যে পরম্পরা সেটি টোলম্যানের ব্যাখ্যায় উ$_1$-প্র$_1$-উ$_2$'র রূপ নেবে।

টোলম্যানের এই ত্রি-স্তর পরম্পরায় প্রাণীর প্রত্যাশার[2] ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ঘণ্টা বাজারূপ প্রত্যাশাটিকে বাস্তবায়িত করার জন্যই প্রাণী বোতাম টিপল। তার যদি এ প্রত্যাশা না থাকত তাহলে সে বোতামটি টিপত না।

টোলম্যানের এই শিখন তত্ত্বটিকে চিহ্ন-ভিত্তিক শিখন বলার কারণ হল যে প্রাণী তার লক্ষ্যে পেঁছিবার জন্য একটি চিহ্ন শিখে থাকে। ব্যক্তি জানছে যে বোতাম টিপলে ঘণ্টা বাজবে। এই 'চিহ্নটি' শিখলে সে ঘণ্টা বাজানোর জন্য বোতামটি টিপবে। একটি ইঁদুর যখন জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে পরিভ্রমণ করে তার লক্ষ্য খাদ্যে পেঁছিচ্ছে তখন সে তার লক্ষ্যে পেঁছিবার জন্য একটা চিহ্ন অনুসরণ করছে। যখন সে সাফল্যের সঙ্গে তার লক্ষ্য 'খাদ্যে' পেঁছিতে পারল তখন বুঝতে হবে যে তার এই 'চিহ্ন' শেখা শেষ হয়েছে। ওয়াটসন প্রভৃতির ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইঁদুরটি যখন গোলকধাঁধা থেকে সাফল্যের সঙ্গে বেরোতে পারে তখন সে তার প্রতিটি গতি বা আচরণ শিখছে। কিন্তু টোলম্যানের মতে ইঁদুরটি তার প্রতিটি গতি বা আচরণ শিখছে না সে প্রকৃতপক্ষে শিখছে তার প্রতিটি গতি বা আচরণের অর্থ। অর্থাৎ সে চিহ্ন এবং তার লক্ষ্য—এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা শিখছে। একেই টোলম্যান চিহ্ন শিখনের তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেছেন।

টোলম্যানের চিহ্নশিখন তত্ত্বটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে গোঁড়া আচরণবাদীদের অনুবর্তনভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি গেস্টাল্টবাদীদের সামগ্রিকতার ধারণার মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর শিখন তত্ত্বের মধ্যে প্রাণীর আচরণের পেছনে উদ্দেশ্যমূলক সচেতনতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং প্রাণী যখন কোন কিছু শেখে তখন সে তার প্রতিটি আচরণের উদ্দেশ্য ও অর্থ বোঝে।

1. S-R Connection 2. Expectancy

টোলম্যানের এই ব্যাখ্যা থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রথম, শিক্ষার্থী যেন ভালভাবে জানে যে সে কেন একটি বিশেষ ধরনের আচরণ শিখছে অর্থাৎ তার শেখা কাজটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে যেন সম্পূর্ণ অবহিত থাকে। তবেই সে তার প্রতিটি বর্তমান আচরণের পরবর্তী আচরণটির প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারবে। এক কথায় সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রত্যেকটি আচরণের অর্থ বুঝতে পারে এবং সেইভাবে তার পরবর্তী আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

টোলম্যানের শিখন তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে সব চিহ্নগুলি শিখবে সেগুলি তার কাছে সুস্পষ্ট করে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী সেই চিহ্নগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে একটি 'জ্ঞানমূলক মানচিত্র' তৈরী করতে পারে। শিক্ষার্থী যত কার্যকরভাবে এই জ্ঞানমূলক মানচিত্রটি তৈরী করতে পারবে তার শিখনও তত দ্রুত ও সুষ্ঠু হবে।

টোলম্যান সুষ্ঠু শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর আচরণকে ব্যাপকধর্মী করার নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর আচরণ যত বেশী আণবিকধর্মী হবে ততই তার মধ্যে যান্ত্রিকতা দেখা দেবে এবং ততই তার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তার পক্ষে নতুন আচরণ শেখা অধিকতর দুরূহ হয়ে উঠবে। শিখনপ্রক্রিয়ার পরিকল্পনার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি মনে রাখবেন।

৪। হাল'র সুসংবদ্ধ আচরণ শিখনের তত্ত্ব[1]

আচরণবাদীরা তাঁদের শিখনের ব্যাখ্যায় প্রক্রিয়াগত যে পরম্পরার উল্লেখ করেছেন সেটিকে সংক্ষেপে উ-প্র পরম্পরা[2] বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ উদ্দীপকের আবির্ভাবের পরে দেখা দেয় প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন শক্তি বা বস্তুর তাঁরা উল্লেখ করেন নি। উড্‌ওয়ার্থই প্রথম বললেন যে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী শক্তিরূপে আর একটি বস্তুর উল্লেখ করা দরকার। সেটি হচ্ছে প্রাণী নিজে। অর্থাৎ উড্‌ওয়ার্থের শিখনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়ার পরম্পরাটি উ-প্র[3] না হয়ে উ-প্রা-প্র[4] হওয়া দরকার।

উদ্দীপকের আবির্ভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির মাঝখানে এই অতিরিক্ত শক্তির ভূমিকার উপর ইতিপূর্বে গুথরি ও টোলম্যান দুজনেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হালের সুসংবন্ধ আচরণ শিখনের তত্ত্বেও এই অন্তবর্তী শক্তিগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

1. Hull's Theory of Systematic Behaviour Learning 2. S-R Sequence
3. S-R 4. S-O-R

ইতিপূর্বে এই অন্তর্বর্তী শক্তি বলতে প্রাণীর উপর শিখন পরিস্থিতির প্রভাবের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু হাল দেখালেন যে প্রাণীর উপর শিখন পরিস্থিতির প্রভাব ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শক্তির প্রভাব আছে। যেমন, প্রাণীর পূর্ব শিখনের ইতিহাস, তার চাহিদা, অনুরূপ ক্ষেত্রে তার পূর্বতৃপ্তির পরিমাণ ইত্যাদি।

হালের আচরণ শিখনের তত্ত্বটিতে পুনরুপস্থাপনের প্রক্রিয়াটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রকে ভিত্তি করে হাল বলেন যে সমস্ত শিখনের ক্ষেত্রেই পুনরুপস্থাপনমূলক বা অননুবর্তিত উদ্দীপক (প্যাভলভের পরীক্ষণে 'খাদ্য') প্রাণীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার (প্যাভলভের পরীক্ষণে 'লালাক্ষরণ') সৃষ্টিকারকই নয়, তার পরিতোষকও বটে এবং সেই কারণেই এই উদ্দীপকটি তার সমস্ত শিখনের পশ্চাতে মৌলিক শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

হালের আচরণ শিখনের তত্ত্বটি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং এতে উন্নত গাণিতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী শক্তির পরিমাণভিত্তিক রূপ দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকের আবির্ভাব এবং প্রাণীর তার উত্তরে প্রতিক্রিয়া সম্পাদন এই দুটি প্রান্তের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন শক্তিগুলির তিনি সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে হালের তত্ত্বটিকে সুসংবদ্ধ আচরণ শিখনের তত্ত্ব বলা হয়। হালের মতে প্রাণীর নতুন শেখা যে কোন আচরণই ছয়টি মুখ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা গঠিত একটি শৃঙ্খলের মত। এই প্রক্রিয়াগুলির কিছু কিছু পারিবেশিক ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু অধিকাংশই অনুমানভিত্তিক অন্তর্বর্তী শক্তিবিশেষ। এই ছ'টি প্রক্রিয়া হল :—

১। পুনরুপস্থাপন[1], ২। সামান্যীকরণ[2], ৩। প্রেষণা[3], ৪। প্রতিরোধ[4], ৫। বিদোলন[5] এবং ৬। প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব[6]।

এই ছ'টি প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল :—

১। পুনরুপস্থাপন

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার পুনরুপস্থাপন থেকে প্রাণীর চাহিদার যত বেশী পরিতৃপ্তি ঘটবে ততই তার অভ্যাসের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এই জন্য পুনরুপস্থাপনের প্রক্রিয়াটিই আচরণ শেখার ক্ষেত্রে প্রথম প্রক্রিয়া।

২। সামান্যীকরণ

বর্তমান শিখন পরিস্থিতির উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের পুনরুপস্থাপন ছাড়াও অতীতের অনুরূপ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজন থেকে সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে যে অভ্যাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হল প্রাণীর আচরণ শেখার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।

---

1. Reinforcement 2. Generalisation 3. Motivation 4. Inhibition 5. Oscillation 6. Response Evocation

৩। প্রেষণা

অভ্যাসের শক্তি ও প্রাণীর প্রেষণার মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ও শক্তির দ্বারা প্রাণীর শিখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি নির্ধারিত হয়।

৪। প্রতিরোধ

প্রাণীর আচরণগত প্রতিরোধ এবং অনুবর্তনজাত প্রতিরোধের দ্বারা তার শিখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তার দ্বারাই তার কার্যকর শিখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি নির্ধারিত হয়।

৫। বিদোলন

কার্যকর প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে যে সব বিদোলনশীল প্রতিরোধমূলক ঘটনা বা শক্তি সংযুক্ত থাকে সেগুলির দ্বারা প্রাণীর ক্ষণস্থায়ী বা তাৎক্ষণিক কার্যকর প্রতিক্রিয়ার শক্তি নির্ধারিত হয়।

৬। প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব

পঞ্চম সোপানে বর্ণিত ক্ষণস্থায়ী বা তাৎক্ষণিক কার্যকর প্রতিক্রিয়াটি যদি যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন হয় তবেই প্রাণীর আচরণটি সংঘটিত হবে।

উপরে বর্ণিত এই ছ'টি প্রক্রিয়া পর পর সংঘটিত হয়ে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। এই ছ'টি প্রক্রিয়া একত্রিত হয়ে শিখন প্রক্রিয়ারূপ শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে।

প্রাণীর শিখন প্রক্রিয়াটিকে এই ভাবে কয়েকটি শৃঙ্খলাবন্ধ প্রক্রিয়ার সমষ্টিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে বলে হালের শিখনের তত্ত্বটি সুসংবন্ধ আচরণ শিখনের তত্ত্ব নামে পরিচিত।

হালের শিখনের তত্ত্বটির শিক্ষামূলক উপযোগিতা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ওয়াটসন এবং তাঁর অনুগামীরা যে আচরণবাদের জন্ম দেন টোলম্যান ও হালের হাতে সেই আচরণবাদের পরিবর্তন ও পুষ্টিসাধন ঘটে। এদিক দিয়ে ওয়াটসন, মর্গান, হোল্ট প্রভৃতিকে প্রাচীন আচরণবাদী বলা যায় এবং টোলম্যান, হাল প্রভৃতিকে বলা যায় আধুনিক আচরণবাদী।

ওয়াটসন শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যারূপে উ-প্র পরম্পরাকে উপস্থাপিত করেন। অর্থাৎ উদ্দীপকের আবির্ভাব এবং তার উত্তরে প্রতিক্রিয়ার অনুষ্ঠান—এই হল শিখন প্রক্রিয়ার বর্ণনা। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন প্রক্রিয়া বা শক্তিকে তাঁরা স্বীকার করেন নি।

কিন্তু এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী শক্তির কথা বললেন টোলম্যান তাঁর শিখনের তত্ত্বে। তিনি প্রাণীর শিখনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতাকে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী শক্তিরূপে বর্ণনা করলেন।

হাল এই অন্তর্বর্তী শক্তি সমূহের আরও অনেক বিস্তারিত ও সুসংবদ্ধ বিবরণ দিলেন। তাঁর মতে এই অন্তর্বর্তী শক্তিগুলি প্রাণীর শিক্ষার অনুষ্ঠান, মাত্রা ও প্রকৃতি সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

এই অন্তর্বর্তী শক্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাণীর প্রেষণা, ঐ উদ্দীপকের দ্বারা প্রেষণার তৃপ্তির মাত্রা, অতীতে অনুরূপ উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রেষণার তৃপ্তির মাত্রা, নানারকম পারিবেশিক প্রতিরোধমূলক শক্তি যা তার প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানের শক্তিকে কমিয়ে দেয় ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যদিও এই অন্তর্বর্তী শক্তিগুলির বর্ণনা হালের অনুমানভিত্তিক তবু এগুলি যে বাস্তব পরিস্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের এই অন্তর্বর্তী শক্তিগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকা বিশেষ দরকার। যে উদ্দীপকটির উপস্থাপনের দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছেন, দেখতে হবে যে সেই উদ্দীপকটি তার প্রকৃত প্রেষণার কতটা তৃপ্তি সাধন করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, অনুরূপ উদ্দীপকের দ্বারা অতীতে শিক্ষার্থীর প্রেষণার কি ধরনের
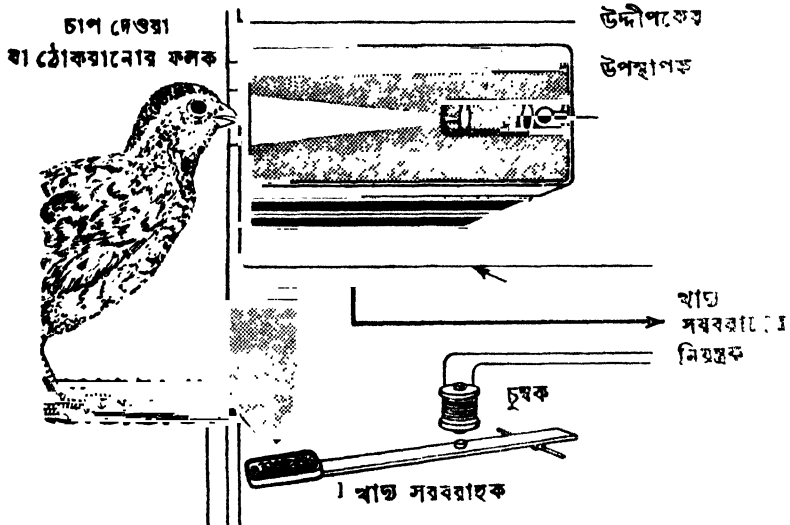
[স্কিনার বক্সের ছবি। আলোরূপ উদ্দীপকটি সক্রিয় হলে পাখীটি ফলকটিতে ঠোকরাবে বা চাপ দেবে। ফলে খাদ্য সরবরাহক ভাণ্ডার থেকে একটি খাদ্য খণ্ড বেরিয়ে আসবে। তাতে উৎসাহিত হয়ে পাখীটি বারবার ফলকে ঠোকরাবে এবং খাবার পাবে। ফলে ফলকে ঠোকরানো এবং খাদ্য পাবার মধ্যে অনুবর্তন ঘটবে। পৃঃ ৩৪৩ দ্রষ্টব্য।]

তৃপ্তি হয়েছিল সে সম্বন্ধেও শিক্ষক অবহিত থাকবেন। কেননা অনুরূপ অতীত পরিস্থিতি থেকে সামান্যীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে

রেখেছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটি অবশ্যই কার্যকর হবে। এই ঘটনাটিকেই আমরা শিখনের সঞ্চালন বলে থাকি।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে শিখনরূপ কাজটি ঘটে থাকে শিক্ষার্থীর সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তির দ্বারা। একেই হাল তাৎক্ষণিক কার্যকর প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার্থীর প্রকৃত প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রাণীর প্রকৃত প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তির কতটা শিখনের সময় কার্যকর প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তিরূপে দেখা দেবে তা নির্ভর করে এই অন্তর্বর্তী শক্তিগুলির উপর। উদ্দীপকের প্রেষণাতৃপ্তির শক্তি যেমন শিখনের ক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান তেমনই নানা পরিবেশঘটিত প্রতিরোধমূলক শক্তিও শিখনের কাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক অবশ্যই এই অত্যাবশ্যক তথ্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

অনুশীলনী

১। প্রতিক্রিয়ামূলক অনুবর্তন এবং সক্রিয়াশীল অনুবর্তনের মধ্যে তুলনা কর। এই প্রসঙ্গে স্কিনার বক্সের পরীক্ষণটির বর্ণনা দাও।

২। গুথরির সান্নিধ্যমূলক অনুবর্তনের তত্ত্বটির বর্ণনা দাও। সাধারণ অনুবর্তনের তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের পার্থক্য কোথায়?

৩। টোলম্যানের চিহ্নমূলক শিখনের তত্ত্বটির বর্ণনা কর। এটিকে চিহ্নমূলক বলা হয় কেন

৪। হালের সুসংবদ্ধ আচরণ শিখনের তত্ত্বের বর্ণনা দাও।

চব্বিশ

মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বা মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ার পরিমিততা

মুখস্থ করা[1] শিখন প্রক্রিয়ারই একটি বিশেষ প্রকারমাত্র। শব্দ, বাক্য, প্রভৃতি ভাষামূলক বিষয়বস্তুর শিখনকে মুখস্থ করা বলে। স্কুল কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থকরণ প্রক্রিয়াটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতির ব্যবহারে অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে মুখস্থ করা যায় সে সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন করে নানা মূল্যবান তথ্য উপস্থাপিত করেছেন।

মুখস্থকরণও এক প্রকারের শিখন হওয়ার ফলে ইতিপূর্বে বর্ণিত কার্যকর শিখনের সর্তগুলিও[2] মুখস্থকরণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে বিষয়বস্তুটি মুখস্থ করতে পরিশ্রম ও সময় দুই কম লাগে। যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু মুখস্থ করতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

সমগ্র পদ্ধতি এবং অংশ পদ্ধতি

শিক্ষণীয় বস্তুটি মুখস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে সেটি মুখস্থ করা যায়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় সমগ্র পদ্ধতি[3]। আবার ঐটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে সেগুলিকে আলাদা আলাদা মুখস্থ করে পরে সেগুলিকে একসঙ্গে গ্রথিত করে সমগ্র বস্তুটি আয়ত্ত করা যায়। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় অংশ পদ্ধতি[4]। ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে ক্ষেত্রভেদে উভয় পদ্ধতিরই কার্যকারিতা আছে এবং কোন্ পদ্ধতিটি কখন প্রযোজ্য তা শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই দুটি পদ্ধতির প্রয়োগ শিক্ষার্থীর পক্ষে লাভজনক তার একটি বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

(ক) সমগ্র পদ্ধতি

সাধারণ ভাবে বলা চলে যে যখন বিষয়বস্তুটি অর্থপূর্ণ হয় এবং যখন তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত সংহতি থাকে তখন সমগ্র পদ্ধতিটিই মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানের মতে সার্থক শিখন শিক্ষণীয় বস্তুটির অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। অতএব যদি বস্তুটি সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে তার পক্ষে সেটি শেখা শক্ত হয়ে

---

1. Memorising 2. পৃঃ ৩৩৫—পৃঃ ৩৩৭ 3. Whole Method 4. Part Method

ওঠে। এই জন্য আধুনিক স্কুল কলেজের শিক্ষণব্যবস্থায় সমগ্র পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বপক্ষে সকলে অভিমত দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে যে যদি বিষয়বস্তুটির মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সেটি শেখা তার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু নিছক সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকলে সব ক্ষেত্রেই শিখন পূর্ণাঙ্গ হয় না। সমগ্র পদ্ধতির সাহায্যে শেখা বিষয়বস্তুটির মূল অর্থ সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও বিষয়বস্তুটির আকৃতিগত শিখন সব সময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। বিশেষ করে যেখানে বিষয়বস্তু বেশ দীর্ঘ সেখানে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেমন শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনই সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটির সুষ্ঠু শিখনও ঘটে না। তাছাড়া অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। যেমন, অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করা, সাঁতার কাটা বা টাইপ করা প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি কার্যকর হয় না। সেইজন্য সমগ্র পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রকৃষ্ট হলেও অনেক ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

(খ) অংশ পদ্ধতি

যখন শিখনের বিষয়টি অর্থহীন, পারস্পরিক সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন বস্তুসমষ্টি হয় তখন সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে না। তখন সেটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে আয়ত্ত করাই মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা। যেমন, যদি অর্থহীন কতকগুলি শব্দের একটা তালিকা মুখস্থ করতে হয় তবে অংশ পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। এখানে বস্তুটির সামগ্রিক রূপ বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী উপলব্ধির কথা ওঠে না। কারণ বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি এখানে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন। এ ক্ষেত্রে শব্দগুলি পৃথক পৃথক শেখাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া কৌশলশিক্ষা বা দক্ষতা আহরণের ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ কেবল কার্যকরই নয়, অনেক সময় অপরিহার্যও। যেমন, টাইপ করতে শেখা, গাড়ী চালাতে শেখা, হাতের লেখা ভাল করা, পিয়ানো বাজাতে শেখা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই। এই সব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে শেখাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া এমন অনেক দক্ষতা আছে যেগুলির শিখন এমনই যান্ত্রিক প্রকৃতির যে সেখানে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভবই হয় না। সেখানে প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন অংশ পৃথক-ভাবে শেখা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

(গ) মধ্যগ পদ্ধতি

সমগ্র পদ্ধতি তখনই অনুসরণ করা যাবে যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির দৈর্ঘ্য

মোটামুটি আয়ত্তাধীন হবে। কিন্তু যদি শিক্ষণীয় বস্তুটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয় তবে কেবলমাত্র সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগে সেটি শেখা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আবার সে সব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অংশ পদ্ধতির উপর নির্ভর করলে শিখন কার্যকর হয় না। কারণ অংশ পদ্ধতিতে বিষয় বস্তুটির অর্থ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উপলব্ধি হয় না এবং তার ফলে শিখন হয়ে দাঁড়ায় অসম্পূর্ণ, যান্ত্রিক ও শ্রমসাপেক্ষ। সেই জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সমগ্র ও অংশ এই দুটি পদ্ধতিকে সম্মিলিত করে একটি তৃতীয় পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছেন।

এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে মধ্যগ পদ্ধতি। এই মধ্যগ পদ্ধতিতে প্রথমে সমগ্র পদ্ধতিতে মুখস্থকরণ সুরু করা হয় এবং পরে অংশ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। বিষয়বস্তুটি অতি দীর্ঘ হলে দেখা গেছে যে সমগ্র পদ্ধতির অনুসরণ করলে বস্তুটির প্রথম দিকটি এবং শেষের দিকটি ভাল করে শেখা হয় কিন্তু মাঝামাঝি স্থানগুলি ভালভাবে শেখা হয় না। সেইজন্য মধ্যগ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুটির অন্তর্গত যে যে অংশগুলি অধিক দুরূহ বা সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হয় সেগুলিকে আলাদা বেছে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে অংশ পদ্ধতির সাহায্যে শেখা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি মূলত সমগ্র পদ্ধতিটিরই একটি প্রকার ভেদ। তবে এর অভিনবত্ব হল যে এখানে বস্তুটির বিশেষ বিশেষ অংশ শেখার জন্য অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সমস্ত অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি প্রযোজ্য, ভাষাবর্জিত ও অর্থহীন বিষয়বস্তু এবং কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতি কার্যকর এবং অতিদীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মধ্যগ পদ্ধতি অনুসরণীয়।

২। আবৃত্তি পদ্ধতি ও পঠন পদ্ধতি

বিষয়বস্তুটি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বার বার পড়ে শেখাকে পঠন পদ্ধতি[1] বলা হয়। আর বিষয়বস্তুটি কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে দেখা যে সেটি কেমন তৈরী হয়েছে এবং দরকার বোধ হলে বই খুলে যেখানে যেখানে ভুল হচ্ছে সেগুলি নিজেই সংশোধন করে নেওয়া এবং এইভাবে আবৃত্তি ও সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র বস্তুটি আয়ত্ত করাকে আবৃত্তি পদ্ধতি[2] বলা হয়। বহু পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা আবৃত্তি পদ্ধতি নানা কারণে অনেক বেশী কার্যকর। এতে সময় ও শ্রম দুইই অপেক্ষাকৃত কম লাগে। পঠন পদ্ধতির তুলনায় আবৃত্তি পদ্ধতির এই উৎকর্ষের কারণগুলি হল :—

(ক) কোথায় কোথায় শিখন দুর্বল হচ্ছে তা শেখার সময়েই জানা যায় এবং সেজন্য সেগুলির উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

1. Reading Method 2. Recitation Method

(খ) ভুল শেখাগুলি স্থায়ীভাবে দৃঢ়বদ্ধ হবার আগেই সেগুলির সংশোধন করা যায়।

(গ) শিখনের প্রতি পদে নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায়। তার ফলে শিখনের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে।

(ঘ) আবৃত্তির মাধ্যমে শেখার ফলে বস্তুটির শিখন ও প্রয়োগ দুইই একসঙ্গে সম্পন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের সময় কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন উভয় প্রকার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকর।

স-বিরাম পদ্ধতি ও অ-বিরাম পদ্ধতি

শিক্ষণীয় বস্তুটি আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অ-বিরাম একটানা পড়ে এবং মাঝে মাঝে কোনরূপ বিরতি না দিয়ে শিক্ষার্থী সেটি আয়ত্ত করতে পারে। একে অ-বিরাম পদ্ধতি[1] বলা হয়। আবার কিছুক্ষণ একটানা পড়ে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে, আবার কিছুক্ষণ পড়ে আবার কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে—এইভাবে শিখে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত করতে পারে। এই পদ্ধতিটিকে স-বিরাম পদ্ধতি[2] বলা হয়ে থাকে।

বহু পরীক্ষণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে স-বিরাম পদ্ধতি অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একটি কবিতা একটানা পড়ে অর্থাৎ অ-বিরাম পদ্ধতিতে মুখস্থ করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগলো। এখন যদি ১৫ মিনিট পড়ে, তারপর ৫ মিনিট বিশ্রাম করে, আবার ১৫ মিনিট পড়ে আবার ৫ মিনিট বিশ্রাম করে—এইভাবে মাঝে মাঝে অল্প বিরতি দিয়ে কবিতাটি শেখা যায় তবে দেখা যাবে যে অ-বিরাম পদ্ধতিতে পড়ার সময় ও পরিশ্রমের চেয়ে স-বিরাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে সময় ও পরিশ্রম দুইই কম লেগেছে।

অ-বিরাম পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় স-বিরাম পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ হল যে এই পদ্ধতিতে শিখন কাজটির মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়ার জন্য পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ কম হয় এবং তার ফলে সংরক্ষণ দ্রুত ও স্থায়ী হয়। কিন্তু অ-বিরাম পদ্ধতিতে শিখনের মাঝে কোনরূপ ছেদ বা বিরতি না থাকার জন্য পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং দ্রুত ও স্থায়ী সংরক্ষণে বাধার সৃষ্টি হয়। এইজন্য স-বিরাম পদ্ধতিতে শিখলে অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে ভাল ও দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

৪। অতি-শিখন

সংরক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি বহুদিন মনে রাখার দরকার পড়ে তবে অতি-শিখন আবশ্যক। বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত হয়ে যাবার পরও যদি

1. Undistributed or Massed Method 2. Distributed or Spaced Method

সেটি আরও কিছুক্ষণ শিখে যাওয়া যায় তবে তাকে অতি-শিখন বলে। অতি-শিখন করা বিষয়বস্তু সহজে ভোলা যায় না এবং পরে সেটি যান্ত্রিক স্মৃতির রূপ নেয়। যেমন, ব্যক্তির নিজের নাম বা যে সহরে বা রাস্তায় সে বাস করে তার নাম, নিজের নিকট আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের নাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে অতি-শিখন হয় বলে ব্যক্তি কখনও এগুলি ভোলে না।

৫। অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি

শিখনের এই পদ্ধতিটি গেষ্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণীয় বস্তুটির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ-ধারা এবং সামগ্রিক রূপটি যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে শিখন দ্রুত ও স্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়। গেষ্টাল্ট মতবাদের অনুসরণে এই পদ্ধতিটিকে অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি[1] বলা যায়। আর যদি যান্ত্রিক পন্থায় উদ্দেশ্যবিহীন প্রতি-ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করা হয় তবে সে শিখন আয়াসবহুল ও বিলম্বিত হয়। যেমন, কোহ্‌লারের শিখনের উপর পরীক্ষণে শিম্পাঞ্জীটি অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতিতে শিখতে পেরেছিল বলে তার শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু থর্নডাইকের পরীক্ষণে বিড়ালটির শিখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘটিত হওয়ার ফলে তার শিখন বিলম্বিত ও শ্রমসাপেক্ষ হয়েছিল।

৬। ছন্দ ও সুর

ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে কোন কিছু মুখস্থ করলে শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়। এই জন্য গদ্যের চেয়ে কবিতা অনেক দ্রুত ও আরও ভালভাবে মুখস্থ হয়। এমন কি অর্থহীন বস্তুও সুর বা ছন্দের মধ্যে দিয়ে সহজে ও স্বল্প সময়ে শেখা যায়। যেমন, সুর করে নামতা মুখস্থ করার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে সব দেশেই প্রচলিত আছে। শিশু বিদ্যালয়ে কবিতার মধ্যে দিয়ে বর্ণ পরিচয় শেখানোর প্রথাও একপ্রকার সর্বজনীন।

৭। স্মৃতি-সহায়ক কৌশলাদি

সময় সময় কোন প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ একটি বিষয়বস্তু মনে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। এগুলিকে স্মৃতি-সহায়ক কৌশল[2] বলা হয়। যখন আমাদের কোন সংখ্যার লম্বা সারি মনে রাখতে হয় তখন আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্য সংখ্যাগুলির মধ্যে নানারকম কৃত্রিম সম্বন্ধের কল্পনা করে নিই। আবার অনেক সময় শিক্ষণীয় শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা প্রভৃতির সঙ্গে বাইরের বা অপ্রাসঙ্গিক কোন বস্তুর কৃত্রিম অনুষঙ্গ[3] স্থাপন করে নিয়ে সেগুলি আমরা মনে রাখতে চেষ্টা করি। ইতিহাসের তারিখ, টেলিফোন বা বাড়ীর নম্বর, এ সকল মনে রাখার জন্য আমরা প্রায়ই এই ধরনের কৃত্রিম কৌশলের সাহায্য নিয়ে থাকি।

---

1. পৃঃ ৩১৫—পৃঃ ৩১৬ 2. Mnemonic Devices 3. পৃঃ ২০৯

এই ধরনের কৌশলগুলি সুপরিকল্পিত হলে অবশ্যই স্মৃতির সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কৌশলটি জটিল ও কষ্টকল্পিত হয় তাহলে সেটি স্মৃতির সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং সহজ এবং স্বাভাবিক সংরক্ষণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

অনুশীলনী

১। সবিরাম ও অবিরাম পদ্ধতি দুটির পার্থক্যগুলি বর্ণনা কর এবং স্মৃতির ক্ষেত্রে এদের তুলনামূলক গুরুত্বটি বল।

২। মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ার পরিমিততার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিগুলি উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা কর।

৩। নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে তুলনা কর :—

(ক) সমগ্র পদ্ধতি ও অংশ পদ্ধতি (খ) আবৃত্তি পদ্ধতি ও পঠন পদ্ধতি

৪। টীকা লেখ :—

(ক) অতি-শিখন (খ) অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি (গ) সহজে ও দ্রুত মুখস্থ করার কৌশল।

পঁচিশ

শিখনের রেখাচিত্র

শিখন প্রক্রিয়াটি যখন সংঘটিত হয় তখন সেটির প্রকৃতি ও অগ্রগতিকে আমরা একটি চিত্রের আকারে প্রকাশ করতে পারি। একেই শিখনের রেখাচিত্র বলে[1]। এই শিখনের রেখাচিত্র থেকে আমরা নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারি। যেমন, কত সময়ে কতটা শিখন হয় বা কতবার প্রচেষ্টার পর কতটা শিখন হয় বা উৎকর্ষের দিক দিয়ে শিখনের প্রকৃতি কি রকম কিংবা পরিমাণের দিক দিয়ে কতটা শিখন হল ইত্যাদি। এই ধরনের রেখাচিত্রে সাধারণত একদিকে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার সংখ্যা বা তার ব্যয়িত সময়কে একক রূপে ধরা হয়, আর অপর দিকে প্রকৃতির দিক দিয়ে কিংবা পরিমাণের দিক দিয়ে শিখনের উন্নতির মানকে একক রূপে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত x-অক্ষরেখায় ছকা হয় শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা বা সময়ের এককগুলি এবং y-অক্ষরেখায় ছকা হয় শিখনের প্রকৃতিগত বা পরিমাণগত উন্নয়নের মানের এককগুলি।

শিখনের রেখাচিত্র শিক্ষার্থীর আচরণ অনুযায়ী নানা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এই ধরনের রেখাচিত্র থেকে যেমন শিখনের গতিপথ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া
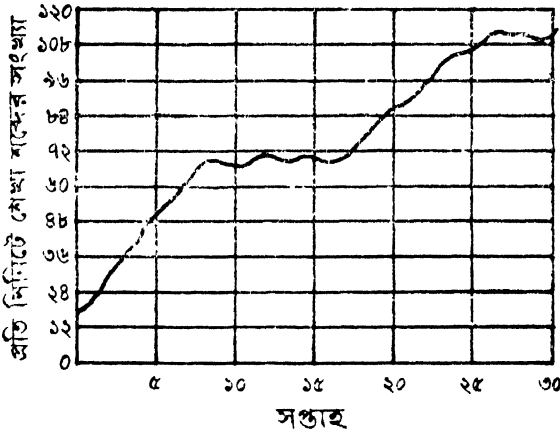
[এই রেখাচিত্রটিতে শিখনের প্রাথমিক উর্ধ্বগতি, স্থিতাবস্থা ও অধিত্যকা ও পরবর্তী উর্ধ্বগতি দেখান হয়েছে।]

যায়, তেমনই পাওয়া যায় শিখনের হার সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান। সাধারণত শিখনের ক্ষেত্রে যে ধরনের রেখাচিত্র পাওয়া যায় তার একটা দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হল।

1. Learning Curve

প্রদত্ত রেখাচিত্রটি শিখনের উপর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের রেখাচিত্র। ১৮৯৯ সালে এই পরীক্ষণটি সম্পাদিত হয়। একজন শিক্ষার্থী সপ্তাহে কতগুলি করে টেলিগ্রাফের সাংকেতিক শব্দ শিখেছে এটি তারই রেখাচিত্র। x-অক্ষরেখায় ছকা হয়েছে শিক্ষার্থীর শিখনের সময় আর y-অক্ষরেখায় ছকা হয়েছে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী কতগুলি করে শব্দ শিখে চলেছে তার পরিমাণ। নীচের তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে উপরের রেখাচিত্রটি আঁকা হয়েছে।

সময়	(সপ্তাহে)	১	২	৪	৫	৬	৮	১০	১২	১৪	১৫	১৮	২০	২৩	২৫
শিখনের হার	(মিনিটে)	[illegible]	২৪	৩৬	৪৮	৫৪	৬৬	৬৮	৭১	৭০	৭১	৭২	৮৪	৯৬	১৮৪

শিখনের রেখাচিত্রের বৈশিষ্ট্য

শিখনের এই রেখাচিত্রটি পরীক্ষা করলে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথা—

প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতি

শিখনের সুরুতে কিছুক্ষণের জন্য নিয়মিতভাবে শিখনের উন্নয়ন হতে থাকে। একে প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতি[1] বলা হয়। তার ফলে শিখনের রেখাচিত্রটি প্রথম দিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়ে থাকে। অবশ্য এই ঊর্ধ্বাভিমুখিতার হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কেননা শিখনের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর শিখনক্ষমতা এই দুটি বস্তুর উপর শিখনের উন্নয়নের হার ও প্রকৃতি নির্ভর করে। উপরের শিখনের রেখাচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে শিখনের সুরু থেকে ১০ম সপ্তাহ পর্যন্ত শিখনের রেখাটি সমভাবে উপরের দিকে উঠে গেছে।

অধিত্যকা বা স্থিতাবস্থা

শিখনের মধ্যপথে এমন একটি অবস্থা আসে যাকে আমরা স্থিতাবস্থা বলে বর্ণনা করতে পারি। রেখাচিত্রের এই অংশটিকে শিখনের অধিত্যকা[2] বলা হয়। রেখাচিত্রের এই অংশটিতে শিখনের ঊর্ধ্বগতি থাকে না এবং রেখাচিত্রটির বেশ কিছুটা অংশ সমতল থাকে। অর্থাৎ এই সময় শিখনের কোন উন্নতি ঘটে না এবং অবনতিও ঘটে না। শিখনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অনুশীলন বা প্রচেষ্টার ফলে শিখনের উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু কতকগুলি শিখনের রেখাচিত্রে দেখা গেছে যে বিশেষ একটা সময়ে এই নিয়ম কার্যকর হয় না বরং ঐ সময়টিতে শিখনের অগ্রগতি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। পূর্বপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ১০ম সপ্তাহ থেকে ১৮শ সপ্তাহ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে নতুন শব্দ বেশী শেখা সম্ভব হয় নি, যদিও তার পর থেকে আবার তার শিখনের উন্নয়ন ঘটে চলেছে।

অধিত্যকা কালের ব্যাখ্যা

শিখনের রেখাচিত্রে কেন এই অধিত্যকা কাল বা উন্নয়নের সাময়িক বিরতি দেখা দেয় তার ব্যাখ্যা রূপে কতকগুলি তত্ত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—

1. **Initial Spurt** 2. **Plateau**

প্রথমত, শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ কমে যেতে পারে বা তার মধ্যে একঘেয়েমি দেখা দিতে পারে। সেইজন্য কিছুক্ষণের জন্য তার শিখনের উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পরে যখন শিক্ষার্থী নতুনভাবে উৎসাহ বোধ করে তখন আবার তার শিখনের উন্নয়ন ঘটতে সুরু করে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার প্রকৃতি বা পদ্ধতি বদলাতে পারে। প্রথম সে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজটি করতে থাকে এবং তার শিখনের মধ্যে ক্রম-উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে হয়ত একটি উন্নততর পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখতে সুরু করে। তার ফলে সেই সময়ে তার শিখনের কোনও উন্নতি ঘটে না। পরে যখন সে তার এই নতুন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন আবার শিখনের ক্রমোন্নতি দেখা যায়।

তৃতীয়ত, কোনও প্রতিবন্ধকের ফলে শিখন সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এমন হতে পারে যে আগে শেখা কোনও শিখন এই নতুন শিখনে বাধার সৃষ্টি করছে এবং তার ফলে শিখনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। অনেক সময় নতুন শেখাবস্তুরই বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে এবং তার ফলে শিখনের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পরে যখন শিক্ষার্থী এই প্রতিবন্ধকটি দূর করতে পারে তখন আবার শিখনের উন্নতি দেখা দেয়। যেমন যে শিক্ষার্থী উচ্চস্বরে পড়া খুব বেশী অভ্যাস করেছে তার পক্ষে নিঃশব্দে পড়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতির পর তার শিখনের মধ্যে অধিত্যকা কাল দেখা দেবে। অবশ্য যখন সে নিঃশব্দে পড়া অভ্যাস করে নেবে তখন আবার তার শিখনের অগ্রগতি হবে।

সাধারণত বিদ্যালয়ে জোর করে যখন কোনও পদ্ধতি বা বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় তখনই 'অধিত্যকা কাল' দেখা দেয়। যেমন শিক্ষার্থীকে হঠাৎ এমন একটা কাজ বা সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হল যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগে কোনও পরিচয় নেই। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতি কিছুটা দেখা দিলেও কিছুক্ষণ পরে শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয় এবং যতক্ষণ না সে সেই নতুন কাজ বা সমস্যাটি আয়ত্ত করতে পারছে ততক্ষণ তার শিখনের অগ্রগতি হয় না। অবশ্য যখন শিক্ষার্থী এই নতুন কাজ বা সমস্যাটি আয়ত্ত করে নেয় তখন আবার শিখনের অগ্রগতি ঘটে।

পরবর্তী ঊর্ধ্বগতি

অধিত্যকা কালের শেষে শিখনের অগ্রগতি পুনরায় সুরু হয় এবং রেখাচিত্রটি আবার ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়। যতক্ষণ শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার মান অব্যাহত থাকে ততক্ষণ

এই ঊর্ধ্বগতিও বজায় থাকে। তবে সাধারণত কিছুক্ষণ শেখার পর শিক্ষার্থীর মধ্যে মানসিক ও দৈহিক উভয় ধরনের ক্লান্তি দেখা দেয়। তার ফলে শিখনের রেখাচিত্রের আকৃতিও সেইমত রূপান্তর গ্রহণ করে। এটা মনে রাখতে হবে যে সব শিখনেরই অগ্রগতির একটা সীমা আছে এবং সেই বিন্দুতে পেঁছলে শিখনের অগ্রগতিও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে সব কিছুই নির্ভর করে শিখনের প্রকৃতি এবং শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও প্রেষণার উপর।

শিখনের রেখাচিত্রমাত্রতেই যে স্থিতাবস্থা বা অধিত্যকা থাকবে তা নয়। এমন অনেক শিখনের ক্ষেত্র আছে যেখানে শিখনের অগ্রগতি অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে এবং কোন স্থিতাবস্থা বা অধিত্যকা দেখা দেয় না। উপরে আলোচিত যে সব কারণে অধিত্যকা দেখা দেয় সে কারণগুলি অনুপস্থিত থাকলে শিখনের রেখাচিত্রে অধিত্যকা দেখা দেবে না এবং শিখনের রেখাচিত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বাভিমুখীই থাকবে।

অনুশীলনী

১। শিখনের রেখাচিত্র কাকে বলে? এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

২। শিখনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উর্ধ্বগতি ও অধিত্যকা কাকে বলে? এগুলি কেন ঘটে?

ছাব্বিশ

শিখনের সঞ্চালন

শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত সকল দেশেই এই তত্ত্বটির উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম রচনা করা হত। শিখন সঞ্চালনের এই তত্ত্বটির বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদের আরও দু'টি প্রাচীন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সে দুটি হল—মানসিক শক্তিবাদ[1] এবং মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব[2]। বর্তমানে এ দুটি মতবাদই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিচারে ভুল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে।

মানসিক শক্তিবাদ

এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের মন কতকগুলি বিভিন্নধর্মী শক্তি দিয়ে গঠিত। সেই শক্তিগুলি হল স্মৃতি, বিচারকরণ, অনুমান, ইচ্ছা, কল্পনা, বুদ্ধি ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটি মনের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে ও নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আমরা যে সব বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি সেগুলি এই শক্তিগুলির সাহায্যেই করে থাকি। এই শক্তিগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অনুশীলন বা চর্চার ফলে এগুলি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অনুশীলন বা চর্চার অভাবে এগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই শক্তিবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। তার প্রধান কারণ হল যে এই মতবাদে যেগুলিকে শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলির অনেকগুলিই সত্যকারের শক্তি নয়। সেগুলি হয় মানসিক প্রক্রিয়া, নয় অন্য কোনও ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য। যেমন চিন্তন, অনুমানকরণ, কল্পন ইত্যাদি হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র। তা ছাড়া মনের মধ্যে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন কোন শক্তি নেই। মনের যে সকল শক্তি আছে সেগুলির অধিকাংশ জটিল ও মিশ্রপ্রকৃতির। তবে আধুনিক ফ্যাক্টরবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের অনেকগুলি ফ্যাক্টর বা উপাদানের কল্পনা করেছেন এবং সেদিক দিয়ে তাঁদের ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রাচীনপন্থী মানসিক শক্তিবাদীদের বেশ কিছুটা মিল দেখা যায়। কিন্তু সে মিল নিতান্তই বাহ্যিক। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের শক্তি বা ফ্যাকালটির সঙ্গে আধুনিক ফ্যাক্টরের বা উপাদানের প্রচুর পার্থক্য আছে।

---

1. Faculty Psychology 2. Theory of Formal or Mental Discipline

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব

প্রাচীনকালের এই মানসিক শক্তিবাদ থেকেই পরে জন্মলাভ করেছিল 'মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব' নামে আর একটি বহুল প্রচলিত মতবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্মৃতি, মনোযোগ, বিচারকরণ, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পাঠের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, গণিতের চর্চার ফলে বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, তর্কবিদ্যা পড়লে বিচার শক্তি বাড়ে, ব্যাকরণ পড়লে স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়, সাহিত্য চর্চা করলে সৌন্দর্যবোধ পুষ্ট হয় ইত্যাদি। প্লেটো থেকে সুরু করে উনবিংশ শতকের অনেক শিক্ষাবিদ্ই মনে করতেন যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের এইভাবে মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে অধিকতর উন্নত বা শক্তিশালী করার ক্ষমতা আছে এবং এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন দেশের পাঠক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শক্তিবাদের অসারতা প্রমাণিত হওয়া থেকেই মানসিক শৃঙ্খলার এই সূত্রটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটির সহগামীরূপে শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি জন্ম নেয়। এই তত্ত্বটির মূল বক্তব্য হল যে পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতি থেকে পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে শিখন সঞ্চালিত হয়ে থাকে। যেমন, এক ব্যক্তি প্রথমে 'ক' বিষয়বস্তুটি শিখল, তারপর 'খ' বিষয়বস্তুটি শিখল। এখন শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব অনুযায়ী 'খ' বিষয়বস্তুটির শিখনে 'ক' বিষয়বস্তুটির শিখন কিছুটা সঞ্চালিত হবে। অর্থাৎ 'ক' বিষয়বস্তুর শিখন 'খ' বিষয়বস্তুর শিখনকে কিছুটা প্রভাবিত করবে। এই প্রভাবিত করা আবার প্রকৃতিতে দু'রকম হতে পারে, অস্তিবাচক ও নেতিবাচক। যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনকে সাহায্য করে তাহলে তাকে অস্তিবাচক সঞ্চালন[1] বলা হয়। আর যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে তাকে নেতিবাচক সঞ্চালন[2] বলা হয়। আবার যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনকে সাহায্য বা প্রতিরোধ কিছুই না করে তাহলে তাকে শূন্য বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন[3] বলা হয়।

মনে করা যাক একজন শিক্ষার্থী প্রথমে একটি ইংরাজী কবিতা শিখল। তারপর সে শিখল একটি বাংলা কবিতা। এখন যদি ইংরাজী কবিতার শিখন তার বাংলা কবিতার শিখনকে সাহায্য করে বা সহজ করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে অস্তিবাচক সঞ্চালন হয়েছে। কিন্তু যদি ইংরাজী কবিতার শিখন তার বাংলা কবিতার শিখনকে কঠিন করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে যে তার ক্ষেত্রে নেতিমূলক সঞ্চালন হয়েছে। আর যদি ইংরাজী কবিতার শিখন তার বাংলা কবিতার শিখনকে সাহায্য

1. Positive Transfer 2. Negative Transfer 3. Nill or Indefinite Transfer

বা প্রতিরোধ কিছুই না করে তাহলে বুঝতে হবে যে শিক্ষার্থীর কোন সঞ্চালন হয় নি বা অনির্দিষ্ট প্রকৃতির সঞ্চালন হয়েছে।

বর্তমানে নানা গবেষণার ফলে মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি পুরোপুরি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলেও শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়নি। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে শিখনের সঞ্চালন একটি সর্বজনীন ঘটনা এবং সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে ঘটে থাকে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিখন সঞ্চালন সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং সব ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটে না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সর্তাধীনে এক পরিস্থিতি থেকে অপর পরিস্থিতিতে যে বিভিন্ন মাত্রায় শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে।

শিখন সঞ্চালনের উপর গবেষণা

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব ও শিখন সঞ্চালন নিয়ে প্রথম পরীক্ষণ করেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস। তাঁর পরীক্ষণটি শিখন সঞ্চালনের ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষণ রূপে স্বীকৃত হয়ে আছে। তিনি প্রথমে ভিক্টর হিউগোর লেখা 'স্যাটির' কাব্য থেকে ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করে নিজের মুখস্থ করার ক্ষমতা অর্থাৎ কত সময়ে তিনি কতটা মুখস্থ করতে পারেন তার একটি মান নির্ধারিত করেন। তারপর তিনি প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' থেকে শিখে ৩৮ দিন ধরে তাঁর মুখস্থ করার ক্ষমতার চর্চা করেন। তারপর তিনি আবার 'স্যাটির' থেকে পূর্বে পঠিত অংশের পরবর্তী ১৫৮ লাইন মুখস্থ করে পরীক্ষা করেন যে তাঁর মুখস্থকরণের ক্ষমতার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা। কিন্তু দেখা গেল যে এই নতুন ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করতে তাঁর প্রথম বারের চেয়ে বেশী সময়ই লেগেছে। জেমস আরও চারজন ভদ্রলোককে দিয়ে ঐ একই পরীক্ষণটি স্বতন্ত্র ভাবে করান এবং ঐভাবে পরীক্ষণ করে তাঁরাও প্রত্যেকে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

জেমসের এই পরীক্ষণ থেকে দুটি তথ্য প্রমাণিত হয়। প্রথমত, প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভুল। মুখস্থ করার চর্চা করলে যে মুখস্থ শক্তি বাড়ে, মানসিক শৃঙ্খলার এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হল। দেখা গেল যে জেমস ৩৮ দিন ধরে মুখস্থ প্রক্রিয়ার চর্চা করা সত্ত্বেও তাঁর মুখস্থ করার শক্তি একটুও বাড়েনি, বরং কমে গেছে। বস্তুত, উইলিয়ম জেমসের এই পরীক্ষণটি মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটিকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করে। জেমসের পরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী অনুরূপ পরীক্ষণ করে প্রমাণ করেছেন যে মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটির কোন বাস্তবতা নেই।

দ্বিতীয়ত, জেম্‌সের পরীক্ষণটি শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটিরও বিরুদ্ধে যায়। তাঁর পরীক্ষণ থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে এক শিখন পরিস্থিতি থেকে আর এক শিখন পরিস্থিতিতে কোন সঞ্চালন হয় না। জেম্‌সের ক্ষেত্রে প্রথম ১৫৮ লাইনের শিখন থেকে দ্বিতীয় ১৫৮ লাইনের শিখনের ক্ষেত্রে কোন সঞ্চালন ঘটেনি। কেননা দ্বিতীয় বারে প্রথম বারের চেয়ে সময় বেশীই লেগেছিল। এক কথায় শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটিও ভুল অর্থাৎ এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালিত হয় না।

শিখন সঞ্চালনের প্রকারভেদ

কিন্তু জেমসের পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটিকে একেবারে অবাস্তব বলে বাতিল করে দেন নি। গত ৫০ বৎসরে এই তত্ত্বটির উপর প্রায় ২০০টি মত পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে এবং তা থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, এমন কি পরস্পর-বিরোধী বহু তথ্য মনোবিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে। এই সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ
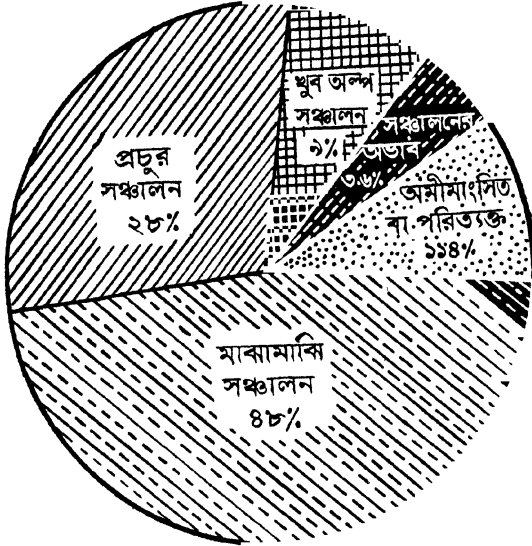
[ওরাটা কর্তৃক সঙ্কলিত শিখন-সঞ্চালনের পরীক্ষণগুলির বিবরণীর চিত্ররূপ]

করে দেখা গেছে যে প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে শিখনের সঞ্চালন নানা প্রকারের হতে পারে। পরিমাণের দিক দিয়ে সঞ্চালন হতে পারে তিন প্রকারের। যথা—প্রচুর, মাঝামাঝি এবং অল্প। প্রকৃতির দিক দিয়ে তেমনই সঞ্চালন হতে পারে তিন প্রকারের—অস্তিমূলক, নেতিমূলক এবং শূন্য বা অনির্দিষ্ট।

১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শিখন-সঞ্চালনের উপর বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা যে সব পরীক্ষণ সম্পন্ন করেন সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ওরাটা[1] তৈরী করেন। এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই পরীক্ষণগুলির মধ্যে প্রচুর শিখন সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ২৮টি ক্ষেত্রে, মাঝামাঝি সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৪৮টি ক্ষেত্রে, খুব অল্প সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৯টি ক্ষেত্রে, নেতিমূলক সঞ্চালন বা সঞ্চালনের অভাব ঘটেছে শতকরা ৩·৬ ক্ষেত্রে এবং বাকী শতকরা ১১·৪টি ক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষণের ফলাফল থেকে বিচার করলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে অস্তিবাচক শিখন সঞ্চালন হয় সেটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যদিও প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চালনের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য থাকতে পারে।

স্কুল-পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন

স্কুল-পাঠ্যবিষয়গুলিতে কি পরিমাণে শিখন সঞ্চালন হয় এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। স্কুলের পাঠক্রমে অনেক বিষয়বস্তু পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হত যেগুলির স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল যে সেগুলির শিখন সঞ্চালনের মাধ্যম রূপে কাজ করার শক্তি আছে। স্কুল পাঠ্যবিষয়গুলিতে কি ধরনের সঞ্চালন হয় তার উপর বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হল।

পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ব্যাকরণ পাঠের একটা বিরাট মূল্য দেওয়া হত এবং দাবী করা হত যে মানসিক শৃঙ্খলাসৃষ্টিতে ব্যাকরণের প্রচুর ক্ষমতা আছে। কিন্তু ব্রিগসের[2] শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখা যায় যে একমাত্র সাদৃশ্য ও বৈষম্য ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া আর কোন গুণ ব্যাকরণ পাঠ থেকে সঞ্চালিত হয় না। অর্থাৎ ব্যাকরণ পাঠের সঞ্চালন ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

গণিতের শিক্ষা থেকে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা সঞ্চালিত হয় এই ছিল এতদিনের প্রচলিত ধারণা। উইঞ্চের[3] পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবল গণিত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা থেকেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঞ্চালন অনির্দিষ্ট প্রকৃতির।

মাধ্যমিক পাঠস্তরে মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন স্কুল বিষয়গুলির অধ্যয়নের কোনরূপ সঞ্চালনমূলক প্রভাব আছে কিনা এ নিয়েও প্রচুর পরীক্ষণ হয়েছে। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধিতে স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলির বিশেষ কোন সঞ্চালনমূলক প্রভাব নেই, সত্যকারের যেটির প্রভাব আছে সেটি হল শিক্ষার্থীর বুদ্ধির।

মাধ্যমিক পাঠস্তরে গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রচুর অস্তিবাচক সঞ্চালনের

1. Orata 2. Brigs 3. Winch

প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এই সঞ্চালন কেবলমাত্র ঐ বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য কোন বিষয়ে সঞ্চালিত হয় না।

থর্নডাইক স্কুলে ল্যাটিন শিক্ষার কোন রূপ সঞ্চালন মূল্য আছে কি না তা দেখার জন্য ব্যাপক পরীক্ষণ চালান। তাঁর পরীক্ষণের ফল থেকে দেখা গেছে যে শিখন সঞ্চালনের দিক দিয়ে ল্যাটিন শিক্ষার যথার্থই দাম আছে। যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিখেছে তারা, যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শেখেনি তাদের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে বেশী উন্নত হয়। যেমন, তারা ল্যাটিন ভাষা থেকে প্রসূত ইংরাজী শব্দের বানান দ্রুত শিখতে পারে ইত্যাদি। তবে এই সঞ্চালন প্রথম দু-এক বৎসর থাকে। পরে দেখা যায় যে ল্যাটিন-জানা ও ল্যাটিন না-জানা উভয় প্রকার শিক্ষার্থীই প্রায় সব বিষয়েই সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এই পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত-ভিত্তিক ভাষাগুলির শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংস্কৃত ভাষা শেখার এই ধরনের সঞ্চালন মূল্য থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিখন সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যই ঘটে থাকে। তবে এ থেকে যেন এ সিদ্ধান্ত না করা হয় যে এটি একটি সার্বজনীন ঘটনা। কেননা শিখন সঞ্চালন বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটলেও দেখা গেছে যে সঞ্চালনের পরিমাণ প্রায় ০% থেকে সুরু করে ৯২·৯% পর্যন্ত হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নেতিমূলক সঞ্চালনও হয়ে থাকে। সেজন্য যদিও মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটিকে কোনক্রমেই বাস্তব ঘটনারূপে গ্রহণ করা যায় না তথাপি শিখন সঞ্চালন যে একটি বাস্তব ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব

শিখন-সঞ্চালন কেন ঘটে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষণ চালান হয়েছে এবং সঞ্চালনের ব্যাখ্যা রূপে আমরা তিনটি প্রধান তত্ত্বের সন্ধান পাই। সেগুলি হল—

১। অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব[1], ২। সামান্যীকরণের তত্ত্ব[2] এবং ৩। অভিস্থাপনের তত্ত্ব[3] বা গেস্টাল্ট তত্ত্ব।

১। অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব

এই তত্ত্বটি থর্নডাইকের দেওয়া। তাঁর মতে একটি মানসিক প্রক্রিয়া আর একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে ততটুকু প্রভাবিত করতে পারে যতটুকু অভিন্ন উপাদান এ দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ পূর্বগামী শিখন পরিস্থিতি এবং অনুগামী শিখন পরিস্থিতি—এ দুয়ের মধ্যে যে যে বিষয় বা অংশটুকু অভিন্ন সেই বিষয়টিরই বা অংশটুকুরই পূর্বগামী পরিস্থিতি থেকে অনুগামী পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে।

1. Theory of Identical Elements 2. Theory of Generalisation 3. Theory of Transposition

থর্নডাইক এই সঞ্চালন প্রক্রিয়াটির একটি শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যাও দেন। তাঁর মতে শিখন ঘটার সময় দুটি ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে যতটুকু এক এবং অভিন্ন স্নায়ুমূলক সংযোজন সংঘটিত হয় ঠিক ততটুকুর ক্ষেত্রেই শিখন সঞ্চালন ঘটে থাকে। থর্নডাইকের এই
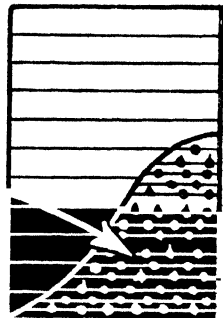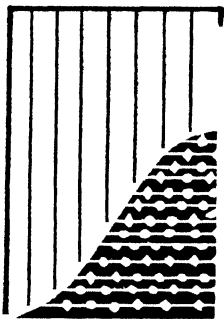
[থর্নডাইকের 'অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বের' চিত্ররূপ। দুটি শিখনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অভিন্ন অংশটুকুরই সঞ্চালন হয়েছে।]

অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বের সমর্থকদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, মনোভাব, এমন কি উদ্দেশ্যের অভিন্নতা থাকলেও এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে ঐ বিষয়গুলির সঞ্চালন ঘটবে।

অভিন্ন উপাদানের সঞ্চালনের একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক একটি ছেলে নীচের গুণ অঙ্কটি প্রথমে কষল।

৩৪৮৯৩৭৭৫৪ × ৪২৬৯

তারপর তাকে আর একটি গুণ অঙ্ক কষতে দেওয়া হল।

৭৮০৯৫৭৩১৪ × ৯০৬৯৫

এখন এই দুটি অঙ্ক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে দুটি অঙ্কই নীচের অংশটি অভিন্ন আছে। যথা— ৯৩৭ × ৬৯

ফলে প্রথম অঙ্কটি করার পর দ্বিতীয় অঙ্কটি করার সময় শিক্ষার্থীর ঐ বিশেষ অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রেই মাত্র সঞ্চালন হবে। অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে কোন সঞ্চালন ঘটবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কটিতে ঐ বিশেষ অংশটি কষার সময় তার পূর্বের শিখন তাকে সাহায্য করবে এবং তার ঐ কাজটুকু অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও দ্রুত হয়ে উঠবে। এখানে দুটি শিখনের ক্ষেত্রে যতটুকু উপাদান অভিন্ন ততটুকুরই সঞ্চালন ঘটল।

২। সামান্যীকরণের তত্ত্ব

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটির সমালোচনা করে জাড[1] বলেন যে উপাদানের অভিন্নতার জন্য শিখনের সঞ্চালন হয় না। প্রকৃতপক্ষে সঞ্চালন নির্ভর করে ব্যক্তি

1. Judd

নিজে তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্যীকরণ বা সামান্য ধারণা গঠন করতে পারল তার উপর। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের অর্থ হল ব্যক্তির বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে থেকে অবান্তর বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিয়ে সেগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে একটি সামান্য সূত্র বা ধারণা গঠন করা। তাঁর মতে যে যত বেশী তার অভিজ্ঞতা থেকে এই রকম সামান্য ধারণা বা সূত্র গঠন করতে পারে তার ক্ষেত্রে তত বেশী সঞ্চালন হয়ে থাকে।

জাডের এই মতবাদের সমর্থনে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের (১৯০৮) উল্লেখ করা যায়। এই পরীক্ষণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর দু'দল ছেলেকে (একটি পরীক্ষণমূলক দল আর একটি নিয়ন্ত্রিত দল)[1] জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটা লক্ষ্যের প্রতি তীর ছুঁড়তে বলা হয়। জলের নীচে কোন বস্তু রাখলে আলোর প্রতিসরণের[2] ফলে বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যে জায়গায় থাকে ঠিক সেখানে দেখা যায় না। সেখান থেকে একটু দূরে আছে বলে মনে হয়। আলোর প্রতিসরণের এই রহস্যটুকু জানা না থাকার জন্য ঐ দু'দল ছেলেই লক্ষ্য ভেদে একই প্রকারের প্রচুর ভুল করল। এর পর পরীক্ষণমূলক দলটিকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষক প্রতিসরণের মূল তত্ত্বটি তাদের কাছে বর্ণনা করলেন। নিয়ন্ত্রিত দলটিকে এ সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। তারপর
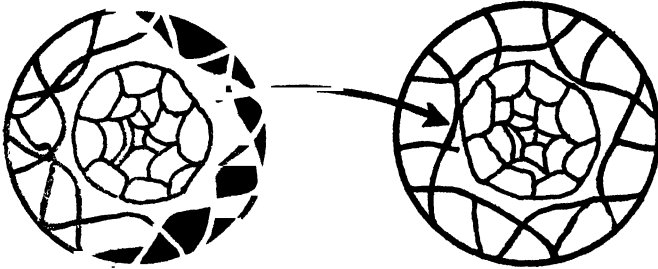
[জাডের 'সামান্যীকরণ তত্ত্বে'র চিত্ররূপ। দুটি ক্ষেত্রের কেবলমাত্র মূলগত সামান্যধর্মী সূত্রগুলির সঞ্চালন হয়েছে।]

ঐ দু'দলকেই আবার ঐভাবে জলের ৪ ইঞ্চি তলায় রাখা আর একটি লক্ষ্যে ঐ একই-ভাবে তীর ছুঁড়তে বলা হল। দেখা গেল যে, পরীক্ষণমূলক দলটি, অর্থাৎ যারা প্রতিসরণের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে, তারা প্রথম বার অপেক্ষা লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভুল করল, অথচ নিয়ন্ত্রিত দলটি অর্থাৎ যারা প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারে নি তারা আগের বারের মতই প্রচুর ভুল করল। হেনড্রিকসন ও স্ক্রাভার (১৯৪১) জাডের ঐ একই পরীক্ষণ অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগ করে অনুরূপ ফল পান।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। কিন্তু

1. পৃঃ ২৩—পৃঃ ২৪ 2. Refrac ion

দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালনই হয় নি। জাডের মতে প্রথম দলটির এই সাফল্যের মূলে কারণ হল যে প্রতিসরণের মূলনীতিটি তাদের জানা থাকার জন্য তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটি সামান্য ধারণা বা সূত্র গঠন করতে পেরেছিল এবং তার ফলে তারা লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভুল করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দলটির প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় তারা সমস্যাটি সম্বন্ধে কোন অন্তর্নিহিত সূত্র গঠন করার সুযোগ পায়নি এবং তার ফলেই তারা প্রচুর ভুল করেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে যেখানে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা থেকে সামান্য সূত্র গঠনে সমর্থ হয় সেখানেই শিখন সঞ্চালন ঘটে।

জাডের এই পরীক্ষায় থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটি স্পষ্টই ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এখানে দু'দল ছেলের প্রথমবারের লক্ষ্যভেদ ও দ্বিতীয়বারের লক্ষ্যভেদ—এই দুটি শিখন পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের প্রচুর অভিন্নতা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি, অথচ প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। উপাদানের অভিন্নতা যদি সঞ্চালনের কারণ হত তাহলে দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রেও সঞ্চালন হত। তার কারণ সেখানে দুটি ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে অভিন্ন উপাদান বর্তমান ছিল। বস্তুত জলের নীচে রক্ষিত লক্ষ্যের গভীরতার পার্থক্য ছাড়া দুটি ক্ষেত্রে অন্য কোন পার্থক্যই ছিল না। অতএব প্রথম দলটির ক্ষেত্রে যে সঞ্চালন হয়েছিল তার কারণ দুটি পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের অভিন্নতা নয়। প্রথম পরিস্থিতি থেকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সামান্যীকরণ বা সামান্য সূত্র গঠনই শিখন সঞ্চালনের প্রকৃত কারণ।

৩। গেষ্টাল্ট মতবাদীদের অভিস্থাপন তত্ত্ব

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমগ্র আকৃতি বা সংগঠনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিখন সঞ্চালনের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটিকে অভিস্থাপন তত্ত্ব[1] বলেও বর্ণনা করা হয়।

তাঁদের মতবাদ অনুযায়ী আমাদের অভিজ্ঞতার কোন বিষয়বস্তুই তার অংশগুলির নিছক সমষ্টি নয়, সেগুলির সমষ্টির উপরেও আরও অতিরিক্ত কিছু এবং সেই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে নিছক যোগ করে বা বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে না। কোন কিছু শেখার অর্থ হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুটির এই অন্তর্নিহিত সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা এবং এভাবে যে শিখন ঘটে সে শিখনই সত্যকারের শিখন। আবার এই ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক এবং স্থায়ী সঞ্চালন ঘটে থাকে। এই কারণে গেষ্টাল্টবাদীরা প্রথম শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধধারাটির পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে অভিস্থাপনকে সঞ্চালন বলে থাকেন।

1. Theory of Transposition

কোহ্‌লারের পরীক্ষণে দেখা গিয়েছিল যে শিম্পাঞ্জী যখন দুটি বাঁশের খণ্ড একসঙ্গে জুড়ে কলার ছড়ার নাগাল পেয়েছিল তখন তার শিখন হয়েছিল অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এবং সেইজন্য ঐ শিখনটি একবার আয়ত্ত হবার পর তা স্থায়ীভাবে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে যখনই তাকে ঐ ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছিল তখনই দেখা গেছল যে ঐ কৌশলটি অবলম্বন করতে তার একটুও দেরী বা দ্বিধা হয় নি।[1]

শিম্পাঞ্জীটির ক্ষেত্রে এই সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গেস্টাল্টবাদীরা বলেন যে শিম্পাঞ্জীটি তার প্রথম দিনের শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির (যেমন, খাঁচা, কলা, দুটি বাঁশের খণ্ড প্রভৃতির) মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ধারাটি হৃদয়ঙ্গম করেছিল দ্বিতীয় দিনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সেই সম্বন্ধের ধারাটিকেই সে অভিস্থাপন করল এবং তার ফলেই মুহূর্তেই তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অতএব এখানে প্রকৃতপক্ষে পূর্বেকার শিখন পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধধারাটিরই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চালন ঘটেছে। এই কারণে প্রথম শিখন পরিস্থিতির সম্বন্ধ ধারাকে দ্বিতীয় শিখন পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করাকেই গেস্টাল্টবাদীরা সঞ্চালন বলে থাকেন।

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যাটি বলতে গেলে থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান সূত্রের ঠিক বিপরীত। থর্নডাইকের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বর্তমান বিষয়-বস্তুটির অভ্যন্তরস্থ অংশগুলির সঙ্গে পূর্বে শেখা বিষয়বস্তুটির অংশগুলির অভিন্নতা খুঁজে বার করতে হবে। আর গেস্টাল্টবাদীদের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার সমগ্র রূপটির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এমন কি তাঁদের মতে সমগ্রকে উপলব্ধি করতে হলে অংশ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে, কারণ অংশের প্রতি মনোযোগ দিলে সমগ্রের উপলব্ধির পথে অন্তরায়ই সৃষ্টি হবে। বলা বাহুল্য জাডের সামান্যীকরণ মতবাদের সঙ্গে মৌলিক সূত্রের দিক দিয়ে এই মতবাদটির প্রচুর মিল আছে।

শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্বের মূল্যায়ন

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটি তাঁর শিখনের সাধারণ সূত্রগুলির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সংব্যাখ্যানে শিখন হল স্নায়ুমণ্ডলীতে নিউরনগুলির মধ্যে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংযোজনগুলির অতিরিক্ত কোন নতুন সংযোজন সৃষ্টি করা, আর সঞ্চালন তখনই হয় যখন এক ও অভিন্ন স্নায়ু-সংযোজন দুটি বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ল্যাটিন শেখার পর যদি ইংরাজী শব্দ শিখতে সুবিধা হয় তবে বুঝতে হবে যে ল্যাটিন শেখার সময় মস্তিষ্কে যে ধরনের স্নায়ু-সংযোজন ঘটেছিল ইংরাজী শেখার সময় ঠিক সেই ধরনের স্নায়ু-সংযোজনের পুনরাবৃত্তি ঘটল। অতএব

---

1. পৃঃ ৩১৫—পৃঃ ৩১৬

থর্নডাইকের মতে শিখনের সঞ্চালন একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

থর্নডাইকের তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমত বলা চলে যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে কেবলমাত্র স্নায়ু-সংযোজনের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয়। অতএব সঞ্চালনের ব্যাখ্যাও এই একই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জাডের পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অভিন্ন উপাদানের জন্য সব সময়ই সঞ্চালন ঘটে না। তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণে দ্বিতীয় দলটির বেলায় উপাদানের অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোন সঞ্চালন ঘটেনি। তৃতীয়ত, অনেক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে উপাদানের অভিন্নতা থেকে সঞ্চালন ত হয়ই নি বরং তা সঞ্চালনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে একথা স্বীকার্য যে কোন কোন শিখনের ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানের জন্যই সঞ্চালন হয়ে থাকে। বিশেষ করে অভ্যাস গঠন, দৈহিক কাজকর্ম, ভাষাশিক্ষা, শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ইত্যাদি যান্ত্রিক প্রকৃতির বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানই সঞ্চালন ঘটার কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু অমূর্ত বা ধারণামূলক বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতার জন্য কোন রকম সঞ্চালন হয় না। সেখানে জাডের সামান্যীকরণ বা গেস্টাল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সঞ্চালন ঘটে বলা চলে।

জাডের বর্ণিত সামান্যীকরণের তত্ত্ব অনুযায়ী সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর কোন মূল্য নেই। সমস্ত নির্ভর করছে শিখনের পদ্ধতির উপর। বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত পন্থার অনুসরণ, অভিজ্ঞতা থেকে অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলি বাদ দিয়ে সাধারণধর্মী ও প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে পৃথকীকরণ ইত্যাদি পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে অভীষ্ট সঞ্চালনের প্রকৃতি ও মাত্রা। এই পদ্ধতিগুলির সাফল্য আবার বিশেষভাবে নির্ভর করছে মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, বিচারকরণ প্রভৃতি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সম্পাদনের উপর। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সুষ্ঠু সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতির অনুসরণ, বুদ্ধির প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষণ, চিন্তন, বিচারকরণ প্রভৃতি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষসাধন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

গেস্টাল্ট মতবাদটিও জাডের মতবাদের সমধর্মী। তবে জাডের তত্ত্বে কেবলমাত্র পদ্ধতির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, বিষয়বস্তুর গঠন বা প্রকৃতির উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কিন্তু গেস্টাল্টবাদে বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি, এ দুয়ের উপরই সমান জোর দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক উপলব্ধি সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য, অতএব সুষ্ঠু শিখনের প্রথম সর্ত হল সমগ্র সমস্যাটির উপস্থাপন। বিষয়বস্তুটিকে যদি আংশিক উপস্থাপিত করা যায় তাহলে তার শিখন সন্তোষজনক হবে না, সঞ্চালনও ঘটবে না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা হবে সমগ্রধর্মী, অংশগত নয়। বিষয়বস্তুর

বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের উপলব্ধি এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক সত্তার জ্ঞানই হল অন্তর্দৃষ্টি জাগানোর একমাত্র উপায়। অতএব সম্বন্ধমূলক চিন্তন ও বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক সত্তার উপলব্ধি, এই দুটিই হল সঞ্চালন ঘটানোর প্রধানতম পন্থা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালনের গুরুত্ব ও প্রয়োগ

উপরে যে তিনটি শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বের আলোচনা করা হল সেগুলি থেকে আমরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালন ঘটে থাকে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী তৈরী করতে পারি।

শিখনের সঞ্চালন ঘটে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে। যথা—

১। বিষয়বস্তুর অভিন্নতা থাকলে

২। পদ্ধতিগত অভিন্নতা থাকলে

৩। মৌলিক তত্ত্ব বা মূলগত সূত্রের দিক দিয়ে অভিন্নতা থাকলে এবং

৪। উপরের ক্ষেত্রগুলির সমাবেশের ক্ষেত্রে।

উপরের বিবরণী থেকে এই সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায় যে শিক্ষক যথেষ্ট সার্থক এবং সন্তোষজনক ভাবেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালনের সূত্রগুলির প্রয়োগ করতে পারেন এবং তার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সহজ, দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পারেন।

তিনি অবশ্যই একথা মনে রাখবেন যে শিখনসঞ্চালন একটি সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং সর্বক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ করা যাবে না। উপরে যে কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল কেবল সেইগুলির ক্ষেত্রেই যাতে শিখনের সঞ্চালন হয় তিনি তার আয়োজন করবেন।

এদিক দিয়ে শিক্ষকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সুষ্ঠু ও সার্থক সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন সযত্ন পরিচালনা ও নির্দেশনা।

শিক্ষক যদি দেখেন যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়ে এই ধরনের কোন অভিন্নতার সুযোগ আছে তাহলে তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে শিক্ষাপ্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং যাতে শিক্ষার্থী শিখন সঞ্চালনের পূর্ণ সুযোগ পায় তার আয়োজন করবেন।

বিষয়বস্তুর অভিন্নতা বা পদ্ধতিগত অভিন্নতার ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালন অনেকটা স্বতঃপ্রসূত ভাবে ঘটলেও মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রের অভিন্নতার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য ও সুপরিচালনা অপরিহার্য। তার কারণ মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে হলে সামান্যীকরণ নামক উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। আর সামান্যীকরণের সার্থক প্রয়োগের জন্য শিক্ষকের সহায়তা বিশেষভাবে দরকার।

আর এক দিক দিয়ে শিখনসঞ্চালনে শিক্ষকের সাহায্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে নেতিমূলক সঞ্চালন শিক্ষার্থীর সন্তোষজনক শিক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। যেমন পূর্বে গঠিত কোন অভ্যাস শিক্ষার্থীদের নতুন কোন দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে সেই বাধাসৃষ্টিকারী অভ্যাসটি যাতে শিক্ষার্থীর নূতন শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারেন।

বাস্তবক্ষেত্রে সঞ্চালন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ

সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থী যাতে এই প্রক্রিয়াকে তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য তাকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। তার ফলে তার দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করতে এবং বিভিন্ন প্রকৃতির কর্তব্য পালন করতে তার সময় ও শ্রম দুয়েরই লাঘব হবে। ফলে তার সর্বাঙ্গীণ কার্যকারিতার সামগ্রিক মানের উন্নয়ন ঘটবে। এর জন্য তার করণীয় হল—

প্রথমত, কোন্ কোন্ বিষয় থেকে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তির নির্দিষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান থাকা সর্বাগ্রে দরকার।

দ্বিতীয়ত, তার সমস্ত কাজকর্মের সংগঠন সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। সঞ্চালন ঘটাতে গেলে সমস্যাটির মধ্যে অন্তর্নিহিত সুসংহতি এবং অঙ্গগত ঐক্য থাকবে এবং তার ফলে ব্যক্তির পক্ষে ঐ বিষয়টির মূলগত ধারণা বা তত্ত্বগুলি অনুধাবন করতে অসুবিধা হবে না। গেস্টাল্টবাদীর ভাষায় সমস্যাটির সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

তৃতীয়ত. ব্যক্তি যাতে সমস্যাটির বাহ্যিক, অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে বাদ দিতে শেখে এবং তার মধ্যে নিহিত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বার করতে পারে, সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। বস্তুত সঞ্চালন নির্ভর করছে সমস্যাটির মূলগত অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও হৃদয়ঙ্গম করার উপর। এই প্রক্রিয়াটিরই নাম দেওয়া হয়েছে সামান্যীকরণ। অবশ্য কেবলমাত্র বিষয়টির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানলেই চলবে না, সেগুলির মধ্যে কি ধরনের পারস্পরিক সম্বন্ধধারা বর্তমান তা জানাও সার্থক সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য।

সবশেষে, করণীয় কাজ বা সমস্যাটির এই মূলগত তত্ত্বগুলি অনুধাবন করার জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় মানসিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস দরকার। যেমন, মনোযোগ দানের অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ, সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন, বিচারকরণের নিয়মাবলী জানা, প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তু চিনতে পারা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির বাস্তব জীবনে প্রয়োগ সঞ্চালনে বিশেষ সহায়তা করে থাকে।

অনুশীলনী

১। শিখনের সঞ্চালন বলতে কি বোঝ? শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি বর্ণনা কর এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সেগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োগ আলোচনা কর।

২। কখন এবং কিভাবে শিখন সঞ্চালিত হয়? কিভাবে বিদ্যালয়ে শেখা বস্তু বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করা যায় তা বর্ণনা কর।

৩। শিখন সঞ্চালনের উপর আধুনিক যে সব গবেষণা হয়েছে সেগুলি আলোচনা কর এবং শিক্ষায় সেগুলি প্রয়োগ কিভাবে করা যায় বল।

৪। থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব এবং জাডের সামান্যীকরণের তত্ত্বের মধ্যে তুলনা কর এবং তত্ত্ব দুটি সম্বন্ধে তোমার মূল্যায়ন দাও।

৫। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়সমূহে কি প্রকার সঞ্চালন হয় বর্ণনা কর।

৬। গেস্টাল্টবাদীদের শিখন সঞ্চালনের উপর অভিস্থাপন তত্ত্বের বর্ণনা দাও।

সাতাশ

প্রক্ষোভের স্বরূপ

রাগ, হিংসা, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা আমরা মনের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকি সেগুলিকেই প্রক্ষোভ[1] বলা হয়। প্রক্ষোভের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। যে কোন প্রক্ষোভঘটিত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার তিনটি দিক দেখতে পাই। যথা, (১) বাহ্যিক আচরণ, (২) অভ্যন্তরীণ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া এবং (৩) প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বা সচেতনতা।

কোন প্রক্ষোভের প্রভাবাধীন হলে প্রাণীমাত্রেই কতকগুলি বাহ্যিক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন, ভয় পেলে মানুষ পালায়, রাগ করলে হাত পা ছোঁড়ে বা আক্রমণ করে ইত্যাদি। এই আচরণগুলির একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে এগুলি সাধারণভাবে সংহতিনাশক অর্থাৎ প্রাণী যখন কোন প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়ে কোন আচরণ করে তখন তার আচরণধারার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সংহতি থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়।

শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। এই দৈহিক পরিবর্তন অবশ্য নানা রকমের হতে পারে, যেমন, রক্তচলাচলঘটিত, গ্রন্থিঘটিত, স্নায়ুঘটিত, পেশীঘটিত ইত্যাদি। সাধারণ ভাষণে আমরা যেমন বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করে থাকি, প্রক্ষোভজাত দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কিন্তু তেমন কোন সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নেই। বরং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ রূপ আছে যেটা সকল রকম প্রক্ষোভের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তবে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী কেবলমাত্র মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি বিভিন্ন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নেয়। প্রক্ষোভজাত দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংহতিনাশক বলে বর্ণনা করার কারণ হল যে দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি এগুলির দ্বারা বেশ ব্যাহত হয়। তবে প্রথম প্রথম সংহতিনাশক হলেও পরবর্তী আচরণের মধ্যে প্রক্ষোভ যথেষ্ট সংহতি এনে থাকে এবং এই প্রক্ষোভই প্রাণীর কাজের পেছনে প্রেষণা বা কর্মশক্তি জুগিয়ে থাকে।

প্রত্যেক প্রক্ষোভ জাগরণের সঙ্গে থাকে ঐ প্রক্ষোভটি সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতা। এই সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে একটা অনুভূতি, যেটা প্রাণীর কাছে হয় সুখকর, নয় দুঃখকর হয়ে থাকে। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগলে এই বিশেষ অনুভূতিটি তীব্রভাবে দেখা দেয়।

প্রক্ষোভমূলক অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা প্রক্ষোভের জাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাই।

1. Emotion

পারিবেশিক উত্তেজনার জন্য ব্যক্তির মধ্যে বহু প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে উচ্চশব্দ, আলোর ঝলকানি, হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও অতি তীব্র পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। এইগুলিকে সেইজন্য প্রক্ষোভের সহজাত উদ্দীপক রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এগুলি শৈশবেই বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই নানা নতুন নতুন শেখা বস্তু তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে ওঠে। যেমন, অন্ধকার, উঁচু খোলা বা বন্ধ জায়গা, কৃষ্ণকায় মানুষ, পশু ইত্যাদি। পরিণত বয়সে প্রক্ষোভের কারণগুলি অধিকাংশই সামাজিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং অপর ব্যক্তির সামান্য কথা, মন্তব্য, আচরণ বা ইঙ্গিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগানর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে।

পারিবেশিক উত্তেজনার চেয়ে প্রক্ষোভ জাগরণের আরও শক্তিশালী কারণরূপে কাজ করে পারিবেশিক উত্তেজকগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা এবং সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা। যেমন, একজনের মন্তব্য বা আচরণ আমাদের মনে প্রক্ষোভ জাগাতে যতটা না পারুক, তার চেয়ে অনেক বেশী পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মানসিক জল্পনা কল্পনা। অনেক সময়ে এই মানসিক আলোড়ন থেকে ধীরে ধীরে প্রক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রক্ষোভই প্রায় এইভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য এই ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টির পেছনে থাকে মনের একটা পূর্বগঠিত প্রক্ষোভমূলক সংগঠন যেটা অতীতের সমশ্রেণীর অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ্রন্থিজনিত উত্তেজনাকেও প্রক্ষোভ সৃষ্টির একটা কারণ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থিজনিত উত্তেজনা অবশ্য সংঘটিত হয় প্রক্ষোভ জাগরণের ফলেই। কিন্তু একবার গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠলে সেগুলি প্রক্ষোভকে তীব্রতর হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ গ্রন্থিজাত উত্তেজনা একাধারে প্রক্ষোভ জাগরণের ফল এবং কারণও। এনডোক্রিন গ্ল্যান্ড[1] বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে যে রস নির্গত হয় সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং পরিবর্ধনের পক্ষে অপরিহার্য তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া

প্রাণীর উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া তীব্রতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য উত্তেজনাবোধ থেকে সুরু করে পরিপূর্ণভাবে আত্মসংযমের বিলোপ পর্যন্ত প্রক্ষোভের ফলরূপে দেখা দিতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি অবশ্য নির্ভর করে প্রক্ষোভের মাত্রার উপর এবং প্রক্ষোভ যখন তীব্রতম হয়ে ওঠে তখন এমন হতে পারে যে প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিজের আচরণের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কোনও সামর্থ্যই তখন তার আর থাকে না। যেমন, খরগোসের বাচ্চা যখন বাঘের সামনে বা হরিণ যখন অজগর সাপের সামনে পড়ে তখন

1. Endocrine Gland

তারা এত ভয় পেয়ে যায় যে তারা চলার শক্তি হারিয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, ছুটে পালাতে পারে না।

শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভের সময় নানারকম অন্তর্দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন, রক্তের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, গ্রন্থিরস নিঃসরণ, পরিপাচনক্রিয়া[1] প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে এই পরিবর্তনগুলি নিখুঁতভাবে মাপার জন্য নানারূপ জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়েছে। যেমন, নাড়ীর স্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগমোগ্রাফ[2], রক্তের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার[3], নিশ্বাস- প্রশ্বাস পরিমাপের যন্ত্রের নাম নিউমোগ্রাফ[4] ইত্যাদি।

পরিপাচন ক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য। ক্যাননের[5] পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর কাজ ও পরিপাচন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি বন্ধ হয়ে যায়। খুব রেগে গেলে বা খুব উত্তেজিত হলে খাদ্য হজমের কাজ স্থগিত থাকে।

গ্রন্থিরস[6] নিঃসরণ প্রক্ষোভের জাগরণের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অ্যাড্রেনালিন[7] নামক গ্রন্থিরসটি রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতি প্রক্ষোভের জাগরণের সময় নির্গত হয় এবং ব্যক্তিকে বিভিন্ন শারীরিক উত্তেজনামূলক কাজ করার শক্তি যোগায়।

প্রক্ষোভ জাগরণের সময় হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানের রক্তপ্রবাহের মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবাহের গতি বেড়ে যায় তেমনই আনন্দ, তৃপ্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্তের চাপ কমে আসে।

সাইকোগ্যালভানোমিটার[8] নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্ষোভের তীব্রতা এবং উত্তেজনার স্বরূপ মাপা হয়ে থাকে। প্রাণীদেহ মৃদু বিদ্যুৎ প্রবাহ কতটা সহ্য করতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রাণীর সাইকোগ্যালভানোমূলক প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল প্রক্ষোভের পরিমাপের ক্ষেত্রে সাইকোগ্যালভানোমূলক প্রতিক্রিয়ার[9] ব্যাপক সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

মস্তিষ্ক তরঙ্গেও[10] প্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রচুর পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গের আবর্তন প্রতি সেকেণ্ডে ৮ থেকে ১২ বার হয়, কিন্তু প্রক্ষোভের জাগরণের সময় মস্তিষ্কতরঙ্গের আবর্তনের হার সেকেণ্ডে ৮ বারের নীচে নেমে যায়।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভজাত প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভয় পেয়ে

---

1. Digestive Function 2. Sphygmograph 3. Sphygmomanometer 4. Pneumograph 5. Cannon 6. Hormone 7. Adrenalin 8. Psychogalvanometer 9. Psychogalvanic Response P. G. R. 10 Brain Waves

ছুটে পালান, আনন্দ হলে জোরে চীৎকার করা, রেগে গেলে আক্রমণ করা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অনুশাসনের চাপে এগুলি নানা রূপ গ্রহণ করে। লোকনিন্দা, সমালোচনা, সমাজের তিরস্কার ও শাস্তিদান প্রভৃতির ভয়ে ব্যক্তি তার প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলিকে প্রায়ই পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং পরিবেশের উপযোগী সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে। এই থেকেই জন্মলাভ করেছে মানুষের অন্তহীন আচরণ-বৈচিত্র্য। বস্তুত প্রক্ষোভমূলক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধানের জন্যই মানুষ নানা বিচিত্র আচরণধারার সাহায্য নিয়ে থাকে।

অটোনমিক বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী

প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায় তার পেছনে আছে বিশেষ একটি স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এটির নাম অটোনমিক বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী[1]। এই স্নায়ুমণ্ডলীটি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে বার হয়ে শরীরের নানা গ্রন্থি, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলী, মাংসপেশী, দেহচর্ম প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্নায়বিক উত্তেজনা এই স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে গ্রন্থি, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতিতে পৌঁছয় এবং ঐগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীর আবার দুটি ভাগ আছে। সিমপ্যাথেটিক[2] এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক[3]। এই দুটি বিভাগের কাজ পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দেহাংশগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সেগুলিকে প্রশমিত করে। যেমন, সিমপ্যাথেটিক বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি পায়, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়, মূত্রাশয়ে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, ফলে রক্ত সঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের মধ্যে নানা উত্তেজনামূলক পরিবর্তন ঘটে। প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে উঠলে হৃদ্‌স্পন্দনের বেগ কমে আসে, শরীরের উত্তাপ হ্রাস পায়, রক্তপ্রবাহ মন্থর হয় এবং অন্যান্য প্রশমনমূলক পরিবর্তনগুলি শরীরের মধ্যে দেখা দেয়। যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের উত্তেজনামূলক কাজের পক্ষে সহায়ক সেগুলি সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনার ফলে নির্গত হয়ে থাকে। যেমন, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে যে রস নির্গত হয় তার নাম অ্যাড্রেনালিন। এই অ্যাড্রেনালিন গ্রন্থিরস ব্যক্তিকে উত্তেজনামূলক কাজ করার উদ্যম ও সামর্থ্য জুগিয়ে থাকে। তেমনই যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের শান্ত অবস্থার পক্ষে সহায়ক সেগুলি প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীর সক্রিয়তার সময় নিসৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যদিও সিমপ্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা উত্তেজনাধর্মী এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা প্রশমনধর্মী তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে সিমপ্যাথেটিক বিভাগকেও প্রশমন বা অবদমনের কাজ করতে দেখা গেছে। যেমন, পাকস্থলীর বিভিন্ন

1. Autonomic Nervous System 2. Sympathetic 3. Parasympathetic

প্রশমনধর্মী কাজগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন সিম্প্যাথেটিক বিভাগেরই সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে।

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে প্রক্ষোভকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম বীপ্সামূলক[1] বা বৃদ্ধিমূলক[2] প্রতিক্রিয়া। আর দ্বিতীয় আকস্মিক[3] বা প্রস্তুতিমূলক[4] প্রতিক্রিয়া। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তেজনা প্রভৃতি ঘটিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল রাগ, ভয় প্রভৃতি থেকে জাত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি। যখন এক শ্রেণীর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তখন অপর শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলি বন্ধ থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির মধ্যে একটা তৃপ্তি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। এইজন্য এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে বীপ্সামূলক বা বৃদ্ধিমূলক বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বর্ধিত মাত্রায় উত্তেজনা ও সক্রিয়তা দেখা দেয়। পলায়ন বা আক্রমণ উভয় প্রকার পরিস্থিতির জন্যই তখন সে দেহে ও মনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই জন্য এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলিকে আকস্মিক বা প্রস্তুতিমূলক আচরণ বলা হয়ে থাকে।

প্রক্ষোভের উত্তেজনার ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচন ক্রিয়া যে বন্ধ হয়ে যায় সেটা পরীক্ষণ প্রমাণিত সত্য। পশুর আহারের সময় তাকে ক্রুদ্ধ বা ভয়গ্রস্ত করে দেখা গেছে যে সে সময় তার পাকস্থলীর কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেছে।

সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুবিভাগের সঙ্গে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিরসের নিঃসরণের নিকট যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত এই অ্যাড্রেনালিন গ্রন্থিরসের নিঃসরণের জন্যই ঘটে থাকে। ক্যাননের ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এই তথ্যটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ত্ব

প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কার্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক জল্পনা হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্বও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি তত্ত্বের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। ম্যাগডুগালের প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্ব

ম্যাকডুগাল প্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলীয় প্রেষণামূলক শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে একটি করে প্রক্ষোভ এবং সেটি জাগলে তবে ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি মোট ১৭টি প্রবৃত্তি এবং তাদের সহগামী ১৭টি প্রক্ষোভের একটা তালিকা দিয়েছেন।

---

1. Appetitive 2. Vegetative 3. Emergency 4. Preparatory

২। জেমস্ ল্যাংগ তত্ত্ব

প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্ ১৮৮৪ সালে এবং ড্যানিস্ শরীরতত্ত্ববিদ্ ল্যাংগ ১৮৮৫ সালে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার একটি নতুন সংব্যাখ্যান দেন। এইটিই বর্তমানে প্রক্ষোভের জেমস্-ল্যাংগ তত্ত্ব[1] নামে পরিচিত।

জেমস্-ল্যাংগ তত্ত্বটিতে প্রক্ষোভের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ লৌকিক বিচারে প্রক্ষোভ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করা হয় এই নতুন তত্ত্বটিতে ঠিক তার বিপরীত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর বা সোপান পাই। যথা, (১) প্রক্ষোভ জাগাতে সমর্থ এমন কোন উদ্দীপক বা পরিস্থিতি, (২) কোন বিশেষ প্রক্ষোভের অনুভূতি, যেমন রাগ হওয়া বা আনন্দিত হওয়া এবং (৩) শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং নানা রকমের বাহ্যিক আচরণ যেমন রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, হৃদ্স্পন্দন দ্রুত হওয়া, হাত-পা ছোঁড়া, পালান, হাসা, কাঁদা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

প্রক্ষোভের লৌকিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী প্রথমে আসে উদ্দীপক বা পরিস্থিতি, তারপর মনে জাগে ঐ প্রক্ষোভের অনুভূতি এবং সব শেষে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া। যেমন, প্রথমে ব্যক্তিটি একটি বাঘ দেখল (উদ্দীপক), তারপর তার মনে ভয় জাগল (প্রক্ষোভের অনুভূতি) এবং সব শেষে তার হৃদ্স্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি, রোমহর্ষণ, মাংসপেশীর সঙ্কোচন ইত্যাদি বাহ্যিক আচরণগুলি দেখা দিল (শারীরিক প্রতিক্রিয়া)। অর্থাৎ লৌকিক সংব্যাখ্যানে প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরগুলির অনুক্রম হল নিম্নরূপ—

উদ্দীপক→→প্রক্ষোভের অনুভূতি→→শারীরিক প্রতিক্রিয়া

কিন্তু জেমস্-ল্যাংগের মতে ঐ সোপানগুলির অনুক্রম সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাঁদের ব্যাখ্যায় প্রথমে আসে উদ্দীপক, তার পরে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং সবশেষে ঘটে প্রক্ষোভের অনুভূতি। অর্থাৎ জেমস্-ল্যাংগের ব্যাখ্যায় প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরগুলির অনুক্রম হল এইরূপ—

উদ্দীপক→→শারীরিক প্রতিক্রিয়া→→প্রক্ষোভের অনুভূতি

জেমস্-ল্যাংগের ভাষায় আমরা ভয় পেলে পালাই না। পালাই বলে ভয় পাই। রেগে গিয়ে যে আক্রমণ করি তা নয়। আক্রমণ করি বলেই রেগে যাই। দুঃখ অনুভব করি বলে যে কাঁদি তা নয়, কাঁদি বলেই দুঃখ পাই। অর্থাৎ জেমস্-ল্যাংগের মতে প্রক্ষোভের অনুভূতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কারণ নয়, তার ফল। উপযুক্ত উদ্দীপক দেখা দিলে মস্তিষ্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই স্নায়বিক উত্তেজনা অটোনমিক স্নায়ু-

1. James-Lange Theory

মণ্ডলী বেয়ে শরীরের নানা জায়গায় গিয়ে পেঁছয়। ফলে গ্রন্থি, রক্তবহা নালী, মাংসপেশী প্রভৃতিতে নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেওয়ার ফলে আবার স্নায়বিক উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে পেঁছয় এবং তার ফলে আমরা রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি অনুভব করি। এক কথায় এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিগত রূপকেই আমরা লৌকিক ভাষণে প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। অর্থাৎ প্রক্ষোভ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেমস্ তাঁর দেওয়া প্রক্ষোভের এই অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থনে কতকগুলি যুক্তির উপস্থাপন করেছেন, যথা—

(ক) কোন বিশেষ প্রক্ষোভ অনুভব করার সময় যদি আমাদের চেতনা থেকে সকল প্রকার দৈহিক অনুভূতিকে বাদ দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে প্রক্ষোভের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যা থাকে সেটা নিছক এক ধরনের উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, তাকে কোনভাবেই প্রক্ষোভ বলা চলতে পারে না। জেমসের মতে দেহসম্পর্কহীন প্রক্ষোভ বলে কোন বস্তু হয় না।

(খ) মানসিক বিকৃতিগ্রস্ত রুগীদের ক্ষেত্রে বাইরের কোন কারণ ছাড়াই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন হিস্টিরিয়া বা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাগ, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি কোন বাহ্যিক কারণ ছাড়াই ব্যক্তির মনে জাগতে পারে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে কেবলমাত্র উপযুক্ত দৈহিক অবস্থা বা পরিবর্তন থেকেই প্রক্ষোভ জন্মাতে পারে।

(গ) শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা বাহ্যিক অভিব্যক্তির মাত্রা বাড়ালে প্রক্ষোভের তীব্রতাও বাড়ে। রাগের সময় যত চেঁচামেচি করা যায় তত রাগ বেড়ে যায়। ভয়ের সময় পালালে ভয় আরও বেশি হয়। তাছাড়া দেখা গেছে যে অভিনয়ের সময় নিছক বাহ্যিক অভিব্যক্তির সাহায্যেই অভিনেতারা নিজেদের মনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারেন।

(ঘ) তেমনই অপর দিকে প্রক্ষোভকে অভিব্যক্ত হতে না দিলে প্রক্ষোভ নিজে নিজেই লোপ পায়। রাগের সময় রাগকে অভিব্যক্ত হতে না দেওয়াই হল রাগ দূর করার প্রকৃত উপায়।

জেমস্-ল্যাংগ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক সচেতনতার নামই প্রক্ষোভ। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক বা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনুভূতি থেকেই প্রক্ষোভ জাগে। অতএব এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভ একই ঘটনার দুটি বিভিন্ন নাম মাত্র।

জেমস্‌-ল্যাংগ তত্ত্বের সমালোচনা

এই তত্ত্বটির অভিনবত্ব মনোবিজ্ঞানের জগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং প্রক্ষোভের উপর বহু আধুনিক গবেষণার জনক হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য আধুনিক পরীক্ষণগুলি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে সেগুলি জেমস্‌-ল্যাংগের তত্ত্বটির বিরুদ্ধেই যায়।

আমরা দেখেছি যে প্রক্ষোভঘটিত শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলির পিছনে আছে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এই স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে উত্তেজনা শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি, মাংসপেশী প্রভৃতিতে পেঁছয় বলেই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রক্ষোভ জেগে থাকে। তাহলে কোন প্রাণীর অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি যদি কোন কাজ না করে তাহলে তার কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটবে না এবং প্রক্ষোভের অনুভূতিও দেখা দেবে না। সেক্ষেত্রে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যে সংযোগ সেটিকে যদি কোনরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় বা কোন আকস্মিক ঘটনায় যদি সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে স্বভাবতই শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি আর সক্রিয় হয়ে উঠবে না এবং তার ফলে প্রক্ষোভঘটিত কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঐ প্রাণীর মধ্যে আর ঘটতে পারবে না। সুতরাং জেমস্‌-ল্যাংগের তত্ত্বটি যদি সত্য হয় তাহলে ঐ প্রাণীর মধ্যে কোন প্রক্ষোভের অনুভূতি আর জাগবে না। কিন্তু নানা পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সত্ত্বেও প্রাণীর মধ্যে প্রক্ষোভের অনুভূতি যথেষ্টই দেখা দিয়ে থাকে।

শেরিংটন[1] একটি কুকুরের শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতির সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির ক্ষেত্রে কোনরূপ দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে কুকুরটির মধ্যে মধ্যে স্পষ্টই ভয়, রাগ ইত্যাদির চিহ্নগুলি প্রকাশ পেল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রক্ষোভের বাহ্যিক প্রকাশ অন্তর্দৈহিক যন্ত্রাদির সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না। এই পরীক্ষণটি অবশ্য সম্পূর্ণ জেমস্‌-ল্যাংগের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায় না। কেননা এক্ষেত্রে কুকুরটির মনে যে সত্যই ভয়, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি জেগেছিল তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব এ পরীক্ষণটি সম্পূর্ণভাবে জেমস্‌-ল্যাংগের তত্ত্বটিকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করছে না।

ক্যানন একটি বিড়ালের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীটি মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং তার ফলে তার অন্তর্দৈহিক যন্ত্রপাতিগুলির সক্রিয়তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কুকুর দেখলে বিড়ালটির মধ্যে আগে যেমন রাগের চিহ্নগুলি প্রকাশ পেত সেগুলি পরেও ঠিক তেমনই প্রকাশ পাচ্ছে।

Sherrington

মানুষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে। একজন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা মহিলা একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ফলে তাঁর অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে মহিলাটির মধ্যে দুঃখ, আনন্দ, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলির অনুভূতি ঠিক পূর্বের মতই রয়েছে।

উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রক্ষোভের শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রক্ষোভের মানসিক অনুভূতি এ দুটি এক বস্তু নয় এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয়টি প্রসূতও নয়।

আর একটি পরীক্ষণে জেমস্-ল্যাংগের তত্ত্বটির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেখা গেল যে তা থেকে প্রক্ষোভ জাগে কিনা। ব্যক্তির শরীরে অ্যাড্রেনালিন[1] প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কৃত্রিম দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হল। কিন্তু দেখা গেল যে সেই উত্তেজনা থেকে ব্যক্তির মনে ভয়, রাগ প্রভৃতি কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভের সত্যকার অনুভূতি জাগে না। অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ নয়।

৩। ক্যানন-বার্ডের থ্যালামাসমূলক তত্ত্ব

প্রক্ষোভের উপর আধুনিক কালে যে তত্ত্বটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটি হল ক্যানন-বার্ডের থ্যালামাসমূলক তত্ত্ব[2]। এই তত্ত্বটিতে জেমস্-ল্যাংগের মৌলিক বক্তব্যটির বিরোধিতা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক থেকে পৌঁছয় মস্তিষ্কের নিম্নভাগে অবস্থিত থ্যালামাস[3] নামক একটি স্থানে। ক্যাননের মতে থ্যালামাসটি (আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে থ্যালামাসের অন্তর্গত হাইপোথ্যালামাস[4] নামক অংশটি) স্নায়বিক উত্তেজনার সমন্বয়নের ক্ষেত্র বিশেষ। এখান থেকে উত্তেজনার কিছু অংশ চলে যায় মস্তিষ্কে এবং সেখানে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারিত করে। অর্থাৎ রাগ, না আনন্দ, না ভয়, কোন্ ধরনের অনুভূতি ব্যক্তি অনুভব করবে তা মস্তিষ্ক নির্ধারিত করে দেয়। আবার কিছুটা উত্তেজনা থ্যালামাস থেকে স্নায়ু পথ বেয়ে নেমে আসে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীতে এবং সেখান থেকে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে গিয়ে পৌঁছয়। তার ফলেই নানাপ্রকার শারীরিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বটি ক্যানন এবং বার্ড যৌথভাবে প্রকাশ করেন বলে এর নাম ক্যানন-বার্ড তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বে থ্যালামাসের সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রক্ষোভ জাগরণের ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে এই তত্ত্বটিকে প্রক্ষোভের থ্যালামাস-মূলক তত্ত্বও[5] বলা হয়। এইভাবে থ্যালামাসের সক্রিয়তা থেকে সৃষ্ট প্রক্ষোভ থেকে

1. Adrenalin 2. Cannon-Bard's Thalamic Theory 3. Thalamus
4. Hypothalamus 5. Thalamic Theory of Emotion

যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা থেকে সঞ্জাত উত্তেজনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয় এবং সেখানে ঐ জাগ্রত প্রক্ষোভের অনুভূতিকে তীব্রতর করে তোলে।
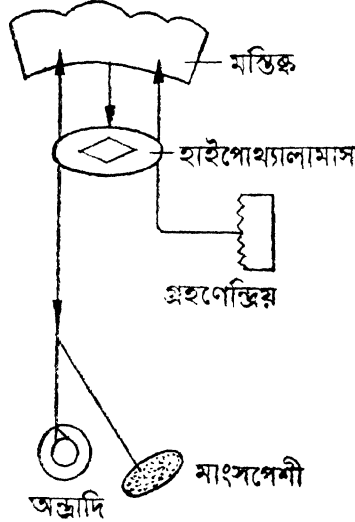
(ক্যানন বার্ডের প্রক্ষোভের থ্যালামাসমূলক তত্ত্বের চিত্ররূপ)

অতএব শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভ জাগাতে না পারলেও তাকে যে তীব্র বা বর্ধিত করতে সাহায্য করে একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন।

প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভের স্বরূপ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সংখ্যা ও তীব্রতা উভয় দিক দিয়েই পরিণত ব্যক্তির প্রক্ষোভ নবজাত শিশুর চেয়ে যে অনেক বেশী এটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা। অতএব জন্মের সময় নবজাতক কতকগুলি এবং কি প্রকৃতির প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এবং কেমন করে সেই প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভগুলি ধীরে ধীরে জটিল ও বহুমুখী হয়ে ওঠে তা নিয়ে বহু ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

১৯২০ সালে ওয়াটসন শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতক জন্মের সময় মাত্র তিনটি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, যথা ভয়, রাগ এবং আনন্দ। ভয় আবার জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক, যথা, উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ ভারসাম্য হারান। রাগ জাগাতে পারে যে উদ্দীপকটি সেটি হল দৈহিক সঞ্চালনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা এবং আনন্দ জাগাতে পারে আদর করা, গায়ে হাত বোলানো ইত্যাদি কাজগুলি। কিন্তু পরে শার্মান[1] অবশ্য প্রমাণ করেছেন যে নবজাতকের ক্ষেত্রে

1. Sherman

এই তিনটি প্রক্ষোভের বাহ্যিক অভিব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা সম্ভব হয় না যদি না আগে থেকেই উদ্দীপকের স্বরূপটি আমাদের জানা থাকে।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার একটিমাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। আরউইন[1] এই ধরনের প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দিয়েছেন সামগ্রিক সক্রিয়তা[2]। ব্রিজেসের[3] মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দেওয়া যায় উত্তেজনা[4]। একথা অবশ্য সত্য যে ছোট শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলির মধ্যে পার্থক্য ধরা খুবই শক্ত। একটি পরীক্ষণে দেখা গেছে যে যদি উদ্দীপকের প্রকৃত স্বরূপ আগে থেকে না জানা থাকে তাহলে কেবল শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখে বিভিন্ন দর্শক কারণরূপে বিভিন্ন প্রক্ষোভের উল্লেখ করে থাকেন। সেইজন্য বলা চলে যে নবজাতকের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার কোন বিশেষ রূপ বা সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি নেই এবং সেটা রাগ, কি আনন্দ, কি ভয় থেকে উৎপন্ন একথা কেবলমাত্র তার আচরণ দেখে বলা সম্ভব হয় না।

একটি শিশুভবনে নবজাতক থেকে সুরু করে দু'বৎসর বয়সের বহু শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ব্রিজেস শৈশবে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি বিবরণী দিয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নবজাতকের মধ্যে জন্মের সময় প্রক্ষোভ বলতে একটা সাধারণধর্মী উত্তেজনা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু দু'তিন মাসে তার মধ্যে আনন্দ এবং অস্বাচ্ছন্দ্য পরিষ্কার রূপে দেখা দেয়। তার পরের তিন মাসে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষায়িত হয়ে রূপ নেয় রাগ, বিরক্তি এবং ভয়ের এবং ১২ মাসের সময় আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাস এবং ভালবাসায় পরিণত হয়। হিংসা এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা জাগে ১৫ মাসের সময়। যদিও বয়স অনুযায়ী এই সময়ের বিভাগকে সর্বজনীন বলে ধরে নেওয়া যায় না, তবুও এই বিবরণ থেকে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ

ম্যাকডুগাল প্রক্ষোভকে প্রাথমিক ও মিশ্র, এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ আছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতেরটি। অতএব ম্যাকডুগালের মতে এই সতেরটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত সতেরটি প্রক্ষোভ প্রাথমিক প্রক্ষোভের পর্যায়ে পড়ে।

ম্যাকডুগালের মতে একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভ[5] অন্য একটি বা একাধিক প্রক্ষোভের সঙ্গে মিশে নতুন একটি প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। এই নতুন প্রক্ষোভগুলির তিনি নাম দিয়েছেন মিশ্র প্রক্ষোভ[6]। যেমন, ম্যাকডুগালের মতে কৃতজ্ঞতা হল মমতা

1. Irwin 2. Mass Activity 3. Bridges 4 Excitement 5. Primary Emotion 6. Secondary Emotion

এবং হীনমন্যতার মিশ্রণ, ঘৃণা হল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, লজ্জা হল হীনমন্যতা ও আত্মগরিমার মিশ্রিত রূপ ইত্যাদি। এইভাবে ম্যাকডুগাল মানব মনের সমস্ত জটিল প্রক্ষোভেরই একটি বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

জটিল প্রক্ষোভগুলির মধ্যে যে একাধিক মৌলিক প্রক্ষোভের প্রভাব পাওয়া যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ম্যাকডুগালের বিবরণ মত এত সুনির্দিষ্ট ও সহজভাবে যে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন না। তাছাড়া প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলতে ম্যাকডুগাল যা বোঝাতে চান সেই ধরনের একেবারে অমিশ্র প্রক্ষোভ বলেও কিছু আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব প্রক্ষোভই অল্পবিস্তর মিশ্রধর্মী।

প্রক্ষোভ ও শিক্ষা

শিক্ষার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রক্ষোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ প্রক্ষোভ হল অনুভূতিমূলক আর শিক্ষা হল জ্ঞান-মূলক। তবুও দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ কোন জ্ঞানই বিশেষ কোনও অনুভূতি ছাড়া ঘটে না। তাছাড়া প্রক্ষোভের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে প্রক্ষোভই আমাদের সকল কাজের পেছনে প্রেষণা বা শক্তি যোগায়। ম্যাকডুগালের সংব্যাখ্যানে আমাদের সকল কাজের পেছনে আছে প্রবৃত্তির সক্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি এবং এটিকেই আমরা সাধারণত প্রক্ষোভ বলে থাকি।

বস্তুত শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভের জাগরণের ফলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস বা হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই গ্রন্থিরসগুলিই আমাদের প্রয়োজনমত শরীরকে উত্তেজিত ও কর্মক্ষম করে তোলে এবং তার ফলেই আমরা শারীরিক প্রচেষ্টাও সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। অতএব প্রক্ষোভের জাগরণ শিক্ষায় সাফল্যের জন্য অপরিহার্য।

অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রক্ষোভই অনুকূল নয়। এমন কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি নিঃসংশয়ে শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল অর্থাৎ সেগুলি জাগলে শিখন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হবেই, যেমন, রাগ, ভয়, বিরক্তি, দুঃখ, হীনমন্যতা ইত্যাদি। আবার তেমনই কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি শিখনের পরম সহায়ক, যেমন আনন্দ, বিস্ময়, কৌতুহল, সৃজনস্পৃহা, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ইত্যাদি। অবশ্য সময় সময় হীনমন্যতা, রাগ প্রভৃতি প্রতিকূল প্রক্ষোভও কিছু পরিমাণে শিখন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে থাকে, তবে তা স্বাভাবিক পন্থায় নয় এবং মোটের উপর ঐগুলি উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, অনুকূল হোক আর প্রতিকূলই হোক প্রক্ষোভ যদি অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবেই। প্রক্ষোভের প্রেষণা-শক্তি ততক্ষণই কার্যকর থাকে যতক্ষণ প্রক্ষোভ তার স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। প্রক্ষোভ অতি তীব্র হলে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক সাম্য দুইই নষ্ট হয়ে যায়। তখন স্বাভাবিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে ড্রেভারের প্রক্ষোভের অবরোধ তত্ত্বের[1] উল্লেখ করা যায়। প্রক্ষোভ জাগ্রত না হলে যেমন কোনও কাজ করার প্রেষণা জাগে না, তেমনই যদি প্রক্ষোভ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগ্রত হয়ে ওঠে তাহলে ব্যক্তির সাধারণ কর্মক্ষমতার মান নীচু হয়ে যায় এবং যতটুকু করা তার সামর্থ্যে সাধ্য তাও সে শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারে না। এই জন্য শিক্ষাদান কালে শিক্ষকের সব সময় দেখা কর্তব্য যে শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ যেন অতিমাত্রায় তীব্র না হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, বিস্মরণের একটা কারণ হল প্রাক্ষোভিক প্রতিরোধ। আনন্দ, ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি যে কোন প্রক্ষোভই যখন অতি তীব্র হয়ে ওঠে তখন মনে করা, মনোযোগ দেওয়া, সুসংহত চিন্তা করা ইত্যাদি মানসিক কাজগুলি ব্যক্তির পক্ষে সম্পন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ এই প্রক্রিয়াগুলি যে কোন বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

সবশেষে শিক্ষার ক্ষেত্রে আনন্দ বা তৃপ্তি রূপে প্রক্ষোভের বিশেষ ভূমিকা আছে। শিশু যখন শেখে তখন যদি তার শেখার মধ্যে আনন্দ বা তৃপ্তি বোধ করে তাহলে শিক্ষা দ্রুত ও কার্যকর হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে যদি শেখার সময় সে অতৃপ্তি বা নিরানন্দ বোধ করে তাহলে তার শিক্ষা মন্থর এবং অনেক সময় নিষ্ফল হয়ে ওঠে। থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ ফলভোগের সূত্রটি[2] এই তত্ত্বটিরই পোষকতা করে। কোনও কাজ করার সময় যদি শিশু মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে তাহলে তার প্রচেষ্টা যে দ্রুত সাফল্য আনে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও বিরক্তি দূর করে এ তথ্যটি বহু পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সুসম্পাদনের জন্য প্রয়োজন (১) যাতে শিশুর মনে অনুকূল প্রক্ষোভ জাগে তা দেখা, (২) যাতে প্রতিকূল প্রক্ষোভ শিশুর শিক্ষা প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে যত্ন নেওয়া, (৩) যাতে প্রক্ষোভ কখনই স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং (৪) যাতে শিশু শেখার মধ্যে সাফল্যের আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করে তার আয়োজন করা।

1. Baulking Theory of Emotion :: পৃঃ ৪৫ 2. Law of Effect :: পৃঃ ১০৮

অনুশীলনী

১। প্রক্ষোভ কাকে বলে? প্রক্ষোভ জাগরণের বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা কর।

২। প্রক্ষোভ জাগরণের সময় ব্যক্তির মধ্যে কি কি পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বর্ণনা কর। প্রাথমিক প্রক্ষোভ কোনগুলিকে বলে?

৩। প্রক্ষোভের জেমস-ল্যাংগ তত্ত্বটি সমালোচনা সহযোগে আলোচনা কর।

৪। প্রক্ষোভের ক্যানন-বার্ড তত্ত্বটি বর্ণনা কর।

৫। শিশুর শিক্ষায় প্রক্ষোভের ভূমিকা কি?

কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভ

মানব আচরণের উপর প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। মানুষ নিজেকে যুক্তিধর্মী বলে গর্ববোধ করলেও তার অধিকাংশ আচরণ নিছক প্রক্ষোভের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। অতএব শিক্ষার্থীর আচরণকে ভালভাবে বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা দরকার। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান মানব প্রক্ষোভের বর্ণনা দেওয়া হল।

রাগ

বৈচিত্র্য ও তীব্রতার দিক দিয়ে রাগ[1] নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য বিরক্ত হওয়া থেকে সুরু করে রেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। হিংসার ক্ষেত্রে এই রাগই ভয়ের সঙ্গে, কখনও কখনও বা দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ঘৃণায় থাকে রাগ এবং ভয়।

অতি শৈশবে শিশুর রাগ হয় প্রধানত যখন তার কাজে বা ইচ্ছায় কেউ বাধা দেয়। কিন্তু পরে বড় হলে তার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, সম্মান, কাজ প্রভৃতিতে সত্যকার বাধাদান ছাড়াও কেবলমাত্র বাধাদানের আশঙ্কাও রাগের সৃষ্টি করে। রাগ মানেই হচ্ছে এক প্রকার মানসিক দুর্বলতা। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে আশা এবং তার প্রকৃত যোগ্যতা, এ দুয়ের মধ্যে যত বেশী পার্থক্য বা বৈষম্য দেখা দেবে তত বেশী তার রাগের কারণ ঘটবে।

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে সর্বদৈহিক। সমস্ত দেহ দিয়েই শিশু প্রথম প্রথম রাগ প্রকাশ করে। কিন্তু সে যত বড় হয় ততই তার রাগের অভিব্যক্তিগুলি বিশেষ-ধর্মী ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ নিছক রক্তচক্ষুতে বা ভ্রূকুঞ্চনে পর্যবসিত হতে পারে।

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশ ক্ষতিকর। রাগের সময় অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং পরিপাচন ক্রিয়ার স্থগিতভবন ইত্যাদি ঘটনাগুলি দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। তেমনই মনের সমতা ও স্বাস্থ্যের উপরও রাগের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্ বয়সে কি কি কারণে রাগ জন্মায় তার একটা

1. Anger

বিবরণ দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রয়াসের উপর যখন কোন রকম বাধা বা প্রতিরোধ আরোপিত হয় তখনই তার মধ্যে রাগ দেখা দেয়। প্রথম শৈশবে রাগ কেবলমাত্র দৈহিক কারণেই সীমাবদ্ধ থাকে। দৈহিক সঞ্চালনে বাধা পাওয়া, শারীরিক অস্বস্তি, স্নান, খাওয়া, পোষাক পরা ইত্যাদি সাধারণ কাজে অসামর্থ্যবোধ প্রভৃতি কারণেই খুব শৈশবে শিশুর রাগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, মুখে ঠিকমত খাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক না পরতে পারলে শিশুর মধ্যে রাগ দেখা দেয়।

তাছাড়া নিজের অক্ষমতা বা অসুবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না বলে শিশুর রাগ আরো বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাহলেও সে রেগে যায়।

আর একটু বড় হলে নানা মানসিক ও প্রাক্ষোভিক কারণে শিশুর মধ্যে রাগ দেখা দেয়। নিজের কোন সম্পত্তি বা অধিকারের সামগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে তাহলে সে রেগে যায়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে এ সময়ে প্রায় মারামারি লেগে থাকে। যদি তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় বা তার কোনও কাজে বা খেলায় বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলেও তার মধ্যে রাগ দেখা দিয়ে থাকে। শিশুকে বকাবকি করলে বা শাস্তি দিলে তার রাগ হয়। নিজে যদি কোন ভুল করে ফেলে বা যদি কোন খেলনা বা বস্তু ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারে তাহলেও সে রেগে ওঠে। শিশুর রাগমাত্রেরই একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল যে যখন সে কোন না কোন রকম বাধ্যতামূলক চাপ অনুভব করে তখনই সে রেগে যায়। যেমন, কোন কাজ করতে বা না করতে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে, কিংবা কোন ইচ্ছাকে সে দমন করতে বাধ্য হচ্ছে, কিংবা জোর করে তাকে কোন অসুবিধায় ফেলা হচ্ছে ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিশুর স্বভাবতই রাগ জম্মায়।

পরিণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল ইচ্ছার দমন, কাজে বাধাদান, আচরণের দোষ ধরা, সমালোচনা করা, বিরক্ত করা, বক্তৃতা করা বা লম্বা উপদেশ দেওয়া, অপ্রীতিকর তুলনা করা ইত্যাদি। তাছাড়া অবহেলিত হওয়া, ভর্ৎসিত হওয়া, কারও হাস্য বা বিদ্রুপের পাত্র হওয়া, অন্যায়ভাবে শাসিত হওয়ার বোধ জন্মান, সহপাঠী ও খেলার সাথীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলিও পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ সৃষ্টির প্রবল কারণরূপে কাজ করে থাকে। পরে যখন তার আগ্রহ ক্রমশ গৃহের প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরের সমাজে সঞ্চালিত হয় তখন বহির্জগতের নানা প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা তাকে প্রতিপদে বিরক্ত করে তুলতে থাকে।

প্রাপ্তযৌবনে এই প্রতিবন্ধকের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ছেলেমেয়েদের রাগও সেই সঙ্গে বেড়ে চলে। এই বয়সে রাগের একটা সাধারণ কারণ হল যে তাদের

মনে এই ধারণা জন্মায় যে তাদের অন্যায়ভাবে শাসন করা বা বকা হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পেঁছনর ক্ষমতা—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর একটি বড় কারণ। এ ব্যবধান যত বাড়তে থাকে ততই তাদের রাগের তীব্রতা বেড়ে যায়।

আরও পরিণত বয়সে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ রাগের প্রধান উদ্দীপক রূপে কাজ করে থাকে। এই ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ নানা কারণে ঘটতে পারে। ব্যক্তির নিজের সুখ-সুবিধা, প্রিয়জনের আনন্দ ও উন্নতি, সামাজিক স্বীকৃতি, অর্থ, মান ও প্রতিপত্তির কামনা প্রভৃতি ব্যক্তির নানা মৌলিক প্রয়োজনের তরঙ্গ বহির্জগতের রূঢ় বাস্তবের শৈলে ধাক্কা লেগে ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে এবং তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগের সৃষ্টি হয়।

রাগের প্রকাশের প্রকৃতিও শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম নিছক শারীরিক অভিব্যক্তিতেই রাগ সীমাবদ্ধ থাকে। তারপর যত শিশু বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই সে তার রাগের বহিঃপ্রকাশকে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়ে নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। চীৎকার, কান্না, হাত-পা ছোঁড়া প্রভৃতি শৈশবের রাগের আচরণগুলি ক্রমশ সংযত হয়ে মার্জিত ও সমাজসম্মত রূপ নেয়।

তবে সময় সময় রাগের কিছু উপকারিতাও দেখা যায়। রাগ ব্যক্তির আলস্য, উদাসীনতা ও নিরুৎসাহ প্রভৃতি দূর করে দিয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে। কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতা মাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি নিজেদের ব্যবহারের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাগ ব্যক্তির এবং তার পরিবেশের আর সকলের পক্ষে অমঙ্গলকরই হয়ে থাকে।

বার বার রাগ হতে হতে শেষে রাগ অভ্যাসে পরিণত হয় যায়। তখন শিশুর পক্ষে তার রাগ সংযত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এই জন্য শিশুর রাগের কারণটি আগে থেকে দূর করতে হবে এবং যাতে শিশুর রাগ অভ্যাসে পরিণত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

অবশ্য সব সময় শিশুর রাগকে জোর করে দমন করা উচিত নয়। যেখানে ব্যর্থতা থেকে রাগ হয় সেখানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থা না করে কেবলমাত্র রাগ দমন করতে বাধ্য করলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণই হয়। সেজন্য শিশুর রাগকে অসামাজিক পথে অভিব্যক্ত হতে না দিয়ে সমাজসম্মত পথে যাতে তা প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

শিশুর রাগের কারণগুলি যাতে না সৃষ্টি হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দরকার।

অনর্থক তার আচরণে বা ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। যে সকল কাজ শিক্ষার্থীর কাছে রুচিকর নয় সেগুলি তাকে করতে না দেওয়াই ভাল। দুরূহ কাজ, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক বাধাদান, সামর্থ্যাতীত দাবী ইত্যাদি যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত। শিশুকে হুকুম করা বা তার ব্যর্থতা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা একেবারে বর্জনীয়। তাছাড়া জোর করে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর কাছ থেকে কাজ আদায় করার প্রথাটিও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর রাগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে রেগে যাওয়াটা সবচেয়ে ক্ষতিকর। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে ও সংযতভাবে শিক্ষার্থীর রাগের কারণ নির্ণয় করা এবং সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে সেটি দূর করাই পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য।

ভয়

রাগের মত ভয়ও মাত্রা ও প্রকাশের দিক দিয়ে নানা প্রকারের হতে পারে। সামান্য আশঙ্কা বোধ করা থেকে সুরু করে ভয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতেও পারে। শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উচ্চ শব্দ বা হঠাৎ পড়ে যাওয়া এ দুটি কারণেই একমাত্র ভয়[1] জাগতে পারে। কিন্তু পরিণত মানুষের ক্ষেত্রে ভয় জাগাতে সক্ষম এমন উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, প্রকৃতিতেও তেমনই সেগুলি বহুবিধ।

বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে উৎসের দিক দিয়ে শিশুর ভয় তিন শ্রেণীর হতে পারে। প্রথমত, কতকগুলি ভয় শিক্ষাপ্রসূত বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত। স্বাভাবিক ভয়ের কারণগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব বিষয়েতেও ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। যেমন উচ্চশব্দ বা অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোষ বস্তুকেও ভয় করতে শেখে। দ্বিতীয়ত, ভীত ব্যক্তিকে অনুকরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন বস্তুকে ভয় করতে শেখে। যেমন, ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদিকে শিশু ভয় করতে শেখে তার মা-বাবা, বড় ভাই বোনদের ভীতিমূলক আচরণ দেখে। ভয়ের তৃতীয় উৎস হল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। যেমন, ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার, হাসপাতাল, বড় বড় জন্তু, রুক্ষদর্শন মানুষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু ঐ সব ব্যক্তিকে বা বস্তুকে ভয় করতে শেখে। অপ্রীতিকর স্বপ্ন থেকেও শিশুর মধ্যে ভয় জেগে থাকে।

ভয়ের উদ্দীপক যত বিভিন্ন প্রকারের হোক না কেন, এক কথায় বলা চলে যে যখনই প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের সামর্থ্যের চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদা আকস্মিকভাবে বেড়ে যায় তখনই প্রাণীর মধ্যে ভয় জাগে। পরিবেশের সঙ্গে নিজের সঙ্গতিবিধানের অক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতার নামই ভয়। শৈশবে এই অক্ষমতা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়মূলক বা দৈহিক সঙ্গতিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকে। পরে শিশু যত বড় হয় ততই তার ভয় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়।

1. Fear

সাধারণত ভয় দু'শ্রেণীর। কারণজাত[1] ও কারণহীন[2]। অনেক ভয় প্রকৃত ও বাস্তব কারণ থেকে জন্মায়, আবার অনেক ভয় মিথ্যা বা অবাস্তব কোন ধারণা বা বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে কারণজাত হোক্, আর কারণহীনই হোক্, ভয় মাত্রেই শিশুর কোন না কোন অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায়।

ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে একটি সহজাত প্রক্ষোভ এবং মাত্র দুটি উদ্দীপকই নবজাতকের মধ্যে ভয় জাগাতে সমর্থ হয়। প্রথমটি হল উচ্চশব্দ, দ্বিতীয়টি হল হঠাৎ ভারসাম্য হারান। নবজাতক এই দুটি কারণ ছাড়া অন্য কিছুতেই ভয় পায় না। তবে যত সে বড় হয় তত তার ভয় এই দুটি উদ্দীপক থেকে আরও অন্যান্য উদ্দীপকে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায়।

প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্তবস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তিন চার বৎসর বয়স থেকেই কাল্পনিক এবং দূরবর্তী নানা উদ্দীপকে তার ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই সময় শিশুর ভয়মূলক উদ্দীপকের সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে। আর একটু বড় হলে তার এই অমূলক ভয়ের কারণগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং প্রকৃত বস্তু বা বাস্তব পরিস্থিতিতে ভয় কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শৈশবকালীন ভয়ের কারণগুলি একেবারে দূর হয় না এবং বহু পরিণত ব্যক্তির মধ্যে অন্ধকার, উচ্চশব্দ, ভূত-প্রেত প্রভৃতি শৈশবকালীন ভয়ের উদ্দীপকগুলি সমভাবেই কার্যকর থেকে যায়।

দশ বার বৎসর বয়সের শিশুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর চেয়ে মানসিক বা অবাস্তব বস্তু সম্বন্ধে ভয় বেশী জাগতে দেখা যায়। ভূত-প্রেত ইত্যাদি দৈব বা অপ্রাকৃতিক বস্তু, দৈত্য-দানব প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মৃত্যু, আঘাতপ্রাপ্তি, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, নানা গল্পে পড়া, শোনা বা সিনেমায় দেখা বিভিন্ন ভীতিকর চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে তার মধ্যে ভয় জন্ম নেয়।

শিশু আর একটু বড় হলে ভয়ের কারণ ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। তখন শিশু অপরের নিন্দা, বিরাগ বা সামাজিক লাঞ্ছনা প্রভৃতিকে শারীরিক বিপদের চেয়ে বেশী ভয় করতে সুরু করে।

শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধকারের ভয় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। ওয়াটসনের মতে উচ্চশব্দ থেকে অনুবর্তিত হয়ে অন্ধকারেতে শিশুর ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়।[3] শৈশবকালের আর একটি ভয় হল একা একা থাকার বা পরিত্যক্ত হবার ভয়। শিশুর অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাই তাকে পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং তাই থেকেই একা থাকার বা পরিত্যক্ত হবার ভয়টা তার মধ্যে বিশেষ করে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শৈশবকালে শিশুর মধ্যে পিতা কর্তৃক অঙ্গহানির একটা ভয় দেখা দেয়। অতি শৈশবে মার প্রতি শিশুর যৌন আসক্তি

1. Rational 2. Irrational 3. পৃঃ ১২৪—পৃঃ ১২৫

জন্মায় এবং সে ভয় পায় যে তার এই অবৈধ কামনার শাস্তিস্বরূপ পিতা তার যৌনাঙ্গ ছেদন করবেন। ফ্রয়েড এই শৈশবকালীন ভীতির নাম দিয়েছেন কাস্ট্রেসান কমপ্লেক্স[1]।

প্রক্ষোভ রূপে ভয় নিকৃষ্টতম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রক্ষোভটি মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে ও ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভয়ের প্রভাব ধ্বংসমূলক। সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য থেকে ভয় জন্মায়। কিন্তু ভয় বাড়তে থাকলে সেই অসামর্থ্য আরও বেড়ে যায় এবং ফলে যতটুকু সঙ্গতিবিধান করা ব্যক্তির সামর্থ্যায়ত্ত ততটুকু করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ভয় ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। ভীত ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি করুণা করে নিজেকেই। ভয় থেকে মুক্তি পাবার পর ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই আত্মগ্লানি ও নিজের সম্বন্ধে হীনমন্যতা দেখা দেয়।

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের জন্য পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। ফলে ব্যক্তির মনে দুর্বলতা ও নানা ধরনের অসঙ্গতি চিরস্থায়ী ভাবে থেকে যায়।

এই সকল কারণে শিশুর মধ্যে যাতে ভয় সৃষ্টি না হয় সেদিকে সযত্ন লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবে যাতে নানা প্রকৃতির অকারণ ও অবাস্তব ভয় এসে শিশুর মনকে দুর্বল না করে ফেলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষক ও পিতামাতার প্রথম কর্তব্য। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করা এবং কোন আকস্মিক আঘাতধর্মী অভিজ্ঞতার[2] জন্য যাতে তার মনে কোন স্থায়ী ভয় সৃষ্টি না হয় সেদিক বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দুশ্চিন্তা ভয়ের সহগামী। বহু অবাস্তব ভয় পরিণত বয়সে দুশ্চিন্তার রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং সুস্থ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এই ধরনের ফোবিয়া বা অবাস্তব ভয়[3] মানসিক শক্তি ও সহজাত সম্ভাবনাগুলিকে নষ্ট করে দেয় এবং অনেক সময় মনোবিকারের কারণও হয়ে ওঠে।

কারও কারও মতে ভয়ের কিছু উপযোগিতাও আছে। উদাহরণস্বরূপ, ভয় মানুষকে দুঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করে, সমাজ-নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং ব্যবহারিক জীবনে নিয়মানুবর্তী ও অনুগত করে তোলে।

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অন্যায় ও অবাঞ্ছিত কাজ থেকে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে ভয় একটি প্রবলতম উপকরণ। সামাজিক সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভয় যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধক রূপে কাজ করে

1. Castration Complex 2. Trauma 3. Phobia

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজে প্রচলিত অনুশাসন ও বিধিনিষেধগুলি এবং সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত শাস্তির প্রতি বিরাগ ও পুরস্কারের প্রতি আকর্ষণ শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই অসামাজিক কাজের প্রতি ভীতি জাগিয়ে তোলে এবং পরে এই ভীতিই তাকে সমাজ অনুমোদিত পথে জীবন কাটাতে বাধ্য করে। বস্তুত সাধারণ মানুষ সমাজের নিন্দা বা শাস্তির ভয়েই অসাধুতা, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাকে।

এই সব যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্য থাকলেও শিশুর মধ্যে ভয় জাগিয়ে বা তাকে ভীতিগ্রস্ত করে বাঞ্ছিত আচরণ করতে বাধ্য করা যে অত্যন্ত অনিষ্টকর ও মনোবিজ্ঞান-বিরোধী পন্থা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বাভাবিক ও সহজ পথে যদি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব না হয় তাহলে ভয় দেখানোর মত অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নেওয়া একান্ত অসঙ্গত। তাছাড়া মনের সুস্থ সংগঠনের উপরে ভয়ের ক্ষতিকর প্রভাব এত বেশি যে কোন মতেই শিশুর মনে ভয় জাগিয়ে কাজ করানোকে সমর্থন করা যায় না।

তবে সামাজিক শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির প্রতি ভয়কে কিছুটা সমর্থন করা যায়। এই ধরনের ভয়ের সাহায্যে আমাদের সমাজজীবনে শৃংখলা বজায় রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিশুর মধ্যে সামাজিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা উচিত সামাজিক সচেতনতা ও দলপ্রীতি জাগরণের মাধ্যমে, ভয় বা অন্য কোন অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্যে নয়।

আনন্দ

আনন্দ সামান্য তৃপ্তির অনুভূতি বা আরামবোধ থেকে সুরু করে উদ্দাম উচ্ছ্বাসের রূপ নিতে পারে। আনন্দ সৃষ্টি হয় ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি থেকে। প্রাণীদেহের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জন্ম থেকেই প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি জৈবিক চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলির তৃপ্তিই প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় রাখাকে সম্ভব করে তোলে এবং তাই থেকেই তার মনে আনন্দ অনুভূত হয়। ক্ষুধা, যৌন চাহিদা, বিশ্রাম বা নিদ্রার চাহিদা, দেহের সংরক্ষণমূলক চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলির তৃপ্তি থেকেই আনন্দের প্রাথমিক উৎপত্তি।

শিশু যতই বড় হয় ততই এই প্রাথমিক উদ্দীপকগুলি থেকে তার আনন্দের বোধ ক্রমশ অন্যান্য উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রথম প্রথম যে সকল তুচ্ছ ঘটনা বা বস্তু থেকে সে আনন্দ পেত, একটু বড় হলে সেগুলি তার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ সে যতই তার চতুষ্পার্শ্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে ততই তার আনন্দের উৎসেরও প্রকৃতি বদলে যায়। সে তখন অপরের প্রশংসা,

সামাজিক স্বীকৃতি, সমর্থন, বন্ধুত্ব প্রভৃতি নানা উৎস থেকে আনন্দ আহরণ করতে সুরু করে।

সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা আর দৈহিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে না, ধীরে ধীরে নানা মানসিক ও সামাজিক ব্যাপারে তা সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফলে দৈহিক চাহিদার তৃপ্তির চেয়ে এই সব নতুন মানসিক ও সামাজিক চাহিদার তৃপ্তিতে সে অধিকতর আনন্দ লাভ করে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর আনন্দ জন্মের প্রথম দিকে থাকে সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে তখনও বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ আহরণ করতে শেখে না। ছ'মাস বয়সে এই আনন্দ থেকে জন্ম নেয় উচ্ছ্বাস[1]। তখন শিশুর আনন্দের কারণ রূপে থাকে নিছক দৈহিক ও ইন্দ্রিয়মূলক পরিতৃপ্তি। কিন্তু ১০/১১ মাস বয়স থেকে দেখা যায় যে সে মা, বাবা, ভাই, বোন প্রভৃতি বহির্জগতের লোকেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।[2] এ সময় থেকে তার মানসিক বা সামাজিক চাহিদার বোধ জাগতে থাকে বলা চলে এবং ক্রমশ তার এই মানসিক চাহিদাগুলির তৃপ্তিই তার আনন্দের একটা বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ছোট শিশুর আনন্দের প্রধান কারণ হল শারীরিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। তাছাড়া যতই সে নতুন কাজ করতে সমর্থ হয় ততই তার আনন্দ আরও বেড়ে যায়। মুখে শব্দ করা, চেঁচান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা, দাঁড়ান ইত্যাদি কাজগুলি করায় সে প্রচুর আনন্দ পায়। জেরসিলডের[3] পরীক্ষণে দেখা গেছে যে যখন শিশুর কাছে কোন কাজ শক্ত বলে মনে হয় বা কোন কাজ করতে সে বাধার সম্মুখীন হয় তখন তার আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। তাছাড়া যখন সে অন্যান্যদের সঙ্গে খেলাধূলা করে তখনও সে প্রচুর আনন্দ পায়। শিশুর আনন্দ প্রকাশের রূপ হল হাসি, তার সঙ্গে শব্দ করা, হাত পা ছোঁড়া, মাথা নাড়া ইত্যাদি।

শিশু আর একটু বড় হলে নিঃসঙ্গ ও সম্পর্কহীন বস্তুর চেয়ে যে সব পরিস্থিতিতে সে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পায় সেই সব পরিস্থিতি থেকে সে বেশী আনন্দ পেতে সুরু করে। যেমন, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে খেলাধূলা করে আনন্দ পায়। এই সময় থেকে শিশু কমিক, কার্টুন বা হাসির ছবি দেখে আনন্দ পেতে শেখে। অপরকে বিরক্ত বা অপ্রতিভ করে বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেও সে আনন্দ পায়।

যখন সে আরও বড় হয় তখন সে অদ্ভুত কিছু দেখলে বা শুনলে হাসে এবং নিজেও রসিকতা করতে শেখে। কোন কিছুতে সাফল্যলাভ করে বা নিজেকে উন্নত প্রমাণ করে সে আনন্দ পায়। যে সব কাজ করা নিষিদ্ধ সেই সব কাজ করতে বা তা নিয়ে আলোচনা করেও সে আনন্দ লাভ করে। এই বয়সে উচ্চ বা মৃদু হাসি হল আনন্দের সাধারণ প্রকাশ। আনন্দের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা শিথিল বা শ্লথ ভাব অনুভূত হয়।

1. Elation 2. পৃঃ ২৩১ 3. Jersild

প্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা তার আনন্দবোধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, সক্রিয়তার চাহিদা, সৃজন বা উদ্ভাবনের চাহিদা, জানবার চাহিদা, দায়িত্ব গ্রহণের চাহিদা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলির তৃপ্তি তার আনন্দের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তির উপর মঙ্গলকর প্রভাবের দিক দিয়ে প্রক্ষোভগুলির মধ্যে আনন্দ সর্বোত্তম। দেহমনের সর্বাঙ্গীণ ও সুষম বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার দিক দিয়ে আনন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

শিশুর এই ক্রমবর্ধমান ভালবাসার চাহিদাটি যদি যথাযথ তৃপ্তি লাভ করে তবে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যময় হবে। আর যদি কোন কারণে তার ভালবাসার চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তবে তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। শিশুদের মধ্যে যত রকম আচরণমূলক অসঙ্গতি দেখা যায় তার অধিকাংশের মূলেই আছে তার এই প্রয়োজনীয় চাহিদাটির অতৃপ্তি।

শিক্ষায় আনন্দের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। থর্নডাইকের শিখনের ফললাভের সূত্র থেকে দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তিলাভ শিখনকে সম্ভবপর ও স্থায়ী করে। শাস্তি এবং পুরস্কারের উপর যতগুলি গবেষণা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আনন্দ বা তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষার পরম সহায়ক। যে শিখনে শিশু তৃপ্তি বা আনন্দ পায় তা সে স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করে। আর যেখানে সে আনন্দ পায় না তা সে সযত্নে পরিহার করে।

এই থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক কালের শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক করে তোলার আন্দোলনটি। শিশুর শিক্ষা জন্ম নেবে শিশুর চাহিদা থেকেই। এক মাত্র চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাই শিশু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, কেননা সে শিক্ষা শিশুর আনন্দের প্রকৃত উৎস। সে শিক্ষাই তাকে পরিতৃপ্তি দিয়ে থাকে।

ভালবাসা[1]

ভালবাসা হল আনন্দের প্রতিক্রিয়া। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ভালবাসা জন্ম নেয় ঐ বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে আনন্দকর অভিজ্ঞতা বা প্রতিক্রিয়া থেকে। সাধারণত ছোট শিশুর শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যারা যত্ন নেয়, যারা তার সঙ্গে খেলাধুলো করে, যারা তাকে কোন না কোন উপায়ে আনন্দ দান করে তাদের প্রতি তার ভালবাসা জন্মায়। বস্তুর সম্বন্ধেও একই কথা। যে সব বস্তু থেকে সে কোন রকম আনন্দ পায় সেই সব বস্তুকে সে ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসার সৃষ্টি মাত্রেই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। বস্তু ও ব্যক্তি থেকে সঞ্জাত শিশুর আনন্দ ঐ বস্তু বা ব্যক্তিতে অনুবর্তিত হয় এবং ঐ বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি শিশুর ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

1. Affection and Love

শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশে যে প্রক্ষোভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেটি হল এই ভালবাসা। ভালবাসা প্রক্ষোভটি দ্বিমুখী—অপরের কাছ থেকে তার ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং অপরের প্রতি তার নিজের ভালবাসার অনুভূতি। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অক্ষম, অসহায় ও অপরের সাহায্য ও যত্নের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এই সময় শিশুর মনের স্বাস্থ্যময় সংগঠনের জন্য প্রয়োজন তার প্রতি বড়দের যথেষ্ট মনোযোগ, স্নেহ, যত্ন, আদর, ভালবাসা ইত্যাদি। যে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে এই ভালবাসা পায় তার ব্যক্তিসত্তা স্বাস্থ্যময় ও সুপরিণত হয়ে ওঠে। আর যে শিশু কোন কারণে এই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তার মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হয় এবং তার ব্যক্তিসত্তা দুর্বল ও অসংহত হয়ে ওঠে। আবার তেমনই অপর পক্ষে শিশুকে অতিরিক্ত আদর দিলে বা ভালবাসা দেখালে বিপরীত ফল হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি মাতাপিতার ভালবাসা অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং তার স্বনির্ভর হবার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। তাছাড়া অতিরিক্ত আদর যত্ন বা স্নেহের আবহাওয়ায় শিশু মানুষ হলে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং বহু কৃত্রিম ও বিকৃত মানসিক ধারণা তার মনে বাসা বাঁধে। ফলে যখন সে বড় হয় তখন তার পক্ষে বাস্তব পরিবেশে সঙ্গতি বিধান করা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণত পিতামাতার একমাত্র সন্তানের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি বা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব শিশুকে ভালভাবে মানুষ করতে হলে যেমন তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ, যত্ন ও ভালবাসা দেওয়া দরকার তেমনই দেখা উচিত যে এগুলি যেন স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। ভালবাসা যেন তার স্বাস্থ্যপূর্ণ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা গঠনের সহায়ক হয়ে ওঠে, প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটিও যেন পারস্পরিক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষকের প্রকৃত কর্তব্য নিছক শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সত্যকারের সহানুভূতি ও ভালবাসার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিকট আত্মীয়ের স্তরে উন্নীত করা শিক্ষকের কর্তব্যের প্রধান অঙ্গ। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নয়, শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটিকে কার্যকর ও আয়াসহীন করে তোলার জন্যও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি পারস্পরিক প্রীতি ও অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিকাশমান শিশুর মানসিক চাহিদাগুলির মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা এবং আত্মস্বীকৃতির চাহিদা হল দুটি প্রধান চাহিদা এবং এগুলির তৃপ্তি হয় শিশু যখন বোঝে যে সে অপরের ভালবাসা এবং অনুরাগের পাত্র।

শিশু যেমন অপরের ভালবাসা চায় তেমনই সে অপরকে ভালবাসতেও স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। দেখা গেছে যে এক বৎসর বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে বড়দের

প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় এবং বছর দেড়েক বয়স থেকেই অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার অনুরাগ জন্মায়।

পাঁচ ছ'মাস বয়স থেকে শিশু তার পরিবারের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এই সময় থেকে সুরু হয় তার সামাজিক যোগাযোগ। যতই সে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং সুখকর অভিজ্ঞতা লাভ করে তত বেশীসংখ্যক ব্যক্তিকে সে ভালবাসতে শেখে। একটা দ্রষ্টব্য বিষয় হল যে শিশুর ভালবাসা মুখ্যভাবে ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে, গৌণভাবে গড়ে ওঠে জড়বস্তু নিয়ে। বার্নহামের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যখন কোন জড়বস্তুর প্রতি শিশুর ভালবাসা জন্মায় তখন সেটিকে সে প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্রিয় ব্যক্তির প্রতীক বা বিকল্প বলে মনে করে। এর পরের ধাপে সে তার পরিবারের গণ্ডীর বাইরের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এই সব ব্যক্তিরাই তাকে তার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে। শিশু এদেরই তার 'বন্ধু' বলে মনে করে।

শিশু যত বড় হয় তত সে বাইরের ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি অনুরক্ত হতে থাকে। বাড়ীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের বস্তু বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিশুর ভালবাসার এই সঞ্চালন তার সামাজিক জীবনবিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান। বস্তুত সুস্থ সমাজ জীবনের বিকাশের জন্য গৃহের প্রতি শিশুর প্রাক্ক্ষোভিক আসক্তি হ্রাস পাওয়া একান্ত দরকার।

এর পরের স্তরে ব্যক্তির প্রতি শিশুর ভালবাসা ধীরে ধীরে অ-ব্যক্তিতে সঞ্চালিত হয়। স্কুল, ক্লাব ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, খেলার মাঠ প্রভৃতি শিশুর আন্তরিক ভালবাসার বস্তু হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ এই সব দলের প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গে তার একটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে ওঠে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর এই ভালবাসার মূল্য অনেকখানি। বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই যদি শিশুর আন্তরিক আসক্তি না জন্মায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সেইজন্য শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রাথমিক লক্ষ্যই হল সমস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির উপর শিশুর আন্তরিক অনুরাগ বা আসক্তি সৃষ্টি করা।

যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভালবাসা যৌনস্তরে উন্নীত হয়। অবশ্য ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর ভালবাসা প্রথম থেকেই যৌনধর্মী। এই সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ আসক্তি দেখা দেয় এবং পরিবার গঠনের কামনা ধীরে ধীরে তাদের মনে জেগে ওঠে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের পরিণত মনে জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং এই বহুমুখী আসক্তি ও অনুরাগ তাদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

অনুশীলনী

১। ভয় ও রাগ প্রক্ষোভ দুটির প্রকৃতি আলোচনা কর। এই দুটি প্রক্ষোভ কিভাবে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে প্রভাবিত করে বল।

২। শিশুর জীবনে আনন্দ নামক প্রক্ষোভটির প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। ভালবাসা প্রক্ষোভটির শিক্ষামূলক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। শিশুর জীবনে রাগের ভূমিকা বর্ণনা কর। রাগের কি কোন উপযোগিতা আছে?

৫। শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার উপর ভয়ের প্রভাব বর্ণনা কর। ভয়ের কি উপযোগিতা আছে?

৬। ফোবিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

মনঃসমীক্ষণ

মনঃসমীক্ষণ[1] মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হলেও পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে প্রচলিত সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এর পার্থক্য বিরাট। এটিকে প্রধানত মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে যদিও আচরণবাদী[2] মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে কোন দিয়েই এর কোন মিল পাওয়া যায় না। বরং আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান[3] নাম দেওয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মানুষ কি ভাবে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে তার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয়ই মনঃসমীক্ষণের প্রধান কাজ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে তাদের পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে নিয়ে পৃথকভাবে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেইভাবে সেগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাদি নির্ণয় করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানুষের সকল আচরণকেই সেগুলির পারিবেশিক শক্তিগুলির সমন্বয়েই বিচার করা হয় এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির সংব্যাখ্যান দেওয়া হয়।

ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েড[4] এই নবীন মনোবিজ্ঞানের জনক। বস্তুত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই মনঃসমীক্ষণ জন্ম লাভ করেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশও ঘটেছে ঐ মনোব্যাধির চিকিৎসাগারেই। হিষ্টিরিয়া ও অন্যান্য মানসিক বিকারের চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড মানব মনের গভীর অন্তঃস্থলে এমন কতকগুলি বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেন যেগুলি মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের এক নতুন সংব্যাখ্যান তাঁর সামনে উপস্থাপিত করল। এই নতুন ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে ফ্রয়েড প্রবর্তিত করলেন এক অভিনব মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতি এবং গড়ে তুললেন তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণের চমকপ্রদ সৌধটি।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে ফ্রয়েড তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার সাহায্যে মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির বাস্তব রূপ দিয়ে যান। তাঁর জীবিতদশাতেই তিনি নিজেই তাঁর তত্ত্বগুলির প্রচুর সংস্কার ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বহু অনুগামীও তাঁর তত্ত্বগুলির মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিজেদের প্রয়োজন ও সংব্যাখ্যান মত মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা উপশাখার জন্ম দিয়েছেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় ফ্রয়েডের নিজস্ব তত্ত্বগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। তবে ফ্রয়েডের প্রথম দিকের তত্ত্বগুলি এখানে বর্জন করা

---

1. Psychoanalysis 2. Behaviourist 3. Psychology of Adjustment
4. Sigmund Freud

হল এবং তাঁর পরবর্তীকালের সংব্যাখ্যানগুলির বর্ণনাই প্রধানত এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি

মনঃসমীক্ষণ একটি পুরোপুরি গতিশীল বিজ্ঞান এবং এতে মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং প্রেষণার সাহায্যেই মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার মূলে আছে দুটি আদিম শক্তি। একটির তিনি নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি বা এরস[1]। এটি হল জীবন এবং ভালবাসার শক্তি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ব্যক্তির নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আত্মসংরক্ষণ এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা। এরস বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর একটি আদিম শক্তি। এটি প্রকৃতিতে এরসের বিপরীতধর্মী এবং ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন মরণশক্তি বা থ্যানাটস[2]। এরস যেমন প্রাণীকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায় তেমনই থ্যানাটস প্রাণীকে তার অপ্রতিরোধ্য লক্ষ্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন আছে বাঁচার ইচ্ছা তেমনই তার পাশাপাশি আছে তার মরণের ইচ্ছা। এই দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই প্রাণীর সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। মরণশক্তির প্রকাশ আবার দু'রকমের হতে পারে। যখন এই শক্তিটি অন্তর্মুখী হয় তখন তা আত্মনির্যাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদির রূপ নেয়। আবার যখন এটি বহির্মুখী হয়ে ওঠে তখন তা ধ্বংস বা মরণের রূপে প্রকাশ পায়। নিষ্ঠুরতা, আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইত্যাদি মারাত্মক প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই বহির্মুখী প্রকাশ।

ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বার্গ'স' প্রভৃতির মত একজন জীবনী-শক্তিবাদী[3]। বস্তুত জীবনী-শক্তিবাদের সঙ্গে তাঁর মতের মৌলিক মিলও যথেষ্ট আছে। ফরাসী দার্শনিক বার্গ'স'র পরিকল্পিত জীবন প্রেষণা[4] বা বার্নার্ড শ'র পরিকল্পিত জীবন শক্তির[5] সমগোত্রীয় হল ফ্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনাটি। কিন্তু প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি দুটিকে পরস্পরবিরোধী শক্তিরূপে ফ্রয়েডের এই পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। এর দ্বারা মানব মনের মধ্যে যে মৌলিক অন্তর্বিরোধিতা আছে তার একটা বৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান পাওয়া যায়।

ফ্রয়েড প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত মূলশক্তির নাম দিয়েছেন লিবিডো[6]। এই লিবিডো হল তেজ ও উদ্যমের আধার। ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় এই লিবিডোই হল ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। এটি একটি পুরোপুরি মানসিক বা অতিদৈহিক শক্তি। দেহগত শক্তি, পুষ্টি বা অন্যান্য দৈহিক শক্তির সঙ্গে এটিকে অভিন্ন বলে মনে করলে ভুল হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি সমান পরিমাণ বা সমান প্রকৃতির লিবিডো নিয়ে জন্মায় না। কারও

---

1. Eros 2. Thanatos 3. Vitalist 4. Elan Vital 5. Life Force 6. Libido

এই তেজোভাণ্ডার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী। আবার লিবিডোর বিকাশ প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারে এবং লিবিডোর এই গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা। অতএব ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিমাণ, তার গতিধারা এবং তার উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এইগুলির উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠন।

ফ্রয়েডের মতে এই লিবিডোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ যৌনধর্মী অর্থাৎ লিবিডোর সকল বিকাশ প্রচেষ্টাই ব্যক্তির যৌন কামনার তৃপ্তির প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান বহু যুগের প্রতিষ্ঠিত মানব-চিন্তার জগতে বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে প্রাণীর বিকাশ বা বৃদ্ধির মূলগত যে তেজ বা শক্তি তা যৌন-কামনার অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য যৌনতাকে ফ্রয়েড কেবলমাত্র প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌনতা বলতে সকল রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন। যৌনতার অন্তর্গত হল ব্যক্তির সুখ অন্বেষণের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা। আত্ম-প্রীতি, পিতামাতা-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আকর্ষণ, মানব জাতির প্রতি প্রেম এবং ব্যাপক অর্থে ভালবাসা বলতে যত রকম আসক্তিকে বোঝায় সে সকলই ফ্রয়েডের যৌনতার ধারণার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে যৌনতার প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থটিও এখানে বাদ যাচ্ছে না। দৈহিক মিলন বা প্রজননক্রিয়া যে যৌনতার মূল্য লক্ষ্য তা এখানে সম্পূর্ণ স্বীকার করে হচ্ছে।

লিবিডোর অগ্রগতি বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ

ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় লিবিডো একটি চলমান তেজঃপ্রবাহ। জন্মের মুহূর্ত থেকে এর চলা সুরু হয় এবং নানা পথ ধরে এটি তার পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। বস্তুত, শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ লিবিডোর এই অগ্রগতিরই সমার্থক। লিবিডোর অগ্রগতি বা ব্যক্তিসত্তার এই ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে।

প্রথম, শৈশব[1], এর স্থায়িত্ব জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, প্রসুপ্ত কাল[2], এর স্থায়িত্ব পাঁচ বৎসর বয়স থেকে বার বা তের বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং

তৃতীয়ত, যৌবনাগম[3], এর স্থায়িত্ব আঠারো থেকে কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত।

এই স্তর তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মতে শৈশবের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। এই স্তরেই লিবিডোর মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে থাকে।

১। শৈশব

জন্মের সময় শিশুর লিবিডো থাকে অসংবত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। কিন্তু খুব শীঘ্রই লিবিডো তার নিজস্ব আশ্রয় বা অবস্থানটি খুঁজে নেয়। কিন্তু লিবিডোর

1. Infancy 2. Latent Period 3. Adolescence

এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে না। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে। লিবিডোর অবস্থান প্রথমে থাকে শিশুর মুখে। এই সময়টিকে মৌখিক-রতি স্তর[1] বলা হয়। এই সময় শিশু তার মুখের সক্রিয়তা থেকেই যৌন আনন্দ লাভ করে থাকে। ঠোঁট ও জিভ দিয়ে চোষা, কামড়ান, চিবানো ইত্যাদি মৌখিক কার্য থেকে সে এই স্তরে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। এই মৌখিক রতিরই শেষের দিকে আসে মৌখিক-ধর্ষণমূলক স্তর[2]। এই স্তরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ধ্বংসমূলক মনোভাব। এই সময় সে যা পায় তাই ভাঙা বা নষ্ট করার একটা প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে।

মৌখিক রতি স্তরের পরে আসে পায়ু-রতি স্তর[3]। এই সময় মুখ থেকে পায়ুতে তার লিবিডো আশ্রয় নেয়। এই স্তরে প্রথম প্রথম মল-নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ পায়। কিন্তু শেষের দিকে নিজের দেহের মধ্যে মল সংরক্ষণে তার লিবিডোর তৃপ্তি ঘটে। ফ্রয়েডের মতে পরবর্তী জীবনে অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বাভাবিক কৃপণতা বা অর্থ, বস্তু প্রভৃতি সংরক্ষণের অতিরিক্ত প্রবণতা দেখা যায় তা এই স্তরে লিবিডোর সংবন্ধন থেকেই সৃষ্টি হয়।

পায়ু স্তরের পর আসে লৈঙ্গিক স্তর[4]। এই সময় শিশু তার যৌনইন্দ্রিয়ের সুখদানের ক্ষমতা আবিষ্কার করে। এই স্তরের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা বিভিন্ন অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এই লৈঙ্গিক স্তর থেকেই শিশুর লিবিডো তার স্বাভাবিক বিকাশের গতিপথ অনুসরণ করে। কিন্তু লৈঙ্গিক স্তরেই লিবিডোর সংগঠন সম্পূর্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে।

২। প্রসুপ্ত কাল

শৈশবের শেষে শিশুর যৌন আচরণে এক আকস্মিক ছেদ বা বিরতি দেখা দেয়। তখন শিশুর বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে কোন রকম যৌন সচেতনতা আর প্রকাশ পায় না। তার সব আচরণ পূর্ণভাবে যৌন-বিবর্জিত হয়ে ওঠে। এই সময়টিকে যৌনতার প্রসুপ্ত কাল[5] বলা হয়। এই সময় যৌনতা শিশুর মনের নিম্নতর স্তরে নিহিত অবস্থায় থাকে এবং বাইরে তার কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু তা' বলে এ সময়ে যৌনতার অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ বন্ধ হয় না। নিহিত থাকা অবস্থাতেই তার যথারীতি বিকাশ ঘটে যায়। যৌবনাগমে এই প্রসুপ্ত কালের সমাপ্তি ঘটে এবং তখন পূর্ণ পরিণত রূপে যৌনতা আবার আত্মপ্রকাশ করে।

৩। যৌবনাগম

এই সময় লিবিডো তার বিভিন্ন ও অস্বাভাবিক অবস্থানগুলি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে জননেন্দ্রিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। এই স্তরকে উপস্থ স্তর[6] বলা হয়। এখানেই

1. Oral erotic Stage 2. Oral-sad·stic Stage 3 Anal-erotic Stage
4. Phallic Stage 5. Latent Period 6. Genital Stage

লিবিডোর বৈচিত্র্যময় যাত্রার শেষ হয় এবং তার চরম লক্ষ্য প্রজনন ক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে লিবিডো সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়।

লিবিডোর অস্বাভাবিক বিকাশ

এই হল লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতির বিবরণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লিবিডোর ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অস্বাভাবিক পথও অনুসরণ করে।

১। সংবন্ধন[1]

লিবিডো তার চলার পথে শৈশবের যে সকল বিচিত্র যৌনতৃপ্তির উৎসে সাময়িকভাবে অবস্থান করে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব উৎস ত্যাগ করে লিবিডো আর এগোতে পারে না। এই ঘটনাকে লিবিডোর সংবন্ধন বলা হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ লিবিডোটি কখনও কোন ক্ষেত্রে সংবন্ধিত হয় না, হয় তার কিছুটা অংশ। বাকী অংশটুকু সামনের দিকে স্বাভাবিক পথেই এগিয়ে চলে। কিন্তু এই সংবন্ধনের ফলে লিবিডো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সংবন্ধিত লিবিডোর প্রভাব তার পরিণত ব্যক্তিসত্তাকে একদিকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনই লিবিডোর বিভাজনের ফলে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনবিকাশের প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতে বহু মানসিক বিকারের মূলেই আছে শৈশবের কোন অস্বাভাবিক যৌন তৃপ্তির উৎসস্থলে লিবিডোর এই ধরনের সংবন্ধন।

২। প্রত্যাবৃত্তি[2]

এই প্রসঙ্গে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি নামক আর একটি প্রক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিণত বয়সে কোন মানসিক আঘাত বা দুঃসহ ব্যর্থতার ফলে প্রবহমান লিবিডো চলার পথে বাধা পায় এবং তার অতীতের শৈশবের অবস্থান-স্থলে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। একে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি বলে। মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি প্রায়ই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ঐ ব্যক্তি বাস্তবজীবনে কোনও দুরূহ পরিস্থিতির সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, এমন কি নানারকম শিশুসুলভ আচরণও করতে সুরু করেছে। তার লিবিডো বর্তমান বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শৈশবের কল্পনাময় ও অবাস্তব সুখের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। অবশ্য লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিকে সম্ভব করে তোলে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন। যার মধ্যে যত বেশী সংবন্ধিত লিবিডো থাকে তার ক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্তি তত সহজে ঘটে। হিষ্টিরিয়া রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির লিবিডো শৈশবে ঈডিপাস কমপ্লেক্স সংবন্ধিত হয়ে থাকে এবং পরিণত বয়সে কোনও মানসিক আঘাত পেলে তার লিবিডো সেই শৈশবের সংবন্ধন স্থলে আবার প্রত্যাবৃত্ত করে।

---

1. Fixation 2. Regression

লিবিডোর পাত্র বা বিষয়বস্তুর পরিবর্তন

লিবিডোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আসক্তির বিষয় বা পাত্রের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিবিডোর আসক্তি থাকে বিষয়বর্জিত অবস্থায় এবং কেবলমাত্র নিজের দৈহিক সুখানুভূতিতেই তার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময় থেকে স্বতঃরতি স্তরের[1] সুরু বলা চলে।

এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক দেহগত সুখই তখন শিশুর কাম্য। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তার সত্তার বা অহমের বিকাশ হতে সুরু করে তখন তার লিবিডো সেই অহমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হল স্বতঃরতি স্তরেরই পরিণত রূপ। একে প্রাথমিক নার্সিসাসতা[2] বলা হয়। নার্সিসাসতা কথাটা এসেছে গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র নার্সিসাসের কাহিনী থেকে। নার্সিসাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে তাকে ভালবেসে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত হতাশায় মারা যায়। অতএব নার্সিসাসতা কথাটির অর্থ হল আত্মরতি।

এই প্রাথমিক আত্মরতি ব্যক্তির অহংসত্তার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং চির-কালই ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অতিরিক্ত আত্মরতি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছু পরিমাণে আত্মরতি ব্যক্তির সবল ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য সর্বদাই আবশ্যক। এই প্রাথমিক নার্সিসাসতার স্তরে যাদের লিবিডোর সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তারা অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে নার্সিসাসতার দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে সুরু করে। সকল প্রাপ্তযৌবন ছেলে বা মেয়েই নিজের প্রতি গভীর প্রেমাসক্তি অনুভব করে থাকে।

লিবিডো তার আসক্তির তৃতীয় স্তরে অহংকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের বিষয়বস্তুতে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তার পিতা বা মাতা। এর সুরু হয় লৈঙ্গিক স্তরে। পিতামাতার প্রতি শিশুর আসক্তি থেকে পরবর্তীকালে জন্মায় ঈডিপাস কমপ্লেক্স[3]।

চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অচেতন

ফ্রয়েডের পূর্বে চেতন মন ছাড়া কোন অচেতন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা বা আলোচনায় স্থান পায়নি। ফ্রয়েডই প্রথম দেখালেন যে মনের অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই, বরং মানব আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। তাঁর পরিকল্পনায় মনের তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ বা স্তর আছে যথা, চেতন[4], প্রাক্‌চেতন[5] ও অচেতন[6]।

---

1. Auto-erotic stage 2. Primary Narcissism 3 পৃঃ ৪১৬-পৃঃ ৪১৭।
4. Conscious. 5. Pre-conscious 6. Unconscious

আমাদের যে মনটির সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক এবং যে মনটির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সচেতন, মনের সেই বিভাগটিকে চেতন[1] বলা যায়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট এবং প্রায় অচেতনের সাত ভাগের একভাগের মত। তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটা বড় অংশও মনের অচেতন প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে। চেতনের ঠিক নীচেই হল প্রাক্‌চেতনের[2] স্থান। এটি যদিও সাধারণ অবস্থায় আমাদের চেতনের পরিসীমার বাইরে তবু চেষ্টা করলে প্রাক্‌চেতনের বিষয়বস্তুগুলিকে চেতন মনে আনা যায়। যে সকল ঘটনা আমাদের সচেতন মনে সাধারণত থাকে না অথচ চেষ্টা করলে আমরা যেগুলিকে মনে করতে পারি সেগুলিরই অবস্থান হল প্রাক্‌চেতনে। অবশ্য প্রাক্‌চেতনের সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে করা

[ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী মনের বিভিন্ন স্তর বিভাগ]
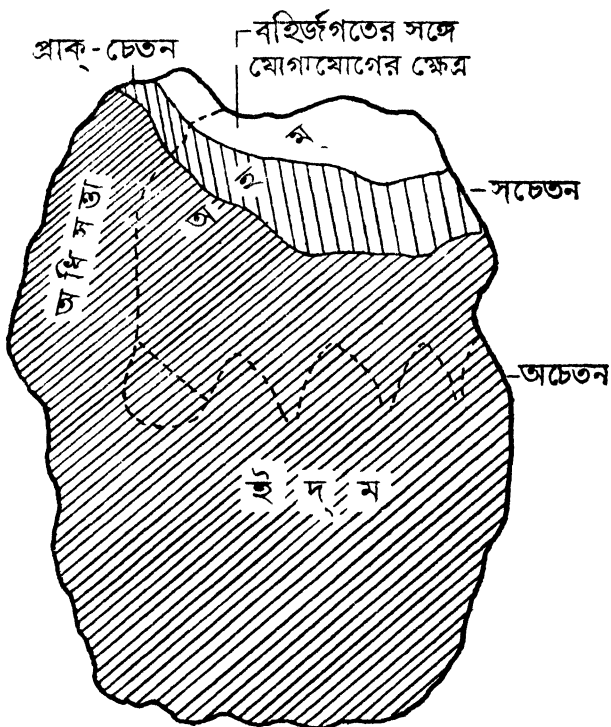
যায় তা নয়, এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে করতে যথেষ্ট কষ্ট বা অসুবিধা হতে পারে। তবে বিশেষভাবে চেষ্টা করলে সেগুলিকে সচেতন মনে আনা সম্ভব।

প্রাক্‌চেতনের নীচে অবস্থিত হল অচেতন[3]। মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই

1. Conscious 2. Pre-conscious 3. Unconscious

অচেতনের অবস্থান। অচেতনের চিন্তা ও ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে হলেও আমাদের সচেতন চিন্তা ও বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেগুলির প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

চেতন মনে যেমন আছে শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতনে তেমনই আছে বিশৃঙ্খলা ও অসংহতি। অচেতন প্রক্রিয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ, শিশুসুলভ ও আদিম প্রকৃতির বলে বর্ণনা করা যায়। অচেতনের প্রধান অধিবাসী হল নগ্ন কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি সৃষ্টি হয় দুটি উৎস থেকে। প্রথম হল এমন কতকগুলি চিন্তা বা কামনা যেগুলি পূর্বে চেতন মনেই ছিল, কিন্তু পরে সেখান থেকে তাদের অসামাজিক প্রকৃতির জন্য অহং কর্তৃক অবদমিত হয়ে অচেতনে এসে আশ্রয় নেয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তা ও কামনাগুলি হল সহজাত, জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী এবং কখনও তারা চেতন স্তরে উঠে আসে না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অচেতন বস্তুগুলির ইউঙ[1] নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন[2]। এগুলি আদিমতম মানুষের মন থেকে বংশধারার মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের মনে আশ্রয় নিয়েছে।

ইদম্, অহম্ ও অধিসত্তা

এছাড়া ফ্রয়েড মনের আরও তিনটি বিশেষ অধিবাসীর পরিকল্পনা করেছেন। সে তিনটি হল ইদম্[3], অহম্[4] এবং অধিসত্তা[5]।

ইদম্ হল পূর্ণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তির সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি ও উদ্যম জোগায়। এ ছাড়া চেতন মনে যত অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক ইচ্ছা জাগে সেগুলিও অবদমিত হয়ে ইদমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইদম্ প্রকৃতিতে অতি আদিম, বন্য। সে পুরোপুরি অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি[6]। অর্থাৎ সে চায় দুঃখকে এড়িয়ে যেতে এবং কেবল মাত্র সুখকে পেতে। সমাজ, শিক্ষা, নীতি, কোন কিছুরই সে ধার ধারে না। ইদম্ মূর্তিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন বাসনার প্রতিমূর্তি। তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, নৈতিক ভাল-মন্দের জ্ঞান নেই। আদিম মানব মনের সে প্রতীক। সে চায় নিছক আনন্দ, তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি, তা সে ভাল হক, মন্দ হক, সমাজ-অনুমোদিত হক, আর সমাজ-নিন্দিতই হক সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই।

ইদম্ ব্যক্তির কামনা বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। ফলে সে সরাসরি তার কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে একমাত্র ইগো বা অহম্।

অহমের কিছুটা চেতন, আবার কিছুটা অচেতন। জন্মের সময় অহম্ থাকে অতি দুর্বল ও অপরিণত। কিন্তু শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এসে

1. Jung 2. Racial Unconscious or Archetype 3. Id 4. Ego 5. Super-Ego 6. Pleasure Principle

অহম্ পুষ্ট হতে থাকে। অহমের চেতন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে। আর তার অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। ইদম্ অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি[1]। কিন্তু অহম পরিচালিত হয় বাস্তব নীতির[2] দ্বারা। অহম্ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যুক্তিধর্মী। সে বোঝে যে সমাজে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে চলতে হবে। সে জন্য বাস্তবের অনুশাসন মেনে চলাই তার নীতি এবং এই নীতির জন্যই সে ইদমের সমস্ত দাবী পূর্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের তৃপ্তি মানে অহমেরই তৃপ্তি। কিন্তু বাস্তবের চাপে অহম্ বাধ্য হয় ইদমকে দাবিয়ে রাখতে, তার কামনাকে অতৃপ্ত রাখতে। তবে যদি অহম্ বোঝে যে ইদমের কোন বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলে তাকে কোনও সমালোচনা বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না, তখন সেই ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে দ্বিধা করে না।

মনের সংগঠনের তৃতীয় অধিবাসীটি হল অধিসত্তা। কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নীতিবোধ ও বিধিনিষেধের ধারণা এবং কিছুটা পিতামাতার কাছ থেকে অর্জন করা নৈতিক শিক্ষা, এই দুয়ে মিলে তৈরী হয়েছে অধিসত্তা। অধিসত্তার বেশীর ভাগই অবস্থিত অচেতনে এবং সেই জন্য অহমের চেয়ে অধিসত্তা ইদমের অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক কামনা বাসনা সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে। অধিসত্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের সকল কাজের সমালোচনা করা এবং তার তিক্ত সমালোচনার দ্বারাই সে ইদমের বাসনাগুলিকে দমন করতে অহম্‌কে বাধ্য করে। বস্তুত আমরা প্রচলিত ভাষণে যাকে বিবেক[3] বলি অধিসত্তা থেকেই পরবর্তী কালে সেটি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উপরের বর্ণনায় আমরা ব্যক্তির ইগো বা অহম্‌সত্তার যে ছবিটি পেলাম সেটি সত্যই খুবই সুখকর নয়। অহম্‌কে সর্বদা একাধিক বিপরীতধর্মী শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। ফ্রয়েডের ভাষায় অহম্‌কে একসঙ্গে তিনটি প্রভুর সেবা করতে হয়, যথা, বাস্তব, ইদম্ ও অধিসত্তা। প্রথমত, অহম্‌কে তার সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাস্তবের অনুশাসন, বিধিনিষেধ প্রভৃতি মেনে চলতে হয়। দ্বিতীয়ত, ইদমের কামনা বা বাসনাগুলির তৃপ্তির জন্য তাকে নানা কৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। আর সবশেষে অধিসত্তার কঠোর সমালোচনার চাপে তাকে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এক কথায় এই তিনটি শক্তিকে সংযত ও শান্ত রেখে অহম্‌কে চলতে হয়। যতক্ষণ অহম্ এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করে চলতে পারে ততক্ষণ তার মানসিক সাম্য বজায় থাকে। যে মুহূর্তে এই শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ন নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ যখন এই তিনটি শক্তির কোন একটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সেই মুহূর্তেই দেখা দেয় মানসিক বিপর্যয়। ফ্রয়েডের মতে মানসিক বিকারগ্রস্ত রুগী হল এমন ব্যক্তি যার অহম্ কোন কারণবশত এই তিনটি পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

---

1. Pleasure Principle 2. Reality Principle 3. Conscience

কমপ্লেক্স

কমপ্লেক্স[1] কথাটির সাধারণ অর্থ হল মানসিক জটিলতা। ফ্রয়েড কমপ্লেক্স কথাটি ব্যবহার করেছেন এক ধরনের বিশেষ মানসিক সংগঠনকে বোঝাতে। যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধ্যে একটি স্থায়ী জটিল সংগঠনের সৃষ্টি হয় তখন তাকে কমপ্লেক্স বলা হয়। এই জটিল মানসিক সংগঠনের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটি প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে উঠলে ব্যক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়ত, কমপ্লেক্স মাত্রেই ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ কমপ্লেক্স ব্যক্তির আচরণকে বিশেষ পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তির আচরণ বিশেষ একটি গতিপথ অনুসরণ করে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে কমপ্লেক্সের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হল অচেতনধর্মিতা অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের কমপ্লেক্স সম্বন্ধে সচেতন থাকে না এবং কমপ্লেক্সের প্রভাবে সে যে আচরণ করে তার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। কমপ্লেক্স ব্যক্তির অচেতন মনের গভীর তলদেশে নিহিত থাকে এবং তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তার সচেতন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে থাকে। ফ্রয়েডের মতে অচেতনধর্মিতাই কমপ্লেক্সের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় অবদমন থেকে। যখন ব্যক্তির মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছা দেখা দেয় যেটি তার অর্জিত শিক্ষা, সামাজিক মান বা ধর্মবোধের বিচারে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় তখন সে সেটিকে তার অচেতনে অবদমিত করে এবং তার ফলে সেটি সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এই অবদমিত চিন্তা বা ইচ্ছা তার অচেতনের গভীর তলদেশে কমপ্লেক্স বা একটি জটিল সংগঠনের রূপ নিয়ে বাস করে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই সেটি তার সচেতন স্তরে উঠে এসে তার আচরণকে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তির অচেতনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকলেও কমপ্লেক্স তার কর্মশক্তি বিন্দুমাত্র হারায় না এবং প্রক্ষোভ-নিষিক্ত অবস্থায় প্রবল এক শক্তির উৎসরূপে তার অচেতনের অন্তঃস্থলে অভিব্যক্ত হবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে। কমপ্লেক্স মাত্রেই কোন না কোন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। সেই জন্য যখনই কমপ্লেক্সের প্রভাবে ব্যক্তি বিশেষ কোন আচরণ করে তখনই তার সেই আচরণে তার মনের সেই গুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইজন্য কমপ্লেক্স থেকে জাত আচরণ কখনও স্বাভাবিক প্রকৃতির হয় না।

এ থেকে আমরা কমপ্লেক্সের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। কমপ্লেক্সের মধ্যে সব সময়েই একটি অবাঞ্ছনীয়তা থাকবে। কেননা সচেতন সত্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা

---

1. Complex

বা চিন্তা থেকেই কমপ্লেক্স জন্মে থাকে। এই কারণেই কমপ্লেক্সের সচেতন মনে প্রবেশাধিকার নেই, তাকে চিরকালই অচেতনে বাস করতে হয়।

যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, একটি শিশু বার কয়েক অঙ্কে ফেল করার ফলে অঙ্ককে ঘিরে তার মধ্যে একটি কমপ্লেক্স তৈরী হল। ফলে যখনই অঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠে বা শিশুটি নিজে অঙ্ক করার চেষ্টা করে তখনই তার মধ্যে ভীতিকর একটি অনুভূতি দেখা দেয় এবং সেই ব্যাপারে তার আচরণও কিছুমাত্রায় অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স ছাড়াও কতকগুলি সর্বজনীন কমপ্লেক্স দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে হীনমন্যতার কমপ্লেক্স[1] উল্লেখযোগ্য। যখন কোন ত্রুটি, অক্ষমতা বা ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তি নিজেকে অপরের চেয়ে ছোট বা হেয় বলে মনে করে তখন তার সেই মনোভাবকে হীনমন্যতার কমপ্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপর পক্ষে নিজেকে অপরের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে বড় মনে করলে ব্যক্তির সেই মনোভাবকে উচ্চতাবোধের কমপ্লেক্স[2] বলা হয়। এছাড়া ফ্রয়েড আরও কয়েকটি সর্বজনীন কমপ্লেক্সের কথা বলেছেন। সেগুলির মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স, কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঈডিপাস কমপ্লেক্স[3]

শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে বাইরের বিষয় বা পাত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার প্রথম আসক্তির পাত্রী হন তার মা। লিবিডোর পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমূলক হয়ে ওঠে। কিন্তু নানা কারণে শিশু বুঝতে পারে যে তার এই যৌন-আসক্তি অনুচিত এবং সে তখন সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই বুঝতে পারার মূলে আছে শিশুর উপর তার পিতার প্রভাব। যেমন করেই হোক শিশু বুঝে নেয় যে মার প্রতি তার যৌনকামনা অত্যন্ত অসঙ্গত।

ফলে সে তার কামনাকে অবদমিত করে এবং এই অবদমিত কামনাটি কমপ্লেক্সের রূপে তার মনে বাসা বাঁধে। ফ্রয়েড এই কমপ্লেক্সটির নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সটির নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণে। ঈডিপাস ছিল থিবসের রাজার ছেলে। তাকে শৈশবে এক পাহাড়ে ফেলে আসা হয় এবং একজন রাখাল তাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। বড় হয়ে ঈডিপাস বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ঘটনাচক্রে একদিন তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপাস নিজের পিতাকে হত্যা করে এবং তখনকার প্রথামত নিহত রাজার স্ত্রী অর্থাৎ নিজের মাকে বিবাহ করে, অবশ্য এসবই সে করে তার মা ও বাবার আসল পরিচয় না জেনেই।

অতএব ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলতে বোঝায় মার প্রতি ছেলের যৌনমূলক আসক্তিকে।

1. Inferiority Complex 2. Superiority Complex 3. Oedipus Complex

মনে রাখতে হবে যে শিশুর এই ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ তার অচেতন মনের। তার চেতন মনে তার মার প্রতি কোনরূপ যৌনমূলক আসক্তির কথা সে জানেই না। তার মার প্রতি এই আসক্তি প্রকাশ পায় মার আদর ও মনোযোগ চাওয়া কিংবা মার কাছে শোওয়া প্রভৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। প্রথম প্রথম মনে করা হত যে শিশুর এই আসক্তি বোধ করি তার মায়ের দৈহিক সত্তার প্রতি উদ্দিষ্ট, কিন্তু পরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশু তার অচেতন মনের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে তার মার একটি প্রতিরূপ তৈরী করে নেয় এবং তার সমস্ত আসক্তি গড়ে ওঠে তার অচেতনের সেই মাতৃমূর্তিকে ঘিরেই। মায়ের প্রতি তার এই যৌন আসক্তি যতই বেড়ে চলে ততই সে তার পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তাঁর দৈহিক ক্ষতি এমন কি তাঁর মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা দেয় ঠিক সেই রকম আসক্তি দেখা দেয় মেয়ের তার বাবার প্রতি। মেয়ে তার বাবার সঙ্গ কামনা করে এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। বাবার প্রতি মেয়ের এই আসক্তিকে ফ্রয়েড প্রথমে ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স[1] বলে একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়েরই পিতা-মাতার প্রতি যৌন আকর্ষণকে ঈডিপাস কমপ্লেক্স এই একটি নাম দিয়েই বোঝান হয়ে থাকে।

অধিসত্তার সৃষ্টির মূলে ঈডিপাসেরই ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মায়ের প্রতি আসক্তি শিশুর মনে পিতার সম্বন্ধে একটি বিরাট ভীতির সৃষ্টি করে। শিশু মনে করে তার এই আসক্তির জন্য পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন এমন কি তার যৌনাঙ্গ ছেদনও করতে পারেন। ফ্রয়েড শিশুর এই মনোভাবের নাম দিয়েছেন কাষ্ট্রেসন কমপ্লেক্স[2]। পিতার সম্বন্ধে এই ভীতিবোধ তাকে পিতার প্রতি অনুগত ও বাধ্য করে তোলে। পরে যখন শিশু বড় হয় তখন তার উপর ঈডিপাস কমপ্লেক্সের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসে এবং পিতার সম্বন্ধে তার অস্বাভাবিক ভীতিবোধও চলে যায়। কিন্তু পেছনে থেকে যায় সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি একটি স্বতঃপ্রসূত আনুগত্য। তারই নাম অধিসত্তা বা সুপার-ইগো[3]। এইজন্য অধিসত্তাকে ঈডিপাস কমপ্লেক্সের অবদান বলে বর্ণনা করা হয়।

প্রতিরক্ষণ কৌশল

অহমকে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্বদাই সঙ্গীতিবিধান করে চলতে হয়, যথা ইদম্, অধিসত্তা ও বাস্তব। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ ইচ্ছাই বাস্তবের বিরোধী এবং ফলে অধিসত্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। তার ফলে প্রায়ই এমন একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন অহমের অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। তখন আত্মরক্ষার জন্য অহমকে

1. Electra Complex 2. Castration Complex 3. Super-Ego

কতকগুলি বিশেষ কৌশলের শরণাপন্ন হতে হয়। অহম্ নিজের আত্মরক্ষার জন্য এই কৌশলগুলির উদ্ভাবন করে বলে এগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল[1] বলা হয়।

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথমত, ইদমের অবদমিত ইচ্ছাগুলির অভিব্যক্তির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার প্রয়াস। আর দ্বিতীয়ত, ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিক তৃপ্তিদানের আয়োজন করে তার সঙ্গে মোটামুটি একটা সঙ্গতিবিধানে পেঁছান। এই জন্য এইগুলিকে সঙ্গতিবিধানের কৌশল[2] নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

১। অবদমন

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের। ইদমের কামনাগুলি তৃপ্তিলাভের জন্য তাদের আবেদন নিয়ে অহমের কাছে হাজির হয়। কিন্তু কামনাগুলির অসামাজিক ও নীতিবিরোধী প্রকৃতির জন্য অহমের পক্ষে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব হয় না। তখন সেগুলিকে হয় আংশিক ও কৃত্রিম তৃপ্তি দিতে হয় কিংবা সেগুলিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখতে হয়। এই দাবিয়ে রাখার কার্জটিকে অবদমন[3] বলে। সময় সময় চেতন মনেও এই ধরনের সমাজবিরোধী বা নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা দেখা দেয়। তখনও অহম্ সেই ইচ্ছাটিকে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অবদমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিন্তাকে ব্যক্তি অবদমিত করে সে সম্বন্ধে পরে তার আর কোন সচেতনতা থাকে না। সেই ইচ্ছা বা চিন্তাটি তার চেতন স্তর থেকে নেমে অচেতনে এসে আশ্রয় নেয় এবং ফলে ব্যক্তি সেই ইচ্ছা বা চিন্তাটি সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

কিন্তু অচেতনে অবদমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি তাদের শক্তি একটুও হারায় না বরং অনেকটা টাইম বোমার মত সেগুলি অচেতনে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বিস্ফোরিত হয়। সেই অবাঞ্ছিত এবং প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য অহম্‌কে সেগুলির উপর একটি বাধা চাপিয়ে রাখতে হয়। ফ্রয়েড এই বাধাকে সেন্সর[4] নাম দিয়েছেন। সেন্সরের কাজ হল ইদমের তৃপ্তি-কামী ইচ্ছাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। যে ইচ্ছাগুলি সেন্সরের বিচারে তৃপ্তিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় সেন্সর সেগুলিকে চেতন মনে প্রবেশের অধিকার দেয় এবং যেগুলি তার বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেগুলিকে সে জোর করে অচেতনে দাবিয়ে রাখে। এক কথায় সেন্সর অবদমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদার রূপে কাজ করে।

অবদমনের কাজে অধিসত্তার ভূমিকা প্রচুর। যদিও অধিসত্তা সরাসরি ইদমের কোন চিন্তা বা ইচ্ছাকে অবদমিত করতে পারে না এবং যদিও অবদমন করাটা একমাত্র

1. Defence Mechanism 2. Adjustment Mechanism 3. Repression 4. Censor

অহমেরই কাজ, তবু সেন্সরের প্রকৃতি নির্ধারণে অধিসত্তারই ভূমিকা সব চেয়ে বেশী। কোন্ ইচ্ছাটি চেতনে স্থান পাবার যোগ্য, আর কোন্‌টি নয়, তার চরম নিয়ন্ত্রক হল অধিসত্তা এবং এই অধিসত্তারই অনুশাসন অনুযায়ী সেন্সর পরিচালিত হয়।

প্রকৃতির দিক দিয়ে অবদমন হল চরমতম এবং নিকৃষ্টতম সঙ্গতিবিধানের কৌশল। কেননা এই পন্থায় ইদম্ পুরোপুরি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তার ফলে ইদম্ ও অহমের দ্বন্দ্বের কোন প্রকৃত মীমাংসা দেখা দেয় না। অবদমন যখন অতিরিক্ত মাত্রার হয়ে ওঠে তখন ইদম্ ও অহমের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপ ধারণ করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্য যে কোন মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানসিক বিকারের কারণই হল ইদমের অতৃপ্ত ইচ্ছার অতিরিক্ত অবদমন।

২। প্রতিক্রিয়া সংগঠন

কখনও কখনও কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যক্তি সেই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি প্রকাশ করে বা বিপরীত আচরণটি সম্পন্ন করে। সেই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন[1] বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অবদমিত যৌন ইচ্ছা যৌন-ভীতির রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স বা কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স থেকে জাত পিতার প্রতি বিদ্বেষ প্রতিক্রিয়া সংগঠনের ফলে পিতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

৩। অপব্যাখ্যান

যখন কোন আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্তে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা সমাজ অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ উপস্থাপিত করা হয় তখন সেই কৌশলটিকে অপব্যাখ্যান[2] বলা হয়। এই কৌশলের দ্বারা অহম্ তার আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে রেহাই পায়, অবশ্য এই প্রকৃত কারণটি গোপন রেখে অন্য একটি কারণ উপস্থাপিত করার কাজটি সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই অহম্ সম্পন্ন করে থাকে। যে কারিগর তার নিজের অকর্মণ্যতার জন্য তার যন্ত্রপাতির দোষ দেয় বা যে নর্তকী তার নৃত্যকলার অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠানের উপর চাপায়, সেই কারিগর বা নর্তকী নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অপব্যাখ্যানের আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

৪। প্রতিক্ষেপণ

প্রতিক্ষেপণ[3] অপব্যাখ্যানের একটি বিশেষ রূপ মাত্র। এই কৌশলটিতে ব্যক্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কামনাই বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। যেমন, কোনও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতন মনে নিহিত ঘৃণাটি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর মনে এই ধারণা

1. Reaction Formation 2. Rationalisation 3. Projection

সৃষ্টি করতে পারে যে তার স্বামীই তার প্রতি আসক্তি হারিয়েছে বা স্বামীই তাকে ঘৃণা করে। মানসিক বিকৃতির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী নিপীড়নের বিভ্রান্তিতে[1] ভোগে অর্থাৎ তার ধারণা হয় যে সকলেই তার উপর নির্যাতন করছে। প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরস্থ নিজের ধ্বংসাত্মক কামনাটি বাহিরের জগতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে তার মধ্যে অপরের দ্বারা নিপীড়িত হবার বিভ্রান্তিকর রূপ নিয়েছে।

৫। উন্নতীকরণ

সঙ্গতিবিধানের কৌশলগুলির মধ্যে উন্নীতকরণ সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা অহমের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর কামনার লক্ষ্যই যৌনমূলক। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক অনুশাসনের চাপে লিবিডোর যৌনমূলক লক্ষ্যটিকে নিরুদ্ধ করে সেটিকে অন্যপথে পরিচালিত করতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ চাহিদাটির অবশ্য আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। একেই উন্নীতকরণ[2] বলা হয়। কোন কামনাকে তার নিম্নশ্রেণীর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে কোন উচ্চশ্রেণীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল উন্নীতকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যনিরুদ্ধ যৌন শক্তি তখন সৃজনমূলক নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যৌন-মিলনের ইচ্ছা উন্নীত হয়ে ক্লাব, পার্টি, সহনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়েছে, আক্রমণাত্মক কামনা বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার রূপ নিয়েছে, ইত্যাদি। দেখা গেছে যে আমাদের সমাজে যৌনতামুক্ত[3] লিবিডো এইভাবে শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টি, সামাজিক কার্যাবলী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান. হবি অনুসরণ প্রভৃতি নানা আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

৬। অভেদীকরণ

এটিও ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার একটি পন্থাবিশেষ। এই কৌশলে ব্যক্তি অপরের সত্তা বা অপরের কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের সত্তাকে বা নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। যেমন, শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে আনন্দ পায়। আমরাও যে আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের[4] দৃষ্টান্ত।

৭। প্রত্যাবৃত্তি

লিবিডো যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তখন সে বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং শৈশবের যে সকল আচরণ করে সে আনন্দ পেত এখন সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করে সে তার বর্তমানের সঙ্গতিবিধানের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের

1. Delusion of Persecution 2. Sublimation 3. Desexualised 4. Identification

ক্ষেত্রে প্রায়ই এই রকম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি ঘটে থাকে।[1] দেখা গেছে যে প্রত্যাবৃত্তির[2] ফলে মানসিক বিকারের রোগী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না বা নিজে পোষাক পরতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে প্রত্যাবর্তন করেছে।

৮। **অবাস্তব কল্পনা এবং দিবাস্বপ্ন**

যে সকল ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে অবাস্তব কল্পনা[3] বা দিবাস্বপ্নের[4] মাধ্যমে ব্যক্তি আংশিকভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসনার তৃপ্তিদানের এই কৌশলটিই খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ত্তাধীন। অনেক সময় অতৃপ্ত যৌনকামনা অযৌন রূপ নিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে।

৯। **রূপান্তর-ভবন**

কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যক্তির রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে রূপান্তরভবন[5] বলা হয়। যেমন, রূপান্তরিত হিস্টিরিয়ার[6] ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনও শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধকে সে একটুও ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারে না। ফলে তার অচেতনে তা থেকে জন্ম নেয় মানসিক দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে মেয়েটির একটি হাত পক্ষাঘাতে অকর্মণ্য হয়ে গেছে। এখানে তার পিতাকে সেবা করার অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণের রূপ নিয়ে তার মধ্যে দেখা দিল।

মনোবিকারের কারণ

লিবিডো তার সহজ অগ্রগতির পথে কোন কারণে বাধা পেয়ে যদি তার শৈশবের কোন সংবন্ধনের[7] স্থানে ফিরে আসে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে নিউরসিস[8] বা মনোবিকার দেখা দেয়। লিবিডোর এই প্রত্যাবৃত্তির ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং শৈশবের যে সকল আচরণ বা পন্থার দ্বারা তার লিবিডো তৃপ্তি পেত সেই সকল আচরণ বা পন্থার সে আবার আশ্রয় নেয়। ব্যক্তি তার জীবনে হঠাৎ কোন আঘাতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক অভিজ্ঞতা লাভ করলে তার লিবিডোর এই প্রত্যাবর্তন ঘটে। এটিকে আমরা মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ বলব।

কিন্তু আঘাতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক ঘটনা ব্যক্তির জীবনে নিয়তই ঘটে থাকে। তার জন্য সকলের ক্ষেত্রেই মনোবিকার দেখা দেয় না। তার ব্যাখ্যা হল আঘাতাত্মক ঘটনার বা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হল মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু তাছাড়াও

1. পৃঃ ৪১০ 2. Regression 3. Fantasy 4. Day Dreaming 5. Conversion 6. Conversion Hysteria 7. Fixation 8. Neurosis

মনোবিকারের আর একটি অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। সেটি হল ব্যক্তির মনোবিকারমূলক প্রবণতা। ব্যক্তির মনের মধ্যে এমন একটি অবস্থা জন্ম থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে যার প্রভাবে লিবিডো যদি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সেটি শৈশবের সংবন্ধনের
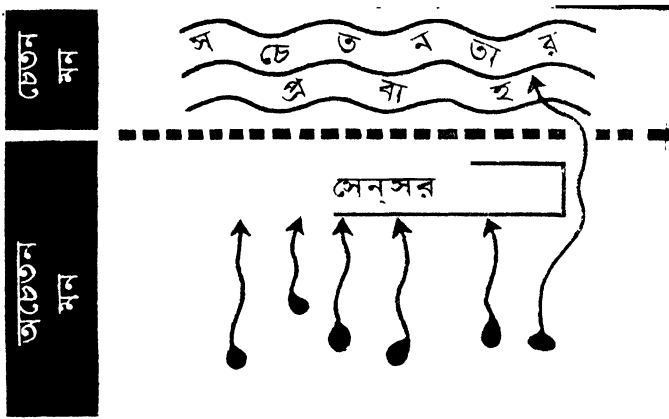
[চেতন মনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসামাজিক ও অনাঙ্খিত কামনাগুলি অচেতনে অবদমিত হয় এবং সেখান থেকে সেগুলি সচেতনে উঠে আসার জন্য বার বার চেষ্টা করে। কিন্তু সেন্সর তাদের উপরে ওঠার সেই প্রচেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করে। কিন্তু কখনও কখনও কোন অবদমিত কামনা কৌশলে সেন্সরের অসতর্কতার সুযোগে সচেতন স্তরে এসে আত্মপ্রকাশ করে।]

স্থলে প্রত্যাবৃত্ত করে। ফ্রয়েডের মতে এই অপ্রত্যক্ষ কারণটি না থাকলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ থেকেই মনোবিকারের সৃষ্টি হয় না।

এই অপ্রত্যক্ষ কারণের ফলেই ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয় লিবিডোর অতিরিক্ত শৈশবকালীন সংবন্ধন, যার ফলে ব্যক্তির জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় লিবিডোর পরিমাণ কম হয়ে যায় এবং কোনরূপ মানসিক আঘাত বা ব্যর্থতা সহ্য করতে লিবিডো অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতৃপ্তির ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডো সংবন্ধিত থাকার ফলে ব্যক্তির অচেতনে সকল সময়ই একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। শৈশবে সংবন্ধিত লিবিডো চায় তার তৃপ্তি। কিন্তু পরিণত মনের অহম্ তাকে সে তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে অহম্‌কে জোর করে সেই শৈশবকালীন কামনাগুলি অবদমিত করতে হয়। তার ফলেও বেশ কিছুটা লিবিডো ব্যয়িত হয়ে যায় এবং বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় লিবিডোর পরিমাণ আরও কমে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন, অহমের সঙ্গে সেই সংবন্ধিত লিবিডোর দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে অহম্ কর্তৃক শৈশবকালীন কামনাগুলির অবদমন—এ সবে মিলে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি করে এমন একটি পরিস্থিতি যেটি মনো-

বিকার সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। অপ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধান হল উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া মনোবিকারমূলক প্রবণতা। এই অপ্রত্যক্ষ কারণগুলির সঙ্গে যখন আঘাতাত্মক রূপে প্রত্যক্ষ কারণটি সংযুক্ত হয় তখনই দেখা দেয় মনোবিকার।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মনোবিকারও ব্যক্তির এক প্রকার সঙ্গতি-সাধনের প্রচেষ্টা, যদিও সে প্রচেষ্টা সফল বা সার্থক প্রচেষ্টা নয়। অহম্ যখন দেখে যে ইদমের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সে আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না, অথচ সেগুলির তৃপ্তি দেওয়ার অর্থ চরম বিপর্যয়কে ডেকে আনা তখন মনোবিকারের মাধ্যমে সে সেগুলির তৃপ্তি দেয়। যেমন, অবৈধ যৌনকামনাকে প্রকাশ্য পন্থায় পূর্ণ তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে অহম্ সেগুলিকে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণের মধ্যে দিয়ে আংশিক তৃপ্তি দেওয়া অনেক নিরাপদ বলে মনে করে। এক কথায় মনোবিকার হল চরম বিপর্যয়কে এড়াবার জন্য আংশিক বিপর্যয়কে বরণ করা রূপ একটা কৌশল মাত্র।

মনোবিকারের চিকিৎসা

ফ্রয়েডের মতে মনোবিকারের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে প্রত্যাবৃত্ত লিবিডোর শৈশব-কালীন আশ্রয়স্থল খুঁজে বার করা এবং সেই সংবন্ধনের স্থান থেকে তাকে মুক্ত করা। এর জন্য প্রয়োজন রোগীর বিস্মৃত শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের রাজ্যে প্রবেশ করা এবং তার লিবিডোর সংবন্ধনের স্থানগুলি আবিষ্কার করা। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর এই শৈশবকালীন আসক্তির স্থানগুলি (যেগুলি তার সচেতন মনে অজ্ঞাত) যে মুহূর্তে রোগীর নিকট জানা হয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই তার মনোবিকারও দূর হয়ে যাবে। ইয়ুং'র মতে কিন্তু মনোবিকারের চিকিৎসার জন্য এই শৈশবকালীন আসক্তির স্থল খুঁজে বার করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে যে বাস্তব বা কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত হয়ে লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত হয় সেই বাধাটি দূর করলেই মনোবিকারও দূর হয়ে যায়।

অবাধ অনুষঙ্গ[1]

শৈশবের লিবিডো-আসক্তির ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বার করা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। কেননা সেই অভিজ্ঞতাগুলি সচেতন মন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার ফলে অচেতন মনে অবদমিত অবস্থায় বাস করে। সাধারণ পন্থায় চেষ্টা করলেও ব্যক্তি তার সেই অতীতের স্মৃতিগুলিকে তার চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

প্রথম প্রথম সম্মোহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে অচেতন স্তর থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত। পরে ফ্রয়েড সম্মোহন প্রক্রিয়াটি ত্যাগ করে তার স্থানে অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতির প্রচলন করলেন। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তার মনের উপর কোনরূপ বাধা অরোপ না করে তার সমস্ত চিন্তা বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

---

1. Free Association

একটি নির্জন ঘরে শান্ত পরিবেশে কেবলমাত্র মনঃসমীক্ষকের উপস্থিতিতে ব্যক্তিকে একটি আরাম কেদারায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর তাকে কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে যা তার মনে আসে অবিকল সেই সব কথা বলে যেতে বলা হয়। প্রথম প্রথম ব্যক্তি তার বর্তমান ও চেতন মনের চিন্তার কথাগুলিই বলে যায়। কিন্তু ক্রমশ সে ধীরে ধীরে তার বিস্মৃত অতীতে এবং অচেতন মনের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতায় চলে যায় এবং তার সেই বিবরণের মধ্যে দিয়ে তার অতীতের অপূর্ণ কামনা ও অবদমিত অভিজ্ঞতার তথ্যগুলি আত্মপ্রকাশ করে। মনঃসমীক্ষক এই সকল তথ্য থেকে তার মানসিক দ্বন্দ্বটির নিখুঁত একটি ছবি পান এবং তাই থেকে তার মনোবিকার দূর করার উপায় নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতিটিকে ফ্রয়েড অবাধ অনুষঙ্গ[1] নাম দিয়েছেন। কেননা এখানে ব্যক্তির এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় অনুষঙ্গ স্থাপনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা হয় না। ব্যক্তির চিন্তাধারা তার সহজ ও অবাধিত অগ্রগতির পথ ধরে এগোতে পারে। যদিও এ পদ্ধতিতে অনুষঙ্গ যথেষ্ট অবাধিত, তবু এটিকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত বা বাধাহীন বলা চলে না, কারণ চিকিৎসকের উপস্থিতি ও তাঁর নির্দেশদান, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য, নিজের রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্যক্তির অনুষঙ্গকে প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

বর্তমানে মনঃসমীক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতির সাহায্যে ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনোবিকারের কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসায় অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ করেছেন। তবে একথাও সত্য যে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট আয়াসবহুল এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ এবং বিশেষধর্মী শিক্ষণ ছাড়া এই পদ্ধতিটি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা দুরূহ।

অচেতনের মনোবিজ্ঞান[1] ও শিক্ষক

পূর্বে মন বলতে একমাত্র সচেতন মনকেই বোঝাত। শিশুর কাজকর্ম আচরণ সবই মনে করা হত সচেতন মনের চিন্তা বা ইচ্ছা থেকে প্রসূত। অতএব তার সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যাও যেমন তার সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা দেওয়া হত তেমনই তার আচরণের সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্যও তার এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্য-গুলিকে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হত। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে তার মনের অসৎ কোন ইচ্ছা বা শাস্তি এড়াবার জন্যই মিথ্যা কথা বলছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে মনে করা হত যে সে লোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করছে। আবার যদি কোন ছেলে ক্লাস থেকে পালাত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে নিশ্চয় পড়াশোনায় অমনোযোগী বা অসৎসঙ্গের প্রভাবে সে পড়ায় অবহেলা করছে। এই সব দুষ্কৃতকারীদের

1. Psychology of Unconsious

সংশোধনের জন্যও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা হত। অর্থাৎ যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে তার মনের অসৎ ইচ্ছাকে দমন করা বা তার মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করা হত। যে ছেলে চুরি করত তাকে তার লোভ দমন করার শিক্ষা দেওয়া হত বা যাতে সে চুরি করার সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করা হত। তেমনই যে ছেলে ক্লাস পালাত সে ছেলে যাতে ক্লাস পালাবার সুযোগ আর না পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হত। শিক্ষকদের এই সংশোধনমূলক প্রচেষ্টায় দুটি বস্তুর সাহায্য ব্যাপকভাবে নেওয়া হত—শাস্তি এবং পুরস্কার। যাতে ছেলেমেয়েদের দুষ্কৃতির দিকে প্রবণতা না দেখা দেয় সেজন্য শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্ত্ররূপে সর্বত্রই ব্যবহার করা হত।

কিন্তু যেদিন থেকে আমরা অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলাম সেদিন থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে মনের আচরণের যে ব্যাখ্যা এতদিন আমরা দিয়ে এসেছি সে ব্যাখ্যা নিতান্তই ভুল ও অসম্পূর্ণ। আমাদের আচরণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আমাদের অচেতন মনই, আমাদের সচেতন মন নয়। শিশুর সচেতন মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে সেটি অবদমিত হয়ে তার অচেতন মনে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে সেটি অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু তার বিভিন্ন সচেতন আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তাধারা, আচরণ, মনোভাব প্রভৃতির স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত করে।

উদাহরণস্বরূপ যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে নিছক অসৎ ইচ্ছায় বা শাস্তির ভয়ে যে তা বলছে তা না হতেও পারে। হয়ত তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক পথে তৃপ্ত না হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। তেমনই যে ছেলে চুরি করছে সেও হয়ত তার অতৃপ্ত সঞ্চয়ের চাহিদা কিংবা প্রত্যাখ্যাত স্বীকৃতির চাহিদাকে তৃপ্ত করার জন্য চুরি করছে। যে ছেলে ক্লাস পালাচ্ছে সেও হয়ত ক্লাসে তার কৌতূহল তৃপ্তির যথেষ্ট উপাদান না পাওয়ার ফলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে তার কৌতূহল তৃপ্তির জন্য। এই সব ছেলেমেয়েদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অপসঙ্গতিসম্পন্ন[1] শিশু বলা হয়ে থাকে। এরা স্বাভাবিক পন্থায় নিজেদের চাহিদার তৃপ্তি করতে না পেরে অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করে সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি পেতে। এতদিন এই সব ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গতানুগতিক পন্থাতেই দিয়ে আসা হয়েছে এবং এদের সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহ্যিক উপায়ে। কিন্তু সে সব চিকিৎসা হয়েছে নিছক লক্ষণভিত্তিক[2]। অর্থাৎ সেখানে কেবলমাত্র তাদের সমস্যার বাহ্যিক লক্ষণগুলিই দূর করার চেষ্টা হয়েছে, প্রকৃত রোগ নিরাময় করার চেষ্টা হয় নি। যে ছেলে ক্লাস থেকে পালাচ্ছে বা চুরি করছে তাকে কড়া শাসনে রাখলে হয়ত ঐ কাজগুলি সে আর করতে পারবে না, কিন্তু তাতে তার চাহিদার তৃপ্তি

1. Maladjusted 2. Symptomatic

হবে না বা মনের অন্তর্দ্বন্দ্বও দূর হবে না। ফলে তার অতৃপ্ত চাহিদা অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে অভিব্যক্ত হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বর্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করার ফলে শিক্ষকেরা শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের সত্যকারের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা এখন বুঝছেন যে শিশুর অপসঙ্গতির যে মূল কারণটি তার অচেতনের গভীর স্তরে নিহিত আছে যতক্ষণ সেটিকে দূর করা না হচ্ছে ততক্ষণ শিশুর অপসঙ্গতিও দূর হবে না। ফলে আজকাল শিশুর সমস্যামূলক আচরণের চিকিৎসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলগত, নিছক লক্ষণগত নয়। সমস্যাসম্পন্ন শিশুকে আজকাল আর শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক বিধিনিষেধের কড়া বাঁধনে বেঁধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় না, তাদের সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার আয়োজন করা হয়। এই কারণেই আজকাল প্রতিটি প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে শিশুদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিশু পরিচালনাগারের[1] সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলের পরিবেশে যাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলি তৃপ্তিলাভ করে এবং যাতে শিশু সুসঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্কার মানবমনের বহু শতাব্দীর বন্ধ দরজাটি আজ খুলে দিয়েছে। শিক্ষক আজ শিশুর মনের নানা জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মানুষের বহু আচরণই বাহ্যত নির্দোষ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তর্নিহিত অসামাজিক চাহিদা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সেগুলি জন্মে থাকে। অনেক সময় অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্সও আমাদের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই সব আচরণকে মনঃসমীক্ষণে প্রতিরক্ষণ কৌশল[2] বলা হয়। এই কারণে শিশুর কোন আচরণকেই আজকাল আর তার বাহ্যিক লক্ষণ বা স্বরূপের দ্বারা বিচার না করে তার অন্তর্নিহিত গুপ্ত কারণটি বা উদ্দেশ্যটিকে খুঁজে বার করে তার পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

অচেতনের মনোবিজ্ঞান যেমন একদিকে সাধারণ সমস্যামূলক আচরণের ব্যাখ্যা দেয়, তেমনই গুরুতর মনোবিকারের কারণেরও সন্ধান দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতনে। লিবিডোর সংবন্ধন ও প্রত্যাবৃত্তি, শৈশবকালীন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মানসিক ঘটনাগুলিই যে মনোবিকারের প্রকৃত কারণ, এ সত্যের সঙ্গে শিক্ষক আজ পরিচিত হয়েছেন। ফলে যাতে শিশুর জীবনে এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিক তিনি যত্ন নিতে পারেন।

1. Child Guidance Clinic 2. Defence Mechanism :: পৃষ্ঠা ৪১৭

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার অচেতন মনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কামনাবাসনার তৃপ্তির তাগাদা এবং বাস্তব জগতের অনুশাসন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু এবং যেভাবে ব্যক্তি সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে ততটুকু এবং সেইভাবে তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু শিক্ষকের জানা থাকলে তিনি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

এছাড়াও মনঃসমীক্ষণের কাছ থেকে আমরা আরও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই সব তথ্য আধুনিক শিক্ষকের কাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের সুবিপুল অবদান থেকে তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে।

শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের অবদান

শিক্ষার নতুন সংব্যাখ্যান ও আধুনিক পদ্ধতির নির্ণয়ে মনঃসমীক্ষণের অবদান যত বেশী, মনোবিজ্ঞানের অন্য কোন শাখার অবদান বোধ করি তত বেশী নয়।

মনঃসমীক্ষণের গবেষণায় মানব মনের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ এত দিন অজানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তার ফলে শিশুকে মানুষ করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলি একেবারে বদলে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে হোক্, আর পরোক্ষভাবে হোক্, পূর্ণভাবে হোক্ আর আংশিকভাবেই হোক্, সব দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই মনঃসমীক্ষণের মৌলিক তথ্যগুলি অনুপ্রবেশ করেছে এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রচুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

শিক্ষা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে মনঃসমীক্ষণ কোন্ কোন্ দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। শৈশবের গুরুত্ব[1]

মনঃসমীক্ষণের সবচেয়ে বড় অবদান হল শৈশবের উপর গুরুত্ব স্থাপন। আগে মনে করা হত যে শৈশবের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ব্যক্তির পরিণত জীবনে থাকে না। কিন্তু বর্তমান মনঃসমীক্ষণের নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শৈশবই জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার অধিকাংশ সংগঠনই প্রস্তুত হয়ে যায় তার জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে। অতএব শিশু তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা না পায় এবং যাতে তার ক্রমবিকাশ স্বাস্থ্যময় ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে সেটা দেখাই শিক্ষার প্রধান কাজ।

২। আচরণ সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা

শিক্ষার্থীদের সমস্যামূলক আচরণ এবং দুষ্কৃতির একটি নতুন ব্যাখ্যা মনঃসমীক্ষণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। পূর্বে শিক্ষার্থীদের অপরাধধর্মী বা নীতি-

1. Importance of Infancy

বিরোধী আচরণগুলিকে সাধারণ গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হত এবং সেগুলির প্রতিকারও করা হত গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী। যেমন, কেউ মিথ্যা কথা বললে তাকে শাস্তি বা পুরস্কারের সাহায্যে সত্য কথা বলতে প্ররোচিত করা হত। কেউ ক্লাস থেকে পালালে ভবিষ্যতে যাতে সে ক্লাস থেকে না পালাতে পারে তার জন্য তার উপর কড়া নজর রাখা হত, ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের চিকিৎসাগুলি সম্পূর্ণ লক্ষণভিত্তিক। অর্থাৎ এসব পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণেরই চিকিৎসা করা হয়, প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করা হয় না। কিন্তু সত্যকারের রোগের চিকিৎসা করতে হলে যেতে হবে রোগের মূলে। সেখানে দেখা যাবে যে কোন বিশেষ মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কোন অবদমিত কামনা শিশুকে ঐ ধরনের অস্বাভাবিক কাজ করতে বাধ্য করছে এবং ঐ অপরাধপ্রবণতা তখনই দূর হবে যখন শিশুর ঐ মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে বা তার অপূর্ণ কামনা তৃপ্তিলাভ করবে। লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের লক্ষণ দূর হতে পারে, কিন্তু রোগ দূর হয় না।

যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে বা চুরি করছে, হয়ত সেটা সে করছে তার অতৃপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাটি পরিতৃপ্ত করতে। সে হয়ত লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে পারছে না, তার ফলে সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি সে পাচ্ছে না। আর তার জন্যই সে মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা বা অন্য কোন অস্বাভাবিক আচরণের মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করছে। অতএব এই ছেলেটির চিকিৎসা করতে হলে তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রথমে দূর করতে হবে এবং তার জন্য তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাটি যাতে স্বাভাবিক পথে তৃপ্তিলাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই জন্ম নিয়েছে সাইকিয়াট্রি[1] বা মনশ্চিকিৎসা নামক সাম্প্রতিক শাস্ত্রটি এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের[2] আধুনিক ধারণাটি।

৩। মানসিক নির্ধারণবাদ[3]

মনঃসমীক্ষণের দেওয়া মানসিক সংগঠনের পরিকল্পনাটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে অচেতনের নতুন পরিকল্পনাটি মানব আচরণের ব্যাখ্যায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। ব্যক্তির আচরণ যে কেবলমাত্র তার সচেতন মনের চিন্তা, ইচ্ছা এবং ধারণা থেকেই জন্মায় না, বরং তার প্রত্যেকটি আচরণের চরম নির্ণায়ক ও নির্ধারক হল তার অচেতন মনের অদৃশ্য শক্তিগুলি—এই অভিনব তথ্যটি আজ আমাদের হস্তগত হওয়ায় শিক্ষাপদ্ধতির রাজ্যেও যুগান্তর দেখা দিয়েছে। এই তত্ত্বটির নাম দেওয়া হয়েছে মানসিক নির্ধারণবাদ। এই তত্ত্বটির পরিপ্রেক্ষিতে মানব আচরণের স্বরূপ নির্ণয়ও সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে।

1. Psychiatry 2. Mental Hygiene 3. Psychic Determinism

৪। মানসিক দ্বৈততা[1]

মনঃসমীক্ষণের আর একটি অবদান হল মানব মনের চিরন্তন দ্বৈততাকে ব্যক্ত করা। মানুষের মনে বহু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শক্তি পাশাপাশি থেকে তার সমস্ত বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এরস[2] হল জীবন ও ভালবাসার শক্তি, তার পাশেই রয়েছে থ্যানাটস[3], ধ্বংস ও মৃত্যুর শক্তি। ইদম্ অন্ধ ও যুক্তিহীন, নগ্ন কামনার প্রতিমূর্তি। তার পাশে থেকে কাজ করেছে অহম্, আমাদের বাস্তব সচেতন মন ও বিচারবুদ্ধির বাহক। অতএব মানুষের আচরণের মধ্যে বৈষম্য ও স্ববিরোধিতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। মানব মনের এই বিপরীতধর্মী প্রবণতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ।

৫। শৈশবকালীন যৌনতা[4]

শৈশবকালীন যৌনতার তত্ত্বটি মনঃসমীক্ষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শৈশবে শিশুর ব্যক্তিসত্তা নির্ণয়ে যৌনশক্তির প্রভাবই যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এ মূল্যবান তথ্যটি প্রথম মনঃসমীক্ষণই উপস্থাপিত করে। অবশ্য ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে মানব আচরণের সকল স্তরেই যৌনতাই একমাত্র শক্তি। এই মতবাদটি আজ সর্বজনস্বীকৃত না হলেও মানব আচরণের নির্ধারক রূপে যৌনতা যে একটি প্রবল শক্তি এ কথাটি আজকাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এই জন্যই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর যৌন চাহিদাকে আর অবহেলা করা হয় না বরং সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনার মধ্যে দিয়ে সেটির তৃপ্তির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই কারণেই যৌনশিক্ষা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

৬। প্রক্ষোভমূলক শক্তি[5]

মনঃসমীক্ষণে প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, অনুভূতি আবেগধর্মী শক্তিগুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে যুক্তিমূলক ইচ্ছা, অভ্যাস, রিফ্লেক্স প্রভৃতিকেই আচরণের প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রকৃতপক্ষে মানব আচরণ নির্ণয়ে ঐগুলির বিশেষ ক্ষমতা নেই এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রক্ষোভমূলক শক্তিগুলিই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে অবদমিত করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৭। অচেতন প্রেষণা[6]

আমাদের আচরণের পিছনে যে প্রেষণা বা ইচ্ছা থাকে সেটির প্রকৃত স্বরূপ যে প্রায়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি মনঃসমীক্ষণের আর একটি

1. Mental Duality 2. পৃঃ ৪০৭ 3. পৃঃ ৪০৭ 4. Infantile Sexuality
5. Emotional Forces 6. Unconscious Motivation

অবদান। এর অর্থ হল যে আমাদের বহু আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অচেতন প্রেষণার দ্বারা। যেমন প্রতিক্ষেপণ, অপব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের প্রকৃত উৎসটি নিহিত থাকে আমাদের অচেতনের কোন অজ্ঞাত কামনায়।

৮। অবদমন

অবদমনের তথ্যটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অনুশাসন, মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণ, শাস্তির ভয় ইত্যাদি কারণে শিশু তার ইচ্ছাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার অচেতনে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই জন্য সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম কর্মসূচী হল শিশুর বিভিন্ন চাহিদাগুলি যতদূর সম্ভব তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করা এবং যাতে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় তা দেখা।

৯। অবাধ অনুষঙ্গ

সবশেষে শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের একটি বড় অবাধ হল অবদান অনুষঙ্গের পদ্ধতি এবং তার অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বটি। মনঃসমীক্ষণই প্রথম ব্যাপক পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করে যে সকল প্রকার মানসিক বিকারের মূলে আছে অচেতনের অবদমিত বাসনা এবং সেই অবদমিত বাসনাটিকে বাইরে অভিব্যক্ত হতে দেওয়াই ব্যক্তির মনোবিকারের মুখ্য চিকিৎসা। আর অবদমিত চিন্তা বা কামনাকে বাইরে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটিই সর্বাপেক্ষা কার্যকর।

১০। যৌনশিক্ষা

মনঃসমীক্ষণের আধুনিক আবিষ্কার থেকেই সাম্প্রতিক কালের যৌনশিক্ষাকে প্রাপ্তযৌবনদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সব দেশের শিক্ষাবিদরা উপলব্ধি করেছেন যে যৌনতা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং তার ফলে যৌনমূলক শিক্ষা দেওয়াটা শিশুর ব্যক্তি-সত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

অনুশীলনী

১। শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের স্থান ও প্রভাব বর্ণনা কর।

২। কিভাবে অচেতনের মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অস্বাভাবিক বা সমস্যামূলক আচরণ বুঝতে সাহায্য করে? উদাহরণের সাহায্যে উত্তর দাও।

৩। ব্যক্তির আচরণের উপর অচেতনের প্রভাব বর্ণনা কর। মানসিক নির্ধারণবাদ বলতে কি বোঝ?

৪। ফ্রয়েডের পরিকল্পনা অনুযায়ী মনের স্তরবিভাগটি বর্ণনা কর।

৫। লিবিডোর অগ্রগতির স্তরগুলি বর্ণনা কর। ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সঙ্গে সেগুলির কি সম্পর্ক বল।

৬। প্রতিরক্ষণ কৌশল কাকে বলে? কয়েকটি এই ধরনের কৌশল বর্ণনা কর। এগুলিকে সঙ্গতিবিধানের কৌশলও বলা হয় কেন?

৭। মনোবিকারের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণের অবদানটি আলোচনা কর।

৮। ফ্রয়েডের পরিকল্পিত ইদ্‌ম্, অহম্ ও অধিসত্তার স্বরূপ ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। বিবেককে অধিসত্তার দান বলা হয়েছে কেন?

৯। অহম্‌কে তিন প্রভুর সেবা করতে হয়, এই উক্তির ব্যাখ্যা কর।

১০। নিউরসিস বা মনোবিকার সৃষ্টির কারণাবলী বর্ণনা কর।

১১। কমপ্লেকস কাকে বলে? প্রধান কয়েকটি কমপ্লেক্সের বর্ণনা দাও।

১২। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের অবদান সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লেখ।

১৩। টীকা লেখ :—

(ক) অবদমন (খ) অবাস্তব কল্পনা (গ) দিবাস্বপ্ন (ঘ) অভেদীকরণ (ঙ) মানসিক নির্ধারণবাদ (চ) শৈশবকালীন যৌনতা (ছ) কমপ্লেক্স (জ) ইডিপাস কমপ্লেক্স (ঝ) অপব্যাখ্যান (ঞ) অবাধ অনুষঙ্গ

চিন্তন

যে প্রক্রিয়াগুলিকে আমরা সাধারণত মানসিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করে থাকি সেগুলির মধ্যে চিন্তন[1] একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। শিখনের সঙ্গে চিন্তনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা যা শিখি তাই নিয়েই চিন্তা করি। তবে চিন্তন প্রক্রিয়াটি শেখা বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার নিজস্ব ক্ষমতার বলে সে শিখনের গণ্ডী ছাড়িয়ে চলে যায় এবং সময় সময় নতুন বস্তু বা তথ্য উদ্ভাবনের[2] পর্যায়ে গিয়ে ওঠে। তখন সেই চিন্তন থেকেই নতুন শিখন ঘটে থাকে।

যখন আমরা আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে কোন বস্তু সম্বন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করি তখন তাকে প্রত্যক্ষণ[3] বলি। প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষিত বস্তু[4] বলা হয়। একই বস্তু নিয়ে আমরা চিন্তন করি, আবার সেটিকে প্রত্যক্ষণও করি। কিন্তু চিন্তনের বিষয়বস্তু এবং প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। যেমন, সামনের টেবিলের উপর রাখা বইটি প্রত্যক্ষণ করতে হলে বইটির সেখানে থাকা দরকার। কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে কোন বাস্তব বই আমাদের সামনে না থাকলেও সেটি নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি।

এর কারণ হল যে চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত বস্তুটির স্থানে অন্য একটি বস্তু দিয়ে কাজ চালাই। বই সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষিত বইটির পরিবর্তে আমরা বইয়ের একটি প্রতীক[5] বা চিহ্ন[6] নিয়েই কাজ চালিয়ে থাকি। এই প্রতীক বা চিহ্ন যদিও প্রত্যক্ষিত বস্তুটির মত নিখুঁত নয় তবুও আমাদের কাজ চালানোর পক্ষে এটি যথেষ্ট।

মানবমনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বস্তু তার প্রত্যক্ষের গোচরে না থাকলেও সেই বস্তুটির একটি মানসিক রূপ সে মনে মনে বহন করতে পারে এবং তার সাহায্যে তার প্রয়োজনমত আচরণ সম্পন্ন করতে পারে। প্রত্যক্ষণের গোচরীভূত নয় এমন কোন বস্তুর পরিবর্তে যে বস্তুটিকে আমরা মনে মনে বহন করি সেটিকে এক কথায় প্রতীক বলা হয়। এই প্রতীক নানা রকমের হতে পারে যেমন, ধারণা, প্রতিরূপ, ভাষা ইত্যাদি। প্রত্যক্ষিত বস্তুর পরিবর্তে আমরা প্রতীকের ব্যবহার করি বলেই প্রত্যক্ষিত বস্তুর উদ্দেশ্যে আমরা সাধারণত যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন

---

1. Thinking 2. Inventing 3. Perception 4. Percept 5. Symbol 6. Sign

করে থাকি প্রতীকের প্রতিও আমরা অনেকটা সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করি। প্রিয়জনকে দেখলে যেমন আনন্দ হয় তার সম্বন্ধে চিন্তা করলে বা তার চেহারা মনে পড়লেও তেমনই আনন্দ হয়। অতএব চিন্তনকে আমরা সেই আচরণ বলে বর্ণনা করতে পারি যেখানে প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। কিংবা এক কথায় চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ[1]।

সাধারণ আচরণ ও প্রতীকমূলক আচরণ

সাধারণ আচরণ এবং চিন্তন বা প্রতীকমূলক আচরণের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সাধারণ আচরণের ক্ষেত্রে প্রথমে হয় উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ, তা থেকে জাগে স্নায়ুঘটিত উত্তেজনা, সে উত্তেজনা গিয়ে পেঁছয় মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক থেকে আবার উত্তেজনা নেমে আসে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে এবং তখনই ঐ আচরণটি সম্পন্ন হয়। এই স্তরটিকে আমরা প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তামূলক স্তর বলতে পারি এবং এই স্তরে আচরণ সম্পাদনের সোপানগুলি হল নিম্নরূপ।

উদ্দীপক—→প্রত্যক্ষণ—→উত্তেজনা—→সক্রিয়তা

প্রতীকমূলক স্তরটিকে এই প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তামূলক স্তরের উপর অধিস্থাপিত দ্বিতীয় আর একটি স্তর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রতীকমূলক স্তরটি
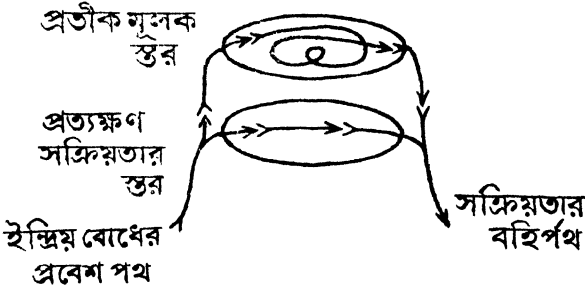
[গিলফোর্ডের পরিকল্পিত আচরণের প্রতীকমূলক স্তরের চিত্ররূপ]

যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাণী যখন চিন্তা করতে সুরু করে তখন নিম্নস্তরে বা প্রত্যক্ষণের স্তরে যে আচরণগুলি সংঘটিত হয় সেগুলি তখন তার চিন্তার স্তরে বা প্রতীকমূলক স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু আচরণগুলি প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে সংঘটিত হয় না, সেহেতু সেগুলির দৈহিক অভিব্যক্তি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে এবং সম্ভবপর সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যক্তি একের পর এক তার চিন্তার দ্বারা বা প্রতীকের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে। তার ফলে এই বিভিন্ন বিকল্প প্রতিক্রিয়াগুলির দোষ-গুণ, সাফল্য-ব্যর্থতারও বিচার করা সম্ভব হয়। অথচ নিম্নস্তরের মত

1. Thinking is a symbolic behaviour

সেগুলির জন্য কোনরূপ দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না বা কোনও উদ্যমও ব্যয়িত হয় না। কোন সমস্যার সমাধানের প্রতীকমূলক স্তরে যে বিভিন্নধর্মী আচরণগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেগুলি যদি আমাদের বাস্তবে সম্পন্ন করতে হত তাহলে তাতে যে কেবলমাত্র প্রচুর সময় লাগত তাই নয়, যে পরিমাণ দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হত সেটা একজনের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। তা ছাড়া এমন অনেক আচরণই চিন্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, যেগুলি বাস্তবে সম্পন্ন করতে গেলে ব্যক্তিকে রীতিমত বিপদ্‌জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত।

সমস্যার সমাধানে সাধারণত বাস্তবে যে সব প্রচেষ্টা-ও-ভুলের আচরণের সাহায্য আমাদের নিতে হয় চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা প্রতীকের সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারি এবং তার ফলে প্রচুর উদ্যম ও প্রচেষ্টার অপচয় থেকে রেহাই পাই। চিন্তন এই জন্যই উন্নত, আয়াসহীন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় প্রাণীর পরম সহায়ক।

চিন্তনের বিভিন্ন প্রতীক

চিন্তনের উপকরণ হল প্রতীক। প্রতীক নানা প্রকারের হতে পারে, যথা পেশীঘটিত প্রস্তুতি[1], প্রতিরূপ[2], ধারণা[3], ভাষা[4] ইত্যাদি।

পেশীঘটিত প্রস্তুতি

প্রতীকমূলক আচরণের সরলতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায় বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার[5] পরীক্ষণগুলিতে। এই পরীক্ষণগুলি সাধারণত নিম্নশ্রেণী প্রাণীদের নিয়েই করা হয়ে থাকে। প্রাণীটির সামনে কিছুটা দূরে তিনটি খাবারের বাক্স পাশাপাশি রাখা হয়। প্রত্যেক বাক্সটির উপর একটি করে আলো থাকে। প্রাণীটিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে যে বাক্সটির আলো জ্বালা হবে সেই বাক্সটির দিকেই সে খাবারের জন্য ছুটে যাবে। এবার প্রাণীটিকে কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে রাখা হল এবং তারপর একটি বাক্সের উপর আলোটা জেবলে নিবিয়ে দেওয়া হল। প্রাণীটিকে তখনই কিন্তু বাক্সের দিকে ছুটে যেতে দেওয়া হল না। কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর প্রাণীটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। এখন প্রাণীটিকে যদি ঠিক বাক্সটিতে পৌঁছতে হয় তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে কোন্ বাক্সটির উপর আলোটি জ্বলেছিল। দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীরা কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানেও ঠিক বাক্সটিতে পৌঁছতে পেরেছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে প্রাণীটি আলো জ্বালার কোন একটি বিশেষ প্রতীক মনে মনে সংরক্ষণ করে রেখেছিল এবং পরে তিনটি বাক্সের মধ্যে থেকে প্রকৃত বাক্সটি সেই প্রতীকের সাহায্যেই সে খুঁজে

1. Muscular Set 2. Image 3. Concept 4. Language 5. Delayed Reaction

বার করেছিল। মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই ক্ষেত্রে প্রাণী যে বস্তুটি প্রতীকরূপে তার মনে মনে বহন করে সেটি হল ঐ বিশেষ বাক্সটির দিকে ছুটে যাবার জন্য একটি দৈহিক পেশীঘটিত প্রস্তুতি। এই পেশীঘটিত প্রস্তুতির প্রতীকটি মনে মনে বহন করা ও পরবর্তী আচরণে সেটি প্রয়োগ করাকে চিন্তনের সরলতম রূপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তন প্রক্রিয়া বিদ্যমান আছে তবে তা অত্যন্ত সরলরূপে।

প্রতিরূপ

চিন্তনের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের নাম প্রতিরূপ। প্রত্যক্ষিত বস্তুর ছবি বা অনুলিপিকে প্রতিরূপ বলা হয়। প্রত্যক্ষিত বস্তুর অনুকরণ হলেও প্রতিরূপ প্রকৃতিতে দুর্বল, অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। তবে স্পষ্টতা এবং সম্পূর্ণতার দিক দিয়ে প্রতিরূপ নানা স্তর ও শ্রেণীর হতে পারে। কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিরূপ আমাদের কাছে এত স্পষ্ট হতে পারে যে সেটি প্রত্যক্ষণের সমপর্যায়ের হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন কোন প্রতিরূপ সে তুলনায় খুবই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ

যে কোন ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাই প্রতিরূপের আকারে আমাদের মনে সংরক্ষিত হতে পারে। ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা প্রধানত পাঁচ রকমের হতে পারে। অতএব প্রতিরূপও পাঁচ রকমের হতে পারে, যথা চাক্ষুষ[1], শ্রবণমূলক[2], স্পর্শজ[3], ঘ্রাণজ[4] এবং স্বাদজ[5]। এ ছাড়াও তাপমূলক[6], চাপ[7], বেদনা[8], সঞ্চালনমূলক[9] প্রভৃতি আরও কয়েক শ্রেণীর ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করে থাকি। অতএব সেগুলি থেকে প্রসূত প্রতিরূপগুলিও আমাদের চিন্তায় স্থান পায়। প্রতিরূপগুলি আবার সাধারণত মিশ্র অবস্থায় আমাদের মনে দেখা দেয়। যেমন, সমুদ্রের ঢেউয়ের চাক্ষুষ প্রতিরূপের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দে প্রতিরূপ। বরফের দেশের ছবি মনে জাগলে শীতল স্পর্শের অনুভূতিটিও তার সঙ্গে মনে আসে। গোলাপের কথা ভাবলে তার সুমিষ্ট গন্ধের প্রতিরূপটি আমাদের মনে জাগে। কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রতিরূপের বহুল ব্যবহার।

যদিও সব রকম প্রতিরূপই সকলের মধ্যে আছে তবু প্রত্যেকেই তার অধিকাংশ চিন্তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য কোনও বিশেষ শ্রেণীর প্রতিরূপের সাহায্য নেয়। সাধারণত বেশীর ভাগ লোকই চাক্ষুষ প্রতিরূপের উপর নির্ভর করে চিন্তন করে। কিন্তু আবার এমন লোক আছে যে হয় শ্রবণমূলক কিংবা স্পর্শজ বা অন্য কোন প্রতিরূপের উপর বেশী নির্ভরশীল। সাধারণত চিত্রকরেরা চাক্ষুষ প্রতিরূপ বা সুরকারেরা শ্রবণমূলক প্রতিরূপেরই উপর নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু এমন অনেক

1. Visual 2. Auditory 3. Tactual 4. Olfactory 5. Gustatory 6. Thermal 7. Pressure 8. Pain 9. Kinaesthetic

চিত্রকর আছেন যাঁরা চাক্ষুষ প্রতিরূপের সাহায্য না নিয়ে অন্য কোন প্রতিরূপের সাহায্যে কাজ করেন। আবার তেমনই অনেক সুরকারও শ্রবণমূলক প্রতিরূপের পরিবর্তে অন্য কোন প্রতিরূপের উপর নির্ভর করে থাকেন।

অনুবেদন

যখন কোন প্রত্যাক্ষিত বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরও আমাদের মধ্যে বস্তুটির সংবেদন থেকে যায় তখন ঐ অভিজ্ঞতাটিকে অনুবেদন বলা হয়। ইংরাজীতে যদিও এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে আফটার ইমেজ[1] বা পশ্চাদ্‌ প্রতিরূপ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তবু এটি আসলে প্রতিরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রত্যাক্ষিত বস্তুর সংবেদনেরই বিলম্বনের একটি ক্ষেত্র বিশেষ। অর্থাৎ প্রত্যাক্ষিত বস্তুটিকে ইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে অপসারিত করার পরও কিছুক্ষণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে সংবেদনটি থেকে যায়। সেজন্য এটিকে অনুবেদন বলাই ঠিক।

সমবর্ণ এবং অসমবর্ণ অনুবেদন

অনুবেদন দু'শ্রেণীর হতে পারে, সমবর্ণ[2] এবং অসমবর্ণ[3]। যখন অনুবেদনে দৃষ্ট রঙগুলি প্রকৃত প্রত্যাক্ষিত বস্তুটির রঙের সঙ্গে অভিন্ন থাকে তখন তাকে সমবর্ণ অনুবেদন[4] বলা হয়। আর যখন অনুবেদনে দৃষ্ট রঙটি প্রত্যাক্ষিত বস্তুটির রঙ না হয়ে তার প্রতিপূরক রঙ হয় তখন তাকে অসমবর্ণ অনুবেদন[5] বলা হয়। নীচে অসমবর্ণ অনুবেদনের একটি পরীক্ষণ বর্ণিত হল।

অসমবর্ণ অনুবেদন

এক টুকরো গাঢ় লাল রঙের কাগজের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যদি আমাদের দৃষ্টি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা সাদা দেওয়াল বা সাদা পর্দার উপর ফেলা যায় তবে দেখা যাবে যে আমরা সেই লাল রঙের টুকরোটির পরিবর্তে নীল-সবুজ রঙের একটি টুকরো ঐ দেওয়াল বা পর্দাটির উপর দেখতে পাচ্ছি। এখানে লাল রঙের কাগজের টুকরোটি আমাদের সামনে না থাকা সত্ত্বেও ঐ বস্তুটির সংবেদন ঠিকই রইল। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যাক্ষিত বস্তুটির রঙ অর্থাৎ লাল রঙের বদলে তার প্রতিপূরক রঙ অর্থাৎ নীল-সবুজ রঙটি দেখা গেল। এটি অসমবর্ণ অনুবেদনের একটি দৃষ্টান্ত। অসমবর্ণ অনুবেদনে সব সময় প্রতিপূরক রঙই দেখা যায়।

প্রতিপূরক রঙ

সূর্যের আলো যখন একটি প্রিজম্‌ বা আট-কোণওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় তখন সেই সোদা আলোটি ভেঙে সাতটি বিভিন্ন রঙে পরিণত হয়। এই সাতটি রঙকে বর্ণালী[6] বলা হয়। এই রঙগুলির প্রত্যেকটির একটি করে প্রতিপূরক রঙ[7] আছে। যখন দুটি রঙকে এক সঙ্গে মেশালে দুটিতে মিশে সাদা

---

1. After Image 2. Positive 3. Negative 4. Positive After Image
5. Negative After Image 6. Spectrum 7. Complimentary Colour

রঙের সৃষ্টি হয়, তখন সেই রঙ দুটিকে পরস্পরের প্রতিপূরক রঙ বলা হয়। যেমন লাল এবং নীল-সবুজ রঙ পরস্পরের প্রতিপূরক। অর্থাৎ লাল এবং নীল-
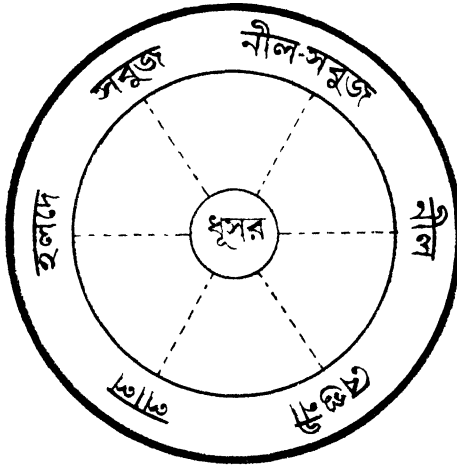
(প্রতিপূরক রঙের চক্রাকার তালিকা)

সবুজ রঙ মিশে সাদা রঙ তৈরী করে। তেমনই হলদে ও নীল রঙ পরস্পরের প্রতিপূরক রঙ। উপরে প্রতিপূরক রঙগুলির একটি চক্রাকার তালিকা দেওয়া হল। চক্রে অবস্থিত বিপরীত রঙগুলি পরস্পরের প্রতিপূরক। অসম অনুবেদনে প্রত্যক্ষিত বস্তুর যা রঙ তার পরিবর্তে তার প্রতিপূরক রঙটি দেখা যায়। যেমন, প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ যদি সবুজ হয় তাহলে অসমবর্ণ অনুবেদনে বেগুনে রঙ দেখা যাবে। কিংবা প্রত্যক্ষিত বস্তুর রঙ নীল হলে অসমবর্ণ অনুবেদনে সেটি হলুদ রঙে দাঁড়াবে। উপরে বর্ণিত পরীক্ষণের সাহায্যে এই ঘটনাগুলি প্রমাণিত করা যায়।

সমবর্ণ অনুবেদন

সমবর্ণ অনুবেদনের দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব বেশী পাওয়া যায় না। খুব তীব্রভাবে যদি দৃষ্টিশক্তিকে উত্তেজিত করা যায় তবে সমবর্ণ অনুবেদনের সৃষ্টি হয়। উজ্জ্বল একটি একশ বাতির আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকলে বা চোখ বন্ধ করলে ঠিক সেই সাদা আলোটির একটি সমবর্ণ প্রতিরূপ দেখা যাবে। সমবর্ণ অনুবেদন কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয় না।

স্মৃতি প্রতিরূপ

সাধারণত প্রত্যক্ষিত বস্তুর যে সব প্রতিরূপ আমরা মনের মধ্যে সংরক্ষণ করি

এবং চিন্তন বা কল্পনের সময় যেগুলির বহুল ব্যবহার করি সেগুলিকেই স্মৃতি প্রতিরূপ[1] নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, কোন বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে তার মুখখানা আমাদের চিন্তায় ভেসে উঠল। কিংবা নিজের বাড়ীর ছবিটি মনে জাগল বা আগ্রার তাজমহলের প্রতিরূপটি মনে ভেসে উঠল ইত্যাদি। এইগুলিকে সাধারণ প্রতিরূপ বা স্মৃতি প্রতিরূপ বলা হয়।

প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ

প্রতিরূপের এই শ্রেণীবিভাগটি জার্মান পদার্থতত্ত্ববিদ্ ফেকনারের[2] পরিকল্পিত। ফেকনারের মতে যখন আমরা দুটি ভারী জিনিস একটির পর একটি হাতে তুলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ওজনের তুলনা করি তখন আসলে আমরা প্রথম বস্তুটির একটি প্রতিরূপের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুটির প্রত্যক্ষণের তুলনা করে থাকি। এখানে প্রথম বস্তুটির যে প্রতিরূপের সঙ্গে আমরা দ্বিতীয়টির প্রত্যক্ষণের তুলনা করি ফেকনার তার নাম দিয়েছেন প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ[3]। ফেকনারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ এবং সাধারণ স্মৃতি প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ।

পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ

একটি প্রতিরূপ যখন বার বার ঘুরে ঘুরে মনে এসে দেখা দেয় তখন তাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ[4] বলা চলতে পারে। যেমন, অনুবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ খুব ছোট কোন বস্তু দেখলে পরে সেই বস্তুটির ছবি বার বার চোখের সামনে আসা যাওয়া করে।

আইডেটিক প্রতিরূপ[5]

জার্মান মনোবিজ্ঞানী জীনস্কের[6] সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে একটি নূতন ধরনের প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি প্রতিরূপের পরীক্ষণ করতে গিয়ে দেখেন যে কোন কোন ছেলেমেয়ের সামনে থেকে প্রত্যক্ষিত বস্তুটি সরিয়ে নেওয়ার পরও তারা সেই বস্তুটির প্রতিরূপটি অতি নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে। যেমন, একটি ছেলেকে একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বলা হল। তারপর তার সামনে থেকে ছবিটি সরিয়ে নেওয়া হল বা তাকে একটি সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হল। দেখা গেছে যে সে তখন ঐ অপসারিত ছবিটির একটি নিখুঁত প্রতিরূপ সেখানে দেখতে পায় এবং সেই প্রতিরূপ

1. Memory Image 2. Fechner 3. Primary Memory Image 4. Recurrent Image 5. Eidetic Image 6. Jaensch

থেকে ঐ ছবিটির নির্ভুল বর্ণনা করতে পারে। এই ধরনের প্রতিরূপকে আইডেটিক প্রতিরূপ বলা হয় এবং এই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আইডেটিক ব্যক্তি[1] বলা হয়। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষণের সময় যতটুকু দেখে সেইটুকু পরে স্মৃতি থেকে বলতে পারে এবং তাও সম্পূর্ণ বা পরিষ্কার ভাবে বলতে পারে না। কিন্তু আইডেটিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা প্রকৃত প্রত্যক্ষণের সময় যা দেখেনি পরে ঐ বস্তুর প্রতিরূপ থেকে সেই সব বৈশিষ্ট্যেরও নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারে। তারা ইচ্ছা করলে পূর্ব প্রত্যক্ষিত যে কোন বস্তুর প্রতিরূপকে মনে বা কোন পর্দার উপর জাগিয়ে তুলতে পারে এবং সেই প্রতিরূপ থেকে বস্তুটির যে সব খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সে আগে দেখেনি সেগুলিরও বর্ণনা করতে পারে।

সাধারণত আইডেটিক প্রতিরূপ ৬ থেকে ১২ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে সকল ছেলেমেয়েই এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈশিষ্ট্যও চলে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রতিরূপ পরিণত বয়সেও থাকতে দেখা গেছে। জীনস্কের মতে আইডেটিক প্রতিরূপ দেখার এই ক্ষমতাটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির[2] কোন সংগঠনমূলক বৈচিত্র্য থেকে জন্মায়।

প্রতিরূপের ব্যবহার ঃ ঃ প্রতিরূপহীন চিন্তন[3]

আগে মনে করা হত যে চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিরূপের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভবপর। বরং সমস্যামূলক বা তত্ত্বমূলক চিন্তা করতে হলে প্রতিরূপের ব্যবহার সুষ্ঠু চিন্তনের পক্ষে বিঘ্নকরই। গণিত বা দর্শনের উন্নতশ্রেণীর সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করার সময় চিন্তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিরূপবর্জিত হয়ে ওঠে।

তবে প্রতিরূপ যে চিন্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের দৈনন্দিন চিন্তার অবয়বটির অধিকাংশ গঠিত হয় প্রতিরূপের দ্বারা। কোন কিছুর প্রতিরূপ মনের মধ্যে জাগাতে মনের বিশেষ আয়াস লাগে না বলে প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তন সহজ, সুসাধ্য ও দ্রুত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিরূপমূলক চিন্তা নিখুঁত বা নির্ভুল হয় না। তার কারণ হল যে প্রতিরূপমাত্রেই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এর জন্য উন্নত চিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অধিকতর নির্ভুল প্রতীকের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য।

গ্যাল্টনের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের চিন্তনে প্রতিরূপের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। কিন্তু পরিণত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধি-নির্ভর কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাদের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য নয়।

1. Eidetic Person 2, Endocrine Gland ঃঃ পৃঃ ১৬৬ 3, Imageless Thinking

সাধারণত যে সকল ব্যক্তিকে প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গেছে যে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা প্রতিরূপের ব্যবহার মোটেই করেন না। যেমন, এমন অনেক চিত্রকর আছেন যাঁদের তেমন উল্লেখযোগ্য চাক্ষুষ প্রতিরূপই নেই বা এমন অনেক সুরকার দেখা যায় যাঁরা যথেষ্ট শ্রবণমূলক প্রতিরূপ ছাড়াই তাঁদের কাজ চালিয়ে যান। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট প্রতিরূপটিকে বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রতীকের সাহায্য নিয়েই কাজ চালান।

ধারণা

চিন্তনের আর এক শ্রেণীর প্রতীকের নাম হল ধারণা[1]। যখন আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত একাধিক বস্তুর সংস্পর্শে আসি তখন সেগুলির পারস্পরিক বৈষম্য সত্ত্বেও সেগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত মিল বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নিই। যেমন, বহু বিভিন্ন আকৃতি, প্রকৃতি, জাতি ও বর্ণের গরু আমরা দেখে থাকি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিভিন্ন গরুগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে সমভাবে বর্তমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা এক কথায় গো-ত্ব নাম দিতে পারি এবং এই থেকেই তৈরী হয় আমাদের গরু সম্বন্ধে ধারণা। গরুর এই ধারণাটি বিভিন্ন গরুর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তৈরী এবং সেজন্যই দেখা না দেখা সকল গরুর উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য। এইভাবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা গঠন করি।

কোন কিছুর ধারণা গঠন করতে হলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়, যথা, পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ।

১। পৃথকীকরণ[2]

কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে হলে প্রথমে সেই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে বর্তমান অর্থাৎ যেগুলি সমভাবে সকলের মধ্যে থাকে সেগুলিকে পৃথক করে নিতে হয় এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলি অ-সাধারণ বা অবান্তর অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান নয় সেগুলিকে বাদ দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াটিকেই পৃথকীকরণ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে অমিল, তেমনই কয়েকটি অতি মৌলিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল আছে। যেমন, মানুষে মানুষে যতই বৈষম্য থাকুক না কেন, সব মানুষের মধ্যে দৈহিক সংগঠন, শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যাবলী, মৌলিক আচরণ, যুক্তিধর্মিতা, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি

1, Concept 2, Abstraction

বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে বর্তমান। মানুষের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে অ-সাধারণ নয় এমন বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে পৃথক করে নেওয়াই হল ধারণা গঠনের প্রথম সোপান।

২। **সামান্যীকরণ**[1]

একই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেবার পর আমরা ঐ জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত বস্তুগুলির উপর ঐ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করি অর্থাৎ ধরে নিই যে ঐ জাতীয় বা ঐ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্তুরই ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে। একেই সামান্যীকরণ বলে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক পৃথক পৃথক মানুষ দেখে আমরা মানুষের সাধারণ গুণগুলি পৃথক করে নিলাম। কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ আমরা দেখিনি বা দেখা সম্ভবও নয়। এই না দেখা বাকী সমস্ত মানুষের উপর আমাদের পৃথক করা ঐ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করলাম। অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে ঐ সাধারণ গুণগুলি বর্তমান। অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া[2] হল এই সামান্যীকরণের অতি প্রাথমিক রূপ।

পৃথকীকরণের মাধ্যমে আমরা কতকগুলি সমজাতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং সামান্যীকরণের সাহায্যে সেই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে একটি মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্র গঠন করি। এই দুটি প্রক্রিয়া মিলিত না হলে কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে ধারণা গঠন সম্পূর্ণ হয় না।

চিন্তন ও ধারণা

ধারণা চিন্তনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। নিছক প্রতিরূপের সাহায্যে যে চিন্তন সে চিন্তন অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অসংহত প্রকৃতির। তার দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বা মীমাংসায় পৌঁছান যায় না। প্রকৃত কার্যকর চিন্তন ধারণার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা যখন চিন্তা করি যে, মানুষ ঐশ্বর্য ভালবাসে তখন আমরা এই চিন্তনটিতে মানুষ, ঐশ্বর্য ও ভালবাসা, এ তিনটি কথার দ্বারা কোনও বিশেষ মানুষ, বিশেষ ঐশ্বর্য বা বিশেষ ভালবাসাকে বোঝাচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে আমরা সমস্ত মানুষ, সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমস্ত ভালবাসাকে বোঝাচ্ছি। অর্থাৎ এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই এখানে ধারণারূপে আমাদের চিন্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ধারণার সাহায্য ছাড়া কোন অর্থপূর্ণ ও সুসম্পূর্ণ চিন্তনই সম্ভব হয় না। বস্তুত আমরা আমাদের যে কোন উন্নত চিন্তনের ক্ষেত্রেই ধারণার বহুল ব্যবহার করে থাকি। ধারণার সাহায্যে আমরা বহু বিচ্ছিন্ন বস্তুপুঞ্জকে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এই জন্যই সংক্ষিপ্ত একটি চিন্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা অগণিত বস্তুরাশি সম্বন্ধে ভাবতে বা সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। সেই

1. Generalisation 2. পৃঃ ৩২০-পৃঃ ৩২৪

কারণে যে কোন উন্নত চিন্তনেই ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য। শিশুর শিক্ষায় ধারণার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশী ও নির্ভুল ধারণা শিশু গঠন করতে শিখবে ততই তার চিন্তনও নির্ভুল ও কার্যকর হয়ে উঠবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ধারণা গঠনের জন্য শিশুর সুষ্ঠু চিন্তন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠেছে।

শিশুর ধারণার ক্রমবিকাশ

শিশুর ক্ষেত্রে ধারণার সুরু হয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন, প্রথমে সে শুনল তার বাড়ীর সামনের একটি শিউলি ফুলের গাছকে লোকে গাছ বলছে। তারপর আবার শুনল যে টবের গোলাপ ফুলের গাছটিকেও সকলে গাছ বলছে। আবার একদিন সে দেখল যে বিরাট একটি বটগাছকেও সকলে গাছ বলে বর্ণনা করছে। যদিও তিনটি গাছই আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক তবু সে তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল এবং সেগুলির সাহায্যে সে গাছ সম্বন্ধে একটি ধারণা মনে মনে তৈরী করে নিল। তারপর যখন একদিন সে প্রথম একটি পদ্মফুলের গাছ দেখল তখন সে নিজে থেকেই সেটিকে গাছ বলে ধরে নিতে ইতস্তত করল না। এইভাবেই শিশু তার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে। ধারণা গঠন কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। নানা পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও পৃথকীকরণের ও সহজ প্রকৃতির ধারণা গঠনের ক্ষমতা যথেষ্টই আছে।

ধারণা শিখনের পদ্ধতি

শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ হল শিশুকে নির্ভুল ধারণা গঠন করতে শিক্ষা দেওয়া। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার অর্থই হল বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে নির্ভুল ধারণা গঠন করতে সাহায্য করা। অতএব কিভাবে শিশুর মনে ধারণা সৃষ্টি করা যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। সাধারণভাবে ধারণা শিখনের তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। যথা- আরোহণ পদ্ধতি[1], অবরোহণ পদ্ধতি[2] এবং মিশ্র পদ্ধতি[3]।

আরোহণ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে নিজে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি সম্বন্ধে তার ধারণা গড়ে নেয়। এখানে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা হচ্ছে বলে এই পদ্ধতিকে আরোহণ

1. Inductive Method 2. Deductive Method 3. Mixed Method

পদ্ধতি বলা হয়। ধারণা শিখন অন্যান্য শিখনের মত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে সুরু হয় এবং অন্তর্দৃষ্টিতে গিয়ে শেষ হয়ে থাকে।

অবরোহণ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং তারপর তাকে ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে চিনতে সাহায্য করা হয়। এখানে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ও খণ্ডিত অভিজ্ঞতায় যাওয়া হচ্ছে বলে এটিকে অবরোহণ পদ্ধতি বলা হয়। আমাদের অধিকাংশ শিখনই এই পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। শিশুর ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে এই অবরোহণ পদ্ধতিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও কেবলমাত্র এই পদ্ধতিটির উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মিশ্র পদ্ধতি

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আরোহণ এবং অবরোহণ এই দুটি পদ্ধতি একসঙ্গে যুক্ত করে মিশ্র পদ্ধতি নামক একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কোন একটি মাত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেয়ে এই মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা অনেক দিক দিয়ে ভাল। এই মিশ্র পদ্ধতিতে প্রথমে আরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শিক্ষক সেগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বস্তুটি সম্বন্ধে ধারণা গঠনে সাহায্য করেন। তারপর শিক্ষক অবরোহণ পদ্ধতির সাহায্যে সেই ধারণাটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন। এই মিশ্র পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে ধারণাটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান জন্মায়।

ভাষা ও চিন্তন

চিন্তনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চিন্তন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতীক-গুলির মধ্যে ভাষার স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তনে ভাষার স্থান কোথায় তা জানতে হলে আমাদের প্রথমে ভাষার স্বরূপটি ভাল করে জানতে হয়।

ভাষার স্বরূপ

মনের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করার মাধ্যম হল ভাষা। বর্তমানে আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির প্রধানতম উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাষা। ভাষা সাধারণত তিন প্রকারে হয়—কথিত ভাষা, লিখিত ভাষা ও ভঙ্গীগত ভাষা। ভাষা প্রকৃতপক্ষে একটি চিহ্ন মাত্র। আমরা যখন আগুন কথাটি বলি বা লিখি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা

আগুন নামক বস্তুটিকে একটি চিহ্ন দিয়ে জানাই। কথা বলার সময় আমরা যেমনই শব্দমূলক চিহ্নের ব্যবহার করি, লেখার সময় তেমনই চাক্ষুষ কোন চিহ্ন প্রয়োগ করি। ভঙ্গীগত ভাষার বেলাতেও অঙ্গসঞ্চালনমূলক কোন চিহ্ন দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য জানাই।

প্রকৃতপক্ষে ভাষা বলতে বোঝায় চিন্তা বিনিময় করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত চিহ্ন ব্যবহারের প্রণালীবিশেষ। এই চিহ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে ভাষাকে প্রধানত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রথম, স্বভাবিক চিহ্নের ভাষা এবং দ্বিতীয়, কৃত্রিম চিহ্নের ভাষা। স্বাভাবিক চিহ্নমূলক ভাষার ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট বস্তু এবং তার চিহ্নের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি সম্বন্ধ পাওয়া যায়—যেমন দেখা যায় আদিম মানবের ব্যবহৃত চিত্রলিপির ভাষায়। এই ধরনের ভাষার দ্বারা যে বস্তুকে বোঝান হত তার একটি ছবি এঁকে দেওয়া হত। তেমনই আদিম মানুষের ব্যবহৃত ভঙ্গীমূলক ভাষাতেও উদ্দিষ্ট বস্তু বা প্রক্রিয়াটির অনুকরণ করা হত। কৃত্রিম চিহ্নমূলক ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তু ও তার চিহ্নের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। যেমন, আগুন কথাটির সঙ্গে আগুন বস্তুটির কোন আকৃতিগত সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি নিতান্তই বাহ্যিক চিহ্ন ছাড়া আর আর কিছুই নয়। এই ধরনের নামগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে সর্বজনস্বীকৃত হয়ে উঠেছে।

কতকগুলি শব্দ আমাদের দৈহিক ভঙ্গী থেকে জন্মলাভ করেছে। যেমন, হ্যাঁ বা না শব্দ দুটি আদিম মানুষের সর্বদৈহিক ভঙ্গীর একটি পরিবর্তিত ভাষামূলক রূপমাত্র।

চিন্তনে ভাষার ব্যবহার

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তি, বস্তু, কার্য প্রভৃতিকে বোঝানোর জন্যই ভাষার সৃষ্টি। বর্তমানে ভাষা আমাদের নিজস্ব সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ভাষার সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু সম্বন্ধেই আমরা আজ আর চিন্তা করতে পারব না।

মানব প্রতীকগুলির মধ্যে কার্যকারিতা ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে আর কোন প্রতীকই ভাষার সমকক্ষ নয়। আমাদের চিন্তনের প্রধানতম উপাদানই হল ভাষা। প্রতীকরূপে ভাষার বহুল ব্যবহারের একটি বড় কারণ হল এই যে ভাষা যেমন খুব সহজে ব্যবহার করা যায় তেমনই ভাষা সহজেই অপরের বোধগম্য হয়। সেজন্য চিন্তার বিনিময়ের ক্ষেত্রে এটি হল সহজতম মাধ্যম। তাছাড়া ভাষামূলক চিন্তার সব সময়েই একটি সামাজিক দিকও আছে।

আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দ, বাক্যাংশ বাক্য প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ভাষাবিহীন চিন্তা যে হয় না, তা নয়। আমরা চেষ্টা করলে এমন

বস্তুর চিন্তা করতে পারি যেটিকে কোনরূপে নাম বা ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না। প্রতিরূপবর্জিত চিন্তার মত ভাষাবর্জিত চিন্তাও সম্ভবপর।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ভাষামূলক প্রতীকই চিন্তার প্রধানতম উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুকেই ভাষার সাহায্যে বর্ণনা করা হয় এবং সে ভাষা কথিত, লিখিত বা ভঙ্গীগত হতে পারে। বস্তুত আমাদের অধিকাংশ চিন্তাই ভাষামূলক প্রতীকগুলির মানসিক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়।

চিন্তন : রুদ্ধস্বর কথন

ভাষার সঙ্গে চিন্তার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখে ওয়াটসন চিন্তাকে 'রুদ্ধ-স্বর কথন'[1] বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে চিন্তন হল এমন এক ধরনের কথা বলা যখন কণ্ঠস্বরের ব্যবহারকে অবদমিত বা রুদ্ধ করা হয়ে থাকে। ওয়াটসন তাঁর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ছোট শিশু প্রথম প্রথম একাই নিজে নিজে কথা বলে। কিন্তু শীঘ্রই পিতামাতা এবং সমাজের অন্য সকলের চাপে পড়ে সে এই একা একা কথা বলার অভ্যাস বন্ধ করতে বাধ্য হয় বটে কিন্তু তার পরিবর্তে সে মনে মনে কথা বলা সুরু করে। ওয়াটসনের মতে এই মনে মনে কথা বলাই হল চিন্তন। অর্থাৎ চিন্তন হল এমন এক ধরনের কথা বলা যখন ব্যক্তির স্বরযন্ত্র থেকে শব্দ নির্গত হয় না। ওয়াটসনের এই তত্ত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি পরীক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন জিভ, গলা, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গগুলিকে সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে মানুষ যখন চিন্তা করে তখন এগুলিও যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গ্যালভানোমিটারের সাহায্যেও দেখা গেছে সে কথা বললে জিভ বা গলায় যে ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় চিন্তা করার সময়ও ঠিক সেই ধরনের পরিবর্তনই ব্যক্তির জিভে এবং গলায় সংঘটিত হয়ে থাকে।

ভাষার একটি বড় উপযোগিতা হল যে এটি আমাদের ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধারণার নামকরণও আমরা করি ভাষার সাহায্যে। মনে করা যাক 'বই' সম্বন্ধে কোন শিশুর ধারণা তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেই ধারণাটি যদি সে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে বা তার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে না পারে তাহলে তার ঐ ধারণাটি অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় থেকে যাবে। এই নামকরণ করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ভাষার জন্য।

তাছাড়া যে সকল ধারণা অমূর্ত ও বস্তুবর্জিত সেগুলি ভাষার সাহায্য ছাড়া গঠন করাই যায় না। যেমন, স্বাধীনতা, সততা, দয়া ইত্যাদি। কতকগুলি ধারণার জন্য আবার বিশেষ প্রকৃতির ভাষার সাহায্য লাগে, যেমন বাইনোমিয়াল সূত্রের মত

1, Sub-Vocal Talking

গাণিতিক তত্ত্বগুলির ধারণা মনে রাখতে হলে সংখ্যামূলক বা বীজগাণিতিক চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্য নিতেই হবে। তেমনি রসায়ন শাস্ত্রেরও বিভিন্ন পদার্থের ধারণা মনে রাখতে হলে শব্দ বা সংখ্যার সাহায্য অপরিহার্য। আমাদের চিন্তায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী এ থেকেই তা বোঝা যায়।

সবশেষে ভাষা কেবলমাত্র চিন্তনের বিষয়বস্তুকেই যে রূপ দেয় তা নয়, চিন্তনের প্রসার ও বিকাশের জন্যও ভাষার সাহায্য অপরিহার্য। বস্তুত ভাষার মত শক্তিশালী মাধ্যম থাকার জন্যই চিন্তনের এত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই জন্যই ভাষাকে আমাদের চিন্তার প্রধানতম উপকরণ বলা হয়ে থাকে।

ভাষার অপূর্ণতা

কিন্তু চিন্তার প্রধান মাধ্যম হলেও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে। ভাষা আমাদের চিন্তনকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। সাধারণত আমরা আমাদের চিন্তনের বিষয়বস্তুগুলির নানারকম ভাষামূলক নাম দিই এবং ধরে নিই যে ঐ নামগুলি আমাদের চিন্তনকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে ভাষার সে ক্ষমতা থাকলেও ভাষা আমাদের চিন্তনের সম্পূর্ণ ভাবপ্রবাহটিকে প্রকাশ করতে পারে না। ভাষা কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে গঠিত কিন্তু আমাদের চিন্তন হল একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। সেই কারণে আমাদের চিন্তনের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্তর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যেমন, সূর্যের আলোর মধ্যে আমরা সাতটি রঙের কথাই ভাষায় উল্লেখ করি। এমন কি রঙগুলির জন্য আমরা নীলচে-বেগুনী বা সবুজে-হলুদ ইত্যাদি ভাষারও ব্যবহার করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রঙের এমন অনেক অতি সূক্ষ্ম স্তর আছে যেগুলির উপযোগী কোন ভাষাই আমাদের অভিধানে নেই। অথচ সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও গঠিত হয় এবং সেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তন করতেও পারি। সেই রকম ধ্বনির ক্ষেত্রেও এমন অনেক সূক্ষ্ম স্তর আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমরা ধারণা গঠন করে থাকি এবং সেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তন করতে পারি। কিন্তু ভাষায় সেগুলির বৈশিষ্ট্যকে আমরা ব্যক্ত করতে পারি না। তেমনই স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অতি সূক্ষ্ম স্তরগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাষা ধারণা-গঠনের অত্যাবশ্যক উপাদান হলেও এমন অনেক ধারণা আছে যা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না।

শিশুর ভাষার বিকাশ

ছোট শিশুর মধ্যে কেমন করে ভাষার বিকাশ হয় এই নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এই সব পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুর ভাষার বিকাশ কতকগুলি

বিশেষ বিশেষ স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। এই রকম কয়েকটি প্রধান প্রধান স্তরের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। রিফ্লেক্স স্তর

শিশু প্রথমে থেকেই কতকগুলিই বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। প্রথমে সে স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে, তারপর ম এবং ন এই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ বলতে পারে। তার পরে সে প এবং ব, এই বর্ণদুটি বলতে পারে এবং তারপর ধীরে ধীরে বাকী বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে। এই স্তরে কথনের জন্য শিশুর কোনও প্রয়াস বা ইচ্ছা থাকে না। অনেকটা যান্ত্রিকভাবেই সে ঐ শব্দগুলি বলে যায়। মুরের[1] পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে চার মাসের শিশু সব রকম শব্দই উচ্চারণ করতে পারে।

২। অনুকরণ-পুনরাবৃত্তির স্তর

দ্বিতীয় স্তরে শিশুর বড়দের উচ্চারিত শব্দ তার অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করে উচ্চারণ করতে স্বরু করে এবং একটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করে যায়, যেমন, মা, মা, মা, কিংবা দা, দা, দা, ইত্যাদি। এই স্তরে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি[2] বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিশু অনুবর্তনের মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন শব্দ শেখে।

৩। অর্থবোধের স্তর

প্রায় ১ বৎসর বয়স থেকে শিশু শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে। তখন সে একটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে একটি বিশেষ শব্দকে সংযুক্ত করতে পারে। এটিও অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। যেমন, যখন সে দুধের বোতলে হাত দেয় তখন মা বা অন্য সকলে দুধ কথাটি উচ্চারণ করেন। ফলে তখন সে শেখে যে ঐ বিশেষ বস্তুটির নাম দুধ। এভাবে শিশু তার চার পাশের বিভিন্ন বস্তুর নাম শেখে এবং কোন্ কোন্ শব্দের দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তু বা ঘটনাকে বোঝান হয় তাও শিখে থাকে।

8। ভাষা-সচেতনতার স্তর

এই স্তরে শিশু ভাষার ব্যবহার ও ভাষার অসীম শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সে দেখে যে বিশেষ শব্দের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুকে সে সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং তার মনের বক্তব্যও প্রকাশ করতে পারে। প্রায় দেড় বৎসর বয়স থেকে শিশু তার সামনে যে বস্তুটি অনুপস্থিত সেই বস্তুটিকে বিশেষ কোন শব্দ দিয়ে জ্ঞাপন করতে শেখে। যেমন, ক্ষিদে পেলে সে বলে 'দুধ'। এই সময় থেকে সে নিজে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে এবং অপরের ব্যবহৃত ভাষার অর্থও বুঝতে পারে।

1. Moore 2. Conditioning :: পৃঃ ৩২০-পৃঃ ৩২৪

৫। বাক্য কথন স্তর

অনুপস্থিত বস্তুর পরিবর্তে কোন বিশেষ শব্দের ব্যবহার থেকেই শিশু বাক্য বলার ক্ষমতাটি অর্জন করে। যখন সে বলে 'দুধ' বা 'ভাত' তখন সে প্রকৃতপক্ষে বলছে যে 'আমার খিদে পেয়েছে' বা 'আমি খেতে চাই'। এর পর থেকেই সে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। এর পর সুরু হয় তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পালা এবং তিন বছরের শিশু বেশ বলিয়ে কইয়ে হয়ে ওঠে। স্মিথের একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১ বৎসরে শিশু ৪টি শব্দ শেখে, ২ বৎসরে শেখে ২৭২ টি, ৩ বৎসরে ৮৯৬টি, ৪ বৎসরে ১৫৪০টি, ৫ বৎসরে ২০৭২টি এবং ১২ বৎসরে ৫০০০টি বলতে শেখে।

৬। পঠন ও লিখন স্তর

পঠন ও লিখন বা চিত্রমূলক ভাষা ব্যবহারের জ্ঞান জন্মায় আরও কয়েক বছর পরে এবং সাধারণভাবে এই সময়টি নির্ভর করে শিশু যে সমাজে বাস করে সে সমাজের প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের উপর। সাধারণত শিশু ছ'বৎসর বয়স থেকে পড়ছে এবং সাত আট বৎসর বয়স থেকে লিখতে শিখে থাকে।

অনুশীলনী

১। চিন্তন একটি প্রতীকমূলক আচরণ—আলোচনা কর।

২। প্রতিরূপ কাকে বলে? কিভাবে প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তন ঘটে বল। কত ধরনের প্রতিরূপ হয় বর্ণনা কর।

৩। ধারণা বলতে কি বোঝ? কিভাবে ধারণা গঠিত হয়? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধারণার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। চিন্তন ও ভাষার মধ্যে কি সম্পর্ক? কেন ভাষাকে চিন্তার প্রধানতম উপাদান বলা হয়? শিশুর মধ্যে কিভাবে ভাষার বিকাশ হয় বর্ণনা কর।

৫। চিন্তনকে 'রুদ্ধ-স্বর কথন' বলা হয় কেন?

৬। টীকা লেখ :—

(ক) অনুবেদন। (খ) আইডেটিক প্রতিরূপ। (গ) প্রতিপূরক রং। (ঘ) চিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষার অপূর্ণতা। (ঙ) সমবর্ণ অনুবেদন। (চ) ধারণা শিখনের পদ্ধতি। (ছ) ভাষার বিকাশে অর্থবোধের স্তর।

মনে রাখতে হবে যে কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা যে সব প্রতিরূপের ব্যবহার করি সেগুলি কিন্তু আমাদের মন থেকে সৃষ্টি নয়। প্রতিরূপগুলি সব সময়েই যথার্থ প্রত্যক্ষণ থেকে উদ্ভূত। যা আমরা কখনও প্রত্যক্ষণ করিনি তার আমরা প্রতিরূপও সৃষ্টি করতে পারি না। তবে যে সব বস্তু আমরা প্রত্যক্ষণ করেছি সে সব বস্তুর প্রতিরূপগুলিকে খুসীমত সাজিয়ে গুজিয়ে ইচ্ছামত কাল্পনিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমাদের আছে। প্রতিরূপের এই ইচ্ছামত ব্যবহারই কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কল্পন ও স্মরণ

কল্পন ও স্মরণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে যখন পূর্বে দেখা বা শেখা বস্তু মনে করি তখন আমরা সেগুলির প্রতিরূপকে উজ্জীবিত করি। যেমন, প্রয়োজন হলে আমাদের পরিচিত কোন বন্ধুর চেহারা বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বাড়ীর ছবি আমরা মনের মধ্যে প্রতিরূপের আকারে জাগিয়ে থাকি। একেই স্মৃতি বলে। কল্পনের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভাবে আমরা প্রতিরূপকে জাগিয়ে থাকি। তবে স্মৃতি ও কল্পনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে স্মৃতির সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ মিল আছে। অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষণ করি এবং যেমন-ভাবে প্রত্যক্ষণ করি সেইটি সেভাবে চিন্তা করাকে স্মৃতি বলে। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রতিরূপগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। যেমন, আমাদের পূর্বে দেখা ঘোড়া এবং একজোড়া ডানার প্রতিরূপকে মনে জাগানোর নাম হল স্মরণ। আর ঘোড়াটির গায়ে দু'জোড়া ডানা লাগিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া তৈরী করা হল কল্পন। এজন্য অনেকে স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক কল্পন[1] এবং সাধারণ কল্পনকে উৎপাদনমূলক বা সৃজনমূলক কল্পন[2] বলে থাকেন। যে অভিজ্ঞতাগুলি আমরা একবার পূর্বে আহরণ করেছি, সেগুলিকেই আবার হুবহু মনের মধ্যে উৎপাদন করা বা জাগান হল স্মৃতির কাজ। সেজন্য স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক প্রক্রিয়া বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত কল্পনায় আমরা প্রতিরূপগুলিকে ইচ্ছামত নতুন বিন্যাসে সংগঠিত করে নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে থাকি। সেজন্য কল্পনাকে উৎপাদনমূলক বা সৃজনমূলক প্রক্রিয়া বলা হয়।

কল্পন ও স্মরণের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। কল্পনের প্রধান উপাদান হল প্রতিরূপ। ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতীকগুলি উপাদানরূপে কল্পনের ক্ষেত্রে কম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রতিরূপের মত অন্যান্য প্রতীকগুলিও উপাদানরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুত ধারণা,

1. Reproductive Imagination 2. Productive Imagination

ভাষা, সংখ্যা ইত্যাদি উপাদানগুলিই বহুল পরিমাণে স্মৃতির অবয়ব সংগঠনে প্রয়োজন হয়। কিন্তু কল্পনা মূলত প্রতিরূপের উপর নির্ভরশীল।

কল্পন ও চিন্তন

কল্পনও হল এক শ্রেণীর চিন্তন। মানসিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে উভয়েই অভিন্ন। আমরা যখন প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার কোন প্রতীক নিয়ে আচরণ করি তখন আমাদের সেই আচরণকে চিন্তন বলা হয়। যখন কোন একটি বস্তুর পরিবর্তে আমরা অন্য একটি বস্তু ব্যবহার করি তখন দ্বিতীয় বস্তুটিকে প্রথম বস্তুর প্রতীক বলা হয়। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির নানা ধরনের প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে বহন করতে পারি। চিন্তনের ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুগুলির পরিবর্তে সেই বস্তুগুলির নানা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতীক নিয়ে আমরা আচরণ করে থাকি। যেমন, একটি বই টেবিল থেকে হাত দিয়ে তোলা হল প্রকৃত আচরণ। কিন্তু আমরা যদি বই, টেবিল, হাত ইত্যাদি বস্তুগুলির প্রতীকের সাহায্যে মনে মনে ঐ একই কাজ সম্পন্ন করি তাহলে আমাদের আচরণটি হল চিন্তন। এই জন্য চিন্তনকে বলা হয় প্রতীকমূলক আচরণ[1]।

চিন্তনে ব্যবহৃত প্রতীক আবার নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন প্রতিরূপ, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা, পেশীমূলক প্রস্তুতি ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন প্রতিরূপের সাহায্যে আমরা চিন্তন করে থাকি। যেহেতু চিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার প্রতীকের সাহায্যে আমরা আচরণগুলি সম্পন্ন করি সেহেতু চিন্তনের ক্ষেত্রে সময় ও শ্রমের প্রচুর সাশ্রয় হয়। এই জন্যই চিন্তন আমাদের এত উপকারে লাগে।

চিন্তন আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন কল্পন, বিচারকরণ, উদ্ভাবন ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কল্পন হল সেই চিন্তন যাতে প্রতিরূপগুলি ব্যক্তি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করে নানা নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে থাকে। সাধারণ চিন্তনের ক্ষেত্রে মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি বাস্তবধর্মী হয়ে থাকে, অর্থাৎ মানসিক প্রতীকগুলি বাস্তব অনুযায়ী সাজানো হয়। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে মানসিক প্রতীকগুলিকে যথেচ্ছ সাজিয়ে ইচ্ছামত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা হয়।

চিন্তন ও কল্পনের মধ্যে এইটিই হল সব চেয়ে বড় পার্থক্য। চিন্তন বাস্তব অনুগামী। কিন্তু কল্পন বাস্তব অনুগামী হতে বাধ্য নয়। ব্যক্তির ইচ্ছা, মনোভাব, অনুভূতি অনুযায়ী প্রতিরূপগুলিকে যেমন খুশী সাজানোর স্বাধীনতা কল্পনে আছে, কিন্তু চিন্তনে নেই। তবে কল্পনও বাস্তব অনুগামী হতে পারে। তখন কল্পন ও চিন্তনে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তাছাড়া চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরূপ ছাড়া অন্যান্য প্রতীকগুলিরও বহুল

1. Symbolical Behaviour

ব্যবহার করে থাকি। বরং চিন্তন যত উন্নত হয় প্রতিরূপের ব্যবহারও তত কমে আসে এবং উন্নত শ্রেণীর চিন্তনে প্রতিরূপের কোন স্থানই নেই। কিন্তু কল্পনের উপাদান প্রধানত প্রতিরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কল্পন যতই উন্নত প্রকৃতির হবে তার প্রতিরূপের ব্যবহারও তত সমৃদ্ধ ও বহুল হবে।

কল্পনের শ্রেণীবিভাগ

কল্পনের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক মনোবিজ্ঞানী এর নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ড্রেভারের দেওয়া শ্রেণীবিভাগটি এখানে বর্ণিত হল।

প্রয়োগমূলক কল্পন ও সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পন

ড্রেভারের মতে সৃজনমূলক কল্পন দু'শ্রেণীর হতে পারে, প্রয়োগমূলক[1] এবং সৌন্দর্যবোধমূলক[2]। প্রয়োগমূলক কল্পনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা নতুন কিছু সৃষ্টি করলেও সে কল্পনা বাস্তব জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রসর হয়। যেমন, কল্পনায় কোন ইঞ্জিনীয়ার একটি ব্রিজ তৈরী করছেন বা কোন স্থপতি একটি প্রাসাদ গড়ছেন। এ সকল ক্ষেত্রে কল্পনা বাস্তব জগতের নিয়মকানুনগুলি পূর্ণভাবে মেনে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনায় ব্যক্তির কল্পনা বহুলাংশে অবাধিত ও অনিয়ন্ত্রিত। যেমন কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখা, কোন সৌন্দর্যময় শিল্প তৈরী করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা বাস্তবের নিয়মকানুন নিখুঁতভাবে মেনে চলতে বাধ্য নয়। এ দু'য়ের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য হল যে প্রয়োগমূলক চিন্তনে তৃপ্তি আসে তখনই যখন কল্পনের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছান যায়। কিন্তু সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনে কল্পনা করার সময়েই তৃপ্তি পাওয়া যায়।

ব্যবহারিক কল্পন ও তত্ত্বগত কল্পন

প্রয়োগমূলক কল্পনাকে আবার ড্রেভার দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, ব্যবহারিক[3] এবং তত্ত্বগত[4]। যে প্রয়োগমূলক কল্পন বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্যই সৃষ্ট হয় তাকে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক প্রয়োগমূলক কল্পন। আর যে প্রয়োগমূলক কল্পনকে কোন বিশেষ তত্ত্ব আহরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয় তাকে বলা যেতে পারে তত্ত্বগত প্রয়োগমূলক কল্পন। কোন ইঞ্জিনীয়ারের একটি ব্রিজ তৈরীর কল্পনটি হল প্রথম শ্রেণীর কল্পনের উদাহরণ এবং কোন বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য যে কল্পন সেটি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনের উদাহরণ।

---

1. Pragmatic 2. Aesthetic 3. Practical 4. Theoretical

শিল্পমূলক কল্পন ও অবাস্তব কল্পন

সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পন কখনও আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে, শিল্পমূলক[1] এবং অলীক বা অবাস্তব[2]। যখন কোন চিত্রকর কল্পনায় একটি ছবি আঁকছেন বা কোন ভাস্কর কল্পনায় একটি মূর্তি গড়ছেন, তখন তাঁদের কল্পনকে শিল্পমূলক বলা চলে, কিন্তু নিছক তৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যে যখন ব্যক্তি লক্ষ্যহীন উদ্ভট কল্পনার জাল বুনে যায় তখন তার কল্পনকে অলীক বা অবাস্তব কল্পন বলা হয়।

শিক্ষা ও কল্পন

মানবজীবনের সব স্তরেই কল্পনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিশুর শিক্ষায় কল্পন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকে। শৈশবের মত যৌবনাগমেও চিন্তনের মধ্যে কল্পনের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিণত বয়সেও কল্পনের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয়।

গ্যাল্টন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়াটি প্রধানত কল্পনধর্মী হয়ে থাকে। প্রথম দিকে সে সমস্ত কিছুই চিন্তা করে প্রতিরূপের সাহায্যে। ধীরে ধীরে সে যত বড় হয় তত তার চিন্তায় কল্পনের আধিক্য কমতে থাকে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে আবার তার চিন্তায় প্রতিরূপের প্রাধান্য নতুন করে দেখা দেয়। এ সময়ের কল্পন অবাস্তব চিন্তা ও দিবাস্বপ্নের রূপ নেয়। প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা তাদের বহুবিধ অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি আহরণ করে এই ধরনের অবাস্তব কল্পনার বা দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। পরিণত বয়সে এই দিবাস্বপ্নের আধিক্য কমে এলেও কোন দিনই তা একেবারে চলে যায় না। সারাজীবন ধরে অল্পবিস্তর পরিমাণে দিবাস্বপ্ন প্রতিটি ব্যক্তির মনোরাজ্যকে প্রভাবিত করে এবং বাস্তবজীবনে ব্যর্থতা এবং আশাভঙ্গের অতৃপ্তির মধ্যে তাকে আংশিক তৃপ্তি এবং সান্ত্বনা দিয়ে থাকে।

শিক্ষার দিক দিয়ে কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সৃজনধর্মিতা। বস্তুত, কল্পনই হল সমস্ত উদ্ভাবনী ও সৃজনমূলক চিন্তনের ভিত্তি। কল্পন যখন সুনিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব অনুগামী হয় তখন সেই কল্পন সত্যকারের নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পমূলক আবিষ্কার, সৌন্দর্যমূলক বস্তু সৃষ্টি, নতুন কবিতা বা উপন্যাস লেখা, ছবি আঁকা এ সকলেরই প্রথম সুরু তাদের সৃজকদের কল্পনার রাজ্যে। সেখানে তাদের সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করলেই তারা বাস্তবে রূপ লাভ করে। যে কল্পনাকে বাস্তবে কোন কিছু সৃষ্টি বা সংগঠনের জন্য প্রয়োগ করা যায় তাকেই প্রয়োগমূলক কল্পনা বলা হয়। এই ধরনের কল্পন শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়াকে সৃজনশীল ও উন্নত করে তোলে। অতএব শিশুর কল্পনকে

1. Artistic 2. Fantastic

নিয়ন্ত্রিত করা এবং তাকে উন্নত পথে পরিচালনা করা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটি বড় অঙ্গ। যাকে আমরা প্রয়োগমূলক কল্পন বলে বর্ণনা করেছি সেই কল্পন শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করা সার্থক শিক্ষাসূচীর যে একটি বড় লক্ষ্য একথা বলাই বাহুল্য।

শিশুর প্রাথমিক কল্পন অবশ্য প্রয়োগমূলক নয়। সেগুলি প্রকৃতিতে প্রধানত অলীক ও অবাস্তব। বাস্তবের নিয়ম কানুন, স্থান ও সময়ের সঙ্গতি কোন কিছুই তার কল্পন মানে না। মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় নিজের খুসীমত পথে নির্বাধ গতিতে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যায়। এই সময়ে শিশুদের এই অবাস্তব কল্পন খোরাক পায় রূপকথার গল্পে—পক্ষীরাজ ঘোড়া, দুধসাগরের দেশ, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী প্রভৃতি কাল্পনিক কাহিনীতে। সবদেশেই শিশুর মনস্তুষ্টির জন্য রূপকথা ও উপকথার গল্প শোনাবার প্রথার প্রচলন আছে।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা শিশুদের রূপকথার গল্প বা অবাস্তব কাহিনী শোনাবার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে রূপকথার গল্প শিশুকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তার মনে প্রকৃত জগৎ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি অবাস্তব ধারণার সৃষ্টি করে যা তার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রস্তুতির বিরাট পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। রূপকথা ও উপকথার গল্পে সাধারণত অতিপার্থিব বা দৈবশক্তির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এই সব গল্প শুনে শিশুর মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে সে যদি কোন বিপদ বা সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পড়ে তবে দৈবশক্তি তাকে তা থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করবে। কিন্তু যখন সে প্রকৃত জীবনে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয় তখন তার শৈশবের এই ধারণা শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশাভঙ্গের আঘাত তার মনকে দুর্বল করে দেয় এবং তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে।

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ মণ্টেসরি এই মতেরই সমর্থক। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকে কোনরূপ রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প শোনান নিষিদ্ধ। তিনি বলতে চান যে শিক্ষার কাজ হলে শিশুকে তার শিশুসুলভ অবাস্তব রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে তাকে বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত করা। তাঁর মতে শিশুর ইন্দ্রিয়মূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে বাস্তবধর্মী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশু বড় হয়ে বাস্তবকে তার প্রকৃত স্বরূপে চিনতে পারে এবং তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয়।

শিশুর অবাস্তব কল্পনা এবং রূপকথা পঠনের বিরুদ্ধে মণ্টেসরি প্রভৃতির এই অভিযোগের পিছনে যে যথেষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। প্রায়ই দেখা গেছে যে শৈশবের রূপকথার মায়াময় জগৎটি যখন পরিণত বয়সে বাস্তবের রূঢ় পরিবেশের সংঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তখন ব্যক্তির পক্ষে তা প্রচণ্ড আশাভঙ্গ ও মানসিক আঘাতের রূপ নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এই অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে না এবং সারাজীবন ধরেই অতৃপ্ত ও বিপর্যস্ত জীবন যাপন করে চলে।

মনঃসমীক্ষণের সংব্যাখ্যানেও শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আধিক্য ব্যক্তির পরিণত জীবনে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি যখন বাস্তবজীবনে কোন দুরূহ সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সন্তোষজনকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তখন সে তার শৈশবের কল্পনার রাজ্যে ফিরে গিয়ে বাস্তবকে এড়িয়ে যায়। একে প্রত্যাবৃত্তি[1] বলা হয়। প্রাণশক্তির এই প্রত্যাবৃত্তি মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং সার্থক জীবন গঠনের পরিপন্থী।

তা বলে অবাস্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের একেবারে কোন উপযোগিতা নেই, এ কথা বলা চলে না। অতি শৈশবে শিশুর মনে এমন সব কামনা দেখা দেয় যেগুলির প্রকৃত রূপ আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্টও নয় এবং যেগুলি পূর্ণ করা আমাদের সাধ্যও নয়। অথচ সেগুলির পরিতৃপ্তি না হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হয়ে ওঠে। শিশু তার এই সব অতৃপ্ত কামনা বাসনাগুলির আংশিক তৃপ্তি অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে আহরণ করে। শিশুর বহুমুখী বুদ্ধি প্রচেষ্টাকে এই ধরনের কল্পনা অনেকখানি সাহায্য করে এবং অনেক প্রাপ্তবয়স্কের মানসিক প্রক্রিয়াও এই কল্পনার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে।

সুনিয়ন্ত্রিত কল্পনা শিশুকে জীবনসমস্যার সমাধানে সাহায্য করে থাকে। কল্পনার সাহায্যে শিশু নানা প্রকল্প[2] গঠন করতে পারে এবং এবং সেই প্রকল্পগুলির সাহায্যে সে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়। দেখা গেছে যে কোন প্রকল্প গঠনের সময় কল্পনার প্রয়োগ এক রকম অপরিহার্য। প্রকল্প গঠন করতে হলে কতকগুলি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তকে বেছে নিতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন সব কটি সম্ভাব্য উপায়কে কল্পনায় প্রয়োগ করে দেখা। এখানে মানসিক উপাদানের সাহায্যে বাস্তব ঘটনাটি অনুষ্ঠিত করতে কল্পনাই শিশুকে সমর্থ করে। কল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর সৌন্দর্যানুভূতির দিকটি। আমাদের মধ্যে যে সহজাত সৌন্দর্যভোগের স্পৃহা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মাধ্যমে তৃপ্তির অনুসন্ধান করে অথচ সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ বাস্তব পরিবেশে পূর্ণ তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, সেই অতৃপ্ত সৌন্দর্যানুভূতির স্পৃহা একমাত্র কল্পনার মাধ্যমেই তার বাঞ্ছিত তৃপ্তি পেতে পারে। এই জন্য সুষ্ঠু কল্পনা ব্যক্তির পক্ষে তৃপ্তিকর, রুদ্ধ প্রক্ষোভের নির্মোচক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়ক।

---

1. Regression :: পৃঃ ৪১০ 2. Hypothesis

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে শিশুর লক্ষ্যহীন অবাস্তব কল্পনাকে লক্ষ্যসম্পন্ন বাস্তবধর্মী কল্পনায় পরিণত করাই শিক্ষার প্রধান কর্মসূচী। রূপকথার গল্প বা অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী শিশুকে একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত (বড় জোর প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত) পড়তে বা শুনতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপর তাকে ধীরে ধীরে কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে আনতে হবে এবং বাস্তব জীবনের চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে হবে। তার উন্মেষকামী কল্পনাকে উপযুক্ত পরিচালনা ও সাহায্যের দ্বারা বাস্তবমুখী করে তুলতে হবে এবং যাতে তার কল্পনা ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত হতে পারে এবং তার জীবন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে সেভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

শিশুর কল্পনার নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান পন্থা হল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর তার কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিশু যত বিভিন্ন ও বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী হবে তার কল্পনা তত বাস্তবধর্মী এবং কম উদ্ভট হয়ে উঠবে। দেখা গেছে যে শিশু যত বেশী সংরক্ষিত ও সীমাবদ্ধ পরিবেশে বাস করে তার কল্পনা তত বেশী অবাস্তব হয়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিশুর কল্পনাকে গঠনমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন করে তোলে।

এই জন্য শিশুর সমস্ত শিক্ষাকেই সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ ধারণা কোনটাই সত্যকারের বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। ফলে শিশুর কল্পনা নানা বিকৃত ও অবাস্তব রূপ ধারণ করে। কিন্তু সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে যা শেখা যায় তাতে অবাস্তব কল্পনা গড়ে ওঠার কোন অবকাশ থাকে না। সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা শিশুর কল্পনার প্রকৃতিকে দৃঢ় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার গতিধারাকে প্রয়োগমূলক পথে পরিচালিত করে।

যেখানে মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না সেখানে উপযুক্ত ইন্দ্রিয়সহায়ক উপকরণের[1] সাহায্য নেওয়া উচিত। তাছাড়া স্লাইড, ছবি, চার্ট, ম্যাপ, ফিল্ম ইত্যাদির সহায়তায় শিশুর কল্পনাকে বাস্তব পথে পরিচালিত করা সম্ভব।

ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের[2] সাহায্যেও কল্পনাকে বাস্তবধর্মী করে তোলা যায়। কল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু যে প্রতিরূপ তা আসে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে। মন্টেসরি প্রবর্তিত পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষসাধন করা হলে কল্পনা অবাস্তব বা উদ্ভট রূপ গ্রহণ করতে পারে না। তবে শিশুর মধ্যে চিন্তনমূলক কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়চর্চা খুব বেশী কার্যকর হয় বলে মনে করা হয় না।

---

1. Audio-visual Aids 2. Sense Training

অনুশীলনী

১। শিশুর উপর কল্পনের প্রভাব আলোচনা কর। কিভাবে শিশুর মধ্যে কল্পনের বিকাশ ঘটে বর্ণনা কর।

২। কল্পনের শ্রেণীবিভাগগুলি উদাহরণ সহযোগে বল এবং সেগুলির শিক্ষামূলক গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। কল্পন ও চিন্তন এবং কল্পন ও স্মরণের মধ্যে তুলনা কর।

৪। শিশুকে রূপকথা পড়তে দেওয়া উচিত কিনা আলোচনা কর।

৫। শিশুর শিক্ষায় কল্পনের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৬। টীকা লেখ ঃ—

(ক) কল্পন ও স্মরণ (খ) কল্পন ও চিন্তন (গ) কল্পন ও প্রতিরূপ (ঘ) কল্পনের শ্রেণীবিভাগ।

সেণ্টিমেণ্ট

সেণ্টিমেণ্ট[1] কথাটি লৌকিক ভাষণে বহুদিন প্রচলিত থাকলেও মনোবিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট পরিভাষা রূপে কথাটি প্রথম প্রবর্তিত করেন স্যাণ্ড[2] নামক একজন মনোবিজ্ঞানী। তাঁর সংব্যাখ্যান অনুযায়ী কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে যখন কোনও বিশেষ একটি প্রক্ষোভ সুসংহত সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে তখন তাকে সেণ্টিমেণ্ট বলে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং তার প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এই সহজাত প্রবণতাগুলির দ্বারা। এগুলিকে আমরা প্রবৃত্তি বা ইনস্টিংক্ট[3] নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু যত সে বড় হয় তত পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলে তার সেই সহজাত প্রবণতাগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম তার প্রবণতাগুলি থাকে অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও বিচ্ছিন্ন কতক-গুলি সত্তার রূপে। কিন্তু ক্রমশ সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। সেণ্টিমেণ্ট হল এই প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলিরই একটি সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ।

যেমন, কোন কিছুকে ভালবাসা একটি প্রক্ষোভ। কিন্তু যখনই বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ভালবাসার প্রক্ষোভটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে, তখনই ভালবাসার সেণ্টিমেণ্টটি জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের জন্মভূমি আমাদের মাতৃভাষা বা নিজেদের প্রিয়জনদের ঘিরে আমাদের ভালবাসার সেণ্টিমেণ্টটি গঠিত হয়ে থাকে। তেমনই আবার কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘিরে আমাদের ঘৃণার সেণ্টিমেণ্ট বা রাগের সেণ্টিমেণ্ট সৃষ্টি হতে পারে।

সেণ্টিমেণ্ট ও প্রক্ষোভ

প্রক্ষোভ থেকেই সেণ্টিমেণ্ট জন্মায়। প্রক্ষোভের সুসংগঠিত রূপকেই সেণ্টিমেণ্ট বলা হয়। যেখানে বা যে বস্তুর প্রতি কোনও সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ ব্যক্তি অনুভব করে না, সেখানে বা সে বস্তুকে ঘিরে কোনও সেণ্টিমেণ্ট তৈরী হয় না। এই জন্য সেণ্টিমেণ্ট মাত্রেই কোন না কোন প্রক্ষোভের দ্বারা নিষিক্ত থাকে। যখনই ঐ সেণ্টিমেণ্ট সক্রিয় হয় তখনই ঐ বিশেষ প্রক্ষোভটি ব্যক্তি অনুভব করে।

প্রক্ষোভ সহজাত, কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট অর্জিত। সেণ্টিমেণ্ট মনের একটি বিশেষ অর্জিত সংগঠন বা রূপ মাত্র যা বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণা সম্বন্ধে

---

1. Sentiment 2. Strand 3. Instinct :: পৃঃ ৩১

ব্যক্তিকে বিশেষ পন্থায় কাজ করতে প্রবৃদ্ধ করে। প্রক্ষোভও ব্যক্তিকে বিশেষভাবে আচরণ করতে প্রবৃদ্ধ করে, কিন্তু প্রক্ষোভের প্রভাব সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু সেন্টিমেন্টের প্রভাব স্থায়ী এবং গভীর।

সেন্টিমেন্ট—আচরণের নিয়ন্ত্রক

যখন প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলি সেন্টিমেন্টের রূপ নিয়ে সুসংগঠিত হয় তখন ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেন্টিমেন্টের সেই বিষয়বস্তুটিকে ঘিরে ব্যক্তির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী আচরণধারা গড়ে ওঠে। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি সেন্টিমেন্টই কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি ব্যক্তির একটি স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক মনোভাব যা ঐ বস্তুটির অভিজ্ঞতা থেকে জন্মে থাকে। কোন ব্যক্তিবিশেষ একটি পরিবেশে কি ভাবে আচরণ করে তা নির্ভর করে ঐ পরিবেশ সম্পর্কে তার পূর্বগঠিত সেন্টিমেন্টের উপর। এই জন্য সেন্টিমেন্টকে আমরা ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক বলতে পারি।

পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে শিশুর প্রক্ষোভগুলি বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। সে কোন বস্তুকে ভালবাসে, কোনটিকে আবার ঘৃণা করতে শেখে। এখন এই বস্তুগুলিকে ঘিরে যদি তার ভালবাসা, ঘৃণা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি বার বার অভিব্যক্ত হতে থাকে তবে কিছুদিন পরেই সেই বিচ্ছিন্ন ও অসংহত প্রক্ষোভগুলি স্থায়ী ও সুসংহত সেন্টিমেন্টের রূপ ধারণ করে। বস্তু এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যেমন সেন্টিমেন্ট তৈরী হয় তেমনই আবার কোন বিশেষ ধারণাকেও কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট তৈরী হতে পারে। যেমন ধর্মের প্রতি কারও অনুরাগের সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে, আবার কারও বিরাগের সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে। আমাদের সকলেরই প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির প্রতি ঘৃণার সেন্টিমেন্ট আছে।

সেন্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি

মানব আচরণের নিয়ন্ত্রকরূপে সেন্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি উভয়েরই ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রবৃত্তি হল সহজাত আচরণ-প্রবণতা এবং শিশুর জীবনের প্রাথমিক আচরণগুলি প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের কাজগুলি শিশু কিভাবে সম্পন্ন করবে তা নির্ণয় করে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে তার মধ্যে তত নতুন নতুন আচরণপ্রবণতা দেখা দেয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে ব্যক্তি এই নতুন আচরণগুলি সম্পন্ন করতে শেখে। তার এই নতুন আচরণ-প্রচেষ্টাগুলির পিছনে থাকে নানা প্রকৃতির সেন্টিমেন্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্কে এসে তার মনে নানা ধরনের

অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির সম্পর্কে সে বিশেষ বিশেষ পন্থায় আচরণ করতে শেখে। এই অর্জিত মানসিক সংগঠনগুলি হল সেণ্টিমেণ্ট। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি হল সহজাত আচরণপ্রবণতা, সেণ্টিমেণ্ট হল অর্জিত আচরণ-প্রবণতা। তবে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে ব্যক্তির জীবনের প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই প্রধান। আর সেণ্টিমেণ্ট-প্রসূত আচরণগুলি ব্যক্তির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিশু যত বড় হয় তত তার প্রবৃত্তি পরিচালিত আচরণগুলি সংখ্যায় কমে আসে এবং সেণ্টিমেণ্টই তার আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সুরু করে। সে যতই পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতিদের সংস্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে নতুন নতুন সেণ্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। তখন তার আচরণের উপর প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থাকে নিতান্তই অল্প। সেই সময় তার আচরণকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করে তার নবগঠিত সেণ্টিমেণ্টগুলি।

তবে প্রবৃত্তি ও সেণ্টিমেণ্ট দুইই প্রক্ষোভধর্মী। উভয়েরই প্রেষণাশক্তি জোগায় প্রক্ষোভ। কোন বিশেষ প্রক্ষোভ জাগলেই প্রবৃত্তি কার্যকর হয়। তেমনই সেণ্টিমেণ্টের শক্তি ও উদ্যম আসে কোনও বিশেষ প্রক্ষোভের জাগরণ থেকে। তবে সেণ্টিমেণ্টের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ অনেক বেশী গভীর, স্থায়ী ও শক্তিসম্পন্ন।

সেন্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স

সেণ্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স মানসিক সত্তার দিক দিয়ে অভিন্ন প্রকৃতির। উভয়েরই জন্ম প্রক্ষোভের সংগঠন থেকে। উভয়ই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়কে ঘিরে সৃষ্টি হয়। উভয় ক্ষেত্রেই যখন ঐ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার উল্লেখ করা হয় বা তার চিন্তা মনে আসে তখন ব্যক্তির মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টা দেখা দেয় এবং ব্যক্তি একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় আচরণ করতে সুরু করে। কিন্তু তবু কতকগুলি দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমত, ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কমপ্লেক্স ব্যক্তির অচেতন মনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানবিশেষ। ব্যক্তির সচেতন মনে কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয় না এবং সেই কারণে তার প্রভাব সম্পর্কে সে জ্ঞাত থাকে না। সেইজন্য যখন কোন কমপ্লেক্সের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তি কোন বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখন সে তার কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারে না, যা যে ব্যাখ্যা সে দেয় এবং বিশ্বাস করে তা প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট পুরোপুরি ব্যক্তির জ্ঞাত মনের উপাদান এবং তার স্বরূপ ও তা থেকে সঞ্জাত আচরণ সম্বন্ধে সে পূর্ণভাবেই সচেতন থাকে।

দ্বিতীয়ত, কমপ্লেক্সের মধ্যে সকল সময়েই একটি অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। যখন ব্যক্তির অহংসত্তার দ্বারা পরিত্যক্ত কোন চিন্তা বা কামনা তার অচেতনে অবদমিত হয়, তখনই কমপ্লেক্স জন্ম নেয়। কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় মানসিক প্রক্রিয়ার

ফল এবং ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের পরম সহায়ক ও উপাদান বিশেষ। সেণ্টিমেণ্ট মনের সুসমন্বয়নের উপকরণস্বরূপ। কমপ্লেক্স মানসিক সংহতির পরিপন্থী এবং মনের কোন বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থার সূচক।

সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টি ও বিকাশ

কোনও সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে শিশু জন্মায় না। পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টি হয়। নবজাতক শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় নিছক তার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শক্তির দ্বারা। কিন্তু সে কিছুটা বড় হলেই তার মধ্যে সেণ্টিমেণ্ট সৃষ্টি হতে থাকে।

সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা থেকে। ড্রেভারের মতে নিছক প্রত্যক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা থেকে সেণ্টিমেণ্ট জন্মায় না। সেণ্টিমেণ্ট জন্মায় যখন অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষণ-মূলক স্তর থেকে চিন্তনমূলক স্তরে গিয়ে পেঁছিয়। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা যখন কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যখন সে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না তখন সেণ্টিমেণ্ট সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু যখন তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে শিশু চিন্তা করতে শেখে তখনই তার মধ্যে সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টি সুরু হয়।

শিশুর মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা, প্রথমত, প্রত্যক্ষণমূলক স্তর, দ্বিতীয়ত, চিন্তনমূলক স্তর এবং তৃতীয় বিচারকরণমূলক স্তর। এই তিনটি স্তরের অনুভূতিরও তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, প্রথম স্তরের অনুভূতি হল অসংহত প্রক্ষোভ, দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হল সেণ্টিমেণ্ট এবং তৃতীয় স্তরের অনুভূতি হল আদর্শবোধ বা জীবনতত্ত্বের অনুভূতি।

প্রত্যক্ষণমূলক স্তর

প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সহজ ও অবাধ সক্রিয়তা। মনোবিকাশের এই প্রাথমিক স্তরে মন বলতে এই প্রবৃত্তিগুলিরই সমষ্টিকে বোঝায়। এই স্তরে শিশু প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে প্রবৃত্তিগুলি সেগুলির সঙ্গেই সংযুক্ত হয়ে যায়। এই স্তরের নাম প্রত্যক্ষণমূলক স্তর এবং অসংহত প্রক্ষোভ হল এই স্তরের একমাত্র অনুভূতি।

চিন্তনমূলক স্তর

দ্বিতীয় স্তরে হয় চিন্তনের সুরু। পূর্বের অসংহত প্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে গোষ্ঠী-বদ্ধ হতে থাকে এবং তার ফলে মনের মধ্যে একটি একতা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি-গুলির পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এমন একটি নতুন মানসিক একতার সৃষ্টি হয়

যেটি ইতিপূর্বে একেবারে ছিল না। এই স্তরের অসংহত প্রক্ষোভগুলি পরস্পরের সঙ্গে একতাবন্ধ ও সুগঠিত হয়ে সেণ্টিমেণ্টের জন্ম দেয় এবং এই স্তরেই মনের একটি স্বাভাবিক সংগঠিত রূপ প্রথম দেখা দেয়।

বিচারকরণমূলক স্তর

তৃতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে বিচারকরণের শক্তি দেখা দেয়। এই সময় শিশু চিন্তনের সাহায্যে নানা সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় এবং বিচারকরণের মাধ্যমে সে ভালমন্দ ন্যায় অন্যায় নির্ণয় করে। সেই সঙ্গে তার মানসিক সংহতি বা সমন্বয়নের মাত্রা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে যে সকল সেণ্টিমেণ্ট বা অর্জিত প্রবণতা শিশুর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে আবার একটি ব্যাপকতর সংগঠন দেখা দেয় এবং সেণ্টিমেণ্টগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুসংবন্ধ হয়ে একটি সুসংগঠিত আকার ধারণ করে। এই বিচ্ছিন্ন সেণ্টিমেণ্টগুলি সঙ্ঘবন্ধ হয়ে যে নতুন সেণ্টিমেণ্টটির সৃষ্টি করে তাকেই বলা হল মাষ্টার সেণ্টিমেণ্ট[1] বা অধিশাসক সেণ্টিমেণ্ট। ম্যাকডুগাল এই সেণ্টিমেণ্টের নাম দিয়েছেন আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট[2]। সেণ্টিমেণ্ট মাত্রেই কোন না কোন বস্তুকে ঘিরে সৃষ্টি হয় এবং অধিশাসক সেণ্টিমেণ্টটি শিশুর নিজের অহংসত্তাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিচারকরণমূলক স্তরে যে ব্যাপক মানসিক সংগঠনটি ঘটে থাকে তা থেকেই জন্ম নেয় মনের সুসম্পূর্ণ রূপটি। এই স্তরের অনুভূতি হল আদর্শবোধ বা জীবনতত্ত্বের অনুভূতি। এই স্তরেই শিশুর মধ্যে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় এবং এগুলি থেকেই শিশু তার নিজস্ব একটি জীবনদর্শন গঠন করে নেয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানসিক বিকাশের প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে কোন রকম সেণ্টিমেণ্ট জন্মায় না। সেণ্টিমেণ্ট জন্মায় তখন যখন শিশু তার প্রক্ষোভের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করতে শেখে। অতএব সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টির জন্য দুটি বস্তুর সহায়তা অপরিহার্য। প্রথমত, বস্তুটি সম্বন্ধে মানসিক জ্ঞান বা উপলব্ধি এবং দ্বিতীয়ত, বস্তুটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রক্ষোভের জাগরণ। এ দুটি ঘটনা একত্রিত হলেই সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষায় সেন্টিমেন্টের প্রভাব : আত্মবোধের সেন্টিমেন্টের ভূমিকা

সেণ্টিমেণ্ট কথাটির সুনির্দিষ্ট সংব্যাখ্যান প্রথম দেন স্যাণ্ড। পরে ম্যাক্‌ডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা স্যাণ্ডের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রদত্ত মানব আচরণের সংব্যাখ্যানে সেণ্টিমেণ্টকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ম্যাক্‌ডুগালের প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্বে শিশুর জীবন গঠনে সেণ্টিমেণ্টের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে সেণ্টিমেণ্ট হল একটি অতি প্রবল শক্তি।

1. Master Sentiment 2. Self-Regarding Sentiment

জন্মের সময় শিশুর মানসিক কর্মপ্রবণতাগুলি অসংহত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তখন শিশুর ব্যক্তিসত্তা বলে কোন বস্তুই থাকে না। তার আচরণ তখন কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন কর্ম প্রচেষ্টার সমষ্টিমাত্র। কিন্তু সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টির সঙ্গে এই অসংলগ্ন কর্মপ্রচেষ্টাগুলি ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেই সময়েই শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে ওঠে। এই সংগঠনের ফল থেকেই শিশুর সুসংহত মনের অস্তিত্ব প্রথম দেখা দেয়। এই কারণেই ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতির মতে ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টির প্রথম ও অতিপ্রয়োজনীয় সোপান হল সেণ্টিমেণ্টের জন্ম।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর নতুন নতুন অর্জিত আচরণগুলির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তার সেণ্টিমেণ্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ধরনের সেণ্টিমেণ্ট তার মনে গঠিত হবে তার আচরণধারাও সেই মত রূপ নেবে। উদাহরণস্বরূপ, সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধে যদি তার প্রীতির সেণ্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে তবে সে তার সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধেও প্রীতিপূর্ণ আচরণ করবে। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি কাজগুলি সম্বন্ধে যদি তার মধ্যে ঘৃণার সেণ্টিমেণ্ট জাগে তাহলে সে ঐ কাজগুলি থেকে দূরে সরে থাকবে ইত্যাদি। অতএব শিশুর সেণ্টিমেণ্টগুলি কি ধরনের রূপ গ্রহণ করল তা জানা শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কেবল তাই নয় যাতে শিশুর মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার আয়োজন করা শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ। পরিবেশের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিচক্ষণ শিক্ষক শিশুর মধ্যে নানা বাঞ্ছিত সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টি করতে পারেন।

নৈতিক সেণ্টিমেণ্ট

শিশু বড় হলে যে সব সেণ্টিমেণ্ট তার ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিক সেণ্টিমেণ্ট[1]। শিশুর মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় সোপানে শিশু শেখে ভাল মন্দের বিচার করতে। অবশ্য তার এই ভালমন্দের বিচারের পেছনে আছে সমাজের অনুশাসন। সমাজের অনুশাসন পিতামাতা ও অন্যান্য বয়স্কদের মাধ্যমে শিশুর উপর প্রযুক্ত হয়। সেই অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সে শেখে কোন্‌ কাজটি সমাজ অনুমোদিত অর্থাৎ ভাল এবং কোন্‌ কাজটি সমাজ অনুমোদিত নয় অর্থাৎ মন্দ। এ ভাবে সে নিজের বিচারকরণের শক্তির প্রয়োগ করে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সুন্দর-অসুন্দর প্রভৃতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মানসিক সংগঠন গড়ে তোলে। একেই নৈতিক সেণ্টিমেণ্ট বলা হয়। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক সেণ্টিমেণ্টের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুর ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, করণীয়-অকরণীয় ইত্যাদির জ্ঞান তার সুশিক্ষার পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু

1. Moral Sentiment

বিকাশও এই নৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং সামাজিক জীবনের সাফল্য এই নৈতিকবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে নৈতিক সেণ্টিমেণ্টের সুষ্ঠু সংগঠনটি শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু একটু বড় হলেই তার বিভিন্ন সেণ্টিমেণ্টগুলির সমন্বয়সাধক রূপে দেখা দেয় তার আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট[1]। ম্যাকডুগাল এরই নাম দিয়েছেন অধিশাসক সেণ্টিমেণ্ট[2]।

আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট

প্রত্যেক সেণ্টিমেণ্ট কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটিরই এক নিজস্ব সংগঠন ও স্বতন্ত্র গতিধারা আছে। এখন এই বিভিন্ন সেণ্টিমেণ্টগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সমন্বয় না থাকে তবে শিশুর আচরণ পরস্পর-বিরোধী ও অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। সেইজন্য ব্যক্তিসত্তা বিকাশের শেষ স্তরে দেখা দেয় এই আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট এবং এই সেণ্টিমেণ্টকেই কেন্দ্র করে অন্যান্য সেণ্টিমেণ্ট-গুলি একটি সুসংহত সংগঠন তৈরী করে। আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট জন্মলাভ করে শিশুর অহংসত্তাকে কেন্দ্র করে। যেহেতু শিশুর অভিজ্ঞতার সকল বস্তুই কোন না কোন দিক দিয়ে শিশুর অহংসত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই হেতু শিশুর আর সব সেণ্টিমেণ্ট স্বাভাবিক ভাবেই আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এই কারণে এটিকে অধিশাসক সেণ্টিমেণ্টও বলা হয়।

বস্তুত, শিশুর অহংসত্তার সচেতনতা থেকেই এই আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টটি জাগে। নবজাত শিশুর অহম্ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না, কিন্তু যতই সে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ অন্যান্য সেণ্টিমেণ্টের মতই তার নিজস্ব সত্তাকে ঘিরে একটি গভীর প্রক্ষোভমূলক সংগঠন গড়ে ওঠে।

আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টটি সমগ্র মানসিক সংগঠনের কেন্দ্রস্বরূপ বিভিন্নধর্মী সেণ্টিমেণ্টগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য দূর করে এই আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টই তাদের মধ্যে সংহতি আনে এবং ব্যক্তির নৈতিকবোধের প্রধানতম নির্ণায়ক ও নির্ধারক শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টটি শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। সুষ্ঠু ও বাঞ্ছিত মানসিক বিকাশের জন্য এই সেণ্টিমেণ্টের গঠন অত্যাবশ্যক। সেইজন্য যাতে যথা সময়ে এবং স্বাভাবিকভাবে শিশুর মধ্যে এই সেণ্টিমেণ্টটি দেখা দেয় তার ব্যবস্থা করাই হল সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য।

---

1. Self-Regarding Sentiment 2. Master Sentiment

শিশুর মধ্যে সুষ্ঠু অহংবোধ জাগরণের দুটি দিক আছে। একটি শিশুর সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির অবাধ বিকাশ এবং তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন। আর দ্বিতীয় তার সামাজিক সচেতনতার সুষ্ঠু জাগরণ ও পরিপুষ্টি।

এই উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির অনেক কিছু করার আছে। শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টাকে যদি ব্যাহত করা যায়, যদি তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া হয়, যদি কঠিন শাসনমূলক পরিস্থিতিতে তাকে মানুষ করা হয় তবে অনিবার্যরূপে তার অহংবোধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে তার আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্টটি সুষ্ঠু-ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরিণত জীবনে এই সকল শিশু দুর্বলমনা, অব্যবস্থিত-চিত্ত ও উদ্যোগহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর অহংবোধের অবাধিত বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি শিশুর জীবনে কখনই ঘটতে দেওয়া উচিত নয়।

এর পর আসে শিশুর সামাজিক সচেতনতা জাগরণের দিকটি। অহংবোধের সুষ্ঠু বিকাশের উপর শিশুর সামাজিক মনোভাবের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর অহম্ জাগে বাস্তবের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সামাজিক প্রকৃতির। শিশু যতই অন্যান্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সঙ্গে নানারকম আচরণ সম্পন্ন করে ততই তার মধ্যে এই সামাজিকবোধ জেগে ওঠে এবং নিজের অহম্ সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে যে তার এই সত্তাটি আর সকলের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন একটি বস্তু।

কিন্তু এই অহম্ বোধের জাগরণের সময় যদি শিশুর চারপাশের সামাজিক পরিবেশটি সত্যকারের সমাজধর্মী না হয় তাহলে শিশুর অহমের বিকাশ হয়ে ওঠে একমুখী, ভারসাম্যহীন, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিসম্পন্ন। এই জন্য প্রয়োজন শিশুর চার পাশের সমাজটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বাড়ীতে বা স্কুলে যেখানে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যাতে শিশু সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশের সাহায্য পায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। স্কুলে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, খেলাধুলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর উন্মেষমুখী অহংসত্তার স্বাস্থ্যময় বিকাশ ও পরিপোষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

অনুশীলনী

১। সেণ্টিমেণ্ট কাকে বলে ? কিভাবে সেণ্টিমেণ্ট গঠিত হয় বর্ণনা কর।

২। ব্যক্তির চরিত্রবিকাশে সেণ্টিমেণ্টের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। অধিশাসক বা আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট কিভাবে গঠিত হয় বল। চরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশে এই সেণ্টিমেণ্টটির কি ভূমিকা বল।

৪। আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট কাকে বলে ? শিক্ষায় সেণ্টিমেণ্টের প্রভাব বর্ণনা কর।

৫। টীকা লেখ :—

(ক) সেণ্টিমেণ্ট ও প্রবৃত্তির সম্পর্ক (খ) সেণ্টিমেণ্ট ও প্রক্ষোভ (গ) শিশুর ব্যক্তিসত্তা ও আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট (ঘ) সেণ্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স।

ব্যক্তিসত্তা

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তা[1] বা ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে না। সাধারণত মনে করা হয় যে বিশেষ সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন এবং সেই ব্যক্তিত্বের জোরেই তাঁরা জীবনে সাফল্য ও সম্মান অর্জন করে থাকেন। সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্বরূপ মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে সারা জীবন দুঃখে ও পরের অধীনে তাকে কাটাতে হয়। ব্যক্তিত্বের এই সঙ্কীর্ণ ও লৌকিক ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানে গ্রাহ্য নয়। মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, তা সে ব্যক্তিসত্তা দুর্বলই হোক বা সবলই হোক, সামাজিকই হোক্‌ বা অসামাজিকই হোক্‌, স্বাভাবিকই হোক্‌ বা অস্বাভাবিকই হোক্‌। ব্যক্তিসত্তা মানবমাত্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তবে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিসত্তা বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা

ব্যক্তিসত্তার নির্ভুল সংজ্ঞা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া ব্যক্তিসত্তার বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র সংজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট[2] তার ব্যক্তিসত্তার উপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ব্যক্তিসত্তার ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অলপোর্ট এই প্রচলিত সমস্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করে নিজে ব্যক্তিসত্তার একটি সুচিন্তিত সংজ্ঞা দিয়েছেন। নীচে অলপোর্টের সেই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিসত্তার একটি ব্যাপকধর্মী সংজ্ঞা দেওয়া হল। যথা—

"ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান, সেই সঙ্গতিবিধানকে নির্ধারণ করে যে সব জৈব-মানসিক সত্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই সত্তাগুলির প্রগতিশীল সংগঠনেরই নাম ব্যক্তিসত্তা।"

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। যথা—

প্রথমত, ব্যক্তিসত্তা হল একটি চিরগতিশীল সংগঠন। সংগঠন বলতে বোঝায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক কতকগুলি উপাদানের যোগফল নয়, সেগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। তাছাড়া এই সংগঠনও চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং অমোঘ নয়,

---

1. Personality 2. Allport

এ হল সদাপরিবর্তনশীল, নিয়ত বিকাশমান ও বর্ধনধর্মী। যখন এই সংগঠনটি যথাযথভাবে গঠিত হয় না তখনই অস্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিসত্তার উপাদানগুলিকে জৈব-মানসিক সত্তা[1] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জৈব-মানসিক কথাটির অর্থ হল যে এই উপাদানগুলি আংশিক মানসিক, আংশিক দৈহিক অর্থাৎ দেহ ও মন উভয়ের যুগ্ম প্রক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিসত্তার উপাদানগুলি জন্ম নেয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক মানসিক বা নিছক দৈহিক কোন বস্তু নয়, উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতন্ত্র সত্তাবিশেষ। ব্যক্তির অভ্যাস, বিশেষধর্মী বা সাধারণধর্মী মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, অন্যান্য মানসিক সংগঠন ইত্যাদি বস্তুগুলি জৈব-মানসিক সত্তার অন্তর্গত।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিসত্তা বলতে ব্যক্তির কোন আচরণ বা কাজকে বোঝায় না। বরং ব্যক্তির আচরণ বা কাজের পেছনে যে সংগঠনটি বা সত্তাটি আছে তাকেই ব্যক্তিসত্তা বলা যেতে পারে। ব্যক্তিসত্তা যে সব উপকরণ দিয়ে তৈরী সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে নির্ধারিত করে দেয়। অবশ্য ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই তার ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ জানা যায়। এই জন্য উপরের সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত 'নির্ধারণ করে' কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে যে সব সঙ্গতিবিধান করে তার প্রত্যেকটি সময়, স্থান ও গুণের দিক দিয়ে অনন্য এবং অপরের সঙ্গে অতুলনীয়।

সব শেষে, ব্যক্তিসত্তাই নির্ধারিত করে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে। এখানে সঙ্গতিবিধান কথাটি কেবলমাত্র প্রক্রিয়া রূপেই সত্য নয়, বিবর্তনের দিক দিয়েও সত্য। প্রাণী বিবর্তনের মূল কথাই হল সঙ্গতিবিধানের ক্রমোন্নতি। ব্যক্তির প্রাকৃতিক ও সামাজিক, উভয় প্রকার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ব্যক্তিসত্তার দ্বারা। এই দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের প্রক্রিয়াবিশেষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথাটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অলপোর্ট তার ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞায় সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে উপকরণ রূপে কাজ করে সেগুলির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যক্তিসত্তার এই উপাদানগুলির তিনি নাম দিয়েছেন সংলক্ষণ[2]।

ব্যক্তিসত্তার ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যান

আবার অনেক মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণবাদীদের নাম সর্বাগ্রে করতে

1. Psycho-physical System 2. Traits :: পৃঃ ৪৭৮

হয়। অলপোর্ট যেমন ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্যক্তিসত্তার উপাদান বা সংলক্ষণের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে, তেমনই ফ্রয়েড ব্যাখ্যা দিয়েছেন মানবমনের কর্মপ্রয়াস বা প্রেষণার[1] বিভিন্নতার দিক দিয়ে। ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথম মানব আচরণের উৎস বা প্রেষণার অনুসন্ধান করেন এবং পরে সেই প্রেষণার বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিচার করেন। ফ্রয়েড মানুষের এই প্রেষণামূলক শক্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো। লিবিডো হল প্রকৃতিতে যৌনধর্মী এবং শিশুর জন্মের পর থেকেই এই লিবিডো নানা যৌনমূলক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শেষে যৌবনাগমে তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পেঁছয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার লিবিডোর শৈশবকালীন পরিভ্রমণের উপর। ব্যক্তিসত্তার বৈচিত্র্য, স্বাভাবিকতা, অস্বাভাবিকতা সব চরমভাবে নির্ধারিত হয় এই লিবিডোর ক্রমবিকাশের প্রকৃতির দ্বারা।[2] এই জন্য মনঃসমীক্ষকদের মতে ব্যক্তিসত্তার বিকাশে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মূল্য অত্যন্ত বেশী।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশ

জন্মের সময় শিশু কোনরূপ ব্যক্তিসত্তা নিয়ে জন্মায় না। তার মধ্যে থাকে কেবল বহুমুখী বুদ্ধিপ্রচেষ্টা এবং সেই বুদ্ধিপ্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপযোগী নানা প্রকৃতিদত্ত সাজসরঞ্জাম। তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি নিছক সম্ভাবনার রূপ নিয়ে তার মধ্যে নিহিত থাকে। তেমনই আর এক দিক দিয়ে জন্মের মুহূর্ত থেকেই তার উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে পরিবেশের বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তিগুলি। এক দিকে শিশুর বহুমুখী বুদ্ধি প্রচেষ্টা আর এক দিকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি—এ দুয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাই থেকে জন্ম লাভ করে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা।

ব্যক্তিসত্তার এই গঠনের কাজটি কোনদিনই সম্পূর্ণ বা শেষ হয় না। পরিবেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ছেদহীনভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখা দেয়। এক কথায় ব্যক্তিসত্তা স্থির বা নিশ্চল কোন বস্তু নয়, ব্যক্তিসত্তা একটি সদা বিকাশমান, পরিবর্তনশীল গতিধর্মী সত্তাবিশেষ।

যদিও পরিবর্তনশীল তবুও প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই একটি মূলগত অপরিবর্তনীয়তা আছে এবং তার উপর ভিত্তি করেই আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে থাকি। এই অপরিবর্তনীয়তাটুকু না থাকলে আমাদের পক্ষে কারও ব্যক্তিসত্তা নিয়ে কোন অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশের দুটি প্রক্রিয়া

ব্যক্তিসত্তার বিকাশে দুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকর। সে দুটি হল বিভেদীভবন[3] ও সমন্বয়ন[4]।

---

1. Motive 2. পৃঃ ৪০৪—পৃঃ ৪০৫ 3. Differentiation 4. Integration

১। বিভেদীভবন

শিশু যখন জন্মায় তখন সে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে জানে না। সে তখন তার সমস্ত আচরণই সম্পন্ন করে তার সর্বদেহ দিয়ে এবং তার ফলে তার সমস্ত আচরণই হয়ে ওঠে সামগ্রিক প্রকৃতির। প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন আচরণধারার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভেদরেখা থাকার জন্য তারা বিভিন্ন আচরণ স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু সদ্যজাত শিশুর বিভিন্ন আচরণগুলির মধ্যে তেমন কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং সেইজন্য সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অখণ্ড মিশ্র প্রকৃতির আচরণের সৃষ্টি করে। শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার প্রতিক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার আচরণও হয়ে ওঠে অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট, নির্ভুল ও কার্যকর। সে তখন বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষ প্রতিক্রিয়াটি দিয়ে সাড়া দিতে শেখে। এই প্রক্রিয়াটিকেই বিভেদীভবন[1] বলা হয়। ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে এই প্রক্রিয়াটি হল প্রাথমিক সোপানস্বরূপ।

২। সমন্বয়ন

ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি হল দ্বিতীয় সোপানস্বরূপ এবং এই প্রক্রিয়ার উপরেই ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত। যে সব বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ নিয়ে শিশু জন্মায় সেগুলি ক্রমশ পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন মানসিক সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে। প্রথম শৈশবে এই সংগঠনগুলি থাকে বিশৃঙ্খল ও অসংহত অবস্থায়। শিশু যত বড় হয় তত সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল ও ব্যাপকতর সংগঠনের আকার নেয়। একেই সমন্বয়ন[2] প্রক্রিয়া বলা হয়। এই সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটিও আবার একবারে সংঘটিত হয় না। ব্যক্তির মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে যখন সর্বশেষ স্তরে ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি হয় তখন এই সমন্বয়নের কাজটি শেষ হয়।

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন স্তর

যে স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে এই সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় সেগুলি হল অনুবর্তিত রিফ্লেক্স, অভ্যাস, সংলক্ষণ, অহংসত্তাবলী এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা। নীচে এই স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। অনুবর্তিত রিফ্লেক্স

জীবনধারণের উপযোগী প্রাথমিক আচরণগুলি শিশু শেখে যান্ত্রিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।[3] এইগুলি হল শিশুর জীবনের প্রথম শিখন। এই প্রক্রিয়াটির সাহায্যে শিশু নির্ধারিত উদ্দীপকের পরিবর্তে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য

---

1. Differentiation 2. Integration 3. পৃঃ ৩২০

কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হয়। এই অনুবর্তিত রিফ্লেক্সগুলিই শিশুর
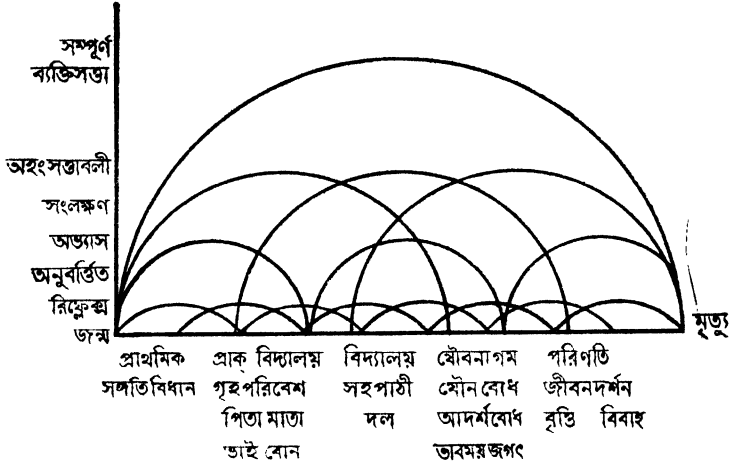
[ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের একটি চিত্ররূপ : অলপোর্টের অনুসরণে]

সহজতম সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা বিশেষ এবং এই গুলির সাহায্যেই শিশু পরিবর্তিত ও নতুন উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে সাফল্যের সঙ্গে সাড়া দিতে পারে।

২। অভ্যাস

প্রথম অবস্থায় এই অনুবর্তিত প্রক্রিয়াগুলি অসংহত ও অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পরে ধীরে ধীরে সেগুলির মধ্যে সমন্বয়ন দেখা দেয় এবং তাই থেকেই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অভ্যাস। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বারবার অপরিবর্তিত এবং গতানুগতিক সাড়া দেওয়াকেই অভ্যাস[1] বলে। এই অভ্যাসের সৃষ্টির স্তর থেকেই প্রকৃত সমন্বয়ন সুরু হয় বলা যেতে পারে।

৩। সংলক্ষণ

সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। এগুলি যেমন মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়, তেমনই আর একদিক দিয়ে এগুলি ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি এবং গতিপথ দুইই নির্ণয় করে। মানসিক সংগঠন অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন, মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, কমপ্লেক্স, আগ্রহ, ইত্যাদি। এই মানসিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সংগঠনগুলিকেই ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ[2] বলা হয় এবং এইগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিসত্তার একক বলে বর্ণনা করা যায়।

৪। অহংসত্তাবলী

সমন্বয়নের পরবর্তী স্তরে এই বিভিন্নধর্মী সংলক্ষণগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে

1. Habit 2. Personality Traits

সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রথম দিকে সংলক্ষণগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর থেকে সম্পর্কশূন্য অবস্থায়। কিন্তু এই স্তর থেকে সেগুলির মধ্যে একটি সুসংগঠিত রূপ দেখা দিতে সুরু করে। এই সংহতি প্রথমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধরনের বিশেষ বিশেষ সংহতির ধারাকে কেন্দ্র করে এক একটি স্বতন্ত্র অহংসত্তার জন্ম হয়। কিন্তু শিশুর সমগ্র অহংবোধের মধ্যে তখনও সামঞ্জস্য ও একতা দেখা দেয় না। তার ফলে এই সময় শিশুর অহম্ সত্তা বিকশিত হলেও সেই অহংবোধ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

৫। ব্যক্তিসত্তা

সমন্বয়নের শেষ স্তরে ব্যক্তিসত্তার গঠন সম্পূর্ণ হয়। এই স্তরে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অহংসত্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক ও অখণ্ড অহংসত্তার সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য ব্যক্তির মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল এই পর্যায়ে সে সবগুলির মধ্যে একটি সংহতি দেখা দেয় এবং ফলে ব্যক্তির সকল প্রতিক্রিয়া একটি সামগ্রিক, সুসংহত ও অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করে। এই সমন্বয়নের স্তরেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পেঁছিয়।

ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সময়গত স্তর বিভাগ

ব্যক্তিসত্তার এই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে শিশুর সময়গত বয়সের দিক দিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই তার অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলির গঠন সুরু হয়। খাওয়া, শোওয়া, চলা, কথা বলা, জিনিসের নাম শেখা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু শেখে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে দু'তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত।

তার পরের ধাপে শিশু যখন কিছুটা বড় হয়, যেটিকে আমরা নার্সারি বা প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তর বলতে পারি, তখন থেকে শিশুর মধ্যে নানা অভ্যাসের গঠন সুরু হয়। ভাষা আয়ত্ত করা, প্রাথমিক আচরণগুলি সম্পন্ন করা, সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন অভ্যাসগুলি শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দেয়। এই সময় শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে তার পরিবার ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ করে তার মা, বাবা, ভাই, বোন প্রভৃতি।

এর পরের স্তরে শিশুর চার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে এবং শিশুর মধ্যে সৃষ্টি হয় সেণ্টিমেণ্ট, মনোভাব, আগ্রহ, কমপ্লেক্স প্রভৃতি নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। বিশেষ বিশেষ

1. Selves

বস্তু ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শিশুর অনুরাগ, বিরাগ, আসক্তি, ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতি গড়ে ওঠে এবং তার আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নধর্মী ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে ওঠে। এই স্তরে শিশু বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং স্কুল, সহপাঠী, বন্ধু, শিক্ষক প্রভৃতি তার ব্যক্তিসত্তার গঠনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

এর পরের স্তরটি হল যৌবনাগমের স্তর। এই সময় শিশুর বিভিন্ন সংগঠন-গুলি ধীরে ধীরে সুসংহত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অহংবোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখনও তার অহংবোধের মধ্যে পূর্ণ সংহতির অভাব থাকে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার অহংসত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। এই স্তরে শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনে তার বহির্জগতের চেয়ে তার মনোজগতের প্রভাবই অনেক বেশী থাকে। এই সময়ে নতুন নতুন ধারণা, আগ্রহ, মনোভাব, আশা ও কল্পনা তার মানসিক সমন্বয়নকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

যৌবনাগমের শেষে ব্যক্তির মধ্যে আসে সব দিক দিয়ে পরিণতি। এই সময়ে তার ব্যক্তিসত্তা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। বহির্জগতের বহুবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াই ধীরে ধীরে একটি সুসংহত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক, নাগরিক কর্তব্য, দাম্পত্য জীবন, জীবিকা অর্জন, বিনোদনমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা ক্রমশ তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয়।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ

শিশুর বহুমুখী বিকাশ প্রক্রিয়ার ফলে তার মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী ধরনের বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। এগুলিকে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ[1] বলা হয়। প্রতিটি সংলক্ষণেরই একটি মানসিক ও একটি আচরণমূলক দিক আছে। যখন কোন সংলক্ষণ কার্যকর হয়ে ওঠে তখন মনের দিক দিয়ে সংলক্ষণটি কোন বিশেষ মনোভাব বা দৃঢ়বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে এবং আচরণের দিক দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট আচরণ ধারার জন্ম নেয়। যেমন, সামাজিকতা[2] একটি ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ। এটি কার্যকর হলে ব্যক্তির মধ্যে মনের দিক দিয়ে অপরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রীতিময় মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তেমনই আচরণের দিক দিয়ে এটি ব্যক্তির মধ্যে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গকামনার প্রচেষ্টারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রকম সমস্ত ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণেরই মানসিক এবং আচরণমূলক দুটি দিক আছে। এই জন্য এগুলিকে জৈব-মানসিক সত্তা[3] বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি জন্মায় সহজাত প্রবণতা ও পারিবেশিক শক্তি, এ

1. Personality Traits 2. Sociability 3. Psycho-physical Entities

দুয়ের পারস্পরিক সংঘাতের ফল থেকে। যদিও কোন সংলক্ষণই চিরস্থায়ী বা চিরস্থির নয়, তবুও এগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির এবং এগুলি থেকে যে সব আচরণ সৃষ্ট হয় সেগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য এবং সঙ্গতি থাকে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্তার একক বলে বর্ণনা করতে পারি। এগুলির দ্বারাই ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়ে থাকে। তবে কেবলমাত্র সংলক্ষণগুলির সমষ্টি বা যোগফলকে ব্যক্তিসত্তা বলে মনে করলে ভুল হবে। ব্যক্তিসত্তা হল এই সংলক্ষণগুলির নিছক সমষ্টির উপরেও অতিরিক্ত কিছু। ব্যক্তিসত্তা বলতে আমরা যে বস্তুটিকে বুঝি সেটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পায় এই বিভিন্নধর্মী সংলক্ষণগুলির সংগঠন থেকে। অর্থাৎ সংলক্ষণগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে যে সমগ্র ও সুসংহত সত্তাটির জন্ম দেয় তাকেই ব্যক্তিসত্তা বলা হয়ে থাকে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিকল্পনা সামাজিক মাপকাঠি বা পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যখন আমরা কোন লোককে গম্ভীর, আমুদে, স্বার্থপর, বন্ধুবৎসল ইত্যাদি বলে বর্ণনা করি তখন আমাদের মন্তব্যের পেছনে থাকে একটি বিশেষ সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা। এইজন্য ব্যক্তিসত্তার পরিকল্পনাটিকেই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তি কি প্রকৃতির তা আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানি না বা জানতে চাইও না। আমরা তাকে বিচার করি সে যে ভাবে নিজেকে আমাদের কাছে উপস্থিত করে তাই থেকে। কোন লোক যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে তবে তাকে আমরা অভদ্র বা অমার্জিত বলে বর্ণনা করি, প্রকৃতপক্ষে সে যদি অন্য প্রকৃতিরও হয় তা হলেও আমাদের কাছে তা গ্রাহ্য নয়। ইংরাজী পার্সোনালিটি কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ পার্সোনা[1] থেকে। পার্সোনা কথাটির অর্থ হল মুখোস। প্রাচীন গ্রীসে যখন রূপসজ্জার তেমন কোন উন্নতি হয়নি তখন অভিনেতারা দর্শকদের কাছে নিজেদের ভূমিকা বা চরিত্রটির পরিচয় জানাবার জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের মুখোস পরত। অতএব পার্সোনালিটি কথাটির অর্থ হল ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে অপরের নিকট প্রকাশ করে তাই।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির দ্বৈততা[2]। মানুষের অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিমুখী-সত্তাবিশিষ্ট। যেমন, সামাজিকতা,—অসামাজিকতা, প্রাধান্য—বশ্যতা, অন্তর্বর্তিতা—বহির্বর্তিতা, ইত্যাদি। কোন সংলক্ষণই চরম মাত্রায় ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। যেমন, কোন লোকই সম্পূর্ণ সামাজিক বা সম্পূর্ণ অসামাজিক প্রকৃতির হয় না। এ দুয়ের মিশ্রিত রূপই সাধারণত মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তবে কোন ব্যক্তির মধ্যে সামাজিকতার লক্ষণ অধিক মাত্রায়

1. Persona 2. Duality

থাকলে তাকে সামাজিক বলা হয়, আবার অসামাজিকতার লক্ষণ বেশী থাকলে তাকে অসামাজিক বলা হয়।

সংলক্ষণের মত অভ্যাস ও মনোভাবও ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচরণ-ধারার সৃষ্টি করে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই অভ্যাসের পরিধি সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সংলক্ষণের পরিধি সে তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। তেমনই মনোভাবমাত্রেই কোন সুনির্দিষ্ট বস্তুকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু সংলক্ষণের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু নেই যাকে কেন্দ্র করে সেটি গড়ে ওঠে।

গিলফোর্ডের ব্যক্তিসত্তার ফ্যাক্টর বা উপাদান

ব্যক্তির আচরণের পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের প্রথাই মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি উপাদান-বিশ্লেষণ বা ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস[1] নামে অধুনা উদ্ভাবিত একটি গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে আরও নির্ভুল ও সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা চলেছে। এই ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস প্রক্রিয়ার সাহায্যে গিলফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা ব্যক্তিসত্তার ১৩টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলি হল এই—১। সামাজিক অন্তর্বৃতি[2] ২। চিন্তামূলক অন্তর্বৃতি[3], ৩। বিষণ্ণতা[4], ৪। অস্থিরচিত্ততা[5], ৫। চিন্তাহীনতা[6], ৬। সাধারণ সক্রিয়তা[7], ৭। প্রাধান্য – বশ্যতা[8] ৮। পৌরুষ-নারীত্ব[9], ৯। হীনতা[10], ১০। স্নায়ু-দুর্বলতা[11], ১১। বিষয়মুখিতা[12], ১২। সহযোগিতা[13] ১৩। অমায়িকতা[14]।

ক্যাটেলের সংলক্ষণ তালিকা

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেলও[15] ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ নির্ণয়ের জন্য নানা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ক্যাটেল ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, বাহ্যিক সংলক্ষণ[16] এবং উৎস সংলক্ষণ[17]। বাহ্যিক সংলক্ষণ বলতে সেই সব সংলক্ষণকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন, আবেগশীলতা হল একটি বাহ্যিক সংলক্ষণ। কোন ব্যক্তি যদি এই সংলক্ষণটির অধিকারী হয় তাহলে সেটি তার বাহ্যিক আচরণেই প্রকাশ পাবে। উৎস সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ভিতরে নিহিত থাকে,

---

1. Factor Analysis 2. Social Introversion 3. Thinking Introversion 4. Depression 5. Cycloid Tendency 6. Rhathymia 7. General Activity 8. Ascendance—Submission 9. Masculinity—Feminity 10. Inferiority 11. Nervousness 12. Objectivity 13. Co-operativeness 14. Agreeableness 15. Cattel 16. Surface Traits 17. Source Traits.

বাইরে থেকে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন প্রভুত্বপ্রিয়তা হল একটি উৎস সংলক্ষণ। এটি সরাসরি ব্যক্তির কোন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না, যদিও তার বহু আচরণের প্রকৃতি এই সংলক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ক্যাটেল তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকে ১২টি উৎস সংলক্ষণ এবং ২০টি বাহ্যিক সংলক্ষণের নাম দিয়েছেন।

এর পরে ক্যাটেল ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস পদ্ধতির প্রয়োগ করে ১৬টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পান। তাঁর বর্ণিত ১২টি উৎস সংলক্ষণের সঙ্গে আরও ৪টি সংলক্ষণ যোগ করে তিনি নীচের ব্যক্তিসত্তার ফ্যাক্টর বা উপাদানের তালিকাটি গঠন করেন। ক্যাটেলের দেওয়া তালিকাটিতে প্রায় প্রতিটি ফ্যাক্টরের দুটি করে বিপরীতধর্মী সংলক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে।[1] যেমন—

১। প্রাক্ষোভিক চরমভাব—প্রাক্ষোভিক সংযতভাব।
২। বুদ্ধি—মানসিক ত্রুটি।
৩। প্রাক্ষোভিক স্থায়িত্ব—সাধারণ মনোব্যাধিপ্রবণতা।
৪। প্রভুত্ব—বশ্যতা।
৫। উচ্ছ্বাসপ্রবণতা—সংযত অভিব্যক্তি।
৬। সুপরিণত চরিত্র—অপরিণত নির্ভরপ্রবণ চরিত্র।
৭। অভিযানমূলক সক্রিয়তা—অন্তবৃত্তি।
৮। প্রক্ষোভমূলক অনুভূতিপ্রবণতা—কঠিন পরিপক্কতা।
৯। অসুস্থ সন্দিগ্ধচিত্ততা—বিশ্বাসপরায়ণ খোলা মন।
১০। দায়িত্বহীন অসাংসারিকতা—ব্যবহারিক সচেতনতা।
১১। কৃত্রিমতা—সরলতা।
১২। সন্দিগ্ধচিত্ততা—বিশ্বাসপ্রবণতা।
১৩। প্রগতিশীলতা—রক্ষণশীলতা।
১৪। আত্মনির্ভরতা—সংকল্পহীনতা।
১৫। ইচ্ছানিয়ন্ত্রণ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা।
১৬। স্নায়বিক উত্তেজনা।

ব্যক্তিসত্তার টাইপ

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের নানা রকম প্রচেষ্টা হয়ে এসেছে। প্রাচীন পরিমাপের প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত দুটি বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথম, দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়, মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা।

1. ক্যাটেলের ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির ইংরাজী নামের তালিকার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালে প্রায়ই হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, নাক, ভ্রূ প্রভৃতির গঠনবৈচিত্র্য বিচার করে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করা হত। যেমন, মহাভারতে ছদ্মবেশী অর্জুনের বর্ণনায় দেখা যায় যে আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ইত্যাদি প্রতিভাবান পুরুষের লক্ষণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। দেহগত বৈশিষ্ট্য বা মনঃপ্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাকে সাধারণত 'টাইপ' বলা হয়ে থাকে।

গলের করোটি-বিচার তত্ত্ব

ব্যক্তিসত্তার টাইপের যে তত্ত্বটি সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে সেটি হল গলের[1] করোটি-বিচারের তত্ত্ব[2]। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মস্তিষ্কের মধ্যে অনুরূপ বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং যে কেন্দ্রটি আকৃতিতে যত বড় হবে সেই কেন্দ্রসংশ্লিষ্ট বিশেষ মানসিক শক্তিটি তত প্রবল হবে। গল দাবী করতেন যে তিনি কোন ব্যক্তির মাথার খুলি বা করোটি পরীক্ষা করে বলতে পারতেন যে তার কোন্ শক্তিকেন্দ্রটি কত শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ, মনোযোগরূপ মানসিক প্রক্রিয়াটির জন্য মস্তিষ্কে একটি নির্দিষ্ট শক্তিকেন্দ্র আছে এবং ঐ শক্তিকেন্দ্রটির উপরি ভাগের মাথার খুলির গঠন পরীক্ষা করে গল বলতে পারতেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির মনোযোগের শক্তি কতটুকু। এইভাবে বুদ্ধি, বিচারকরণ, স্মৃতি, কল্পন প্রভৃতি সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলিরই শক্তির পরিমাপ ব্যক্তির মাথার খুলি পরীক্ষা করে বলা যায় বলে গল দাবী করতেন। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে পরে প্রমাণিত হয়েছে যে গলের এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনাভিত্তিক এবং বর্তমানে এটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসত্তার টাইপের নানা শ্রেণীবিভাগ করেন ইয়ুং[3], ক্রেৎসমার[4], সেলডন[5], ষ্টিভেন্স[6] প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা। এই ধরনের কয়েকটি ব্যক্তিসত্তার টাইপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

ইয়ুঙের টাইপ

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং ব্যক্তিসত্তার একটি টাইপমূলক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তিনি সমস্ত মানুষকেই দুশ্রেণীতে ভাগ করেছেন, অন্তর্বর্তি[7] ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন এবং বহির্বর্তি[8] ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন। ফ্রয়েডের মত ইয়ুঙেরও মতে ব্যক্তির লিবিডো হল তার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তির ধারক। এই লিবিডো যখন বাইরের দিকে উদ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ যখন বাইরের ব্যক্তি, বস্তু, কাজকর্ম প্রভৃতিতে তার প্রাণশক্তি নিজের তৃপ্তি খুঁজে পায় তখন

1. Gall 2. Phrenology 3. Jung 4. Kretschmer 5. Sheldon 6. Stevens 7. Introvert 8, Extrovert

তার ব্যক্তিসত্তাকে বহির্বৃত বলা হয়। আর যখন তার প্রাণশক্তি অন্তরাভিমুখী হয় অর্থাৎ যখন দিবাস্বপ্ন, অবাস্তব কল্পনা, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা প্রভৃতিতেই তার সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়োজিত থাকে তখন তার ব্যক্তিসত্তাকে অন্তর্বৃত বলা হয়। যে ব্যক্তি বহির্বৃত হয় সে প্রকৃতিতে সমাজপ্রিয় ও সঙ্গকামী হয়ে থাকে। সে নানা বাহ্যিক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশা, সামাজিক অনুষ্ঠান ও দলমূলক কাজকর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এরাই সমাজসেবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা প্রভৃতি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অন্তর্বৃত সে প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, চিন্তাশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়। সামাজিক মেলামেশা থেকে সে যতটা পারে দূরে থাকে এবং নিজের মনের অভ্যন্তরে একটি নিজস্ব জগৎ তৈরী করে সেখানেই সে বাস করে।

মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ইয়ুং এইভাবে দু'শ্রেণীতে ভাগ করলেও এই ধরনের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ বাস্তবে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হল এই দু' ধরনেরই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মিশ্র প্রকৃতির ব্যক্তি। তবে কারও মধ্যে অন্তর্বৃতির মাত্রা বেশী থাকে, কারও মধ্যে বা বহির্বৃতির মাত্রা বেশী থাকে। সম্পূর্ণ অন্তর্বৃত বা সম্পূর্ণ বহির্বৃত, এই দুই কাল্পনিক চরম ক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে আমরা এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তির অস্তিত্ব ধরে নিতে পারি যারা অর্ধেক অন্তর্বৃত এবং অর্ধেক বহির্বৃত। এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে আমরা উভবৃত[1] বলতে পারি। বাস্তবে এই উভবৃত ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন লোকই অধিকসংখ্যায় পাওয়া যায়। এঁদের বৈশিষ্ট্য হল যে এঁরা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তর্বৃত, আবার বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বহির্বৃত।

ক্রেৎসমারের টাইপ

ক্রেৎসমার ছিলেন একজন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী বিশেষ বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। যেমন, যারা স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত তারা প্রায়ই লম্বা, রোগা, ওজনে হাল্কা ও সরু-মুখসম্পন্ন ব্যক্তি হয়। আবার যারা ম্যানিকডিপ্রেসিভ ব্যাধির রোগী, তারা খর্বকায়, মোটাসোটা ও গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর পর ক্রেৎসমার সুস্থ মানুষের ব্যক্তিসত্তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর একটি নতুন ধরনের টাইপমূলক শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেন।

তাঁর মতে সমস্ত মানুষকে চারটি টাইপে ভাগ করা যায়—(১) পিকনিক[2], (২) এস্থেনিক[3], (৩) হাইপোপ্লাস্টিক[4] এবং (৪) এ্যাথলেটিক[5]। এই চার ধরনের টাইপের প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে।

পিকনিক টাইপের ব্যক্তিরা দেখতে খর্বকায়, মোটাসোটা এবং গোলাকার দেহবিশিষ্ট

1. Ambivert 2. Pyknic 3. Aesthenic 4. Hypoplastic 5. Athletic

হন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সাইক্লোথিম[1] বলা হয়। এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এঁরা প্রক্ষোভের দিক দিয়ে চরমভাবাপন্ন, অর্থাৎ এঁরা যখন উত্তেজিত হন তখন অত্যন্ত বেশী মাত্রায় হন, আর যখন নিরুৎসাহ হন তখনও চরমভাবে হন। এঁরা সহজেই আনন্দিত হন, আবার সহজেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। প্রকৃতিতে এঁরা মিশুকে, আবেগপ্রবণ, বাস্তববাদী এবং সহিষ্ণু হয়ে থাকেন। এই সাইক্লোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগে আক্রান্ত হন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল, রাশিয়ার ভূতপূর্ব জননেতা ক্রুশ্চেভ প্রভৃতি হলেন পিকনিক সাইক্লোথিম টাইপের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

এস্থেনিকেরা আকৃতিতে দীর্ঘকায়, হাল্কা ও রোগা হয়ে থাকেন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের স্কিৎজোথিম[2] বলা হয়। প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশে এঁরা খুবই সংযত এবং প্রকৃতিতে এঁরা স্বাবলম্বী, সতর্ক, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ হয়ে থাকেন। এঁরা প্রায়ই বাস্তব থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই স্কিৎজোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হন তখন তাঁদের মধ্যে স্কিৎজোফ্রেনিয়া নামে রোগ দেখা দেয়। রাজা গোপালাচারী, কৃপালিনী, জহরলাল, ইংলণ্ডের ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রভৃতি হলেন এই টাইপের দৃষ্টান্ত।

হাইপোপ্লাষ্টিকদের দৈহিক বৃদ্ধি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং সেই জন্য তাঁরা হীনমন্যতাবোধ[3] থেকে ভুগে থাকেন।

এ্যাথলেটিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাই ক্রেৎসমারের মতে দেহ ও মনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ। এঁরা দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে যেমন সমতাসম্পন্ন তেমনি প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক দিয়েও এঁরা সাম্যভাবাপন্ন।

ক্রেৎসমারের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে লৌকিক অভিজ্ঞতা ও ধারণার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে সুনির্দিষ্ট ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মেনে নিতে অনেক মনোবিজ্ঞানীরই আপত্তি আছে। কেননা বাস্তবক্ষেত্রে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

সেলডনের টাইপ

ক্রেৎসমারের মত ব্যক্তিসত্তার টাইপ নিয়ে আধুনিক কালে ব্যাপক গবেষণা চালান সেলডন[4] এবং ষ্টিভেন্স[5]। তাঁরা প্রায় ৪০০ যুবকের নগ্নদেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে তিনটি বিভিন্ন টাইপের নামকরণ করেন। যথা, (১) এণ্ডোমর্ফ[6], এঁরা আকৃতিতে গোলগাল, কোমলদেহবিশিষ্ট এবং উদরপ্রদেশের প্রাধান্যসম্পন্ন। (২) মেসোমর্ফ[7], এঁরা প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট, কঠিন এবং পেশীর প্রাধান্যসম্পন্ন এবং (৩) এক্টোমর্ফ[8], এঁরা দুর্বল দেহবিশিষ্ট শীর্ণ এবং চর্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্যসম্পন্ন।

---

1. Cyclothyme 2. Sch'zothyme 3. Sense of Inferiority 4. Seldon 5. Stevens 6. Endomorph 7. Mesomorph 8. Ectcmorph

সেলডন প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সাত মাত্রার স্কেলে পরিমাপ করেন। এই স্কেলেতে যে চরম এণ্ডোমর্ফ তার স্কোর দাঁড়ায় ৭১১ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফি'তে তার স্কোর ৭ মাত্রা, মেসোমর্ফি'তে ১ মাত্রা, এক্টোমর্ফি'তে ১ মাত্রা), চরম মেসোমর্ফে'র স্কোর হল ১৭১
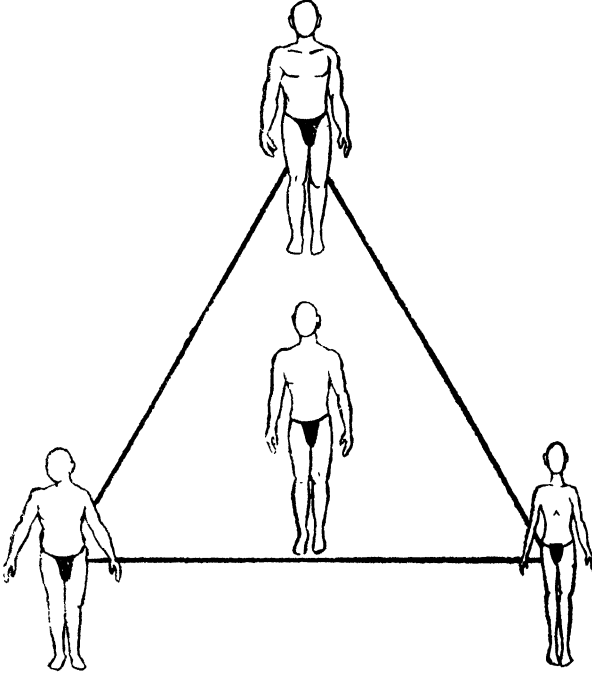
সেলডনের ব্যক্তিসত্তা টাইপের ত্রিভুজ

নীচের বাম কোণে এণ্ডোমর্ফ, ডান কোণে এক্টোমর্ফ এবং সব উপরে মেসোমর্ফ এই তিনটি কোণের ঠিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আদর্শ টাইপের মানুষ। যে কোন ব্যক্তিই এই ত্রিভুজের কোন না কোন একটি জায়গায় পড়বেনই।]

(অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফি'তে তার স্কোর ১ মাত্রা, মেসোমর্ফি'তে ৭ মাত্রা, এক্টোমর্ফি'তে ১ মাত্রা) এবং চরম এক্টোমর্ফে'র স্কোর হচ্ছে ১১৭ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফি'তে তার স্কোর ১ মাত্রা, মেসোমর্ফি'তে ১ মাত্রা, এক্টোমর্ফি'তে ৭ মাত্রা)। বাস্তবে অবশ্য এই ধরনের চরম ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায় না। নিখুঁত হিসাব ধরতে গেলে সাধারণ মানুষের স্কোর ৪৪৪'র কাছাকাছি দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবে যা দেখা যায় তাতে কোন একটি বিশেষ টাইপের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির বেশী ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে এবং অন্য দুটির প্রতি তুলনায় কম ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে। ফলে ৫২৩ বা ৪৩১ বা ১৩৫ এই ধরনের স্কোরই

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কোন ব্যক্তির এই দৈহিক পরিমাপকে তার সোমাটোটাইপ নাম দেওয়া হয়েছে।

এইবার সেলডন এই দৈহিক টাইপগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসিক বৈশিষ্ট্যের তিনটি শ্রেণীবিভাগ করলেন এবং সেগুলির নাম দিলেন (১) ভিসেরোটনিক[1], (২) সোমাটোটনিক[2] এবং (৩) সেরিব্রোটনিক[3]। এই মানসিক টাইপগুলির প্রত্যেকটির তিনি ২০টি করে বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ভিসেরোটনিকদের মধ্যে পরিপাচনমূলক ও বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রাধান্য থাকে; এঁরা দৈহিক আরামপ্রিয় হন, উৎসব, হৈ-চৈ, বাহ্যিক অভিব্যক্তি ভালবাসেন এবং একা থাকা পছন্দ করেন না। এঁরা সহিষ্ণু হন এবং অপরের স্নেহ, প্রশংসা, মনোযোগের প্রত্যাশী হন এবং মনের আবেগ বিনা বাধায় প্রকাশ করেন।

সোমাটোটনিকদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। এঁরা কাজে, কর্মে, কথায়, ভঙ্গীতে প্রভুত্বপ্রিয় হন। এঁরা উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করেন। অপরের অনুভূতির প্রতি এঁরা উদাসীন এবং সরাসরি কাজ করার পক্ষপাতী হন। আচরণে এঁরা উদ্যমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্মী।

সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের অভাব ও অবদমিত আচরণের প্রাধান্য দেখা যায়। এঁরা প্রায়ই ভয়ে ভয়ে সময় কাটান এবং সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলেন। এঁদের মধ্যে সাধারণত আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়।

সেলডন পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর বর্ণিত দৈহিক টাইপ ও মানসিক টাইপের মধ্যে প্রচুর সঙ্গতি আছে। যেমন, মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এণ্ডোমর্ফরা ভিসেরোটনিক টাইপের অন্তর্গত, মেসোমর্ফরা সোমাটোটনিক টাইপের অন্তর্গত এবং এক্টোমর্ফরা সেরিব্রোটনিক টাইপের অন্তর্গত। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে সহপরিবর্তনের মান[4] নির্ণয় করে দেখা গেছে যে এণ্ডোমর্ফ ও ভিসেরোটনিকদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান ·৭৫, মেসোমর্ফ ও সোমাটোটনিকদের মধ্যে এই মান ·৮২ এবং এক্টোমর্ফ ও সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে ·৮১।

আইসেঙ্কের ব্যক্তিসত্তার আয়তন

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী আইসেঙ্ক[5] ব্যক্তিসত্তার বিশ্লেষণে আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং তার উপর ভিত্তি করে এক নতুন ধরনের শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেন। তিনি পূর্বগামীদের মত ব্যক্তিসত্তাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট টাইপে ভাগ করেননি। তার পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তিনটি ডাইমেনসন[6] বা আয়তন আছে। সেই আয়তন তিনটি হল :—

1. Viscerotonic 2. Somatotonic 3. Cerebrotonic 4. Co-efficient of Correlation or 5. Eysenck 6. Dimension

(১) অন্তর্বৃত্তি-বহির্বৃত্তি[1] (২) মনোব্যাধি প্রবণতা[2] এবং (৩) মনোবিকার-প্রবণতা[3]।

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিসত্তার আয়তনের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই, অথচ এই তিনটি আয়তনই কম বেশী মাত্রায় সকলের মধ্যে বর্তমান। এই বিভাগ অনুযায়ী মনোব্যাধি-সম্পন্ন বা মনোবিকারগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের কোন প্রকৃতি-গত পার্থক্য নেই। যে পার্থক্য পাওয়া যায় তা নিছক মাত্রাগত। এই তিনটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ছাড়া আইসেঙ্কের মতে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আরও কতকগুলি সঙ্কীর্ণ ফ্যাক্টর আছে, যেমন, রক্ষণশীলতা—প্রগতিশীলতা[4], সরলতা—জটিলতা[5] এবং দৃঢ়চিত্ততা—কোমলচিত্ততা[6]।

ফ্রয়েডীয় টাইপ

ফ্রয়েড এবং তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের অনুগামীরা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে তার অভ্যন্তরীণ জীবনী-শক্তির বিচিত্র স্বরূপ ও গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে বহুমুখী পরিবেশের প্রভাবের ফলস্বরূপ যে সব তৃপ্তি ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলি ব্যক্তির যৌনতার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে সেই সব অভিজ্ঞতার উপরই মনঃসমীক্ষকেরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ফ্রয়েড ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি টাইপের উল্লেখ করেছেন।

১। মৌখিক-রতিমূলক টাইপ

এই টাইপটি দু'রকমের হতে পারে, যথা—সক্রিয় দংশনকামী টাইপ[7] এবং নিষ্ক্রিয় চোষণকামী টাইপ[8]। মৌখিক সক্রিয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় রূপে অতিমাত্রায় চিবানো ও কামড়ানোর আশ্রয় নিয়ে থাকে। এরা সাধারণত নিরাশবাদী, সন্দিগ্ধমনা এবং হিংসাপরায়ণ হয়। কিন্তু অপর পক্ষে মৌখিক নিষ্ক্রিয় টাইপের ব্যক্তিরা ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শিশুজনোচিত আচরণের আশ্রয় নেয়। এরা আশাবাদী, নির্ভরশীল ও অপরিণত চরিত্রসম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায় এবং আশা করে যে অপরে তাদের যত্ন নেবে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবে।

২। পায়ু-রতিমূলক টাইপ

অতিকৃপণতা, একগুঁয়েমী, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে চরম মাত্রায় দেখা দিয়ে থাকে। এই টাইপের মধ্যেও আবার দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি, ধর্ষণকামী টাইপ[9] আর দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয় টাইপ[10]। প্রথম টাইপের লোকেরা

---

1. Introversion-Extroversion 2. Neuroticism 3. Psychoticism 4. Conservatism -Radicalism 5. Simplicity—Complexity 6. Toughmindedness—Tendermindedness 7. Acting Biting Type 8. Passive Sucking Type 9. Sadistic Type 10. Passive Type

অপরকে নির্যাতিত করে বা কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিরা আত্মনির্যাতনেই আনন্দ পায়।

৩। উপস্থ টাইপ[1]

উপস্থ টাইপের মধ্যে দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি লৈঙ্গিক টাইপ[2]। এটি হল উপস্থ টাইপের প্রাথমিক বা অপরিণত স্তর। এই টাইপের ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল প্রদর্শন-প্রবণতা, উচ্চাকাঙ্খা, দাম্ভিকতা, আত্মরতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে স্বাভাবিক উপস্থ টাইপের ব্যক্তিরা। উপস্থ টাইপের সুষম ও সুপরিণত বিকাশ থেকেই স্বাভাবিক মানুষ দেখা দেয়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে যৌনতা কোন অস্বাভাবিক স্থলে সংবন্ধিত হয়ে থাকে না এবং স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়ে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা ও সংযম, নির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বন, আত্মপ্রিয়তা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটা সমতা দেখা যায়।

বলা বাহুল্য ফ্রয়েডের দেওয়া ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগটি অস্বাভাবিক মানুষকে ভিত্তি করেই গড়া। পুরোপুরি এই ধরনের কোন একটি বিশেষ টাইপে পড়ে এমন ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই শ্রেণীবিভাগগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তাকে যে কতকগুলি অতি গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ[3]

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের প্রচেষ্টা চলে এসেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত পর্যবেক্ষণ ও সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যক্তির আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম, বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা করেই ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করা হত। কিন্তু এতদিন এই পর্যবেক্ষণের পন্থাগুলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। তাছাড়া আগে পর্যবেক্ষণের পরিস্থিতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হত না। সব শেষে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির অভাবে লব্ধ ফলাফলের ব্যাখ্যাও মোটেই নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হত না। এই সব নানা কারণে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের প্রাচীন পদ্ধতিগুলি নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল।

আধুনিক কালে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের বহু আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলিও পর্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতিগুলির সঙ্গে তুলনায় আধুনিক পদ্ধতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি

1. Genital Type 2. Phallic Type 3. Measurement of Personality

অনেক বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ত্রুটিহীন। বর্তমানে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিগুলিও বৈচিত্র্য ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নত প্রকৃতির হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক কালে সংব্যাখ্যান পদ্ধতিও আগের চেয়ে অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। নীচে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা করা হল।

১। সাক্ষাৎকার[1]

ব্যক্তিকে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করে তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করার নাম সাক্ষাৎকার। ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে এটিই হল প্রাচীনতম। বর্তমানে বহু অভিনব বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের মূল্য ও উপযোগিতাকে কোনদিনই অস্বীকার করেন না।

তবে সাক্ষাৎকার সব সময় কার্যকর হয় না। কারণ প্রথমত, যে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয় তার প্রদত্ত উত্তরগুলি সত্য হওয়া না হওয়া তার মনোভাবের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ব্যক্তির প্রকৃত উত্তরটি দেবার ইচ্ছা থাকলেও লজ্জা বা সঙ্কোচের জন্য সে সাক্ষাৎকারকের সামনে সেটি বলতে পারে না। তৃতীয়ত, সাক্ষাৎকারকের নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রচুর পরিমাণে সাক্ষাৎকারের ফলাফলকে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে যে সাক্ষাৎকারের সাফল্য তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে। প্রথমত, সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি যেন সাক্ষাৎকারকের জানা থাকে। দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে সে যেন সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকে এবং তৃতীয়ত, সাক্ষাৎকারক যে প্রশ্নগুলির সাহায্যে ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন সেগুলি যেন সুচিন্তিত এবং কার্যকর হয়।

সাক্ষাৎকারের প্রধান ত্রুটি হল যে এর মধ্যে সাক্ষাৎকারকের নিজস্ব প্রভাব খুব বেশী কাজ করে। বর্তমানে সেই জন্য সাক্ষাৎকারকে ব্যক্তি-প্রভাব-বর্জিত করার চেষ্টা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলির প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট করে এবং প্রশ্ন করার পদ্ধতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সাক্ষাৎকারের নির্ভরশীলতা বাড়াবার চেষ্টা চলছে।

২। কেস হিষ্ট্রি পদ্ধতি[2]

ব্যক্তির অতীত আচরণ, শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা, জীবন-বিকাশের গতিধারা, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি থেকে তার ব্যক্তিসত্তার একটি মোটামুটি ধারণা গঠন করা যায়। এই পদ্ধতিটি মনোব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩। রেটিং পদ্ধতি[3]

রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীতিটি হল কোন ব্যক্তির সম্পর্কে অপরের কাছ থেকে

1. Interview 2. Case Historo Method 3. Rating Method

তথ্য সংগ্রহ করা। বহু প্রকারের রেটিং পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে রেটিং স্কেল[1] এবং সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি[2] দুটি বর্তমানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ক। রেটিং স্কেল

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের ফলাফল বা মনোভাবকে সুসংহত পন্থায় প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালীকে রেটিং স্কেল বলা হয়। শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক, সহপাঠী বা সহকর্মী প্রভৃতিরা রেটিং স্কেলের সাহায্যে কোন বিশেষ ব্যক্তির, কোন দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করতে পারেন। অনেক সময় আবার নিজেই নিজের রেটিং করা যায়।

রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে যে কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে সেটির বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। একেই স্কেল বলা হয়। তারপর ঐ স্কেলের কোন বিভাগে বা পর্যায়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির স্থান সেটা নির্ণয় করা হয়। যেমন, সামাজিকতা রূপ বৈশিষ্ট্যটির নিম্নরূপ রেটিং স্কেল তৈরী করা যেতে পারে।

প্রঃ—লোকটি সামাজিক না অসামাজিক ?

	অতিরিক্ত সামাজিক	কম সামাজিক	মাঝামাঝি সামাজিক	কম অসামাজিক	অতিরিক্ত অসামাজিক
ক		×			
খ			×		
গ					×

উপরের স্কেলটিতে ক, খ, গ, এই তিন ব্যক্তির সামাজিকতার দিক দিয়ে কোথায় কার স্থান তা নির্ণয় করা হয়েছে। রেটিং স্কেলের মাত্রানুযায়ী বিভাগটি সাধারণত তিন, পাঁচ বা সাত মাত্রার হতে পারে এবং সেইমত স্কেলটিকে তিন-মাত্রার[3], পাঁচ-মাত্রার[4] বা সাত-মাত্রার[5] স্কেল বলা হয়ে থাকে। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটি একটি পাঁচ-মাত্রার স্কেলের।

রেটিং পদ্ধতিটি নিছক পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে মতামত জ্ঞাপন এবং লিপিবন্ধ করার একটি সুসংহত পন্থামাত্র। ফলে যে পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে রেটিং করা হয় তার চেয়ে এটি খুব বেশী কার্যকর হতে পারে না। সেইজন্য যে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার যত বেশী সুযোগ পাওয়া যায় সেই বিষয়টিতেই রেটিং তত বেশী নির্ভরযোগ্য হয়। তাছাড়া একজন মাত্র পর্যবেক্ষকের রেটিং-এর উপর খুব বেশী নির্ভর করা উচিত নয়। সেই জন্য আজকাল রেটিং পদ্ধতিতে একের বেশী পরিমাপকারীর সাহায্য

1. Rating Scale 2. Sociometric Method 3. Three-Point Scale 4. Five-point Scale 5. Seven-Point Scale

নেওয়া হয়ে থাকে। যদি একই বিষয়ের উপর অন্তত ৮ জন পরিমাপকারীর রেটিং'র গড় নেওয়া যায় তবে ফলাফলটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রেটিং পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি হেলো এফেক্ট[1] নামে পরিচিত। যখন কোন ব্যক্তির একটি বিশেষ সংলক্ষণের মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটি ধারণা তৈরী হয়ে থাকে তখন তার অন্য একটি সংলক্ষণের রেটিং-এর ক্ষেত্রে সেই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা হয় বেশী, নয় কম রেটিং করে ফেলি। একেই 'হেলো এফেক্ট' বলা হয়। এই 'হেলো এফেক্টে'র ত্রুটি দূর করতে হলে কোন দলভুক্ত সকল ব্যক্তিকে প্রথমে একটি সংলক্ষণের উপর রেটিং করে নিতে হয়। তার পরে সমস্ত ব্যক্তিকে আর একটি সংলক্ষণের উপর রেটিং এবং তার পরে আর একটির উপর এইভাবে পর পর সব কটি সংলক্ষণের উপর রেটিং করতে হয়। এই পদ্ধতিতে রেটিং করলে একটি সংলক্ষণের রেটিং আর একটি সংলক্ষণের রেটিংকে বিশেষ প্রভাবিত করে না।

খ। সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি[2]

ব্যক্তির জীবনধারণের প্রচেষ্টায় এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠনের স্বরূপ এবং বিশেষ কোন গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তির নিজের স্থান পর্যবেক্ষণের জন্য নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি বিশেষ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক-বৈচিত্র্যকে একটি চিত্রের আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে। এই চিত্রটিকে সোসিওগ্রাম[3] বলা হয়। কোন বিশেষ দলের সোসিওগ্রাম তৈরী করার সময় দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে প্রশ্ন করা হয় যে বিশেষ কোন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সে দলের কাকে পছন্দ করে। যেমন, স্কুলের কোন বিশেষ ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হল যে তাকে যদি কোন একটি কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে তার সঙ্গী বা সহকর্মীরূপে সে ক্লাসের কাকে কাকে বেছে নেবে। তারা যে উত্তর দেবে তা থেকে বিভিন্ন ছেলেদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি চিত্ররূপ আঁকা যেতে পারে। নীচে এই ধরনের একটি সমাজমিতিমূলক চিত্র বা সোসিওগ্রাম দেওয়া হল।

ঐ সোসিওগ্রামটিতে কোন স্কুলের একটি বিশেষ ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। তীর ও সরল রেখাগুলির দ্বারা ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিটি জ্ঞাপন করা হচ্ছে। দুটি ছেলের নাম তীর দিয়ে যুক্ত করা হলে বুঝতে হবে যে, যে ছেলেটির প্রতি তীরটি উদ্দিষ্ট তাকে অপর ছেলেটি পছন্দ করে। কিন্তু সেই ছেলেটি অপর ছেলেটিকে পছন্দ করে না। যেমন, পর পৃষ্ঠার

1. Halo Effect 2. Sociometric Method 3 Sociogram

ছবিতে হোসেন অমলকে পছন্দ করে কিন্তু অমল হোসেনকে পছন্দ করে না। আর যেখানে কেবলমাত্র একটি সরল রেখার দ্বারা দুটি নাম সংযুক্ত সেখানে বুঝতে হবে যে ছেলে দু'জনই পরস্পরকে পছন্দ করে। যেমন, সোমেন অমলকে পছন্দ করে আবার অমলও সোমেনকে পছন্দ করে।

এই সোসিওগ্রাম থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ক্লাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে হচ্ছে স্বপন। স্বপনকে ৯টি ছেলে পছন্দ করে, কিন্তু স্বপন মাত্র কাশিম, অতুল আর
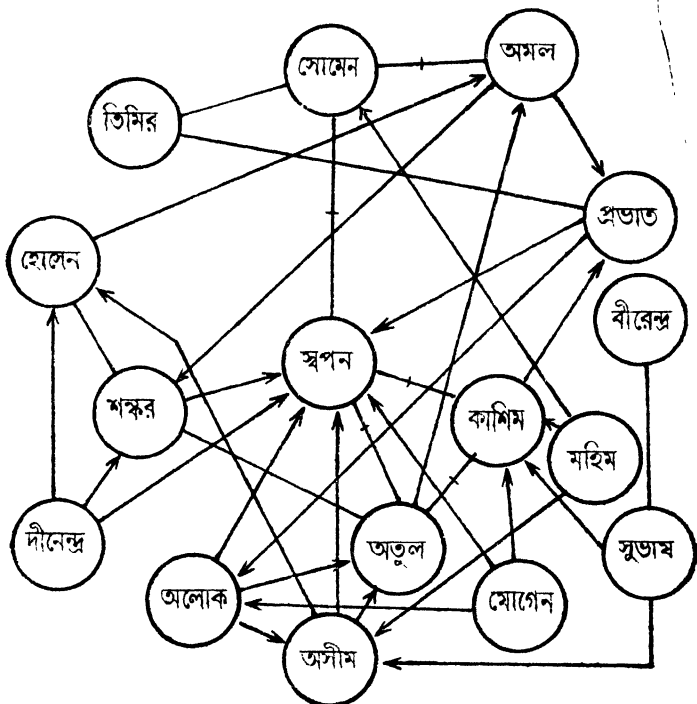
[একটি সোসিওগ্রামের উদাহরণ]

সোমেনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ক্লাসের মধ্যে বীরেন্দ্র হল পরিত্যক্ত ছেলে। তাকে কেউই পছন্দ করে না। তিমিরের ক্ষেত্রটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হোসেন, সোমেন এবং প্রভাত এই তিনটি মাত্র বন্ধু নিয়ে তিমির নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেছে।

সমাজতত্ত্বের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় সোসিওগ্রাম যে যথেষ্ট সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও নানা তথ্য সোসিওগ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। দলের অন্তর্গত অন্যান্য সদস্যদের প্রতি ব্যক্তির কি মনোভাব এবং ব্যক্তির প্রতিও অন্যান্য সদস্যদের কি মনোভাব এই দু'ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই আমরা সোসিওগ্রাম থেকে পেতে পারি।

৪। প্রশ্নাবলী[1]

ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল ব্যক্তিকে তার মনোভাব, মতবাদ, বিশ্বাস, আচরণ, অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। যখন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি প্রশ্ন করা হয় তখন তাকে সাক্ষাৎকার বলা হয়। কিন্তু এ ধরনের সাক্ষাৎকারে প্রায়ই ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং নানা কারণে ব্যক্তি স্বাভাবিক এবং সহজভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু যদি সামনাসামনি প্রশ্ন করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে প্রশ্নগুলি লিখিত রূপে দেওয়া যায় এবং তার পক্ষে অনুকূল পরিবেশে তাকে স্বাভাবিকভাবে সেগুলির লিখিত উত্তর দেবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেখা গেছে যে তাতে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য উত্তর পাওয়া যায়। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দিক দিয়ে এই ধরনের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপরিকল্পিত প্রশ্নাবলী অনেক বেশী কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়া প্রশ্নাবলীতে প্রশ্নগুলি লিখিত আকারে থাকার জন্য মৌখিক প্রশ্নের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে সেগুলির বেশী উপযোগিতা আছে। প্রথমত, প্রশ্নগুলির সংগঠনকে সুনিয়ন্ত্রিত বা আদর্শায়িত[2] করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন লোকের উপর প্রশ্নগুলি প্রযুক্ত হওয়ায় প্রতিটি প্রশ্নের কত বিভিন্ন ধরনের উত্তর পাওয়া যায় তারও একটি সুনির্দিষ্ট বিবরণী রাখা এবং পরে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

(ক) নির্বাচনী প্রশ্নাবলী

কতকগুলি ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী নিছক নির্বাচন বা বাছাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলিকে নির্বাচনী প্রশ্নাবলী[3] বলা হয়। বিশেষধর্মী মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা বিশেষ প্রকারের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে এমন ব্যক্তিদের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেওয়ার জন্য এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রথম তৈরী করেন উডওয়ার্থ ১৯১৮ সালে। এটির নাম সাইকোনিউরটিক ইনভেন্টরি। এই প্রশ্নাবলীটির সাহায্যে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ধরনের অনেকগুলি নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হয়।

(খ) ব্যক্তিসত্তা নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী

ব্যক্তিসত্তার বিশেষ দিকগুলি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আর এক ধরনের প্রশ্নাবলী গঠন করা হয়ে থাকে। এগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্তা নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী[4] বলতে পারি। এই ধরনের প্রশ্নাবলীতে বিশেষ একটি বা একাধিক সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরী করা হয়। পরে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ঐ একটি বা

---

1. Questionnaire 2. Standardised 3. Screening Questions 4. Personality Inventory

একাধিক সংলক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কি মাত্রায় আছে তা নির্ণয় করা হয়। একটি সুপরিচিত ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলীর নাম হল মিনেসোটা মালটিফেসিক পার্সোনালিটি ইনভেণ্টরি[1] এই প্রশ্নাবলীতে মোট ৫৫০টি উক্তি আছে। প্রত্যেকটি উক্তি এক একটি কার্ডে ছাপা থাকে। এই উক্তিগুলি পড়ে ব্যক্তিকে বলতে হয় যে উক্তিটি তার ক্ষেত্রে সত্য কি মিথ্যা।

ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি থেকে তার ব্যক্তিসত্তার নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে এই ধরনের অনেকগুলি ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী তৈরী হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বার্নরয়টার পার্সোনালিটি টেস্টটির[2] নাম উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলীতে প্রশ্নগুলি একটি মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে থাকে। কখন কখন স্বতন্ত্র কার্ডেও এগুলি মুদ্রিত থাকে। এই প্রশ্নগুলির উত্তরে ব্যক্তিকে সাধারণত 'হাঁ', 'না' বা 'জানিনা' এই তিনটির একটি উত্তর দিতে হয়।

৫। **উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি**[3]

ব্যক্তিসত্তার আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতিটি উপাদান বিশ্লেষণ নামে পরিচিত। এটি উন্নত গাণিতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিটিতে ব্যক্তিসত্তাসূচক বিভিন্ন বৈশিষ্টগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করে ব্যক্তিসত্তার মৌলিক উপাদানগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন গিলফোর্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে ব্যক্তি-সত্তার ১৩টি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মৌলিক উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁরা ব্যক্তিসত্তার নানারকম প্রশ্নাবলী রচনা করেন। তার মধ্যে একটি প্রখ্যাত প্রশ্নাবলীর নাম হল গিলফোর্ড-জিমারম্যান টেমপারামেণ্ট সার্ভে[4]। এই অভীক্ষাটিতে উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া দশটি ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্নাবলী রচনা করা হয়েছে। এতে প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের উপর ৩০টি করে মোট ৩০০টি প্রশ্ন আছে। সেই দশটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ—১। সাধারণ সক্রিয়তা[5]। ২। সংযম[6]। ৩। প্রাধান্য[7]। ৪। সামাজিকতা[8]। ৫। প্রক্ষোভ-মূলক স্থৈর্য[9]। ৬। বিষয়মুখিতা[10]। ৭। বন্ধুত্ব[11]। ৮। চিন্তাশীলতা[12]। ৯। ব্যক্তিগত সম্পর্ক[13] এবং ১০। পৌরুষ[14]।

ক্যাটেলও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। সেটি পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর কোশ্চেনেয়ার[15] নামে পরিচিত। ক্যাটেলের মতে

1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory or M. M. P. I. 2. Burnreuter Personality Test 3. Factor Analysis Method 4. Guilford-Zimmarman Temperament Survey 5. General Activity 6. Restraint 7. Ascendance 8 Sociability 9. Emotional Stability 10. Objectivity 11. Friendliness 12. Thoughtfulness 13. Personal Relation 14. Masculinity 15. Personality Factor Questionnaire

ব্যক্তিসত্তার উপাদান ১৬টি। এই ১৬টি উপাদানকে ভিত্তি করে ক্যাটেলের প্রশ্নাবলীটি রচিত হয়েছে।

৬। বাধ্যতামূলক নির্বাচন পদ্ধতি[1]

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সামনে দুটি বিকল্পমূলক প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয় এবং তার মধ্যে থেকে ব্যক্তিকে একটি নির্বাচন করতে বলা হয়। কখনও কখনও আবার তিনটি বিকল্প দিয়ে বলা হয় যে ঐগুলির মধ্যে যেটি তার কাছে সব চেয়ে বেশী বাঞ্ছিত এবং যেটি তার কাছে সব চেয়ে অবাঞ্ছিত—সেই দুটি নির্বাচন করতে। বিকল্পগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে সেগুলি যেন অভীক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয়তার দিক দিয়ে সমান মানের বলে মনে হয়। যেমন,

তুমি কোন্‌টি পছন্দ কর? নিম্ন বেতনে চিত্তাকর্ষক কাজ করতে, না উচ্চ বেতনে একঘেয়ে কাজ করতে?

কিংবা, তুমি কোন্ ধরনের খ্যাতি পছন্দ কর? শান্ত বলে পরিচিত হতে, না, বন্ধুভাবাপন্ন বলে পরিচিত হতে?

তুমি কি ধরনের স্বামী পছন্দ কর? ধনী অথচ অশিক্ষিত স্বামী, না, দরিদ্র কিন্তু উচ্চশিক্ষিত স্বামী।

সাধারণ প্রচলিত ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলীর চেয়ে এই বাধ্যতামূলক নিবাচন পদ্ধতিতে অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার সম্ভাবনা অনেক কম।

৭। প্রতিফলন অভীক্ষা[2]

আধুনিক প্রতিফলন অভীক্ষাগুলিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এগুলিতে ব্যক্তিকে এমন একটি কাজ করতে বা এমন একটি সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হয় যেটির গঠন অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং তার ফলে সেটি সম্পন্ন বা সমাধান করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। এখানে অভীক্ষক আশা করেন যে ব্যক্তি তার এই কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই নিজের ধারণা, মনোভাব, ইচ্ছা, ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির স্বরূপগুলি প্রকাশ করে ফেলবে। প্রতিফলন কথাটি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব থেকে নেওয়া। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় প্রতিফলন কথাটির অর্থ হল নিজের কোন বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা। এখানে অবশ্য প্রতিফলন কথাটি এই অর্থে নেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তি এই অভীক্ষাগুলি সমাধান করতে গিয়ে তার আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের প্রকৃত ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি বাইরে প্রতিফলিত বা প্রকাশিত করে ফেলে।

এই অভীক্ষাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলিতে যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলির কোন নির্দিষ্ট সংগঠন বা রূপ থাকে না এবং তার ফলে সেগুলির ক্ষেত্রে বহু বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর। এই কাজগুলি সম্পন্ন করতে অভীক্ষার্থী তার

1. Forced-Choice Method 2. Projective Test

কল্পনাশক্তির বাধাহীন প্রয়োগ করতে পারে এবং যে ভাবে সে ঐ অস্পষ্ট বহু-অর্থবোধক বস্তুগুলির ব্যাখ্যা করে তাই থেকে তার মনের অপ্রকাশিত বিভিন্ন দিকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষার যথার্থ প্রকৃতি ও সংব্যাখ্যানের পদ্ধতিটি অভীক্ষার্থীর কাছ থেকে গোপন রাখা সম্ভব হয়। কেননা অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার যে কি ধরনের বা কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন সে সম্পর্কে কিছুই তার জানা থাকে না। তার ফলে তার পক্ষে সচেতনভাবে অভীক্ষার ফলাফলের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, এই অভীক্ষাগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার যে পরিমাপ হয় তা সামগ্রিক প্রকৃতির। ব্যক্তিসত্তার কোন একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা এগুলির উদ্দেশ্য নয়। অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটি অখণ্ড রূপ বা তার মনের সংগঠনের একটি সামগ্রিক ধারণা এগুলি থেকে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এই অভীক্ষাগুলির একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ ধরনের মূল্য আছে। কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

ক। রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষা

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রখ্যাত হল রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষাটি[1]।

[রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষার একটি ছবি]

এই অভীক্ষাটি সুইজারল্যাণ্ডবাসী হারম্যান রর্সা[2] নামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন।

1. Rorschach Inkblot Test 2. Harman Rorschach

একটি কাগজের উপর একবিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক ঐ বিন্দুটির মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় তাহলে ঐ কালির বিন্দুটি থেকে কাগজটির উপর এমন একটি ছবি তৈরী হবে যার খণ্ডার্ধ দুটি মোটামুটি একই রকমের দেখতে হবে। এই ধরনের দশটি কালির ছাপ নিয়ে রর্সার অভীক্ষাটি গঠিত। এই কালির ছাপগুলি একটির পর একটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেগুলি দেখে তার মনে যে সব ধারণা বা কল্পনার উদয় হয় সেগুলি তাকে বর্ণনা করতে বলা হয়। ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি এমনই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির যে এগুলি ব্যক্তির মনে নানা বিভিন্ন ধরনের ভাবধারা ও চিন্তার সৃষ্টি করে। ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক সংগঠন, মনঃপ্রকৃতি, বিশ্বাস, দৃঢ়বদ্ধ ধারণা প্রভৃতির দ্বারাই এই সব ভাবধারা ও চিন্তার স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই জন্য ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে তার মানসিক সংগঠন, প্রবণতা, মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। বর্তমানে এই অভীক্ষাটি মনশ্চিকিৎসার উপকরণরূপে বহুল ব্যবহৃত হয়।

খ। কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা

আর একটি প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হল, মারে[1] ও মর্গান[2] কর্তৃক উদ্ভাবিত কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা[3]। এই অভীক্ষাটি ১৯টি ছবি দিয়ে তৈরী। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়-বস্তু অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং সেটির বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগুলি একটি একটি করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটির উপর একটি করে ছোট নিবন্ধ বা কাহিনী লিখতে বলা হয়। অভীক্ষার্থী ঐ ছবিগুলির উপর যে ধরনের কাহিনী লেখে বা সেগুলির সে যে ধরনের ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে তার অপ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছার বা দ্বন্দ্বের স্বরূপ অভীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী কাহিনী সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে। এটি শিশু সংবোধন অভীক্ষা[4] নামে পরিচিত।

[কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি]

1. Murray 2. Morgan 3. Thematic Apperception Test or TAT
4. Children's Apperception Test or CAT

গ। শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এতে কতকগুলি সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে যে শব্দটি বা চিন্তাটি অভীক্ষার্থীর মনে আসে সেইটি তাকে তৎক্ষণাৎ বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর উত্তর দিতে যতটা সময় লাগে সেই সময় এবং প্রদত্ত উত্তরের প্রকৃতি, এ দুয়েরই বিচার করে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করা হয়। যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে দেরী করে বা একেবারেই না দেয় তাহলে বোঝা যায় যে সে তার মনে আসা প্রথম শব্দটি কোন কারণে বলতে চায় না। উত্তরের প্রকৃতি থেকে অভীক্ষার্থীর অচেতনে নিহিত কমপ্লেক্স এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউঙ[1] এই শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষাটির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। কেন্ট[2] ও রোজানফ[3] মনোব্যাধি চিকিৎসার উপকরণরূপে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। বর্তমানে এই অভীক্ষাটি অপরাধী নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

[কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি]

অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা

উপরের অভীক্ষাগুলি ছাড়াও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বাক্যসম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা, রোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন অভীক্ষা ইত্যাদি। বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যেগুলি নানা বিভিন্ন উপায়ে সম্পূর্ণ করা যায়। এই সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির মনোভাব, প্রবণতা ও মানসিক সংগঠনের একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। তেমনই আর একটি অভীক্ষায় কতকগুলি অসম্পূর্ণ চিত্র অভীক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থী ছবিগুলি কি ভাবে সম্পূর্ণ করল তা পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। রোজেনজুউইগের[4] ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণের অভীক্ষাটিতে কতকগুলি সাধারণ ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গের ছবি দৃষ্টান্ত রূপে দেওয়া

1. Jung 2, Kent 3. Rosanoff 4. Rosenzweig

থাকে এবং সেগুলি দেখে অভীক্ষার্থীর মনে কি ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাকে বর্ণনা করতে বলা হয়।

অনুশীলনী

১। ব্যক্তিসত্তার একটি আদর্শ সংজ্ঞা দাও এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বর্ণনা কর।

২। ব্যক্তিসত্তা বলতে কি বোঝ? দেখাও কিভাবে সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩। ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন টাইপগুলি বর্ণনা কর।

৪। ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ বলতে কি বোঝ? ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন প্রকারের সংলক্ষণগুলি বর্ণনা কর। কিভাবে এগুলি পরিমাপ করা যায় বল।

৫। ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি বর্ণনা কর এবং এটি পরিমাপের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ কর।

৬। ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের উপর একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

৭। টীকা লেখ :

(ক) রেটিং স্কেল (খ) প্রতিফলন অভীক্ষা (গ) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (ঘ) রর্শা ইঙ্ক ব্লট অভীক্ষা (ঙ) কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (চ) সোসিওগ্রাম (ছ) বাধ্যতামূলক নির্বাচন পদ্ধতি।

চরিত্র

ব্যক্তিসত্তার মত চরিত্রেরও[1] কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও চরিত্র কথাটি আমাদের লৌকিক ভাষণে বহু-ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম।

প্রচলিত ভাষণে চরিত্র কথাটির বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। অতএব প্রথমে চরিত্র শব্দটির অর্থের একটি পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রয়োজন।

চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তার তুলনা

অনেক মনোবিজ্ঞানী চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে অলপোর্টের[2] ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র মূলত অভিন্ন। একই বস্তুকে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্য দেওয়া দুটি বিভিন্ন নাম মাত্র। যখন কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমাজ-অনুমোদিত মানের দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার মূল্য-নির্ধারণ করা হয় তখন আমরা তাকে চরিত্র বলি। আর যখন এ ধরনের কোনরূপ মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা থাকে না, নিছক বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়ের উল্লেখ করা হয় তখন আমরা ব্যক্তিসত্তা কথাটি ব্যবহার করে থাকি। এক কথায় চরিত্র হল মূল্য-নিরূপিত ব্যক্তিসত্তা এবং ব্যক্তিসত্তা হল মূল্য-নিরূপণহীন চরিত্র[3]।

বস্তুত চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে দুটি পৃথক সত্তা বলে মনে করা যায় না। দুটিই ব্যক্তির বহুবিধ দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সমষ্টিমূলক সংগঠনের নাম। তবে যখন এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ কতকগুলিকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করি এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সংগঠনটির মূল্য নির্ধারণ করি তখনই আমরা চরিত্র কথাটি ব্যবহার করে থাকি। যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চরিত্রের কথা উত্থাপন করি সেগুলি মূলত সামাজিক ও নৈতিক মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমাজের একজন সদস্যরূপে ব্যক্তির যে সকল রীতিনীতি মেনে চলা উচিত এবং প্রচলিত নৈতিক আদর্শের যে সকল অনুশাসন তার অনুসরণ করা উচিত সেগুলি সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মান বা আদর্শের ধারণা সকল সমাজেই আছে। এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন ব্যক্তির আচরণ-বৈশিষ্ট্যের বিচার করি তখন আমরা চরিত্র কথাটি ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, সততা বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর আচরণের নাম।

---

1. Character 2. Allport

3. "Character is personality evaluated and personality is character devaluated"—Allport

যখন ব্যক্তিসত্তার কোনরূপ মূল্য নির্ধারণের কথা ওঠে না তখন নিছক আচরণরূপে অন্যান্য আচরণ থেকে সততার পৃথক বা স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই। কিন্তু যখনই সামাজিক বা নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈশিষ্ট্যটির বিচার করা হয় তখনই সততা ব্যক্তির চরিত্রের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে চরিত্র বলতে আমরা ব্যক্তিসত্তার সেই ধারণা বা ব্যাখ্যাকে বুঝি যাতে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ঐ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তির সমগ্র সংগঠনটির বিচার করা হয়। এই বিশেষ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক ও নৈতিক আচরণের আদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে সমাজ-নির্ধারিত বিশেষ কতকগুলি মান বা আদর্শের দিক দিয়ে যখন ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার করা হয় তখন আমরা চরিত্র কথাটি ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাধান্যপ্রিয়তা ব্যক্তিসত্তার একটি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ। এটিকে যখন সামাজিক পরিস্থিতি বা ব্যক্তির সঙ্গে তার আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রভৃতির সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন আমরা এটিকে একটি সবল বা সুদৃঢ় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। তেমনই বশ্যতাপ্রবণতা বা হীনমন্যতা ব্যক্তিসত্তার আর একটি সংলক্ষণ। সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে এটি হয়ে দাঁড়ায় একটি দুর্বল বা কোমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন নিছক ব্যক্তিসত্তার দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন সেগুলি ভাল কি মন্দ, কাম্য কি অকাম্য ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যখনই সেগুলিকে চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখনই ভাল মন্দ, কাম্য অকাম্যের প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠে। এক কথায় ব্যক্তিসত্তার ধারণা হল নিছক অস্তিবাচক[1], কিন্তু চরিত্রের ধারণা হল সম্পূর্ণভাবে মানমূলক[2]।

সুচরিত্রের স্বরূপ

প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মান বা মূল্যবোধের দিক দিয়ে চরিত্রের বিচার করা হয়। যে যে বৈশিষ্ট্য এই মান বা মূল্যবোধগুলির দ্বারা অনুমোদিত সেগুলিকে আমরা সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলি। আর যে যে বৈশিষ্ট্য এই মান বা মূল্যবোধগুলির বিচারে পরিত্যক্ত সেগুলিকে আমরা অবাঞ্ছিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। যদিও সুচরিত্রের ধারণা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন তবু সাধারণ সভ্য মনুষ্যসমাজে সুচরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রচুর মিল আছে।

1. Positive 2. Normative

সাধারণত তিন প্রকার মানের দিক দিয়ে সুচরিত্রের বিচার করা হয়ে থাকে। যথা, ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিক, সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের দিক এবং নৈতিক মান বা মূল্যবোধের দিক। ব্যক্তিসত্তার যে সব বৈশিষ্ট্য এই ত্রিবিধ মানের যে কোন একটি মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয় সেই সব বৈশিষ্ট্যকে সুচরিত্রের সূচক বলে ধরা হয়ে থাকে। সুচরিত্র বিচারের এই তিন রকম মান এবং সেগুলি দ্বারা অনুমোদিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। ব্যক্তির কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী

এই বিভাগে সুচরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্য অন্তর্গত যেগুলি ব্যক্তির নিজস্ব উন্নতি, পার্থিব সাফল্য, ব্যক্তিগত জীবনে সন্তুষ্টি ইত্যাদি অর্জনে ব্যক্তিকে সক্ষম করে থাকে। এই পর্যায়ে পড়ে সংকল্পের দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, মানসিক স্থৈর্য, প্রাক্ষোভিক সাম্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি। যে ব্যক্তির মধ্যে এই সব গুণ থাকে তার ব্যক্তিগত জীবন সুখময় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে ওঠে। অতএব এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুচরিত্রের সংলক্ষণ বলা চলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ঠিক বিপরীত হল দুর্বলচিত্ততা, মানসিক চাপল্য, প্রক্ষোভমূলক বৈষম্য, সংকল্পহীনতা ইত্যাদি।

২। সমাজের কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সমানুভূতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজিক আনুগত্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সামাজিক সংগঠন সুদৃঢ় হয় এবং সমাজ জীবন সুন্দর ও স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে। এই সামাজিক গুণগুলির বিপরীত হল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সমাজের প্রতি আনুগত্য বা বিশ্বস্ততার অভাব ইত্যাদি।

অনেক সময় ব্যক্তিকল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজকল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তখন দুয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে সুচরিত্রের লক্ষণ বলে ধরা হবে তা নির্ভর করে সমাজের গৃহীত মূল্যবোধ ও অনুসৃত আদর্শের উপর। যেমন, যে সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতির অবকাশ আছে সেখানে প্রাধান্যপ্রিয়তা বা আক্রমণধর্মিতা রূপ বৈশিষ্ট্যগুলি সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যে সমাজে সামগ্রিক অস্তিত্ব বা সমন্বয়নকে বড় বলে ধরা হয়ে থাকে সে সমাজে উপরের গুণগুলিকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে করা হবে। তেমনই কোন সমাজে বহির্বৃত্তিকে কাম্যগুণ বলে ধরা হয়, আবার অন্য কোন সমাজে অন্তর্বৃত্তিকে ব্যক্তির পক্ষে কাম্য বলে মনে করা হয়ে থাকে। তবে আদর্শ সমাজে ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলী ও সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলীর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা সমন্বয় ঘটে থাকে।

৩। নৈতিক মাননির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যাবলী

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধক গুণগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি গুণকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয় যেগুলি নিছক নীতির দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকুক বা না থাকুক নীতিশাস্ত্রের আদর্শ বা মান অনুযায়ী এগুলি কাম্য এবং তার ফলে এগুলিকে সুচরিত্রের উপাদান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ব্যক্তির দিক দিয়ে বা সমাজের দিক দিয়ে এই গুণগুলির কিছু না কিছু মূল্য আছে। কিন্তু এগুলির স্বপক্ষে যুক্তি রূপে এই ধরনের কোন বাস্তব মূল্যের উল্লেখ না করে ঐগুলির পেছনে নীতিশাস্ত্রের সমর্থনকেই বড় বলে ধরা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় সমস্ত সমাজে সত্যবাদিতা বা সাধুতাকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। এই গুণ দুটির সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্য থাকুক আর না থাকুক, এ দুটিকে সর্বত্রই কাম্য গুণ বলে মনে করা হয় নিছক এগুলির নৈতিক মূল্যের জন্য। দরিদ্র বা দুঃস্থের প্রতি দয়া দেখান, বিশ্বাস রাখা, কৃতজ্ঞতা বোধ করা, সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করা, অতিথিবৎসল হওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সমাজের নীতির দিক দিয়ে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অসাধুতা, মিথ্যা কথা বলা, নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই পর্যায়ের কাম্য গুণের বিপরীত।

চরিত্রের বিকাশ

চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের নামান্তর। তবে স্বতন্ত্রভাবে চরিত্রের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করার অর্থ হল এই যে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার কোন্ স্তরে এবং কিভাবে তার মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা জাগে তা নির্ণয় করা। চরিত্র যখন সামাজিক ও নৈতিকবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন যতক্ষণ না এই বোধগুলি শিশুর মধ্যে জাগছে ততক্ষণ প্রকৃত চরিত্র বলে কোন কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলা চলে না। এখানেই ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য পাওয়া গেল। ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র কোনটিই সহজাত নয়, উভয়ই শিশুর অর্জিত। উভয়ই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ নানাবিধ উপকরণ ও বাহ্যিক শক্তিনিচয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল থেকে জাত। তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা গঠনের কাজ সুরু হয়ে যায়। কিন্তু চরিত্র গঠনের কাজ সুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম তার মধ্যে সামাজিক মনোভাব ও নৈতিক ভালমন্দের বোধ দেখা দেয়। এই দিক দিয়ে বলা চলে যে ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাবের পরবর্তী স্তরে দেখা দেয় চরিত্র।

সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি শিশুর মধ্যে কখন দেখা দেয় এ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে প্রক্ষোভের উপর আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে প্রায় এক বৎসর বয়স থেকে শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা জাগতে সুরু হয় এবং তার কয়েকমাস পর থেকেই সে অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদেরও ভালবাসতে সুরু করে। অতএব নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে এই সময় থেকেই তার চরিত্র গঠনের কাজ সুরু হয়। নৈতিক বিচারবোধ ঠিক কখন জন্মায় তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা চলে না। এ সম্বন্ধে ম্যাকডুগালের একটি তত্ত্বের উল্লেখ করা যায়।

ম্যাকডুগালের চরিত্রের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব

ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা চরিত্র বিকাশের যে সংব্যাখ্যান দিয়েছেন তাতে মূলত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি সেণ্টিমেণ্টকে বা প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে ব্যক্তিসত্তার একক[1] বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে চরিত্রের ক্রমবিকাশের চারটি স্তর আছে।

প্রথম স্তরে থাকে নিছক প্রবৃত্তির প্রাধান্য এবং সে সময় একমাত্র সুখ বা দুঃখের অনুভূতির দ্বারাই শিশুর সমস্ত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্তরে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি কোন বোধই শিশুর থাকে না। এই সময় কোন সামাজিক প্রভাবও শিশুর উপর কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয় স্তরে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ধীরে ধীরে শিশুর উপর সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি সমাজের আরোপিত শাস্তি ও পুরস্কারের প্রভাবের দ্বারা ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। ম্যাকডুগালের মতে এই সময় শিশুর মনে নানারূপ সেণ্টিমেণ্ট জন্মলাভ করে এবং এই স্তরে সেণ্টিমেণ্টগুলি প্রধানত বাড়ীঘর, মা-বাবা, খেলনা ইত্যাদি মূর্ত বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই সময় থেকেই শিশুর চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হয় বলা চলে এবং শিশুর মনে উচিত-অনুচিত ও ভালমন্দের জ্ঞান অল্প অল্প দেখা দেয়।

তৃতীয় স্তরে, শিশুর উপর সামাজিক অনুশাসনের প্রভাব আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং তখন সামাজিক নিন্দা বা প্রশংসাই বিশেষ করে শিশুর সমগ্র আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই স্তরে নানা অমূর্ত বস্তুকে ঘিরে শিশুর মনে সেণ্টিমেণ্টের গঠন সুরু হয় এবং ন্যায়বিচার, সততা, নিষ্ঠুরতা, সৌন্দর্য প্রভৃতি ধারণাকে ঘিরে সেণ্টিমেণ্ট জন্মায়। এই স্তরে চরিত্র গঠনের কাজটি আরও এক সোপান এগিয়ে যায় এবং শিশুর মধ্যে অমূর্ত ধারণার সাহায্যে আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেখা দেয়। চরিত্র বিকাশের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তরে নিছক আদর্শবোধের দ্বারাই শিশুর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত

---

1. Unit

হয়ে থাকে। এই সময় তার চরিত্রের বিভিন্নধর্মী উপাদানগুলির মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ঘটে এবং তার চরিত্র গঠনের কাজটিও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বলা চলে।

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে সামাজিক বোধ ও ভালমন্দের জ্ঞান জাগতে থাকে এবং তৃতীয় স্তরে সেটি আরও পরিণত হয়ে ওঠে। এই তৃতীয় স্তরেই শিশুর নৈতিক আদর্শবোধ সুপরিণত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার আচরণ আর কেবলমাত্র সামাজিক শাস্তি-পুরস্কার বা নিন্দা-প্রশংসার উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার পরিণত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শবোধই তখন থেকে তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এক কথায় তখন তার চরিত্রগঠন পূর্ণতা লাভ করে।

নৈতিক সেণ্টিমেণ্টের সৃষ্টি

ম্যাকডুগালের বর্ণিত ব্যক্তিসত্তা বিকাশের তৃতীয় স্তরে নানা অমূর্ত ধারণাকে ঘিরে সেণ্টিমেণ্ট তৈরী হয়। তাঁর মতে এই সময় শিশুর মনে নৈতিক সেণ্টিমেণ্ট নামে একটি বিশেষ সেণ্টিমেণ্ট গঠিত হয়। এই সেণ্টিমেণ্ট শিশুর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি ধারণাগুলি সৃষ্টি করে। এই নৈতিক সেণ্টিমেণ্ট[1] যাদের মধ্যে দুর্বল থেকে যায় তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে না। ম্যাকডুগাল নৈতিক সেণ্টিমেণ্টকে দ্বিমুখী বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যদি কোন নৈতিক ধারণার প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মায় তখন তার বিপরীতধর্মী ধারণার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাবে। যেমন, সত্যভাষণকে যে ভালবাসে অসত্যভাষণকে সে ঘৃণা করে।

এই নৈতিক সেণ্টিমেণ্টটি মূলত সৃষ্টি হয় সামাজিক জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে। সম্পূর্ণ জনহীন প্রদেশে যে মানুষ হয়েছে তার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক মান জন্মাতে পারে না। সমাজে বাস করা কালীন ব্যক্তি প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা শোনে, সেগুলির বাস্তব উদাহরণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের আচরণের মধ্যে দিয়ে সেগুলি সে আহরণ করে নেয়। ম্যাকডুগালের ভাষায় শিশু যে সব ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করে তাঁদেরই সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে তার নৈতিক সেণ্টিমেণ্টটি গঠিত হয়।

শিশু প্রথমে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ভালবাসে। পরে ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সে ভালবেসে ফেলে। এও এক ধরনের অনুবর্তন প্রক্রিয়া। এইভাবে মূর্তবস্তু থেকে অমূর্ত ধারণাগুলিতে শিশুর সেণ্টিমেণ্ট সঞ্চালিত হয়ে যায়।

---

1. Moral Sentiment

শিক্ষা ও চরিত্র গঠন

শিক্ষার পরিকল্পনায় চরিত্র গঠন যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে একথা বলা বাহুল্য। বহু শিক্ষাবিদ্ চরিত্র গঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করে থাকেন। অবশ্য শিক্ষার লক্ষ্যের এই সংব্যাখ্যানটি অতি সঙ্কীর্ণ হলেও চরিত্র গঠন যে শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি বড় অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুচরিত্র গঠনকে আমরা এক কথায় এই বলে বর্ণনা করতে পারি যে এটি হল ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করা যেগুলি ব্যক্তির নিজের দিক, তার সমাজের দিক এবং অনুমোদিত নৈতিক মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুচরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তিন রকম ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণকে আমরা সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা করে থাকি।[1] সেগুলি হল ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলী, সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলী এবং নৈতিক মান নির্ণায়ক গুণাবলী। এই তিন শ্রেণীর গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করাকেই সুচরিত্র গঠন বলা যেতে পারে। মানসিক দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, প্রাক্ষোভিক সমতা, আত্মসংযম প্রভৃতি গুণগুলি পড়ে ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলীর পর্যায়ে। সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলীর পর্যায়ে এবং সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, কৃতজ্ঞতা, প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে নৈতিক মান নির্ণায়ক গুণাবলীর পর্যায়ে। অতএব সুচরিত্র গঠন বলতে বোঝায় শিশুর মধ্যে এই তিন রকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে সাহায্য করা। এদিক দিয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ার ভূমিকা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা একমাত্র শিশুর শিক্ষার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তার মধ্যে এই গুণগুলি সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

কিন্তু এই গুণগুলি আহরণ করতে শিশুকে কেমন করে সাহায্য করা যায় সেটিই হল শিক্ষার প্রকৃত সমস্যা। একদল শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁরা চরিত্র গঠনে নৈতিক অনুশাসনগুলির উপরই বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন এবং এই গুণগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করেন এগুলির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ মূল্যকে। তাঁদের মতে সৎ হওয়ার জন্যই মানুষ সৎ হবে। সৎ হওয়ার ব্যক্তিগত বা সামাজিক উপযোগিতা থাকলেও তা একান্তই গৌণ। এ সকল ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা শিক্ষকের পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। কেননা নৈতিক অনুশাসনের স্বপক্ষে শিশুকে কোনরূপ যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অথচ বিকাশমান শিশুর মন অন্ধভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না এবং সেজন্য প্রায়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে এই ধরনের শিক্ষার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

---

1. পৃঃ ৫০১—পৃঃ ৫০৩

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের ব্যাপক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে অমূর্ত বা নিছক তত্ত্বমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া খুবই কষ্টকর। প্রকৃত শিক্ষা আসে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। নৈতিক শিক্ষা যেখানে পূর্ণভাবে তত্ত্বনির্ভর সেখানে শিশুর নীতিবোধ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টরূপে গঠিত হয়ে থাকে। এই কারণেই দেখা যায় যে আমাদের অধিকাংশ নৈতিক শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু যদি নৈতিক শিক্ষাকে শিশুর অভিজ্ঞতাভিত্তিক করে তোলা যায় তাহলে শিশুর কাছে সে শিক্ষা কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে ওঠে।

এই কারণে নৈতিক অনুশাসনকে ব্যক্তির নিজস্ব বা সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রদ হয়ে উঠবে। শিশুর মন যুক্তিধর্মী। তার নিজের বা সমাজের কল্যাণের কথা বললে সে সহজেই তা বুঝতে পারে এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেও সে সম্মত হয়। যদি উচিত অনুচিতের মাপকাঠিটিকে ব্যক্তি ও সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে এক করে ফেলা যায় তবে নীতিগত অনুশাসনগুলি মেনে চলতে শিশু আপত্তি করবে না। কিন্তু যদি নিছক করণীয় বলে কোন কাজ শিশুকে করানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে শিশুর মন সেটি মেনে নিতে চায় না এবং ফলে সমস্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে ওঠে।

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তার চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাবের দ্বারা। শিশু যাকে শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে অজ্ঞাতসারে এবং অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই সে তার আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তা, এমন কি চলন ও বাচনেরও অনুকরণ করে থাকে। এই ব্যাপক অনুকরণের ফলে শিশুর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণা প্রভৃতি বহুলাংশে তার সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটির সমধর্মী হয়ে ওঠে এবং তার চরিত্রের ভবিষ্যৎ রূপটি এইভাবেই মূর্ত রূপ ধারণ করে।

অতএব শিশুর চরিত্রগঠনের দায়িত্ব শিশুর পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই। শিশু যাতে অবাঞ্ছিত মনোভাব বা অস্বাভাবিক ধারণার অধিকারী না হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে শিক্ষক, পিতামাতা প্রত্যেকেরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সুচরিত্র গঠনের পন্থা

শিশু যাতে সুচরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে পিতামাতা শিক্ষকদের করণীয় কতকগুলি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা হল। যথা—

১। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণগুলি সৃষ্টি করার একটি কার্যকর পন্থা হল শিশুর

পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ। অধিকাংশ ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণই পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্ট এবং পুষ্ট হয়ে থাকে। সেই জন্য শিশুর পরিবেশকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে তার মধ্যে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে। পরিবেশ বলতে শিশুর চারপাশের ব্যক্তি, বস্তু, প্রচলিত রীতিনীতি, ধারণা প্রভৃতির সমষ্টিকেই বোঝায়।

২। আদর্শ আচরণ অনুষ্ঠান

সুচরিত্র গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হল শিশুর সামনে আদর্শ আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। শিশুর মন অনুকরণধর্মী। তার আশপাশে বয়স্ক ব্যক্তিদের সে যা করতে দেখে তাই সে অনুকরণ করে। যে সমাজে বয়স্কদের আচরণ অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত সে সমাজে শিশুদের চরিত্রও অসংযত ও বিষমধর্মী হয়ে ওঠে। অনেক সময় পিতামাতা বা অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর সামনে অবাঞ্ছিত ও নিন্দনীয় আচরণ করে থাকেন এবং তার ফলে তা বিশেষভাবে শিশুর সুচরিত্র গঠনের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। অতএব বয়স্করা শিশুর সামনে এমন আচরণ করবেন না যা তাকে অবাঞ্ছিত আচরণ সম্পন্ন করতে প্ররোচিত করতে পারে।

৩। মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ

মহৎ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনীও সুচরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, সমাজসেবক প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবনী থেকে শিশুরা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং সেগুলি থেকে তারা বহু বাঞ্ছিত গুণ আহরণ করে থাকে।

৪। কল্যাণবোধের জাগরণ

সুচরিত্র গঠনের আর একটি কার্যকর পন্থা হল শিশুর মধ্যে সত্যকারের কল্যাণবোধ জাগান। তার নিজের এবং তার সমাজের কল্যাণের জন্য কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং কি ধরনের আচরণ করা উচিত নয় এই সচেতনতা যদি তার মধ্যে জাগানো যায় তাহলে অভীষ্ট আচরণগুলি তাকে শেখান শক্ত হয় না। কোন অবাস্তব নৈতিক মানের দোহাই দিয়ে বা কোন অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট আদর্শের কথা বলে শিশুকে প্রভাবিত করার চেয়ে তার নিজের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার পন্থাটি অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ।

৫। বাস্তব উদাহরণ

নিছক বক্তৃতা বা উপদেশের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় না। বরং প্রায় ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল দেখা দেয়। একমাত্র বাস্তব আচরণের মধ্যে

দিয়েই কার্যকর নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। মুখে দয়া বা ক্ষমা সম্বন্ধে হাজার কথা অপেক্ষা দয়া বা ক্ষমার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত শিশুর মনকে অনেক বেশী প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্ত সকল সময়েই উপদেশের চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রদ। সত্য কাহিনী, বাস্তব ঘটনা, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে কার্যকর ভাবে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায়।

৬। সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি

শিশুর মধ্যে সামাজিকবোধ সৃষ্টি করা সুচরিত্র গঠনের একটি কার্যকর পন্থা। শিশু যদি সমাজজীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে এবং যদি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি তার অনুরাগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দলপ্রীতি প্রভৃতি সুচরিত্রের গুণাবলী তার মধ্যে গড়ে ওঠে। বস্তুত সুচরিত্রের বহু গুণই সামাজিক সচেতনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব যাতে শিশুর মধ্যে সমাজপ্রীতি, গোষ্ঠীবিশ্বস্ততা, সহযোগিতা প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় তার আয়োজন করা সুচরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

৭। অন্তর্জাত বা স্বাভাবিক শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলাবোধ সুচরিত্র গঠনের একটি বড় সহায়ক শক্তি। তবে বহিঃশৃঙ্খলা বা কৃত্রিম শৃঙ্খলা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। সবচেয়ে কার্যকর হল স্বতঃপ্রণোদিত শৃঙ্খলাবোধ। শিশুর মধ্যে যাতে সহজ ও স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ প্রথম থেকেই গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ থেকে বহু কাম্য গুণ স্বতঃপ্রসূতভাবেই শিশুর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

৮। অমূর্ত ধারণা ও অবাস্তব মূল্যবোধ পরিহার

যে সকল গুণ শিশুর পক্ষে আহরণ করা উচিত বলে মনে করা হবে সেগুলিকে যেন তার কাছে কতকগুলি অমূর্ত ধারণা বা অবাস্তব মূল্যবোধের রূপে উপস্থিত করা না হয়। সেগুলির সামাজিক ও ব্যক্তিগত উপযোগিতাটাই শিশুর কাছে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

৯। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, যৌথপ্রচেষ্টা, খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক অভীষ্ট আচরণ-বৈশিষ্ট্য শিশুকে শেখান যায়। এ ধরনের দলভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর চরিত্রের ব্যক্তিগত ও সমাজগত সব দিকই স্বাস্থ্যসম্মত

পন্থায় গড়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে একদিক দিয়ে যেমন আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, কর্মকুশলতা প্রভৃতি গুণ গড়ে ওঠে তেমনই আর একদিক দিয়ে সহযোগিতা, যৌথ কর্মপ্রবণতা প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিপুষ্টি লাভ করে।

অনুশীলনী

১। চরিত্র বলতে কি বোঝ? ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে চরিত্রের পার্থক্য বর্ণনা কর।

২। চরিত্রের একটি সংজ্ঞা গঠন কর। শিশুর চরিত্র কি ভাবে বিকশিত হয় বল।

৩। সুচরিত্রের উপাদানগুলি কি কি? শিশুর শিক্ষায় চরিত্রের গুরুত্ব বল।

৪। সুচরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। পিতামাতা ও বিদ্যালয় শিশুর সুচরিত্র গঠনে কি কি পন্থা অনুসরণ করতে পারে বল।

৬। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র বিকাশের সম্পর্কটি বর্ণনা কর।

ছত্রিশ

অভ্যাস

ছোটই হোক আর বড়ই হোক যে কোন আচরণ সম্পন্ন করতে দুটি বস্তুর প্রয়োজন হয়, একটি হল মানসিক প্রচেষ্টা আর একটি হল মনোযোগ। একথা একমাত্র আমাদের সহজাত আচরণগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন শরীর-তত্ত্বমূলক আচরণগুলি বা রিফ্লেক্সগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা বা মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। সেগুলি যন্ত্রের মত নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি ছাড়া সমস্ত শিক্ষাপ্রসূত আচরণের ক্ষেত্রেই প্রচেষ্টা ও মনোযোগের প্রয়োগ অপরিহার্য।

অভ্যাসের স্বরূপ

কিন্তু সাধারণ আচরণও বার বার করতে করতে এমন একটি স্তরে গিয়ে পেঁছয় যখন সেটি সম্পন্ন করতে আর মানসিক প্রচেষ্টা বা মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, রিফ্লেক্স বা অন্যান্য সহজাত আচরণের মতই সেটি নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। এই ধরনের আচরণকেই অভ্যাস[1] নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন প্রথম যখন কেউ সাঁতার কাটতে বা টাইপ করতে শেখে তখন তাকে প্রচুর প্রচেষ্টা ও মনোযোগ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু যখন সাঁতার কাটা বা টাইপ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয় তখন কোনরূপ প্রচেষ্টা বা মনোযোগের সাহায্য না নিয়েই সে অনায়াসে ঐ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অতএব কোন আচরণ যখন বার বার সম্পন্ন করার ফলে এমন স্তরে গিয়ে পেঁছয় যখন সেটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও মনোযোগের সহায়তা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে ও সহজে সম্পন্ন হতে পারে তখন তাকে অভ্যাস বলা হয়। এই কারণে অভ্যাসকে আমরা এক ধরনের যান্ত্রিক আচরণ বলে বর্ণনা করতে পারি।

অভ্যাস হল আচরণের সুসম্পূর্ণ ও ত্রুটিহীন রূপ। এর কারণ হল, কোন আচরণের যখন অতি-শিখন ঘটে তখনই সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে হল অতি-শিখন-জাত কোন আচরণ। আর অতি-শিখনের ফলে আচরণমাত্রেই সমস্ত দোষমুক্ত হয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠে। যেমন, প্রথম যখন ব্যক্তি সাঁতার কাটা শেখে তখন তার আচরণের মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকে। কিন্তু যখন সাঁতার কাটা তার অভ্যাসে দাঁড়ায় তখন তার সাঁতার কাটা নিখুঁত, সাবলীল ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

---

1. Habit

সেই জন্যই অভ্যাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পুনরাবৃত্তি বা বার বার প্রচেষ্টা। অধিকাংশ অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা। থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ অনুশীলনের সূত্রটির এখানে প্রয়োগ করে বলতে পারা যায় যে অভ্যাস গঠন নির্ভর করে আচরণের বার বার অনুষ্ঠানের উপর।

অবশ্য এই পুনরনুষ্ঠান কাজটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঘটতে পারে। কোন কোন অভ্যাস আমরা স্বেচ্ছায় গঠন করি, আবার কোন কোন অভ্যাস আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যায়। শেষোক্ত ধরনের অভ্যাসগুলি অনুবর্তন প্রক্রিয়া[1] থেকে জন্মায় এবং আমাদের দৈনন্দিন আচরণের একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকে। কথা বলা, খাওয়া, শোওয়া, চলাফেরা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি কার্য ঘটিত যে সকল অভ্যাস আমাদের মধ্যে দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশই অনুবর্তন প্রক্রিয়া থেকে প্রসূত।

চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার গঠনে অভ্যাসের ভূমিকা

কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা অভ্যাসের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। উক্তিটি অনেকাংশে সত্য। অলপোর্টের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিসত্তার বিকাশের প্রথম স্তরে শিশু অনুবর্তিত রিফ্লেক্সগুলি আহরণ করে এবং দ্বিতীয় স্তরে এই রিফ্লেক্সগুলি থেকে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তার অতি প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি। এই অভ্যাসগুলি থেকেই পরে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি।

অলপোর্টের বর্ণিত ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে যে অভ্যাস হল ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির মৌলিক উপাদান। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাস থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা বলতে কতকগুলি বিশেষধর্মী বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে সঞ্জাত সংগঠনটিকে বোঝায়। অতএব যদি বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা যে বহুলাংশে তার অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তিকে বন্ধুবৎসল বা সৎ বলে বর্ণনা করার অর্থ হল যে ঐ ব্যক্তির তার বন্ধুদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বা সততা-পূর্ণ আচরণ করার অভ্যাস আছে। কিংবা কাউকে প্রবঞ্চক বা নিষ্ঠুর বলার অর্থই হল ঐ ব্যক্তির প্রবঞ্চনামূলক বা নিষ্ঠুর আচরণ করার অভ্যাস আছে। অতএব ব্যক্তির বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বা ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি প্রত্যক্ষভাবে অভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সাধারণভাবে বলা চলে যে চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাসের রূপেই নিহিত থাকে।

---

1. Conditioning :: পৃঃ ৩২০

বস্তুত সাধারণ মানুষের অধিকাংশ আচরণই অভ্যাসজাত। তাকে যেভাবে আমরা জানি বা চিনি তা মূলত তার অনুষ্ঠিত কতকগুলি আচরণধারা থেকেই। আর এই সুনির্দিষ্ট আচরণধারাগুলির পশ্চাতে আছে তার অর্জিত কতকগুলি সুগঠিত অভ্যাস-সমষ্টি। এই কারণে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমস্ মানুষকে কতকগুলি 'অভ্যাসের চলমান সমষ্টি'[1] বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু অভ্যাসকে চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা সঙ্গত হলেও একমাত্র উপাদান বলা ঠিক নয়। কেননা চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তু। কিন্তু অভ্যাস একটি একান্তভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। অতএব চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনধর্মী দিকটি স্বতন্ত্র উপাদান দিয়ে গঠিত। সামাজিক সচেতনতা, নৈতিক মান সম্পর্কে ধারণা, বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের চরিত্রের স্বরূপ নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং এগুলি কোন সময়েই আমাদের অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং এগুলি প্রয়োজন মত অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তিত করে।

অভ্যাস ও প্রবৃত্তি

অভ্যাসের সঙ্গে প্রবৃত্তির সম্বন্ধ অতি নিকট।[2] জেমসের মতে প্রবৃত্তি থেকে অভ্যাস জন্মায় এবং অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গেলে সেই প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রবৃত্তি হল অভ্যাসের জনক। তাছাড়া তাঁর মতে প্রবৃত্তিকে অবরুদ্ধ করা বা পরিবর্তিত করার শক্তিও অভ্যাসের আছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তির সহজাত আচরণ প্রবণতা পরিবর্তিত, এমন কি লুপ্ত হয়েও গেছে।

অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী

যখন কোন আচরণ যান্ত্রিকতার স্তরে গিয়ে পৌঁছয় তখন তাকে অভ্যাস বলা হয়। যে কোন অভ্যাসের গঠন বিশেষ কতকগুলি নিয়মের উপর নির্ভরশীল। আমরা সেই রকম কয়েকটি নিয়মের এখানে উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, প্রত্যেক অভ্যাস গঠনের পেছনেই একটি উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। কোন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যে প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে সেটি সম্পন্ন করার উপযোগী অনুকূল মানসিক অবস্থা ব্যক্তির অবশ্যই থাকবে। এই জন্যই যে সব আচরণ আমাদের কাছে তৃপ্তিকর বা সন্তোষজনক সেই সব আচরণ সহজেই অভ্যাসে পরিণত হয়। আর যে সব আচরণ আমাদের কাছে দুঃখদায়ক বা কষ্টকর হয় সেগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যথেষ্ট মানসিক প্রচেষ্টার দরকার। সেইজন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে তার মধ্যে সেই অভ্যাসের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি যাতে আগে গড়ে ওঠে তা দেখা প্রথমেই দরকার।

---

1. "a walking bundle of habits." 2. পৃঃ ৪৬—পৃঃ ৪৮

দ্বিতীয়ত, যে আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয় সেই আচরণটির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই সচেতনতা থাকে। ব্যক্তির জ্ঞাত মনের কাছেই হোক্, আর অজ্ঞাত মনের কাছেই হোক্ ঐ আচরণটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগে ধারণা না থাকলে সেটি অভ্যাসে পরিণত হতে পারে না। এই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে ঐ আচরণটির সার্থকতা বা মূল্য সম্পর্কে শিশুকে প্রথমেই সচেতন করা দরকার। এই সার্থকতা বোধ বা সচেতনতা শিশুর মধ্যে জাগলে আচরণটি সহজে অভ্যাসে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, পুনেরনুষ্ঠান বা বার বার আচরণ সমস্ত অভ্যাসের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। প্রত্যেক অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা। শিশুর আচরণকে সহজসাধ্য, ত্রুটিহীন ও যান্ত্রিক করে তুলতে হলে তাকে ঐ আচরণটি বার বার অনুশীলন করতে দিতে হবে।

চতুর্থত, প্রত্যেক অভ্যাসের সংগঠনই অনুকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। অতএব শিশুর মধ্যে কোনও অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তার উপযোগী ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, অভ্যাস মাত্রেই এক ধরনের শিখন। থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র অনুযায়ী যে অভ্যাসটি গঠনে ব্যক্তির মনে তৃপ্তি আসে সে অভ্যাস সহজে গঠিত হয়। এই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে সেই অভ্যাসটির ফল যাতে শিশুর কাছে তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

সবশেষে, অনেক অভ্যাস নিছক যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হয়ে যায়। এই অভ্যাসগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুবর্তন প্রক্রিয়া থেকে জন্মলাভ করে। আবার অনেক অভ্যাস আছে যেগুলি ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে এমন কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গঠিত হয়ে যায়। শিশুর পরিবেশকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করে সুপরিকল্পিত অনুবর্তনের মাধ্যমে খুব সহজেই শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত অভ্যাস সৃষ্টি করা যেতে পারে। সামাজিক রীতিনীতি, ভদ্রতা, শালীনতা প্রভৃতি ঘটিত অভ্যাসগুলি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখান যেতে পারে।

অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলীর গুরুত্ব

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাস গঠনের নিয়মগুলির বিশেষ মূল্য আছে। বাঞ্ছিত অভ্যাসগঠন শিক্ষার একটি মূল্যবান অঙ্গ। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন, শৈশবে শিশুর মধ্যে নানা আচরণমূলক অভ্যাস গঠন করতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়তে পারা, লিখতে পারা, শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারা, রেখাচিত্র আঁকতে পারা, গণনা করতে পার

ইত্যাদি শিক্ষামূলক অভ্যাসগুলি শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। উপরের অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী শিক্ষকের জানা থাকলে প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি শিশুর মধ্যে গঠন করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষক নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারেন। যথা—

প্রথমত, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে কি করে পড়তে হয় তা শিশুকে শেখাতে হবে। যদি শিশু ভালভাবে পড়তে শেখে তাহলে স্বভাবতই তার মধ্যে পঠনের অভ্যাস গড়ে উঠবে। এ থেকে শিশুর মধ্যে পঠনের জন্যে মানসিক প্রস্তুতিও জন্মাবে।

দ্বিতীয়ত, উচ্চস্বরে ও নীরবে দু'ধরনের পঠন সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে যাতে যখন যেমন প্রয়োজন সেইমত পঠনের সাহায্য সে নিতে পারে।

তৃতীয়ত, শিশু যখনই কোন কিছু পড়বে তখনই যেন ঐ পাঠ্যবিষয়টি সুন্দর করে পড়ে নেয়। এতে সে পঠনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু তার পাঠ্যবিষয়টি অতি দ্রুত ও অযত্নের সঙ্গে পড়ে নিয়ে পাঠ্যবিষয়টির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়। তাতে পঠনের তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়। শিশু যাতে তার প্রতিটি পাঠ্যবিষয় সুন্দর করে আবৃত্তি করে পড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

চতুর্থত, পঠনের পশ্চাতে কেবল বিদ্যালয়ের পড়া তৈরী করার চাপ থাকলে চলবে না। শিশু যেন পড়ায় সত্যকারের আগ্রহ অনুভব করে। তার জন্য শিশুর মধ্যে সত্যকারের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা বা কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হবে। কৌতূহলী শিশু যা দেখে তাই পড়ে। তার এই স্বাভাবিক কৌতূহলকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে পঠনের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে।

পঞ্চমত, শিশুর ক্রমবর্ধমান কৌতূহল যাতে পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয় তার জন্য উপযুক্ত পঠনসামগ্রীর আয়োজন করতে হবে। এর জন্য দরকার শিশুর প্রয়োজন-উপযোগী পুস্তকাগার। শিশুর কৌতূহল একমুখী নয়, বহুমুখী। অতএব তার সেই বহুমুখী কৌতূহল তৃপ্ত করতে পারে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ পঠনসামগ্রী যাতে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় তার আয়োজন পুস্তকাগারে রাখতে হবে।

শিক্ষা ও অভ্যাস

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির দিক দিয়ে অভ্যাস একটি যান্ত্রিক আচরণ হলেও নূতন ও সৃজনমূলক আচরণমাত্রেই অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার অগ্রগতি অভ্যাস গঠন ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাপনেও অভ্যাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীচে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের কয়েকটি মুখ্য উপযোগিতার উল্লেখ করা হল।

অভ্যাসের উপযোগিতা

প্রথমত, আমাদের শিক্ষার সর্ববিধ অগ্রগতির বাহক হল অভ্যাস। পুরাতন আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলেই আমাদের পক্ষে নূতন আচরণ শেখার চেষ্টা করা ও তাতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন আচরণগুলির অভ্যাস গঠিত না হলে নূতন আচরণ শেখা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক আচরণেই যদি সকল সময় একই পরিমাণ প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দিতে হত, তাহলে আমাদের মানসিক শক্তির পক্ষে বহুসংখ্যক আচরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না এবং আমাদের অগ্রগতির পথও অবরুদ্ধ হয়ে যেত। যেমন, শিশুর অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠিত হলেই তার পক্ষে শব্দ লেখা সম্ভব হয়, শব্দ লেখার অভ্যাস গঠিত হলেই তার পক্ষে বাক্য লেখা সম্ভব হয় এবং বাক্য লেখা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখনই তার পক্ষে মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা এবং প্রবন্ধ-কবিতা ইত্যাদি রচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। যার অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠিত হয় নি তার পক্ষে পরবর্তী কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, অভ্যাসের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অভ্যাসমূলক আচরণ সহজসাধ্য ও আয়াসহীন। ব্যক্তির পক্ষে কোন নতুন আচরণ সম্পন্ন করার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় যে কোন অভ্যাসমূলক আচরণ সম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব।

তৃতীয়ত, অভ্যাসের ক্ষেত্রে সময়েরও যথেষ্ট সাশ্রয় হয়ে থাকে। সাধারণ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে কোন অভ্যস্ত আচরণ সম্পন্ন করতে।

চতুর্থত, অভ্যাসমূলক আচরণমাত্রেই অনেক বেশী কার্যকর ও ত্রুটিহীন হয়। সাধারণ অনভ্যস্ত আচরণের মধ্যে নানা ধরনের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু অভ্যাসলব্ধ আচরণে সে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি বহুলাংশে দূর হয়ে যায় এবং আচরণটি ত্রুটিহীন, নিখুঁত ও অনেক বেশী কার্যকর হয়ে ওঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অভ্যাস গঠন অপরিহার্য। শিক্ষণীয় আচরণগুলি যতই অভ্যাসে পরিণত হবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ততই নতুন শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হবে। এই সব কারণে অভ্যাসকে কেবলমাত্র একটি যান্ত্রিক আচরণ বলে গণ্য করা ভুল হবে। জন ডিউই অভ্যাস গঠনকে ব্যক্তির ধারাবাহিক শিক্ষা-প্রবাহের একটি সক্রিয় অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে যখন একটি অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তখন সে অভ্যাস ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার পরবর্তী শিক্ষার প্রকৃতিও এই পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে অভ্যাস দু'দিক দিয়ে সাহায্য

করে। প্রথমত, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও মনোযোগের অপচয় বাঁচিয়ে তাকে নতুন শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ করে এবং দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনে পরিবর্তন এনে তার পক্ষে ভবিষ্যৎ শিক্ষাগ্রহণ সহজ করে তোলে।

চিন্তনের অভ্যাস

এত গেল আচরণমূলক অভ্যাসের কথা। এছাড়া আরও দু'শ্রেণীর অভ্যাস আছে, যা শিশুর আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সে দুটি হল চিন্তার অভ্যাস এবং ইচ্ছার অভ্যাস। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দু'শ্রেণীর অভ্যাসের গুরুত্ব যথেষ্ট। কোন কিছু সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার মধ্যেও প্রচুর প্রচেষ্টা এবং মনোযোগের প্রয়োজন হয়। চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। বিভিন্ন প্রতীকগুলিকে সুসংহতভাবে ব্যবহার করার উপর সুষ্ঠু চিন্তন নির্ভর করে। চিন্তন প্রক্রিয়ার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই তার চিন্তা পরস্পরবিরোধী, অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর মধ্যে যদি চিন্তনের অভ্যাস গঠন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কোন রকম প্রয়াস ও মনোযোগ ছাড়াই সে সুসংহতভাবে চিন্তা করতে পারছে। তাছাড়া চিন্তনের মধ্যে যখন সামঞ্জস্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তখনই চিন্তন কার্যটি অভ্যাসের পর্যায়ে উঠতে পারে। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চিন্তা করার অভ্যাস থাকলেই চিন্তন আয়াসহীন ও সার্থক হয়ে ওঠে।

ইচ্ছার অভ্যাস

তেমনই ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাসও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাস থাকলে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, সংশয় প্রভৃতির দ্বারা কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রায়ই দেখা গেছে যে বিভিন্ন চিন্তার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির পক্ষে কোন সুনির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একমাত্র ইচ্ছার অভ্যাসই ব্যক্তির আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনিশ্চিত পথে পরিচালিত করতে পারে। যে ব্যক্তির ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাস নেই তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা থাকে না এবং তার পক্ষে কোনও সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করাও সম্ভব হয় না।

অভ্যাসের অপকারিতা

অভ্যাসের যেমন অনেকগুলি গুণ আছে তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও আছে। যথা—

প্রথমত, অভ্যাস মাত্রেই একবার অর্জিত হলে সহজে দূর হতে চায় না। প্রয়োজনের সময় অভ্যাসের সৃষ্টি যেমন ব্যক্তির পক্ষে সহায়ক, তেমনই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সে অভ্যাস দূর করা একই রকম কষ্টকর।

দ্বিতীয়ত, অভ্যাস যান্ত্রিক প্রকৃতির এবং এর মধ্যে কোন অভিনবত্ব আনা যায় না। ব্যক্তির মধ্যে একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে অভ্যাস তার গতানুগতিক পথ অনুসরণ করেই চলে।

তৃতীয়ত, যে অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্রিক অর্থাৎ যে অভ্যাস উদ্দেশ্যহীন ভাবে গঠিত সে অভ্যাস শিক্ষার প্রতিবন্ধক। অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনার চাপে শিশু এমন কতকগুলি অভ্যাস অর্জন করে যেগুলি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ও যান্ত্রিক। সেগুলি শিশুর অগ্রগতির পথে পরম বিঘ্ন হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার সহজ সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব দেখতে হবে যে শিশু যখন কোন অভ্যাস আহরণ করে, তখন যেন সে সেই অভ্যাসের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকে। উদ্দেশ্য-হীন ও অন্ধভাবে অর্জিত অভ্যাস মানসিক শক্তি ও প্রচেষ্টার নিছক অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

পিতামাতা ও শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু এমন কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস আহরণ করতে পারে যেগুলি তার সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। যে সকল ছেলেমেয়ের শৈশবকালীন আচরণ গঠনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না তারা বড় হয়ে কথা বলা, পড়া, লেখা, পোষাক পরা, শারীরিক স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মানা ইত্যাদি আচরণগুলির ক্ষেত্রে নানা ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস অর্জন করে এবং বড় হয়ে সেগুলি পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন, অশুদ্ধ উচ্চারণ করা, হাতের লেখা খারাপ হওয়া, ঠিক মত পড়তে না পারা, অপরের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ করতে না পারা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মাদি না মানা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলি বড়দের অবহেলার জন্যই শিশুরা আহরণ করে থাকে এবং সারাজীবনই সেগুলি তাদের মধ্যে থেকে যায়।

কু-অভ্যাস দূর করার উপায়

সু-অভ্যাস যেমন উপকারী, কু-অভ্যাস তেমনই ক্ষতিকর। ব্যক্তির সদিচ্ছা থাকলেও কোন অভ্যাসের বশবর্তী হলে সে বাঞ্ছিত আচরণটি সম্পন্ন করতে পারে না এবং অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না। এই জন্য অভ্যাসকে মানুষের 'দ্বিতীয় স্বভাব'[1] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিশুর মধ্যে যাতে কু-অভ্যাসের সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত এবং যদি কোনও কারণে কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে অবিলম্বে তা দূর করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শিশুর কোন বিশেষ কু-অভ্যাস দূর করতে হলে নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করা দরকার।

প্রথমত, অভ্যাসটির অপকারিতা সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করতে হবে। অভ্যাসটি

1. Second Nature

বাঞ্ছিত নয় এবং সেটি যে দূর করা দরকার এই বোধটি তার মধ্যে প্রথমে জাগাতে হবে। কোন অভ্যাস দূর করতে হলে সচেতন মানসিক প্রয়াসের প্রয়োজন এবং তা একমাত্র দেখা দিতে পারে যদি অভ্যাসটির অবাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে শিশুর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।

দ্বিতীয়ত, কোন অভ্যাসকে নষ্ট করতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তি বা ইচ্ছার প্রয়োজন। শিশু যাতে সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা ও সংকল্প তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। এই মানসিক দৃঢ়তা বা সংকল্প সহজে শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা ও বিচক্ষণ সুপরিচালনা।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক অভ্যাসগত আচরণই ব্যক্তির কাছে তৃপ্তিদায়ক। সেজন্য কোন মন্দ অভ্যাস দূর করতে হলে সেটিকে শিশুর কাছে বিরক্তিকর করে তুলতে হবে। অর্থাৎ শিশু যখন সেই অভ্যাসটি সম্পন্ন করবে তখন দেখতে হবে যেন তার মধ্যে বিরক্তি বা অসন্তোষ জাগে। তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যাসটি তার মধ্যে থেকে চলে যাবে। সমালোচনা, বোঝান, মনোবিজ্ঞানমূলক শাস্তি, নিন্দা ইত্যাদির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই বিরক্তি বা অসন্তোষ সৃষ্টি করা যায়। তবে এই পন্থাগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ও সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে। কেননা এগুলির অতিরিক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বাঞ্ছিত ফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলেরই সৃষ্টি করে।

চতুর্থত, অভ্যাস মাত্রেই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। অতএব যদি অভ্যাস সম্পাদনের মাঝে মাঝে বাধা দেখা দেয় তাহলে সে অভ্যাস দুর্বল হয়ে ওঠে। এইজন্য শিশু যখন কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস সম্পন্ন করবে তখন তার আচরণে বাধার সৃষ্টি করা যেতে পারে। অনুবর্তন দূর করার একটি পন্থা হল অনুবর্তন থেকে জাত তৃপ্তি বা সন্তুষ্টির উৎসটি বন্ধ করা এবং তার ফলেই অপানুবর্তন দেখা দেবে। দেখতে হবে যে শিশু ঐ অভ্যাসটি থেকে যে তৃপ্তি আহরণ করে সে তৃপ্তি সে যেন আর আহরণ করতে না পারে।

পঞ্চমত, কু-অভ্যাস দূর করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তার বিপরীত অভ্যাসটি গঠন করা। শিশুর যে অভ্যাসটি দূর করতে হবে তার বিপরীতধর্মী অভ্যাসটি যদি তার মধ্যে গঠন করা যায় তাহলে ঐ অবাঞ্ছিত অভ্যাসটি নিজে নিজেই চলে যাবে। যেমন, যে শিশুর দেরীতে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস তার মধ্যে যদি রোজ সকালে বেড়াতে যাবার অভ্যাস তৈরী করা যায় তাহলে ঐ দেরীতে ওঠার অভ্যাসটি স্বভাবতই আর থাকবে না।

ষষ্ঠত, অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবেই নানা অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তন করাই অভ্যাসটি দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। দেখা গেল যে কোন বিশেষ পরিবেশে বা বন্ধুমহলে থাকার ফলে শিশুর মধ্যে তাস খেলার

অবাঞ্ছিত অভ্যাসটি গড়ে উঠেছে। তাকে যদি ঐ পরিবেশ বা বন্ধুমহল থেকে সরিয়ে আনা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তার ঐ অভ্যাস চলে গেছে।

সবশেষে, সুপরিচালনা কু-অভ্যাস দূরীকরণ ও সু-অভ্যাস গঠনের অপরিহার্য উপকরণ। কোন্ ধরনের আচরণ শিশুর সাফল্যের পক্ষে সহায়ক এবং কোন্গুলি নয় সে সম্বন্ধে তার মনে দৃঢ়বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করতে হবে। উপযুক্ত সুপরিচালনার ফলে শিশু তার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে শিখবে এবং যে অভ্যাসটি সে মন্দ বলে মনে করবে সেটি সে নিজেই দূর করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করবে।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সু-অভ্যাস, কু-অভ্যাস দুয়েরই গঠনে বয়স্কদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহদান অবশ্যই থাকে। শিশুর কোন অভ্যাসই বয়স্কদের চক্ষুর অন্তরালে বা অজ্ঞাতসারে গঠিত হতে পারে না। সেজন্য কু-অভ্যাস যাতে তার মধ্যে সৃষ্টি না হয় সেদিকে বয়স্করা অবশ্যই দৃষ্টি রাখবেন। শিশুর কু-অভ্যাস দূর করার প্রকৃষ্টতম পন্থা হচ্ছে তার মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন করা। অতি শৈশব থেকে শিশুর অভ্যাসগুলি যাতে বাঞ্ছিত ও পরিকল্পিত পথে গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সকল বয়স্কের কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। অভ্যাস কাকে বলে? অভ্যাস গঠনের প্রধান নীতিগুলি আলোচনা কর।

২। 'মানুষ অভ্যাসের চলমান সমষ্টি বিশেষ' আলোচনা কর। মানুষের জীবনে অভ্যাসের প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। অভ্যাসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর এবং অভ্যাস গঠনের উপযোগিতা ও অপকারিতাগুলি বল।

৪। শিশুর জীবনে অভ্যাসের প্রভাব বর্ণনা কর। কি ভাবে সু-অভ্যাস গঠন করা যায় ও কু-অভ্যাস দূর করা যায়?

৫। অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী আলোচনা কর ও শিক্ষায় সেগুলির প্রয়োগ বর্ণনা কর।

৬। অভ্যাস গঠনের উপকারিতা ও অপকারিতা আলোচনা কর। বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে কি কি প্রয়োজনীয় অভ্যাস গড়ে তোলা যায়?

৭। অভ্যাস গঠনের সর্তাবলী বল। কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলা যায় বল?

৮। শিশুর শিক্ষায় চিন্তার অভ্যাস ও ইচ্ছার অভ্যাসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৯। টীকা লেখ:— (ক) অভ্যাস ও প্রবৃত্তি (খ) অভ্যাস ও চিন্তন।

সাঁয়ত্রিশ

কাজ ও ক্লান্তি

ব্যাপক অর্থে সকল আচরণই এক প্রকারের কাজ। কিন্তু আমরা সাধারণত 'কাজ' কথাটি একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। সেই সব আচরণকে আমরা কাজ বলি যেগুলি সম্পন্ন করতে কিছু পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় দক্ষতার একটি নিম্নতম মান আছে এবং দক্ষতার সেই মান পর্যন্ত যতক্ষণ না পেঁছিন যাচ্ছে ততক্ষণ ঐ আচরণটিকে কাজ বলা হবে না।

কাজের সঙ্গে অভ্যাসের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রতি কাজের মধ্যেই অভ্যাসের প্রয়োগ অপরিহার্য। এদিক দিয়ে নানা মানসিক এবং শারীরিক অভ্যাসের বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগকেই কাজ বলা চলতে পারে।

কাজ মাত্রেই শিখনের উপর নির্ভরশীল। কাজ সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের প্রয়োগ এবং সেই শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস আহরণে আমাদের সক্ষম করে শিখন। সেদিক দিয়ে শিখনের একটি নতুন সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যথা, কাজের অনুমোদিত মান-সম্মত অভ্যাস গঠন করার নাম হল শিখন।

কাজের সম্পাদনের জন্য শারীরিক এবং মানসিক, এই দু'ধরনের প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হয়। সেইজন্য অনেকে কাজকে শারীরিক ও মানসিক, এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়, কেননা শারীরিক ও মানসিক দু'ধরনের কাজের পেছনেই আছে স্নায়ুমূলক ও পেশীমূলক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার। তবে শারীরিক কাজ ও মানসিক কাজের মধ্যে একদিক দিয়ে পার্থক্য করা যেতে পারে। শারীরিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও পেশীগুলি মানসিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও পেশীগুলির তুলনায় আকৃতির দিক দিয়ে যেমন বড়, সংখ্যাতেও তেমনই বেশী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কাজ বলতে বোঝায় বিশেষ কোন দক্ষতামূলক আচরণ এবং সেই দক্ষতা আমরা অর্জন করে থাকি শিখনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্যক্তির দক্ষতা থাকলেও সেই দক্ষতার মান সে সব সময় বজায় রাখতে পারে না। নানা কারণে কাজের দক্ষতা বিভিন্ন সময়ে কমতে বাড়তে থাকে। তাছাড়া কেবলমাত্র শিখনের মাত্রার দ্বারাই কাজের দক্ষতা নির্ধারিত হয় না, অনেক বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের দ্বারাই কাজের দক্ষতা নিরূপিত হয়ে থাকে।

কাজের রেখাচিত্র

কাজের দক্ষতার এই পরিবর্তনের একটি চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। এটিকে সাধারণত কাজের রেখাচিত্র[1] বলা হয়। এই রেখাচিত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে

1. Work Curve

যে এর তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় আছে। প্রথম, প্রাথমিক উর্ধ্বগতি,[1] দ্বিতীয়, অধিত্যকা কাল[2] এবং তৃতীয়, অধোগতি[3]।

প্রাথমিক উর্ধ্বগতি ও অধিত্যকা স্তর

প্রথমেই যখন কাজ সুরু হয় তখন ব্যক্তির দক্ষতা ও উৎকর্ষের একটা প্রাথমিক উর্ধ্বগতি দেখা যায়। এই সময় কর্মী কাজ সুরু করার আনন্দে ও উৎসাহে তার সর্বশক্তির প্রয়োগ করে এবং তার কাজের দক্ষতা তখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে ওঠে। তারপর থেকে তার দক্ষতা ক্রমশ কমতে থাকে এবং শীঘ্রই সে এমন একটি বিন্দুতে এসে পেঁছয়
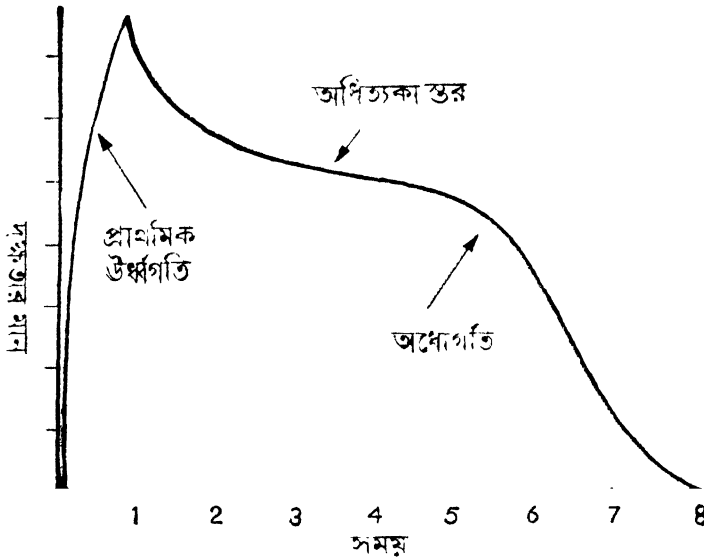
[কাজের রেখচিত্র : প্রাথমিক উর্ধ্বগতি, অধিত্যকা স্তর ও অধোগতি]

যখন তার দক্ষতার এই নিম্নগতি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার দক্ষতার মান একটা স্থিতাবস্থা ধারণ করে। বেশ কিছুকাল ধরে এই অপরিবর্তিত অবস্থা বজায় থাকে। এই সময়টিকে অধিত্যকা কাল বলা হয়। এই সময়ে কাজের দক্ষতার মান বিশেষ কমেও না, বাড়েও না।

অধোগতি

অধিত্যকা কালের শেষে দেখা দেয় অধোগতি। এবার ধীরে ধীরে কাজের দক্ষতার মান নামতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কাজটি শেষ হবার সময় আবার একটি আকস্মিক

1. Initial Spurt 2. Plateau Period 3. Fall

ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। এটি ঘটে তখনই যখন কর্মীরা বোঝে যে কাজের সমাপ্তি নিকটবর্তী এবং তাদের আর কাজ করতে হবে না। এই ঘটনাটিকে আমরা অন্তকালীন ঊর্ধ্বগতি[1] বলতে পারি। এই ঘটনাটি অবশ্য সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং যেখানে কর্মীরা কাজের সমাপ্তি সম্পর্কে সচেতন নয় সেখানে এই অন্তকালীন ঊর্ধ্বগতি দেখা যায় না। কাজের আসন্ন সমাপ্তির কথা ভেবে ব্যক্তির প্রেষণার যে বৃদ্ধি দেখা দেয় সেটাই কাজের শেষের দিকে এই দক্ষতার উন্নতির কারণ।

কাজের রেখাচিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন ক্রেপেলিনের ছাত্র এ্যাক্সেন ওহর্ন[2] ১৮৮৯ সালে। তিনি দশজন অধ্যাপক ও ছাত্রদের নানা রকম বিষয়বস্তু শেখার কাজ দেন এবং তাঁদের দক্ষতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকেই তিনি উপরের সিদ্ধান্তগুলি গঠন করেন।

প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতির পর যে বিন্দুতে ক্লান্তির সুরু হয় সে বিন্দুকে চরম দক্ষতার বিন্দু বলা হয়। ওহর্ন দেখেন যে বিভিন্ন কাজে চরম দক্ষতার বিন্দু বিভিন্ন। যেমন, এই চরম দক্ষতার বিন্দু দেখা দেয় অর্থহীন শব্দশিক্ষার ক্ষেত্রে ২৪ মিনিট পরে, শ্রুতি-লিখনের ক্ষেত্রে ২৬ মিনিট পরে, যোগ অঙ্কের ক্ষেত্রে ২৮ মিনিট পরে, পড়ার ক্ষেত্রে ৩৮ মিনিট পরে, একটি একটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৩৯ মিনিট পরে, তিনটি তিনটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৫৯ মিনিট পরে এবং সংখ্যা শেখার ক্ষেত্রে ৬০ মিনিট পরে।

ক্লান্তি ও প্রেষণা

একবার কাজটি সুরু হলে কাজের দক্ষতার মান এবং কাজের রেখাচিত্রের প্রকৃতি দুটি বস্তুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সে দুটি হল ক্লান্তি এবং প্রেষণা। এছাড়া কাজের পরিবেশ, কর্মীদের মানসিক দৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয়গুলিও কাজের দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আগের পাতায় কাজের যে রেখাচিত্রটি দেওয়া হইয়াছে সেটির পেছনে নানা মাত্রা এবং প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব কাজ করতে পারে।

ত্রিবিধ ক্লান্তি

ব্যক্তির উপর ক্লান্তির প্রভাব সর্বজনীন প্রকৃতির এবং সেজন্য এর প্রভাবের কাল, প্রকৃতি এবং পরিমাপ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। কাজ করার সময় সমগ্র ব্যক্তির মধ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক এবং শরীরতত্ত্বমূলক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী তাকে ক্লান্তি বলা হয়। কোন কাজ করতে করতে ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম মানসিক এবং দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে তার কর্ম-দক্ষতার মানের অবনতি ঘটে। একেই আমরা ক্লান্তি বলি। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে তিন শ্রেণীর ক্লান্তি সৃষ্টি হতে পারে। যথা :—

1. End Spurt 2. Axen Ohrn

(১) মানসিক ক্লান্তি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা একঘেয়েমি
(২) শারীরিক ক্লান্তি বা দেহগত পরিবর্তন
(৩) বস্তুমূলক ক্লান্তি বা কাজের মানগত অবনতি

১। মানসিক ক্লান্তি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা একঘেয়েমি[1]

কিছুক্ষণ একটি কাজ করার পর কর্মীর মনে সেই কাজ সম্পর্কে তার অনুভূতিটি ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। কাজের প্রথম দিকে তার মধ্যে যে আনন্দ বা উৎসাহের ভাবটি থাকে, সেটি যত সময় যায় তত কমে আসে। একেই আমরা মানসিক ক্লান্তি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা একঘেয়েমি বলে থাকি। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কাজের সুরু থেকেই এই মানসিক ক্লান্তিবোধ সুরু হয়। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং মানসিক সংগঠনের উপর এই ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা মানসিক ক্লান্তির মাত্রা নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ক্লান্তির উপর নীচের পরীক্ষণ কয়েকটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একটি পরীক্ষণে একশ জন লরীচালকের লরী চালানোর বিভিন্ন সময়ে ঐ কাজটি সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ক্লান্তির পরিমাপ করা হয়। দেখা যায় যে কাজের সুরুতে শতকরা ৬৬ জনের ঐ কাজটি সম্পর্কে সন্তোষজনক মনোভাব ছিল। ১ ঘণ্টা থেকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে ৪৮ জন কাজটিকে ক্লান্তিকর মনে করে এবং ১০ ঘণ্টা পরে মাত্র শতকরা ১৫ জন কোন ক্লান্তি অনুভব করে না। কিন্তু বাকী শতকরা ৮৫ জনের কাছেই কাজটি অল্পবিস্তর ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। থর্নডাইকের আর একটি পরীক্ষণে ২৯ জন ব্যক্তিকে দু'ঘণ্টার জন্য ছাপান লেখা সাজানোর ভার দেওয়া হল। প্রতি ১০ মিনিট অন্তর কাজটি করার সময় কর্মীদের সন্তুষ্টি বা তৃপ্তির গড়পড়তা স্কোর পাওয়া গেল এইরূপ—৪'৪, ৪'০, ৩'৬, ৩'৪, ২'৮, ২'৬। এখানে দেখা যাচ্ছে যে যত সময় যাচ্ছে ততই কর্মীদের মানসিক ক্লান্তি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি বেড়ে চলেছে।

কাজের তৃপ্তিবোধের এই অবনতি কাজের প্রকৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। একে আমরা প্রেষণার প্রভাব বলে বর্ণনা করতে পারি। পফ্‌ফেনবার্জার[2] তাঁর একটি পরীক্ষণে চারটি বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের সময় কর্মীদের মানসিক ক্লান্তির পরিবর্তন পরিমাপ করেন। এই কাজ চারটি হল বুদ্ধির অভীক্ষা, বাক্যসম্পূর্ণকরণ, রচনাবিচার এবং যোগকরণ। দেখা গেছে যে চার প্রকারের কাজে তৃপ্তিবোধের অবনতি বুদ্ধির অভীক্ষার ক্ষেত্রে হয় মাত্র ১'৩, বাক্য-সম্পূর্ণকরণে হয় ২'৭, রচনাবিচারে হয় ২'৩ এবং যোগকরণে হয় ২'৩। অর্থাৎ মানসিক ক্লান্তি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি কাজের প্রকৃতির উপর বেশ নির্ভরশীল।

---

1. Mental Fatigue or Personal Fatigue or Boredom 2. Poffenberger

২। শারীরিক ক্লান্তি[1] বা দেহগত পরিবর্তন

প্রাচীন শরীরতত্ত্ববিদেরা ক্লান্তিকে শরীরের মধ্যে দূষিত পদার্থের সঞ্চয় থেকে সঞ্জাত এক ধরনের রাসায়নিক অবস্থা বলে বর্ণনা করেন। তার কারণ হল যে তাঁরা দেখেছিলেন যে কাজের সময় স্নায়ুতন্তু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং উত্তাপ নির্গত হয় এবং পেশীগুলির মধ্যে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং ল্যাকটিক এ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই কারণে শরীরের মধ্যে এমন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না যার দ্বারা কাজের দক্ষতা কমে যেতে পারে। বস্তুত আধুনিক শরীরতত্ত্বমূলক পরীক্ষণগুলি থেকে ক্লান্তির কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মানসিক কাজ এবং বিশ্রামের সময় শরীরে যে পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে তুলনা করলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল হৃদ্‌স্পন্দনের গতিবেগ বৃদ্ধি। হৃদ্‌স্পন্দনের এই গতিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ক্যালোরি। এই জন্য যারা বেশী কাজ করে তাদের ক্যালোরির অভাব পরিপূরণের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

সাধারণ অবস্থায় কাজ করার সময় যে সব শারীরিক চাহিদা দেখা দেয় সেগুলি পূরণ করার ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই থাকে। যেমন, অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা মেটাবার জন্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুতভবন, রক্তের চাপ ও হৃদ্‌স্পন্দনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ প্রভৃতি কাজগুলি নিজে নিজেই ঘটে থাকে। শরীরের উত্তাপের নিয়ন্ত্রণও নিজে নিজেই শরীরের যন্ত্রপাতির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থকে। অর্থাৎ এক কথায় কাজের সময় শারীরিক সাম্যাবস্থা[1] অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই থাকে। তবে কাজটি যদি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হয় বা ব্যক্তির সহনশীলতা যদি কম হয় বা বাইরের উত্তাপ বা শৈত্য খুব বেশী বা কম হয় তবে ব্যক্তির এই শারীরিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে ক্লান্তি দেখা যায়। ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় কাজের মানের অবনতি এবং শেষ পর্যন্ত কাজটি বন্ধই হয়ে যায়।

৩। বস্তুমূলক ক্লান্তি[2] বা কাজের মানের অবনতি

কোন কাজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে করলে ধীরে ধীরে কাজের মানের অবনতি ঘটতে থাকে। একেই বস্তুমূলক ক্লান্তি বলা হয়। কাজের রেখাচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে কাজ সুরু হওয়ার পরেই কাজের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যায়। এটিকে আমরা প্রাথমিক উর্ধ্বগতি বলে বর্ণনা করেছি। এ সময় কর্মীর মধ্যে উদ্যম ও উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে এবং কাজে হাত দেবার কিছু পরেই সে উৎসাহিত[3] হয়ে ওঠে। এই উৎসাহের স্তরেই কর্মীর কাজের মান তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু

1. Physical Fatigue 2. Material Fatigue 3. Warming Up

তার পর থেকেই কাজের মানের পতন ঘটতে থাকে এবং কিছুটা পতনের পর কাজের মান বেশ কিছুকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তার আর পতন হয় না। একেই অধিত্যকা কাল[1] বলা হয়। এই অধিত্যকা কালের শেষে আবার কাজের মানের পতন
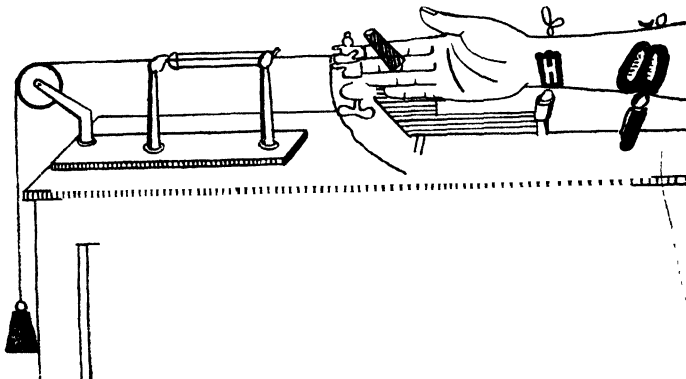
[ক্লান্তি পরিমাপের যন্ত্র আরগোগ্রাফ]

সুরু হয়। ক্লান্তির পরিমাণ যদি খুব বেশী হয় তাহলে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

ক্লান্তির পরিমাপ

কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ সম্পর্কে বহু পরীক্ষণ করা হয়েছে। আরগোগ্রাফ[2] নামক যন্ত্রটির সাহায্যে এই ক্লান্তির পরিমাপ করা যায়। আরগোগ্রাফ যন্ত্রটি মসো[3] ১৮০০ সালে আবিষ্কার করেন। একটি টেবিলের উপর পরীক্ষার্থীকে তার হাতটি আলগা করে রাখতে বলা হয় এবং মাঝের আঙুলটি ছাড়া অন্য আঙুলগুলি এমনভাবে বেঁধে রাখা হয় যাতে ঐ একটি আঙুল ছাড়া অন্য কোন আঙুল সে নাড়াতে পারে না। এবার ঐ মাঝের আঙুলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটি ভারি বস্তু ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, এবং ব্যক্তিকে ঐ আঙুলটি দিয়ে ঐ বস্তুটি সামনের দিকে টানতে বলা হয়। একটি কিমোগ্রাফের সঙ্গে একটি ষ্টাইলাস সংযুক্ত থাকে এবং ঐ ষ্টাইলাসটির দ্বারা পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটি চিত্ররূপ ঐ কিমোগ্রাফের উপর আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে আরগোগ্রাম[4] বলা হয়। পরপৃষ্ঠায় একটি আরগোগ্রামের ছবি দেওয়া হল।

এই ছবিটি থেকে দেখা যাবে যে পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকের টানগুলি

1. Plateau Period 2. Ergograph 3. Mosso 4. Ergogram

বেশ লম্বা লম্বা ছিল। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত টানের দৈর্ঘ্য কমে আসছে এবং অবশেষে টান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ টানের দৈর্ঘ্যটি প্রায় একই রয়েছে। এটি হল অধিত্যকা কাল। আরগোগ্রামও এক ধরনের কাজের রেখাচিত্র। সেই জন্য দেখা যাবে যে এতেও প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতি, অধিত্যকার স্তর এবং ক্রমপতন—এই তিনটি পর্যায়ই পর পর রয়েছে। কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ নানা কারণের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির নিজস্ব কর্মদক্ষতা, প্রেষণা, মানসিক দৃঢ়তা, কাজের প্রকৃতি, কাজের সময় ও পরিবেশ প্রভৃতির দ্বারা বস্তুমূলক ক্লান্তি বা কাজের মানের অবনতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বস্তুগুলি বিভিন্ন কাজের বেলায় বিভিন্ন হওয়ার জন্য বস্তুমূলক ক্লান্তি বা কাজের মানের অবনতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে।
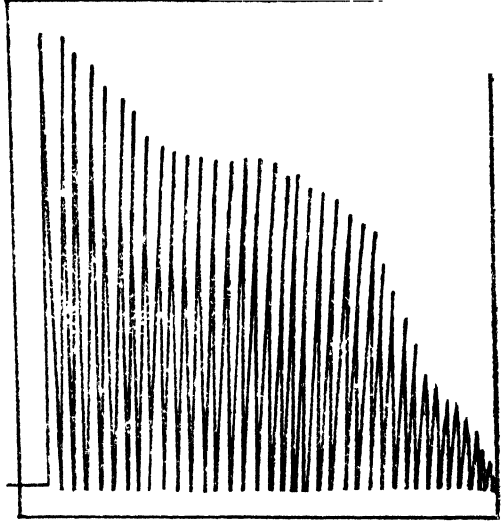
[আরগোগ্রাম বা ক্লান্তির রেখাচিত্র]

ক্লান্তির কারণ

ক্লান্তির কারণ বহুবিধ হতে পারে। সাধারণ ভাবে আমরা সেগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি।

(১) পারিবেশিক কারণ, (২) শারীরিক কারণ, (৩) মানসিক কারণ।

১। **পারিবেশিক কারণ:** যে পরিবেশে কাজটি করা হয় কাজটির সম্পাদনের মান ও প্রকৃতির উপর সেই পরিবেশের প্রচুর প্রভাব থাকে। বিভিন্ন পরিবেশে একই কাজের সম্পাদনের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে। কাজের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত গরম, অত্যন্ত শীত বা গুমোট আবহাওয়ায় কোন কাজ ভালোভাবে করা যায় না এবং সহজেই ক্লান্তি আসে। কিন্তু স্বাভাবিক আবহাওয়ায় ক্লান্তি সহজে দেখা দেয় না। তাছাড়া কাজের সম্পাদনের উপর আলো, হাওয়া ইত্যাদির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

২। **শারীরিক কারণ :** স্বাভাবিক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে শারীরিক ক্লান্তি দেখা দেয়। আমাদের দেহের পরিশ্রম করার ক্ষমতার একটি সীমা আছে। কাজ করতে করতে যখন এই সীমায় পেঁছান যায় তখন দেহের কর্মক্ষমতা কমে আসে এবং ক্লান্তি দেখা দেয়। বিশ্রামের পর আবার এই কর্মক্ষমতা ফিরে আসে।

তবে শরীরের অবস্থার উপরও শারীরিক ক্লান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। যে ব্যক্তির শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী তার ক্লান্তি দেরীতে দেখা দেয়। কিন্তু দুর্বল, অসুস্থ বা পুষ্টিহীন শরীর অতি সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

৩। **মানসিক কারণ :** দেখা গেছে যে কোন কাজ করতে করতে এমন সময় আসে যখন কাজটি সম্পর্কে কর্মীর মধ্যে একঘেয়েমী বা বিরক্তিকর মনোভাব দেখা দেয়। প্রথম প্রথম কাজটি সম্পর্কে ব্যক্তির মনে তৃপ্তিকর মনোভাব থাকে, কিন্তু পরে যত কাজটি এগোয় তত এই মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে বিরূপ এবং বিরক্তির মনোভাবের রূপ নেয়। একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা মানসিক ক্লান্তি বলা হয়। এই ক্লান্তি নানা কারণে দেখা দেয়।

প্রথমত, কাজটি করার পেছনে যে প্রেষণা থাকে তার উপরেই এই মনোভাবটি নির্ভর করে। যদি কাজের প্রেষণাটি অত্যন্ত তীব্র হয় তাহলে এই একঘেয়েমী ভাব সহজে দেখা দেয় না। কিন্তু প্রেষণা যদি দুর্বল বা কৃত্রিম হয় তাহলে কর্মীর কাছে সেই প্রেষণার আবেদন স্থায়ী হয় না এবং কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্তি দেখা দেয়। আবার কাজটি যদি বহুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে যথেষ্ট প্রেষণা থাকা সত্ত্বেও এমন একটি সময় আসে যখন ক্লান্তি দেখা দেবেই।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক কাজের জন্যই প্রয়োজন প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা প্রকৃতিতে যেমন দৈহিক, তেমনই মানসিকও। দৈহিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন হয় দৈহিক প্রতিক্রিয়ক যন্ত্রগুলির যথাযথ প্রয়োগ। কিন্তু মানসিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি। এই মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপ ও স্থায়িত্বের উপর ক্লান্তি নির্ভর করে। যদি এই মানসিক প্রস্তুতি দুর্বল হয় তবে ব্যক্তির মধ্যে শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা দেয়, আর যদি মানসিক প্রস্তুতি দৃঢ় হয় তাহলে ক্লান্তিও বিলম্বিত হয়। মানসিক প্রস্তুতি নির্ভর করে নানা বিষয়ের উপর। প্রথমত, কাজটির দ্বারা কর্মীর ব্যক্তিগত চাহিদা কতটুকু তৃপ্ত হচ্ছে তার উপর। যদি কাজটি ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা তৃপ্ত করতে পারে, তাহলে কাজটির জন্য তার মানসিক প্রস্তুতি স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় হয়ে থাকে। আর যদি কাজটি ব্যক্তির চাহিদার বহির্ভূত হয় অর্থাৎ কাজটি অপরের দ্বারা তার উপর আরোপিত হয় তাহলে ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি কৃত্রিম ও দুর্বল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির চাহিদা ছাড়াও আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানসিক প্রস্তুতিকে প্রভাবিত করে। সেগুলি হল কাজটি সম্পর্কে কর্মীর পছন্দ, অপছন্দ, কাজের পরিবেশ সম্পর্কে কর্মীর মনোভাব ইত্যাদি।

ক্লান্তির মানসিক কারণের মধ্যে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটিকে কাজের মোরাল[1] বা মানসিক দৃঢ়তা বলা হয়ে থাকে। প্রতি কাজেই ব্যক্তিকে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই তার মনোযোগকে অটুট রাখে এবং তার উদ্যমকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না। কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য এই ইচ্ছাশক্তি বা মানসিক দৃঢ়তা অপরিহার্য। যতক্ষণ এই মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে ততক্ষণ ক্লান্তি সহজে দেখা দেবে না। আর যদি কোন কারণে এই মানসিক দৃঢ়তার অভাব হয়, তাহলে শীঘ্রই ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেবে এবং কাজের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। বড় বড় কারখানার কর্মীদের মধ্যে এই মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখার একটা প্রধান উপায় হল কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করা। নিজের কাজ, নিজের বা আপন জনের ভবিষ্যৎ, নিজের স্বাস্থ্য বা শারীরিক মঙ্গল প্রভৃতি সম্পর্কে যদি কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দেয় তাহলে এই মানসিক দৃঢ়তা স্বভাবতই কমে যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্লান্তি অপনোদনের উপায়

শিক্ষার ক্ষেত্রের ক্লান্তির সূত্রগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিখনও এক ধরনের কাজ এবং যথেষ্ট পরিমাণে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি দেখা দেয়।

শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে দুটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত, শিখন প্রক্রিয়ায় ক্লান্তিকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্লান্তি দেখা দিলে অবিলম্বে তার অপনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হলে নীচের পন্থাগুলি অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমত, ক্লান্তির আবির্ভাব ও মাত্রা দুইই নির্ভর করে প্রেষণার উপর। শিখনের ক্ষেত্রে যদি প্রেষণা দুর্বল হয় তাহলে সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্তি দেখা দেয়। আর যদি প্রেষণা সবল ও স্থায়ী হয় তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দেয় না। অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হয় তাহলে যাতে সুদৃঢ় ও স্থায়ী প্রেষণা শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রেষণা যত গভীর হবে ক্লান্তি ততই বিলম্বিত হবে।

দ্বিতীয়ত, শিখনের পরিবেশটি যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অস্বাস্থ্যকর বা অসুবিধাজনক পরিবেশে ক্লান্তি দ্রুত দেখা দেয়।

---

1. Morale

তৃতীয়ত, শিক্ষাথীর ক্ষেত্রে শারীরিক অবস্থা শিখনের উপযোগী হওয়া উচিত। দেখতে হবে যে শিখনটি সম্পন্ন করতে যতটা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা প্রয়োজন শিক্ষাথীর স্বাস্থ্য ততটা পরিশ্রম করার উপযোগী কিনা। যদি শিখন কাজটি শিক্ষাথীর দৈহিক সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহলে অতি শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা দেবে। শারীরিক ক্লান্তি দেখা দিলেই মানসিক দক্ষতার মানও নেমে আসবে।

চতুর্থত, শিখনের বিষয়বস্তুটিকে শিক্ষাথীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি শিক্ষাথীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে কিছুক্ষণ পরেই শিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষাথীর কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। একেই ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি নাম দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চমত, শিখন পদ্ধতিটি যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না হয় তাহলেও ক্লান্তি দ্রুত দেখা দেয়। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শেখার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যদি অনুপযোগী শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শিখন কষ্টকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। তার ফলে ক্লান্তিও তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যে বিষয়বস্তুটি অন্তর্দৃষ্টিমূলক পন্থায় শেখা দরকার সেটি শেখার জন্য যদি প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাহলে শিক্ষাথী সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। অতএব উপযুক্ত শিখনপদ্ধতির অনুসরণ ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার একটি প্রধান উপায়।

ষষ্ঠত, মানসিক তৃপ্তি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার আর একটি উপকরণ। শিক্ষাথী যদি শিখন কাজের মধ্যে মানসিক তৃপ্তি না পায় তাহলে তার মধ্যে ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়। কিন্তু সে যদি শিখনের মধ্যে তৃপ্তি পায় তবে কাজটি কঠিন হলেও ক্লান্তি স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। এইজন্য শিখন প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুবিভক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষাথী যেন শিখন কাজটি সম্পন্ন করার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে। যদি শিখন কাজটি এমনই সুদীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয় যার ফলে সম্পূর্ণ শিখন কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ সাফল্যের আস্বাদ পাওয়া শিক্ষাথীর পক্ষে সম্ভব হয় না, তাহলে সে ক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যেই কাজটি তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে ও সহজেই ক্লান্তি দেখা দেয়। অবশ্য দেখতে হবে যে শিখন প্রক্রিয়াটিকে এইভাবে বিভক্ত করার সময় বিভাগগুলি যেন স্বাভাবিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। শিখনের বিভাগগুলি যদি কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত হয় তাহলে শিখন আয়াসবহুল হয়ে ওঠে এবং ফল বিপরীতই হয়। ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে কাজের মধ্যে সাফল্যের আনন্দ একটি শক্তিশালী উপকরণ।

সবশেষে, কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় শ্রমের মাত্রানুযায়ী সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াটি সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার অর্থাৎ ক্লান্তির সূত্র অনুযায়ী সহজ ও কষ্টসাধ্য কাজগুলিকে যথাযথ বণ্টন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কাজ আরম্ভ হবার প্রথম দিকে

কষ্টসাধ্য কাজগুলি করতে দেওয়া দরকার। তারপর ক্রমশ ক্লান্তি সুরু হতে থাকলে সহজ কাজগুলি শিক্ষার্থীকে করতে দিতে হবে। এরপর কিছুক্ষণ কাজ চললে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটি সাময়িক বিরতি দেওয়া দরকার। বিরতির শেষে আবার কষ্টসাধ্য কাজ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আবার ক্লান্তি দেখা দিলে সহজ কাজগুলি আবার বণ্টন করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে যেখানে শিখন চালানো হয় সেখানে কার্য-বণ্টনের এই নীতিটি অনুসরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণত স্কুল-কলেজে পাঠদানের সময়-তালিকা রচনা করার সময় উপরের কার্যবণ্টনের নীতিটি অনুসরণ করা হয়।

অনুশীলনী

১। ক্লান্তি কাকে বলে? কয় ধরনের ক্লান্তি দেখা যায়? ক্লান্তির কারণগুলি বল।

২। কাজ ও ক্লান্তির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্লান্তি অপনোদনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩। টীকা লেখ :—(ক) ক্লান্তির পরিমাপ, (খ) কাজের রেখাচিত্র, (গ) কাজ ও তার প্রকৃতি।

আটত্রিশ

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা

শিক্ষার বহু সমস্যার মধ্যে অনগ্রসরতার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় যে স্কুলে নিয়মিত যোগদান করা সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয় না। এই সব ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তারা তাদের সহপাঠীদের চেয়ে লেখাপড়ায় বেশ পশ্চাদ্‌পদ হয়ে আছে এবং যখন ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তারা অকৃতকার্য হয়ে একই ক্লাসে পড়ে থাকছে। কেউ কেউ আবার দু'এক বছর চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই সব ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিক্ষামূলক অনগ্রসরতার[1] বিশেষ গুরুতর কারণ থাকতে পারে। তাদের সমস্যা বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সমস্যার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। আবার এই সব ছেলেমেয়ের সমস্যাগুলির সমাধানের যথোচিত ব্যবস্থা না করতে পারলে তাদের শিক্ষা ত বটেই তাদের সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবুদ্ধিতা

যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তারা লেখাপড়ায় যে অনগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষীণবুদ্ধি ছেলে তার বুদ্ধির স্বল্পতার জন্যই লেখাপড়ায় প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। তাদের অনগ্রসরতা কোন সাময়িক বা পারিবেশিক কারণ থেকে জন্মায় না। বিশেষ পদ্ধতি ও প্রচেষ্টার সাহায্যে ক্ষীণবুদ্ধিদের লেখাপড়া শেখান সম্ভব হলেও তাদের অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর করা যায় না। এই কারণে ক্ষীণবুদ্ধিজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং পারিবেশিক কারণজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি তাদের অনগ্রসরতার সমস্যা বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

অনগ্রসরতার প্রকৃতি

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দু'শ্রেণীর হতে পারে। প্রথমত, সর্বাত্মক[2]। দ্বিতীয়ত, বিষয়মূলক[3]। যখন শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় সব কটি বিষয়েতেই ক্লাসের অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ থাকে, তখন তার ক্ষেত্রটিকে সর্বাত্মক অনগ্রসরতা বলা হয়। আর যখন একটি বা একাধিক পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয় তখন তার ক্ষেত্রটিকে

---

1. Educational Backwardness 2. General Backwardness 3. Subject Backwardness

বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা হয়। সর্বাত্মক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সব কটি বিষয়েতেই শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ থাকে। কিন্তু বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি, দুটি বা তার চেয়ে বেশী বিষয়ে শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ হয়। যেমন, ইংরাজীতে কিংবা অঙ্কে কিংবা অন্য কোন পাঠ্যবিষয়ে ক্লাসে অন্য সকলের চেয়ে শিক্ষার্থী পেছিয়ে থাকতে পারে।

অনগ্রসরতার কারণাবলী

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। আমরা দেখেছি যে ক্ষীণবুদ্ধিতার জন্য শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ঘটে থাকে। সেজন্য যখনই কোন অনগ্রসরতার ক্ষেত্র পাওয়া যাবে তখন প্রথমেই দেখতে হবে যে তার মূলে ক্ষীণবুদ্ধিতা আছে কি না। ক্ষীণবুদ্ধিতা থাকলে তার শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিশেষধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু ক্ষীণবুদ্ধিতা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে অনগ্রসরতা দেখা দেয় তবে তা দূর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। সর্বাত্মক অনগ্রসরতা কতকগুলি সাধারণ ঘটনা বা কারণ থেকে জন্মায়। নীচে সর্বাত্মক অনগ্রসরতার কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করা হল।

সর্বাত্মক অনগ্রসরতার কারণাবলী

(ক) দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য শিশু অনেক সময় লেখাপড়ায় অনগ্রসর হতে পারে। স্বাস্থ্য দুর্বল হলে শিশু প্রয়োজন মত পর্যাপ্ত পরিশ্রম করতে পারে না এবং এজন্য সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়াশোনায় পেছিয়ে পড়ে।

(খ) অনেক সময় চোখের বা কানের অসুখের জন্য শিশু ক্লাসে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। চোখে কম দেখলে শিশু ভাল করে বোর্ড দেখতে পায় না, কানে কম শুনলে শিক্ষকের পড়া ভাল করে শুনতে পায় না। ফলে ক্লাসের অগ্রগতির সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে না। এই দোষগুলি উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে দূর না করলে শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(গ) প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ। কোন বিশেষ ঘটনা, আচরণ, ব্যক্তি বা পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ দেখা দিতে পারে। তার ফলে তার পড়াশোনা স্বাভাবিক পথে এগোয় না এবং সহজ ও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না।

(ঘ) অনেক সময়ে কোন স্থায়ী বা প্রলম্বিত রোগের জন্যে শিশুর মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। বহুদিন কোন রোগে ভুগলে নানা কারণে লেখাপড়া ঠিকমত হয়ে ওঠে না এবং শিশু ক্লাসের আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে।

(ঙ) কোন বিশেষ কারণে বিদ্যালয়ে বহুদিন অনুপস্থিত থাকলে শিশু ক্লাসের পড়ায় আর সকলের চেয়ে অনগ্রসর হয়ে ওঠে। একবার বেশ খানিকটা পেছিয়ে পড়লে তার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। তার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(চ) শিশুর পক্ষে অনুপযোগী পাঠক্রম অনগ্রসরতার আর একটি কারণ। পাঠক্রমটি যদি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যাতীত হয় বা তার গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি মেটাতে সক্ষম না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে সেটি বিরক্তিকর ও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে এবং তার ফলে অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(ছ) প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে অনেক সময় অনগ্রসরতা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি শিক্ষার্থীর অনুকূল না হয় তাহলে সে শিক্ষা শিশুর কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। যে সব বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক সেখানেও শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে।

(জ) অনুপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি অনগ্রসরতার আর একটি বড় কারণ। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন সেটি মনোবিজ্ঞানের বিচারে নানাদিক দিয়ে খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা সে শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষাগ্রহণ কার্যকর হয় না এবং পরীক্ষাতেও তারা ভাল ফল দেখাতে পারে না।

(ঝ) প্রতিকূল গৃহ পরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ বলে ধরতে হবে। শিশু যে গৃহে মানুষ হয়, যে প্রতিবেশীদের পরিবেশে সে বড় হয় এবং যে সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সে মেলামেশা করে, শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর ঐ বস্তুগুলির অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। মা, বাবা, ভাই-বোন, বাইরের সঙ্গী-সঙ্গিনী, প্রতিবেশী—এদের প্রভাব যদি শিক্ষার অনুকূল না হয় তাহলে শিশু লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণাবলী

যখন কোন বিশেষ একটি পাঠ্য বিষয়ে শিশু পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়ে তখন তার ক্ষেত্রটিকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা হয়। হয়ত দেখা গেল যে শিশু আর সব বিষয়ে ভাল, কিন্তু ইংরাজীতে ও গণিতে কাঁচা। সাধারণত বিষয়মূলক অনগ্রসরতা কতকগুলি বিশেষধর্মী কারণের জন্য দেখা দেয়। নীচে এই শ্রেণীর কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল।

(ক) কোন বিশেষ কারণবশত বিষয়টির উপর শিশুর প্রথম থেকেই বিরাগ থাকতে পারে বা বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না হতে পারে। সমস্ত শিক্ষার সাফল্য

নির্ভর করে শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক সমতার উপর। যদি কোন কারণে বিষয়টি সম্বন্ধে শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিরূপতা সৃষ্টি হয় তাহলে ঐ বিষয়টির প্রতি শিশুর প্রতিকূল মনোভাব দেখা দেবে এবং কালক্রমে সে ঐ বিষয়টিতে অনগ্রসর হয়ে উঠবে। এই ধরনের বিষয়মূলক বিরাগ নানা কারণে দেখা দিতে পারে। পিতামাতা-শিক্ষকদের মনোভাব, পরিবেশের প্রভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপারগুলি কোন বিশেষ পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোভাবকে প্রতিকূল করে তুলতে পারে।

(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির জন্যও বহুক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশু অনগ্রসর হয়ে ওঠে। অনেক সময় প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি নানা দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা খুবই সাম্প্রতিক কালে সুরু হয়েছে। এতদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে এসেছে বর্তমানে সেগুলির মধ্যে বহু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্য বহু শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ইংরাজী ও গণিতে বহু ছেলেমেয়ের অনগ্রসর হবার একটি বড় কারণ হল যে এ বিষয় দুটিতে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

(গ) অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ বা মনোভাবের জন্য ঐ শিক্ষক যে বিষয়টি পড়ান সেই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে। কোনও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক যদি অনুপযোগী বা অদক্ষ হন তাহলে শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়টির প্রতি প্রতিকূল ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে ঐ বিষয়টিতে অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(ঘ) বিদ্যালয় পরিবেশের জন্যও শিশুদের মধ্যে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। অসামাজিক আবহাওয়া, অতিরিক্ত শৃঙ্খলামূলক নিয়মকানুন প্রভৃতি কারণে শিশু কোনও কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে।

(ঙ) বিষয়মূলক অনগ্রসরতা তৈরী হবার আর একটি বড় কারণ হল প্রতিকূল-ধর্মী অনুবর্তনের সৃষ্টি। অর্থাৎ কোনও কারণে শিশুর মধ্যে ঐ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে বিরক্তি বা বিরাগ অনুবর্তিত হয়ে পড়তে পারে। এই অনুবর্তনের মূলে কোন ব্যক্তির অনুদার আচরণ বা কোন বিশেষ আঘাতাত্মক ঘটনা বা বিদ্যালয় পরিবেশের কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

(চ) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাসে বহুদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে।

অনগ্রসরতা দূর করার উপায়

অনগ্রসরতা দূর করতে হলে নিরাময়মূলক[1] ও প্রতিরোধমূলক[2], এই দু'ধরনের পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যথা—

নিরাময়মূলক পন্থা

প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণটি কি এবং সেই কারণটি দূর করাই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। যেমন, যদি দেখা যায় যে শারীরিক অসুস্থতা, ইন্দ্রিয়জনিত কোন দুর্বলতা বা প্রলম্বিত ব্যাধির জন্য অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে ঐ বিশেষ কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। যদি কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনগ্রসরতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে পদ্ধতির উন্নয়ন করলেই তার অনগ্রসরতাও দূর হবে। সেই রকম যদি অনুপযোগী পাঠক্রম, প্রতিকূল পরিবেশ বা কোন বিশেষ ঘটনাজনিত বিরাগ প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে ঐ কারণটি দূর করাই হল অনগ্রসরতা নিরাকরণের প্রধান উপায়।

যে সব ক্ষেত্রে প্রক্ষোভজনিত প্রতিরোধ থেকে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয় সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে ঐ প্রতিরোধ দূর করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধের কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং সেই কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও দূরীভূত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী কিংবা লেখাপড়ার প্রতি মনে ঘৃণা, ভয় বা বিরাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার মন থেকে ঐ বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে পারলে শিক্ষার প্রতি তার অনুকূল মনোভাব ফিরে আসবে।

প্রতিরোধমূলক পন্থা

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাপড়ায় অনগ্রসর না হয়ে ওঠে তার জন্য নীচের প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

(ক) শিশু যে গৃহে বড় হয় সেই গৃহ পরিবেশকে সমুন্নত করা দরকার। শিশুর শিক্ষা তার গৃহ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তার প্রক্ষোভমূলক সমতা তার গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গৃহ পরিবেশ উন্নত হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা দেবার সম্ভাবনা অনেক কম হবে। যে গৃহ কলহ, বিবাদ,

1. Curative Measures 2. Preventive Measures

অতিরিক্ত দারিদ্র্য, অনাচার প্রভৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত সে গৃহে শিশুর শিক্ষাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) শিক্ষায় অনগ্রসরতা দূর করতে হলে শিক্ষণপদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। অধিকাংশ অনগ্রসরতা ভুল শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য দেখা দিয়ে থাকে। অতএব শিক্ষণপদ্ধতিটিকে আধুনিক গবেষণাভিত্তিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত করা অনগ্রসরতা রোধ করার প্রধানতম পন্থা।

(গ) পাঠক্রমটিকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গড়ে তোলা অনগ্রসরতা রোধ করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

(ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করা এবং অন্তর্জাত শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করা অনগ্রসরতা প্রতিরোধের আর একটি কার্যকর উপায়।

(ঙ শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(চ) শিক্ষার অগ্রগতি শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সেজন্য শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষণের আয়োজন রাখা বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

(ছ) কোন শারীরিক বা ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটি থাকলে অবিলম্বে তার চিকিৎসা করা এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার।

(জ) বিদ্যালয় থেকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থী কোন পাঠ্য বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়লে তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্য তাকে বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভাবে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরাগ থাকলে সেই বিরাগের কারণ খুঁজে বার করা ও ঐ কারণটি দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার।

ত্রুটি-নির্ণায়ক অভীক্ষার প্রয়োগ

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার চিকিৎসা করতে হলে কোন বিশেষ বিষয়ের কোন্ কোন্ অংশে বা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্পদ সেটি প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। যেমন, মনে করা যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে কাঁচা হয় তাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাজীর কোন্ ক্ষেত্রটিতে কাঁচা। অর্থাৎ দেখতে হবে যে সে বানানে কাঁচা, না ব্যাকরণে কাঁচা, না বাক্যগঠনে কাঁচা, না বিশেষ প্রয়োগবিধিতে কাঁচা ইত্যাদি। হয়তো ইংরাজীর এই বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে কতকগুলিতে সে ভালই, কিন্তু আর কতকগুলিতে দুর্বল হওয়ার জন্য সে ইংরাজীতে ভাল ফল দেখাতে পারছে না। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্য ঐ বিষয়টির যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে সে কাঁচা সেই

বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে তাকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। নইলে শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় হবে।

এই সব বিশেষধর্মী ত্রুটি বা দুর্বলতা ধরার জন্য আজকাল এক নতুন ধরনের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিকে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা[1] বলা হয়। এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন বিশেষ বিষয়ের ঠিক কোন্ অংশে বা কোন্ ক্ষেত্রটিতে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা তা ধরা যায় এবং সেইমত তার সংশোধন বা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, এই পন্থাতেই অনগ্রসরতার প্রকৃত স্বরূপটি চিকিৎসকের কাছে উদ্ঘাটিত হয় এবং তখন সেটিকে সুনিশ্চিত এবং কার্যকরভাবে দূর করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া এক প্রকার অপরিহার্য। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনগ্রসরতা দূর করার উপকরণরূপে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে। পঠন, গণিত, ইংরাজী প্রভৃতি যে সব বিষয়গুলিতে অনগ্রসরতা বিশেষ করে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলির উপর সুপরীক্ষিত ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা গঠিত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা কাকে বলে? এর প্রকৃতি এবং ত্রুটি দূর করার পন্থা নির্দেশ কর

২। শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণগুলি কি? এগুলি দূর করার উপায় আলোচনা কর।

৩। ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা কাকে বলে? এই অভীক্ষা কিভাবে শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দূর করতে সাহায্য করে বল।

৪। বিষয়মূলক অনগ্রসরতা কাকে বলে? কিভাবে তা দূর করা যায়?

৫। টীকা লেখ :— (ক) শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবুদ্ধি (খ) সর্বাত্মক অনগ্রসরতা ও তার কারণ (গ) অনগ্রসরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

1. Diagnoistic Test

অপরাধপ্রবণতা

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা হল অপরাধপ্রবণতা।[1] অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু সহজ ও স্বাভাবিক পথ অনুসরণ না করে নানারকম অস্বাভাবিক ও অসামাজিক আচরণ সম্পন্ন করছে। প্রত্যেক সমাজেই আচরণের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট মান আছে। আর শিশুকে এই মান অনুযায়ী আচরণ করতে শেখানোই সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। আচরণের এই মান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়াকে অপরাধ আখ্যা দেওয়া হয়। খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই আচরণের মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে সমস্যামূলক আচরণ[2] বলা হয়। আর একটু বড় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই সামাজিক মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে অপরাধপ্রবণতা নাম দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণের মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে দেশের প্রচলিত আইনের দ্বারা বিচার করা হয় এবং তাদের কোন আচরণ সেই আইনবিরোধী হলেই সেটিকে আইনগত অপরাধ[3] নাম দেওয়া হয়। কিশোর অপরাধীদের[4] স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার ব্যবস্থা সবদেশেই প্রচলিত আছে এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র কিশোর বিচারালয়ও[5] স্থাপিত হয়েছে। এর কারণ হল, মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে কিশোরদের অপরাধ করার মূলে এমন কতকগুলি বাইরের শক্তি কাজ করে যেগুলির জন্য কিশোরেরা নিজেরা সব সময় দায়ী নয়। অতএব সাধারণ আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদের অপরাধের শাস্তি না দিয়ে তাদের এই মানসিক ভ্রষ্টতার প্রকৃত কারণ কি তা খুঁজে বার করা এবং সেটি দূর করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করাই উচিত।

অপরাধপ্রবণতার কারণাবলী

বস্তুত, অপরাধপ্রবণতাকে নিছক শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে সমাজমূলক সমস্যা বলাই উচিত। কেননা অপরাধপ্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তি কিশোরদের মনে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে থাকে। এই সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিকূল এবং এগুলির চাপেই শিশুর ব্যক্তিসত্তা অস্বাভাবিক পথে বেড়ে ওঠে। যদি এই প্রতিকূল শক্তিগুলি কার্যকর না হত তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠত এবং সে অপরাধ-প্রবণ হত না।

---

1. Delinquency 2. Problem Behaviour 3. Crime 4. Delinquent
5. Juvenile Court

অপরাধপ্রবণতার কারণগুলিকে আমরা চার শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা ঃ বংশধারামূলক[1], পারিবেশিক[2], সামাজিক[3] এবং মনোবৈজ্ঞানিক[4]।

বংশধারামূলক কারণ

বংশধারামূলক কারণ বলতে বোঝায় মাতাপিতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অপরাধপ্রবণতামূলক বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে অপরাধপ্রবণতা শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না। এটি একটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শিশু নানা কারণের জন্য অপরাধপ্রবণতা অর্জন করে থাকে। অবশ্য দেখা গেছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটি নিকট যোগাযোগ আছে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষীণবুদ্ধি পাওয়া যায়। অর্থাৎ যারা ক্ষীণবুদ্ধি হয় তাদের মধ্যে অনেকেরই অপরাধ করার দিকে মন যায়। যাদের বুদ্ধি স্বল্প তারা সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে সমর্থ হয় না এবং তার ফলে যে সব কাজ করতে সাধারণ ব্যক্তি ভয় পায় বা ইতস্তত করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি তা করে না। কোন্ কাজের কি ফল এবং সেই ফল কতটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবুদ্ধিদের থাকে না এবং সেই জন্যই অপরাধ করতে তাদের কোন দ্বিধা বা ভয় হয় না। দেবদূতেরা যেখানে পা দিতে ভয় পান মূর্খরা সেখানে সবেগে এগিয়ে যায়। ক্ষীণবুদ্ধিতা একটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বা সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই জন্য আমরা ক্ষীণবুদ্ধিতাকে অপরাধপ্রবণতার বংশধারামূলক কারণ বলে বর্ণনা করতে পারি।

আধুনিক প্রজননশাস্ত্রের গবেষণায় অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক জিন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়।

পারিবেশিক কারণ

অপরাধপ্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা পারিবেশিক কারণ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ধরনের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(১) গৃহের পরিবেশ শিশুর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধপ্রবণতার বহু কারণ এই পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকতে দেখা গেছে।

(২) যে গৃহপরিবেশে শিশু বড় হয় সে পরিবেশ স্বাস্থ্যপ্রদ না হলে শিশুর ব্যক্তিসত্তাও দুর্বল ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। অস্বাস্থ্যকর গৃহপরিবেশ আবার নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন—

(ক) শিশু যদি অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়। সাধারণত যে পরিবারে অনেকগুলি ভাইবোন থাকে সে পরিবারে সব কটি শিশুই পূর্ণ যত্ন ও মনোযোগ পায় না।

---

1. Hereditary 2. Environmental 3. Social 4. Psychological

(খ) শিশু যদি অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হয়।

(গ) শিশু যদি অতিরিক্ত আদরে বা যত্নে পালিত হয়। সাধারণত শিশু যদি পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান হয় তাহলে সে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত মাত্রায় আদরযত্ন লাভ করে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসত্তার সুষম ও সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হয়।

(ঘ) শিশু যদি বিপর্যস্ত গৃহে[1] মানুষ হয়। দায়িত্বহীন, স্বার্থপ্রিয় মা কিংবা অসচ্চরিত্র মদ্যপ বাবা বা বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ভেঙ্গে যাওয়া সংসার বা সর্বদা মা-বাবার কলহে শান্তিহীন পরিবার প্রভৃতি কারণ শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যময় গৃহপরিবেশকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই ধরনের বিপর্যস্ত গৃহে যে সব শিশু বড় হয় তাদের মধ্যে সহজেই অপরাধমূলক আচরণের প্রবণতা দেখা দেয়।

(ঙ) অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা অভাবের জন্যও সময় সময় অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। সাধারণ মাত্রার দারিদ্র্য বা অভাববোধ অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যদি দারিদ্র্য সহনাতীত হয় তাহলে তা শিশুর প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই মানসিক নিপীড়নের ফলে শিশুর মন অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে ঝোঁকে।

(চ) অতিরিক্ত শৃঙ্খলা যেমন অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে তেমনই শৃঙ্খলার অভাবও অপরাধপ্রবণতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা আর শৃঙ্খলা হীনতা এক কথা নয়। স্বাধীনতা সুপরিচালিত ও উদ্দেশ্যমূলক হলে তা বিপথগামী হয় না। কিন্তু অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার আনে এবং শিশুকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে চালিত করে।

(ছ) শৃঙ্খলার অভাব যেমন ক্ষতিকর তেমনই ক্ষতিকর হল শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। দেখা যায় এমন অনেক পিতামাতা আছেন যাঁরা এই মুহূর্তে শিশুকে বকাবকি ও মারধোর করলেন বা কঠিন শাস্তি দিলেন, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত তাকে প্রচণ্ড আদরযত্ন করলেন বা উপহার পুরস্কারে প্লাবিত করে তুললেন। তাঁদের ধারণা যে বকাবকি মারধোর করার পর আদর করলে সেই বকাবকি মারধোরের কোন ফল বা প্রভাব পরে শিশুর উপর আর থাকে না। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুর মনকে গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ করে এবং তাকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

(জ) যদি গৃহ পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর ও শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার সহজ গতিপথের প্রতিকূল হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সুস্থ মনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ দেহ এবং তার জন্য স্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ অপরিহার্য।

1. Broken Home

(ঝ) গৃহ-পরিবেশের পরে আসে শিশুর বহির্জগতের পরিবেশ। শিশু যে অঞ্চলে মানুষ হয়, যে ধরনের সঙ্গীসাথীর সঙ্গে মেলামেশা করে, যে ধরনের প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে সে আসে সে সবেরও প্রচুর প্রভাব থাকে শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনের উপর। যদি তার বাসস্থানের পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের পরিপন্থী হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ রূপে বড় হয়ে ওঠে। অসৎ সঙ্গীদের প্রভাবে শিশুর বিপথগামী হয়ে যাবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে শিশুদের মধ্যে দল-বিশ্বস্ততা গভীরভাবে দেখা দেয় এবং দলের প্রভাব তাদের আচরণকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে। যদি এই সময় সে ভাল সঙ্গীসাথীদের প্রভাবে না আসে তাহলে তার পক্ষে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা খুবই সম্ভব।

(ঞ) শিশুর পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয় পরিবেশ একটি বড় স্থান জুড়ে থাকে। দিনের একটি বেশ বড় অংশ শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং এই সময়ে সে বহু প্রভাবশালী শক্তির সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধবের দল, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন, আচারব্যবহার ও প্রথাদি শিশুর মানসিক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যে সব বিদ্যালয়ে পরিবেশকে সত্যকারের সমাজধর্মী করে গড়ে তোলা হয় না, সে সব বিদ্যালয়ে শিশু একটি বিচ্ছিন্ন মানুষ রূপে বড় হয়ে ওঠে এবং তার উপর বিদ্যালয়ের সংহতিমূলক কোন প্রভাব কার্যকর হয় না। এই সব শিশুরা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ দুর্বল হওয়ার জন্য অপরাধ-প্রবণতাও সহজে দেখা দেয়।

সামাজিক কারণ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদেরা কিশোর অপরাধকে মুখ্যত একটি সামাজিক সমস্যা বলেই বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুত সমাজের প্রকৃতি ও অভ্যন্তরীণ গঠনবৈশিষ্ট্য, আচরণের অনুমোদিত মান, বিধিশৃঙ্খলার কঠোর চাপ, নৈতিক আদর্শের অনুশাসন প্রভৃতির দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের কতটা আনুগত্য আছে তার উপর শিশুদেরও ভালমন্দ, উচিত-অনুচিতের ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে সমাজে নীতিগত আদর্শ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার আধিক্য দেখা যায়। এই জন্যই অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় নানারকম দুর্নীতি ও অপরাধের প্রাচুর্য দেখা যায়। যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির জন্য সমাজব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখন সেই সমাজের কিশোর এবং তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাও ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই সব কারণে স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যখন কোন সমাজে

কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেড়ে ওঠে তখন তার মূলে সামাজিক সংগঠনের কোন বিরাট ত্রুটি বা গলদ থাকবেই। সমাজসংগঠনের যোগসূত্রগুলি যখন দুর্বল হয়ে ওঠে তখন সেই দুর্বলতা ব্যক্তির মনে অসংযম ও আদর্শহীনতার রূপ নিয়ে প্রতিফলিত হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে অল্পবিস্তর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। ভারতের মত সুদূর দেশেও কালোবাজারী, অতিরিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত রাখা, প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা অন্যায় এবং অনুচিত অসামাজিক কাজ প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল তা আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার মাত্রা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনোবৈজ্ঞানিক কারণ

অপরাধপ্রবণতার একটি বড় কারণ হল মনোবৈজ্ঞানিক অপসঙ্গতি। প্রত্যেক শিশুরই কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদাগুলি সংখ্যা ও জটিলতার দিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বেড়ে ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি যথাযথ তৃপ্ত না হলে তার মধ্যে অপসঙ্গতি[1] দেখা দেয়। যখন এই অপসঙ্গতি তীব্র আকার ধারণ করে তখন তা অপরাধপ্রবণতার রূপ নেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, ধ্বংসমূলক কাজকর্ম করা ইত্যাদির মূলে আছে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার অতৃপ্তি। এই সব ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক পন্থায় তাদের চাহিদা মেটাতে না পেরে অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের সেই অতৃপ্ত চাহিদা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে।

শিশুদের ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার একটি বড় কারণ হল তাদের এই সব মৌলিক চাহিদাগুলির অতৃপ্তি। ভালবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সমাজজীবনের চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগুলি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের সুপরিণতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু নানা কারণে আমাদের সমাজে শিশুর এই প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক অপসঙ্গতি। শিশু তার সেই অপসঙ্গতি দূর করার জন্য নানা ধরনের পরিপূরক আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইগুলির মধ্যে অনেক আচরণই সমাজের অনুমোদিত মান ও আদর্শের বিচারে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে এবং তার ফলে লোকচক্ষুতে সেই শিশু অপরাধপ্রবণ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রে শিশুটি অপরাধ করার জন্য অপরাধ করে না। সে অপরাধ করে তার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

---

1. Maladjustment

অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ

অপরাধপ্রবণতা শিশুর মধ্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত রূপগুলি শিশুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

(ক) মিথ্যাভাষণ
(খ) অপহরণ
(গ) ক্লাসপালানো
(ঘ) শৃঙ্খলাভঙ্গ করা
(ঙ) আক্রমণধর্মিতা
(চ) নৈতিমনোভাব
(ছ) অবাধ্যতা
(জ) প্রতারণা
(ঝ) ধ্বংসমূলক আচরণ
(ঞ) যৌন অপরাধ

এই সব অপরাধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও মাত্রা নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে। উপরের তালিকার অধিকাংশ আচরণই ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেগুলি মূলত পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে তাদের সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যের জন্যই দেখা দেয় এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বা অনেক সময় শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিজে নিজেই চলে যায়। কিন্তু কিশোরদের মধ্যে যখন এই সব অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তখন অতি যত্নের সঙ্গে সেগুলির চিকিৎসা করা প্রয়োজন। অপরাধপ্রবণ কিশোরই বড় হয়ে সমাজবিরোধী অপরাধী বা ক্রিমিনাল[1] হয়ে ওঠে। এইজন্য শিশুর নিজের এবং সমাজের মঙ্গলের জন্যই অবিলম্বে অপরাধপ্রবণতার চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক।

অপরাধপ্রবণতা দূর করার উপায়

অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে আমাদের দু'ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হবে। (১) প্রতিরোধমূলক[2] এবং নিরাময়মূলক[3]। প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি আবার দু' রকমের হতে পারে। ব্যক্তিমূলক[4] ও সমষ্টিমূলক[5]।

প্রতিরোধমূলক পন্থা

প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় শিশুর মনে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে সব কারণের জন্য শিশুর মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দূর করাই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা

যখন এই প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্ত হয় তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলা যায়। এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হল নীচের পন্থাগুলি।

1. Criminal 2. Preventive 3. Curative 4. Individual 5. Collective

(ক) শিশুর গৃহ পরিবেশ উন্নত করা।

(খ) শিশু যাতে অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত না হয় তা দেখা।

(গ) শিশুকে অতিরিক্ত আদর না দেওয়া।

(ঘ) বিপর্যস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে শিশু যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থান পায় তার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) সাংসারিক অভাব, অনটন, পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি শিশুর মনকে যাতে পীড়িত না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(চ) শিশুর বাসস্থান যাতে স্বাস্থ্যকর হয়, শিশু যাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম লাভ করে এবং ব্যায়াম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিশুর নিত্যসঙ্গী ও খেলাধুলার সাথী, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি যাতে উন্নতস্তরের হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(জ) গৃহের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সযত্নে বর্জন করা।

(ঝ) অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে সর্বাগ্রে সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে, সকল শিশুর চাহিদা মেটাতে পারে এমন পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে, শিক্ষা পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে সাধারণভাবে সামাজিক সংগঠনের উন্নয়নকেই বোঝায়। এদিক দিয়ে বিচার করলে নীচের ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(ক) সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রথা-পদ্ধতিগুলি যেন প্রগতিশীল হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমতা রেখে সমাজ ব্যবস্থারও সংস্কার করা প্রয়োজন।

(খ) পরিবর্তনশীল সমাজের সদস্যদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে আদর্শ বা মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হবে। প্রাচীন গতানুগতিক মূল্যবোধের প্রতি অন্ধ আসক্তি পরিত্যাগ না করলে বিকাশমান কিশোর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সমাজে পূর্ব প্রচলিত মূল্যবোধের সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে কিশোর মনে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং তা থেকে অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(গ) রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও নিরাপত্তা-হীনতার বোধ যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মত কিশোর ও তরুণদের মনও সেই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সময় অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কিশোর মনের উপর এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক চাপের সৃষ্টি করে যার ফলে অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন চলে যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সর্বাত্মক মানব ধ্বংসের নানা অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেই একটি সর্বব্যাপী আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে। আদিম বন্য পরিবেশ ছেড়ে মানুষ যেদিন সভ্য হয়েছিল সেদিন সে যে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার বোধ অনুভব করেছিল আজ এই সব ভয়ঙ্কর মারণ অস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে তা মানুষের মন থেকে চলে যেতে বসেছে। ফলে বর্তমান জগতের সভ্য সমাজমাত্রেই এক সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি ও দুশ্চিন্তার চাপ কিশোর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধমূলক কাজ করে।

এইজন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর মনকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। সুপরিকল্পিত নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিশোরদের শিক্ষাসূচীকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের চিন্তা বা মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়।

(ঘ) সমাজের বিধিনিষেধ, শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন কঠোর হোক্ বা শিথিল হোক্ তাতে কিশোর মনের কিছু এসে যায় না। কিন্তু সবচেয়ে যা বিশেষভাবে কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেইসব নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের প্রতি সমাজের বয়স্কদের আনুগত্যের প্রকৃতি ও মাত্রা। যে সমাজে প্রাপ্তবয়স্করা সমাজের আদর্শ ও বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত সে সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

(ঙ) যদি বিশেষ কোন মানসিক অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে উপযুক্ত মনশ্চিকিৎসকের সাহায্যে তার সেই অপসঙ্গতি দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরাময়মূলক পন্থা

নিরাময়মূলক পন্থাগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) যদি প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তাহলে সেই পরিবেশের পরিবর্তন বা উন্নয়ন করতে হবে। সেই অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিয়ে অনুকূল পরিবেশে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(খ) গৃহ পরিবেশ অনুপযোগী ও ক্ষতিকর হলে সুপরিচালিত আবাসিক বিদ্যালয়ে শিশুকে রাখা যেতে পারে।

(গ) অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখা দিলে সেই অপসঙ্গতির মনোবৈজ্ঞানিক কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশু যাতে যথাযথভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করার সুযোগ পায় এবং যাতে তার মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

(ঘ) সমাজধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করা, বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করা, কর্ম-কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা, বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে বহুল পরিমাণে খেলাধুলো ও সম্মিলিত কাজকর্মের আয়োজন রাখা প্রভৃতি হল অপরাধপ্রবণতা দূর করার কার্যকর উপায়।

(ঙ) বহু ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক কারণের জন্য শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। বিশেষ করে অতৃপ্ত চাহিদার ফলে শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধমূলক আচরণ সম্পন্ন করে। অতএব এই ধরনের অপরাধপ্রবণতার চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার ঐ মনের অন্তর্দ্বন্দ্বটি দূর করতে হবে। যে বিশেষ চাহিদাটির অতৃপ্তির জন্য তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে সেটিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেটির পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুশীলনী

১। অপরাধপ্রবণতা কাকে বলে? [illegible] কারণ কি?

২। অপরাধপ্রবণতার বিভিন্ন কারণগুলি [illegible] কর। কিভাবে [illegible] প্রতিরোধ করা [illegible]?

৩। অপরাধপ্রবণতা একটি মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক সমস্যা—আলোচনা কর।

৪। অপরাধপ্রবণতার সংজ্ঞা নির্ধারণ কর। [illegible] প্রধান কয়েকটি শ্রেণী আলোচনা কর। অপরাধপ্রবণতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক পদ্ধতি [illegible] কর।

চল্লিশ

যৌথ মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। ব্যক্তির আচরণের স্বরূপ, কারণ ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করাই হল তার কাজ। মানব আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর অপরিসীম বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা। দেখা গেছে যে একা বা সঙ্গীহীন অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের আচরণ করে এবং দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় তার যে আচরণ, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তখন তার আচরণের প্রকৃতি এক প্রকারের হয়, আর যখন সে দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তার আচরণ আর এক প্রকৃতির হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত দলভুক্ত অবস্থায় থাকার সময় ব্যক্তির মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠনের মধ্যে বিরাট একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। তার ফলে মনোভাব, চিন্তাধারা, বিচারবুদ্ধি, নৈতিক মান প্রক্ষোভ প্রভৃতি গুরুতরভাবে বদলে যায় এবং তার স্বাভাবিক আচরণধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

দলবদ্ধ মানুষের আচরণের প্রকৃতি সঙ্গীহীন মানুষের আচরণের প্রকৃতি থেকে এতই পৃথক যে একই মনোবৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে এই দু'ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব নিয়মকানুন অনুযায়ী মানব আচরণ সম্পন্ন হয়, দলবদ্ধ অবস্থায় মানব আচরণে সে সব নিয়মকানুন সব সময় প্রযোজ্য হয় না। তার ফলে দলবদ্ধ ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যার জন্য নূতন এক মনোবিজ্ঞান সৃষ্ট হয়েছে। একেই যৌথ মনোবিজ্ঞান[1] নাম দেওয়া হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের সংজ্ঞা

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একস্থানে সমবেত হলেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে দল বলা যায় না। কোন কর্মব্যস্ত দিনে বড় রাস্তার মোড়ে অফিস যাবার সময় বহুলোককে প্রায়ই একসঙ্গে একই জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই লোকের সমাবেশকে প্রকৃত দল নাম দেওয়া যায় না। কেননা এই সমাবেশের প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। তার আশপাশের অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যখনই রাস্তায় কোন দুর্ঘটনার ফলে বা অন্য কোনও বিশেষ কারণে এই লোকগুলিই সেখানে সমবেত হয় তখন তারা একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দল সৃষ্টি করে। কেননা তখন

1. Group Psychology

প্রতিটি ব্যক্তিরই চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণ ঐ দুর্ঘটনা বা ঐ বিশেষ কারণটির বিষয়বস্তুটিকে কেন্দ্র করে সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। যদিও তাদের এই সংহতি অগভীর প্রকৃতির এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং অচিরেই তারা নিজের নিজের কাজে চলে যাবে তবুও তারা অল্পক্ষণের জন্য একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দল তৈরী করে। এই ধরনের দলকে জনতা[1] বলা হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দল বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। জনতার চেয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী দল হল কোন বক্তৃতা বা আলোচনার স্থলে সমবেত শ্রোতার দল বা ছায়াছবি ও নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত দর্শকের দল। তার চেয়ে স্থায়ী দল হল ক্লাব, সাহিত্যমূলক বা সাংস্কৃতিক সংঘ। তার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী দল হল পরিবার, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের বৈশিষ্ট্যাবলী

নীচে মনোবিজ্ঞানমূলক দলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

১। মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দলের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া[2] হল দল মাত্রেরই মৌলিক ধর্ম। যখন দুই বা তার বেশী ব্যক্তি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একেই মনোবিজ্ঞানমূলক পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া[2] বলে। এই মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এই ভাবেই প্রতিটি দল তৈরী হয়ে থাকে এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কই হল প্রতিটি দলের মৌলিক ভিত্তি।

২। ছেদহীনতা

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর ছেদহীনতা[3] কোন বিশেষ জনসমাবেশ তখনই দল নাম পাবার যোগ্য হয় যখন সেটির মধ্যে ছেদহীনতা থাকে। অর্থাৎ দল গঠন করতে হলে জনসমাবেশটিকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে স্থায়ী হতে হবে। যে সমাবেশের মধ্যে সময়গত স্থায়িত্ব বা ছেদহীনতা নেই সেই সমাবেশটিকে দল বলা চলে না।

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের এই ছেদহীনতা দুশ্রেণীর হতে পারে—বস্তুগত ছেদহীনতা এবং আকারগত ছেদহীনতা। যে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দল গঠন করে, তারা যখন অপরিবর্তিত থাকে তখন তাকে বস্তুগত ছেদহীনতা বলে। যেমন, পরিবারের ছেদহীনতা বস্তুগত। কেননা পরিবারের অন্তর্গত যে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, তারা মোটামুটি ভাবে

1. Crowd 2. Interaction 3 Continuity

সব সময় অপরিবর্তিতই থাকে, বদলে যায় না। আবার যখন দলটির আকার ঠিক একই রকম থাকে কিন্তু দলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা বদলে যায় তখন দলটির ছেদহীনতাকে আকারগত ছেদহীনতা বলে। যেমন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সরকার প্রভৃতি সংগঠনগুলির ছেদহীনতা হল আকারগত ছেদহীনতা। এগুলির সদস্যরা বদলে গেলেও এগুলির সংগঠনমূলক রূপ বা আকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে বলে দলের অস্তিত্ব ঠিকই বজায় থাকে।

৩। সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি

দলের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে একটি আত্মীয়তাবোধ বা সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি থাকবে। অর্থাৎ সকল সদস্যই মনে করবে যে তারা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। একেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি[1] বলা হয়। এই সমগোষ্ঠিতার অনুভূতির উপরই প্রতিটি গোষ্ঠীর বা দলের সংহতি বিশেষভাবে নির্ভর করে।

৪। লক্ষ্যের অভিন্নতা

প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিন্নতা থাকবে। যখন বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মিল দেখা যায় তখনই তারা একত্রে সম্মিলিত হয়ে দল গঠন করে। আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান বলেই সর্বত্র মানব দল বা মানব সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের একতা থেকেই নানারকম বিশেষধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৫। আচরণের অভিন্নতা

লক্ষ্যের অভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আসে আচরণের অভিন্নতা। কোন একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মৌলিক আচরণগুলির মধ্যে প্রচুর সমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে আছে অচেতন এবং সচেতন উভয়বিধ অনুকরণ প্রক্রিয়া।

৬। পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সমতা

আচরণের সমতা থেকেই পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব, জীবনধারণের প্রকৃতি প্রভৃতির মধ্যেও সমতা এবং মিল ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কোন গোষ্ঠীকে সুসংবদ্ধ রাখতে হলে এই সমতাগুলি অপরিহার্য।

৭। সঙ্গকামিতা

গোষ্ঠীর সৃষ্টির মূলে যে শক্তিটি বিশেষভাবে কাজ করে থাকে সেটি হল আমাদের সঙ্গকামিতা বা দলবদ্ধতার আকাঙ্খা। অনেক মনোবিজ্ঞানী একে যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তি[2] বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের মতে এই প্রবণতা প্রাণীর মধ্যে জন্ম

1. We-feeling 2. Gregarious Instinct

থেকেই সহজাত প্রবৃত্তি রূপে বর্তমান থাকে এবং তারই প্রভাবে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গকামিতা বা দল বাঁধার আকাঙ্খাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করায় যদিও অনেক মনোবিজ্ঞানীর আপত্তি আছে তবু এই আকাঙ্খাটি যে প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে একটি প্রবল শক্তি রূপে বিদ্যমান থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা গেছে যে সাধারণভাবে মানুষ নির্জনতা বা একাকিত্ব পছন্দ করে না এবং অপরের সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে বাস করতে চায়। বস্তুত এই সঙ্গপ্রাপ্তির আকাঙ্খাই সকল প্রকার দল বা সংগঠন তৈরী করার মূলে আছে।

৮। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

আধুনিক কালে দলবদ্ধতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি পরস্পরের সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই উপলব্ধি বিভিন্ন দল গঠনে যে বিশেষ শক্তিরূপে কাজ করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দলের শ্রেণীবিভাগ

দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে দলকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

১। প্রাথমিক দল বা প্রত্যক্ষ দল[1]

২। পরোক্ষ দল[2]

৩। প্রান্তীয় দল[3]

প্রাথমিক দল বা প্রত্যক্ষ দল

যে দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি সম্পন্ন হয় তার নাম প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দল[1]। এই ধরনের দলে ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে, পরস্পরের সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে গভীর অনুভূতি ও অনুরাগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল প্রভৃতি হল এই ধরনের প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দলের উদাহরণ। প্রত্যক্ষ দলের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মীয়তার অনুভূতি একান্ত আন্তরিক ও স্থায়ী এবং পরস্পরের মধ্যে এক গভীর প্রক্ষোভের বন্ধন বিরাজ করে। বস্তুত সকল প্রকার দলের মধ্যে প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দলের ভিত্তিই হল সবচেয়ে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী।

পরোক্ষ দল

যে দলের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেই দলকে গৌণ বা পরোক্ষ[2] দল বলা হয়। যেমন, বাঙালী সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, ক্যাথলিক

1. Primary Group 2. Secondary Group 4. Marginal or Tertiary Group

সমাজ, রোটারিয়ান, সমাজতন্ত্রী দল, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি। এই ধরনের দলের সদস্যদের সকলের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কোন সম্পর্ক থাকে না। সাধারণত কোন বিশেষ মতবাদ, আদর্শ বা লক্ষ্যের মাধ্যমে দলের এই সব সদস্যরা পরোক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পন্ন করে থাকে। যেমন যদিও সমস্ত বাঙালী পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নয়, তবুও প্রতিটি বাঙালী নিজেকে বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। এই ধরনের দলগুলি সাধারণত আকারে খুব বড় হয়ে থাকে এবং সদস্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ আদান-প্রদান না থাকার ফলে প্রত্যক্ষ দলের তুলনায় এই সব দলের ভিত্তি অপেক্ষাকৃত কম সুদৃঢ় হয়।

প্রান্তীয় দল

এছাড়া আরও এক ধরনের দল আছে যেগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এবং যেগুলির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অসংহত ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে সবচেয়ে দুর্বল এবং অস্থায়ী হওয়ার জন্য এই দলগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়। যেমন, পথে হঠাৎ কোন সাময়িক কারণের জন্য যে জনতার সৃষ্টি হয় বা ট্রামে বাসে অফিস যাবার সময় যে সব দলের সৃষ্টি হয় সেই দলগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উপরের তিন ধরনের দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দল স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে অন্যান্য সকল দলের চেয়ে অনেক উন্নত। তার পর আসে পরোক্ষ দল এবং সবচেয়ে দুর্বল ও অস্থায়ী দল হল প্রান্তীয় দল।

ব্যক্তিগত আচরণ ও দলগত আচরণের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। শুধু আচরণে নয়, দলে থাকাকালীন চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন আসে। ব্যক্তির চিন্তা, মনোভাব, অনুভূতি, আচরণ প্রভৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য[1] বলা হয়। যখন ব্যক্তি কোন আচরণ সম্পন্ন করে তখন তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সেই আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন সে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দলগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অবদমিত হয়ে পড়ে এবং তার আচরণের নিজস্বতা দলের সম্মিলিত আচরণের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। এই জন্যই দলের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সে তখন দলের একটি অংশমাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

দল গঠনে বিভিন্ন শক্তি

দল গঠনের পিছনে কি ধরনের শক্তিগুলি কাজ করে থাকে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে অনেক মতভেদও দেখা যায়। এই ধরনের কয়েকটি শক্তি সম্পর্কে পরের পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হল।

1. Individuality

১। যৌথ-প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে দল গঠনের পিছনে আছে যৌথ প্রবৃত্তি। ম্যাকডুগাল তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তির তালিকাটিতে যৌথ প্রবৃত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন[1] এবং তার সহগামী প্রক্ষোভরূপে একাকিত্বের অনুভূতির[2] উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাণীমাত্রেই দল গঠন করে এই বিশেষ প্রবৃত্তিটির তাড়নায়। মানুষের মধ্যে একা থাকার অনুভূতিটিই এই প্রবৃত্তিটিকে সক্রিয় করে তোলে অর্থাৎ মানুষ যখন একা থাকে তখন তার মধ্যে একটি নির্জনতা বা একাকিত্বের অনুভূতি জেগে ওঠে এবং তার প্রেরণাতেই সে দল গঠন করতে সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য ম্যাকডুগালের এই তত্ত্বটি দল গঠনের প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়। মানুষের মধ্যে দল বাঁধার যে একটি জন্মগত প্রবণতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানবীয় দল প্রকৃতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে এত বিচিত্র ও বিবিধ হয়ে থাকে যে নিছক যৌথ প্রবৃত্তির দ্বারা সেগুলির সৃষ্টির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কোন দলের সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সন্ধান পাই। বস্তুত এই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলি দলগঠনের পিছনে প্রধান শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

২। সমানুভূতি

বিচ্ছিন্ন ও অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দলবদ্ধ করার প্রধানতম শক্তিটি হল সমানুভূতি[3]। যখন কোন বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একই অনুভূতির সৃষ্টি হয় তখন সেই ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে দল বা গোষ্ঠী তৈরী করে। অন্যান্য দিক দিয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে নানা রকম পার্থক্য ও বৈষম্য থাকলেও এই সমানভূতি তাদের একতার সূত্রে বেঁধে দেয়। রাস্তায় হঠাৎ জমা হওয়া একটা ভীড় থেকে সুরু করে পরিবার, ক্লাব, সংঘ, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতি সকল রকম দলেরই ভিত্তি হল এই সমানুভূতি। রাস্তায় জনতার প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হয় দুঃখ, নয় রাগ, নয় কৌতূহল বা অন্য কোন অনুভূতি সমবেত আর সকলের সঙ্গে সমানভাবে অনুভব করেছে বলেই ঐ দলটি তৈরী হতে পেরেছে। তেমনই সংঘ, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার প্রভৃতি সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যই সমানভাবে পরস্পরের অনুভূতিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। দল যত স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ হয় এই সমানুভূতিও সংখ্যা এবং মাত্রার দিক দিয়ে ততই বেড়ে চলে। হঠাৎ তৈরী হওয়া সাধারণ একটি জনতার মধ্যে এই অনুভূতি সংখ্যায় মাত্র একটি এবং স্থায়িত্বের দিক দিয়েও অত্যন্ত সাময়িক প্রকৃতির। তেমনই একটি সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্যে এই

1. পৃঃ ৩৬ 2. Feeling of Loneliness :: পৃঃ ১৬ 3. Sympathy

সমানুভূতির সংখ্যা একের চেয়ে বেশী এবং সংঘটির স্থায়িত্বও জনতার স্থায়িত্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘ। একটি সুসংবদ্ধ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমানুভূতি সংখ্যাতেও যেমন অজস্র তেমনই সেগুলি একরকম চিরস্থায়ী বললেও চলে। একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই সমানভাবে এবং অত্যন্ত গভীরভাবে পরস্পরের প্রায় প্রতিটি অনুভূতিতেই অংশ গ্রহণ করে থাকে।

বস্তুত ছোট হোক্ বড় হোক্ স্থায়ী হোক্ অস্থায়ী হোক্ সমস্ত দলের মৌলিক ধর্ম হল সমানুভূতি। যখনই একজন অপরের অনুভূতিকে অংশ গ্রহণ করে তখনই সে অপরের সঙ্গ কামনা করে এবং এইভাবেই দলের উৎপত্তি হয়। কেবলমাত্র দলের সৃষ্টিতেই যে সমানুভূতির অবদান আছে তা নয়, দলের পুষ্টি, প্রসার এবং স্থায়িত্ব সবই বহুলাংশে নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক সমানুভূতির মাত্রার উপর।

৩। অনুকরণ

দলের সৃষ্টি ও সংরক্ষণে আর একটি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। সেটি হল অনুকরণ প্রক্রিয়া[1]। অপরের আচরণের অনুসরণে আচরণ করাকে অনুকরণ বলে। অনুকরণপ্রবণতা মানুষের প্রকৃতিজাত এবং জীবনযাত্রার সকল স্তরে এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। শৈশবে শিশু তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শেখে অনুকরণের মাধ্যমে। সামাজিক দল গঠনে অনুকরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। দলের অন্তর্গত সদস্যরা কখনও নিজেদের জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে অপরের আচরণ অনুকরণ করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অনেক আচরণ করে, যা সে অপরকে দেখে করতে শিখেছে। এই জন্যই একটি দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণের মধ্যে প্রচুর মিল দেখা যায়। বস্তুত যে কোন দলের গঠন সম্ভব হয় সদস্যদের মধ্যে এই অনুকরণ প্রবণতা আছে বলে এবং সদস্যদের এই অনুকরণপ্রবণতাই তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমতার কারণ।

ব্যক্তির মধ্যে এই অনুকরণ প্রবণতা এত গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ যে ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা একে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অনুকরণ প্রবণতা যে আমাদের সামাজিক আচরণের স্বরূপ নির্ধারণে একটি শক্তিশালী উপকরণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৪। অনুভাবন

দলের সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে আর একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। সেটি অনুভাবন[2] নামে পরিচিত। অনুভাবনও হল এক প্রকারের অনুকরণ। যখন আমরা অপরের চিন্তা, ভাবধারা, আদর্শ প্রভৃতি নিজস্ব করে

1. Imitation 2. Suggestion

নিই, তখন তাকে অনুভাবন বলা হয়। অনুভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে আমরা যে চিন্তা বা ধারণা অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করি সেগুলি আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে থাকি। অর্থাৎ আমরা অপরের এই চিন্তা বা ধারণাগুলিকে অপরের বলে জানতে পারি না বা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ করছি বলেও মনে করি না। আমরা মনে করি যে ঐ চিন্তা বা ধারণাগুলি আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই জন্মেছে। এক কথায় অনুভাবন প্রক্রিয়াটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া। তবে যে ব্যক্তি অনুভাবিত হয় তার কাছেই সব সময় অনুভাবন প্রক্রিয়াটি অচেতন থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যাকে অনুভাবিত করে তার কাছে অনুভাবন প্রক্রিয়াটি সচেতন বা অচেতন দুইই হতে পারে।

আমাদের জীবনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দলগত জীবনযাত্রা, পরস্পরের মধ্যে ভাবের সঞ্চালন, চিন্তাধারার একতা এবং আদর্শগত সমতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনুভাবনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত যে কোন দলের জ্ঞানমূলক বা চিন্তামূলক দিকটির সংগঠন এই অনুভাবন প্রক্রিয়ারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দলের অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে চিন্তামূলক সংহতি দেখা দেয়। একই গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্গত বা একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।

অনুভাবন প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মূলে আছে একটি বশ্যতার অনুভূতি। যখন আমরা অপর কোন ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে কোন দিক দিয়ে বড় বা উন্নত বলে মনে করি তখনই তার চিন্তা বা ধারণার কাছে নতি স্বীকার করি। এই বশ্যতার অনুভূতি থেকেই আমরা অপরের চিন্তা বা ভাবধারা আমাদের অজ্ঞাতসারেই নিজের করে নিই। যেখানে এই বশ্যতার অনুভূতি নেই সেখানে অনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকর হয় না। এইজন্য দল বা গোষ্ঠীতেই অনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকর হয় এবং অনুভাবন প্রক্রিয়ার উপরই আবার দল বা গোষ্ঠীর সংহতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সাধারণত দলের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ বলে পরিচিত হন তাঁদের মতামত, চিন্তা এবং ধারণা সহজেই দলের অপর সদস্যেরা গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ থাকে তাঁর চিন্তা, ধারণা বা বিশ্বাস গ্রহণ করতে আমাদের দেরী হয় না। স্বাভাবিক অনুভাবন ছাড়াও অস্বাভাবিক অনুভাবনের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। সম্মোহনের সাহায্যে ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজে বা ব্যাপারে অনুভাবিত করা যেতে পারে। দেখা গেছে যে সম্মোহনের পর ব্যক্তি যখন জেগে ওঠে তখনও সে ঐ অনুভাবনের প্রভাব অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। এই ধরনের অনুভাবন অবশ্য মানসিক রোগের চিকিৎসাতেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

দলের সংগঠনে যে তিনটি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হল সেই প্রক্রিয়া তিনটি মূলত একই। তিনটিই অনুকরণ প্রক্রিয়ার বিশেষ রূপ মাত্র। সমানুভূতি বা অনুভাবন এ দুটিও এক ধরনের অনুকরণ প্রক্রিয়া। সমানুভূতির অর্থ হল অপরের অনুভূতির অনুকরণ করা এবং অনুভাবনের অর্থ হল অপরের চিন্তা বা ভাবধারার অনুকরণ করা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে অনুভূতির অনুকরণ, চিন্তার অনুকরণ এবং আচরণের অনুকরণ, এই তিন শ্রেণীর অনুকরণ প্রক্রিয়াই সমস্ত দল বা গোষ্ঠীর সংগঠনে প্রধানতম শক্তি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সঙ্গকামিতা বা দলবদ্ধতা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, তাহলে এই ত্রিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়া সেই প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত করার প্রকৃতিদত্ত উপকরণ বিশেষ।

গণমন

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন একত্রিত হয়ে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন সত্তা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় এবং তাদের স্থানে একটি সমষ্টিগত একক সত্তা দেখা দেয়। এই একক সত্তাটির চিন্তাধারার মধ্যে কোন বিভেদ বা বৈষম্য থাকে না এবং তার উদ্দেশ্য, প্রচেষ্টা ও আচরণ সবই একটিমাত্র পথ ধরে অগ্রসর হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে যখন এই ধরনের একটি দলের সৃষ্টি হয় তখন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমষ্টিগত একক মনের সৃষ্টি করে। এই একক মনকে তাঁরা সমষ্টিগত মন[1] বা গণমন[2] নাম দিয়েছেন। এই মনোবিজ্ঞানীদের মতে যখন একটি সত্যকারের সুসংবদ্ধ দল তৈরী হয় তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলির বিশেষ কোন নিজস্ব প্রভাব থাকে না। তখন সমস্ত ব্যক্তিমনকে পরিব্যাপ্ত করে একটি একক গণমনের সৃষ্টি হয়ে যায়। এই গণমনের কাছে ব্যক্তিগত মনগুলি তাদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় এবং গণমনের চিন্তা, লক্ষ্য, প্রয়োজন প্রভৃতির দ্বারাই দলের প্রত্যেকটি লোকের আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু গণমনের মধ্যে ব্যক্তিগত মন তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে সেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, লক্ষ্য, ইচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ কোন কিছুরই মূল্য তখন থাকে না। ব্যক্তিমন তখন পরিপূর্ণভাবে গণমনের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং গণমনের লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ্য, তার চিন্তাকে নিজের চিন্তা, তার প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দকে নিজের প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দ বলে গ্রহণ করে। এই জন্যই দেখা যায় যে একটি সত্যকারের সুসংবদ্ধ দলের সদস্যদের মধ্যে চিন্তা, লক্ষ্য এবং আচরণ প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে।

কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা, আচরণ প্রভৃতির দিক দিয়ে একতা সম্বন্ধে কারও দ্বিমত না থাকলেও গণমন বা সমষ্টিগত মন নামে কোন একটি স্বতন্ত্র মনের

1. Collective Mind 2. Group Mind

অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে দলের প্রভাবে দলের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের মনে একটি সাময়িক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং যতক্ষণ সে দলের মধ্যে থাকে ততক্ষণই সেই দলের সমষ্টিগত লক্ষ্য, চিন্তা ও চাহিদা তার সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ একটা সমষ্টিগত সচেতনতাই সমস্ত যৌথ আচরণের কারণ। কোনরূপ গণমন বা সমষ্টিগত মনের পরিকল্পনাকে তাঁরা অতিরঞ্জন বলে বর্ণনা করেন।

কিন্তু যাঁরা গণমনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা বলেন যে দলের মধ্যে থাকার সময় ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ ও অনুভূতির মধ্যে এমন আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় যে একটি সর্বব্যাপী গণমনের পরিকল্পনা ছাড়া তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বব্যাপী একনায়ক একটি মাত্র গণমনের প্রভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়।

দলের গঠনের ফলে গণমন বলে সত্যকারের একটি স্বতন্ত্র মন সৃষ্ট হয় কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে দলের সংহতি ও ঐক্য নির্ভর করে এই ধরনের একটি সমষ্টিমূলক অনুভূতি বা সচেতনতার উপর। যেখানেই এই গণচেতনা যত সুদৃঢ় সেখানেই দলের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব তত বেশী। এই জন্যই যখনই কোন দল গঠন করা হয় তখনই দেখতে হয় যে সদস্যদের মধ্যে গণমন বা গণচেতনা কতটা সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যালয় ও গণমন

বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি দল এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, সংহতি ও সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের দলের ঐক্য ও সংহতির উপর। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে সংহতি বেশি, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজও সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি কম সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজ আয়াসবহুল ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই জন্য বিদ্যালয়ে গণমন বা গণচেতনা সৃষ্টি করাই শিক্ষার সফল সম্পাদন ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে সর্ব প্রথম কাম্য।

বিদ্যালয়ে গণমন বা গণচেতনা সৃষ্টি করার পন্থা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গণমন বা গণচেতনা সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। সেগুলি হল —

প্রথমত, প্রত্যেক দলেরই সংহতির জন্য প্রয়োজন তার অস্তিত্বের মধ্যে একটি ছেদহীনতা। দলের অস্তিত্ব নিতান্ত সাময়িক বা অস্থায়ী হলে গণচেতনা সৃষ্টি হতে পারে না।

বিদ্যালয়ে বস্তুগত ও আকারগত, দু'ধরনের ছেদহীনতাই আছে। সেজন্য সেখানে গণচেতনা জাগানো সহজ। বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে এই ছেদহীনতা আরও স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়। সেজন্য আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবন গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ।

দ্বিতীয়ত, গণচেতনা সৃষ্টি করার আর একটি উপায় হল, দলের ব্যক্তিদের মধ্যে দল সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টি করা। অর্থাৎ দলটির প্রকৃতি, সংগঠন, কাজ, শক্তি, সামর্থ্য ও বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে দলের প্রত্যেকের যথাযথ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এই জ্ঞানই ব্যক্তিদের মধ্যে দল সম্পর্কে সচেতনতা এনে দেয় এবং তাদের মধ্যে দলগত সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি করে। যে শিশু বিদ্যালয়ের স্বরূপ, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন সে শিশু কোনদিনই বিদ্যালয় সমাজের সার্থক সদস্যরূপে গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রতিটি দলের সঙ্গে বাইরের সমপ্রকৃতির দলের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থাকা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আদর্শগত ও লক্ষ্যগত বিভিন্নতা এবং ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত বৈষম্য থাকে। তার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলে ব্যক্তির মনে নিজের দল সম্পর্কে সচেতনতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই দলচেতনা সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন দলের পুষ্টি ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই জন্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যান্য বিদ্যালয়, বিভিন্ন সমাজ ও বিদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভ্রমণ, গ্রাম পরিদর্শন, সমাজসেবা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, খেলাধুলো প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়।

চতুর্থত, প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কতকগুলি আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাস আছে এবং দলের সদস্যরা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকে। এই আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাসগুলি সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ করে এবং এগুলির সচেতনতাই দল সম্পর্কে ব্যক্তিদের সচেতন করে রাখে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই এই রকম বহু নিজস্ব প্রথা ও নিয়মকানুন প্রচলিত থাকে এবং এগুলিই শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতাবোধ সব সময় জাগিয়ে রাখে। বিদ্যালয়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান, প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সমাজকে সুসংহত ও পরিপুষ্ট করে তোলে।

পঞ্চমত, গণমন সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে দলের মধ্যে সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর অনুসরণ। প্রত্যেক দলেরই অস্তিত্ব ও গতিশীলতা নির্ভর করে সুনির্ধারিত এবং সুসংগঠিত কর্মপন্থার অনুশীলনের উপর। এই কাজগুলির

নির্বাচন এমন হবে যার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের নিজস্ব প্রতিভা ও সম্ভাবনা অভিব্যক্তি লাভ করবে। বিদ্যালয়েতেও সেইরকম সুচিন্তিত কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে যাতে সেগুলির মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভবপর হয়।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের একতা আনতে হবে। তারা সকলেই যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছে এই বোধটি তাদের মধ্যে প্রথমেই জাগাতে হবে। যদি তাদের প্রত্যেকে একই লক্ষ্য এবং আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সংহতি এবং ঐক্য দেখা দেবে।

সপ্তমত, নানা ধরনের বাহ্যিক প্রতীক বা চিহ্নের সাহায্যেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতার বোধ সৃষ্টি করা যেতে পারে। একই স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমান ইউনিফর্ম বা পোষাক, কোনও বিশেষ ধরনের স্কুলব্যাজ বা প্রতীক, স্কুলের নিজস্ব সঙ্গীত, স্কুলের নিজস্ব পতাকা ইত্যাদি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণচেতনা বা গণমন সৃষ্টি করা যেতে পারে। একই ধরনের পোষাক, ব্যাজ, প্রতীক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ভুলে যায় এবং নিজেদের একই গোষ্ঠী বা দলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে।

সবশেষে, যৌথ কর্মসূচীই হল দলের সংহতি সৃষ্টি করার পক্ষে সব চেয়ে বড় শক্তি। সম্মিলিত ভাবে কোন কাজ করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মধ্যে দল সম্পর্কে চেতনা জাগে এবং দলের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। তাই থেকে সহযোগিতা, দায়িত্বজ্ঞান, স্বার্থত্যাগ, দল বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রচুর পরিমাণে যৌথ অভিজ্ঞতা কর্মসূচীতে প্রবর্তন করা প্রয়োজন। খেলাধুলা, ভ্রমণ থেকে সুরু করে বিতর্ক, প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন, সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যমূলক অধিবেশন, সামাজিক সম্মেলন, সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূর করে তাদের মধ্যে একতা ও সংহতি সৃষ্টি করা যায়।

অনুশীলনী

১। যৌথ মনোবিজ্ঞান বলতে কি বোঝ? মনোবিজ্ঞানমূলক দলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। মনোবিজ্ঞানমূলক দল বলতে কি বোঝ? কয় শ্রেণীর দল দেখা যায়? এগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

৩। দল গঠনে কোন্ কোন্ শক্তি কাজ করে?

৪। কোন্ কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে একটি শিশুদের জনতাকে একটি সুসংবদ্ধ দলে রূপান্তরিত করা যায়?

৫। গণমন কাকে বলে? কিভাবে তুমি বিদ্যালয়ে গণমন গঠন করতে পার?

৬। বিদ্যালয়ে গণমন বা গণসচেতনা সৃষ্টি করার সার্থকতা বর্ণনা কর।

৭। টীকা লেখ :—

(ক) গণমন (খ) প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দল (গ) প্রাথমিক দল (ঘ) সমানুভূতি (ঙ) অনুভাবন

যৌনশিক্ষা

যৌনতা মানবজীবনের গঠন ও নির্বাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাণীর বংশ প্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্য যৌনতার সৃষ্টি হলেও প্রাণীর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে এবং তার অন্যান্য দিকগুলির পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে যৌনতা একটি অতি প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন, তার প্রক্ষোভমূলক সংগঠন তার জীবনাদর্শের বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি দিকই যৌনতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে শৈশবে শিশুর মধ্যে কোনরকম যৌন সচেতনতা থাকে না এবং যৌবনপ্রাপ্তির আগে তার মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ ও প্রবণতা দেখা দেয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের গবেষণা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে যৌন চেতনা দেখা দেয়। শুধু তাই নয় তার যে সব আচরণকে আমরা নির্দোষ বা অর্থহীন বলে মনে করি সেগুলির মধ্যে অনেক আচরণই প্রকৃতপক্ষে তার যৌনতৃপ্তির প্রচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতির দিক দিয়ে পরিণত নরনারীর স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে শিশুর এই যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টার যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। বস্তুত স্বাভাবিক এবং সমাজস্বীকৃত রূপ ও মানের দিক দিয়ে শিশুর এই যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টাকেও বিকৃত এবং অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে। শৈশবকালের পর যে বাল্যকাল আসে তাকে যৌনতার দিক দিয়ে সুপ্তকাল বলা হয়। এই সময়ে শিশুর মধ্যে কোন যৌনতার অনুভূতি বা যৌন প্রচেষ্টা প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় না। কিন্তু বাল্যকালের শেষে যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যৌনতা তার পূর্ণরূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তির জীবননির্বাহের ক্ষেত্রে একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্যক্তির জীবনে সব দিক দিয়েই পূর্ণ পরিণতি আসে এবং তার এই পরিণতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় যৌনতা একটি শক্তিশালী উপাদান রূপে কাজ করে থাকে।

যৌনতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও সাধারণ সভ্যসমাজে যৌনতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখা হয়ে থাকে। যৌনতা সম্পর্কে সভ্যমানুষের মনে একটা লজ্জা ও সংকোচের মনোভাব দেখা যায়। কোন কোন সমাজে আবার যৌনতাকে ঘৃণার চোখেও দেখা হয়। তার ফলে যখন শিশু বড়

হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে যৌনতার উন্মেষণ ঘটে তখন সে সম্বন্ধে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নেই। যৌবনপ্রাপ্তির সময়ে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই যৌন সম্পর্কিত তথ্যগুলি জানার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থাতে শিশুর এই যৌন কৌতূহল তৃপ্ত করার কোন সুষ্ঠু আয়োজন না থাকার জন্য শিশু নানা অবাঞ্ছিত ও অনুপযোগী সূত্রের থেকে বিকৃত ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যগুলি যেমন একদিকে তাদের কৌতূহল পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারে না তেমনই তাদের কাছে অসত্য ও অর্ধসত্য পরিবেশন করে তাদের মধ্যে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি করে। এই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞান যে নানা দিক দিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে একথা সকল আধুনিক মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করে থাকেন।

যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেখা গেছে যে আধুনিক সভ্যসমাজে শিশুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধ-প্রবণতার একটি বড় কারণ হল তাদের অসম্পূর্ণ ও বিকৃত যৌনজ্ঞান। ছেলে ও মেয়ে ও নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ সম্পর্কে পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অসংযম প্রায়ই দেখা দেয়। কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই নয় বিকৃত যৌনজ্ঞানের কুফল গুরুতর ভাবে পরিণত বয়সেও ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। দাম্পত্য জীবনে শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে নির্ভুল ও সুসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের উপর। বিকৃত যৌনজ্ঞান থেকে শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক যৌন প্রচেষ্টা ও প্রবণতা জন্ম নেয় এবং বহুক্ষেত্রে পরিণত বয়সে তা থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য, যৌনব্যাধি ও নানা বিকৃত যৌন অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

এই সব কারণে বর্তমানে শিশুদের যৌন শিক্ষা দানের স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মানবজীবনের একটি বড় দিককে শিশুর কাছে অজ্ঞাত বা অর্ধজ্ঞাত রেখে তার ব্যক্তিসত্তাকে কখনই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য আজকাল অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশের বিদ্যালয়েই যৌন শিক্ষাকে পাঠক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলা হয়েছে। যৌন শিক্ষাদানের স্বপক্ষে নীচের যুক্তিগুলির উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, যৌবন প্রাপ্তির সময় শিশুদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে যৌন সচেতনতা দেখা দেয়। এই যৌন সচেতনতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যৌন কৌতূহল। আগে বিশ্বাস করা হত যে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সক্রিয় যৌন আচরণ সম্পন্ন করার প্রতিই আকর্ষণ প্রবল থাকে। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত

হয়েছে যে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে সক্রিয় যৌন প্রচেষ্টার প্রতি আকর্ষণের চেয়ে যৌনমূলক বিষয়সমূহ সম্পর্কে কৌতূহলই অনেক প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অতএব প্রাপ্তযৌবনদের যৌনমূলক চাহিদা তৃপ্ত করার একটি প্রধান পন্থা হল তাদের এই যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা। এক কথায় যৌন রহস্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরিবেশন করলে শিশুদের যৌনমূলক চাহিদা অনেকাংশে তৃপ্ত হয়। এই জন্য বিদ্যালয় পাঠস্তর থেকেই যৌনশিক্ষা সুরু করা উচিত। বিশেষ করে নবম শ্রেণীতে যে সময়ে যৌবনের প্রথম উন্মেষ ঘটে সে সময় যাতে ছেলেমেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ যৌন তথ্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয় তার আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার সংগঠন নির্ভর করে সুস্থ যৌনজীবনের উপর। যৌনজীবনকে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে তুলতে হলে যৌন বিষয়াদি সম্পর্কে শিশুর সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এই কারণে পরবর্তীকালে যৌনজীবনের সাফল্যের জন্য শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যৌন শিক্ষাকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যাতে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বিকৃত সত্য, অর্ধসত্য ও অসত্য যৌনজ্ঞানের অধিকারী হয়ে অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা নানা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যৌন চাহিদা ও যৌন অনুভূতি সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভাব থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে একটি ভীতি ও লজ্জার মনোভাব দেখা দেয়। তার জন্য হয় তারা তাদের যৌন প্রবণতাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়, নয় অপরাধবোধ থেকে সঞ্জাত আত্মগ্লানি থেকে সারাজীবন কষ্ট পায়। সুপরিকল্পিত যৌন শিক্ষার আয়োজনই হল এই অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর করার একমাত্র উপায়।

চতুর্থত, পরিণত জীবনের অধিকাংশ অভ্যাসেরই প্রাথমিক সংগঠনটি অতি শৈশবেই তৈরী হয়ে যায়। শিশুর যৌন অভিজ্ঞতার প্রকৃতি তার বিভিন্ন অভ্যাস গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বলা বাহুল্য বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের অধিকারী হলে শিশুর মনে নানা অবাঞ্ছিত অভ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটাই এই ধরনের অভ্যাসের প্রভাবে ব্যর্থতা ও অতৃপ্তির বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

পঞ্চমত, যৌন অনুভূতি শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রক্ষোভমূলক সংগঠনের একটি বড় অংশ অধিকার করে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশের পথে পরিচালিত করা না হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ প্রক্ষোভমূলক

সংগঠনটিই বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা হল যৌনসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলি তাকে পরিষ্কারভাবে জানতে দেওয়া।

ষষ্ঠত, যৌনশিক্ষা বলতে নিছক জীবতত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক তথ্যের পরিবেশনই বোঝায় না। সার্থক যৌনশিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা এবং এক পক্ষের মধ্যে অপর পক্ষের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ সশ্রদ্ধ মনোভাব গঠন করা। এই কারণেই যৌনশিক্ষা সুষম ব্যক্তিসত্তা গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সপ্তমত, সুখী দাম্পত্যজীবন যাপন ও সন্তানপালন সম্বন্ধে শিক্ষাও যৌনশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। দেখা গেছে যে জীবনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা না পাওয়ার ফলে বহু ব্যক্তির মধ্যে পরিণত জীবনে নানা জটিল সমস্যা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। অতএব এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলিও ব্যক্তির জীবন গঠনের পক্ষে অপরিহার্য।

যৌনশিক্ষার প্রকৃতি

বিকাশমান শিশুমাত্রেরই প্রক্ষোভমূলক জীবনের একটি প্রধান শক্তি হল যৌনতা। সেই জন্য যৌনশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র যৌনতার জীবতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা কিংবা যৌনতার সংগঠন-বৈশিষ্ট্য বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি শিক্ষা দেওয়াকে বোঝায় না। ব্যক্তির সমগ্র প্রক্ষোভমূলক জীবনে যৌনতার অসীম প্রভাব থাকার জন্য যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগঠন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নগ্রহণ, সন্তোষজনক শৈশব অভিজ্ঞতা, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যথাযথভাবে মেলামেশা করা, ভালবাসা, বিবাহ, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের প্রতি বলিষ্ঠ মনোভাব প্রভৃতির শিক্ষাকেও যৌন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত দেখা যায় যে নানা কারণে পিতামাতারা শিশুদের যৌনশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী নন। কোন কোন পিতামাতা ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান। কেউ কেউ আবার যৌনশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে নিজেরাই ভালভাবে অবহিত থাকেন না বলে যৌনশিক্ষার মূল্য স্বীকার করেন না। আবার কোন কোন পিতামাতা নিজেদের যৌনজীবনে অসঙ্গতি থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের যৌন শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান সমাজের জটিল সংগঠনের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে যৌন শিক্ষাদানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। বর্তমানে প্রত্যেক সুবিবেচক পিতামাতার

পক্ষে নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য যৌনশিক্ষা দানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

যৌনশিক্ষা দানের তিনটি স্তর

যৌনশিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, বাল্যকালের স্তর, কৈশোরের স্তর ও যৌবনপ্রাপ্তির স্তর। বাল্যকালের স্তর বলতে সাধারণভাবে ৩ বৎসর বয়স থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায়। কৈশোরের স্তর বলতে ১০ বৎসর বয়স থেকে ১৪—১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং যৌবনপ্রাপ্তির স্তর বলতে ১৪—১৫ বৎসর বয়স থেকে ১৯—২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায়। এই বয়সগত স্তরবিভাগকে অবশ্য একেবারে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বলা যায় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবেশিক বৈষম্যের জন্য এই বয়সগত বিভাগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা দিতে পারে। শিক্ষাগত পর্যায়ের দিক দিয়ে বাল্যকালকে কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায়ের সমকালীন, কৈশোরকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সমকালীন এবং যৌবনপ্রাপ্তিকে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের সমকালীন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। অতএব এই তিনটি স্তরের জন্য যৌনশিক্ষারও তিনটি বিভিন্ন পাঠস্তর থাকবে।

বাল্যকালে যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

এই স্তরে যৌনশিক্ষা দেওয়া হবে অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষারূপে। এই স্তরে যৌনশিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। নানা সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর অনুভূতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই হবে এই স্তরের পাঠক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

প্রথমত যাতে ছোট শিশুর মধ্যে সুষম ও স্বাস্থ্যময় শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস গড়ে ওঠে সে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ছোট ছেলেমেয়ে, পোষা পশু পাখী প্রভৃতির প্রতি ভালবাসা এবং সেইসঙ্গে সাধারণ বিবেচনা শক্তি যাতে শিশুর মনে গড়ে ওঠে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

যৌন বিষয় সম্পর্কে এই সময় শিশুর মধ্যে দুরন্ত কৌতূহল দেখা দেয়। সেজন্য শিশুর মাকে দেখতে হবে যে শিশু যেন তার যৌন কৌতূহল বিনা সঙ্কোচে প্রকাশ করতে শেখে। ছ'বৎসর বয়স থেকেই শিশু তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের নির্ভুল নাম শিখবে। এই সময় নিজের যৌনাঙ্গগুলির নামও শিশু জানবে এবং সাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকলাপ সম্পর্কে তার মনে একটি ধারণার সৃষ্টি হবে।

ছোট শিশুর জীবনে মায়ের স্থানই সবচেয়ে বড়। মাকেই সে বেশীর ভাগ প্রশ্ন করে থাকে। একটু বড় হলে বাবার কাছেও সে তার প্রশ্ন নিয়ে হাজির

হয়। শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য মা বাবা উভয়কেই প্রস্তুত থাকতে হবে। অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরের কোন জায়গা থেকে কোন আলোচনা বা মন্তব্য শুনে মা বাবাকে যৌনবিষয়ক প্রশ্ন করে। তখন পিতামাতার উচিত শিশুর মনে সত্যকারের কোন্ ধরনের চিন্তার উদয় হয়েছে নির্ণয় করা এবং সেইমত তার কৌতূহল তৃপ্তির চেষ্টা করা। মনে রাখতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর বিশদ্‌ভাবে দেওয়ার দরকার হয় না। উত্তর অতি বিশদ্ হলে তাদের চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তারা তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এর চেয়ে একটু বড় হলে বাড়ীর কাজকর্মে পরিবারের আর সকলের সঙ্গে শিশুদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সঙ্গে যাতে তারা স্বাস্থ্যকর খেলায় ও কাজে অংশগ্রহণ করে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই সময় শিশুরা পিতামাতার কাছ থেকে বিনা সঙ্কোচে যৌনবিষয় সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করতে শিখবে। সেই সঙ্গে যাতে শিশু কোনরূপ অবাঞ্ছিত যৌন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে না পারে সেদিকে পিতামাতাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই বয়স থেকে প্রত্যেক ছেলেমেয়ে তার নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম নিখুঁতভাবে জানবে। যখন তার বয়স দশ বৎসর হবে তখন থেকেই জনন-প্রক্রিয়ার অর্থ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্ভুল প্রাথমিক জ্ঞান যাতে প্রতি শিশু আহরণ করতে পারে তারও আয়োজন করতে হবে।

আট বৎসর বয়সের আগে শিশু বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের বিচার করে না। আট বৎসর বয়স থেকেই দেখা যায় যে ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে। দশ এগার বৎসর বয়স থেকেই ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে সুরু করে। যৌন সচেতনতার এই ক্রমবিকাশের কথা মনে রাখলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বয়স্করা তাঁদের আচরণও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন।

বিকাশমান শিশুর উপর তার পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নেহ ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার চেষ্টা করলে তাদের ব্যক্তিসত্তার সংগঠনও সুষম হয়ে উঠতে পারে। এই সময় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে নানা প্রশ্ন শিশুদের মনে দেখা দেয়। এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাতে তারা পেতে পারে পিতামাতাদের সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যালয়ই হল যৌন শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট স্থান। শৈশব স্তরে অবশ্য যৌনবিষয়ক কোন তথ্য প্রত্যক্ষভাবে পড়ান বা শেখান সম্ভব নয়। তবে শরীর-তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের সাধারণ বিষয়গুলির সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করার আয়োজন এই

স্তরের পাঠক্রমে রাখা দরকার। ক্লাসের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের কাজকর্মগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে কাজ করার এবং খেলাধুলার সুযোগ পায়। তার ফলে ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি আন্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে।

কিশোর স্তরের যৌন শিক্ষার পাঠক্রম

সাধারণভাবে বলা চলে যে যৌবনপ্রাপ্তির আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনরূপ যৌনমূলক আচরণ দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে বাল্যকালের যে সব আচরণকে যৌনমূলক বলে মনে হয় অধিকাংশক্ষেত্রেই সেগুলি যৌনতাবর্জিত ও নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু যৌনতাপ্রাপ্তির ঠিক আগের সময় থেকেই যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি কিছু আগে ঘটে বলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিশোর বয়সে মেয়েরা যতটা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি ততটা আকর্ষণ অনুভব করে না। এইজন্য এই সময় ছেলেদের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের যথাযথ পরিচালনা করা একান্ত আবশ্যক। দেখতে হবে যে ছেলেমেয়েদের মনে যেন এ বিশ্বাস জন্মায় যে তাদের মা-বাবারাই তাদের যৌনঘটিত সমস্যাগুলির সবচেয়ে ভালভাবে সমাধান করতে পারেন।

যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মনেই একটি প্রবল প্রক্ষোভমূলক আলোড়ন দেখা দেয়। তাদের শরীরে এই সময়ে যে সব পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিকে তারা যদি যথাযথ বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে না পারে তাহলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দেয়। যৌনমূলক শরীরতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচিত করার দায়িত্ব প্রধানত পিতামাতারই। অবশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উপদেষ্টারা যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিশোর বয়সে মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনমূলক সঙ্গতিসাধন বেশ সহজ হয়ে উঠতে পারে যদি রজঃসৃষ্টির রহস্য এবং সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। সাধারণতঃ এই মূল্যবান কাজটি মায়েরাই করে থাকেন। আর যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ না জেনেই জীবন যাত্রা সুরু করে সে সব ক্ষেত্রে তাদের নানা ভ্রান্তি, সংশয় ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই জন্য যৌনশিক্ষার পরিকল্পনায় এটি হল একটি অতি মূল্যবান স্তর বা সোপান।

রজঃসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে ছেলেদেরও পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেননা এই দৈহিক পরিবর্তনগুলি মেয়েদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃত্বের সঙ্গে সেগুলির

কি সম্পর্ক এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ছেলেদের জানা থাকলে তারা এই ঘটনাগুলিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে। আর যদি এই সব দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছেলে-মেয়েদের মনে ভুল ধারণা জন্মায় তাহলে যৌনতার প্রতিই তাদের মনে একটি অস্বাস্থ্যকর মনোভাব গড়ে উঠবে। মোট কথা কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে থাকবে যৌনমূলক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং যৌনঘটিত নানা দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদির পরিবেশন। সেই সঙ্গে ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি যাতে একটি বলিষ্ঠ ও উদার মনোভাব গড়ে ওঠে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রাপ্তযৌবন স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

সাধারণতঃ বাল্যকাল বা কৈশোরে শিশু প্রয়োজনীয় যৌন তথ্যগুলি সংগ্রহে অসমর্থ হলেও যৌবনপ্রাপ্তির সময় সে নানা সূত্র থেকে নানা উপায়ে যৌনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-গুলি আহরণ করে থাকে। শারীরিক বিকাশ ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সে তার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে লাভ করে। অতএব সেই সময়ে যৌন সংক্রান্ত সকল ব্যাপার সম্পর্কেই যাতে তার নির্ভুল জ্ঞান জন্মায় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য প্রত্যক্ষভাবে যৌনশিক্ষার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে।

নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি যৌবনাগমের দ্বারাই সূচিত হয়ে থাকে। এই সময় ছেলেমেয়েরা সব দিক দিয়ে পরিণত মনের অধিকারী হয়ে ওঠে। তখন সে বিশেষ কোন ছেলে বা বিশেষ কোন মেয়েকে ভালবাসতে শেখে, নিজের বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনায় মগ্ন হয়। কিন্তু যৌনবিষয়ক সমস্যাগুলি এই সময় তাদের কাছে খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে নিজেদের অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে ছেলেরা অনেক সময় অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। তেমনই মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করবে সে সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যা অনুভব করে। অনভিজ্ঞতা ও যৌনশিক্ষার অভাবে বহু ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ ও সুস্থ যৌন সম্পর্ক দুষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে বহু প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নানা বিকৃত ও অস্বাস্থ্যকর যৌনপ্রবণতা দেখা যায়। সমরতিপ্রবণতা[1] এই ধরনের একটি অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণতা। এটি সকল প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যেই দেখা দেয় এবং স্বল্প-কালের জন্য থেকে স্বাভাবিক যৌনতার পূর্ণবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিক যৌনতা বলতে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি সহজ যৌন আকর্ষণকেই বোঝায়। কিন্তু যে সব ব্যক্তির এই সমরতিপ্রবণতা যৌবনপ্রাপ্তির পরেও থেকে যায় তাদের ক্ষেত্রে এটি অস্বাভাবিক ও বিকৃত যৌনপ্রবণতা বলে বুঝতে হবে। প্রাপ্তযৌবনের

1. Homosexuality

যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে না পারলে তার ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অস্বাভাবিক ও ব্যর্থতাময় হয়ে ওঠে।

কোন রকম বিকৃত যৌনপ্রবণতা যদি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে থেকে যায় তাহলে তাদের পরিণত বয়সের স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন একেবারেই সুখকর হয় না। এই সব অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌনশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রাপ্তযৌবনদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ক) যৌন বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট জীবতত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান।

(খ) বিভিন্ন যৌন বিকৃতি সম্পর্কে ধারণা ও সেগুলির কুফল সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা।

(গ) যৌনঘটিত ব্যাপারে স্বাস্থ্যময় ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর গঠন এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি।

(ঘ) দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য সম্পর্কে সুসংহত বিবরণ। নারী-পুরুষের সুষ্ঠু সম্পর্কের ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রয়োজনীয়তার আলোচনা।

(ঙ) সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন।

(চ) যৌথ কাজকর্ম, সাহিত্যমূলক ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, সৃজনমূলক প্রচেষ্টা, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী।

অনুশীলনী

১। যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

২। বিদ্যালয় পাঠক্রমে যৌনশিক্ষার স্থান নির্ধারণ কর এবং কিভাবে এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায় বর্ণনা কর।

৩। শিশুর শিক্ষায় কেন বর্তমানে যৌনশিক্ষাকে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়? শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যৌনশিক্ষা প্রবর্তনের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা কর।

৪। টীকা লেখ :- (ক) যৌনশিক্ষার প্রকৃতি। (খ) যৌবনাগম স্তরে যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

বিয়াল্লিশ

অনুকরণ

প্রাণীর সকল স্তরের আচরণের স্বরূপ ও সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে অনুকরণ[1] প্রক্রিয়ার উপর। ছোট বড় উন্নত অনুন্নত সকল প্রকার প্রাণীর অনুষ্ঠিত আচরণের একটি বড় অংশই তাদের সমাজের অন্যান্য সদস্যদের আচরণের অনুকরণে শেখা। যে কোন ছোট শিশুর আচরণের সংগঠন, স্বরূপ ও গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা অনুকরণের অসীম গুরুত্ব এবং ব্যাপকতার পরিচয় পাই।

অনুকরণের এই সর্বজনীন ও পরিব্যাপক প্রভাবের জন্য বহু মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে সহজাত প্রবৃত্তির গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। ম্যাক্‌ডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা অনুকরণকে পলায়ন, খাদ্য-অন্বেষণ প্রভৃতির মত একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে শিশু জন্ম থেকেই অনুকরণের প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং সেই জন্যই সে অপরকে অনুকরণ করে থাকে। কিন্তু থর্নডাইক প্রভৃতি আর একদল মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যে সকল আচরণকে আমরা অনুকরণজাত বলে বর্ণনা করে থাকি সেগুলি প্রকৃত পক্ষে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা আচরণ এবং প্রাণীর অভ্যাসের ফল থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁদের মতে শিশু বার বার প্রচেষ্টা ও ভুলের মধ্যে দিয়ে আচরণগুলি শেখে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। ঐগুলিকেই সাধারণত অনুকরণজাত আচরণ বলা হয়।

অনুকরণের গুরুত্ব

অনুকরণকে একটি সহজাত প্রবৃত্তিই বলা হোক্‌ আর অভ্যাস-প্রসূত আচরণই বলা হোক্‌, একথা অনস্বীকার্য যে প্রাণীমাত্রের অধিকাংশ প্রাথমিক আচরণই অনুকরণজাত। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক এবং কার্যকর সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই অনুকরণের জন্ম। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গতি-বিধানের জন্য যে বিশেষ আচরণটি কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সম্পন্ন করে খুব স্বাভাবিক-ভাবেই শিশু সেই পরিস্থিতিতে পড়লে সঙ্গতিবিধানের জন্য সেই তৈরী আচরণটিই সম্পন্ন করে। এদিক দিয়ে সমাজের বয়স্কদের আচরণগুলি শিশুর কাছে তার সঙ্গতি-বিধানের জন্য পূর্ব গঠিত ও কার্যকর উপকরণ বিশেষ। সেইজন্য কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়লে নতুন কোন আচরণ উদ্ভাবনের চেয়ে বয়স্কদের ঐ আচরণটি সম্পন্ন করা শিশুর পক্ষে অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। তাছাড়া সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিস্থিতিতে শিশুর পক্ষে উপযোগী নতুন আচরণ উদ্ভাবন করাও সম্ভব নয়। তার সামনে যদি

---

1. Imitation

বয়স্কদের অনুসৃত তৈরী আচরণগুলি না থাকত এবং যদি অপরের আচরণ অনুকরণ করার সহজাত সামর্থ্য নিয়ে সে না জন্মাত তাহলে তার পক্ষে অপরিচিত পরিবেশে অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। সমস্ত অনুকরণের অন্তর্নিহিত মূল রহস্যটিই হল এই। অর্থাৎ অনুকরণ প্রচেষ্টা প্রাণীমাত্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রাথমিক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সোপান বিশেষ। মানবশিশু তার জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য আচরণগুলি বয়স্কদের কাছ থেকে এই অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আহরণ করে থাকে।

অনুকরণের সর্বব্যাপকতা সম্বন্ধে উইলিয়াম জেমসের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। সেটি হল—'অনুকরণ' ও 'উদ্ভাবন', এই দুটি প্রক্রিয়ারই উপর ভর দিয়ে মানবজাতি ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ মানবজাতির ক্রমোন্নতির মূলে আছে দুটি প্রক্রিয়া, অনুকরণ ও উদ্ভাবন। অনুকরণ মানবজাতিকে তার পূর্বপুরুষদের আচরিত আচরণ অনুষ্ঠান করতে ও তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতারাশি আহরণ করতে সমর্থ করে। আর উদ্ভাবন তাকে নতুন পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ করে। এইভাবে অনুকরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে মানবসভ্যতা প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিমাত্রেই সর্বদাই তার চতুষ্পার্শ্বের পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছে। সেজন্য যখন সে তার চেয়ে বয়সে বড় এবং অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে দেখে তখন সেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে ঐ আচরণটি অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ এক কথায় সে ঐ আচরণটির অনুকরণ করে। এই জন্য আমরা আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট বা কোন কম অভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করি না। যার আচরণের উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল তারই আচরণ আমরা অনুকরণ করে থাকি। শিশুর ক্ষেত্রে তার পূর্ণ অনভিজ্ঞতার জন্য সকলের আচরণই উৎকৃষ্ট ও কার্যকর, অতএব অনুকরণীয় এবং সেজন্য সে ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলের আচরণ অনুকরণ করে থাকে।

কিন্তু যত সে বড় হতে থাকে ততই তার এই নির্বিচারে অনুকরণ করার অভ্যাসটি কমে যায় এবং পরে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির আচরণ ছাড়া আর কারও আচরণ সে অনুকরণ করে না। পরিণত বয়সে তার অনুকরণীয় ব্যক্তির সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে অনুকরণীয় আচরণের সংখ্যা আরও কমে যায়।

অনুকরণের শ্রেণীবিভাগ

অনুকরণ দুশ্রেণীর হতে পারে—অচেতন অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণ। বহু আচরণ আছে যা শিশু সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতসারেই অপরের অনুকরণ করে শেখে।

তার এই অনুকরণের মধ্যে কোন ইচ্ছাজাত প্রচেষ্টা নেই। এমন কি সে যে অনুকরণ করছে তাও তার কাছে অজ্ঞাত থাকে। শিশুর ভাষা, আচার-ব্যবহার, বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বহু আচরণই অবিকল বড়দের অনুকরণ করে শেখা এবং তার এই অনুকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অচেতন প্রকৃতির। সচেতন অনুকরণের দৃষ্টান্তও শিশুর আচরণের মধ্যে অজস্র পাওয়া যায়। তবে মানসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে শিশু যত পরিণত হয়ে ওঠে ততই তার মধ্যে সচেতন অনুকরণ দেখা যায়। পোশাক পরার পদ্ধতি, কথা বলার ভঙ্গী, চলাফেরার কায়দা ইত্যাদি বহু আচরণ শিশু তার সঙ্গীসাথী বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের নকল করে শেখে।

অনুকরণকে আবার আর এক দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, দৈহিক আচরণের অনুকরণ, চিন্তা বা ভাবের অনুকরণ ও অনুভূতির অনুকরণ। প্রচলিত ভাষণে দৈহিক আচরণকেই আমরা অনুকরণ বা সমাচরণ[1] বলে থাকি। চিন্তা ও ভাবের অনুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে অনুভাবন[2] এবং অনুভূতির অনুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে সমানুভূতি[3]।

দৈহিক অনুকরণ বা সমাচরণ

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার অনুকরণ সর্বজনীন। ছোট বড় সকলের মধ্যেই দৈহিক অনুকরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এগুলিকে আমরা সমাচরণ নাম দিতে পারি। সমাচরণ বা দৈহিক অনুকরণ আবার সচেতন ও অচেতন দু'প্রকারের হতে পারে। যখন কোন চলচ্চিত্র, খেলাধূলা, বক্সিং প্রভৃতি আমরা নিবিষ্টমনে দেখি তখন প্রায়ই দেখা যায় যে দৃষ্ট ব্যক্তিদের দৈহিক আচরণধারা আমরা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করে চলেছি। এগুলি হল অচেতন সমাচরণের দৃষ্টান্ত। খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রেই অচেতন সমাচরণের দৃষ্টান্ত সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। তার কথা বলা, খেলাধূলা, চলাফেরা প্রভৃতি আচরণগুলির প্রায় সবই বড়দের এবং তার সঙ্গীসাথীদের দেখে সম্পূর্ণ অচেতনভাবে অনুকরণ করা। অচেতন সমাচরণ ছাড়াও আমরা অপরের বহু আচরণ সচেতনভাবে অনুকরণ করে থাকি।

চিন্তার অনুকরণ বা অনুভাবন

অপরের দৈহিক আচরণের যেমন অনুকরণ করা যায় তেমনই অপরের চিন্তা, ধারণা ও ভাবনা, আদর্শ, বিশ্বাস প্রভৃতিরও অনুকরণ করা যায়। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অনুভাবন। দৈহিক অনুকরণের মত শিশুর জীবনে অনুভাবনের প্রভাবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মানসিক সংগঠন, বিশ্বাস, আদর্শ সবই গড়ে ওঠে এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা।

---

1. Imitation 2. Suggestion 3. Sympathy

দৈহিক আচরণের মত অনুভাবনও সচেতন ও অচেতন হতে পারে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যক্তি অপরের চিন্তা ও ভাবধারাকে নিজস্ব করে নিতে পারে। তবে অচেতন অনুভাবনের শক্তিই সব চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। শিশুর ক্রমবর্ধমান মানসিক সংগঠনটির বিকাশ ও পুষ্টির পেছনে থাকে এই অচেতন অনুভাবন প্রক্রিয়াটি।

অনুভূতির অনুকরণ বা সমানুভূতি

দৈহিক আচরণের অনুকরণ এবং চিন্তার অনুকরণের মত আমরা অপরের অনুভূতিরও অনুকরণ করতে পারি। অপরের রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বিরক্তি, ভয় প্রভৃতি আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের মধ্যেও অনুরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। একেই সমানুভূতি বলা হয়। সমানুভূতিও অন্যান্য অনুকরণ প্রক্রিয়ার মত অচেতন ও সচেতন হতে পারে। আমরা জ্ঞাতসারে অপরের দুঃখে দুঃখিত বা সুখে সুখী হতে পারি। তেমনই আবার আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের অনুভূতি আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের মনে দুঃখ, আনন্দ, ভয় ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে।

শিশুর জীবনে অনুকরণের প্রভাব

এই ত্রিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়াই শিশুর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তার বাহ্যিক আচরণ, চিন্তা, ধারণা, বিশ্বাস, আনন্দ, রাগ, দুঃখ প্রভৃতি সকল রকম বৈশিষ্ট্যই অনুকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বাহ্যিক আচরণের অনুকরণ শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে তার অজ্ঞাতসারে সে বহু আচরণই অপরের দেখাদেখি শেখে ও সম্পন্ন করে। এই সময়ে শিশুর আচরণধারার সংগঠনে অনুকরণ প্রয়াসের মূল্য অসীম। জীবনধারণের বহু অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য আচরণও সে এই সময় অচেতন অনুকরণের মাধ্যমে শেখে।

শিশু কিছুটা বড় হলে তার মধ্যে সচেতন অনুকরণ কার্যকর হয়। স্কুল জীবনে সচেতন অনুকরণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই সময় তার মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং প্রায়ই দেখা যায় যে শিশু সেই বিশেষ ব্যক্তির আচরণ ও চিন্তাধারা অনুকরণ করে চলেছে। শিশু মাত্রেরই প্রথম অনুকরণের পাত্র হল তার পিতামাতা। কিন্তু যত সে বড় হয় তত সে নতুন নতুন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তার আসক্তি ক্রমশ পিতামাতাকে ত্যাগ করে শিক্ষক বা অন্য কোন ব্যক্তির

প্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তখন শিশু সেই ব্যক্তির আচরণধারা নির্বিচারে অনুকরণ করে।

তবে পিতামাতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য বয়স্কদের আচরণের অনুকরণেই শিশু অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলি শিখে থাকে। সেজন্য পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির আচরণ শিশুর পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভবপর, শিশুর আচরণধারার সংগঠনে তাঁদের দায়িত্ব যে অপরিসীম সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁরা যেন এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থাকেন যে শিশুর সামনে এমন আচরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ কখনও তাঁরা স্থাপন করবেন না যা তার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে।

অনুকরণ প্রক্রিয়াকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কিনা

শিশুর অনুকরণ প্রয়াস শিক্ষার পক্ষে অনুকূল কি প্রতিকূল এবং তার সে প্রয়াসকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। একদল মনোবিজ্ঞানী আছেন যাঁরা শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে শিক্ষার পরিপন্থী বলে মনে করেন এবং কোন দিক দিয়েই তার পরিপোষণ বা উৎসাহ-দানকে তাঁরা সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে অনুকরণমাত্রেই যান্ত্রিক ও অন্ধ আচরণ এবং তার ফলে অনুকরণকারী শিশুর নিজস্ব সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যায় এবং সে আত্মনির্ভর হয়ে নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না। যদি শিশু কেবলমাত্র অপরের অনুকরণ করেই তার সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে তাহলে তার নিজস্ব মানসিক প্রচেষ্টা কোনদিনই বিকশিত হয়ে উঠবে না এবং সে অপরের আচরণের উপর চিরকালই নির্ভরশীল থেকে যাবে। তার যদি নিজস্ব কোন প্রতিভা বা উদ্ভাবনী-শক্তি থাকে তা হলে তা স্বাধীন প্রচেষ্টার অভাবে অভিব্যক্ত হতে পারবে না। অতএব শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে অবরুদ্ধ করা এবং তার স্বাধীন আচরণ প্রয়াসকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়াকেই তাঁরা শিক্ষার প্রধান কর্তব্য বলে বর্ণনা করেন।

এই মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার্য। কিন্তু শিশুর স্বাধীন প্রচেষ্টার সংগঠনে অনুকরণের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি তাঁরা এখানে উপেক্ষা করছেন। সৃজনমূলক প্রয়াসমাত্রেরই সুরু অনুকরণে, যদিও তার পরিসমাপ্তি স্বাধীন আচরণে ঘটে থাকে। কোন স্রষ্টা যতই প্রতিভাবান হোন্ না কেন, প্রথম হতেই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে তিনি কোন নতুন বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁর প্রাথমিক সৃজন প্রয়াস কোন না কোন পূর্বগামীর প্রদর্শিত পথ ধরে প্রথমে অগ্রসর হয় কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হবার পর তাঁর প্রয়াস সেই পুরাতন পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নতুন পথ আবিষ্কার করে নেয় এবং সেই প্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতি ঘটে নতুন এবং অভিনব কিছুর সৃষ্টিতে। অতএব অনুকরণ প্রয়াস স্বাধীন প্রয়াসের বিরোধী নয়, বরং তার সহায়ক ও অপরিহার্য সোপানবিশেষ।

কিন্তু যেখানে শিশুর আচরণ তার প্রাথমিক অনুকরণের গণ্ডী পার হয়ে নিজস্ব স্বাধীন পথ খুঁজে নিতে পারে না সেখানে অনুকরণ ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু গঠনের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। সেখানে আচরণ সত্যই যান্ত্রিক ও অন্ধ হয়ে যায় এবং শিশুর অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্যের বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব সুশিক্ষার কার্যকর কর্মসূচী হচ্ছে শিশুর আচরণধারাকে ধীরে ধীরে অনুকরণের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে নতুন বস্তুর উদ্ভাবন বা নতুন চিন্তার সৃষ্টির পথে পরিচালিত করা। প্রথম থেকে শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে রুদ্ধ করা কখনই উচিত নয়। বরং তাকে যথাসময়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে অনুকরণমূলক আচরণ থেকে নূতন ও সৃজনমূলক আচরণের পথে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

কিন্তু এর জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যথাসময়ে যদি শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে রুদ্ধ করা না যায় তাহলে তার সমস্ত আচরণই গতানুগতিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং অপরের প্রদর্শিত পথ ছাড়া সে নিজে নতুন কোনও পন্থা বা আচরণের উদ্ভাবন করতে পারবে না। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিশুর এই স্বাভাবিক অনুকরণ প্রক্রিয়া থেকে স্বাধীন আচরণে সঞ্চালনের উপযুক্ত সময় সম্পর্কে শিক্ষক সচেতন থাকেন না এবং প্রয়োজনমত তাকে স্বাধীন প্রচেষ্টার পথে সুপরিচালিত করতে পারেন না। তার ফলে শিশুর আচরণ চিরকালের জন্য অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, নূতন উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে ওঠে না। এই জন্য শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচীটি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত করতে হবে। বিভিন্ন বয়সের পাঠস্তরে যেমন অনুকরণমূলক কাজের সাহায্যে শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, তেমনই সেই সঙ্গে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য তাকে সর্বদাই উৎসাহ ও সুযোগ দিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অঙ্কন, লিখন, মূর্তিগঠন, কার্ডবোর্ড, মাটি, বালি ইত্যাদি দিয়ে নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা, কবিতা ও সাহিত্য রচনা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বাধীন কর্মপ্রয়াসকে পরিপুষ্ট হবার পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।

অনুভাবন ঃঃ চিন্তার অনুকরণ

একজনের ভাবধারা বা চিন্তা অপরের মনে সঞ্চালিত হওয়ার নাম অনুভাবন। দেখা গেছে যে মানুষমাত্রেরই মনে অল্পাবিস্তর অপরের দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রবণতা আছে। একে আমরা মানব মনের অনুভাবনীয়তা[1] বলে থাকি। অনুভাবনও এক প্রকারের অনুকরণ। অপরের ভাবধারা বা চিন্তার অনুকরণকেই অনুভাবন নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে অনুভাবনের গভীর

1. Suggestibility

প্রভাব আছে। ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার প্রভৃতির অধিকাংশই অনুভাবনের প্রভাব থেকে প্রসূত। মানব মনের একটি অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে অপরের চিন্তা ও ভাবধারা ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই এবং অনেক সময় নির্বিচারে নিজস্ব করে নেয়। একজনের মন থেকে অন্যজনের মনে ভাবধারা বা চিন্তার সঞ্চালন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তবে দৈহিক অঙ্গভঙ্গী, আকার-ইঙ্গিত বা অন্যান্য পন্থাতেও এই সঞ্চালন ঘটতে পারে।

শিশুর বিকাশমান মনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তার চতুষ্পার্শ্বের বয়স্ক ব্যক্তিদের মতবাদ, আদর্শ ও চিন্তাধারা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তার চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। আরও বড় হলে শিশু কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তার আদর্শ মানুষ বলে ধরে নেয় এবং তখন সেই ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবধারা তার মানসিক সংগঠনের প্রধানতম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত স্কুলজীবনে দেখা যায় যে কোনও বিশেষ শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুর মনে এই আদর্শ মানুষের স্থানটি অধিকার করে থাকেন এবং শিশু তাঁর বাচনভঙ্গী, চলন বৈশিষ্ট্য, আদব-কায়দা প্রভৃতি থেকে সুরু করে তাঁর চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও জীবনদর্শন হুবহু অনুকরণ করে। প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুকরণ তাদের আচরণমূলক, প্রাক্ষোভিক, চিন্তামূলক প্রভৃতি সকল প্রকার সংগঠনেরই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

অনুভাবন আর সকল অনুকরণ প্রক্রিয়ার মতই অচেতন ও সচেতন হতে পারে। আমরা যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের কোন চিন্তা, আদর্শ, বিশ্বাস, মতবাদ, সংস্কার প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই তখন তাকে অচেতন অনুভাবন বলা হয়। আবার কখনও কখনও আমরা আমাদের জ্ঞাতসারেই অপরের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তখন তাকে সচেতন অনুভাবন বলা হয়। যেমন কারও কোনও আলোচনা শুনে বা যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে আমরা তার মতবাদ বা ধারণাটি জেনেশুনেই গ্রহণ করতে পারি।

অচেতন অনুভাবন প্রক্রিয়াটি মনোবিকারের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে রোগীকে সম্মোহিত করে তাকে সেই সময়ে কোন একটি বিশেষ উপদেশ বা নির্দেশ দিলে সে পরে জেগে উঠে ঠিক সেই উপদেশ বা নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। যেমন কোন মনোব্যাধির রোগী হয়ত হাতের ব্যথা বা মাথার যন্ত্রণা থেকে কষ্ট পাচ্ছে বা কোন অস্বাভাবিক আচরণ অনুষ্ঠান করছে। তাকে সম্মোহিত করে চিকিৎসক বললেন যে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে দেখবে যে তার ঐ ব্যথা বা অস্বাভাবিকতা আর নেই, সম্পূর্ণ সেরে গেছে। দেখা গেছে যে সম্মোহন থেকে জেগে উঠে রোগীটি সত্য সত্যই আর ঐ ব্যথা অনুভব করে না বা ঐ অস্বাভাবিক আচরণ আর অনুষ্ঠান করে না। ফ্রয়েড প্রভৃতি মনঃসমীক্ষকেরা মনোব্যাধির

চিকিৎসায় অনুভাবন প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগের বহু নিদর্শন রেখে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে অচেতন অনুভাবনের প্রক্রিয়াটিই সব দিক দিয়ে শক্তিশালী, ব্যাপক ও সর্বজনীন। ব্যক্তিমাত্রেই কিছু না কিছু পরিমাণে অনুভাবনের প্রভাবাধীন। তবে মানসিক শক্তির পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অনুভাবনীয়তা বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে।

অনুভাবন প্রবণতার পেছনে ব্যক্তির মধ্যে একটা বশ্যতা বা হীনমন্যতার বোধ থাকে। যখনই আমরা অপরকে আমাদের চেয়ে বুদ্ধিতে, জ্ঞানে বা বিচক্ষণতায় বড় বলে মনে করি তখনই তার মতবাদ বা চিন্তাকে আমরা আমাদের নিজস্ব করে নিই। অপর পক্ষে যাকে আমরা আমাদের চেয়ে হেয় বলে মনে করি তার দ্বারা আমরা কখনই অনুভাবিত হই না। এই কারণেই আমরা মহৎ, মানী, গুণী, প্রভাবশালী ও শক্তিমান ব্যক্তিদের দ্বারা সহজেই অনুভাবিত হয়ে থাকি।

ভাষা অনুভাবন সৃষ্টির একটি বড় মাধ্যম। ভাষার আবেদন আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলেই আমরা সহজে ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠি। এই কারণে কোন বক্তব্য সুন্দর করে আমাদের কাছে বলা হলে আমরা সহজেই সেটা বিশ্বাস করি অর্থাৎ আমরা তার দ্বারা অনুভাবিত হয়ে পড়ি। জার্মানীর বিখ্যাত যুদ্ধকালীন প্রচারবিদ্ গোয়েবল্সের ভাষায় মিথ্যা কথাও যদি বার বার এবং বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় তবে সেটিকে মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। এটি মানব মনের অনুভাবনীয়তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই সব কারণে অনুভাবনের প্রভাব প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক, জননায়ক, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি ব্যক্তিদের চিন্তাধারা আমরা অজ্ঞাতসারেই আমাদের নিজস্ব করে নিই। সময় সময় দেখা যায় যে কোন বিশেষ চিন্তানায়ক বা জননেতার ভাবধারা একটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে তোলে। জনমত সৃষ্টিতেও অনুভাবনের ভূমিকা যথেষ্ট। দেশের জনমণ্ডলীর মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার সঞ্চালন থেকেই জনমতের সৃষ্টি হয়। এই একই কারণে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য আমাদের এতটা প্রভাবিত করে থাকে। পত্রপত্রিকায় যে সব বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেগুলি যে আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্যই পরিকল্পিত তা জেনেও আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষা, বক্তব্য, আবেদন, উপস্থাপন শৈলী প্রভৃতির দ্বারা বস্তুটির প্রতি আমাদের অজ্ঞাতসারেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুভাবনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার সমগ্র পরিবেশটি কি ধরনের চিন্তা ও আদর্শ তাদের মনে সৃষ্টি করে তার উপর। কথাবার্তা, আলোচনা, শিক্ষণ, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে

যে ধরনের চিন্তা ও ধারণার সৃষ্টি করেন তাদের মনের মৌলিক সংগঠনটিও সেই আকৃতি ধারণ করে। অতএব শিক্ষকমাত্রকেই নিজের আচরণ, কথাবার্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। যে সব চিন্তা বা মতবাদ শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু মানসিক সংগঠনের পরিপন্থী বলে মনে হবে সেগুলি যাতে শিক্ষকের ভাবে বা ভঙ্গীতে কোন রকমে ব্যক্ত না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে সবল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে এমন চিন্তাধারাই যাতে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয় সে সম্বন্ধে পিতামাতা ও শিক্ষককে সচেতন হতে হবে।

সমানুভূতি

অপরের অনুভূতির অনুকরণের নাম হল সমানুভূতি। অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করা বা অপরের সুখে সুখ অনুভব করা বা অপরের ঘৃণা, বিরক্তি, ভালবাসা সমানভাবে অনুভব করা প্রভৃতি হল সমানুভূতির উদাহরণ। সমানুভূতিও অচেতন এবং সচেতন দু'শ্রেণীর হতে পারে। অর্থাৎ আমরা যেমন জ্ঞাতসারে অপরের অনুভূতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারি তেমনই আবার আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই অপরের অনুভূতিকে নিজস্ব করে নিতে পারি। পরিচিত বা প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার পেছনে মনের একটা যুক্তিভিত্তিক সক্রিয়তা আছে। কিন্তু অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির প্রক্ষোভও আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে। যেমন, কোন দুঃখী বা যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তিকে দেখলে আমরা দুঃখ বা যন্ত্রণা বোধ করে থাকি। ভিক্ষুক বা দরিদ্র ব্যক্তি দেখলে দয়া অনুভব করার পেছনেও আছে এই সমানুভূতি। এই সব কারণে সমস্ত সামাজিক সংগঠনের মৌলিক উপাদানই হল সমানুভূতি।

সমানুভূতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে সমানুভূতি মাত্রেই সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। একটি সামাজিক পরিবেশ বা একাধিক ব্যক্তি না থাকলে সমানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে না। একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখিত হওয়া, একজনের সুখে সুখী হওয়া বা একজন বিরক্ত হলে আর একজনের বিরক্ত হওয়া ইত্যাদি হল সমানুভূতির দৃষ্টান্ত। এই সমানুভূতির জন্যই কোন গোষ্ঠীর অন্তর্গত একজনের মধ্যে কোন একটি প্রক্ষোভ দেখা দিলে সেই প্রক্ষোভ গোষ্ঠীর অপরাপর সদস্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে পড়ে। স্পষ্টত, সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমানুভূতি সম্ভবই নয়।

সমানুভূতির ক্ষেত্রে যে সব সময়ই অপরের অনুভূতিটি ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে না বুঝেই ব্যক্তি অপরের কোন প্রক্ষোভের অনুকরণ করে এবং পরে সেই প্রক্ষোভটি সে নিজের মনে অনুভব করে। যেমন কাউকে কাঁদতে দেখে যদি কেউ কাঁদে বা কাউকে হাসতে দেখে যদি কেউ হাসে তখন যে সব সময়

অপরের কান্না বা হাসির প্রক্ষোভটি সে অনুকরণ করে তা নয়, বহু ক্ষেত্রেই অনেকটা যান্ত্রিক ভাবেই সে অপরের অনুকরণ করে কাঁদে বা হাসে।

ভয়ের ক্ষেত্রেও অনুভূতির এই স্বতঃপ্রণোদিত সঞ্চালন দেখা যায়। অপরকে ভীত হতে দেখলে কেন সে ভীত হল তা চিন্তা করা বা তা যুক্তি দিয়ে বোঝার সময় সে পায় না। সম্পূর্ণ যন্ত্রের মত সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়ে। এই জন্যই জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ কোন কারণে ভয়গ্রস্ত হয়ে উঠলে অন্যান্য অংশেও দেখতে দেখতে সেই ভীতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একেই আমরা প্যানিক[1] বা আতঙ্ক নাম দিয়ে থাকি। ভয়ের মত রাগ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলিও জনসমষ্টির এক অংশকে প্রভাবিত করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাকী অংশটিকেও প্রভাবিত করে ফেলে। দাঙ্গা, হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিপ্লব প্রভৃতির মূলে এই ধরনের সামগ্রিক সমানুভূতি বা প্রক্ষোভমূলক সঞ্চালনই প্রধান শক্তি জুগিয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ে অনুভাবনের ভূমিকা

বিদ্যালয়ে সার্থক সমাজজীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমানুভূতি জাগিয়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ও ঐক্য সৃষ্টি করার একটি বড় উপকরণ হল তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সমানুভূতি সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে এই বিশেষ অনুভূতিটির সঞ্চালন যত ব্যাপক ও গভীর হবে বিদ্যালয় সমাজও তত সুদৃঢ় এবং সুসংহত হবে। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শাস্তিদান, ভীতি-প্রদর্শন, উৎপীড়ন প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয় সে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যেই একটা ভীতি ও নিরাপত্তার অভাববোধ সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে আন্তরিকতা, প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যময় ও তৃপ্তিকর পরিবেশ গড়ে ওঠে।

বস্তুত সমানুভূতি বিদ্যালয় সমাজের সুষ্ঠু কার্যনির্বাহের বিশেষ সহায়ক। বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই স্বাভাবিক প্রবণতাটিকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত করে বিদ্যালয় সমাজকে উন্নত ও কার্যকর করে তুলতে পারেন।

কেবল বিদ্যালয় সমাজেরই নয়, সমানুভূতি আমাদের সমস্ত সামাজিক সংগঠনেরই প্রাণস্বরূপ। মানুষে মানুষে অনুভূতির এই একতাবোধই আমাদের সমাজজীবনকে এক গ্রন্থিতে বেঁধে রেখেছে এবং একজনকে অপরের জন্য স্বার্থত্যাগে ও দুঃখবরণে অনুপ্রাণিত করে থাকে।

1. Panic

অনুশীলনী

১। অনুকরণ কাকে বলে? মানবজীবনে অনুকরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। কয় ধরনের অনুকরণ দেখা যায়? শিশুর জীবনে এর ভূমিকা বর্ণনা কর। শিশুকে অনুকরণে উৎসাহিত করা উচিত কিনা বল।

৩। "অনুকরণ ও উদ্ভাবন, এই দুটি প্রক্রিয়ার উপর ভর দিয়েই মানবজাতি ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে" (উইলিয়াম জেমস্)—এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অনুকরণের গুরুত্ব ও শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্ক বর্ণনা কর।

৪। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণ অপরিহার্য কিন্তু শুধুমাত্র অনুকরণই শিক্ষা নয়। —আলোচনা কর।

৫। অনুভাবনের সঙ্গে অনুকরণের সম্পর্কটি বল। এই পরিপ্রেক্ষিতে "শিক্ষা সম্ভব কারণ শিশুরা অনুভাবনীয়" এই উক্তিটি আলোচনা কর।

৬। শিশুর জীবনে সমানুভূতি এবং অনুভাবনের প্রভাব বর্ণনা কর।

৭। টীকা লেখ :— (ক) সমানুভূতি (খ) সমাচরণ (গ) অনুকরণ ও শিশুর আচরণ (ঘ) অচেতন ও অনুকরণ (ঙ) সমানুভূতি ও আতঙ্ক।

তেতাল্লিশ

আচরণবাদ

ইতিপূর্বে শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের বর্ণনার সময় আমরা বহুবার আচরণবাদের[1] উল্লেখ করেছি। এই মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদটির সঙ্গে আমাদের একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। নীচে এই মতবাদটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

জন ব্রোডাস ওয়াটসনকে[2] আচরণবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তাঁর এই নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল দুটি মুখ্য কারণ। প্রথম সে সময় মন, সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়েই মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ ও গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখা হত। ওয়াটসন এই ধরনের অমূর্ত ও ধরা ছোঁয়ার বহির্ভূত বস্তু নিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিবাদ রূপেই তাঁর আচরণবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁর নিজের ভাষায়, আচরণবাদীর বিচারে মনোবিজ্ঞান হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষণমূলক শাখা-বিশেষ। এর তত্ত্বগত লক্ষ্য হবে আচরণের নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যৎ গণনা। এর মুখ্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্তঃনিরীক্ষণের কোন স্থান থাকবে না। এখন এমন একটা সময় এসেছে যখন মনোবিজ্ঞান সচেতনতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে।

ওয়াটসনের দেওয়া মনোবিজ্ঞানের এই নতুন ব্যাখ্যা তৎকালীন মনোবিজ্ঞানের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও কর্মপরিধির মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

ওয়াটসন সে সময়ের মনোবিজ্ঞানীদের আর একটি মনোভাবেরও তীব্র বিরোধিতা করেন। সে সময় পশু মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা সম্বন্ধে সাধারণ মনোবিজ্ঞানীদের একটা তাচ্ছিল্যের মনোভাব ছিল এবং তাঁদের পরীক্ষণলব্ধ তথ্যাবলীকে মানবীয় মনোবিজ্ঞানে স্থান দেওয়া হত না। ওয়াটসন দেখলেন যে সে সময়ে পশুদের উপর পরীক্ষণ করে কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন এবং সেগুলির সাহায্যে মানবীয় মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা সম্ভব। অতএব ওয়াটসনের পশু মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলে গ্রহণ করা উচিত।

ওয়াটসন তাঁর আচরণবাদের প্রাথমিক উপস্থাপনা করেন তাঁর বিহেভিয়ার নামক পুস্তকে ১৯১৪ সালে। তাঁর এই নতুন মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ সে সময়ে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের সদস্যরা অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করলেন এবং অতি শীঘ্রই আচরণবাদের উপর ভিত্তি করে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষণ এক নতুন পথে এগিয়ে চলল। ওয়াটসনের আচরণবাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। যথা—

1. Behaviourism 2 John Broadus Watson

মনোবিজ্ঞান সচেতনতার বিজ্ঞান নয়, মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। এর পরিধি আর মানব আচরণের পরীক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পশুর আচরণও এর পরীক্ষণের বিষয়বস্তু হবে। তার কারণ হল পশুদের অপেক্ষাকৃত সরল আচরণগুলি পরীক্ষা করে মানব আচরণের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। পরীক্ষণের পদ্ধতিরূপে আচরণবাদ নৈর্ব্যক্তিক তথ্য ছাড়া আর কিছুর উপরই নির্ভর করবে না এবং মনোবিজ্ঞানে অন্তর্নিরীক্ষণের কোন মূল্য দেওয়া হবে না।

সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রক্ষোভ প্রভৃতি গতানুগতিক মানসিক ধারণাগুলি আচরণবাদে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হবে এবং উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া, শিখন, অভ্যাস প্রভৃতি আচরণ-ধর্মী ধারণাগুলিই কেবলমাত্র ব্যবহার করা হবে। মানসিক ধারণাগুলি পরিত্যাগ করার কারণ হল যে এগুলির ব্যাখ্যা কেবলমাত্র প্রাণীর সচেতন অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় এবং অন্তর্নিরীক্ষণের পদ্ধতি ছাড়া এগুলির পর্যবেক্ষণ করা যায় না। কিন্তু উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া, শিখন, অভ্যাস—এই আচরণভিত্তিক ধারণাগুলি কেবলমাত্র পশু ও মানব আচরণের নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ থেকেই পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালের মন ও দেহের সমান্তরাল তত্ত্বটি অর্থাৎ মন ও দেহ দুটি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা এবং দুটি সত্তাই সমান্তরাল কাজ করে যায়—এই তত্ত্বটি স্বাভাবিকভাবেই আচরণবাদে পরিত্যক্ত হল। তার কারণ আচরণবাদে 'মন'কেই সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। দেহ ও আচরণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলে বর্ণনা অবশ্য ওয়াটসনই প্রথম করেন নি। তাঁর আগে ক্যাটেল, ম্যাকডুগাল, পিলসবারি প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রাণীর আচরণ নিয়ে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চালানোই যে মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ সে কথা বলে গেছেন।

ওয়াটসনের কৃতিত্ব হল নিছক নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ থেকে লব্ধ তথ্যের দ্বারা প্রাণীর বিভিন্ন আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া। বিভিন্ন মানব আচরণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি মনের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন এবং সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রক্ষোভ প্রভৃতি প্রচলিত বিভিন্ন মানসিক সত্তার ভূমিকাকেও স্বীকার করেন নি।

ওয়াটসন আচরণের ব্যাখ্যায় মনের ভূমিকাকে স্বীকার না করলেও মনের অস্তিত্ব বা মস্তিষ্কের জটিল কার্যাবলীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না। তবে তাঁর বক্তব্য হল যে যেহেতু এগুলি পর্যবেক্ষণের আয়ত্তাধীন নয় সেহেতু এগুলিকে সাক্ষাৎভাবে আচরণের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করা যায় না। মন, সচেতনতা ইত্যাদির দ্বারা প্রসূত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ-যোগ্য বলেই কেবলমাত্র এগুলির দ্বারাই প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।

ওয়াটসন তাঁর আচরণবাদের তত্ত্বটি গঠনের ক্ষেত্রে প্রথম অনুপ্রেরণা পান রুশ মনোবিজ্ঞানী বেকটেরেভ এবং পরবর্তীকালে প্যাভলভের অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপর ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে। তিনি দেখলেন যে মন বা মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য ছাড়াই বেকটেরেভ ও প্যাভলভের অনুবর্তন ও পুনরুপস্থাপন তত্ত্বের দ্বারাই প্রাণীর শিখন প্রক্রিয়ার অতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এই সময় থর্নডাইক তাঁর উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোজন ও প্রচেষ্টা-ও ভুলের তত্ত্ব[1] দুটি প্রকাশ করেন। ওয়াটসন বিনা বিলম্বে থর্নডাইকের শিখনের এই তত্ত্ব দুটি তাঁর আচরণবাদের ব্যাখ্যার জন্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু ওয়াটসন থর্নডাইকের উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোজন এবং প্রচেষ্টা-ও-ভুলের তত্ত্ব দুটি পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেও তাঁর ফললাভের সূত্রটি বর্জন করলেন। কেননা এই সূত্রটিতে প্রাণীর তৃপ্তিকে শিখনের স্থায়ীভবন এবং অতৃপ্তিকে শিখনের শিথিলভবনের কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু তৃপ্তি বা অতৃপ্তি মানসিক অনুভূতি সেহেতু ওয়াটসন বললেন যে ফললাভের ঘটনাটিকে সাম্প্রতিকতা[2] এবং পুনরনুষ্ঠানের[3] সূত্রের দ্বারা খুব ভালভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এর অর্থ হল যে, যে আচরণটি বারবার অনুষ্ঠান করা হয় বা চাহিদা পূরণের ঠিক পূর্বেই অনুষ্ঠান করা হয় সে আচরণটি প্রাণী শিখে থাকে। থর্নডাইকের বিড়ালের পরীক্ষণে বিড়ালটি দরজা খোলার কাজটি শিখল যেহেতু ঐ কাজটি তাকে খাদ্য-প্রাপ্তি-জনিত তৃপ্তি দিয়েছে বলে নয়। সে শিখেছে যেহেতু দরজা খোলা রূপ কাজটি হল খাদ্যপ্রাপ্তির আগে তার অনুষ্ঠিত সর্বশেষ কাজ। অর্থাৎ খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঐটি তার সাম্প্রতিকতম কাজ বলেই সে ঐ কাজটি শিখল।

একদিকে থর্নডাইকের উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোজন এবং অপর দিকে বেকটেরেভ, প্যাভলভের অনুবর্তন ও পুনরুপস্থাপন—এ'দুটি তত্ত্বের সাহায্যে ওয়াটসন সব রকম মানব আচরণের ব্যাখ্যা দিতে উদ্যোগী হলেন। মনোবিজ্ঞানী মরগ্যানের[4] সহযোগিতায় তিনি ব্যাপক পরীক্ষণের সাহায্যে দেখালেন যে কিভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে নবজাত শিশুর মধ্যে নানা অভ্যাস ও প্রক্ষোভমূলক অভিব্যক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানী রেনরের[5] সহযোগিতায় তিনি দেখালেন যে নিছক অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছোট শিশুর মধ্যে নানা নতুন বস্তুতে ভয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ওয়াটসনের এই তত্ত্বটি মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে আচরণবাদের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করল। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে কেবলমাত্র সরল সঞ্চালনমূলক অভ্যাসই নয়, ব্যক্তিসত্তার অনেক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও সংলক্ষণই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে গঠিত হয়ে থাকে।

দেখা গেল যে আচরণবাদের যাত্রা একদিন সুরু হয়েছিল নিছক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানমূলক পরীক্ষণের ক্ষেত্র থেকে সচেতন মানসিক

---

1. পৃঃ ৩০৫—পৃঃ ৩০৭ 2. Recency 3. Frequency 4. Morgan 5. Raynor

প্রক্রিয়াগুলিকে বাদ দেবার দাবী নিয়ে। কিন্তু ওয়াটসন ও তাঁর অনুগামীদের ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে আচরণবাদ অতি শীঘ্রই নিজস্ব অস্তিবাচক সূত্র ও ধারণার অধিকারী হয়ে উঠল এবং একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদরূপে আত্ম-প্রকাশ করল।

ওয়াটসন রিফ্লেক্সের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখান যে মানব আচরণ কতকগুলি রিফ্লেক্সের সমষ্টিমাত্র। প্রতিটি রিফ্লেক্স হল একটি উদ্দীপকের উত্তরে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়ামাত্র। সেখানে সচেতনতা বা কোন মানসিক কাজের ভূমিকা নেই।

প্রতিক্রিয়া আবার অনুবর্তনের মাধ্যমে অন্য উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যায়। মানুষের সব আচরণেরই এই ধরনের রিফ্লেক্স ও অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

মানুষের বাহ্যিক আচরণকে এইভাবে ব্যাখ্যা দেবার পর ওয়াটসন মানসিক আচরণেরও একইভাবে ব্যাখ্যা দিলেন। যে সব আচরণকে সাধারণত মানসিক আচরণ বলে বর্ণনা করা হয় ওয়াটসনের মতে সেগুলিও শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেগুলি বাহ্যিক আচরণের মত শারীরিক সঞ্চালন থেকেই প্রসূত, যদিও বাহ্যিক আচরণের মত সেগুলি পর্যবেক্ষণ-যোগ্য নয়। অতএব যেগুলিকে আমরা মানসিক আচরণ বলে থাকি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের অন্তর্নিহিত আচরণ ছাড়া আর কিছু না।

হোল্ট[1] নামক একজন আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে শিশুর কথা বলতে শেখার ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ভূমিকাই প্রধান। কোনও শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ঐ শব্দের উত্তরে একটি অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া বিশেষ। শিশুর সামনে দুধের বোতলটি ধরলে সে হাত বাড়ায়। এখন যদি এই সঙ্গে 'বোতল' কথাটি বহুবার উচ্চারণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সত্যকারের বোতলটি তার সামনে উপস্থাপিত না করে কেবলমাত্র 'বোতল' কথাটি বললেই শিশু হাত বাড়াচ্ছে। এইভাবে দেখা যাবে যে বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে অনুবর্তিত হয়ে যায় বিশেষ বিশেষ আচরণ যেগুলি ঐ বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে স্বভাবতই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আচরণবাদীরা একে "নিষ্ক্রিয় ভাষার অভ্যাস" বলে বর্ণনা করে থাকেন। এর অর্থ হল বিশেষ শব্দের উত্তরে বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করা। আর "সক্রিয় ভাষার অভ্যাস" বলতে বোঝায় শব্দটি ব্যবহার করা।

শিশু যেমন অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় ভাষার অভ্যাস শিখে থাকে তেমনই শব্দের ব্যবহার বা 'সক্রিয় ভাষার অভ্যাস'ও শিশু অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আহরণ করে থাকে।

শিশুর বিভিন্ন চাহিদার সময় শিশু দেখে যে কোন কোন শব্দ উচ্চারণ করলে তার বিশেষ কোনও চাহিদা বয়স্করা তাড়াতাড়ি মেটান। তার ফলে ঐ বিশেষ

1. Holt

শব্দটির সঙ্গে ঐ চাহিদার বস্তুটিকে সে সংযুক্ত করে নেয়। যেমন, 'জল' বললে শিশুর মা তার কাছে জল এগিয়ে দেন। তার ফলে তার কাছে 'জল' কথাটির সঙ্গে জল বস্তুটি অনুবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ সে জল কথাটি শেখে বা জল কথাটি ব্যবহার করতে শেখে। এ ক্ষেত্রে শিশুকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের সাহায্যে সঠিক শব্দটির অর্থ শিখতে হয়। এই ভাবে ওয়াটসন প্রমাণ করলেন যে 'সক্রিয় ভাষার অভ্যাস'ও কোন সচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে ঘটে না। বস্তুত একটি ইঁদুর যেভাবে গোলক ধাঁধার পথগুলি শেখে বা একটি বেড়াল যেভাবে খাঁচা থেকে বেরোতে শেখে শিশুও ঠিক একই ভাবে কথা বলতে শেখে। অর্থাৎ কথা বলতে শেখা প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে অনুবর্তিত আচরণ বিশেষ।

শিশু এইভাবে বিভিন্ন শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে শেখে এবং পরে সেগুলিকে তার অন্যান্য আচরণের সঙ্গে সুসমন্বিত করে বাক্য ব্যবহার করতে শেখে।

কথা বলা বা বাহ্যিক ভাষা শেখার পর শিশু চিন্তা করতে বা অভ্যন্তরীণ ভাষা শেখে। ওয়াটসন চিন্তা করাকে অনুচ্চারিত কথন[1] বলে বর্ণনা করেছেন। খুব ছোট শিশুকে দেখা যায় সে খেলতে খেলতে একা একা কথা বলে যায়। কিন্তু মা-বাবা বা বাড়ীর অন্যান্য বয়স্কদের চাপে একটু বড় হলে সে একা কথা বলা বন্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একা একা কথা তখনও বলে যায়। কিন্তু সে উচ্চারণ করে বা শব্দ করে কথা আর বলে না, সে কথা বলে মনে মনে। অর্থাৎ সে চিন্তা করে। এক কথায় ওয়াটসনের মতে চিন্তা করাটা শব্দ না করে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ শব্দ করে কথা বলার সময় যে বাক্‌যন্ত্রের ব্যবহার করে ওয়াটসনের মতে চিন্তা করার সময়েও সে ঐ একই বাক্‌যন্ত্রের ব্যবহার করে তবে অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় এবং তাঁর মতে যদি পরিমাপ করার উন্নত যন্ত্রের আবিষ্কার করা যায় তাহলে চিন্তার সময় বাক্‌যন্ত্রের ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। বস্তুত সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে আমরা যখন চিন্তা করি তখন প্রায়ই অনুচ্চারিত কথা এবং বাক্যের বহুল ব্যবহার করে থাকি।

শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে কথা বলা এবং চিন্তা করার মধ্যে একটি মাত্রই পার্থক্য আছে। সেটি হল প্রথম ক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীর[2] ব্যবহার করা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীর ব্যবহার না করা। স্বরতন্ত্রীর ব্যবহার না করার ফলে কথা বাইরে থেকে শোনা যায় না।

চিন্তা করাকে বাক্‌যন্ত্রেরই সক্রিয়তা থেকে উৎপন্ন একটি প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করার ফলে ধারণা বা ভাব প্রভৃতি যে সব বস্তু দিয়ে চিন্তা গঠিত বলে এতদিন বর্ণনা করা হয়ে এসেছে সেগুলির কোন ভূমিকা আর থাকে না। চিন্তা করা নিছক কথা বলারই একটি অভ্যন্তরীণ রূপমাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

---

1. Sub-Vocal talking 2. Vocal Cord

ইতিপূর্বে বলেছি যে ওয়াটসনের মতে মানুষের সব আচরণকেই কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার এককে বিশ্লেষণ করা যায়। চিন্তনের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা আমরা উপরেই উল্লেখ করেছি। প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের ক্ষেত্রেও ওয়াটসন অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাস দুইই এই রকম উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার শৃংখলে গঠিত আচরণ বিশেষ। তবে প্রথম ক্ষেত্রে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার এককগুলি সহজাত অর্থাৎ জন্ম থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর অভ্যাসের ক্ষেত্রে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার এককগুলি অর্জিত।

যেহেতু আচরণবাদীরা আচরণের ব্যাখ্যায় সচেতনতার ভূমিকাকে স্বীকার করেন না সেহেতু সংবেদন, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলিকে তাঁরা শারীরিক আচরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁদের মতবাদ অনুযায়ী মানুষের সব আচরণকেই বিভিন্ন শারীরিক সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে।

মনোবিজ্ঞানীরা চিরকালই কতকগুলি আচরণকে 'কেন্দ্রীয়'[1] বা গুরুমস্তিষ্কজাত[2] আচরণ বলে বর্ণনা করে এসেছেন। কিন্তু ওয়াটসন কেন্দ্রীয় আচরণ বলে কোন আচরণের অস্তিত্বকে স্বীকার করলেন না। তিনি মস্তিষ্ককে একটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের কি-বোর্ডের[3] সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে যখন কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তখন সংবেদক[4] স্নায়ুর মাধ্যমে যে উত্তেজনা প্রবাহিত হয় সেটিকে প্রচেষ্টক[5] স্নায়ুতে পাঠিয়ে দেওয়াই হল মস্তিষ্কের একমাত্র কাজ এবং তার ফলেই বিশেষ একটি কর্মেন্দ্রিয় বিশেষ কোন একটি আচরণ সম্পন্ন করে। অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্ক এমন কোন উন্নত কাজ করে না যাকে শারীরিক প্রকৃতির বলা যায় না। এক কথায় ওয়াটসনের মতে সব আচরণই সংবেদক-প্রচেষ্টক[6] প্রকৃতির। নিছক মস্তিষ্কজাত বা কেন্দ্রীয় আচরণ বলে কিছু নেই।

সংবেদন[7] ও প্রত্যক্ষণ[8] এদুটি ঘটনাও এতদিন কেন্দ্রীয় ঘটনা বলে পরিচিত। কিন্তুওয়াটসন এগুলিকে এক ধরনের সংবেদক-প্রচেষ্টকমূলক আচরণরূপেই অভিহিত করলেন।

স্মৃতিমূলক প্রতিরূপকেও এক ধরনের কেন্দ্রীয় ঘটনা বলে মনোবিজ্ঞানীরা চিরকাল বর্ণনা করে এসেছেন। ওয়াটসন প্রতিরূপকেও সংবেদক-প্রচেষ্টকধর্মী প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন যে চাক্ষুষ প্রতিরূপ কোন মানসিক ঘটনা নয়, এটি আংশিক চোখ থেকে জাত অনুবেদন, আংশিক চোখের পেশী থেকে জাত সঞ্চালনমূলক উত্তেজনা[9] এবং আংশিক বাক্‌যন্ত্রের অন্তর্নিহিত সক্রিয়তা। এই-ভাবে ওয়াটসন অন্যান্য প্রতিরূপেরও ব্যাখ্যা দিলেন।

প্রক্ষোভ ও অনুভূতিকে মনোবিজ্ঞানীরা চিরকাল বিশুদ্ধ কেন্দ্রীয় ঘটনা বলে

1. Central 2. Cerebral 3. Key-board 4. Sensory 5. Motor
6. Sensory-Motor 7. Sensation 8. Perception 9. Kinaesthetic Impulse

গণ্য করে এসেছেন। তাঁদের মতে এগুলি কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৃষ্ট হয় না এবং এগুলির কোনও সুনির্দিষ্ট শারীরিক অভিব্যক্তিও নেই।

কিন্তু ওয়াটসন এগুলিকেও পরিষ্কার সংবেদক-প্রচেষ্টকমূলক ঘটনা বলে বর্ণনা করলেন। তাঁর মতে আনন্দ, দুঃখ, রাগ প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি এক ধরনের 'অভ্যন্তরীণ আচরণ' বিশেষ এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন গ্রন্থির সক্রিয়তা থেকে এই আচরণগুলি জন্ম নেয়। তাঁর প্রমাণস্বরূপ সব রকম প্রক্ষোভ ও অনুভূতির ক্ষেত্রেই দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতির মধ্যে নানা রকম সক্রিয়তা দেখা যায়, যেমন হৃদস্পন্দনের পরিবর্তন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুতীভবন, চোখমুখ লাল হওয়া প্রভৃতি শারীরিক আচরণগুলি ঘটে থাকে। ওয়াটসনের মতে প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভ হল, তিনটি যথা, রাগ, আনন্দ ও ভয়। পরে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে এই তিনটি প্রক্ষোভ বহুমুখী ও বহু বিভিন্ন প্রক্ষোভে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর্থার নামক একটি ছোট ছেলের উপর ওয়াটসনের প্রক্ষোভের অনুবর্তনের প্রসিদ্ধ পরীক্ষণটি তাঁর এই তত্ত্বকে সুপ্রমাণিত করেছে।[1]

ওয়াটসন কিন্তু তাঁর আচরণবাদের তত্ত্ব থেকে সচেতনতাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফল হন নি।

তিনি থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটি বাদ দিয়েছিলেন যেহেতু এই সূত্রে প্রাণীর তৃপ্তি ও অতৃপ্তির সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি প্যাভলভের পুনরুপস্থাপনের তত্ত্বটি সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। অথচ পুনরুপস্থাপনের তত্ত্বটিতে পুনরুপস্থাপনের সর্তরূপে প্রাণীর চাহিদার তৃপ্তিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়াটসন, স্মিথ, মর্গান, হোল্ট প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের আচরণবাদীদের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের যে সব আচরণবাদী আবির্ভূত হন তাঁরা ওয়াটসনের শিখন তত্ত্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। মূলত তাঁরা তাঁদের তত্ত্বে সচেতনতাকে কোন না কোন রূপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই পর্যায়ের দুইজন সাম্প্রতিক আচরণবাদী হলেন টোলম্যান ও হাল। আমরা এদুজনের শিখনের তত্ত্ব নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি।[2]

আচরণবাদের অবদান

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে যদিও আচরণবাদের যাত্রা সুরু হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, তবু পরবর্তী কালে এর নিজস্ব সুনির্দিষ্ট অস্তিবাচক তত্ত্ব ও সূত্রাবলী গড়ে ওঠে এবং শীঘ্রই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদরূপে আচরণবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

ওয়াটসনের সমস্ত মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেই মন, সচেতনতা ইত্যাদি অমূর্ত ধারণাগুলিকে বাদ দেবার একটা প্রচণ্ড প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে

1. পৃঃ ৩২৪—পৃঃ ৩২৫ 2. পৃঃ ৩৪৫—পৃঃ ৩৫৫

তাঁর সংব্যাখ্যান অতি-সরলীকরণের দোষে দুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আচরণের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর বহু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা এখনও পর্যন্ত কারও পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বরং সেগুলি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই পূর্ণভাবে নির্ভুল না হলেও প্রত্যেকটিই নতুন আবিষ্কার ও স্বাতন্ত্র্যের দ্যুতিতে ভাস্বর।

আমরা ওয়াটসন ও তাঁর আচরণবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, আচরণবাদের পূর্বে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ব্যক্তিকতাভিত্তিক তথ্যের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। অন্তর্নিরীক্ষণ ছিল মনোবিজ্ঞানের মুখ্য পদ্ধতি। আচরণবাদই নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণকে সুনির্দিষ্ট তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। সেদিক দিয়ে মনোবিজ্ঞানকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব আচরণবাদেরই প্রধানত প্রাপ্য। আচরণবাদের আবির্ভাব না হলে হয়ত মনোবিজ্ঞান আজও দর্শনশাস্ত্রের কুক্ষিগত একটি অনির্ভরযোগ্য ও অবিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র হয়ে থাকত।

দ্বিতীয়ত, পশুর আচরণের উপর নানা রকম গবেষণা করে মানব আচরণের রহস্য ভেদ করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও আচরণবাদের অবদান যথেষ্ট। বিভিন্ন পশুর আচরণের পরীক্ষণ থেকে যে মানব আচরণ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় এ তথ্যটি আচরণবাদীরা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তৃতীয়ত, প্রাণীর সমস্ত আচরণকে সংবেদক-প্রচেষ্টক প্রকৃতির বলার ফলে বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত মন ও দেহের দ্বৈতসত্তার তত্ত্বটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হলেও এই ব্যাখ্যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে মন ও দেহ এক-যোগে প্রাণীর সমগ্র সত্তাটি সৃষ্টি করে থাকে এবং তার সকল আচরণই মন ও দেহের যৌথ সক্রিয়তার ফলে ঘটে থাকে। আচরণের এই সংব্যাখ্যানের ফলে মন ও সচেতনতা সম্বন্ধে দার্শনিকেরা যে অতিদৈহিক বর্ণনা এতদিন দিয়ে এসেছিলেন সেটি দূর হল।

এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ওয়াটসন প্রকৃতপক্ষে মন, সচেতনতা ইত্যাদির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। তিনি অস্বীকার করেছিলেন এগুলির দ্বারা মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেবার গতানুগতিক প্রথাটি গ্রহণ করতে। তাঁর মতে মন থাকতে পারে এবং মনের কাজও থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমরা মনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না সেজন্য মনকে আমরা আমাদের পরীক্ষণের বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করব না। কিন্তু মনের মধ্যে যে বস্তুটি প্রবেশ করছে এবং তা থেকে যে বস্তুটি বেরিয়ে আসছে সেগুলিকেই আমরা আমাদের পরীক্ষণের বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করব। কেননা সেগুলি পর্যবেক্ষণ-যোগ্য। এই জন্য ওয়াটসনের আচরণবাদকে কালো বাক্সর

মনোবিজ্ঞান[1] বলা হয়। কালো বাক্সটির মধ্যে কি আছে তা আমরা জানি না। কিন্তু কালো বাক্সে যা প্রবেশ করছে বা সেটি থেকে যা বেরিয়ে আসছে সেগুলিকে আমরা ভালভাবেই জানতে পারি।

চতুর্থত, উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ায় সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ এবং অতি-সরল বলে পরিগণিত হলেও এর দ্বারা প্রাণীর আচরণের একটা বাস্তবভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংব্যাখ্যানের উপযোগিতা যথেষ্ট। শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু শেখাতে হলে উদ্দীপকটিকে যে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত করা দরকার এই সত্যটি এই তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

সবশেষে আচরণবাদের প্রয়োগ বিশেষভাবে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে শিশু মনোবিজ্ঞানে। শিশুর ভাষাশিক্ষা, অভ্যাস গঠন, নতুন নতুন আচরণ শেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আচরণবাদের ব্যাখ্যা বিশেষ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজন এবং পুনরুপস্থাপনের নীতি—এ দুইই শিশুর আচরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। শিশু যত বড় হতে থাকে তার চাহিদা, প্রেরণা, উদ্দেশ্য প্রভৃতির মধ্যে তত জটিলতা দেখা দেয় এবং উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনও প্রকৃতিতে তত জটিল হয়ে আসে। এই কারণেই গুথরি, টোলম্যান, হাল প্রভৃতি ওয়াটসনের পরবর্তী আচরণবাদীরা এই উ-প্র পরম্পরার[2] মধ্যে পরিবর্তন আনেন।[3] তাঁরা উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার এই দুয়ের মধ্যবর্তী বিভিন্ন শক্তি ও ঘটনার ভূমিকাকে স্বীকার করেন এবং তাঁদের শিখনের তত্ত্বে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

অনুশীলনী

১। আচরণবাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলনে এর প্রধান অবদান কি ?

২। আচরণবাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী চিন্তন, শিখন, প্রতিরূপ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের সংব্যাখ্যানগুলি আলোচনা কর।

1. Black-Box Psychology 2. S-R Sequence 3. পৃঃ ৩৪৫—পৃঃ ৩৫৫

উন্নতবুদ্ধি শিশু ও তাদের শিক্ষা

বহু পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টন একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করে থাকে। এই নীতিটিকে আমরা স্বাভাবিক বণ্টনের সূত্র বলে থাকি। খুব সরল ভাবে বলতে গেলে এই বণ্টনের বৈশিষ্ট্য হল যে অধিকাংশ মানুষই (প্রায় ৬০%র মত) মাঝামাঝি বা গড় বুদ্ধির অধিকারী আর বাকী ৪০%র অর্ধেক অর্থাৎ ২০%র মত গড় বুদ্ধির চেয়ে কম বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় এবং বাকী ২০% গড় বুদ্ধির চেয়ে বেশী বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়। বুদ্ধির এই স্বাভাবিক বণ্টনের ঘটনাটিকে চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া যায় এবং তার ফলে যে চিত্রটি আমরা পাই তাকে স্বাভাবিক বণ্টনের রেখাচিত্র[1] বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র[2] বলা হয়।

গড়বুদ্ধি

বুদ্ধি পরিমাপ করার অতিপ্রচলিত পন্থাটি হল বুদ্ধ্যঙ্কের গণনা করা। বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে বেশীও না, আবার কম নয় বা এক কথায় গড় বুদ্ধি বলতে ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ককে বোঝায়।[3] কিন্তু পরিমাপের অপরিহার্য ত্রুটির কথা চিন্তা করে মনোবিজ্ঞানীরা গড় বুদ্ধি বলতে ৯০ থেকে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ককে ধরে থাকেন। ফলে গড় বুদ্ধির নীচে বলতে ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে এবং গড় বুদ্ধির উপরে বলতে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্কের উপরে বোঝায়।

যে সব ছেলেমেয়ের বুদ্ধি গড় বুদ্ধির নীচে অর্থাৎ ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে তারা ক্ষীণবুদ্ধি[4] শিশু এবং যাদের বুদ্ধি গড় বুদ্ধির উপরে অর্থাৎ ১১০'র উপরে তারা উন্নতবুদ্ধি[5] শিশু নামে পরিচিত।

উন্নতবুদ্ধি শিশু

অতএব মনোবিজ্ঞানের বর্ণনায় উন্নতবুদ্ধি শিশু বলতে সেই সব শিশুদের বোঝায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০'র উপরে।

এত গেল বুদ্ধ্যঙ্কের দিক দিয়ে উন্নতবুদ্ধির সংজ্ঞা। সাধারণ বিচারে আচরণ, কর্মক্ষমতা, মননশক্তি, সৃজনশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উন্নতবুদ্ধি শিশুরা সাধারণ শিশুদের চেয়ে অধিকতর উৎকর্ষ ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে। এই কারণে পৃথিবীর যে কোনও জনগোষ্ঠীতে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েরাই নূতন চিন্তাধারার সৃজক ও উন্নত মানব আচরণের সক্রিয় প্রবর্তক। তাদের উন্নত মানসিক শক্তির দ্বারা

---

1. Normal Distribution Curve 2. Normal Probability Curve 3. পৃঃ ৮১
4. Feebleminded 5. Gifted

তারা সকল ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট জনসমষ্টির পথপ্রদর্শক ও পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

উন্নতবুদ্ধিদের শ্রেণীবিভাগ

গড় বুদ্ধির উপরে বুদ্ধির অধিকারী হলে উন্নতবুদ্ধি বলা হলেও তাদের মধ্যে মানসিক শক্তির মাত্রার দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে এবং সে দিক দিয়ে তাদের আচরণ ও কৃতিত্বের উৎকর্ষের মধ্যেও প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। সেই কারণে উন্নতবুদ্ধিদের বুদ্ধ্যঙ্কের দিক দিয়ে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রচলিত একটি শ্রেণীবিভাগ হল ঃ—

শ্রেণী	বুদ্ধ্যঙ্ক
সাধারণ বুদ্ধিমান[1]	১১০—১২০
প্রতিভাবান[2]	১২০—১৪০
অতিমানব[3]	১৪০—২০০ বা তদূর্ধ্বে

এই পুস্তকে ইতিপূর্বের আলোচনায়[4] আমরা উপরের শ্রেণীবিভাগটি গ্রহণ করেছি এবং প্রদত্ত স্বাভাবিক বণ্টনের রেখাচিত্রে বুদ্ধির বণ্টনের এই শ্রেণীবিভাগটিই দেখান হয়েছে।

অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। সাম্প্রতিক কালে দেওয়া প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আনাস্তেসিয়ার শ্রেণীবিভাগটি হল নিম্নরূপ ঃ—

শ্রেণী	বুদ্ধ্যঙ্ক
উন্নত[5]	১১২—১২৪
অতি উন্নত[6]	১২৪—১৪৮
প্রতিভাবান বা প্রায়-প্রতিভাবান[7]	১৪৮—তদূর্ধ্বে

আগের শ্রেণীবিভাগের তুলনায় এই শ্রেণীবিভাগটি খুব একটা পৃথক নয়, যদিও শ্রেণীবিভাগের নামকরণে কিছুটা পার্থক্য আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটিভাবে উন্নতবুদ্ধি শিশুদের তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এই তিন শ্রেণীর উন্নতবুদ্ধিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও আচরণের স্বতন্ত্র বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

উন্নত শিশু

মোটামুটিভাবে ১১০ থেকে ১২০।১২৫ পর্যন্ত এদের বুদ্ধ্যঙ্ক হয়ে থাকে। ক্লাসে যাদের আমরা উজ্জ্বল প্রকৃতির ছেলেমেয়ে বলে থাকি, যারা প্রশ্ন করলে চটপট উত্তর দেয়, সপ্রতিভ ও আত্মবিশ্বাসী—এদের সাধারণত এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। এরা লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালই ফল করে থাকে, যদিও সবাই যে খুব কৃতিত্বের পরিচয়

1. Intelligent 2. Genius 3. Superman 4. পৃঃ ৯৮ 5. Superior 6. Very Superior 7. Genius or Near-Genius

দেয় তা নয়। তবে জীবনে খুব উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য লাভ না করলেও এদের অধিকাংশই মোটামুটিভাবে সফল ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন করতে সমর্থ হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে জনসমষ্টির মধ্যে এদের সংখ্যা শতকরা ১৪।১৫'র মত।

অতি-উন্নত শিশু

উন্নত শিশুদের উপরের স্তরে যারা পড়ে তারা অবশ্যই অতি উচ্চমানের বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০।১২৫ থেকে ১৪০।১৫০'র মধ্যে থাকে। এরা লেখাপড়া, চিন্তাশক্তি, আচরণের উৎকর্ষ সব দিক দিয়ে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক উন্নত। ক্লাসের পড়ায় আর সকলের চেয়ে এরা সব সময়েই এগিয়ে থাকে, বাইরের নানা বই পড়ে নিজেদের জ্ঞানস্পৃহা তৃপ্ত করে এবং পরীক্ষায় সব সময়েই খুব ভাল ফল করে। এদের আগ্রহের পরিধিও যথেষ্ট বিস্তৃত এবং সকল বিষয়েই এরা জ্ঞান অর্জন করে থাকে। জনসমষ্টিতে এদের সংখ্যা শতকরা ৪।৫'র বেশ হয় না।

প্রতিভাবান্ বা অতিমানব শিশু

উন্নত বুদ্ধিদের সব চেয়ে উপরের স্তরে যারা তারা সত্যকারের প্রতিভাবানের পর্যায়ে পড়ে। এদের মধ্যে এমন উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন পাওয়া যায় যাদের আমরা অতিমানব আখ্যা দিতে পারি। এরা সংবোধন, বিচারকরণ, মনন, সৃজনশীলতা প্রভৃতি উন্নত মানসিক শক্তির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় বিশেষ ভাবে ব্যতিক্রম। পৃথিবীর নূতন চিন্তা, ধারণা, তত্ত্ব প্রভৃতির সৃজক এরাই। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে নূতন অগ্রগতির পথে মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুভার এরাই বহন করে থাকে। জনসমষ্টিতে এদের সংখ্যা শতকরা ১ জন বা তারও কম হয়ে থাকে।

ইতিহাসে উন্নতবুদ্ধি

বুদ্ধির অভীক্ষা আবিষ্কৃত হবার অনেক আগে থেকেই উন্নতবুদ্ধি এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিদের পরিচয় মানুষ পেয়ে এসেছে। অসাধারণ চিন্তাশক্তি, নতুন নতুন তত্ত্ব গঠন, পড়াশোনায় অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রভৃতি দিক দিয়ে বাল্যকাল থেকেই এরা আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। শুকদেব সম্বন্ধে গল্প আছে যে তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থা থেকেই সমগ্র বেদ কেবল কানে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। কাহিনীটির অতিরঞ্জিত অংশটুকু বাদ দিলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে তিনি অতি শৈশবেই সমগ্র বেদ আয়ত্ত করে ছিলেন। শৈশবে গভীর জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন এই রকম বহু মুনি-ঋষির কাহিনীও শোনা যায়। আমাদের দেশে আধুনিক কালে বিবেকানন্দ,

আশুতোষ, জহরলাল, হরিনাথ দে প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের শৈশবকালীন কৃতিত্ব থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে তাঁরা সকলেই উন্নতবুদ্ধি ছিলেন।

পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাসেও এই রকম বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক, তর্কশাস্ত্রবিদ ও অর্থনীতিবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল তিন বৎসর বয়সে গ্রীক ভাষা পড়তে সুরু করেন, সাত বৎসর বয়সে প্লেটো পড়েন, আট বৎসর বয়সে ল্যাটিন, বীজগণিত ও জ্যামিতি আয়ত্ত করেন এবং বার বৎসর বয়সে দর্শন শাস্ত্র পড়তে সুরু করেন। তাঁর বুদ্ধ্যঙ্ক ১৯০ ছিল বলে ধরা হয়। চার্লস ডিকেন্স সাত বৎসর বয়সেই একটি উপন্যাস লেখেন এবং ঐ বয়সেই বহু দুরূহ বই পড়ে শেষ করেন। গেইটে আট বৎসর বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে জার্মান ভাষা ছাড়াও তিনি আরও পাঁচটা ভাষা শিখেছিলেন।

সাম্প্রতিক কালের বহু দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিবিদ্দের বাল্যকালে এই রকম অসাধারণ ক্রিয়াকলাপের কাহিনী শোনা যায়। আবার পরবর্তীকালে বিরাট প্রতিভাবান হয়েছেন অথচ বাল্যকালে তাঁদের মধ্যে এই ধরনের কোনও প্রতিভার সূচনা দেখা যায় নি এমন ব্যক্তিরও প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায়। আইনষ্টাইন বিদ্যালয় জীবনে এমন উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন যে তিনি যে পরবর্তী জীবনে এত বড় বৈজ্ঞানিক হবেন একথা কেউ ভাবতেও পারে নি। নিউটন ত স্কুলে রীতিমত একজন অতি সাধারণ ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন।

কিছুদিন আগে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম নামে একজন অতি-উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ছেলেটি ১২ বৎসর বয়সে কলেজের সম্পূর্ণ পাঠক্রমটি শেষ করে ফেলে। তার অসাধারণ প্রতিভার জন্য তাকে ঐ বয়সেই আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া হয়।

উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে স্যার ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের নাম সবার আগে করতে হয়। তাঁর বুদ্ধ্যঙ্ক নাকি ২০০ ছিল।

উন্নতবুদ্ধি শিশুদের লক্ষণাবলী

বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগ করে উন্নতবুদ্ধি শিশুদের চেনা যায় একথা সত্য। কিন্তু তা ছাড়াও কতকগুলি আচরণমূলক লক্ষণের উল্লেখ করা যায় যেগুলি দেখে আমরা উন্নতবুদ্ধি শিশুদের চিনতে পারি। সেগুলি হল ঃ—

উন্নতবুদ্ধির শিশুরা

১। দ্রুত ও সহজে শেখে।

২। যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রয়োগ করে থাকে।

৩। স্বচ্ছ চিন্তা করতে, ঘটনার বিচার করতে, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে এবং অর্থ উপলব্ধি করতে পারে।

৪। যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ না করে পড়া বা শোনা জিনিষ মনে রাখতে পারে।

৫। অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক বস্তু সম্বন্ধে জানে।

৬। সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং কথাবার্তায় সেগুলি নির্ভুলভাবে ব্যবহার করতে পারে।

৭। নিজের ক্লাসের চেয়ে দু তিন বৎসরের উঁচু ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক পড়ে।

৮। দুরূহ মানসিক কাজ করতে পারে।

৯। বহু প্রশ্ন করে। নানা রকম বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে।

১০। নিজের ক্লাসের চেয়ে এক দুই ক্লাস উঁচু স্তরের পড়া শেষ করে ফেলে।

১১। নিজের স্বাতন্ত্র্য দেখানোর জন্য প্রচলিত পদ্ধতি ও ধারণা বর্জন করে নতুন পদ্ধতি ও ধারণা গ্রহণ করে।

১২। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে পরিস্থিতি অনুযায়ী সব সময়ে প্রস্তুত থাকে এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।

উপরের বর্ণনা থেকে আমরা সংক্ষেপে উন্নতবুদ্ধি শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করতে পারি। যথা—

উন্নতবুদ্ধি শিশুদের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। দ্রুত শিখনক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন

২। উন্নত সাধারণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক বুদ্ধি

৩। চিন্তন, বিচারকরণ, সম্পর্ক নির্ণয়ন, সৃজন প্রভৃতি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা

৪। উন্নত স্মৃতি শক্তি

৫। সমৃদ্ধ শব্দমালা

৬। ব্যাপক কৌতূহল ও বহুমুখী আগ্রহ

৭। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও নিজস্বতা

৮। উন্নত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ব্যাপক জ্ঞান ও উদ্ভাবনক্ষমতা

উন্নতবুদ্ধি শিশু চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি

সাধারণ শিশুদের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উন্নতবুদ্ধি শিশুদের খুঁজে বার করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যথা—

১। ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগ

বিনে স্কেল, ওয়েকস্‌লার বেলিভিউ প্রভৃতি ব্যক্তিগত অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিশুর বুদ্ধি নির্ণয় করতে হয়।

২। যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগ

সাধারণত ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ সর্বত্র সম্ভব নয়। তাছাড়া এ পদ্ধতি যথেষ্ট ব্যয়বহুল। একটি বিদ্যালয়ে যদি ৫০০ ছাত্র থাকে সেখানে ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা সব সময় প্রয়োগ করা সম্ভবই নয়। সেজন্য যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এতে মোটামুটি ভাবে কাজ হলেও প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ, পঠনের অনগ্রসরতা প্রভৃতি কারণের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ কার্যকর হয় না।

৩। বিভিন্ন বিদ্যালয় বিষয়ের অর্জিতজ্ঞানের অভীক্ষার প্রয়োগ

এটিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর। কিন্তু যে সব উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ে কোনও পারিবেশিক কারণে লেখাপড়ায় অনগ্রসর তাদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ফল নির্ভরযোগ্য হবে না।

৪। শিক্ষক পরিমাপ পদ্ধতির প্রয়োগ

বুদ্ধির অভীক্ষার পরিপূরক রূপে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উন্নতবুদ্ধিদের বিভিন্ন সমস্যা ও চাহিদা

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির বিশেষ অনুগৃহীত, পিতামাতার গৌরবের বস্তু এবং সমগ্র সমাজ ও দেশের কাছে একটি বিরাট মূল্যবান সম্পদ বিশেষ।

কিন্তু এদের যদি যথাযথভাবে শিক্ষাদানের আয়োজন না করা যায় তাহলে এরা যে কেবল তাদের প্রকৃতিদত্ত বিশেষ শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করতেই অসমর্থ হয় তাই নয়, তারা অনেক সময় বিপথগামী হয়ে নিজেদের ও সমাজের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ হল যে উন্নত মানসিক শক্তির জন্য তাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ধরনের চাহিদা দেখা দেয় এবং যদি সেই চাহিদাগুলি যথাযথভাবে পূর্ণ না হয় তাহলে তা থেকে তাদের মধ্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক লিউই টার্মানের পর্যবেক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টার্মান ১৫২৮ জন সুনির্বাচিত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের প্রায় ৩০ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করেন। এছাড়াও বার্বে[1], মিলার[2], কার্সটেটার[3], গ্যালাঘার[4], গিলফোর্ড[5] প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণও উল্লেখযোগ্য।

এঁদের পাওয়া বিভিন্ন তথ্যাবলী থেকে আমরা উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের চাহিদা ও সমস্যাগুলির একটি বিবরণী দিতে পারি। যথা—

1. Barbe 2. Miller 3. Kerstetar 4. Gallaghar 5. Guilford

১। বহুমুখী কৌতূহল ও আগ্রহের তৃপ্তির সুযোগের অভাব

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কৌতূহলের মাত্রা সব সময়েই বেশী হয়ে থাকে। তাদের সব বিষয়ে জানবার আগ্রহ দেখা যায় এবং তাদের জিজ্ঞাসার অন্ত থাকে না। সাধারণ ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের চেয়ে তাদের প্রশ্নগুলি অনেক বেশী অর্থপূর্ণ হয় এবং তাদের সব প্রশ্নের পেছনে সত্যকারের জানার ইচ্ছাটাই প্রবল থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে এই সব ছেলেমেয়েদের কৌতূহল মেটাবার সুযোগ ও প্রচেষ্টা দুয়েরই অভাব থাকে। সাধারণত খুব কম পিতামাতাই আন্তরিকভাবে শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তার ফলে এই সব শিশুদের কৌতূহল অতৃপ্তই থেকে যায়। উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন এমনই উন্নত স্তরের হয়ে থাকে যে সে সব প্রশ্নের উত্তর সাধারণ পিতামাতার পক্ষে অধিকাংশ সময়েই দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। বলা বাহুল্য জানার এই আগ্রহ যদি তৃপ্ত না হয় তাহলে এক দিকে যেমন তাদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটে না, তেমনই তাদের মধ্যে মানসিক অতৃপ্তি দেখা দেয় এবং তা থেকে নানারকম প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়।

২। শিক্ষার নিম্ন ও অনুপযোগী মান

সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের যে আয়োজন থাকে তার পদ্ধতি ও মান দুইই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্যই পরিকল্পিত। তার ফলে যে সব ছেলেমেয়ে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন তারা এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে তাদের উপযোগী শিক্ষা লাভ করতে পারে না। ক্লাসে যা পড়ান হয় তা তাদের পূর্বজ্ঞাত বা তাদের উন্নত বোধশক্তির তুলনায় অতি সহজ। ফলে বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষার্জনের চাহিদা অতৃপ্তই থেকে যায়। ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে যে সব ছেলেমেয়ে ক্লাসে গোলমাল করে, শৃঙ্খলাভঙ্গ করে বা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে তাদের মধ্যে একটা বড় অংশই হল উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ে। বস্তুত, বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষামূলক চাহিদা তৃপ্ত না হওয়ার ফলেই তারা এই ধরনের অপরাধপ্রবণ কাজকর্মের আশ্রয় নেয়।

৩। প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক চাহিদা সাধারণ বিদ্যালয়ে তৃপ্ত না হওয়ার ফলে প্রায়ই তাদের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা বিপথগামী হয়ে ওঠে। সাধারণত শিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এই ধরনের আচরণের প্রকৃত কারণ ধরতে পারেন না এবং তাদের অমনোযোগী, অপরাধপ্রবণ, শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ইত্যাদি বলে অভিযুক্ত করেন। এতে ফল আরও খারাপ হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের পরিত্যক্ত বা তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে বলে মনে

করে এবং নিজেদের অবাঞ্ছিত আচরণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সত্য সত্যই গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এমন অনেক ক্ষেত্র দেখা গেছে যেখানে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা তাদের ব্যর্থতা-বোধের জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অবাঞ্ছিত সংসর্গে যোগ দিয়েছে এবং চুরি, জালিয়াতির মত অপরাধ করছে বা অনেক সময় মদ, হিরোয়িন, কোকেন জাতীয় অতি ক্ষতিকর নেশার আশ্রয় নিয়েছে।

৪। মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি

যৌবনাগমে সব ছেলেমেয়েরই মৌলিক চাহিদা হল আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা। সকলেই তাদের নিজস্ব প্রকৃতিদত্ত সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী নিজেদের আর সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেই প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই নিজেদের প্রক্ষোভমূলক তৃপ্তি লাভ করে।

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা এই ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। গতানুগতিক বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত শিক্ষা পরিবেশে তাদের উন্নত মানসিক সামর্থ্য পূর্ণ-ভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে না। ফলে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ছেলেমেয়েরা যে স্তরের সাফল্যলাভ করে তারা তাও লাভে সমর্থ হয় না। বিশেষ করে বয়স্কদের ভুল বোঝা এবং ভ্রান্তিকর আচরণের ফলে তাদের প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং তাদের সমস্যা তীব্রতর হয়ে ওঠে। চরমক্ষেত্রে কোন কোন উন্নতবুদ্ধি শিশু পরবর্তী জীবনে সত্যকারের একজন অপরাধী হয়ে ওঠে।

৫। বহুমুখী আগ্রহের তৃপ্তির অভাব

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ ব্যাপক ও বহুমুখী হয়ে থাকে। নানা রকমের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহ থেকে সুরু করে নতুন নতুন কাজে ও বিষয়ে তাদের আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ সামাজিক পরিবেশে তাদের এই ব্যাপক ও বহুমুখী আগ্রহ তৃপ্ত হবার বিশেষ কোনও সুযোগ থাকে না। ফলে যেমন তাদের মনের প্রসার ও জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ব্যাহত হয় তেমনই তাদের মধ্যে গুরুতর মানসিক অতৃপ্তিও দেখা যায়।

৬। সৃজনশীলতার অভিব্যক্তির ব্যাহতি

অধিকাংশ উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েই উন্নত ধরনের ও অভিনব প্রকৃতির সৃজনশীলতার প্রবণতা ও তার উপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিয়ে জন্মায়। সেই সব প্রবণতার বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন উপযোগী পরিবেশ ও যথাযথ সুযোগসুবিধা। কিন্তু

আমাদের সামাজিক পরিবেশে এই সম্ভাবনাগুলিকে রূপায়িত করার মত আয়োজন ও সুযোগসুবিধার একান্তই অভাব। ফলে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং তারা মানসিক তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

৭। বয়স্কদের ভুল বোঝা

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের আচরণ ও মনোভাবের জন্য পরিবেশের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের একটি গুরুতর প্রকৃতির ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পিতামাতা, শিক্ষক, প্রতিবেশীদের প্রায় সকলেই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের ভুল বোঝেন এবং তাদের আচরণের প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে পারেন না। পিতামাতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অবাধ্য, দুর্বিনীত, দায়িত্বজ্ঞানহীন ইত্যাদি বলে মনে করেন এবং তাদের সঙ্গে সেই রকম আচরণ করেন। প্রতিবেশী এবং পরিবেশের অন্যান্য ব্যক্তিরাও প্রায়ই এই সব ছেলেমেয়েদের বিপথগামী বলে ধরে নেন এবং তাদের সঙ্গে এমনই আচরণ করেন যে যার ফলে তাদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

উন্নতবুদ্ধি শিশুদের সমস্যার সমাধান

উন্নতবুদ্ধি শিশুদের মানসিক সমস্যার সমাধান এবং তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য বিশেষ আচরণমূলক ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। সেগুলির মধ্যে মুখ্য কয়েকটি ব্যবস্থার উল্লেখ করা হল।

১। বুদ্ধির ও প্রতিভার যথাযথ পরিমাপ

প্রথমেই যে সব শিশুর আচরণের পর্যবেক্ষণ থেকে তাদের উন্নতবুদ্ধি মনে হবে তাদের বুদ্ধির ও প্রতিভার যথাযথ পরিমাপ প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির উৎকর্ষের দিক দিয়ে প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে এবং সেই কারণে তাদের সহজাত উন্নতবুদ্ধি ও প্রতিভার মাত্রা অনুযায়ী তাদের শিক্ষাসূচীও বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হবে। অতএব সর্বাগ্রে প্রতিটি উন্নতবুদ্ধি শিশুরই বুদ্ধির প্রকৃত মাত্রাটি বুদ্ধি পরিমাপের আধুনিক অভীক্ষার সাহায্যে জানতে হবে।

২। আচরণের যথাযথ ব্যাখ্যা ও সমস্যার অনুসন্ধান

নানা কারণে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের প্রক্ষোভমূলক ও শিক্ষামূলক চাহিদা তৃপ্ত হয় না এবং তাদের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। স্বভাবতই তার ফলে তাদের মধ্যে নানা রকম আচরণবৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে এসব ক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক, প্রতিবেশী প্রভৃতি বয়স্করা তাদের আচরণের প্রকৃত কারণ ধরতে পারেন না এবং তাদের আচরণবৈষম্যের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করেন।

তার ফলে তাদের সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এ সব ক্ষেত্রে তাদের এই আচরণ-বৈষম্যের গতানুগতিক পন্থায় ব্যাখ্যা না করে তাদের প্রকৃত কারণগুলি খুঁজে বার করতে হবে এবং অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে তাদের কোন্ বিশেষ চাহিদাটি তৃপ্ত না হবার ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণের সৃষ্টি হয়েছে।

৩। ব্যাহত চাহিদার তৃপ্তিসাধন

যে সব চাহিদার ব্যাহতি থেকে উন্নতবুদ্ধি শিশুদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলির সার্থক তৃপ্তির আয়োজন করা বিশেষ প্রয়োজন। একথা স্বীকার্য যে পিতামাতা ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঙ্কুচিত পরিবেশের জন্য উন্নতবুদ্ধি শিশুদের সমস্ত চাহিদার সুষ্ঠু তৃপ্তিদান সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটিও সত্য যে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন গ্রহণ করলে তাদের বহু চাহিদাই পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে মেটানো সম্ভব এবং তার ফলে অনেক উন্নতবুদ্ধি শিশুর ভবিষ্যৎ অবাঞ্ছিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি উন্নতবুদ্ধি শিশু ক্লাসের পড়া তার কাছে আগে থেকেই জানা বলে প্রায়ই ক্লাস থেকে পালায়। শিক্ষকের বকাবকির ফলে তার এই অবাঞ্ছিত আচরণ বন্ধ হয় না এবং শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধের জন্য হয়ত তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় এবং তার চরম ফল রূপে শিশুটির শিক্ষাগত জীবনটিই নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যদি পিতামাতা বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন ছেলেটি ক্লাস থেকে পালাচ্ছে সেটি অনুসন্ধান করে তার আচরণবৈষম্যের প্রকৃত কারণটি নির্ণয় করতেন এবং তার সেই অতৃপ্ত চাহিদাটির তৃপ্তি করার কোন ব্যবস্থা নিতেন তাহলে শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবনের এই রকম দুঃখজনক পরিণতি ঘটত না।

উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষামূলক চাহিদার তৃপ্তি

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে বড় সমস্যাটি তাদের শিক্ষামূলক চাহিদার অতৃপ্তি থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার যে মান ও পদ্ধতি অনুসৃত হয় তার দ্বারা উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের প্রকৃত প্রয়োজন মেটে না। তার ফলে এক দিক দিয়ে যেমন তাদের শিক্ষাগত চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তেমনই তা থেকে জাত ব্যর্থতাবোধ থেকে তাদের মধ্যে নানা গুরুতর প্রকৃতির প্রক্ষোভমূলক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উন্নতবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষামূলক চাহিদাটির তৃপ্তি সাধনের জন্য আধুনিক শিক্ষা-তাত্ত্বিক ও মনোবিজ্ঞানীরা কয়েকটি পন্থার উল্লেখ করেছেন। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। যথা :—

ক। শিক্ষার দ্রুতীকরণ

শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটিকে সাধারণ শিশুদের তুলনায় অধিকতর দ্রুত করে তোলা উন্নতবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাগত সমস্যার সমাধানের একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা। এই দ্রুতীকরণ[1] প্রক্রিয়াটি নানাভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। যথা—(১) অল্প বয়সে শিক্ষা সুরু করা, (২) একটি শ্রেণী বাদ দিয়ে উন্নীত করা, (৩) সংক্ষিপ্ত শ্রেণীব্যবস্থার পরিকল্পনা করা, (৪) স্কুলে বা কলেজে অল্প বয়সে যোগদান করা।

এই সব কটি পন্থারই মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠগ্রহণের যে সময় নির্ধারিত করা হয়ে থাকে তার চেয়ে স্বল্পতর সময়ে এই সব ছেলেমেয়েদের পাঠ শেষ করার ব্যবস্থা করা।

(১) অল্প বয়সে শিক্ষা সুরু করা: সাধারণত সব দেশেই শিশুদের স্কুলের পাঠ সুরু করার একটা বয়স নির্ধারিত থাকে। যেমন ৪।৫ বৎসর বয়সে কিণ্ডারগার্টেনে এবং ছ'বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের প্রথা অধিকাংশ দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের এই বয়সের আগে যদি স্কুলে ভর্তি করা যায় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ফল ভালই পাওয়া যায়। বহুক্ষেত্রেই তারা তাদের অধিকতর বয়স্ক সহপাঠীদের চেয়ে উন্নত মানেরই ফল দেখিয়ে থাকে।

(২) একটি শ্রেণী বাদ দিয়ে উন্নয়ন: উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে একটি শ্রেণী বাদ দিয়ে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নয়নের প্রথাও অনেক ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে থাকে। টার্মানের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই ধরনের শ্রেণী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষামূলক ফল বেশ সন্তোষজনক হয়েছে।

(৩) সংক্ষিপ্ত শ্রেণীব্যবস্থার পরিকল্পনা: অনেকে একটি শ্রেণী সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে শ্রেণী উন্নয়নের প্রথাকে সমর্থন করেন না। তার পরিবর্তে তাঁরা সংক্ষিপ্ত শ্রেণী-বর্ষের পরিকল্পনাটি অনুসরণের নির্দেশ দেন। এই পন্থায় বিশেষ একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ পাঠক্রমটিই পড়ান হয় কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময়ে। উদাহরণস্বরূপ, স্কুলের একটি বর্ষের নির্দিষ্ট পাঠক্রমটি উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা পুরোটাই পড়ে, কিন্তু পড়ে হয়ত এক বৎসর জায়গায় ছ'মাসে। শ্রেণীবিভাগবর্জিত প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমের পরিকল্পনাটি এই পন্থার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রেণীবিভাগ না থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এক বৎসরেই দুই বা তিন শ্রেণীর পাঠক্রম শেষ করে ফেলতে পারে।

(৪) স্বল্পবয়সে কলেজে যোগদান করা: অল্পবয়সে স্কুলে যোগ দেওয়ার ফলে বা একটি শ্রেণী বাদ দিয়ে শ্রেণী-উন্নয়নের ফলে যে সব ছেলেমেয়ে নির্ধারিত বয়সের আগে স্কুলের পড়া শেষ করে তারা স্বাভাবিকভাবেই নির্ধারিত বয়সের আগে কলেজেও

1. Acceleration

যোগ দেয় এবং সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় অল্পবয়সে কলেজের পড়া শেষ করতে পারে। টারম্যান, ওডেন প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই সব ছেলেমেয়েরা কলেজের পড়াও বেশ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারে। নির্ধারিত বয়সের আগে কলেজে প্রবেশ করার পন্থাটি উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান সে বিষয়ে অনেকেই একমত।

খ। পাঠক্রমের সমৃদ্ধীকরণ

উন্নতবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাপ্রক্রিয়ার দ্রুতীকরণের পরিবর্তে অনেকে যে পন্থাটির উল্লেখ করেন সেটিকে আমরা সমৃদ্ধীকরণ নাম দিতে পারি। এই পন্থাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের উন্নত মানসিক সামর্থ্যের উপযোগী করে পাঠক্রমটিকে সমৃদ্ধ[1] করে তোলা। এই পন্থায় বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রমটি প্রচলিত থাকে সেটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে সেটির সঙ্গে উন্নত প্রকৃতির উপাদান সংযুক্ত করে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক চাহিদা তৃপ্ত করা হয়।

সমৃদ্ধীকরণ প্রক্রিয়াটিকে নানা বিভিন্ন পন্থায় বাস্তবে রূপ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

প্রথমত, ক্লাসে শিক্ষক এই ধরনের ছেলেমেয়েদের পাঠক্রমের বাইরের অতিরিক্ত কাজ, পড়া ইত্যাদি দিতে পারেন এবং শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলীতে অধিকতর মাত্রায় অংশ-গ্রহণের সুযোগ দিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক ক্লাসের মধ্যেই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র দল তৈরী করতে এবং তাদের পৃথকভাবে এমন কাজ ও সমস্যার ভার দিতে পারেন যেগুলি করতে তাদের উন্নতবুদ্ধি প্রয়োগ করার দরকার পড়ে।

তৃতীয়ত, ক্লাসের পড়া ছাড়াও অতিরিক্ত কোন বিষয় যেমন, কোনও একটি বিদেশী ভাষা শিখতে দেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থত, উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য একজন স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তাঁর কাজ হবে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের চিহ্নিত করা, তাদের শিক্ষার জন্য ক্লাসের শিক্ষকদের অতিরিক্ত শিক্ষার উপাদান দিয়ে সাহায্য করা, উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের বহিঃপাঠক্রমিক কার্যাবলী ও অতিরিক্ত কাজ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া এবং তাদের বিশেষ আগ্রহের প্রকৃতি অনুধাবন করে তাদের জন্য বিশেষ ক্লাস, বিতর্কসভা প্রভৃতির আয়োজন করা।

পঞ্চমত, উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার মান যাতে উন্নত হয় এবং তারা যাতে স্বাধীনভাবে ও সৃজনশীল কাজকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ হয় সে দিকে শিক্ষকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

---

1. Enrichment of Curriculum

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সমৃদ্ধীকরণ প্রক্রিয়াটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষার পাঠক্রমটিকে অতিরিক্ত ও উন্নতপ্রকৃতির উপকরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলা, যার দ্বারা উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা তাদের উন্নতমানের বুদ্ধি ও মানসিক সামর্থ্যের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করতে পারে।

গ। বিশেষ ক্লাস ও স্কুলের আয়োজন

পাঠক্রমটিকে সমৃদ্ধিকরণেরই একটি অতি প্রচলিত পন্থা হল সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যেই উন্নতবুদ্ধিদের জন্য স্বতন্ত্র দল তৈরী করা বা তাদের জন্য বিশেষ ক্লাসের আয়োজন করা। এই স্বতন্ত্র দল বা ক্লাস নানা পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ক্লাসের মধ্যেই উন্নতবুদ্ধিদের স্বতন্ত্র একটি দলরূপে সংগঠিত করে তাদের অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও উন্নতবুদ্ধিদের জন্য স্বতন্ত্র সেকসান বা উপশ্রেণী তৈরী করা হয়ে থাকে। যেমন মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতবুদ্ধিদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি উপশ্রেণী গঠন করা যেতে পারে। আবার কখনও উন্নতবুদ্ধিদের জন্য সাধারণ পাঠক্রমের সঙ্গে উন্নত পাঠক্রম পড়ানোর স্বতন্ত্র ক্লাসেরও আয়োজন করা যেতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে উন্নতবুদ্ধিদের বিশেষ ক্লাস দু'শ্রেণীর হতে পারে। প্রথমত, তাদের সাধারণ ক্লাসে রেখে স্বতন্ত্রভাবে অতিরিক্ত পাঠক্রম পড়ানো। দ্বিতীয়ত, উন্নতবুদ্ধিদের একেবারেই আলাদা করে নিয়ে পুরো পাঠক্রমের জন্য স্বতন্ত্র ক্লাস গঠন করা।

এছাড়া অনেক সময় উন্নতবুদ্ধিদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের আয়োজনও করা হয়ে থাকে। এই ধরনের বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উন্নতবুদ্ধিদেরই ভর্তি করা হয় এবং তাদের উপযোগী পাঠক্রম পড়ান হয়ে থাকে। অনেক শিক্ষাবিদই এই শ্রেণীর বিশেষ বিদ্যালয় প্রবর্তন করার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছেন। তাঁদের মতে উন্নতবুদ্ধিদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় গঠন করা যেমন অগণতান্ত্রিক তেমনই মনোবিজ্ঞানবিরোধীও বটে। প্রথমত উন্নতবুদ্ধিদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে তাদের মানসিক সংগঠনের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেবে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হবে। বিশেষ করে এই ব্যবস্থায় তাদের মধ্যে একটা আত্মশ্লাঘার মনোভাব তৈরী হবে এবং তারা নিজেদের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে উন্নতশ্রেণীর মানুষ বলে মনে করবে। তার ফলে তাদের দাম্ভিক, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে প্রচুর। তাছাড়া এইভাবে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় পুরোপুরি মনোবিজ্ঞানভিত্তিকও নয়। কেননা উন্নতবুদ্ধিদের জন্য উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠক্রমের প্রয়োজন হলেও সব পাঠ্যবিষয়ে তার

দরকার পড়ে না। বহু বিষয়ে তারা সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একযোগে পাঠগ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, উন্নতবুদ্ধিদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে পৃথক করার সুনির্দিষ্ট পন্থা সব সময় অনুসরণ করা যায় না। এটা সব সময়েই বিতর্কের বিষয় থেকে যাবে যে কোন্ পর্যায় বা স্তর থেকে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য এই বিশেষ বিদ্যালয় গঠিত হবে। সব শেষে, উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বুদ্ধির মাত্রার দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য থাকে। তার ফলে তাদের সকলের ক্ষেত্রে একই পাঠক্রম অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করলেই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সমস্যার সমাধান হবে না।

ঘ। শিক্ষাপরিকল্পনাকে উপযোগী করে তোলা

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক সমস্যাগুলি সাধারণ গতানুগতিক সংগঠনসম্পন্ন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে দেখা যায়। যে সব বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং শিক্ষার্থীদের বহিঃপাঠক্রমিক কাজের আয়োজনও কম থাকে সে সব বিদ্যালয়েই উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষাদান একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকাল যে সব বহুমুখী বা ব্যাপক প্রকৃতির বিদ্যালয় তৈরী হয়েছে সেগুলিতে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের উপযোগী বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠক্রমের আয়োজন থাকে এবং তার ফলে সেগুলিতে তাদের শিক্ষামূলক চাহিদা তৃপ্ত হওয়ার অধিকতর সুযোগ থাকে। এক কথায় শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নতবুদ্ধিদের উপযোগী শিক্ষাদানের আয়োজন করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও শিক্ষাপরিকল্পনাটিকে উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের উপযোগী করার জন্য আরও কয়েকটি পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। সেগুলি হল—

১। অধিকতর সুপরিচালনা দানের আয়োজন করা।

২। বহিঃপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন করা। যেমন, বিদ্যালয় প্রকাশন, বিজ্ঞান ক্লাব, ছবি ক্লাব, শিক্ষার্থী স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি।

৩। বিজ্ঞান, গণিত প্রতি বিষয়ে উন্নত ক্লাসের আয়োজন করা।

৪। উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত পাঠক্রম অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা।

৫। প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া।

৬। ডাকযোগে শিক্ষাদান বা অন্য কোন শিক্ষাপরিকল্পনায় যোগ দিতে দেওয়া।

অনুশীলনী

১। উন্নতবুদ্ধি শিশু বলতে কাদের বোঝায়? এদের বিশেষ সমস্যা ও চাহিদাগুলি বর্ণনা কর। সেগুলি কি ভাবে সমাধান করা যেতে পারে?

২। উন্নতবুদ্ধি শিশুদের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা কর। এদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য সমস্যাগুলি আলোচনা কর এবং সেগুলির সমাধানের পন্থার উল্লেখ কর।

৩। উন্নতবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাগত সমস্যাবলী ও সেগুলির সমাধানের উপায় বর্ণনা কর।

ক্ষীণবুদ্ধি শিশু ও তাদের শিক্ষা

মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যারা সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে পশ্চাদ্‌পদ তাদের ক্ষীণবুদ্ধি[1] ছেলেমেয়ে বলা হয়। প্রকৃতির দিক দিয়ে মানসিক শক্তিকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষ মানসিক শক্তি বা বিশেষ প্রকৃতির কার্যসম্পাদনের দক্ষতা। এই বিশেষধর্মী মানসিক শক্তিগুলি সর্বজনীন নয় এবং এগুলির কোনও নিম্নতম মানও নেই। অতএব ব্যক্তিবিশেষে এই শক্তিগুলির কোনটির অভাবকে ক্ষীণবুদ্ধিতার লক্ষণ বলে ধরা হয় না। কিন্তু সাধারণ মানসিক শক্তি বা বুদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার একটি নিম্নতম মান বা গড় বুদ্ধি ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এই গড় বুদ্ধির নীচে যাদের বুদ্ধি তাদের ক্ষীণবুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

বুদ্ধির এই স্বাভাবিকতার মানটি বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের ফলাফল থেকে নির্ধারিত করা হয়ে থাকে। সেদিক দিয়ে ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ককে[2] গড় বুদ্ধির সূচক বলে ধরা হয়ে থাকে। বুদ্ধির অভীক্ষায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০'র কম মানসিক শক্তির দিক দিয়ে তাদের ক্ষীণবুদ্ধি বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যদিও হিসাবে ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ককে গড় বুদ্ধির সূচক বলে গণ্য করা হয় তবু পরিমাপের ত্রুটির কথা ভেবে মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণত ৯০ থেকে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ককে গড় বুদ্ধির সূচক বলে ধরে থাকেন। অর্থাৎ যারা ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে তাদেরই আমরা ক্ষীণবুদ্ধি বলে গণ্য করে থাকি।

বহু পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ক্ষীণবুদ্ধিরা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের তুলনায় বাস্তবে বহুক্ষেত্রে নিম্নস্তরের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এই ক্ষীণবুদ্ধিতা আবার বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে এবং সেইজন্য ক্ষীণবুদ্ধিদের সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যও নানা মাত্রার হতে পারে।

ক্ষীণবুদ্ধিদের শ্রেণীবিভাগ

৯০ থেকে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ককে গড় মানুষের বুদ্ধির সূচক বলে ধরে নিলে ঐ সংখ্যার নীচে যারা তাদেরই আমরা ক্ষীণবুদ্ধির শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। কিন্তু এই বুদ্ধির অভাবের মাত্রাও আবার নানা প্রকারের হতে পারে। সে দিক দিয়ে ক্ষীণবুদ্ধিতার মাত্রাও কম বেশী হবে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০'র নীচে তাদের এক কথায় ক্ষীণবুদ্ধি বা মানসিক

1. Feebleminded 2. 100 I. Q.

প্রতিবন্ধী নাম দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধ্যঙ্কের দিক দিয়ে এদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

	বুদ্ধ্যঙ্ক		শ্রেণী
ক্ষীণবুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধী	100	ঃ	সাধারণ বা গড় ব্যক্তি[1]
	100'র কম—70	ঃ	স্বল্পবুদ্ধি[2] ও সীমারেখাবর্তী[3]
	70—50	ঃ	স্বল্পব্যাহতিসম্পন্ন বা মোরোন[4]
	50—35	ঃ	মধ্যমব্যাহতিসম্পন্ন বা ইমবেসাইল[5]
	35'র নীচে—	ঃ	গুরুতরব্যাহতিসম্পন্ন বা ইডিয়ট[6]

যে সব ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০'র নীচে অথচ ৭০'র উপর তারা মানসিক প্রতিবন্ধসম্পন্ন হলেও মোটামুটিভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ এবং সাধারণ সমাজে বাস করে জীবন কাটাতে পারে। এজন্য এদের বর্ডারলাইন বা সীমারেখাবর্তী ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা হয়। তবে এ যোগ্যতা অর্জনের জন্যও তাদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সত্যই জীবনযাপনের মৌলিক ও অপরিহার্য কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারে না এবং সমাজের কাছে গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাদেরই সত্যকারের মানসিক প্রতিবন্ধী[7] বলে গণ্য করা হয়।

মানসিক ব্যাহতির দিক দিয়ে এদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) স্বল্পব্যাহতিসম্পন্ন বা মোরোন (খ) মধ্যমব্যাহতিসম্পন্ন বা ইমবেসাইল এবং (গ) গুরুতরব্যাহতিসম্পন্ন বা ইডিয়ট।

স্বল্পব্যাহতিসম্পন্ন বা মোরোন

মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে স্বল্পমাত্রার ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বা মোরোনদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। এরা মানসিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে বড় জোর ৮ থেকে ১১ বৎসর বয়সের শিশুর সমতুল্য জ্ঞানমূলক স্তরে পৌঁছতে পারে। কিন্তু এরা নিজেদের জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক কাজকর্মগুলি সম্পন্ন করতে পারে এবং যথাযথ শিক্ষা পেলে প্রধানত শারীরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ও সহজপ্রকৃতির কাজকর্ম করে জীবিকা অর্জন করতে পারে।

মধ্যমব্যাহতিসম্পন্ন বা ইমবেসাইল

ইমবেসাইল বা মধ্যমব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু কিছু দৈহিক অসঙ্গতিও দেখা যায়। ৪ থেকে ৯ বৎসর বয়সের শিশুদের সমতুল্য মানসিক পরিণতির চেয়ে

1. Average 2. Dull 3. Borderline 4. Moron 5. Imbecile 6. Idiot
7. Mentally Retarded

উচ্চতর স্তরে এরা পৌঁছতে পারে না। এরা অবশ্য কথাবার্তা বলতে শেখে এবং নিজেদের চাহিদা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ কিছুই করতে পারে না। এরা সাধারণ বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারলেও কোনও জটিল পরিস্থিতিতে পড়লে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। খুব সহজ ও যান্ত্রিক প্রকৃতির কাজ কিছু কিছু এরা করতে পারে। নিজেদের প্রয়োজন এরা নিজেরা মেটাতে পারে না এবং সেদিক দিয়ে এরা একান্তভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল। এদের চিকিৎসাগারে রাখা বাঞ্ছনীয় হলেও সব সময় অপরিহার্য নয়।

গুরুতর ব্যাহতিসম্পন্ন বা ইডিয়ট

গুরুতর মানসিকব্যাহতিসম্পন্ন বা ইডিয়ট ব্যক্তিদের চিকিৎসাগারে রাখা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তাদের মনের পরিণতি একেবারে প্রাথমিক স্তরে সীমিত থাকে এবং তাদের মধ্যে তীব্রমাত্রায় ইন্দ্রিয়ঘটিত ও সঞ্চালনমূলক ব্যাহতি, দৈহিক অসঙ্গতি এবং গুরুতর মাত্রার ব্যাধিপ্রবণতা দেখা যায়। এরা নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলি তৃপ্ত করার দায়িত্বও নিতে পারে না, এমন কি সাধারণ বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পর্যন্ত পারে না। এদের মানসিক ব্যাহতি চরম মাত্রার হওয়ার জন্য এদের জড়ও বলা হয়ে থাকে। এদের কোন আবাসধর্মী প্রতিষ্ঠানে রাখা একান্ত অপরিহার্য।

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিচারে মানসিক ব্যাহতি

ব্যাহতির প্রকৃতি ও কারণের দিক দিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে মানসিক প্রতিবন্ধীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা—মোঙ্গলত্ব বা মোঙ্গলিজম্[1], ক্রেটিনত্ব বা ক্রেটিনিজম[2], ক্ষুদ্রমস্তকত্ব বা মাইক্রোসেফালি[3], বৃহৎমস্তকত্ব বা ম্যাক্রোসেফালি[4] জলমস্তকত্ব বা হাইড্রোসেফালি[5]। এই সব মানসিক ব্যাহতির লক্ষণগুলি ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। এছাড়া মস্তিষ্কের অসাড়তা[6], রোগ বা আঘাত থেকে জাত মস্তিষ্কের ক্ষতি[7] প্রভৃতি কারণেও মানসিক ব্যাহতির সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মোঙ্গলত্ব

মোঙ্গল জাতীয় লোকদের মত নাক চ্যাপ্টা, চোখ বাঁকা ও পুরু ঠোঁট থাকে বলে এই শ্রেণীর মানসিক ব্যাহতিকে মোঙ্গলিজম্ বা মোঙ্গলত্ব নাম দেওয়া হয়েছে। জন্মকালে মাতাপিতার জিনের মধ্যে বিকৃতির জন্য এই বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এরা সাধারণত মধ্যমমাত্রার মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন বা ইম্বেসাইল শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। এদের মানসিক পরিণতি পাঁচ বৎসর বয়সেই সীমাবদ্ধ থাকে।

1. Mongolism 2. Cretinism 3. Microcephaly 4. Macrocephaly
5. Hydrocephaly 6. Cerebral Palsy 7. Brain Damage

ক্রেটিনত্ব

সাধারণত থাইরয়েড গ্রন্থির ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়ার জন্য ক্রেটিনত্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে মায়ের খাদ্যে আয়োডিন[1] কম থাকলে শিশুর মধ্যে এই অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ক্রেটিনদের কতকগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন, বামনাকৃতি দেহ, পুরু চোখের পাতা, শুকনো গায়ের চামড়া, প্রচুর কালো চুল এবং বহিরুদ্গত উদরপ্রদেশ ইত্যাদি। ইডিয়ট বা ইমবেসাইল উভয় শ্রেণীর ক্ষীণবুদ্ধিই ক্রেটিনদের মধ্যে দেখা যায়। এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক স্তরে যদি থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসা করা যায় তাহলে ক্রেটিনত্ব সেরে যেতে পারে।

ক্ষুদ্রমস্তকত্ব

মাথার গঠন স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে ছোট হওয়ার ফলে যখন ক্ষীণবুদ্ধিতা দেখা দেয় তখন তাকে ক্ষুদ্রমস্তকত্ব বলা হয়। ক্ষুদ্রমস্তকত্ব ঘটার কারণ এখনও সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় নি। এরা সাধারণত হয় ইডিয়ট, নয় ইমবেসাইলের শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। এরা কোনও কোনও হাতের কাজ শিখলেও ভাষামূলক কোন দক্ষতা এদের মধ্যে জন্মায় না। ডাক্তারি চিকিৎসায় এদের ক্ষেত্রে কোনও সুফল পাওয়া যায় না।

বৃহৎমস্তকত্ব

গ্লিয়া নামক কোষের[2] অস্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকেই এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এই কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মস্তিষ্কের কাঠামোটি বেড়ে যায়। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কোনও কারণ জানা যায় নি। তবে এ ব্যাধিরও ডাক্তারি চিকিৎসায় কোন ফল হয় না।

জলমস্তকত্ব

মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিকুলার প্রণালীতে[3] বাধার সৃষ্টির ফলে মাথার খুলির মধ্যে অস্বাভাবিক পরিমাণে সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড জমে যায়। তার ফলে মস্তিষ্কের তন্তুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাথার আকৃতি স্ফীত হয়ে ওঠে। এর ফলে মানসিক ব্যাহতি দেখা দেয়।

ক্ষীণবুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা

মানসিক ব্যাহতির কোনও কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে কোন কোনও ক্ষেত্রের ডাক্তারী চিকিৎসার সাহায্যে এ ধরনের ব্যক্তিদের কার্যকারিতার আচরণের মানের কিছুটা উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে।

1. Iodin 2. Glia Cell 3. Ventricular Path

তবে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা দিয়ে তাদের অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন করার চেষ্টা বর্তমানে প্রগতিশীল সব দেশেই চলেছে এবং তার দ্বারা বিশেষ সন্তোষজনক ফলও পাওয়া গেছে।

স্বল্পবুদ্ধি ও সীমারেখাবর্তীদের শিক্ষা

বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফলের দিক দিয়ে ১০০ বুদ্ধ্যঙ্কসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঠিক নীচে যারা তাদের স্বল্পবুদ্ধি বলা হয়। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ৮০। এর নীচে আছে সীমারেখাবর্তীরা। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৭০। এই দু'শ্রেণীর ব্যক্তিদেরই যে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেগুইঁ ও ইতরাদের বিশদ পর্যবেক্ষণ থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে যদিও উচ্চশিক্ষা লাভ করা এদের সামর্থ্যের বাইরে তবুও উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পৌঁছান বা সাফল্যের সঙ্গে তা অতিক্রম করা এদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়। আজকাল আধুনিক সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই স্বল্পবুদ্ধি ও সীমারেখাবর্তী ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষধর্মী শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের একত্রে রেখে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ত্রি-ধারা পদ্ধতি[1] এই ধরনের একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে মেধাবী, সাধারণ এবং স্বল্পবুদ্ধিদের একই বিদ্যালয়ে রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রতি শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী তিনটি ধারায় বা প্রবাহে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি ধারা বা প্রবাহে স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। এর ফলে স্বল্পবুদ্ধিদের মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয়। এমন কি প্রয়োজন হলে সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনাটিকেও এদের প্রয়োজন মত পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। স্বল্পবুদ্ধিদের জন্য অনেকে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে যদি এদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে ব্যয় যেমন কম হয় তেমনই ফলও ভাল পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞরা স্বল্পবুদ্ধি বা সীমারেখাবর্তীদের ক্ষীণবুদ্ধি বলে ধরে নিলেও তাদের যথার্থ মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের পর্যায়ে ফেলেন না। সত্যকারের মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন বলতে তাদেরই বোঝায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ বা তারও কম।

1. Three-stream Method

মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার আয়োজন

বস্তুত শিক্ষার সত্যকারের সমস্যা এদেরই নিয়ে। এদের স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্নদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে রেখে শিক্ষা দেওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না। এরা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন বা ঈষৎ ব্যাহতিসম্পন্নদের চেয়ে মানসিক যোগ্যতার দিক দিয়ে এতই পেছিয়ে থাকে যে এদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

শিক্ষালাভের যোগ্যতার দিক দিয়ে বিচার করে বিশেষজ্ঞরা ক্ষীণবুদ্ধিদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন।

প্রথমত, শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ মানসিক প্রতিবন্ধীরা[1]।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ নয় কিন্তু আচরণের উন্নয়ন সম্ভবপর এবং নানারকম দক্ষতা ও কৌশল শিখতে সমর্থ এমন মানসিক প্রতিবন্ধীরা[2]।

তৃতীয়ত, যারা সকলরকম শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ[3]।

শিক্ষণযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা

এই স্তরের ক্ষীণবুদ্ধিদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ থেকে ৫০'র মধ্যে। এদের মোটামুটিভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, যদিও কোনও অমূর্তধর্মী বা উন্নত চিন্তামূলক শিক্ষা এদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে এদের সব সময় স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে পাঠানোর দরকার হয় না। সাধারণ প্রচলিত বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্লাসের মাধ্যমেই এদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সহজ প্রকৃতির ভাষা পড়া, গণনা করা প্রভৃতি মৌলিক দক্ষতাগুলি এরা আয়ত্ত করতে পারে। এদের মধ্যে যারা উন্নত শ্রেণীর তারা নানা রকম বৃত্তিও ভালভাবেই শিখতে পারে এবং প্রশংসনীয় মাত্রায় আত্ম-নির্ভরতা আহরণ করতে সমর্থ হয়।

পাঠক্রমের প্রধান উপাদান

শিক্ষণযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্লাসে সাধারণত যে সব কাজকে ভিত্তি করে পাঠক্রমটি পরিকল্পিত হয় সেগুলি হল ঃ—

১। মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগ
২। অন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্ক
৩। টাকাকড়ির হিসাব
৪। পরিমাপ করা
৫। প্রকৃতিকে বোঝা
৬। সমাজকে বোঝা
৭। জীবিকা অর্জন করা
৮। গৃহস্থালীর কাজকর্ম শেখা
৯। বেড়ানো
১০। অবসর সময় যাপন করা
১১। নিরাপদে বাস করা
১২। ব্যক্তিগত পর্যাপ্তবোধ গঠন করা
১৩। সৌন্দর্য উপভোগ ও উপলব্ধি করা

1. Educable Mentally Retarded 2. Trainable Mentally Retarded
3. Un-educable Mentally Retarded

উন্নয়নযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা[1]

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব ক্ষীণবুদ্ধি যারা সত্যকারের শিক্ষণযোগ্যের স্তরে না পড়লেও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দক্ষতা, কৌশল, বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করার সামর্থ্য রাখে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণত ৩৫ থেকে ৫০'র মধ্যে থাকে। এদের কোনও জ্ঞানমূলক বা চিন্তামূলক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে জড়বুদ্ধিদের মত এদের সব সময় প্রতিষ্ঠানভুক্ত করাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে না। এরা বাড়ীতে থেকে এবং নিয়মিত দিবাকালীন বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে কিছু কিছু শিল্পে দক্ষতা লাভ করতে পারে। তবে আবাসিক শিক্ষায়তনে এদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে ভাল।

এদের শিক্ষার কর্মসূচীর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। সেগুলি হল—

(১) ভাষার বিকাশ (২) সঞ্চালনমূলক বিকাশ (৩) মানসিক বিকাশ (৪) ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষসাধন (৫) সঙ্গীত (৬) স্বাস্থ্যবিদ্যা ও নিরাপত্তার শিক্ষা (৭) সমাজবিদ্যা (৮) স্বাবলম্বন (৯) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (১০) সামাজিকীকরণ (১১) শিল্প ও কলা (১২) নাট্যাভিনয় এবং (১৩) বৈজ্ঞানিক ধারণার সৃষ্টি।

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে জোর দেওয়া হয় ভাষার বিকাশের উপর। প্রায় ক্ষেত্রেই ক্ষীণবুদ্ধিদের ভাষার দুর্বলতা বিশেষ গুরুতর প্রকৃতির হতে দেখা যায়। বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে যাতে তাদের ভাষাকথনের উন্নতিসাধন করা যায় তার চেষ্টা করা হয়। তার পরে আসে দৈহিক সঞ্চালনের বিকাশ। গুরুতর মানসিক ব্যাহতির ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক সঞ্চালন প্রক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকে। এই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করে যাতে সে স্বাভাবিকভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করতে পারে তার জন্য তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মানসিক বিকাশের কর্মসূচীতে তার ব্যাহত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যাতে স্বাভাবিক পথে সংঘটিত হতে পারে তার জন্য সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করা হয়। চিন্তন, কল্পন, তুলনাকরণ প্রভৃতি মানসিক কাজগুলি ভিত্তি করে ছোট ছোট সমস্যা দিয়ে তাকে তার মানসিক বিকাশের ব্যাহতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা হয়। এর সঙ্গে থাকে সঙ্গীত চর্চা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তার নিয়মাবলী পালন করা, সমাজবিদ্যার অনুশীলন, স্বাবলম্বী হবার অভ্যাস, ব্যক্তিগত শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, শিল্প ও কলার চর্চা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যাবলী।

1. Education of the Trainable Mentally Retarded

জড়বুদ্ধিদের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষা[1]

যে সব শিশুর মানসিক ব্যাহতির মাত্রা অত্যন্ত গুরুতর অর্থাৎ যাদের জড় বলে আমরা অভিহিত করে থাকি এবং যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩৫'র নীচে তাদের সব রকম শিক্ষাগ্রহণের অযোগ্য[2] বলে বর্ণনা করা যায়। তাদের বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানে রেখে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তবে আজকাল ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে গুরুতর মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের অনেককেই বিশেষ প্রতিষ্ঠানে না রেখেও শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে। তবে যে সব শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক যত্ন নেওয়া বা ডাক্তারি চিকিৎসার প্রয়োজন থাকে তাদের প্রতিষ্ঠানে না রেখে উপায় নেই।

এই ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল এদের সঙ্গতিবিধানের মান যতটা সম্ভব উন্নত করে তোলা। এই জড়বুদ্ধিদের কোনও উচ্চস্তরের চিন্তাধর্মী শিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব নয় তা বলাবাহুল্য। এদের শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হল এদের সঞ্চালনমূলক ও জ্ঞানমূলক সামর্থ্যের যতটা উৎকর্ষসাধন করা সম্ভব তার চেষ্টা করা। সাধারণ জড়বুদ্ধিদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকে এবং তার জন্য শারীরিক যত্ন ও সময়মত চিকিৎসার আয়োজন করা তাদের শিক্ষাসূচীর একটি প্রধান অঙ্গ।

এই শ্রেণীর মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের এমন কোনও রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় যা লাভ করে এরা পরে সমাজে স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারবে। এরা চিরকালই পরনির্ভর হয়ে থাকে। তবে সুপরিকল্পিত শিক্ষার সাহায্যে সাধারণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এদের বেশ কিছুটা স্বাবলম্বী করে তোলা যেতে পারে।

জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে অন্তর্গত হল—

১। ভাষার বিকাশ। ২। সঞ্চালনমূলক বিকাশ। ৩। স্বাবলম্বন শিক্ষা। ৪। স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তার নিয়মকানুন শিক্ষা। ৫। মানসিক বিকাশ। ৬। শিল্প ও কলার অনুশীলন। ৭। নাট্যাভিনয়।

ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য এই সব বিশেষ ক্লাসে প্রায় অর্ধেকের মত মেয়ে থাকে। তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য কাজগুলি শেখা দরকার। ছেলেদের মধ্যে যারা অবিবাহিত থাকবে তাদেরও রান্না করা, জিনিসপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মেরামত করা, বাজার করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি শেখা দরকার। তাছাড়া ক্ষীণ-

1. Institutionalised Education of the Idiots 2. Uneducable

বুদ্ধিদের প্রত্যেকেরই নাগরিকোচিত অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে সামাজিক সংগঠন সম্পর্কেও তাদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার।

ক্ষীণবুদ্ধি ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুসঙ্গতিবিধান করতে তাদের সমর্থ করা যেমন বিশেষ প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন তাদের বৃত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব স্বনির্ভর করে তোলা। বহু মানসিক প্রতিবন্ধীর শারীরিক সামর্থ্য ও পটুতা স্বাভাবিক মানুষের মতই থাকে এবং নানা রকম হাতের কাজ তারা ভালভাবেই শিখতে পারে। যেমন, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, বেতের কাজ, কয়ারের কাজ প্রভৃতি সাধারণ ধরনের অথচ অর্থকরী বৃত্তি মানসিক প্রতিবন্ধীরা শিখতে পারে এবং সমাজে আত্মনির্ভর মানুষ রূপে জীবনযাপন করতে পারে।

বৃত্তিমূলক দক্ষতার মতই প্রয়োজনীয় হল জ্ঞানমূলক দক্ষতা। কতকগুলি জ্ঞানমূলক দক্ষতা সভ্য ও সার্থক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই সব শিশুদের কথা বলা, কথা শোনা অপরের কথা বোঝা, নিজেদের বক্তব্য অপরকে বোঝান প্রভৃতি সামাজিক যোগাযোগের পন্থাগুলি শেখান দরকার। পাঠ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়াগুলি যাতে তারা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশ থেকে যাতে তারা সুসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পটভূমিকা গঠন করতে পারে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

সমাজে সার্থক ও কার্যকর জীবন যাপন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুষ্ঠু ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের। কিন্তু সাধারণ সব সমাজেই ব্যক্তির মানসিক সামর্থ্যের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অবশ্যম্ভাবীভাবেই অপরের উপহাস ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে দিন কাটায়। সেই কারণে যাতে তারা নিজেদের বুঝতে ও মেনে নিতে, সমাজের অপরের সমর্থন পেতে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা গড়ে তুলতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়ে তাদের বিশেষভাবে সাহায্য দিতে হবে।

অনুশীলনী

১। মানসিক প্রতিবন্ধী কাদের বলে? তাদের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর।

২। বিভিন্ন শ্রেণীর মানসিক প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষাসূচীর বিবরণ দাও।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

দেহের যেমন স্বাস্থ্য আছে তেমনই মনেরও স্বাস্থ্য আছে। দেহের কোন যন্ত্রপাতি যদি ঠিকমত কাজ না করে তাহলে যেমন দেহের স্বাস্থ্য বিকল হয়, তেমনই মনেরও কোন প্রক্রিয়া যদি কোন কারণে স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন না হয় তবে মনের স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। মনের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুনের শাস্ত্রকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রকৃতি

মনের কাজকে তখনই আমরা স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাভাবিক বলব যখন বাইরের বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হয়। এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার সাফল্যের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবনধারণ, প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি, এমন কি তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ। যখন ব্যক্তি এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না তখন নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তার জীবনধারণ সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে, মানসিক শান্তি ও প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি বিপন্ন হয়, ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই শক্ত হয়ে ওঠে। এই সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অভাবেরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি[1]। যখন ব্যক্তির জীবনে এই অপসঙ্গতি দেখা দেয় তখন তার মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে ওঠে।

অতএব মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির দেহমনের সেই অবস্থা, যখন তার পক্ষে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয় এবং তার ফলে তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির সুষম বিকাশে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় না। আর মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান[2] বলতে বুঝি সেই সব নিয়মকানুন ও সর্তাদি যেগুলি অনুসরণ করলে ব্যক্তির পক্ষে এই সঙ্গতিবিধানে কোনরূপ বিঘ্ন দেখা দেয় না এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সুষমভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে যথাযথভাবে তার পরিবেশকে বুঝতে

1. Maladjustment 2. Mental Hygiene

এবং সেইমত তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করা। ব্যক্তির মনের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ ও ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করা এবং সমস্যা দেখা দিলে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মুখ্য কাজ। এই কাজের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব তৃপ্তি ও শান্তিলাভের পথই প্রশস্ত করে না, ব্যক্তি যাতে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে তারও ব্যবস্থা করে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে বাইরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখায় এবং তার আচরণকে যতটা সম্ভব কার্যকর, তৃপ্তিদায়ক, আনন্দময় ও সমাজ-অনুকূল করে তোলে। ব্যক্তি যাতে তার প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে এবং স্বল্পতম সংঘর্ষ ও বিক্ষোভ ভোগ করে নিজের এবং সমাজের চরমতম তৃপ্তি আনতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যই হল তাই। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তায় ব্যক্তি অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাকে এবং বিচারশক্তি, বিবেচনা ও প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির দিক দিয়ে নিজের মানসিক সাম্য বজায় রাখতে পারে। এক কথায়, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে সব দিক দিকে অধিকতর পূর্ণ, সুখময়, সুষম ও কার্যকর জীবনযাপনে সাহায্য করে থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মপরিধি

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মপরিধি যথেষ্ট সুপ্রসারিত। ব্যক্তির সঙ্গে তার বাইরের জগতের সম্পর্কের প্রকৃতি ও সমস্যা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ফলে ব্যক্তির জীবনের সমস্ত স্তরের বিভিন্ন দিকগুলির সঙ্গেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শৈশব থেকে সুরু করে তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য, তার বাড়ী, স্কুল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, কর্মস্থল, অবসর বিনোদনের আয়োজন এ সব পর্যবেক্ষণ করাও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এক কথায়, ব্যক্তি এবং তার সমগ্র পরিবেশেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্গত।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিক্ষা

শিক্ষার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে যদি সার্থক ও কার্যকর করে তুলতে হয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দেশগুলি যথাযথ মেনে চলা সর্বাগ্রে দরকার।

শিক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি উভয়েরই লক্ষ্য এক। উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সুষম বিকাশসাধন করা যাতে সে সমাজে কার্যকর এবং সন্তোষজনক জীবন যাপন করতে পারে। প্রাচীন শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষা বলতে নিছক জ্ঞান অর্জনকে বোঝাত এবং শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভর করত কে কতটা জ্ঞান লাভ করল তার উপর। কিন্তু আধুনিক কালে প্রকৃত শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান বা কৌশলের আয়ত্তীকরণকে বোঝায় না, জীবনধারণের সমস্যাগুলি সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে পারে এমন মনোভাবের গঠন এবং সাধারণধর্মী তত্ত্বাবলীর আহরণকে বোঝায়। তাছাড়া আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা বা স্কুলের কাজ নিছক শিশুর জ্ঞানমূলক দিকেতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার প্রক্ষোভমূলক দিকটির সুষ্ঠু বিকাশের উপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা, স্কুলে যে শিক্ষার্থী পড়তে আসে, সে তার সমগ্র সত্তা নিয়েই সেখানে আসে। তার জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে কোনভাবেই তার প্রক্ষোভ বা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে পৃথক করা যেতে পারে না। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে সেই জন্য নিছক জ্ঞান বা কৌশলের শিক্ষাদান ছাড়াও বহু বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জনেরও আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথমত, কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে বা সাধারণভাবে স্কুলকে ঘিরে শিক্ষার্থীর মনে যে সব দুশ্চিন্তা জন্মায় সেগুলি তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, কোন পাঠ্য বিষয়ে প্রথম দিকে পড়া না পারলে যদি তাকে বকাবকি করা বা শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে সেই বিষয়টি ঘিরে তার মধ্যে ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি প্রতিকূল প্রক্ষোভ দেখা দেবে। তৃতীয়ত, স্কুল থেকে শিক্ষার্থীকে যে সব কাজ বাড়ীতে করতে দেওয়া হয় সেগুলি সম্বন্ধে বাড়ীতে থাকাকালীন তার মধ্যে যে সব দুশ্চিন্তা জন্মায় সেগুলিও বিশেষ করে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের পাঠশিক্ষায় অসাফল্যের মূলে আছে এই তিনটি কারণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই তিনটি কারণ একসঙ্গে বর্তমান থাকে।

যে সব ছেলেমেয়ে স্কুলে ভাল পড়াশোনা পারে না, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে প্রবল হীনমন্যতা দেখা দেয়। তারা নিজেদের অপরের বিদ্রূপ ও অবহেলার পাত্র বলে মনে করে এবং কালক্রমে তাদের ব্যক্তিসত্তা দুর্বল ও ভীরু হয়ে গড়ে ওঠে। এই ছেলেমেয়েদের যদি পাঠ্যবিষয়গত অসামর্থ্য দূর করা যায় তবে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও বিদ্যালয়

স্কুল যেমন শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তেমনই করে তার গৃহ। গৃহ বলতে বোঝায় তার মা-বাবা-ভাই-বোন এবং অন্যান্য যাদের সঙ্গে শিশু বাস করে তাদের নিয়ে গঠিত সমগ্র পরিবেশটিকে। গৃহেও শিশুকে নানা নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং যদি কোন ক্ষেত্রে শিশুর সঙ্গতিবিধান ঠিকমত না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। শিশুর প্রতি বাড়ীর সকলের মনোভাব ও আচরণই শিশুর মানসিক সংগঠনে সব চেয়ে বড় শক্তি। অতিরিক্ত আদর, উদাসীনতা, অবহেলা, শাসনধর্মী আবহাওয়া, সুনির্দিষ্ট নীতি বা শৃংখলার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে শিশুর মানসিক সংগঠন স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে না।

তেমনই বিদ্যালয় পরিবেশের নানা বিভিন্নধর্মী ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশু কেবলমাত্র জ্ঞান কৌশলই অর্জন করে না, তার প্রক্ষোভমূলক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলিরও সমানভাবে পুষ্টিসাধন হয়। আধুনিক স্কুলের শিক্ষার পরিধি যখন এতই ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, তখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী। এমন কি শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার দায়িত্বও অনেকাংশে স্কুলের উপর পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের উপর। এদিক দিয়ে স্কুলের পরিবেশ শিশুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার শিক্ষক, সহপাঠী, ব্যক্তিগত বন্ধু প্রভৃতিদের নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি তার কাছে নিত্য নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেগুলি তার বিকাশোন্মুখ মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং কোন দিক দিয়ে যদি সেখানে সে সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। বলা বাহুল্য এই ধরনের অপসঙ্গতিসম্পন্ন[1] ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নানাদিক দিয়ে ব্যাহত হয়, তারা প্রক্ষোভমূলক অতৃপ্তিতে ভোগে এবং ভবিষ্যতে সমাজের অনুপযোগী ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। সেই জন্য স্কুলের পরিচালকবর্গ থেকে সুরু করে প্রতিটি শিক্ষকের এ দিক দিয়ে দায়িত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আচরণ বা স্কুলের সাধারণ পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটির ফলে শিশুর মধ্যে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দেয়। তার ফলেও শিশুর শিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ নানাভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্রায় সকল স্কুলেই এমন ছাত্রছাত্রী দেখা

1. Maladjusted

যায় যারা উপযুক্ত মানসিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। বকাবকি, শাস্তির ভয়, অনুরোধ, উপরোধ ইত্যাদি নানা পন্থা অবলম্বন করেও কোন ফল হয় না। অধিকাংশ স্থলেই শিক্ষকেরা এদের সংশোধনের অতীত ক্ষেত্র বলে মনে করে হাল ছেড়ে দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা বিপথগামী শিশু নয়। এরা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতার রোগী।

মনোবিজ্ঞানীদের দীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরনের বিষয়গত অসামর্থ্যের কারণ তিন রকমের হতে পারে। প্রথমত, অপরিবর্তনীয় পাঠক্রম, যা সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উপযোগী নয়। ফলে ক্লাসের কিছু ছেলেমেয়ে সব সময়েই পিছিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, বাড়ীর বয়স্কদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শিশুর মনে প্রতিফলিত হয় এবং তার মধ্যে অনুরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ভাইবোন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় শিশু নানা কারণে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এবং তার মধ্যে দেখা দেয় দুশ্চিন্তা, ভয়, হিংসা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ। পিতামাতা ও অভিভাবকেরা শিশুর এই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণটি খুঁজে পান না এবং সেগুলিকে দূর করার জন্য নানা অবান্তর উপায় অবলম্বন করেন। তার ফলে শিশুর অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং তার শিক্ষা, মানসিক ধৈর্য ও প্রক্ষোভমূলক বিকাশ নানাভাবে ব্যাহত হয়। অতএব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর তার বাড়ীর প্রভাব তার স্কুলের প্রভাবের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র শিশুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জীবনের সমস্ত স্তরেই মানসিক ধৈর্য ও সমতা অপরিহার্য এবং তা নির্ভর করে তার পরিপার্শ্বের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের উপর। এইজন্য ব্যক্তি যাতে তার পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বৃহত্তর সমাজ প্রভৃতির সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতিবিধান করতে পারে, তার জন্য আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তিনটি দিক

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তিনটি দিক আছে। যথা ১। সংরক্ষণমূলক[1] ২। প্রতিরোধমূলক[2] এবং ৩। প্রতিকারমূলক[3]।

সংরক্ষণমূলক দিক

অধিকাংশ সাধারণ শিশু যেমন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ নিয়ে জন্মায় তেমন সে একটি স্বাস্থ্যবান মন নিয়েও জন্মায়। স্বাভাবিক পরিবেশে বড় হলে এই

1. Conservative 2. Preventive 3. Curative

মন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে। কিন্তু যখনই শিশুর পরিবেশের মধ্যে অস্বাভাবিক শক্তির সৃষ্টি হয় তখনই মনের বিভিন্ন দিকগুলি সেই শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং তার ফলে শিশুর মনের মধ্যে নানা ব্যাধি দেখা দেয়। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যেক শিশুই তার পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা করতে, সমাজ-নির্দিষ্ট আচরণগুলি সম্পন্ন করতে, স্কুলে যেতে ও পড়াশোনা করতে যথেষ্ট স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে থাকে। কিন্তু নানা অস্বাভাবিক ঘটনার চাপে তার মধ্যে অসামাজিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পড়াশোনায় অমনোযোগ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। অতএব শিশুর এই সহজাত মানসিক সংগঠনটি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং প্রতিকূল পরিবেশের চাপে যাতে বিকৃত না হয়ে ওঠে সেটা দেখাই মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রথম কাজ। এর জন্য প্রয়োজন বাড়ী, স্কুল, খেলার মাঠ, এক কথায় শিশুর সমস্ত পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি যাতে প্রতিকূল না হয়ে ওঠে সেটি দেখা। বাড়ীতে শিশুর প্রতি বয়স্কদের মনোভাব ও আচরণ, স্কুল, ক্লাসের সংগঠন, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়াটাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সংরক্ষণমূলক কর্মসূচীর অন্তর্গত।

প্রতিরোধমূলক দিক

সংরক্ষণমূলক দিকটি হল সামগ্রিক প্রকৃতির। এতে ব্যক্তিগত সমস্যা বা চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না, প্রধানত সমষ্টিমূলকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিধিনিষেধগুলি পালন করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক দিকটিতে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, সমস্যা ও বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বিশেষ করে যাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি অনুধাবন করা এবং সেগুলিকে প্রতিরোধ করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হল প্রতিরোধমূলক দিকটির প্রধান কাজ। মানসিক স্বাস্থ্য সত্যকারের বিপন্ন হবার আগেই তার কারণটি খুঁজে বার করে সেটি দূর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। উদাহরণ-স্বরূপ, দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে মাঝে মাঝে স্কুল পালায়। তার এই আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে একটি স্থায়ী মানসিক ব্যাধির রূপ নেবার আগেই যদি তার এই আচরণটির কারণ খুঁজে বার করা যায় এবং সেটি দূর করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ছেলেটিকে একটি মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা হল।

প্রতিকারমূলক দিক

প্রতিরোধমূলক দিকের পরেই আসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব হলে অনেক সময় শিশুর মানসিক সংগঠনে এমন ত্রুটি দেখা যায় যা সাধারণ উপায়ে দূর করা সম্ভব হয় না। তখন তার জন্য বিশেষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হয়। শিক্ষকদের এই সময় যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হয়। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক ব্যাধির গুরুত্বের উপর নির্ভর করছে যে শিক্ষক নিজেই তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করবেন, না বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন। যদি শিক্ষার্থীর রোগ তেমন গুরুতর না হয় তাহলে শিক্ষক তাঁর নিজের বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু যদি ব্যাধি জটিল আকার ধারণ করে থাকে তাহলে শিক্ষকের নিজের পক্ষে কোন কিছু করা মোটেই সঙ্গত নয়। তখন তাঁর উচিত অবিলম্বে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া। জটিল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য উন্নত জ্ঞান ও বিশেষধর্মী পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেটা সাধারণ শিক্ষক বা পিতামাতার কাছ থেকে আশা করা যায় না। অসাবধানতা বা অজ্ঞানতা বশত যদি ভুল পন্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে শিশুর মানসিক ব্যাধিকে তীব্রতর করাই হবে এবং শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনা হবে।

অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ

মানুষমাত্রেই জন্মায় কতকগুলি চাহিদা নিয়ে। সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জৈবিক চাহিদা[1]। যেমন, অক্সিজেন, উত্তাপ, খাদ্য, জল, ঘুম প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি তৃপ্ত না হলে ব্যক্তির দেহগত অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং তার পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না।

জৈবিক চাহিদার চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সংখ্যাতেও অনেক বেশী হল মানসিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদা। এগুলির মধ্যে কতকগুলি চাহিদা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার কতকগুলি হল তার সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির বিভিন্ন নিজস্ব চাহিদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিরাপত্তার চাহিদা, কৌতূহল তৃপ্তির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মতৃপ্তির চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধান ও ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ। মানসিক চাহিদার দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে ব্যক্তির সামাজিক চাহিদাগুলি। যেমন, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, ভালবাসার চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা ইত্যাদি। ব্যক্তির সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপনের জন্য এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি অপরিহার্য।

1. Organic Needs

ব্যক্তির এই বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত হয় তবেই তার মানসিক সংগঠনের বিকাশ স্বাস্থ্যসম্মত পথে অগ্রসর হয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষম পরিণতিতে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। এক কথায় সে তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে তার কোন চাহিদার তৃপ্তি না হয় তাহলে তার মধ্যে দেখা দেয় প্রক্ষোভমূলক অতৃপ্তি এবং মানসিক দ্বন্দ্ব। সেই প্রক্ষোভমূলক অতৃপ্তি এবং মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণকে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে সে নানা অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ করে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি[1]। অতএব সাধারণভাবে বলা চলতে পারে যে অপসঙ্গতি মাত্রেরই কারণ হল ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্তি না হওয়া। অবশ্য ব্যক্তির কোন চাহিদা অতৃপ্ত থাকলেই যে সকল সময়েই অপসঙ্গতি দেখা দেবে তা নয়। এমন বহু চাহিদা আমাদের আছে যা অনেক সময়েই অতৃপ্ত থেকে যায়। অথচ সব সময়েই তার জন্য অপসঙ্গতি দেখা দেয় না বা আমরা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর আচরণ সম্পন্ন করি না।

চাহিদার বিভিন্ন পরিণতি

ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন চাহিদা দেখা দেয় তখন সেই চাহিদাটির পরিণতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে।

প্রথমত, চাহিদাটি পূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ প্রক্ষোভমূলক তৃপ্তি লাভ করে। ফলে তার মানসিক সমতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তার মধ্যে কোনরকম অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিধির দিক দিয়ে এটি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা।

দ্বিতীয়ত, চাহিদাটি একেবারেই তৃপ্ত না হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে গুরুতর প্রাক্ষোভিক অতৃপ্তি দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক সমতার মধ্যে বিপর্যয় আসতে পারে এবং সে নানা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর আচরণে লিপ্ত হতে পারে। অবশ্য চাহিদাটি যদি গুরুতর না হয় তাহলে ব্যক্তির এই মানসিক দ্বন্দ্ব স্বল্পস্থায়ী হয় এবং কিছুদিন পরে সে আবার তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যত ব্যক্তি তার ব্যর্থতা বা অতৃপ্তিকে ভুলে গেলেও চাহিদাটি তার অচেতন মনে অবদমিত হয়ে বাস করে এবং সুযোগ পেলেই তার বাহ্যিক আচরণকে তার অজ্ঞাতসারেই নানা ভাবে প্রভাবিত করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণ দেখে তার মধ্যে কোন অপসঙ্গতি খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার মনের গভীর তলদেশে গুরুতর অপসঙ্গতি বিস্ফোরকের শক্তি নিয়ে সুপ্ত হয়ে থাকে। এই অপসঙ্গতি এক দিকে যেমন তার মনে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তেমনই সুযোগ পেলে তার বাহ্যিক আচরণকে বিপথগামী করে তোলে।

1. Maladjustment

তৃতীয়ত, এই দুটি চরম সম্ভাবনার পরিবর্তে চাহিদাটির আংশিক পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে। ব্যক্তি যদি তার এই আংশিক পরিতৃপ্তিকে মেনে নেয় তাহলে তার মধ্যে বিশেষ অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। কিন্তু যদি সে তা না করে তাহলে তার চাহিদার আংশিক অতৃপ্তির জন্য তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে বলা বাহুল্য পূর্ণ অতৃপ্তির চেয়ে আংশিক তৃপ্তির ক্ষেত্রে অপসঙ্গতির মাত্রা অনেক কম।

অতএব দেখা যাচ্ছে অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয় ব্যক্তির চাহিদার অতৃপ্তি থেকে এবং অতৃপ্তি হলে কি পরিমাণ অতৃপ্তি হল তার উপর নির্ভর করছে অপসঙ্গতির মাত্রা। তাছাড়া চাহিদাটি ব্যক্তির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার অতৃপ্তি তার মধ্যে কতটা প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় আনবে এই দুটি ব্যাপারের দ্বারাই অপসঙ্গতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ

ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিলে তা তার মনের মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং বাইরে বিশেষ এক ধরনের আচরণের রূপ নেয়। এই আচরণকে আমরা পরিপূরক আচরণ নাম দিতে পারি। চাহিদাটি তৃপ্ত না হওয়ার ফলে ব্যক্তি যে ঈপ্সিত মানসিক তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় সেই মানসিক তৃপ্তি পেতে সে চেষ্টা করে অন্য কোন ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে। সেই বিশেষ আচরণটি যদিও তার পূর্বের প্রকৃত লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যেতে পারে না এবং অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে নিয়ে যায়, তবু যে মানসিক তৃপ্তি সে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছলে পেত, সেই তৃপ্তিই সে পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে এই নতুন বা পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌঁছনর মধ্যে দিয়ে লাভ করে। অর্থাৎ সে তার প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে আর একটি নতুন বা বিকল্প লক্ষ্য[1] স্থাপন করে এবং এই বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছনর মাধ্যমে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছনর অক্ষমতাকে পূরণ করে।

অতএব অপসঙ্গতির কোন ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর পাই। যথা, (ক) ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছনর পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা। এই অক্ষমতার কারণ ব্যক্তির নিজস্ব অসামর্থ্য হতে পারে, আবার পারিবেশিক শক্তির প্রতিকূলতাও হতে পারে। (খ) প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন। (গ) সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য বিশেষ কোনও পরিপূরক আচরণ[2] সম্পন্ন করা। এদিক দিয়ে অপসঙ্গতিমূলক আচরণমাত্রেই হচ্ছে বঞ্চিত তৃপ্তি অন্য পথে পাবার প্রচেষ্টা এবং অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলতে সেই উদ্দেশ্যসম্পন্ন পরিপূরক আচরণকেই বোঝায়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে ক্লাসে ভাল ফল করে সকলের কাছে তার কৃতিত্বের

1. Substitute Goal 2. Compensatory Behaviour

স্বীকৃতি পেতে চায়। এখানে সকলের কাছে নিজের স্বীকৃতি বা পরিচিতি লাভের ইচ্ছাই হল তার চাহিদা। গতানুগতিক বিদ্যালয়ে এই চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে একমাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালে বা প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থান অধিকার করলে। অতএব ছেলেটির প্রকৃত লক্ষ্য হল পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান। এখন মনে করা যাক ছেলেটি তার সামর্থ্যের অভাবের জন্য পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারল না, ফলে তার পরিচিতি লাভের চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে গেল। তখন সে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে আত্মস্বীকৃতি লাভের পরিবর্তে তার চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের উপর অত্যাচার করা, উৎপীড়ন করা, সহপাঠীদের বই, খাতা চুরি করা এই রকম নানা অবাঞ্ছিত উপায়ে নিজের স্বীকৃতি ও পরিচিতি লাভের চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ সে তার চাহিদার প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করল এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, চুরি ইত্যাদি পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করল। অর্থাৎ এক কথায় ছেলেটির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিল।

এই বিকল্প লক্ষ্য এবং পরিপূরক আচরণ যে সব সময়েই অবাঞ্ছিত এবং অসামাজিক রূপ নেবে তার কোন অর্থ নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে ব্যক্তি যে বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণটি গ্রহণ করে সেটি সমাজের দিক দিয়ে বাঞ্ছিত প্রকৃতির এবং ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকরও। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তের ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে না পেরে খেলাধুলা, অঙ্কন, সঙ্গীত বা অভিনয় ইত্যাদির কোন একটিতে পারদর্শিতা দেখিয়ে দশজনের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি আদায় করল। এখানে তার বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ দুইই কাম্য ও মঙ্গলপ্রসূ হয়ে দাঁড়াল। তত্ত্বের দিক দিয়ে যদিও এও এক ধরনের অপসঙ্গতি তবু আমরা একে অপসঙ্গতি বলব না। কেবলমাত্র সেই সব পরিপূরক আচরণকেই আমরা অপসঙ্গতির পর্যায়ে ফেলব যেগুলি সমাজ অনুমোদিত নয় কিংবা যেগুলি ব্যক্তির নিজের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলতে আমরা সেই সব আচরণকে গণ্য করব যেগুলি ব্যক্তির মনের দ্বন্দ্বের স্থায়ী মীমাংসা আনতে পারে না এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। সাধারণ অপসঙ্গতিমূলক আচরণগুলি সাময়িকভাবে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি আনতে সক্ষম হলেও সেগুলি মনের স্থায়ী শান্তি বা সমতা আনতে সক্ষম হয় না।

চাহিদামাত্রেরই অতৃপ্তি কিন্তু অপসঙ্গতির সৃষ্টি করে না। এমন অনেক চাহিদা আছে যেগুলির অতৃপ্তি মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রক্ষোভমূলক বিক্ষোভের সৃষ্টি করে বটে কিন্তু সেগুলি নিতান্তই সাময়িক ধরনের এবং ব্যক্তির মনে কোন স্থায়ী প্রভাব রেখে

যায় না। তবে এমন বিশেষ কতকগুলি চাহিদা আছে যেগুলির প্রভাব প্রায় সকল মানুষের উপরই বেশ উল্লেখযোগ্য এবং সেগুলির অতৃপ্তি ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সুসঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ছেলেমেয়েরা কৈশোর পার হয়ে যৌবনের তোরণদ্বারে প্রবেশ করে। এই সময়ে তাদের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই সব চাহিদা যদি যথাযথ ভাবে তৃপ্ত না হয় তাহলে প্রাপ্তযৌবনদের জীবনে গুরুতর প্রতিবন্ধক দেখা দেয় এবং তাদের শিক্ষা, প্রাক্ষোভিক সংগঠন, ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ সবই বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়ে ওঠে।

অপসঙ্গতির কারণাবলী

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে অপসঙ্গতি ঘটতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা সেগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অপসঙ্গতির প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। এই কারণগুলির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য সযত্ন মনঃসমীক্ষণমূলক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অপসঙ্গতির কয়েকটি প্রধান কারণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি

নিরাপত্তার অভাববোধ অপসঙ্গতির একটি বড় কারণ। এই অনুভূতিটি দেখা দেয় যখন ব্যক্তি নিজেকে সকলের কাছে অবাঞ্ছিত বা পরিত্যক্ত বলে মনে করে এবং তার মধ্যে এই ধারণা হয় যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা এবং মঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলেছে। এইরকম মনোভাবের দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদের স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্র সর্বত্রই দেখা যায়। এই ধরনের ব্যক্তিরা সব সময়েই সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এবং কোন নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে ভয় পায়। স্কুলে এই ধরনের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়া বলতে ইতস্তত করে এবং সব সময়ই অপরের বিদ্রূপ বা নিন্দার ভয়ে নিজে থেকে কিছু করতে সাহস করে না। অতি শৈশবে সাধারণত এই নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তীব্র মাত্রায় থাকে। অবশ্য যে সব পিতা-মাতা শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুলির যথাযথ পরিতুষ্টির ব্যবস্থা করেন তাদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরিত্যক্ত বা অবহেলিত বলে মনে করে না এবং তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধও জন্মায় না। কিন্তু যেখানে পিতামাতা এবং বয়স্করা শিশুর প্রতি প্রতিকূল বা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন সেখানে শিশু নিজেকে পরিত্যক্ত এবং অবাঞ্ছিত বলে মনে করে। তার ফলে তার মধ্যে

গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।

স্কুলে নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেয়। সেগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। যেমন, কঠিন কাজের চাপ, রূঢ় মন্তব্য, কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তিদান, সহানুভূতির অভাব, অবহেলা, বিদ্রূপ ইত্যাদি। এছাড়াও পিতামাতাদের নিজেদের মধ্যে কলহ, জাতিগত বা ধর্মগত বৈষম্য, বৃহত্তর সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণেও শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগে।

নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতিকে দূর করতে হলে এই অনুভূতি সৃষ্টির মৌলিক কারণটি খুঁজে বার করতে হবে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে সে সত্য সত্য অবহেলিত বা অবাঞ্ছিত নয় এবং তার কাজের যথাযোগ্য সমাদর যাতে সে পায় তা দেখতে হবে। বিদ্রূপ, শ্লেষোক্তি, লজ্জা দেওয়া, ব্যক্তিগত সমালোচনা ইত্যাদি আচরণগুলি অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করতে হবে। তার নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যাতে মুক্তি পায় তার পর্যাপ্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে। খেলাধুলা, আঁকা, লেখা, নতুন নতুন জিনিস তৈরী করা, বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তার নিরাপত্তাহীনতার বোধকে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের বোধে রূপান্তরিত করতে হবে।

আক্রমণমূলক মনোভাব

অপসঙ্গতির আর একটি কারণ হল আক্রমণমূলক অনুভূতি[1]। দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির আক্রমণাত্মক মনোভাব জন্মলাভ করে এবং তার ফলে তার এই আচরণের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয়। তার এই আক্রমণাত্মক মনোভাব যে অন্যায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং যাতে তার এই মনোভাব তার আচরণে প্রকাশ না পায় সে সম্বন্ধে সে সচেষ্টও হয়। তরে ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা তার বাহ্যিক আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কারেন হর্নির[2] পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞানমূলক দুশ্চিন্তা অনেক ক্ষেত্রে এই আক্রমণাত্মক অনুভূতি থেকে জন্মলাভ করে থাকে।

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব নানা আচরণের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ছোট ভাইবোনদের বা ক্লাসের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছেলেমেয়েদের আঘাত করা বা উত্যক্ত করা এই মনোভাবের একটি সাধারণ অভিব্যক্তি। যাদের মধ্যে এই মনোভাব খুব বেশী তাদের প্রায়ই সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করতে দেখা যায়। পশুপাখীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার

1. Sense of Hostility 2. Karen Horney

করাটাও অনেক সময় এই মনোভাব থেকেই জন্মায়। উৎপীড়ক এসব ক্ষেত্রে জানে যে পশুপাখীরা নিতান্তই অসহায় এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারবে না। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে জড় বস্তুর প্রতিও আক্রমণমূলক মনোভাব দেখা দিয়ে থাকে। ডেস্কে নাম লেখা বা খোদাই করা, জানালা দরজা ভাঙা, চেয়ারের গদি ছুরি দিয়ে কাটা, স্কুল, লাইব্রেরী বা সভাগৃহের সম্পত্তি বিনষ্ট করা প্রভৃতি ধ্বংসমূলক আচরণগুলি এই আক্রমণমূলক মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

শিশুর মধ্যে আক্রমণমূলক অনুভূতি সৃষ্টির প্রধানতম কারণ হল তার প্রতি তার পিতামাতা প্রভৃতির বৈষম্যমূলক আচরণ। যে সব পিতামাতা নিজেরাই মানসিক বিপর্যয়ে ভোগেন বা যে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধের অভাব থাকে তাঁরা তাঁদের শিশুদের মধ্যে এই অতিপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তার মনোভাবটি কখনই সৃষ্টি করতে পারেন না এবং তার ফলে স্বভাবতই তাঁদের ছেলেমেয়েরা আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে।

যে সব পিতামাতা স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা, পক্ষপাতপূর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের আন্তরিকভাবে ভালবাসতে জানেন না, তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই আক্রমণমূলক মনোভাব তীব্রভাবে জেগে থাকে। একাধিক ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়েকে বেশী ভালবাসলে অবহেলিত শিশুদের মনে প্রায়ই আক্রমণমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতার আচরণ কখনও খুব কঠোর কখনও খুব কোমল হয়ে থাকে অর্থাৎ তাদের আচরণের মধ্যে কোন রকম সামঞ্জস্য বা সংহতি নেই। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই ধরনের সামঞ্জস্যহীন বৈষম্যধর্মী আচরণের ফল নিছক কঠোর বা অন্যান্য প্রকৃতির আচরণের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া শিশুদের বন্ধু নির্বাচনে বাধাদান, তাদের কোন কাজকে বিদ্রূপ করা, তাদের আচরণ বা লক্ষ্যের সমালোচনা করা ইত্যাদি আচরণগুলিও শিশুদের মধ্যে এই ধরনের আক্রমণমূলক মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

শিশুদের মধ্যে থেকে এই আক্রমণমূলক মনোভাব দূর করার সব চেয়ে প্রশস্ত পন্থা হল তাদের মনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দেওয়া। অবশ্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল শিশুর মধ্যে যে পরিত্যক্ততার মনোভাব জেগেছে সে মনোভাবটিকে দূর করা এবং আন্তরিক ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা তাকে আপন করে নেওয়া। শিশুকে তার কাজের জন্য প্রাপ্য প্রশংসা দান করে এবং তাকে তার কাজে উৎসাহিত করে তার আত্ম-

আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারলে তার এই আক্রমণমূলক মনোভাব নিজে নিজেই চলে যাবে। সব শেষে তাকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে এবং যতটা সম্ভব তার কাজে যাতে বাধা না দেওয়া হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, তার নিজের বন্ধু-নির্বাচন, কোন বিশেষ কাজে মনোযোগ দান, কোন বিশেষ ছবির অনুসরণ ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব স্বাধীনতা তাকে দিতে হবে।

অপরাধের অনুভূতি

অপসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হল অপরাধের অনুভূতি[1]। ব্যক্তি অনেক সময় তার কোন বিশেষ আচরণের জন্য নিজেকে অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে এবং তার জন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। এর মূলে আছে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে নিকৃষ্টতার ধারণা। অতি সাধারণ ও নির্দোষ কাজের ক্ষেত্রেও এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে এবং এক ধরনের বিবেকের দংশন অনুভব করে থাকে। তারা সব সময়েই মনে মনে এই ভেবে ভীত বা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে এই বুঝি তাদের আচরণে অপরে অসন্তুষ্ট বা অপমানিত হল।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অপরাধের বোধ নানা ভাবে অভিব্যক্ত হয়। আত্মগ্লানি বা আত্মনিন্দা এই অনুভূতির একটি প্রধান রূপ। এই মনোভাব-সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা মনে করে এবং অনেক সময় মুখেও প্রকাশ করে যে তারা কোন একটা অপরাধ বা পাপ কাজ করেছে। অনেক সময় আবার প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তারা সেই অপরাধের জন্য নিজেদেরই শাস্তি দেয় এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রাখে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তারা তাদের এই অপরাধ অপরের উপর প্রতিফলিত করে এবং নিজেদের দোষত্রুটির জন্য অপরকে দোষী বা দায়ী করে। একে মনোবিজ্ঞানে প্রতিফলন[2] বলে।

অপরাধবোধের সব চেয়ে বড় কারণ হল নিজের সম্বন্ধে নিম্নতাবোধ। সাধারণত বয়স্কদের বিরূপ সমালোচনা, নিন্দা, বিদ্রূপ, ভাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা ইত্যাদি থেকেই শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ জন্মায়। তাছাড়া শিশু অনেক সময় কোন একটা অন্যায় কাজ হঠাৎ করে ফেলার পর থেকে যদি তাকে সব সময়ে সেই কাজের জন্য দোষী করে যাওয়া হয় তাহলেও তার মধ্যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে পিতামাতার কিছু কিছু ভ্রান্তিকর আচরণ শিশুদের মধ্যে প্রায়ই অপরাধবোধ সৃষ্টি করে থাকে। প্রথমটি হল তাদের যৌন-ঘটিত জ্ঞান অর্জনে বাধা দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি হল তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলি

1. Sense of Guilt 2. Projection

মানতে বাধ্য করা। শিশুদের যৌন সচেতনতা জাগার সময় থেকে তাদের মধ্যে নিজেদের দেহের যৌনাঙ্গগুলি পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই সময় যদি তাদের বকাবকি, মারধোর করা বা লজ্জা দেওয়া যায় তাহলে তাদের মধ্যে ঐ ইচ্ছা আরও প্রবল কৌতূহলের আকার নিয়ে দেখা দেয়। ফলে তারা ঐ কাজগুলি গোপনে সম্পন্ন করতে সুরু করে এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে তীব্র অপরাধের অনুভূতি জাগে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে এই সব যৌন প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে। কিন্তু আমাদের সাধারণ সমাজে যৌন প্রবণতা এবং যৌন আচরণকে এতই মন্দ ও নীতিবিরোধী কাজ বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে প্রাপ্তযৌবনদের মনে অতি তীব্র মাত্রায় অপরাধবোধের সৃষ্টি হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে ওঠে।

ছেলেমেয়েদের মনে অপরাধবোধ সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হল তাদের উপর ধর্মসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি চাপিয়ে দেওয়া। এই সব অনুশাসন মূলত অপরাধ ও পাপ সম্বন্ধে সচেতনতার সৃষ্টি এবং তার জন্য শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ভীতিপ্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এগুলি ছেলেমেয়েদের মনে সুতীব্র অপরাধবোধ, ভীতি, দুশ্চিন্তা, আত্মগ্লানি প্রভৃতি সৃষ্টি করে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

অপরাধবোধ হল জটিল অপসঙ্গতির একটি উদাহরণ বিশেষ। সাধারণ প্রচেষ্টায় এটিকে দূর করা যায় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের[1] সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিশুর মন থেকে অপরাধবোধ দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং তার অহংসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া। তার জন্য শিশুর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে হবে, তার উদ্দেশ্য, মতামত ও কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে এবং তাকে বুঝতে দিতে হবে যে সেও আর দশজনের মত স্বাভাবিক ও সহজ একজন মানুষ। নিজের যৌনাঙ্গ পর্যবেক্ষণ শিশুর ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং যথাসময়ে এ অভ্যাসটি চলে যায়। অতএব এ ব্যাপারটিকে অনর্থক অতিরঞ্জিত করে শিশুর মধ্যে ভুল ধারণা ও অপরাধবোধ সৃষ্টি করা কখনই উচিত নয়। ধর্মমূলক শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ধর্মের নামে ভীতি প্রদর্শন করে শিশুর মধ্যে অপরাধবোধ, পাপ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি সৃষ্টি না করে উচ্চ আদর্শ, নীতিবোধ, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তোলা উচিত। অপরাধবোধ হঠাৎ একটি বা দুটি ঘটনার দ্বারা শিশুর মধ্যে সৃষ্ট হয় না। দীর্ঘসময়ের পুঞ্জীভূত আত্মগ্লানি বা অন্যায়ের সচেতনতা থেকে তা ধীরে ধীরে জন্মায়। অতএব এর চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সময়, সতর্ক প্রচেষ্টা ও সযত্ন পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

1. Psychiatrist

অন্তর্দ্বন্দ্ব

সকল প্রকার অপসঙ্গতিরই সাধারণ লক্ষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব[1]। যে কোন কারণ থেকেই অপসঙ্গতি জন্ম নিক না কেন, তা প্রথমে ব্যক্তির মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবেই এবং তাই থেকেই শেষে অপসঙ্গতি দেখা দেবে। এই দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে অপসঙ্গতির বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ বা সর্বজনীন কারণ বলাই সঙ্গত।

অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে বোঝায় একটি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভধর্মী মানসিক অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা দুটি কারণে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, যখন ব্যক্তির মধ্যে একাধিক পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা জাগে, আর দ্বিতীয়ত, যখন ব্যক্তির কোন ইচ্ছা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অতৃপ্ত থেকে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির মধ্যে একটা আশাভঙ্গ বা ব্যর্থতার মনোভাব দেখা দেয় এবং এই ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বোধ থেকেই তার মনে প্রক্ষোভমূলক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, সচেতন ও অচেতন। সব সময়ে যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তির কাছে জ্ঞাত থাকে তা নয়। মনঃসমীক্ষকদের মতে অনেক ক্ষেত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তির অচেতন মনে নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। অথচ ব্যক্তির সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার বাহ্যিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিমাত্রকেই তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়তই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয়। এই সঙ্গতিবিধান যাতে সে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য তার মধ্যে দেখা দেয় নানা বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা এবং আচরণ-প্রচেষ্টা। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের স্বাধীন আচরণের পথে রয়েছে অসংখ্য বাধাবিঘ্ন। ফলে প্রায়ই আমাদের আচরণের স্বাভাবিক সম্পাদন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক ইচ্ছা বা চাহিদাই অপূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য এই ইচ্ছাপূরণের পথে বাধাটি বাস্তবও হয়ে থাকে আবার বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা-প্রসূতও হয়। ইচ্ছাপূরণের এই অসামর্থ্য থেকে ব্যক্তির মনে জাগে প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা এবং তাই থেকে সৃষ্টি হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই ধরনের চাহিদার অতৃপ্তি সকলের মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ নেয় না। ব্যক্তির কাছে চাহিদাটির গুরুত্ব এবং তার অতৃপ্তি তাকে কতখানি বিক্ষুব্ধ করল তার উপরই নির্ভর করে অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও তীব্রতা। অনেক সময় আবার দেখা গেছে যে অন্তর্দ্বন্দ্বটির সুষ্ঠু মীমাংসা ব্যক্তি নিজেই উদ্ভাবন করে নিতে সমর্থ হয়েছে এবং তার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য সে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্ভর করে ব্যক্তির সমস্যার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর। ছোট একটি ছেলে স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে ক্রমশ তার সমস্যার সংখ্যা বাড়তে থাকে। স্কুলের পড়া তৈরী করা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মানিয়ে চলা, শিক্ষকদের সঙ্গে যথাযথ

1. Conflict

সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা ক্রমশ তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। এই সময় প্রায়ই তাকে পরস্পরবিরোধী অনেক ইচ্ছার সম্মুখীন হতে হয়। এই বিরোধী ইচ্ছাগুলির মধ্যে যদি সে সন্তোষজনক মীমাংসা করে নিতে না পারে তাহলেই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যেমন, সে স্কুলের পড়া তৈরী করবে, না বাইরে খেলতে যাবে, এ দুটি বিরোধী ইচ্ছা যখন তার মধ্যে দেখা দেয় তখন তা থেকে তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব জাগে। এখন যদি ছেলেটি দুয়ের মধ্যে মীমাংসা করে নিতে পারে তাহলে তার দ্বন্দ্ব আর থাকে না। কিন্তু মনে করা যাক ছেলেটি স্কুলের পড়া না করে শুধু খেলেই কাটাল, তাহলে তার মধ্যে স্কুলের পড়া না করার জন্য জাগল দুশ্চিন্তা, ভীতি এবং অপরাধবোধ এবং তার ফলে কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল। এত গেল সাধারণ স্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। পরিস্থিতি অনুযায়ী শিশুর মনে আরও অনেক গুরুতর ও জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগতে পারে এবং প্রায়ই সেগুলি সহজে মীমাংসা করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে সে সব ক্ষেত্রে তার মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটে থাকে।

গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের যেমন অপকারিতা আছে তেমনই স্বাভাবিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তাও আছে। বহুদিক দিয়ে আমাদের সীমাবদ্ধ সমাজ জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে না পারলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই শিশু উন্নততর ও অধিকতর কার্যকর আচরণ করতে উৎসাহিত হয়। এ দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুষ্ঠু ও উন্নত সঙ্গতিবিধানের সোপানবিশেষ বলে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু যখন তার পক্ষে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা করা সম্ভব হয় না তখনই তার ফল ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া শিশুর অবিকশিত ব্যক্তিসত্তার বাঞ্ছিত বিকাশ সম্ভব হয় না। যে শিশুর মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে না বুঝতে হবে যে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র চাহিদা বলে বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয় নি এবং সে পরিবেশকে যতটা পারে এড়িয়ে চলে। ফলে তার ব্যক্তিসত্তা দুর্বল, সঙ্কীর্ণ ও অপরিণত হয়ে গড়ে ওঠে। অতএব সেদিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি মানসিক স্বাস্থ্যবিধির বিচারে সব সময় অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল ঘটনা নয়। শিশু তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসা করতে পারল কিনা সেটা দেখাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রকৃত কাজ।

কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে ব্যক্তি একটি বিকল্প লক্ষ্য বেছে নেয় এবং সেই লক্ষ্যে পেঁছনর মাধ্যমে তার সেই চাহিদাটি পূর্ণ করার চেষ্টা করে। প্রকৃত লক্ষ্যে পেঁছনর অসামর্থ্য থেকে তার মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এই বিকল্প লক্ষ্যটি বেছে নেওয়ার ফলে। এভাবেই সাধারণত অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা

হয়ে থাকে। কিন্তু যদি বিকল্প লক্ষ্যটি অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার মধ্যে আবার নতুন করে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

শিশুর ক্ষেত্রে নানা পরিস্থিতি থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব জন্মায়। অনেক সময় শিশু এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় যখন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিশুর পরিবেশের অন্তর্গত একাধিক ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের মধ্যে যখন সংঘাত দেখা দেয় তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, স্কুলে ছেলেটির একটি সহপাঠী কোন অন্যায় কাজ করেছে। শিক্ষক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন যে ঐ অন্যায় কাজটি কে করেছে। এখানে ছেলেটির মনে শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য এবং সহপাঠীর প্রতি অনুরাগ এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। তার ফলে শিশু যে আচরণই করুক না কেন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগবেই। এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কেবল শিশুর ক্ষেত্রে নয়, বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রচুর দেখা দিয়ে থাকে।

এতক্ষণ যে অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোচনা করা হল তা হল সচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব। অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুক্ষেত্রে অচেতন অবস্থায় থাকে। অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নিজের সমস্যা এবং তা থেকে সঞ্জাত অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটুও সচেতন থাকে না। এই ধরনের অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব সচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও গুরুতর হয়। অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে শিশুর মনে একই ব্যক্তির প্রতি পরস্পরবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একই ব্যক্তিকে সে একই সময় ভালবাসে আবার ঘৃণাও করে। শৈশবে সাধারণত বাবার প্রতি ছেলের এবং মায়ের প্রতি মেয়ের এই ধরনের যুগ্ম-অনুভূতি[1] জন্মে থাকে। অথচ শিশু তার এই মনোভাব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন থাকে না এবং এ থেকে সঞ্জাত অন্তর্দ্বন্দ্ব তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। এ ছাড়া অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও নানা কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতি শৈশবে ভয়জাত বা কষ্টঘটিত কোন গুরুতর প্রকৃতির অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা—যা হয়ত শিশু পরে ভুলে গেছে অর্থাৎ যেটিকে সে তার অচেতন মনে অবদমিত করেছে—তা তার মধ্যে অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। পরবর্তী কালে সেই অভিজ্ঞতাটি শিশু সম্পূর্ণ ভুলে গেলেও একটা ভীতি বা গভীর বেদনার অনুভূতি তার অচেতন মনে বাসা বেঁধে থাকে। বদ্ধ স্থানের ভীতি, মুক্ত স্থানের ভীতি, জন্তু-জানোয়ারের ভীতি, উচ্চ শব্দের ভীতি এই রকম বিভিন্ন প্রকৃতির ভীতি অতীতের বিস্মৃত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। ফলে এই ধরনের অচেতন মনের ভীতিগুলির কারণ চেতন মনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া

1. Ambivalence

অপরিহার্য। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে অতীতের যে ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বটির সৃষ্টি হয়েছে শিশুর অচেতন মন থেকে সেটিকে খুঁজে বার করাটাই অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং অনেক সময় একমাত্র পন্থা।

বাস্তবকে গ্রহণ করা এবং পরাজয় ও অসাফল্যকে মেনে নেওয়াই হল অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। সকলেরই কল্পনা বা ইচ্ছা অনুযায়ী বাস্তব পরিস্থিতি গঠিত হয় না এবং তার ফলে কিছু মাত্রায় হতাশা, ব্যর্থতা, আশাভঙ্গ সকলের ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী। এই সত্যটুকু যদি শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে নিজেই তার অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে নিতে পারে।

শিশুর মধ্যে যাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব গুরুতর আকার ধারণ না করে তার জন্য দেখতে হবে যে স্কুলে শিশুর কাছে যেন কোন অন্যায় অসম্ভব চাহিদা উপস্থাপিত করা না হয়। অনেক স্কুলে শিশুদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়। তার ফলে যে অল্প কয়েকজন প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করে তারা ছাড়া আর সকলেই ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয় এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে। যদি স্কুলের আবহাওয়াটি সহযোগিতামূলক হয় এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সাফল্যের পরিবর্তে যদি সকলের সাফল্যের যৌথভাবে মূল্য দেওয়া হয় তাহলে সেখানে শিশুদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক কম মাত্রায় দেখা দেয়।

অপসঙ্গতির কয়েকটি রূপ

যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না অর্থাৎ যার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার আচরণ সহজ ও স্বাভাবিক পথ ত্যাগ করে অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক পথে অগ্রসর হয়। একেই আমরা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলে থাকি। এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। কয়েকটি প্রচলিত ও সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

ভীরুতা

যে সব ছেলেমেয়ে ক্লাসে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে, কোনরকম গোলমাল করে না তাদের শিক্ষকেরা ভাল ছেলেমেয়ের পর্যায়ে ফেলেন এবং সর্বদাই সুনজরেই দেখে থাকেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফল থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে গুরুতর অপসঙ্গতির শোচনীয় ক্ষেত্রবিশেষ। এই সব ছেলে মেয়ে বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সন্তোষজনক

সঙ্গতিবিধান করতে পারে নি। ফলে তাদের বিশেষ কোন চাহিদা অপূর্ণ থেকে গেছে এবং তারা সেই ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েছে। যাতে তাদের অধিকতর ব্যর্থতাকে মেনে নিতে না হয়, সেইজন্য তারা বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নিয়েছে। এই আচরণ নিঃসন্দেহে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। কিন্তু এ প্রচেষ্টা নিতান্তই অসার্থক ও অমঙ্গলকর। এর দ্বারা তাদের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন তেমনই থেকে যায়, তার কোন মীমাংসা হয় না। উপরন্তু বাস্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অবহেলিত ও অনাদৃত ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের ভীরুতা প্রায়ই গড়ে উঠতে দেখা যায়। যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের ইচ্ছা পূরণের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প তখন তারা ব্যর্থতার দুঃখ এড়াবার জন্য নিজেদের বাস্তব থেকে প্রত্যাহৃত করে নেয়। আবার যে সব ছেলেমেয়ে নিপীড়নমূলক বা অতিরিক্ত শৃংখলা-শাসিত আবহাওয়ায় মানুষ হয় তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে, ফলে তারাও নিজেদের বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে আনে এবং কালক্রমে ভীরু ও দুর্বলচিত্ত হয়ে ওঠে। ইউঙ'র ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী এদের অন্তর্বৃত[1] বলা হয়। এদের অহংসত্তা বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য এই ধরনের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অস্বাভাবিক ও গুরুতররূপে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ভীরুতা দূর করতে হলে এদের অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের মনের মধ্যে সঞ্চিত অবহেলার গ্লানি দূর করে এদের মধ্যে সাহস ও ভরসা সৃষ্টি করতে হবে। এরা যাতে কাজে সাফল্য লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং যে বাস্তবকে এরা ভয়ে এড়িয়ে যেত সেই বাস্তবকে যাতে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা মেনে নিতে পারে, সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে। তবে যে বিশেষ ঘটনা বা কারণের জন্য এদের মধ্যে ভীরুতার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করা এবং সেটি দূর করে তাদের মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনাই এদের চিকিৎসার প্রথম সোপান।

অবশ্য ক্লাসে শান্তশিষ্ট এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেই যে কোন শিশুকে অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে ক্লাসে যা পড়ানো হচ্ছে তা হয়ত শিশুটি কোন কারণে ঠিকমত অনুসরণ করতে পারছে না, ফলে বাধ্য হয়ে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তার ঐ অসুবিধাটুকু দূর করতে পারলেই তার নিষ্ক্রিয়তা দূর হবে। সেই জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর ভীরুতা সত্যকারের অপসঙ্গতিমূলক কিনা তা জানবার জন্য দেখেন যে ভীরুতার সঙ্গে অন্য কোন অস্বাভাবিক উপসর্গ আছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ, যদি তাঁরা

1. Introvert :: পৃঃ ৪৮৩

দেখেন যে দাঁতে নখকাটা, তোৎলামি, অস্থিরতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গ-গুলিও ভীরুতার সঙ্গে রয়েছে তাহলে তাঁরা সেটিকে প্রকৃত অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে ধরে নেন। আর ভীরুতার সঙ্গে তেমন কোন উপসর্গ না দেখা গেলে সেটিকে তাঁরা সাধারণ ভীরুতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন।

আক্রমণধর্মিতা

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অভাব যেমন শিশুকে ভীরু করে তোলে তেমনই আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মিতা[1] জাগায়। এই ধরনের ছেলেমেয়েরা তাদের সহপাঠী, ভাইবোন প্রভৃতির উপর অকারণে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। এদের ইংরেজীতে বুলি[2] বলা হয়।

নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণধর্মিতার প্রধান কারণ। যে শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার বোধ নেই এবং যে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে সে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার জন্য বয়সে ছোট বা শারীরিক শক্তিতে দুর্বল শিশুর উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। আত্মস্বীকৃতি ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার জন্য অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। বাড়ীতে বা স্কুলে স্বাভাবিক পন্থায় পরিচিতি বা স্বীকৃতি লাভ করতে অক্ষম হয়ে শিশু এই অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করে। এইভাবে সে বাড়ীর বয়স্কদের বা স্কুলে শিক্ষক-সহপাঠীদের কাছ থেকে আত্মস্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে।

আক্রমণধর্মিতা দূর করতে হলে প্রথমে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাটি কি তা দেখতে হবে। যে চাহিদার অপূর্ণতার জন্য সে আক্রমণধর্মী হয়ে উঠেছে সেটিকে অনুসন্ধান করে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপত্তাহীনতার বোধই তার অপসঙ্গতির কারণ হয়ে থাকে, তবে যাতে তার মন থেকে সেই অবাঞ্ছিত অনুভূতিটি চলে যায় তা দেখতে হবে। একমাত্র আন্তরিক ভালবাসাই শিশুর মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব তার রুক্ষ মনকে ভালবাসা দিয়ে সিঞ্চিত করে তুলতে হবে এবং যাতে সে তার আত্মবিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

আর যদি আত্মস্বীকৃতি ও পরিচিতিই তার অতৃপ্ত চাহিদার বস্তু হয়ে থাকে তবে সে যাতে ঈপ্সিত পথে সেগুলি পেতে পারে তার আয়োজন করতে হবে। খেলাধূলা, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে যাতে সে তার অহংসত্তাকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য তাকে পর্যাপ্ত সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে।

1. Aggressiveness 2. Bully

অনেকে শিশুর আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হল যে আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার ফল মন্দই হয়। তার চেয়ে ভাল পন্থা হল ঐ আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে সেটিকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীতকরণ[1] বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ছেলে মারামারি করতে অভ্যস্ত তাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার সুযোগ দিলে ধীরে ধীরে তার ঐ আচরণটি সংযত ও গঠনধর্মী হয়ে ওঠে।

গুরুত্বের দিক দিয়ে ভীরুতা আক্রমণধর্মিতার চেয়ে কঠিনতর ব্যাধি। কেন না ভীরুতার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে কোন আচরণই থাকে না। তার মধ্যে নতুন করে আচরণের সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু আক্রমণধর্মিতার ক্ষেত্রে আচরণ আগে থেকেই থাকে, কেবল প্রয়োজন হয় সেটিকে পরিবর্তিত করে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা।

ক্লাস পালানো

ক্লাস পালানো[2] একটি অতি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ। ক্লাস পালানোর অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ক্লাস পালানোর সব চেয়ে বড় কারণ হল শিশুর শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা ক্লাসে পূর্ণ না হওয়া। তার ফলে ক্লাসে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা সে আর অনুভব করে না এবং সুযোগ সুবিধা পেলেই ক্লাস থেকে পালায়।

ক্লাসে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন তৃপ্ত না হবার তিন রকম কারণ আছে। প্রথমত, শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে এবং তার ফলে হয় শিক্ষার্থীর কাছে ক্লাসের পড়া দুরূহ ঠেকে, নয় তা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এই জন্য আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণপদ্ধতিকে নানা শিক্ষাসহায়ক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষণপদ্ধতিটিও যাতে মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থী যদি উন্নতধীসম্পন্ন শিশু হয় তবে তার কাছে ক্লাসের পড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে জানা থাকে বা অতি সহজ বলে মনে হয়। ফলে তার মধ্যে সে কোন নূতনত্ব খুঁজে পায় না এবং ক্লাসে থাকারও কোন আগ্রহ বোধ করে না। এই কারণেই উন্নত মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ক্লাস পালানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ছেলেমেয়েদের ক্লাস পালানো বন্ধ করতে হলে ক্লাসে তাদের বিশেষ উন্নত ধরনের কাজ দিতে হবে যাতে তারা তাদের মানসিক শক্তির উন্নত প্রয়োগের উপযোগী ক্ষেত্র পেতে পারে।

1. Sublimation 2. Truancy

তৃতীয়ত, যে সব ছেলেমেয়ে বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারাও সাধারণ ক্লাসের পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সনাতন প্রকৃতির স্কুলগুলিতে সাহিত্যধর্মী এবং ভাষাভিত্তিক বিষয়পাঠের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়, ফলে বিশেষধর্মী শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির প্রকৃত ব্যবহার এই সব ক্লাসে হয় না এবং তার ফলে তারা বাধ্য হয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু যদি তাদের প্রকৃতিদত্ত শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠদানের আয়োজন করা হয় তাহলে তারা সেই সব কাজে তৃপ্তি ও সাফল্য দুইই পায়। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে এই জন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির কাজের ব্যবস্থা আছে যাতে সকল রকম বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েই তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রঘটিত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলেকে যদি সাধারণ স্কুলের ক্লাসে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে সে মোটেই সেখানে আগ্রহ বোধ করবে না এবং সুযোগ পেলেই ক্লাস পালাবে। কিন্তু যদি তাকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তখন তার উৎসাহ ও আগ্রহের কোন অভাব নেই।

এ ছাড়া ক্লাস পালানোর আরও কতকগুলি কারণ আছে। অনেক সময় অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার জন্য ছেলেমেয়েরা ক্লাস পালায়। বিশেষ করে বাড়ীতে সম্পন্ন করার জন্য স্কুল থেকে যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলি সম্বন্ধে প্রায়ই ছেলেমেয়েরা সত্যকারের আগ্রহ বোধ করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে এই সব কাজ করে উঠতে না পারলে শিক্ষকের বকুনি বা সহপাঠীদের উপহাসের ভয়ে তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। এছাড়াও নিজের নিম্নজাতিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, নিকৃষ্ট পোষাক ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ক্লাস থেকে পালায়।

ক্লাস পালানোর কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এ ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ শক্ত নয়। এমন কি ক্লাস পালানো রূপ আচরণটিকে একটি গুরুতর অপসঙ্গতি বলে গণ্য না করাও যেতে পারে। তবে ক্লাস পালানো নিজে একটি গুরুতর অপসঙ্গতি না হলেও এটি যে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অপসঙ্গতির, এমন কি অপরাধপরায়ণতার পূর্ব সোপান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অধিকাংশ যুব অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্লাস পালানো তাদের স্কুলজীবনের একটি অপরিহার্য লক্ষণ ছিল। ক্লাস পালানোর কারণটি প্রথম অবস্থায় দূর করা শক্ত হয় না। কিন্তু যদি সেটিকে অবহেলা করা হয় বা প্রাথমিক অবস্থায় দূর না করা হয় তাহলে ঐ কারণটি জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে শিশুর মধ্যে গভীর মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। সেই জন্য মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত যে শিশুর মধ্যে ক্লাস পালানোর প্রবণতা দেখলেই অবিলম্বে তার কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব সেটি দূর করতে হবে।

ক্লাস পালানোর প্রবণতা দূর করতে হলে প্রথমেই ক্লাসের পাঠদানকে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে স্কুলের সমগ্র পরিবেশটিকেও শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে, শিক্ষণপদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে হবে এবং অর্থহীন নিপীড়নমূলক শৃংখলার প্রয়োগে শিশুর মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা ক্লাসের পাঠে পরিতৃপ্ত হল তার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাস কতটা আকর্ষণীয় হবে। অতএব শিশুর নিজস্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ক্লাসের পাঠের মধ্যে দিয়ে তার মানসিক শক্তির যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

মিথ্যাভাষণ

মিথ্যা কথা বলাও একটি অতি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ। নানা কারণে শিশু মিথ্যাভাষণের[1] আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষেত্রে কারণটি নিতান্ত নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং প্রকৃত অপসঙ্গতির পর্যায়ে পড়ে না। যেমন, উচ্ছ্বাসের মাথায় কোন কিছু অতিরঞ্জিত করে বলা বা বানিয়ে বলা, ভয়ে কোন কিছু গোপন করা বা অসত্য বলা ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকার ফলে এগুলিকে প্রকৃত অপসঙ্গতি বলা চলে না যদিও এই আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলে ভবিষ্যতে সেগুলি থেকে গুরুতর অপসঙ্গতির সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু অনেক সময় শিশু তার কোন বিশেষ অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি মিথ্যাভাষণের মধ্যে দিয়ে পাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু হয়ত অসামর্থ্যবশত লেখাপড়া বা অন্যান্য প্রচলিত পথে তার কাম্য আত্মস্বীকৃতি বা পরিচিতি পেল না। সে তখন তার বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীদের কাছে তার কল্পিত সাফল্য ও মিথ্যা কীর্তির নানা কাহিনী রচনা করে বলতে লাগল এবং এইভাবে তার বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য প্রশংসা ও পরিচিতি আদায় করল। এই ধরনের মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে তার অতৃপ্ত আত্মস্বীকৃতির চাহিদা থেকে জাত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল এবং অপসঙ্গতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মিথ্যাভাষণে তার চাহিদার সত্যকারের তৃপ্তি হয় না এবং তার ফলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব অমীমাংসিতই থেকে যায়। ঐ সাময়িক এবং আংশিক তৃপ্তি লাভের জন্য সে ক্রমশ মিথ্যার মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে যায় এবং শেষে প্রচণ্ড অপরাধবোধ তার মনকে দুর্বল ও পঙ্গু করে তোলে। বাইরের জগতের কাছেও শীঘ্রই তার এই মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে যায় এবং সমাজে সে মিথ্যাবাদী, অনির্ভরযোগ্য, দায়িত্বহীন লোক বলে পরিগণিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে তার বাঞ্ছিত প্রশংসা ও স্বীকৃতি আর পায় না এবং তার ফলে তার অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার মিথ্যাভাষণের প্রকৃত কারণটি

1. Lying

কি তা খুঁজে বার করতে হবে এবং যে চাহিদার অতৃপ্তির জন্য সে এই পরিপূরক আচরণ গ্রহণ করেছে, তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর বিভিন্ন কর্ম-শক্তির বিকাশের পর্যাপ্ত আয়োজন থাকে সেখানে কোন না কোন উপায়ে সে তার কাম্য আত্মস্বীকৃতি লাভ করে এবং মিথ্যাভাষণ বা অন্য কোন অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সাহায্য তাকে আর নিতে হয় না।

বহু ক্ষেত্রে শিশু মিথ্যাভাষণকে প্রতিরক্ষামূলক পন্থা রূপে ব্যবহার করে থাকে। শিশু কোন অন্যায় কাজ করে ফেললে শাস্তি বা নিন্দা থেকে বাঁচার জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় যদি যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে তোলে।

অপহরণ

অপহরণ[1] বা চুরি করাও মিথ্যাভাষণের মত একটি অপসঙ্গতির উদাহরণ। কোন গুরুত্বপূর্ণ অথচ অতৃপ্ত চাহিদাটি শিশু অপরের জিনিসপত্র অপহরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে তৃপ্তিদানের চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে স্কুলে ভাল পড়া পারে না এবং ফলে তার কাম্য স্বীকৃতির চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায়। ছেলেটি তার চাহিদা মেটাবার জন্য সহপাঠীদের বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি ইত্যাদি চুরি করতে সুরু করে। তার এই কাজের ফলে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও দুশ্চিন্তা দেখে সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে থাকে এবং তার ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা কিছুটা তৃপ্তি লাভ করে। বলা বাহুল্য এই তৃপ্তি তার সমস্যার সত্যকারের সমাধান করতে পারে না এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও কোন মীমাংসা এর দ্বারা হয় না।

এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক চৌর্য-আচরণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং শিশু তার সামাজিক মানমর্যাদা সবই হারাতে থাকে। এতে তার অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং কালক্রমে সে একটি অপরাধপ্রবণ[2] শিশুতে পরিণত হয়। বস্তুত অপহরণের অভ্যাস গুরুতর ভবিষ্যৎ অপরাধপ্রবণতার প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছু নয়।

মনোবিকারমূলক অপহরণ[3]

আবার কোন কোন শিশুর মধ্যে গভীর প্রকৃতির মনোবিকারমূলক চুরির প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময় কোন বিশেষ একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর গভীর অচেতনে নিহিত থাকে এবং কোন একটি মনোবিকারমূলক চিন্তা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তা তীব্র

1. Stealing 2. Delinquent 3. Pathological Stealing

রূপ ধারণ করে। সেই অচেতনের অন্তর্দ্বন্দ্বটি তখন বিশেষ বস্তু চুরি করার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

মনোবিকারমূলক চুরির ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে বস্তুগুলি চুরি করে সেগুলিকে সে কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং ঐ বস্তুগুলির উপর অধিকারলাভের মধ্যে দিয়ে সে তার বিশেষ কোন চাহিদা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য এই ক্ষেত্রগুলি প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক ও মনোবিকারমূলক এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া এ সব ক্ষেত্রের উপযুক্ত চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

অপসঙ্গতিমূলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতেই দূর করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে শিশু নিজের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর সকলের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য পরিচিতি পেতে পারে এবং তার অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার দিক দিয়ে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারে না, তারা যাতে লেখাপড়া ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষ দেখাতে পারে পাঠক্রমে তারও পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে। এই জন্য স্কুলে খেলাধূলা, অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলিও তৃপ্ত হয়।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অপহরণপ্রবণতা যে অপসঙ্গতি থেকে জন্মায় তা নয়। নিছক মানসিক অপরিণতির জন্যও অনেক ছেলেমেয়ে মিথ্যা কথা বলার মতই এটা ওটা চুরি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চুরি করাটা যে অনুচিত একথা বোঝার মত বয়সই তখন তাদের হয় না। তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে নিছক কৌতূহল তৃপ্তির জন্যও চুরি করে থাকে। আবার কেউ কেউ তাদের পিতামাতার অস্বচ্ছল অবস্থার জন্য আকর্ষণীয় বা মূল্যবান কিছু দেখে সাময়িক লোভের বশে চুরি করে থাকে। এই ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত অপসঙ্গতির দৃষ্টান্ত নয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশের সাহায্যে বুঝিয়ে এদের নিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু যদি এই ধরনের চুরিকেও যথা সময়ে নিবৃত্ত করা না হয় তাহলে তা অভ্যাসে দাঁড়াতে পারে এবং ভবিষ্যতে শিশুর মধ্যে গুরুতর অপসঙ্গতির সৃষ্টি করতে পারে।

নেতিমনোভাব

নেতিমনোভাব[1] বলতে বোঝায় কর্তৃস্থানীয়দের আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা, অনুরোধ অগ্রাহ্য করা এবং প্রচলিত আইনকানুনের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামত কাজ করা। এই মনোভাবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময়েই একটা প্রতিবাদ বা

1. Negativism

বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা যায় এবং যা কিছু নির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তারই বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই মনোভাবের ফলে কি বাড়ীতে, কি স্কুলে সর্বত্রই শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্কুলের সংগঠিত রূপ ও আবহাওয়াটি এই সব ছেলেমেয়েদের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের কাছে গভীর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষেরা এই সব ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী বা অসামাজিক বলে বর্ণনা করেন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভুল এবং ক্ষতিকর। নেতিমনোভাব শিশুর মানসিক বিকাশ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতির ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় শিশু স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার চেষ্টা করে এবং সেই জন্যই সে অপরের অনুশাসন বা কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে। সে চায় যে সে নিজেই নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে। অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে নেতিমনোভাব কোন প্রকার অপসঙ্গতি নয় বরং স্বাভাবিক বিকাশপ্রক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রতিকূল পরিবেশে অবশ্য এই নেতিমনোভাব গুরুতর অপসঙ্গতির আকার ধারণ করতে পারে। শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে যদি অবদমিত করা হয় বা ভুল বুঝে তার আচরণকে শৃঙ্খলাভঙ্গ, বিদ্রোহ ইত্যাদি নামে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে শিশুর মনের ঐ গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তাই থেকে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দেয়। শিশুর এই স্বাধীনতার চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকলে তার মধ্যে নেতিমনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং হয় সে আত্মকেন্দ্রিক ও বহির্জগৎ থেকে আত্ম-প্রত্যাহৃত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়, নয় আক্রমণধর্মী ও অপরাধপ্রবণ সমাজবিদ্বেষী রূপে বড় হয়ে ওঠে।

যৌন অপরাধ[1]

শিশু যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় তখন তার নবজাগ্রত যৌন সচেতনতা ধীরে ধীরে যৌন কৌতূহল ও সক্রিয় যৌন আচরণের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন যৌন ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য শিশুর মধ্যে প্রবল কৌতূহল দেখা দেয় এবং তার সেই কৌতূহল সুস্থ উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে অসুস্থ ও অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করে। গুরুতর ক্ষেত্রে এই বিপথগামী যৌন-চাহিদা নানা রকম যৌন অপরাধের রূপ নেয়। বিকৃত যৌন আচরণ, যৌনধর্মী নিপীড়ন, যৌনমূলক আঘাত, অশ্লীল আচরণ, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ ও অশালীন ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বহু রকমের অবাঞ্ছিত যৌন আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। এই ধরনের অপসঙ্গতিগুলি যদি অবিলম্বে দূর করা না হয় তাহলে শীঘ্রই সেগুলি গুরুতর অপরাধপ্রবণতায় পর্যবসিত হয়।

1. Sex Offences

যৌন অপরাধ গুরুতর অপসঙ্গতির ফল। যৌবনাগমে স্বাভাবিক যৌন-চাহিদার তৃপ্তি না হলে তা যৌন অপরাধের রূপ নেয়। অতএব যৌন অপরাধ দূর করার উপায় হল যাতে শিশুর যৌন চাহিদা বিকৃত পথে না যায় তার জন্য তাদের যৌন চাহিদাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করা। তাছাড়া জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনযাপন করা যায় সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে যুক্তিধর্মী আলোচনা করলে এই ধরনের অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন আর যায় না। এর জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় স্তর থেকেই সুপরিকল্পিত যৌনশিক্ষা দানের আয়োজন করা।

অপসঙ্গতির অন্যান্য রূপ

এছাড়া অপসঙ্গতি আরও বিভিন্ন রূপে গ্রহণ করতে পারে। যেমন, স্বার্থপরতা, বদমেজাজ, একগুয়েমী, অবাধ্যতা ইত্যাদি। এগুলি সবই অপসঙ্গতির লক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আগের মত কোন না কোন মৌলিক চাহিদার তৃপ্তির অভাব থেকেই এগুলি জন্মলাভ করেছে। এগুলিকে দূর করতে হলে যে সকল অতৃপ্ত কামনা থেকে অপসঙ্গতি জন্মলাভ করেছে সেই কামনাগুলি খুঁজে বার করতে হবে এবং সেগুলির তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুশীলনী

১। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কাকে বলে? শিক্ষার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কি সম্পর্ক বর্ণনা কর।

২। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদাতার কর্তব্য বর্ণনা কর।

৩। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝ? কি ভাবে শিশুদের এই স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা যায়?

৪। অপসঙ্গতি কাকে বলে? অপসঙ্গতির কারণ বর্ণনা কর।

৫। অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু কাকে বলে? অপসঙ্গতির কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রের বর্ণনা কর।

সাতচল্লিশ

অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসা

অপসঙ্গতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করাটা অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য অপরিহার্য। অপসঙ্গতির বাহ্যিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। একই মানসিক সমস্যা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তেমনই আবার একই অপসঙ্গতিমূলক আচরণের মূলে থাকতে পারে বিভিন্ন মানসিক কারণ। অতএব নিছক বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখেই অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন, কোন ছেলের যদি মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস হয় কিংবা কোন মেয়ে যদি ক্লাসে তার সহপাঠিনীদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা না করে, তাহলে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু তাদের এই অপসঙ্গতির কারণ তাদের এই সব বাহ্যিক আচরণ থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা ছেলেটির চুরি করার প্রবণতা কিংবা মেয়েটির লাজুকতার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা থেকে সুরু করে স্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা প্রভৃতি বহু রকম মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি থাকতে পারে। অতএব অপসঙ্গতির যথাযথ চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা।

সাধারণ অপসঙ্গতির স্বরূপ নির্ণয় করার দুটি সোপানের উল্লেখ করা যায়। যথা, তথ্যসংগ্রহ ও সংব্যাখ্যান।

১। তথ্যসংগ্রহ ঃ সাক্ষাৎকার ও অবাধ অনুষঙ্গ

অপসঙ্গতির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে শিশুর সমস্যাটি সম্বন্ধে চিকিৎসককে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সংগ্রহের নানা পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হল সাক্ষাৎকার[1]। অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুটির সঙ্গে চিকিৎসক প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে তার সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করেন। সমস্যাটি কি প্রকৃতির, কবে থেকে সুরু হয়েছে এবং তার সৃষ্টির প্রকৃত কারণ কি—এই মূল্যবান তথ্যগুলি চিকিৎসক শিশুর সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংগ্রহ করেন। বলা বাহুল্য, এই সাক্ষাৎকার একবারে বা একদিনেই শেষ হয় না। বহুদিন ধরে ও বহু ধৈর্যপূর্ণ ঘণ্টা কাটানোর পর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। অপসঙ্গতির চিকিৎসায় এই সাক্ষাৎকারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মনে যদি চিকিৎসক যথেষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কখনই

1. Interview

তিনি সংগ্রহ করতে পারেন না। ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে কোন চিকিৎসকই সাক্ষাৎকারকে সফল করে তুলতে পারেন না।

তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করলেও মনঃসমীক্ষণ গোষ্ঠীভুক্ত চিকিৎসকেরা এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে মোটেই কার্যকর বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটিই[1] হল শিশুর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র কার্যকর পন্থা। প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণবিদ্ ফ্রয়েড এই অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির উদ্ভাবক। তাঁর মতে শিশুর সমস্যা বা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করতে হলে তার অচেতন মনের গভীর তলদেশে অনুসন্ধান চালান অপরিহার্য। সাধারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুর সেই অজ্ঞাত মনের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সেই জন্য অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ না থাকলেও এই পদ্ধতিটি শিশুদের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে সব সময় প্রয়োগ করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক, সময়সাপেক্ষ ও শ্রমবহুল। সেই জন্য অনেক আধুনিক মনোবিজ্ঞানীই সাধারণভাবে সরাসরি প্রত্যক্ষ আলোচনার উপর নির্ভর করে থাকেন।

২। সংব্যাখ্যান

তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী সোপান হল সংব্যাখ্যান[2]। ব্যক্তির কাছ থেকে যে সব তথ্য চিকিৎসক সংগ্রহ করেন সেগুলির যথাযথ সংব্যাখ্যানের উপরই চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে শিশু এমন বহু অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করে থাকে যেগুলির সঙ্গে প্রকৃত সমস্যার কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক ত নেইই, উপরন্তু সেগুলি নানাভাবে প্রকৃত সমস্যাটিকে আবৃত করে রাখে। চিকিৎসকের কাজ হল এই অজস্র তথ্যের মধ্যে থেকে প্রকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি খুঁজে বার করা এবং সেগুলির নির্ভুল সংব্যাখ্যান দেওয়া। মনঃসমীক্ষণের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতেও স্তূপীকৃত তথ্য মনঃসমীক্ষকের হাতে পৌঁছয় এবং সেগুলির মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনা বা কারণটি তাঁকে সযত্নে খুঁজে বার করে নিতে হয়।

সংব্যাখ্যানের কাজটিই অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় মেলে। বস্তুত সমস্যাটির যথাযথ সংব্যাখ্যান পেলে তার সমাধান আর দূরবর্তী থাকে না। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই এই সংব্যাখ্যানের নিজস্ব পদ্ধতি ও রীতি আছে। মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসকদের সংব্যাখ্যানের পদ্ধতি অনেক গভীর ও ব্যাপকধর্মী। তাঁদের মতে সমস্ত মানসিক

1. Free Association 2. Interpretation

সমস্যার মূলেই আছে অচেতন মনের প্রভাব। মানুষের সচেতন মনে তার জটিল সমস্যাগুলির কোনও প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই জন্যই তাঁরা কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী নন। মনঃসমীক্ষকেরা অপসঙ্গতির সমস্ত সংব্যাখ্যান অচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই দেবার চেষ্টা করে থাকেন এবং তাঁদের চিকিৎসার পদ্ধতিও অচেতন মনের দ্বন্দ্ব বা বৈষম্য দূরীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যে সব মনোবিজ্ঞানী মনঃসমীক্ষণ গোষ্ঠীভুক্ত নন তাঁরাও অচেতন মনের অপরিসীম শক্তি ও প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। যদিও তাঁরা মনঃসমীক্ষকদের মত সমস্ত মানসিক সমস্যার মূলে একমাত্র অচেতনের ভূমিকাকে স্বীকার করেন না তবু মানসিক সমস্যার সৃষ্টিতে অচেতন মন যে প্রধানতম শক্তিরূপে কাজ করে থাকে সে বিষয়ে তাঁরা কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না। এই জন্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যে সব তথ্য তাঁদের হাতে পেঁছিয় সেগুলির সাহায্যে তাঁরা অচেতন মনের কার্যকলাপ অনুমানের চেষ্টা করে থাকেন। তাঁদের মতে সাধারণ ধরনের ও সরাসরি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়েই অচেতন মনের কার্যকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই সব তথ্যের সাহায্যে সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হয়।

অপসঙ্গতির চিকিৎসা

অপসঙ্গতির সমস্যাটির স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের পরবর্তী সোপান হল তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। এখানে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। শিশুর মানসিক ব্যাধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন এবং তাঁদের সেই বিভিন্ন তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে।

১। অচেতন উদ্‌ঘাটন

মানসিক অপসঙ্গতির ক্ষেত্রে যে চিকিৎসার পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণভিত্তিক পদ্ধতিটি। ফ্রয়েডের পূর্বে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে সম্মোহন পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হত। মনোবিজ্ঞানীরা চিরকালই এ সিদ্ধান্ত করে এসেছেন যে ব্যক্তির মনের মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কোনও অবদমিত অতৃপ্তি থেকেই মানসিক ব্যাধি বা অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু মনের গভীর তলদেশে নিহিত এই মানসিক দ্বন্দ্ব বা অপসঙ্গতির সন্ধান সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। তার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

যেহেতু কোন অবদমিত চিন্তা, ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে সেহেতু মনঃসমীক্ষক চিকিৎসকেরা একথা মনে করেন যে ব্যক্তির

সেই অবদমিত চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতাটিকে তার সামনে উদ্ঘাটিত করে তুলতে পারলেই তার মানসিক অপসঙ্গতি দূরে হয়ে যায়। তাঁদের মতে অপসঙ্গতির চিকিৎসার প্রধান অঙ্গই হল অচেতন থেকে অবদমিত দ্বন্দ্বটিকে খুঁজে বার করা। যখন চিকিৎসক ব্যক্তির অচেতনের রহস্যটি উদ্ঘাটিত করতে পারেন তখন তাঁর চিকিৎসার কাজও শেষ হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিকে তার মনের এই অজ্ঞাত রহস্যটির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেন এবং যাতে সে ভবিষ্যতে আর অপসঙ্গতিমূলক আচরণ না করে সে সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দেন। মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই পরামর্শদানই মনোবিকারের চিকিৎসার মূল্যবান অঙ্গ।

যাঁরা মনঃসমীক্ষণবাদে বিশ্বাসী নন তাঁরা তথ্য আহরণের জন্য যেমন অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন না, তেমনই অচেতনের কার্যকলাপের দ্বারা সমস্ত মানসিক অপসঙ্গতির ব্যাখ্যাও তাঁরা দেন না। ফ্রয়েডের দুই প্রাক্তন সহকর্মী ইয়ুঙ এবং অ্যাডলার ফ্রয়েডের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এঁদের মধ্যে ইয়ুঙ ফ্রয়েডের মতই অচেতনের ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ফ্রয়েডের মত তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে অচেতনের কার্যকলাপের অনুসন্ধানকেই সর্বপ্রধান স্থান দেন। কিন্তু অ্যাডলার তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে অচেতনের ভূমিকাকে মোটেই স্বীকার করেন নি এবং ব্যক্তির নিজস্ব প্রত্যাশা ও বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জস্যকেই মনোবিকারের প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। অ্যাডলার ব্যক্তির মানসিক অপসঙ্গতির চিকিৎসার সময় অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতির অনুসরণ করেন না। তিনি ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তার মনের দ্বন্দ্বটির প্রকৃত স্বরূপ জানার চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে অ্যাডলারের ব্যাখ্যায় ব্যক্তির মধ্যে মনোবিকারের তখনই সৃষ্টি হয় যখনই তার নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে ধারণা এবং তার প্রকৃত সামর্থ্যের মধ্যে ব্যবধান বা বৈষম্য অলঙ্ঘনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় মনোবিকারের বহু চিকিৎসক দেখা দিয়েছেন যাদের মধ্যে বেশ বড় একটি দলই ফ্রয়েডীয় পন্থায় পুরোপুরি বিশ্বাসী নন। কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্রয়েডের অচেতন মনের তত্ত্বটি মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং অচেতনের উদ্ঘাটনকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার প্রধানতম অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছেন।

২। আচরণের নিয়ন্ত্রণ

বহু মনোবিকারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরামর্শদানের দ্বারাই ব্যাধির নিরাময় করা সম্ভব হয় না। সেই সঙ্গে ব্যক্তির আচরণকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করারও

প্রয়োজন দেখা যায়। অনেক সময় ব্যক্তি তার মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণটি উপলব্ধি করতে পারলেও বাঞ্ছিত বা উপযুক্ত আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে নিজে থেকে কোন সুপরিকল্পিত আচরণধারা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে ব্যক্তির আচরণ সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় এবং সে যাতে সুনির্দিষ্ট একটি আচরণধারা অনুসরণ করে চলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য চিকিৎসকের একার পক্ষে ব্যক্তির আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তার জন্য ব্যক্তির পরিবারের লোকজন, শিক্ষক, সহকর্মী প্রভৃতি সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

মনে করা যাক কোন একটি শিশুর লেখাপড়ায় উৎকর্ষ প্রদর্শনের মত যথেষ্ট মানসিক শক্তি নেই। তার ফলে তার মধ্যে যে ব্যর্থতা আসে তা থেকে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের আশ্রয় নেয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে লাভ করতে পারল না সেই কাম্য প্রতিষ্ঠা সে আদায় করল অলীক ও মিথ্যা গর্ব বা আস্ফালনের মাধ্যমে বা নানা অবাস্তব সাফল্যের কাহিনী বর্ণনা করে। চিকিৎসক তার এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণের যথার্থ কারণটি যদি তার সামনে তুলে ধরেন তাহলে তার অপসঙ্গতি কিছু পরিমাণে দূর হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মানসিক দ্বন্দ্ব বা ব্যর্থতার অনুভূতি তার দ্বারা লোপ পাবে না। এর জন্য প্রয়োজন লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সে যাতে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে তার উপযোগী পন্থা তাকে দেখিয়ে দেওয়া। শিশুটির প্রকৃতিদত্ত বিভিন্ন শক্তি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোন্ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা আছে এবং তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি দেখা যায় যে শিশুটির খেলাধুলোয় পারদর্শিতা দেখাবার ক্ষমতা আছে বা অভিনয় বা অন্য কোন শিল্পে সহজাত নৈপুণ্য আছে তাহলে তাকে সেই পথে পরিচালিত করে আর সকলের কাছে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করতে হবে। বলা বাহুল্য এই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির অপসঙ্গতি চলে যাবে। এইভাবে শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তার অপসঙ্গতির প্রকৃত নিরাময় দেখা দেবে।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা

ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতিগুলি সব সময় প্রয়োগ করা যায় না কিংবা তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও তাদের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানা সম্ভব হয় না। খুব ছোট ছেলেমেয়েরা ভাষার সাহায্যে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, আলাপ আলোচনা করা ত দূরের কথা। অথচ মানসিক

দ্বন্দ্ব বা অপসঙ্গতি দেখা দেয় খুব অল্প বয়স থেকেই। সে জন্য খুব অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকেরা খেলাভিত্তিক চিকিৎসা[1] পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক শিশুর খেলার মধ্যে দিয়ে তার মানসিক দ্বন্দ্বটির স্বরূপ নির্ধারণ করে থাকেন।

সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিশুর ক্ষেত্রে খেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। তার মনোভাব, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, আশা, চাহিদা সবই তার খেলার মধ্যে দিয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। মনশ্চিকিৎসকগণ অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুকে নানারকম খেলার সুযোগ দেন এবং তার সেই খেলার প্রকৃতি ও গতিধারা দেখে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটির স্বরূপ ধরতে পারেন এবং সেই মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। প্রখ্যাত শিশু মনশ্চিকিৎসক মেলানি ক্লিন[2] ও ফ্রয়েড কন্যা আনা ফ্রয়েড[3] শিশুদের মানসিক চিকিৎসার পদ্ধতিরূপে খেলার বহুল ব্যবহার করে থাকেন।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি

সাধারণত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় প্রথমে অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুকে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি খেলনা, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, নানা রকম জিনিষ তৈরী করার উপযোগী মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড, কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুর সামনে ধরা হয় এবং সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুশী খেলতে বলা হয়।

নানা রকম খেলার সামগ্রী দিয়ে সাজান চিকিৎসাগারের খেলাঘরটিতে শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে বলা হয়, তুমি এগুলির মধ্যে তোমার খুসীমত যে কোন খেলনা নিয়ে খেলতে পার। সেই মুহূর্ত থেকেই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু হয়ে যায়। প্রথমেই চিকিৎসক দেখেন যে তাঁর এই কথার উত্তরে শিশুর মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শিশু উৎসাহের সঙ্গে খেলা সুরু করে, না সে খেলতে ইতস্তত বোধ করে। চিকিৎসক আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে শিশুর খেলা উদ্দেশ্যহীন না উদ্দেশ্যসম্পন্ন, সৃজনমূলক না ধ্বংসমূলক। সবশেষে শিশুর খেলা থেকে চিকিৎসক নির্ণয় করার চেষ্টা করেন যে শিশুর কোন অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব বা দুশ্চিন্তা তার খেলার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। শিশুর খেলার মাঝে মাঝে চিকিৎসক ছোট ছোট উক্তি বা মন্তব্য করে শিশুকে তার মনোভাবটি আরও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেন। অনেক সময় চিকিৎসক নিজেও শিশুর সঙ্গে সক্রিয় ভাবে খেলায় যোগ দিয়ে থাকেন।

বয়স্কদের চিকিৎসার সময় যেমন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন তেমনই শিশুর

1. Play Therapy 2. Melanie Klein 3. Anna Freud

খেলার মধ্যে দিয়েও শিশুর সম্পর্কে চিকিৎসক অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শিশু অবশ্য বয়স্কদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু তবু খেলার মধ্যে দিয়ে সে যা ব্যক্ত করে তা যেমন প্রচুর, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুর ভাষা হল প্রতীক বা চিহ্নের ভাষা। তার বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু তার বক্তব্যটি চিকিৎসকদের সামনে তুলে ধরে এবং অভিজ্ঞ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকের পক্ষে সেই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। নীচের একটি উদাহরণ থেকে খেলাভিত্তিক শিক্ষার পদ্ধতিটি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

ডিক নামে পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে চিকিৎসকের কাছে আনা হল। ছেলেটি সব সময় বিমর্ষ, গম্ভীর ও আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির। প্রথম প্রথম সে চিকিৎসকের সঙ্গে একটিও কথা বলত না। লক্ষ্যহীনভাবে বালি নিয়ে খেলা করত কিংবা বক্সিংয়ের ব্যাগে এক নাগাড়ে ঘুসী মেরে যেত। পরের বারে সে আঙুল দিয়ে ছবি আঁকতে সুরু করল এবং কাগজের উপর উজ্জ্বল রঙ দিয়ে বড় বড় দাগ টানতে লাগল। এইবার সে চিকিৎসকের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা বলতে সুরু করল, কিন্তু তাও অত্যন্ত অল্প এবং সীমিত প্রকৃতির।

কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে তার ভাবভঙ্গী বেশ বদলে গেছে। সে ভালভাবেই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করেছে। চিকিৎসক তার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন এবং তাকে তার নিজের খুশীমত খেলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ডিক হঠাৎ একটি খেলাঘরের বাড়ীর কাছে গেল এবং তার ভেতর থেকে পুতুলগুলি টেনে টেনে বার করতে লাগল আর ভীষণ উত্তেজিতভাবে নিজের মনে মনে কি বলতে লাগল। তারপর একসময় মা'র পোষাক পরা পুতুলটি টেনে বার করে খেলার বাড়ীর দেওয়ালে সজোরে ছুঁড়ে মেরে চীৎকার করে বলে উঠল, এইবার যাও। তার সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

চিকিৎসক ডিককে তাঁর কাছে সস্নেহে টেনে নিয়ে এসে বললেন, সময় সময় মার উপর তোমার খুব রাগ হয়, তাই না ডিক। ডিক কান্নায় ফেটে পড়ে চিকিৎসকের কোলে মুখ লুকাল।

উপরের দৃষ্টান্তটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে শিশুর মনের অবদমিত চিন্তাকে তার খেলার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করানই এই পদ্ধতিটির প্রধানতম লক্ষ্য। শিশু যাতে বিনা দ্বিধায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং তার মনের দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ বা ক্রোধাত্মক চিন্তা চিকিৎসককে অকপটে জানাতে পারে তার জন্য তাকে উৎসাহিত করা হয়। এর জন্য যে বস্তুটির বিশেষ করে প্রয়োজন হয় সেটি হল শিশুর সঙ্গে

চিকিৎসকের একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। শিশু যদি চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখে এবং তাঁকে তার সত্যকারের হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে তাহলে তার মনের অবদমিত চিন্তা ও প্রক্ষোভ তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করতে সে দ্বিধা করে না।

শিশুর মনের অবদমিত চিন্তা ও রুদ্ধ কামনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে শিশুর অপসঙ্গতির চিকিৎসা করা চিকিৎসকের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। খেলাভিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমত, শিশুর অবদমিত প্রক্ষোভ ও আবেগ বাইরে অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে শিশুর মনের মধ্যে সমতা ও স্থৈর্য ফিরে আসে এবং তার অপসঙ্গতির অনেকখানি তখনই দূর হয়ে যায়। বস্তুত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় এই রুদ্ধ প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই চিকিৎসার প্রধানতম অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, এই অভিব্যক্ত মনোভাব ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসক তার যথাযথ চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু পরীক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে এর কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায়

অপসঙ্গতি হল শিশুর কোন মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তির ফল। চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকার ফলে মনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তার বহিঃপ্রকাশ হল অপসঙ্গতিমূলক আচরণ। অতএব ভীরুতা, আক্রমণধর্মিতা, ক্লাসপালানো, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, যৌন-অপরাধ প্রভৃতি যে সব আচরণকে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলে অভিহিত করা হয়, সেগুলির কোনটিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাধি নয়, সেগুলি হল ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণমাত্র। প্রকৃত ব্যাধি নিহিত থাকে মনের মধ্যে অতৃপ্ত চাহিদার রূপে। অতএব অপসঙ্গতির চিকিৎসা করতে হলে ঐ লক্ষণগুলির কেবলমাত্র চিকিৎসা করলে চলবে না। অর্থাৎ শিশুর ভীরুতা বা আক্রমণধর্মিতাকে পরিবর্তিত করা কিংবা ক্লাসপালানো, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে দমন বা নিবারণ করার চেষ্টা করলেই হবে না। শিশু মনের গভীর স্তরে নিহিত যে অতৃপ্ত কামনার জন্য এই আচরণটি সে সম্পন্ন করছে সেই অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি করার ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় অপসঙ্গতির চিকিৎসা নিছক লক্ষণমূলক হবে না, হবে উৎসমূলক। চিকিৎসা করতে হবে অপসঙ্গতির লক্ষণের নয়, অপসঙ্গতির প্রকৃত উৎসের।

যে সব মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য সেগুলি যাতে ব্যাহত না হয় তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে সর্বাগ্রে। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, স্বাধীনতা ও দায়িত্বপালনের চাহিদা, সামাজিক পরিচিতির চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা—প্রভৃতি শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি যাতে অবশ্যই স্কুলে, বাড়ীতে, প্রতিবেশীদের কাছে সর্বত্র তৃপ্তিলাভের সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এ সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষকদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হল।

১। সুষম খাদ্য

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্পর্ক। শরীর যদি সুস্থ বা যথোচিত পুষ্ট না থাকে তাহলে প্রক্ষোভমূলক সাম্য বজায় থাকে না। অজীর্ণ, ক্ষুধার অভাব, খাদ্যে বিরাগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে বিরক্তি ও অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে পরে জাগে অপসঙ্গতির প্রবণতা। এজন্য সুষম খাদ্য হল মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রধানতম উপকরণ। দেহের প্রয়োজনমত সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করলে শিশুদের শরীর সুস্থ ও সুপুষ্ট থাকবে এবং সহজে অপসঙ্গতি দেখা দেবে না।

২। ব্যায়াম ও খেলাধূলা

কেবল সুষম খাদ্য হলেই হবে না, শরীরের সুপুষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলে পরিপাচন প্রক্রিয়ার কোন ত্রুটি দেখা দেবে না এবং স্বাস্থ্য সবল হয়ে উঠবে। তার ফলে শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সহজে অপসঙ্গতি দেখা দেবে না। তাছাড়া ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে অপসঙ্গতিমূলক অস্থিরতা বা চঞ্চলতা উপশমিত হয়ে থাকে। শিশুর ক্ষেত্রে খেলা হল প্রকৃষ্ট ব্যায়াম। অতএব শিশু যাতে খেলার পর্যাপ্ত সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। বিশ্রাম

পর্যাপ্ত বিশ্রামও শিশুর মানসিক সমতা রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে ক্ষয় হয় তা পূরণের জন্য যেমন প্রয়োজন সুষম খাদ্যের, তেমনই প্রয়োজন বিশ্রামের। রাত্রে পর্যাপ্ত ঘুম ছাড়াও কাজের মধ্যে শিশু যাতে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম পায় তার উপযুক্ত আয়োজন রাখতে হবে।

৪। ইন্দ্রিয়মূলক উৎকর্ষ

কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে নানা কারণে ইন্দ্রিয়মূলক দোষ দেখা যায়। বিশেষ করে চোখের বা কানের দোষ অনেকেরই মধ্যে থাকে এবং ফলে তারা ভালভাবে দেখতে বা শুনতে পায় না। এই সব ছেলেমেয়ের পক্ষে ক্লাসে বোর্ডের লেখা দেখায় বা শিক্ষকদের পাঠ শোনায় প্রচুর অসুবিধা হয়। তার ফলে এদের মধ্যে একটা বিরক্তি ও ব্যর্থতার মনোভাব সৃষ্ট হয়। এই থেকে শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জন্ম নেয় এবং তা থেকে পরে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে।

সেজন্য ছেলেমেয়েরা যাতে কোন রকম ইন্দ্রিয়ঘটিত অসামর্থ্য থেকে না ভোগে সেদিকে যত্ন নেওয়া তাদের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত

চিকিৎসককে দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে তাদের চোখ, কান বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার দোষ আছে কিনা এবং থাকলে সে দোষ যে ভাবে দূর করা যায় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

স্কুলে বা বাড়ীতে সর্বত্রই ছেলেমেয়েরা যে পরিবেশে বাস করে তা যাতে স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে যতটা সম্ভব মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে শিশুর বিকাশমান দেহ-মনের জন্য পর্যাপ্ত আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে দেখা দেয় প্রক্ষোভমূলক অসমতা এবং তা অপসঙ্গতির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

৬। জানার আগ্রহ ও কৌতূহলের তৃপ্তি

বিকাশমান শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে তার বাইরের জগতের বস্তুগুলিকে সে ভাল করে চিনতে এবং জানতে চায়। তার কৌতূহল একরকম অসীম বললেই চলে। নতুন কিছু দেখলেই সে নানারকম প্রশ্ন করে, হাত দিয়ে বস্তুটি নাড়াচাড়া করে, বস্তুটি কি তা সে বলতে চায়। শিশুর কৌতূহলের পরিতৃপ্তি হওয়া তার মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন তার প্রক্ষোভমূলক সুসঙ্গতির জন্য। তাছাড়া তার এই স্বাভাবিক কৌতূহলকে গঠনমূলক পথে পরিচালিত করে তাকে বাঞ্ছিত আচরণ ও জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৭। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান

প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের আর একটি উপায় হল শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলামেশা ও তাদের নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদানের সুযোগ দেওয়া। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দলের সংযোগে এসে শিশুর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়, মনের উদারতা বাড়ে, মানসিক সাম্য বজায় থাকে এবং ছোটখাট ঘটনা বা ব্যাপার তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না।

সামাজিক মেলামেশা অপসঙ্গতিকে দূরে রাখার একটি প্রশস্ত উপায়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখা প্রতিটি সুপরিচালিত কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত।

৮। পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ

শিশু একটু বড় হলেই তার মধ্যে অপরের কাছ থেকে পরিচিতি বা স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা জাগতে থাকে। এই ইচ্ছার তৃপ্তির উপর নির্ভর করে তার নিরাপত্তাবোধ। যদি শিশু কোন না কোন দিক দিয়ে নিজের মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে তার

মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধের সৃষ্টি হয়। অথচ সকল ছেলেই লেখাপড়ায় ভাল ফল করতে পারে না। অতএব স্কুলের পাঠক্রমে লেখাপড়া ছাড়াও খেলাধুলা, অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, বিভিন্ন শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েরও পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে যাতে শিশু তার নিজস্ব প্রকৃতিদত্ত শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রটি খুঁজে পায় এবং তার অহংসত্তাকে কোন বিশেষ দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৯। ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

শিশুদের প্রাক্ষোভিক সঙ্গতিবিধানের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। সে যে সমাজের আর দশজনের মত একজন এবং অন্যান্য সকলের মত তারও স্থান যে স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এটা যদি শিশু বুঝতে পারে তাহলে সহজে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। এর জন্য প্রয়োজন শিশুকে ভালবাসা, তাকে আপন করে নেওয়া এবং তাকে কখনও মনে করতে না দেওয়া যে সে অবহেলিত বা পরিত্যক্ত। এ থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা দেবে অতিপ্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার ফলে তার ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিক পন্থায় ও সুষমভাবে গড়ে উঠবে।

১০। অন্যান্য চাহিদার পরিতৃপ্তি

এ ছাড়া শিশুদের বিবিধ চাহিদাগুলি যাতে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে তার আয়োজন করাই অপসঙ্গতি নিবারণের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। এগুলির মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করছে শিশুর প্রাক্ষোভিক সমতা ও অপসঙ্গতির নিরাময়।

অনুশীলনী

১। অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২। খেলাভিত্তিক চিকিৎসা কাকে বলে? অপসঙ্গতির চিকিৎসায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ বর্ণনা কর।

৩। অপসঙ্গতি নিরাময়ের পন্থা বর্ণনা কর।

৪। শিশুর অপসঙ্গতি নিরাময়ের ক্ষেত্রে কি কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত বল।

আটচল্লিশ

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা[1]

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাকে সমুন্নত ও অধিকতর কার্যকর করার জন্য যে সব নতুন নতুন প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপক পরিকল্পনাটি। প্রাচীন কালে শিক্ষার মধ্যে তেমন কোনও বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা ছিল না, তার ফলে সকল শিক্ষার্থীই মোটামুটি একই পাঠধারা অনুসরণ করতে বাধ্য হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই শিক্ষার পাঠক্রমে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা প্রবর্তিত হল এবং শিক্ষার্থীকে বহু পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে থেকে নিজের পাঠ্যবিষয়গুলি নির্বাচিত করে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হল। এই নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে দেখা দিল এক নতুন সমস্যা। শিক্ষার্থীকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও তার নির্বাচন যে সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর যদি কোন কারণে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে তার ভুল হয়ে যায় তাহলে তার শিক্ষা যে কেবলমাত্র আয়াসবহুল ও অপচয়ময় হবে তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠবে। বর্তমানে এই চিন্তার ফলেই দেখা দিয়েছে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে সুপরিচালনার পরিকল্পনাটি।

সুপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাবিদরা বহুদিন থেকে উপলব্ধি করলেও শিক্ষার্থীর সুপরিচালনার জন্য যে সব উপকরণ ও জ্ঞানের প্রয়োজন সেগুলি এতদিন তাঁদের আয়ত্বে ছিল না। তার ফলে শিক্ষার্থীকে সত্যকারের সুপরিচালনা দেওয়া এতদিন সম্ভবই হয় নি। গত পঞ্চাশ বৎসরে ব্যক্তির মানসিক শক্তি ও বিভিন্ন সহজাত বৈশিষ্ট্য পরিমাপের যে সব অভিনব আধুনিক অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি বর্তমানে সুপরিচালনাকে সম্ভবপর করে তুলেছে। শিক্ষার্থীকে সত্যকারের কার্যকর সুপরিচালনা দিতে হলে দুটি বস্তুর প্রয়োজন। প্রথমত, শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কার্যকর বিস্তারিত জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর প্রকৃতিদত্ত শক্তি ও আগ্রহ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। এই দু'ধরনের জ্ঞান না থাকলে সুপরিচালনা দান সম্ভবই হয় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশদ্ জ্ঞান আহরণ করা শক্ত হয় না। কিন্তু শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ শক্তি ও আগ্রহের স্বরূপ জানতে হলে নানাবিধ মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ যন্ত্রের প্রয়োজন। আধুনিক অভীক্ষাগুলি সে প্রয়োজন অনেকখানি মিটিয়েছে।

---

1. Educational and Vocational Guidance

সুপরিচালনার ব্যাপক অর্থ ও উপযোগিতা

সুপরিচালনার সমস্যাটি প্রথম দেখা দেয় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পাঠধারা ও বৃত্তি নির্বাচন সম্পর্কে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোন্ পাঠধারা অনুসরণ করবে এবং কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে—এ দুটি বিষয় সম্বন্ধে তাকে পরিচালিত করা বা নির্দেশ দেওয়াই এতদিন সুপরিচালনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে সুপরিচালনাকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে কেবলমাত্র পাঠধারা ও বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করার প্রয়োজন থাকে তা নয়, তার সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে যাতে সে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে সে সম্বন্ধে তাকে সাহায্য দেওয়া ও পরিচালিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

আমাদের সমাজজীবন যতই উন্নত ও প্রগতিশীল হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীর চারপাশের পরিবেশও তত বিচিত্র ও জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিভিন্নধর্মী পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থী যদি ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটিই অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন দুইই ব্যর্থতাময় হয়ে ওঠে। অতএব কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পাঠধারা ও বৃত্তি সম্বন্ধেই তাকে পরিচালিত করলে চলবে না, তার সামগ্রিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি যাতে অনুকূল ও স্বাস্থ্যময় পথ ধরে এগোতে পারে তার ব্যবস্থা করাও সুপরিচালনার কার্যসূচীর অন্তর্গত।

এই জন্য আধুনিক সুপরিচালনার কার্যসূচী ব্যক্তিজীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্র তিনটি হল—

১। ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুপরিচালনা, ২। শিক্ষাগত সুপরিচালনা এবং ৩। বৃত্তিগত সুপরিচালনা।

১। ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুপরিচালনা[1]

সুপরিচালনার ব্যক্তিগত ও সমাজগত সমস্যাগুলি বলতে ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গতিবিধানের সমস্যাগুলিকেই বুঝিয়ে থাকে। শিক্ষার্থী যত বড় হয় তত তার জীবনকে ঘিরে নানারকম জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা সে অর্জন করে। সেগুলিকে ঠিকমত তার মানসিক সংগঠনের সঙ্গে সমন্বিত করা তার মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। আধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল সংঘর্ষময় সমাজে শিক্ষার্থী সব সময় এই ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে উঠতে পারে না। তেমনই শিক্ষার্থীকে তার চার পাশের সমাজের নানা বিভিন্ন ব্যক্তি ও শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে হয়। তার সুষ্ঠু সমাজজীবনের

1. Personal and Social Guidance

জন্য এই সঙ্গতিবিধান অপরিহার্য। কিন্তু আধুনিক জটিল সমাজে এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সব সময় সহজ হয় না এবং অনেক সময় নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

সুপরিচালনার বিষয়বস্তু হল সমগ্র শিশু-সমাজ। অতএব শিশু যাতে তার ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন—এই উভয় জীবনেই সার্থক ও সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে তার জন্য তাকে সুপরিচালনা দান করা আধুনিক শিক্ষাসূচীর অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে।

২। শিক্ষাগত সুপরিচালনা[1]

সুপরিচালনার দ্বিতীয় সমস্যা হল শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষার স্বরূপ নিয়ে। যে বিশেষ শিক্ষাধারা বা পাঠপ্রবাহ শিক্ষার্থীর উপযোগী সে সম্বন্ধে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া বা উপযুক্ত পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষাগত সুপরিচালনার লক্ষ্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন মানসিক শক্তি, আগ্রহ ও দক্ষতা নিয়ে জন্মায়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীতে বিরাট পার্থক্য। অতএব সব রকম পাঠধারাই সকলের উপযোগী নয়। বুদ্ধি ছাড়াও এমন কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি আছে যেগুলির দিক দিয়েও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষার ধারা পৃথক হওয়া উচিত। বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি অনুযায়ী কোনও শিক্ষার্থীর পক্ষে সাহিত্যমূলক পাঠধারা উপযোগী কারও পক্ষে আবার কারিগরি, যন্ত্রশিল্প বা অন্য কোনও পাঠধারা উপযোগী। যে সব ছেলেমেয়ে অধিক সাধারণ বুদ্ধি এবং ভাষামূলক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারা সাহিত্য এবং ভাষার উন্নত পাঠধারা অনুসরণ করলে উপকৃত হয়। যারা সংখ্যামূলক বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তাদের পক্ষে গণিতধর্মী পাঠধারা অনুসরণ করা বিধেয়। তেমনই যে সব শিক্ষার্থীর মধ্যে যন্ত্রঘটিত বিশেষ শক্তি থাকে তাদের ক্ষেত্রে কারিগরি বা যন্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট পাঠক্রম সবচেয়ে উপযোগী। এইভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী পাঠধারাটি নির্ধারিত করা না হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও অপচয়ময় হয়ে ওঠে।

অথচ আজকাল এত নতুন নতুন পাঠধারার উদ্ভব হয়েছে যে শিক্ষার্থীর নিজের পক্ষে তার উপযোগী পাঠক্রম নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। এর জন্য যে অভিজ্ঞতা, বিচার ক্ষমতা, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর নিজের মানসিক শক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন তা শিক্ষার্থী বা তার পিতামাতা অভিভাবকদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

তার ফলে পাঠপ্রবাহের নির্বাচন শিক্ষার্থীর পিতামাতা বা তার অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের পছন্দ মত শিক্ষণীয় পাঠপ্রবাহ

---

1. Educational Guidance

নির্বাচন করে থাকেন। দেখা গেছে, সমাজে যে সব বিষয়ের শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য অধিক বলে বিবেচিত হয়ে সেই বিষয়গুলিই সাধারণত শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর শক্তি ও আগ্রহের উপযোগী কিনা সে বিচার কেউই করেন না। এর ফলে শিক্ষার্থী সেই বিষয়গুলিতে সন্তোষজনক ফল ত দেখাতে পারে না বরং শিক্ষার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যটিও তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ সেই শিক্ষার্থীকেই যদি তার সামর্থ্য ও আগ্রহের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে দেওয়া হত, তাহলে তার শিক্ষা সন্তোষজনক ও সার্থক হয়ে উঠত।

এইজন্য আজকাল প্রতি প্রগতিশীল শিক্ষায়তনেই শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠধারা নির্বাচন করার জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ বা সুপরিচালকের সাহায্য নেওয়া হয়।

একথা সত্য, যে কোন ভাল শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সুপরিচালনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবু তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সুপরিচালনা দান করা বিশেষ প্রয়োজন। যথা—(১) পাঠপ্রবাহ ও পাঠসূচীর নির্বাচন, (২) পাঠপ্রবাহ অনুসরণের কার্যকর পদ্ধতির অনুসরণ এবং (৩) নির্বাচিত শিক্ষাধারা ও শিক্ষার্থীর উপযোগী শিক্ষায়তন নির্বাচন।

শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠপ্রবাহ নির্বাচনে প্রথমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করা অপরিহার্য। সাধারণ স্কুলকলেজের পাঠে সাফল্য লাভ করার একটি বড় উপকরণ হল পর্যাপ্ত বুদ্ধি। অতএব শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাণের উপর অনেকখানি তার ভবিষ্যৎ পাঠপ্রবাহের নিবাচন নির্ভর করে। বুদ্ধির পর আসে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিশেষধর্মী মানসিক শক্তিগুলির কথা। ভাষামূলক, সংখ্যামূলক, অবস্থান-মূলক, যন্ত্রমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষ শক্তিগুলির মাত্রা ও পরিমাণের বিচার করে শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠধারা নির্বাচন করা উচিত। আজকাল বুদ্ধি পরিমাপের নানা উন্নত অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ শক্তি ও দক্ষতা পরিমাপের বহু বিশেষধর্মী অভীক্ষা নির্মিত হয়েছে। এগুলির প্রয়োগের দ্বারাই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তির যথার্থ স্বরূপ পরিচালক জানতে পারেন। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য এ সমস্যাটি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বিদেশী ভাষায় অনেক উন্নত অভীক্ষা আবিষ্কৃত হলেও ভারতীয় ভাষায় ও ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উপযোগী অভীক্ষার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ভারতীয় ভাষায় বিশেষ শক্তির কোন অভীক্ষা তৈরী হয়নি বললেই চলে।

মানসিক শক্তি পরিমাপের পর শিক্ষার্থীর আগ্রহ পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। এর জন্যও বিদেশে বহু উল্লেখযোগ্য অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন্ কোন্ শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে তা এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যায় এবং সেইমত তার পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষার পাঠপ্রবাহ বা বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর সুপরিচালনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যে শিক্ষার্থী সুষ্ঠুভাবে সেই পাঠপ্রবাহ অনুসরণ করতে পারছে কিনা তা দেখা। তার জন্য নির্বাচিত পাঠপ্রবাহটি সুষ্ঠুভাবে অনুসরণের জন্য কার্যকর পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিতে হবে এবং সেই পদ্ধতি অনুসরণে তার যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে তা দূর করতে হবে। অনেক সময় প্রতিকূল গৃহ-পরিবেশ বা অস্বাভাবিক বিদ্যালয় পরিবেশ, শিক্ষার্থীর নিজস্ব কোনও অসুবিধা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী প্রভৃতির অভাব—এ সব কারণেও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। যাতে শিক্ষার্থীর এসব অসুবিধা দূর হয় সুপরিচালক তার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন।

এছাড়া দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীর জন্য যে পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করা হল সেটি অনুসরণ করার উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐ অঞ্চলে আছে কিনা এবং থাকলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেখানে যোগদান করে ঐ পাঠপ্রবাহ অনুসরণ করা সম্ভব কিনা। শিক্ষাগত সুপরিচালনার এই বাস্তব দিকটি সম্বন্ধেও সুপরিচালককে সচেতন থাকতে হবে।

৩। বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা[1]

পাঠপ্রবাহের মত উপযুক্ত বৃত্তির নির্বাচনও বর্তমান কালে বিশেষ জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, কারিগরি প্রভৃতির অকল্পনীয় প্রসারের ফলে শিক্ষার্থীর সামনে আজ এক সঙ্গে বহু বৃত্তির পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অথচ কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করতে হলে বিশেষ মানসিক শক্তি, দক্ষতা ও আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। যদি বৃত্তির নির্বাচন ব্যক্তির মানসিক শক্তি ও সংগঠনের উপযোগী না হয় তাহলে সে বৃত্তি অন্যান্য দিক দিয়ে যতই আকর্ষণীয় হোক্ না কেন, তা অবশ্যই তার অসাফল্যের কারণ হবে, তার মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করবে এবং তার জীবনে ব্যর্থতা আনবে। তাছাড়া নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও তার কাছ থেকে আশানুরূপ কাজ পাবেন না। ফলে অর্থ, সময় ও মানবশক্তি সবেরই অযথা অপচয় ঘটবে। অথচ বৃত্তিটি যদি ব্যক্তির মানবশক্তি শক্তি ও আগ্রহের সঙ্গে স্যামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তার বৃত্তিতে সে সাফল্য লাভ করবে, নিয়োগকারীও সন্তোষজনক কাজ পাবেন এবং জাতীয় আয়ভাণ্ডারটিও সমৃদ্ধ হবে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের দিক দিয়েই প্রত্যেক ব্যক্তির বৃত্তির সুনির্বাচন অবশ্য প্রয়োজন। এই

1. Vocational Guidance

কারণে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা আধুনিক শিক্ষাপরিকল্পনার একটি বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিচালকের বিশদ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। যথা, ১। ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে তার মানসিক শক্তি, দক্ষতা, শিক্ষা, আগ্রহ এবং অন্যান্য ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি, ২। প্রচলিত বিভিন্ন বৃত্তির স্বরূপ এবং সেগুলিতে সাফল্যলাভ করতে হলে যে যে ধরনের মনোবিজ্ঞানমূলক গুণাবলী থাকা দরকার, ৩। বিভিন্ন বৃত্তিতে যোগ দেবার কি সুবিধা আছে, ৪। কোনও বৃত্তি গ্রহণ করতে হলে কি ধরনের শিক্ষা বা দক্ষতার প্রয়োজন এবং ৫। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের কি ধরনের ব্যবস্থা বা সুবিধা আছে।

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনাতে প্রথমে ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করতে হয়। এমন অনেক বৃত্তি আছে যেগুলির সাফল্য উন্নত বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। পরিশাসনমূলক কর্মী, আইনজীবী, শিক্ষক, বিচারক, ব্যবসায় পরিচালক প্রভৃতি পদের জন্য উচ্চমানসম্পন্ন বুদ্ধির প্রথমেই প্রয়োজন। তাছাড়া সব বৃত্তিতেই অল্পবিস্তর বুদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য। বৃত্তির নির্বাচনে অবশ্য বিশেষধর্মী মানসিক শক্তিগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, কেননা বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিন্ন বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয়। যেমন, লেখাপড়া-ঘটিত বৃত্তিতে ভাষামূলক শক্তির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। তেমনই কারিগরি বা যন্ত্রশিল্পঘটিত কাজে যন্ত্রমূলক শক্তি থাকা একান্ত আবশ্যক। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, বড় বড় ব্যবসায়ের হিসাব গণনার কাজ প্রভৃতিতে সংখ্যামূলক শক্তি থাকাটা অপরিহার্য। অতএব ব্যক্তি কোন্ ধরনের বিশেষ শক্তির অধিকারী তা নির্ণয় করেই তার বৃত্তির নির্বাচন করা উচিত।

বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বুদ্ধি এবং বিশেষধর্মী শক্তিগুলির পর ব্যক্তির আগ্রহের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। বৃত্তিতে সাফল্যলাভও অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির আগ্রহের উপর। কেননা বৃত্তিমূলক যোগ্যতা আংশিক নির্ভর করে অর্জিত দক্ষতার উপর। এই অর্জিত দক্ষতার মাত্রা আবার নির্ভর করে ব্যক্তির আগ্রহের উপর। যদি ব্যক্তি কোনও বৃত্তিতে আগ্রহ বোধ করে তাহলে সে নিজের প্রচেষ্টায় ঐ বৃত্তিটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নেয় এবং অনেকে ক্ষেত্রে তার সহজাত শক্তির অভাবকে পূরণ করে নিতে পারে।

এছাড়া প্রতিক্রিয়া-কাল, মনোযোগের বিস্তার, স্মৃতির বিস্তার প্রভৃতির পরিমাপও অনেক বৃত্তিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া কাল, মনোযোগের বিস্তার, স্মৃতির বিস্তার প্রভৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। অনেক বৃত্তির ক্ষেত্রে এগুলির মূল্য যথেষ্ট। যেমন, যারা রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী বা বড় বড় মেসিন চালানোর কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল কম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সুপরিচালনার উপকরণাদি

আধুনিক কালে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

বুদ্ধির অভীক্ষা: বিনে-সাইমন স্কেল ও তার ইংরাজী সংস্করণ। বর্তমানে ভারতীয় ভাষায় এই প্রসিদ্ধ অভীক্ষাটির সংস্করণ রচিত হয়েছে। তাছাড়া ওয়েক্সলার-বেলিভিউ টেস্টটিও বুদ্ধির পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যৌথ পরিমাপের জন্যও অনেক যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষা রচিত হয়েছে।

এছাড়াও 'সম্পাদনী অভীক্ষা' নামে একটি বিশেষ অভীক্ষাও বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য গুডএনাফের তৈরী 'মানুষ-আঁকা' অভীক্ষাটিও বহুল ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ শক্তির অভীক্ষা: ভাষামূলক বিশেষ শক্তি, সংখ্যামূলক বিশেষ শক্তি, অবস্থানমূলক বিশেষ শক্তি, যন্ত্রমূলক বিশেষ শক্তি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য বিশেষ বিশেষ অভীক্ষার আজকাল প্রচলন হয়েছে। এই পর্যায়ে নীচের অভীক্ষাগুলির নাম করা যেতে পারে। ষ্টেনকুইস্ট মেকানিক্যাল টেস্ট (যন্ত্রমূলক শক্তির অভীক্ষা), সিসোর মিউজিক্যাল এবিলিটি টেস্ট (সঙ্গীতমূলক শক্তির অভীক্ষা), থার্স্টোনের প্রাইমারি এবিলিটি টেস্ট (প্রাথমিক মৌলিক শক্তিগুলির অভীক্ষা) ইত্যাদি।

আগ্রহের অভীক্ষা: ষ্ট্রং ভোকেসানাল ইন্টারেস্ট ব্ল্যাঙ্ক, কুদের প্রেফারেন্স রেকর্ড, থার্স্টোন ইন্টারেস্ট সিডিউল, গিলফোর্ড-স্নিডম্যান-জিমারম্যান ইন্টারেস্ট সার্ভে ইত্যাদি।

ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা: শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার উপর তার শিক্ষা ও বৃত্তির নির্বাচন অনেকখানি নির্ভর করে। ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা

আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ব্যক্তিসত্তা নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী, রেটিং স্কেল, ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র, প্রতিফলন অভীক্ষা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা : অনেক সময় শিক্ষার্থী কোনও বিশেষ বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়লে সেই বিষয়ে তাকে যথাযোগ্য সুপরিচালনা দানের প্রয়োজন হয়। তখন সেই বিষয়ে তার কোথায় ত্রুটি ও দুর্বলতা তা পরিচালককে নির্ণয় করতে হয়। এর জন্য ত্রুটি নির্ণায়ক অভীক্ষা[1] নামে এক বিশেষ ধরনের অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সুপরিচালনার সমস্যাবলী ও সমাধান

আধুনিক শিক্ষাসংগঠনে সুপরিচালনা যে অপরিহার্য এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিমতের স্থান নেই। কিন্তু সুপরিচালনা দানের ক্ষেত্রে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে ভারতে এই সমস্যাগুলি বিশেষ গুরুতর। সেগুলি হল :—

প্রথমত, সুপরিচালনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে সুপরিচালনার শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে এই বিশেষধর্মী শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য পাওয়া সম্ভব। ভারতে এই ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা একপ্রকার নেই বললেই চলে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুপরিচালক থাকা দরকার। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজস্ব সুপরিচালক রাখা সম্ভব না হলেও, এক একটি বিশেষ অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি যাতে অন্তত একজন সুপরিচালকের সাহায্য পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতে এ ধরনের কোনও আয়োজন এখনও হয়নি।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় স্তর থেকেই সুপরিচালনা দেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে যাতে সকল শিক্ষার্থী সুযোগ পায় তার জন্য রাষ্ট্রকে যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সুপরিচালনাগার[2] খুলতে হবে এবং স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি যাতে সেই সুপরিচালনাগারের সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থত, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুপরিচালনা দানের জন্য বিদ্যালয়েতেই সুপরিচালনা দানে অভিজ্ঞ শিক্ষক-সুপরিচালক[3] প্রয়োজন। সেইজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে শিক্ষক সুপরিচালক তৈরী করতে হবে এবং তার জন্য বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠস্তরের প্রবর্তন করতে হবে।

পঞ্চমত, সুপরিচালনার জন্য তথ্য সংগ্রহে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবও সুপরিচালনা

1. Diagnostic Test 2. Guidance Centre 3. Teacher Counsellor

দানের একটি বড় সমস্যা। অথচ শিক্ষার্থীর সম্বন্ধে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে কার্যকর সুপরিচালনা দান একেবারেই সম্ভব নয়। এর জন্য স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠত, অভিভাবকদের পূর্ণ সহায়তা ছাড়া সার্থক সুপরিচালনা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অভিভাবকেরা সুপরিচালনা দানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নন। সেইজন্য সুপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং যাতে তাঁরা সুপরিচালনার কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করেন তার জন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সপ্তমত, সুপরিচালনা সব সময়েই বাস্তবভিত্তিক হবে। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা তখনই সার্থক হবে যখন বৃত্তিশিক্ষা অর্জনের শেষে শিক্ষার্থী তার নির্বাচিত বৃত্তিতে চাকরী পায় এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য প্রায়ই দেখা গেছে যে উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করার পরও শিক্ষার্থীরা বেকার হয়ে বসে আছে। এ সব ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা সুচিন্তিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হয় না। অতএব বৃত্তিশিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের যতদিন না পর্যাপ্ত সংখ্যক চাকরী দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন বৃত্তি-শিক্ষাই নিরর্থক হয়ে থাকছে এবং তার ফলে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনাদানের কোনও উপযোগিতাই থাকছে না।

অষ্টমত, সুপরিচালনার জন্য যে সব মনোবৈজ্ঞানিক উপকরণের প্রয়োজন ভারতে তার একান্ত অভাব। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মানসিক, প্রাক্ষোভিক, শিক্ষামূলক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ পরিমাপ করার উপকরণ এদেশে এখনও তৈরী হয় নি। অতএব সুপরিচালনার কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এই সব মনোবৈজ্ঞানিক উপকরণগুলি অবিলম্বে প্রস্তুত করা দরকার।

সবশেষে, আমাদের দেশে অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলেই আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত। এখানে অভিভাবক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কারও পক্ষেই সুপরিচালনার জন্য অর্থব্যয় করা সম্ভব নয়। অতএব শিক্ষার্থীদের জন্য সুপরিচালনা দানের যদি সত্যই কোনও ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ করতে হবে রাষ্ট্রকেই। বস্তুত সুপরিচালনা দানের সম্পূর্ণ কার্যসূচীটিকেই বাস্তবে রূপদানের দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে।

কোঠারি কমিশন ও সুপরিচালনার কার্যসূচী

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের বিবরণীতে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সুপরিচালনার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মতে প্রকৃত সুপরিচালনার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে উপদেশ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশেও সহায়তা করবে। এই উদ্দেশ্যে কমিশনের নির্দেশ হল যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে সুপরিচালনার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে, বিদ্যালয়ের পাঠশেষে শিক্ষার্থী ও পিতামাতাদের পাঠপ্রবাহ নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অন্তত একজন করে সুপরিচালনায় অভিজ্ঞ অধ্যাপক থাকবেন। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রতি ১০টি বিদ্যালয়ের জন্য একজন করে পরিদর্শনকারী বিদ্যালয় সুপরিচালক[1] থাকবেন। তাছাড়া সুপরিচালনাকে বৃত্তিরূপে নেবেন এমন ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে শিক্ষণ দেবার আয়োজন করতে হবে।

অনুশীলনী

১। সুপরিচালনা বলতে কি বোঝ? আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার স্থান কি বল?

২। সুপরিচালনা দানের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতির বর্ণনা কর।

৩। ভারতে সুপরিচালনা দানের পথে সমস্যাগুলি বর্ণনা কর। সেগুলির সমাধানের উপায় কি বল।

1. Visiting School Counsellor

দ্বিতীয় খণ্ড

পরিমাপ ও পরিসংখ্যান

এক

শিক্ষায় পরিমাপ (Measurement sn Education)

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পরিবর্তিত ও নূতন পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের জন্য নূতন আচরণ শেখান। কিন্তু কেবল শিক্ষাদান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার পরের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল শিক্ষার্থী সে শিক্ষা সত্যই গ্রহণ করতে পেরেছে কি না এবং যদি পেরে থাকে তাহলে কি পরিমাণে বা কত মাত্রায় সে শিক্ষা সে গ্রহণ করেছে তা দেখা। শিক্ষক যদি এই তথ্যটি জানতে না পারেন তাহলে তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই অন্ধকারে থাকবেন এবং সমগ্র শিক্ষা-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই অনিশ্চিত থেকে যাবে। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকই যে শিক্ষার ফলাফল জানতে আগ্রহশীল তা নয়। শিক্ষার্থী যে সমাজে বাস করে সে সমাজও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, কেন না, সমাজের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি দুই-ই সমাজের অপরিণত নাগরিকদের শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

এই সব কারণেই যে দিন থেকে মানবসমাজে সুপরিকল্পিত শিক্ষা দেবার প্রথা প্রচলিত হয়েছে সেদিন থেকেই পাশাপাশি দেখা দিয়েছে শিক্ষা পরিমাপের পদ্ধতিটি। সব দেশের বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে এবং পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জনসমাজ সকলেই মনে করেন যে শিক্ষার পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি পরীক্ষা গ্রহণেই ঘটে।

শিক্ষায় পরীক্ষা গ্রহণকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করা হলেও প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিটি নানা দিক দিয়ে গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে। সেজন্য গতানুগতিক পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিটির পরিবর্তে আধুনিক কালে নূতন ও উন্নত ধরনের পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। এগুলিকে বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অভীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। গতানুগতিক পরীক্ষা-গুলি রচনাধর্মী অর্থাৎ এই সব পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয় দীর্ঘ রচনার আকারে। ফলে যিনি পরীক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ এমন কি শারীরিক অবস্থা এবং মেজাজও পরীক্ষার ফলাফলকে নানা দিক দিয়ে প্রভাবিত করে। সেইজন্য এই রচনাধর্মী পরীক্ষাগুলি কোন দিক দিয়েই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। অপ রদিকে আধুনিক অভীক্ষাগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে সেগুলির উত্তর সব সময় একই এবং সুনির্দিষ্ট থাকে। তার ফলে পরীক্ষকের কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কোন দিক দিয়েই পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে না। এইজন্য

এগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত-প্রভাবশূন্য অভীক্ষা বলা হয়। কিন্তু গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হলেও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সেটিকে নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। তবে আধুনিক অভীক্ষার যেভাবে দ্রুত উন্নতি ঘটছে, তাতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুলি শিক্ষামূলক পরিমাপের সমগ্র ক্ষেত্রটিই অধিকার করতে পারবে।

ব্যক্তির পরিমাপ (Assessment of the Individual)

সাধারণভাবে বলতে গেলে সমস্ত পরিমাপের বিষয়বস্তু হল শক্তি বা কর্মদক্ষতা। অর্থাৎ কোনও ব্যাপারে বা কাজে একজনের কতটা শক্তি বা দক্ষতা আছে তা নিরূপণ করাই পরিমাপের উদ্দেশ্য। যেমন, কোন ব্যক্তি কত ভারি জিনিস একবারে তুলতে পারে, কত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে, কত নির্ভুলভাবে অঙ্ক কষতে পারে, কত নিখুঁত ও দ্রুত টাইপ করতে পারে বা কতটা পড়া একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিখতে পারে, কত শক্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে কিংবা কতটা সাফল্যজনক ভাবে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে—এই ধরনের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা দক্ষতা নির্ণয় করাই আধুনিক অভীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর অভীক্ষাগুলির দ্বারা একটি বা একাধিক দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে সব পরিমাপের বিষয়বস্তু একটি শক্তি হলেও সরাসরি শক্তিটিকে পরিমাপ করার মত কোন যন্ত্র বা উপকরণ আমাদের নেই। কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমেই ব্যক্তির শক্তির পরিমাপ করাই হল আমাদের পরিমাপের একমাত্র পদ্ধতি। ধরা যাক, আমরা একজনের বুদ্ধির পরিমাপ করতে চাই। সরাসরি ব্যক্তিটির বুদ্ধির পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। সেইজন্য প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষায় ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে বা কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার ঐ সমস্যাগুলির সমাধান বা ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দানের উৎকর্ষের বিচার করে নির্ণয় করা হয় যে তার কতটা বুদ্ধি আছে। অর্থাৎ এক কথায় বুদ্ধির পরিমাপ সরাসরি করা সম্ভব নয়, বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ সম্পাদনের মান ও প্রকৃতির বিচার করে। বুদ্ধির মত আর সমস্ত মানসিক শক্তির পরিমাপের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক কথায় সমস্ত শক্তি বা দক্ষতার পরিমাপ প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না, পরোক্ষভাবেই করা হয়ে থাকে।

শক্তি বা কর্মক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, অর্জিত (Acquired) এবং সহজাত (Inherited)। সেদিক দিয়ে পরিমাপ যন্ত্র বা অভীক্ষা-

গুলিকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথম, অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা এবং দ্বিতীয়, সহজাত শক্তির অভীক্ষা।

আর এক ধরনের অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বারা কোন দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ করা হয় না। সেগুলির দ্বারা প্রধানত কোন বিশেষধর্মী মানসিক ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর অভীক্ষার মধ্যে পড়ে আগ্রহের অভীক্ষা (Interest Test), মনোভাবের অভীক্ষা (Attitude Test), ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা (Personality Test) ইত্যাদি।

১। অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা

(Test of Acquired Knowledge or Skill)

যে সব জ্ঞান ও দক্ষতা আমাদের অর্জিত সেগুলি পরিমাপের যে সব উপকরণ, সেগুলিকে আমরা অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা (Attainment Test or Achievement Test) বলে থাকি। সাধারণত এই ধরনের অভীক্ষার দ্বারা স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয় বলে এগুলিকে শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test) নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test)

মনে করা যাক কোন বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রেরা ইতিহাসে বা ইংরাজীতে কতটা জ্ঞান আহরণ করল তা জানার জন্য একটি অভীক্ষা তৈরী করা হল। এটিকে আমরা অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা বলব। অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা সাধারণত বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর তৈরী হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন শ্রেণী (Class or Grade) অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ও মানের হয়ে থাকে। যেমন, সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষা বা নবম শ্রেণীর ইংরাজীর অভীক্ষা বা কলেজে ডিগ্রী কোর্সের অর্থনীতি বা মনোবিজ্ঞানের অভীক্ষা ইত্যাদি। তবে অনেক সময় স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষা একসঙ্গে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ পর পর কতকগুলি শ্রেণীকে একত্রিত করেও তৈরী করা হয়ে থাকে।

যদিও তত্ত্বের দিক দিয়ে সহজাত শক্তি ও অর্জিত শক্তি পৃথকধর্মী তবু বাস্তব ক্ষেত্রে এই দুটি শক্তি কখনও পৃথকভাবে অভিব্যক্ত হয় না এবং পৃথকভাবে তাদের পরিমাপ করাও সম্ভব হয় না। কেননা সহজাত শক্তিকে কোন ক্ষেত্রেই অর্জিত দক্ষতা বা জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তার কারণ হল যে কোন প্রকার কাজকর্ম করতে না শিখলে কোন শক্তিকেই বাইরে ব্যক্ত করা যায় না। তেমনই আবার অর্জিত জ্ঞান

বা দক্ষতা মাত্রেই সহজাত শক্তির প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। কারণ, বিভিন্ন সহজাত শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করাই যায় না। অতএব সমস্ত অভীক্ষাই আংশিক সহজাত শক্তি ও আংশিক অর্জিত শক্তির মিশ্রিত ফল পরিমাপ করে থাকে। অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ আবার দু'রকমের হতে পারে। প্রথম, প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষা অর্থাৎ যে সব রচনাধর্মী পরীক্ষা কলেজে বহুদিন ধরে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বিদ্যা পরিমাপ করার জন্য প্রয়োগ করে আসছেন। দ্বিতীয়, আধুনিক বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অভীক্ষা যেগুলি মনোবিজ্ঞানীরা আধুনিক কালে তৈরী করেছেন প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষার দোষত্রুটিগুলি দূর করার জন্য। গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও গঠন ও প্রস্তুতির দিক দিয়ে সেগুলি সর্বত্রই এক প্রকার। এগুলির দ্বারা সাধারণ পাঠক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর কতটা জ্ঞান বা পারদর্শিতা শিক্ষার্থী অর্জন করল তার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী ভাষার পরীক্ষা, ইতিহাসের পরীক্ষা, ভূগোলের পরীক্ষা ইত্যাদি।

গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির নানা দোষ থাকায় এবং সেগুলি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অসম্পূর্ণ ও মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের আধুনিক বিষয়মুখী অভীক্ষা (New-Type Objective Test) তৈরী করেছেন। বস্তুত গতানুগতিক পরীক্ষা ও আধুনিক অভীক্ষার মধ্যে উদ্দেশ্য বা প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের দ্বারাই ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। পার্থক্য যা, তা হল পদ্ধতি এবং সংগঠনের দিক দিয়ে। এই সমস্ত অভীক্ষাই আবার দু'প্রকারের হতে পারে, মাননির্ণীত বা আদর্শায়িত (Standardised) এবং অ-মাননির্ণীত (Unstandardised)। মান-নির্ণীত বা আদর্শায়িত অভীক্ষা বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির এমন একটি মান বা নর্ম (Norm) নির্ণয় করা হয়েছে যার সাহায্যে সমস্ত অভীক্ষার্থীর কৃতিত্বের একটি তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হতে পারে। অভীক্ষাটি যদি মাননির্ণীত বা আদর্শায়িত না হয় তাহলে তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মান বিশেষ একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু সর্বজনীনভাবে তা প্রযোজ্য হয় না। আর আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত অভীক্ষার সুবিধা হল এই যে এর সর্বজনীন মান বা নর্মের সঙ্গে যে কোন অভীক্ষার্থীর সাফল্যের তুলনা করা চলে এবং ঐ তুলনার দ্বারা তার সাফল্যের বা কৃতিত্বের যথাযথ সংব্যাখ্যান দেওয়া সম্ভব হয়। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হল যে এগুলি আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত।

শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক আদর্শায়িত শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলি নানা প্রকৃতির হতে পারে। প্রথমত-

স্কুল কলেজের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর অভীক্ষা গঠিত হতে পারে, যেমন ইংরাজীর অভীক্ষা বা বাংলার অভীক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া পঠন অভীক্ষা (Reading Test), শব্দমালা অভীক্ষা (Vocabulary Test), সংবোধন অভীক্ষা (Comprehension Test), বানান অভীক্ষা (Spelling Test), হস্তলিপি অভীক্ষা (Handwriting Test) ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্গত নানা বিষয়ের উপর শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা তৈরী করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলিকে আবার ব্যক্তিগত (Individual) অভীক্ষা এবং যৌথ (Group) অভীক্ষা—এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[1] ব্যক্তিগত অভীক্ষা বিভিন্ন অভীক্ষার্থীর উপর ব্যক্তিগতভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং যৌথ অভীক্ষা একসঙ্গে অনেকের উপর প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর স্বতন্ত্র-ভাবে প্রয়োগ করতে হয় বলে ব্যক্তিগত অভীক্ষার প্রয়োগে অনেক সময় এবং পরিশ্রম লাগে। কিন্তু একসঙ্গে বহুসংখ্যক অভীক্ষার্থীর উপর যৌথ অভীক্ষা প্রয়োগ করা যায় বলে যৌথ অভীক্ষার সময় ও শ্রম উভয়েরই প্রচুর পরিমাণে সাশ্রয় হয়। যেমন, যদি একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা একজন অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে তবে ৩০ জন অভীক্ষার্থীকে পরীক্ষা করতে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ জন অভীক্ষার্থীর উপর একসঙ্গে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা সম্ভব বলে ৩০ ঘণ্টার কাজটি ১ ঘণ্টায় শেষ করা যায়। যৌথ অভীক্ষার এই বিরাট সুবিধার জন্য আধুনিক কালে অধিকাংশ শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই যৌথ অভীক্ষাধর্মী।

সহজাত শক্তির অভীক্ষা (Test of Inherited Ability)

সহজাত শক্তিকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, সাধারণধর্মী (General) শক্তি ও বিশেষধর্মী (Specific) শক্তি। সাধারণধর্মী শক্তি বলতে বোঝায় সেই শক্তি যা আমাদের সমস্ত কাজের পেছনেই কিছু না কিছু পরিমাণে নিয়োজিত হয়ে থাকে। একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি নাম দিয়ে থাকি। সেই জন্য সহজাত সাধারণধর্মী শক্তির অভীক্ষাগুলি সচরাচর বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) নামে পরিচিত।

বিনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale)

সার্থক বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম সৃষ্টি করার কৃতিত্ব আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামে একজন ফরাসী মনোবিজ্ঞানীর। তাঁর অভীক্ষাটি বিনে-সাইমন স্কেল

1. বুদ্ধির পরিমাপ ঃঃ পৃঃ ৮০—পৃঃ ৯০ (১ম খণ্ড)

(Binet-Simon Scale) নামে খ্যাত।[1] বিনের তৈরী অভীক্ষাটিই প্রথম সাফল্যজনকভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করতে সমর্থ হয় এবং কালক্রমে বিভিন্ন দেশে তাঁর অভীক্ষাটিই বুদ্ধি পরিমাপের আদর্শ উপকরণরূপে গৃহীত হয়।

প্রথমে ১৯১৬ সালে এবং পরে ১৯৩৭ সালে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী টারমান ও মেরিল বিনের স্কেলটির ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং ১৯৬০ সালে এর একটি বিশেষভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই নতুন অভীক্ষাটির নাম বিনে-সাইমন স্কেলের স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ (Stanford Revision)। বর্তমানে এই সংস্করণটি ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিনের স্কেলটি প্রকাশিত হবার পর নানা দেশের মনোবিজ্ঞানীরা নানা বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে থাকেন। সেগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বিনের অভীক্ষার মৌলিক নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই সব মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা ও প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হয়েছে।

ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ও ভাষাবর্জিত অভীক্ষা
(Verbal Test & Non-Verbal Test)

বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সংগঠনের দিক নিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—ভাষাভিত্তিক (Verbal) এবং ভাষাবর্জিত (Non-Verbal) অভীক্ষা। ভাষাভিত্তিক অভীক্ষাতে নানাভাবে ভাষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমত, সেগুলিতে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, নির্দেশ যা দেওয়া হয় তাও ভাষার সাহায্যেই দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, এমন অনেক প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে যেগুলির সমাধান অনেকাংশে বা পূর্ণভাবে ভাষামূলক জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। ফলে এই ধরনের অভীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে হলে অভীক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিমাণে ভাষামূলক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বিনে-সাইমন স্কেল এবং তার বিভিন্ন অনুবাদ ও সংস্করণগুলি এই ধরনের ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা।

কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা প্রয়োগ করে উপযুক্ত ফল পাবার আশা করা যায় না। যেমন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বিদেশী ব্যক্তি বা ভাষাজ্ঞানের দিক দিয়ে যারা দুর্বল প্রকৃতির, তাদের ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষার দ্বারা সুবিচার করা যেতে পারে না। সেইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এক ধরনের ভাষাবর্জিত বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করেছেন। এই শ্রেণীর অভীক্ষায় সমস্যাগুলি ভাষার দ্বারা গঠিত হয় না। অসম্পূর্ণ নক্সা, আংশিক ছবি বা নানা

1. বুদ্ধির পরিমাপ :: পৃঃ ৮০—পৃঃ ৯০ (১ম খণ্ড)

আকৃতির চিহ্ন দিয়ে তৈরী অসম্পূর্ণ সারি (Series) প্রভৃতি সম্পূর্ণকরণের সমস্যা দিয়েই এই ধরনের অভীক্ষাগুলি মূলত তৈরী হয়ে থাকে। ভাষাবর্জিত অভীক্ষা-গুলিতে ভাষার ব্যবহারকে অনেকাংশে বাদ দেওয়া সম্ভব হলেও নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে ভাষাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সমস্যাগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া এবং অভীক্ষার্থীকে কি করতে হবে তা জানানো ভাষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় না। একথা সত্য যে এই সব ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য এবং সেই জন্য এই ধরনের অভীক্ষায় যতটা অল্প ও সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার করা যায় সেদিকে অভীক্ষককে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে যে সব ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীদের ভর্তি করা হয়েছিল তাদের বুদ্ধির পরিমাপের জন্য আর্মি বিটা (Army Beta) নামে একটি ভাষাবর্জিত (Non-Verbal) যৌথ অভীক্ষা (Group Test) তৈরী করা হয়েছিল।

আর্মি বিটা অভীক্ষা (Army Beta Test)

আর্মি বিটা অভীক্ষাটিতে নীচের সাত রকম ভাষাবর্জিত সমস্যা দেওয়া হয়েছে।

(ক) গোলকধাঁধা : কাগজে আঁকা গোলকধাঁধায় পেন্সিলের সাহায্যে পথ বার করা।

(খ) ঘনক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Cube Analysis) : একস্তূপ ঘনক্ষেত্রের মধ্যে কটি ঘনক্ষেত্র আছে তা নির্ণয় করা।

(গ) X—O সারি : X এবং O দিয়ে গঠিত নানা সম্মেলনের অসম্পূর্ণ সারি সম্পূর্ণ করা।

(ঘ) সংখ্যা প্রতীক (Digit Symbol) : সংকেতলিপি (Code) প্রণয়ন বা বিশেষ একটি সাংকেতিক নির্দেশ (Key) অনুযায়ী কতকগুলি সংখ্যাকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা।

(ঙ) সংখ্যা মিল করা : ৩ থেকে ২২ সংখ্যা দিয়ে তৈরী অনেকগুলি অঙ্কের মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টির মিল তা নির্ণয় করা।

(চ) চিত্র সম্পূর্ণকরণ : অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা।

(ছ) জ্যামিতিক অঙ্কন : কতকগুলি রেখা এমনভাবে টানতে হবে যাতে চিত্রটি একটি প্রদত্ত বিশেষ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে।

আর্মি বিটা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাষাবর্জিত অভীক্ষার মধ্যে পিণ্টনার নন-ল্যাঙ্গুয়েজ টেষ্ট (Pintner Non-Language Test), চিকাগো নন-ভার্বাল এগ্‌জামিনেসান (Chicago Non-Verbal Examination) ইত্যাদির নাম করা যায়।

এ ছাড়াও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে আবার আর এক দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—কাগজ-কলম-নির্ভর বা লিখনধর্মী অভীক্ষা (Paper-Pencil Test) ও সম্পাদনী অভীক্ষা (Perfomance Test)। যে সব অভীক্ষার উত্তর নিছক কাগজ কলমে লিখে দেওয়া যায় এবং যেগুলিতে কোন কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয় না, সেগুলিকে কাগজ-কলম নির্ভর বা লিখনধর্মী অভীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। বিনে-সাইমন-স্কেল, আর্মি আলফা স্কেল ইত্যাদি অভীক্ষাগুলি কাগজ-কলম-নির্ভর বা লিখনধর্মী অভীক্ষা।

সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)

আধুনিক কালে আর এক ধরনের নতুন ভাষাবর্জিত অভীক্ষা গড়ে উঠেছে যেগুলিতে কাগজ কলমে লেখার কোন প্রয়োজন হয় না। এই অভীক্ষাগুলিতে মূর্ত বস্তুর সাহায্যে কোন কিছু তৈরী করা, কোন অসম্পূর্ণ বস্তু সম্পূর্ণ করা কিংবা কোন মূর্তধর্মী সমস্যার সমাধান করা প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর সাফল্য বা কৃতিত্বের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সেইজন্য এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)।

প্রাচীনতম সম্পাদনী অভীক্ষাগুলির মধ্যে ইটালিয়ান মনোবিজ্ঞানী সেগুঁইর (Seguin) তৈরী ফর্মবোর্ডের নাম করতে হয়। তিনি ক্ষীণবুদ্ধি (Feeble-minded) ছেলেমেয়েদের ইন্দ্রিয়মূলক ও সঞ্চালনমূলক শিক্ষার জন্য এই ফর্ম বোর্ডের (From Board) উদ্ভাবন করেন। পরে তাঁর এই ফর্মবোর্ড সম্পাদনী অভীক্ষার প্রধানতম অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। সেগুঁইর ফর্মবোর্ডের অভীক্ষাটিতে একটি কাঠের বোর্ডের উপর দশটি বিভিন্ন নক্সার গর্ত আছে এবং সেগুলির মধ্যে ঠিক ঐ নক্সাগুলির আকৃতি বিশিষ্ট দশটি কাঠের টুকরো খাপে খাপে বসিয়ে দেওয়া যায়। অভীক্ষার্থীকে দশটি কাঠের টুকরো দিয়ে বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন ঐ টুকরোগুলি যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। পর পর তিনবার তাকে চেষ্টা করতে দেওয়া হয় এবং তিনবারের মধ্যে স্বল্পতম সময়টিকেই অভীক্ষার্থীর স্কোর ব'লে ধরা হয়। সেগুঁইর ফর্ম বোর্ডটি সব চেয়ে সরল ও সহজ। পরে সেগুঁইর বোর্ডের অনুকরণে অনেক জটিল ও উন্নত ধরনের ফর্মবোর্ড বহু মনোবিজ্ঞানী তৈরী করেছেন।

ফর্মবোর্ড ছাড়া আরও অনেক রকমের সম্পাদনী অভীক্ষার প্রচলন আছে। তার মধ্যে হিলির চিত্র-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Healy Picture-Completion Test) খুব প্রাচীন। এই অভীক্ষায় কতকগুলি ছবি থেকে চৌকো চৌকো টুকরো কেটে আলাদা করে রাখা হয় এবং অভীক্ষার্থীকে ঐ কাটা অংশগুলি ছবিগুলির যথাস্থানে বসিয়ে ছবিটি সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ চৌকো অংশটি ঠিকমত

বসাতে হলে ছবিতে বর্ণিত ব্যাপারটি বা ঘটনাটি অভীক্ষার্থীকে আগে ভাল করে বুঝতে হয়।

হিলি পাজল (Healy Puzzle) নামে আর একটি সম্পাদনী অভীক্ষাও বহুদিন ধরে প্রচলিত। এই অভীক্ষার কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির কাঠের টুকরো দিয়ে অভীক্ষার্থীকে ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ একটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরী করতে বলা হয়। নক্স সিপ টেষ্ট (Knox Ship Test) নামে আর একটি সম্পাদনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীকে জাহাজের ছবির কতকগুলি টুকরো দিয়ে একটি পুরো জাহাজ তৈরী করতে বলা হয়।

নক্স কিউব টেষ্ট (Knox Cube Test) পর পর সাজান চারটি কিউবের উপর অভীক্ষক আঙ্গুলের টোকা দেন এবং অভীক্ষার্থীকেও সেইভাবে টোকা দিতে বলেন। নানাভাবে উল্টোপাল্টা টোকা দিয়ে অভীক্ষার্থীর করণীয় কাজটিকে বেশ জটিল করে তোলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর অনন্তর স্মৃতিরই (Immediate Memory) পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

প্রথম আদর্শায়িত (Standardised) পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনী অভীক্ষার নাম হল পিণ্টনার-প্যাটারসন পারফরম্যান্স স্কেল (Pintner-Patterson Performance Scale)। এই স্কেলটির মধ্যে সেগুইই, হিলি, নক্স প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত সম্পাদনী অভীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই স্কেলটি মোট ১৫টি অভীক্ষা নিয়ে গঠিত। পিণ্টনার-প্যাটারসন স্কেলের অনুকরণে পরে আরও অনেকগুলি সম্পাদনী অভীক্ষার স্কেল তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে কর্নেল-কক্স পারফরম্যান্স এবিলিটি স্কেল (Cornel-Cox Performance Ability Scale), আর্মি পারফরম্যান্স স্কেল (Army Performance Scale), আর্থার পারফরম্যান্স স্কেল (Arthur Performance Scale) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর প্রত্যেকটি স্কেলই আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত।

পোর্টিয়াসের উদ্ভাবিত পোর্টিয়াস মেজ টেষ্টগুলি (Porteous Maze Test) সম্পাদনী অভীক্ষারূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই অভীক্ষাগুলিতে কতকগুলি রেখাঙ্কিত গোলকধাঁধা (Maze) দেওয়া থাকে। অভীক্ষার্থীকে ঐ গোলকধাঁধাগুলিতে পেন্সিল দিয়ে নির্ভুল পথটি বার করতে বলা হয়।

কোহ্স ব্লক ডিজাইন (Kohs Block Design) নামক আর এক শ্রেণীর সম্পাদনী অভীক্ষায় এক ইঞ্চি ঘনক্ষেত্রের আকারের কতকগুলি কাঠের ব্লক বা টুকরো দেওয়া হয়। ব্লকগুলির ছ'দিকে লাল, নীল, হলদে, সাদা, হলদে-নীল এবং লাল-সাদা এই ছ'রকম রঙ দেওয়া থাকে। ঐ ছ'রকম রঙ দিয়ে তৈরী কতকগুলি রঙীন

নক্সা অভীক্ষার্থীর সামনে ধরা হয় এবং ঐ নক্সাগুলি অনুযায়ী ব্লকগুলি তাকে সাজাতে বলা হয়।

আলেকজান্ডারের পাস-এ্যালংগ (Pass-Along) টেস্টটিও আর একটি নতুন ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষা। এই অভীক্ষায় একটি ছোট বাক্সের মধ্যে কাঠের বা প্লাষ্টিকের কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির টুকরো রাখা থাকে। সেগুলিকে বাক্স থেকে না তুলে কেবল উপরে, নীচে এবং পাশের দিকে সরিয়ে প্রদত্ত নক্সা অনুযায়ী সাজাতে হয়। কত কম সময়ের মধ্যে অভীক্ষার্থী প্রদত্ত নক্সা অনুযায়ী টুকরোগুলিকে নির্ভুলভাবে সাজাতে পারল তার উপর অভীক্ষার্থীর স্কোর নির্ভর করে। ডিয়ারবর্নের (Dearborn) ফর্ম বোর্ড, কোহস্ (Kohs) ব্লক ডিজাইন এবং আলেকজান্ডারের পাস-এ্যালংগ—এই তিনটি সম্পাদনী অভীক্ষাকে একত্রিত করে আলেকজান্ডারের প্রসিদ্ধ পারফরম্যান্স স্কেলটি (Alexander's Performance Scale) সৃষ্টি করা হয়েছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আর এক ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষার প্রচলন আছে। এই অভীক্ষাটির নাম মানবমূর্তির অভীক্ষা (Manikin Test)। এই অভীক্ষায় একটি কাঠের বা প্লাষ্টিকের তৈরী ছোট মানবমূর্তি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডে ভাগ করা থাকে। ঐ খণ্ডগুলি শিশুকে দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে ঠিকমত সাজিয়ে পূর্ণ মানুষের মূর্তিটি তাকে তৈরী করতে বলা হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাবর্জিত বুদ্ধির অভীক্ষার নাম হল গুডএনাফের মানুষ আঁকার অভীক্ষা (Goodenough's Man-Drawing Test)। এতে অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি আঁকতে বলা হয়। শিল্পনৈপুণ্য বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর আঁকা ছবিটির বিচার করা হয় না। কেবল দেখা হয় যে মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিটিতে আঁকতে পারল এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে অনুপাতমূলক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণাই বা কতটা নির্ভুল। চার থেকে দশ বৎসর বয়সের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষারূপে এই অভীক্ষাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এখন একটি প্রশ্ন হল যে সম্পাদনী অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির কি ধরনের শক্তি বা কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। স্পীয়ারম্যান প্রভৃতি একদল মনোবিজ্ঞানী সম্পাদনী অভীক্ষাকে এক ধরনের অসংগঠিত বুদ্ধির অভীক্ষা বলেই বর্ণনা করেছেন। আলেকজান্ডার তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে সম্পাদনী অভীক্ষাগুলি মূর্ত বুদ্ধির (Concrete Intelligence) পরিমাপ করে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে আলেকজান্ডার বুদ্ধিকে মূর্ত (Concrete) ও অমূর্ত (Abstract) এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অবশ্য সকল মনোবিজ্ঞানী আলেকজান্ডারের এই শ্রেণীবিভাগকে

মেনে নেননি। ভানন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা সম্পাদনী অভীক্ষাকে বুদ্ধির অভীক্ষা বলে মানতেই রাজী নন। তাঁদের মতে সম্পাদনী অভীক্ষার দ্বারা উপলব্ধিমূলক ও অবস্থানমূলক বিশেষধর্মী শক্তিগুলিরই পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

আজকাল অবশ্য সম্পাদনী অভীক্ষা বুদ্ধির পরিমাপের উপকরণ রূপে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্বল্পভাষা শক্তি-সম্পন্ন-ব্যক্তি, বিদেশী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধি পরিমাপের উপকরণ রূপে প্রায়ই কোন না কোন-রূপ সম্পাদনী অভীক্ষার ব্যবহার হয়ে থাকে।

বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (Test of Special Abilities)

বুদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা মনের সাধারণ শক্তি বলে ধরে নিয়েছেন এবং বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার দ্বারা কেবলমাত্র ব্যক্তির সাধারণ মানসিক কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে সাধারণভাবে সকল প্রকার মানসিক কাজে অভীক্ষার্থী কেমন ফল দেখাবে। কিন্তু কোন বিশেষধর্মী কাজে তার কুশলতা বা দক্ষতার পরিচয় বুদ্ধির অভীক্ষা থেকে পাওয়া যাবে না। এই জন্য আধুনিক কালে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সাধারণ শ্রেণীবিন্যাসের অভীক্ষা (General Classification Test) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এর অর্থ হল যে বুদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র সাধারণ শক্তি বা কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা (Differential Aptitude Test)

কিন্তু জীবনে সাফল্যলাভ কেবলমাত্র সাধারণ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। ব্যক্তি যে সব বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মেছে সেগুলির উপরও তা বহুলাংশে নির্ভর করে। সেই জন্য আধুনিক কালে নানা ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (Test for Special Ability) প্রস্তুত করা হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এগুলির নাম দিয়েছেন পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা (Differential Aptitude Test)। এর দ্বারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশেষ শক্তি বা দক্ষতার দিক দিয়ে কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে তা জানা যায়।

বিশেষ শক্তির অভীক্ষাগুলির দ্বারা নানা প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট অথচ বিশেষধর্মী কাজগুলির দিক দিয়ে অভীক্ষার্থীর দক্ষতাকে স্বতন্ত্রভাবে পরিমাপ করা হয়। যেমন, কেবলমাত্র ভাষামূলক উৎকর্ষ পরিমাপ করার জন্য যদি একটি অভীক্ষা তৈরী করা হয় তবে সেটি হবে এই ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা বা পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা। নানা পরীক্ষণের দ্বারা বিশেষ করে আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে ভাষামূলক দক্ষতার পেছনে একটি বিশেষ উপাদান বা

ফ্যাক্টর (Factor) কাজ করে থাকে। এটিকে সংক্ষেপে V বলা হয়। অতএব ভাষামূলক দক্ষতার অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির এই বিশেষ উপাদান বা ফ্যাক্টরটির পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

এই রকম স্মৃতির (Memory or M) পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র অভীক্ষা তৈরী করা হয়েছে। এগুলিকে স্মৃতির অভীক্ষা (Memory Test) বলা হয় এবং এগুলির দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর স্মৃতি যেমন যান্ত্রিক স্মৃতি, অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি ইত্যাদির পরিমাপ করা যায়।

এই একই ভাবে গাণিতিক দক্ষতা (Numerical Ability or *n*), বিচারকরণ দক্ষতা (Reasoning Ability or R), অবস্থানমূলক দক্ষতা (Spatial Ability or *s*) ইত্যাদি নানা বিশেষধর্মী শক্তির উপর আজকাল অভীক্ষা তৈরী করা হয়েছে। যান্ত্রিক দক্ষতার (Mechanical Ability or *m*) উপর একটি প্রাচীনতম অভীক্ষার নাম হল স্টেনকুইস্ট মেকানিকাল টেস্ট (Stenquist Mechanical Test)। সেইরকম সঙ্গীতমূলক দক্ষতার (Musical Ability) উপর প্রচলিত একটি অভীক্ষার নাম হল সিসোর মিউজিক্যাল টেস্ট (Seashore Musical Test)।

সাম্প্রতিক কালে পূর্ণাঙ্গ পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা বলতে থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তির অভীক্ষাটির (Thurstone's Primary Ability Test) নাম করতে হয়। থার্স্টোনের এই অভীক্ষাটিতে মানবমনের সাতটি বিশেষধর্মী কর্মদক্ষতার পরিমাপ করা হয়। এগুলিকে থার্স্টোন 'প্রাথমিক শক্তি' বলে বর্ণনা করেছেন। এগুলি হল ভাষাবোধ শক্তি (Verbal Comprehension or V), সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility or R), স্মৃতি (Memory or M), আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning or R), উপলব্ধিমূলক শক্তি (Perceptual Ability or P), অবস্থানমূলক ধারণা (Space or S), ভাষা ব্যবহারের উৎকর্ষ (Word Fluency or W)।

আর একটি সাম্প্রতিক পার্থক্যমূলক অভীক্ষার নাম হল সাইকোলজিকাল কর্পোরেশনের (Psychological Corporation) তৈরী ডিফারেন্সিয়াল এ্যাপটিটিচিউড টেস্ট (Differential Aptitude Test or DAT)। এতেও থার্স্টোনের অভীক্ষার মত ভাষামূলক, গাণিতিক, বিচারকরণমূলক, অবস্থানমূলক প্রভৃতি বিশেষধর্মী কাজগুলির উপর অভীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জননিয়োগ বিভাগের তৈরী জেনারেল এ্যাপটিটিচিউড টেস্ট ব্যাটারিটিও (General Aptitude Test Battery or GATB) এই ধরনের বিশেষধর্মী শক্তি পরিমাপের অভীক্ষা বিশেষ।

বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা (Special Aptitude Test)

এ ছাড়া আরও এক ধরনের বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে এবং বর্তমানে শিক্ষায় ও মনোবিজ্ঞানে এগুলির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা (Special Aptitude Test)।

এগুলির মধ্যে প্রথমে ইন্দ্রিয়মূলক দক্ষতার অভীক্ষাগুলির (Sensory Test) উল্লেখ করতে হয়। যেমন, দর্শনমূলক অভীক্ষা (Visual Test) বা শ্রবণমূলক অভীক্ষা (Auditory Test) ইত্যাদি। এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে অভীক্ষার্থীর ঐ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। এছাড়া সঞ্চালনমূলক দক্ষতার অভীক্ষারও (Motor Dexterity Test) আজকাল বহুল প্রচলন হয়েছে। এই অভীক্ষায় হাত-পা নাড়া, চলা-ফেরা, শরীরকে বিভিন্নভাবে হেলান, স্থিরতা, মাংসপেশী ক্ষমতা ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের নির্বাচনেও এই অভীক্ষাটির উপযোগিতা যথেষ্ট।

যন্ত্রমূলক দক্ষতার (Mechanical Aptitude) অভীক্ষারও আজকাল বিশেষ উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনতম যন্ত্রমূলক দক্ষতার অভীক্ষাটির নাম স্টেনকুইণ্ট মেকানিকাল টেস্ট (Stenquist Mechanical Test)। বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগে যান্ত্রিক দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বহু উন্নত ধরনের অভীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন, কেণ্ট স্যাকো'র (Kent Shakow) শিল্পমূলক ফর্মবোর্ড (Industrial Form Board), ম্যাককোয়ারির (McQuarrie) যান্ত্রিক দক্ষতার অভীক্ষা, মিনেসোটা (Minnesota) মেকানিক্যাল এ্যাসেম্বলী টেস্ট ইত্যাদি।

করণিক দক্ষতা (Clerical Aptitude) পরিমাপের অভীক্ষাগুলিও আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই অভীক্ষাগুলিতে সংখ্যা এবং নামের তুলনা করা, কাগজপত্রের শ্রেণীবিভাগ করা, ফাইল করা, কাগজ বাছা, খাম আঁটা ইত্যাদি নানা বিভিন্ন প্রকারের অফিস সংক্রান্ত কাজকর্ম অভীক্ষার্থীকে করতে হয়। মিনেসোটা ক্লারিকাল টেস্ট (Minnesota Clerical Test), জেনারেল ক্লারিকাল টেস্ট (General Clerical Test or GCT) প্রভৃতি বহুল প্রচলিত অভীক্ষাগুলিরও নাম এই পর্যায়ে করা যায়।

আগ্রহের অভীক্ষা (Interest Test)

কোন কাজ করা বা কিছু শেখার পেছনে যে বস্তুটি থাকা একান্ত অপরিহার্য সেটি হল প্রেষণা (Motive)। প্রেষণাই ব্যক্তিকে বিশেষ একটি কাজ করতে প্রণোদিত করে, তার কর্মক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার উদ্যমকে অব্যাহত রাখে। প্রেষণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে আর একটি

বস্তু, তার নাম আগ্রহ। আগ্রহ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এক ধরনের তৃপ্তি বা আনন্দের অনুভূতি যা একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।[1] এই জন্যই যে কাজে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে না সে কাজ সম্পাদনে ব্যক্তি তৃপ্তিবোধ করে না, ফলে তার মধ্যে ঐ কাজের জন্য কোন প্রেষণা জন্মায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির সুশিক্ষা ও সুপরিচালনার জন্য তার কোন্ কোন্ বিষয়ে বা কাজে আগ্রহ আছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও পরিচালনামূলক কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আগ্রহের স্বরূপটি জানা অপরিহার্য বললেই চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে আগ্রহ অনুভব করে সে বিষয়টি সে খুব সহজে শিখতে পারে। অবশ্য সমস্ত শিক্ষাই সহজাত শক্তি ও আগ্রহের মিলিত ফল, কিন্তু কোন বিষয়ে কেবল মাত্র শক্তি বা কর্মদক্ষতা থাকলেই শিক্ষা ঘটে না, যদি না সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ থাকে। তেমনই বৃত্তির ক্ষেত্রেও এই একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই জন্যই আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহ পরিমাপের নানা পন্থার উদ্ভাবন করেছেন।

আগ্রহের পরিমাপ (Measurement of Interest)

আগ্রহ পরিমাপের সব চেয়ে সহজ উপায় হল শিক্ষার্থীকে সোজাসুজি নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং সেই সব প্রশ্নের উত্তর থেকে তার আগ্রহের স্বরূপ নির্ণয় করা। কিন্তু নানা কারণে এই ধরনের উত্তরগুলি বাস্তবধর্মী ও নির্ভরযোগ্য হয় না। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সোজাসুজি প্রশ্নের দ্বারা প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। প্রথমত, তাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাদের আগ্রহের পরিধিও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ থাকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় ও বৃত্তি সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত এবং আর দশজনের পরিপোষিত ধারণা বা মতবাদের দ্বারা তারা এতই প্রভাবিত হয় যে নিজেদের আগ্রহ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা তারা গড়ে তুলতে পারে না। এই সব কারণেই প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কার্নেগী ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির এক আলোচনা সভায় আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতির প্রথম উদ্ভাবন করা হয়। কিন্তু সব-চেয়ে সাফল্যজনক আগ্রহের অভীক্ষাটি তৈরী করেন ই কে ষ্ট্রং (E K Strong) নামক এক মনোবিজ্ঞানী। তাঁর অভীক্ষাটির নাম ভোকেসানাল ইণ্টারেষ্ট ব্ল্যাঙ্ক (Vocational Interest Blank or VIB)।

কার্নেগী ইনষ্টিটিউটের অভীক্ষাটির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, বহু বিচিত্র প্রকারের কাজ, বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে অভীক্ষার্থীর পছন্দ বা অপছন্দ জানা যায়

1. পৃঃ ১৪০ (১ম খণ্ড)

এমন ধরনের প্রশ্ন অভীক্ষাটিতে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি অনুযায়ী উত্তরগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল। তার ফলে দেখা গেল যে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের দিক দিয়ে বেশ মিল আছে।

ষ্ট্রং'র V B অভীক্ষাটিতে মোট চারশত প্রশ্ন আছে এবং সেগুলি আটটি অংশে বিভক্ত। প্রথম পাঁচটি অংশে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভীক্ষার্থীর আগ্রহ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পাঁচটি বিষয় হল, বৃত্তি, স্কুলপাঠ্য বিষয়সমূহ, আমোদ-প্রমোদ, নানারকম কাজকর্ম এবং অপরের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যসমূহ। প্রত্যেকটি প্রশ্ন বা উক্তির পাশে লেখা থাকে পছন্দ, উদাসীন এবং অপছন্দ। অভীক্ষার্থীকে ঐ তিন ধরনের উত্তরের মধ্যে একটিতে দাগ দিতে বলা হয়। যেমন—

	পছন্দ	উদাসীন	অপছন্দ
১। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম করা			
২। অঙ্ক কষা ...			
৩। সিনেমায় যাওয়া ...			

অভীক্ষাটির শেষ তিনটি ভাগে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কাজকে অভীক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী সাজাতে এবং নিজের বর্তমান কর্মক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমাপ করতে বলা হয়। এই অভীক্ষাটিতে প্রত্যেকটি বৃত্তির (Occupation) স্বতন্ত্র স্কোরের তালিকা আছে। কোন বিশেষ ব্যক্তির স্কোরটি ঐ নির্দিষ্ট স্কোরের তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে যে সে বৃত্তিটিতে সাধারণ পুরুষ বা সাধারণ নারী থেকে আগ্রহের দিক দিয়ে কতটা দূরে সরে আছে।

আর একটি বহুল ব্যবহৃত আগ্রহের অভীক্ষার নাম হল কুডের প্রেফারেন্স রেকর্ড (Kuder Preference Record)। এই অভীক্ষাটি খুবই সম্প্রতি তৈরী হয়েছে এবং ষ্ট্রং'র অভীক্ষার সঙ্গে এটির অনেক দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য আছে। এতে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে আগ্রহ নির্ণয় না করে কতকগুলি ব্যাপক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ কেমন আছে তারই পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন বিষয়ের উপযোগী বিভিন্ন ফর্ম (Form) বা আকারে এই অভীক্ষাটি পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, এর বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে ১৬৮টি পদ (Item) আছে। এমন ধরনের তিনটি করে পদ এক সঙ্গে দেওয়া থাকে যেগুলির দ্বারা একই শ্রেণীর অথচ প্রকৃতির দিক দিয়ে বিভিন্ন তিনটি কাজকে বোঝান হয়। অভীক্ষার্থী ঐ তিনটি কাজের মধ্যে যে কাজটি সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে এবং যে কাজটি সব চেয়ে কম পছন্দ করে সেই দুটি কাজের পাশে তাকে দাগ দিতে বলা হয়। যেমন—

নীচে তিনটি কাজের নাম দেওয়া আছে। এর মধ্যে কোন্ কাজটি তোমার সব চেয়ে পছন্দ, আর কোন্‌টি সব চেয়ে অপছন্দ বল।

১। অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা
২। মুদ্রা সংগ্রহ করা
৩। প্রজাপতি সংগ্রহ করা

কুডের প্রেফারেন্স রেকর্ডের বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে নানারকম বৃত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন—কৃষিমূলক, যন্ত্রপাতিমূলক, গণনামূলক, বিজ্ঞানমূলক, চারুকলামূলক সাহিত্যমূলক, কারণিক, সামাজিক ইত্যাদি।

স্ট্রং এবং কুডেরের আগ্রহ পরিমাপের অভীক্ষা ছাড়াও আজকাল আরও অনেকগুলি আগ্রহের অভীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে থার্স্টোন ইন্টারেস্ট সিডিউল (Thurstone Interest Schedule) এবং গিলফোর্ড-স্নিডম্যান-জিমারম্যান ইন্টারেস্ট সার্ভে (Guilford-Sneidman-Zimmerrman Interest Survey) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

(Characteristics of a Good Test)

যে কোন ভাল অভীক্ষায় নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এগুলির একটিরও যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষাটিকে নিখুঁত বলতে পারা যাবে না। যথা—

১। নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)
২। নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)
৩। যাথার্থ্য (Validity)
৪। প্রয়োগশীলতা (Administrability)
৫। সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability)
৬। পরিমিততা (Economy)

নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ বা ফল নির্ণয়ের উপর অভীক্ষকের কোনরূপ প্রভাব থাকবে না। অভীক্ষাটি সব দিক দিয়ে ব্যক্তিগত প্রভাববর্জিত হবে। এর অর্থ হল যে অভীক্ষাটি সম্পূর্ণভাবে বিষয়মুখী হবে, ব্যক্তিমুখী হবে না।

গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট্যটি একেবারেই নেই। সেখানে যে ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয় অভীক্ষার্থীকে সেগুলির উত্তর দিতে হলে বড় বড় রচনা লেখা ছাড়া অন্য পথ থাকে না। যেমন, শিক্ষার লক্ষ্য কি? বা কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়? ইত্যাদি প্রকৃতির প্রশ্নের উত্তরে অভীক্ষার্থী দীর্ঘ আলোচনামূলক রচনা লিখতে বাধ্য হয়। এই জন্য এই ধরনের প্রশ্নগুলিকে রচনাধর্মী প্রশ্ন বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করে নম্বর দেবার সময় অভীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত, পছন্দ-অপছন্দ এমন কি খেয়াল-খুসী, মেজাজ ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একেই ব্যক্তিকতা (Subjectivity) বলে। আধুনিক অভীক্ষায় এই ব্যক্তিকতা দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা হয় এবং সেগুলির উত্তর মাত্র একটিই হয়, একটি ছাড়া দুটি হয় না। যেমন—

১। নীচের প্রশ্নটির প্রদত্ত তিনটি উত্তরের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক বল।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল—

(ক) স্বাস্থ্যচর্চা (খ) সমাজ উন্নয়ন (গ) আত্ম-উপলব্ধি।

২। বাক্যটির শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ কর।

জেমস্-ল্যাংগ মতবাদ অনুযায়ী দৈহিক অনুভূতি জাগে —, প্রক্ষোভের অনুভূতি দেখা দেয় —।

৩। নীচের উক্তিটি সত্য কিংবা মিথ্যা বল।

পৃথিবী আকারে বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে বড়। সত্য—মিথ্যা

এই ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং এক-উত্তর-বিশিষ্ট প্রশ্নগুলির সাহায্যে আধুনিক অভীক্ষা তৈরী করা হয়ে থাকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিকতাদোষের দ্বারা দুষ্ট হবার সম্ভাবনা এক প্রকার থাকে না বললেই চলে।

নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি কতটা নিখুঁত বা নির্ভুল। সাধারণত যদি একটি অভীক্ষা একই দলের উপর কিছুদিনের ব্যবধানে পর পর দু'বার প্রয়োগ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে অভীক্ষার্থীদের এই দু'বারের স্কোরের মধ্যে বেশ মিল আছে তা হলে অভীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়। সাধারণত দলটির এই দু'বারের স্কোরের মধ্যে মিল বা সমতা মাপা হয় সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের দ্বারা। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থাতেও অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক পরীক্ষাগুলি এই দিক দিয়ে একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়।

যাথার্থ্য (Validity) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য তৈরী হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেইটিই পরিমাপ করছে, অন্য কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করছে না। গতানুগতিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইতিহাস

বা ভূগোলের জন্য তৈরী পরীক্ষা ইতিহাস বা ভূগোলের জ্ঞান ছাড়াও হাতের লেখা, ভাষামূলক দক্ষতা, রচনাশৈলী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা গুণও পরিমাপ করে থাকে। সেজন্য আমরা বলতে পারি যে এই পরীক্ষাগুলির যাথার্থ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে যাথার্থ্যসম্পন্ন অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপের জন্য তৈরী সেটি ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপ করবে না। কোন অভীক্ষার যাথার্থ্য নির্ণয় করার নিয়ম হল, অভীক্ষাটি প্রস্তুত করার পর অপর কোন যাথার্থ্যসম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত অভীক্ষার সঙ্গে সেটির তুলনা করা। সাধারণত এই দুটি অভীক্ষাকে একই দলের উপর প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। যদি দেখা যায় যে এই সহপরিবর্তনের মান বেশ উন্নত পাওয়া গেল তবে নতুন অভীক্ষাটির যাথার্থ্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

প্রয়োগশীলতা (Administrability) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটি অভীক্ষার্থীদের উপর সহজে ও বিনা আয়াসে প্রয়োগ করা যাবে। অভীক্ষার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করার উপর। কোনও অভীক্ষা অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উন্নত হলেও যদি তার প্রয়োগপদ্ধতি কষ্টসাধ্য বা জটিল হয় তাহলে অভীক্ষাটির কোনই সার্থকতা থাকে না। এই জন্য আধুনিক অভীক্ষাগুলির প্রয়োগবিধি যতটা সম্ভব সহজ ও সুনির্দিষ্ট করা যায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

সংব্যাখ্যান (Interpretation) ও তুলনীয়তা (Comparability) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটি থেকে যে স্কোরগুলি পাওয়া যায় সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা করা এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ভাবে তুলনা করা যাবে। সাধারণত গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে খেয়ালখুশী মত ধরে নেওয়া একটা পাশ মার্কের সঙ্গে তুলনা করে বিশেষ কোন অভীক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাপ করা হয়। ফলে এই ধরনের পরিমাপের প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্যই থাকে না। সেজন্য আধুনিক অভীক্ষাগুলির এমন একটি মান বার করা হয় যেটিকে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং যেটির সঙ্গে কোন বিশেষ অভীক্ষার্থীর কৃতিত্বের তুলনা করা চলতে পারে। একেই সর্বজনীন মান বা নর্ম (Norm) বলা হয়।

পরিমিততা (Economic) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির রচনা, প্রয়োগ, বিচার ইত্যাদির ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম প্রয়োজন হবে। প্রশ্নপত্র রচনা ও প্রয়োগের দিক দিয়ে গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য সময় ও পরিশ্রম বেশী লাগে না। সেদিক দিয়ে আধুনিক অভীক্ষাগুলি তৈরী করা ও প্রয়োগ করা উভয় কাজেই যথেষ্ট সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তেমনই প্রশ্নপত্র দেখা এবং নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে গতানুগতিক অভীক্ষায় প্রচুর সময় ও শ্রম লাগে, কিন্তু

আধুনিক অভীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করার কাজটিকে এত সহজ ও সরল করে তোলা হয়েছে যে, যে কোন স্বল্পবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিও সেগুলি নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করতে পারে।

আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test)

আধুনিক অভীক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি আদর্শায়িত। আদর্শায়িত হওয়ার জন্যই আধুনিক অভীক্ষা প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, ত্রুটিহীন ও কার্যকর। আদর্শায়িত বলতে কি বোঝায় এখন তাই দেখা যাক।

কোন অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardisation) বলতে এক কথায় বোঝায় যে অভীক্ষাটির প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্কোরিং (Scoring) এ দুটি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সমতা (Uniformity) রক্ষা করা।

প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে সমতা রক্ষার অর্থ হল যে যে পরিস্থিতিতে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই পরিস্থিতিটির বিভিন্ন দিক বা উপাদানগুলি যেন অভীক্ষাটির প্রয়োগের সকল সময়ে বা ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে। সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয়তা একটি অপরিহার্য উপকরণ। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির এই সমতা একান্ত আবশ্যক। এর জন্য যে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় সেগুলি হল অভীক্ষাটির প্রয়োগকালীন মৌখিক বা লিখিত নির্দেশগুলি, অভীক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দানের পদ্ধতি, অভীক্ষাটির প্রাথমিক দৃষ্টান্ত প্রদান, অভীক্ষা প্রয়োগের সময় সীমা, অভীক্ষায় ব্যবহার করার বিভিন্ন উপকরণ এবং অভীক্ষা প্রয়োগের পরিবেশঘটিত অন্যান্য উপাদানগুলি। অভীক্ষাটিতে সন্তোষজনক ফল লাভের জন্য এই বিষয়গুলি সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হওয়া বিশেষ দরকার। এই জন্য যখন কোন নতুন অভীক্ষা তৈরী করা হয় তখনই সেটি কেমন করে প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধে অভীক্ষককে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও নির্দেশ গঠন করতে হয়। নইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভীক্ষাটির প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা দেবে এবং তার ফলে তা থেকে লব্ধ ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

আধুনিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে অভীক্ষাটির প্রয়োগের সময় অভীক্ষকের বাচনভঙ্গী, হাবভাব, মুখের অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া থাকে। কেননা অভীক্ষার্থীদের উপর এগুলিরও প্রভাব কম দেখা যায় না। এমন কি যেখানে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হবে সেখানকার আলোর পর্যাপ্ততা এবং বায়ু-চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অভীক্ষার্থীর বসার ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের যথাযথ আয়োজন প্রভৃতি যাতে সব

ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় তার প্রতিও তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা হয়। সবশেষে অভীক্ষক ও অভীক্ষার্থীর মধ্যে একটি সম্প্রীতিমূলক বোঝাপড়া (Rapport) সৃষ্টি করাটা অভীক্ষার সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধেও অভীক্ষাটিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

কোন অভীক্ষার স্কোরিং এর ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার জন্য অভীক্ষাটির নর্ম (Norm) বা মান বার করা দরকার। আমরা দেখেছি যে কোন সু-অভীক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability)। এর অর্থ হল যে অভীক্ষাটির ফলাফলের ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যাবে এবং একজন অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোরের সঙ্গে অপর অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোরের যথাযথ তুলনা করা সম্ভব হবে। এর জন্য অভীক্ষাটির একটি বিজ্ঞানসম্মত মান বা নর্ম থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত স্কুল কলেজে যে সব পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির এই ধরনের কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই। ফলে এই সব পরীক্ষায় যদি কেউ ২০ বা ৬০ বা ৯০ পায় তবে তার সেই স্কোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত পাস মার্ক (যেমন ৩০ বা ৩৬) ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটিও সম্পূর্ণ খেয়ালখুশীমত নির্ধারিত করা হয় এবং তার কোন যুক্তিনির্ভর ভিত্তি নেই। ফলে এর দ্বারা পরীক্ষার্থীর সাফল্যের কোনরূপ প্রকৃত পরিমাপ করা সম্ভব হয় না এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ তুলনা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।

সেজন্য প্রয়োজন এমন একটি মান বা নর্ম (Norm) যেটির সঙ্গে কোন বিশেষ পরীক্ষার্থীর পাওয়া স্কোরের তুলনা করে আমরা তার সাফল্যের ঠিকমত বিচার করতে পারি। এ ধরনের মানকেই সর্বজনীন মান বা নর্ম (Population Norm) বলা হয়ে থাকে। আধুনিক আদর্শায়িত অভীক্ষার (Standardised Test) ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন মান বা নর্ম থাকাটা একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরা যাক, সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য ইতিহাসের একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী করা হল। অর্থাৎ দেশে যত ছেলেমেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের সাফল্যের একটি মান বা নর্ম ঠিক করা হল। মনে করা যাক, এই নর্মটি হল ৪২। এখন যদি বিশেষ একটি ছেলে ঐ পরীক্ষায় ৫০ পায়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারি যে সারা দেশের সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ছেলেটির স্থান কোথায়। এক্ষেত্রে নর্ম ৪২'র সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় যে এই বিশেষ ছেলেটির ইতিহাসের জ্ঞান সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী এবং কতটা বেশী তাও আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কোন বিশেষ অভীক্ষার সর্বজনীন নর্ম বা মান নির্ণয় করার পন্থা হল সমস্ত অভীক্ষার্থীর স্কোরের সমষ্টিকে

অভীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। এখন কোন অভীক্ষার সর্বজনীন মান নির্ণয় করতে গেলে প্রকৃত পক্ষে সেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষার মান নির্ণয় করতে হলে প্রকৃত পক্ষে সেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর উপর অভীক্ষাটির প্রয়োগ করতে হয়, বা দেশে যত সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের সমগ্র স্কোরের যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি বাস্তবে সম্ভব নয় বলে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত সমস্ত ছেলেমেয়ের একটি বাছাই করা দলের (Sample Group) উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের স্কোর থেকেই সাধারণত এই সর্বজনীন মান বা নর্ম নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অবশ্য দেখতে হবে যে এই বাছাই করা দলটি যেন সমগ্র দলের যথার্থ প্রতিনিধিস্বরূপ হয়। অর্থাৎ পরিবেশ, স্কুলে শিক্ষার মান, পিতামাতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়ে সমগ্র দলটিতে যত বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলেরই কিছু কিছু প্রতিনিধি অনুপাতমত এই বাছাই করা দলটিতে থাকবে। বলা বাহুল্য, এই বাছাই করার (Sampling) প্রক্রিয়াটি যত নিখুঁত হবে, নর্মও তত নির্ভুল হবে।

আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি

একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরীর সময় নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। অভীক্ষাটি বুদ্ধির অভীক্ষাই হোক্ বা বিশেষ শক্তির বা দক্ষতার অভীক্ষাই হোক্ কিংবা কোন পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই হোক সর্বত্রই এই নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করতে হবে। যথা—

প্রথমত, যে শক্তি, বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের উপর অভীক্ষাটি গঠন করা হবে সে সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রথমেই গঠন করে নিতে হবে। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে হলে কাকে বুদ্ধি বলে, কিংবা ইতিহাসের অভীক্ষা তৈরী করতে হলে ইতিহাসের জ্ঞান বলতে অভীক্ষক কি বোঝেন, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটি ধারণা আগে তৈরী করে নিয়ে অভীক্ষককে অভীক্ষা তৈরীর কাজে হাত দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এইবার ঐ নির্দিষ্ট ধারণা অনুযায়ী অভীক্ষাটির পদ (Item) গঠন করতে হবে। যতগুলি পদ সম্পূর্ণ অভীক্ষাটিতে থাকবে তার প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক পদ প্রথমে গঠন করা প্রয়োজন। যেমন ১০০টি পদ-বিশিষ্ট অভীক্ষা তৈরী করতে হলে প্রথমে অন্তত ২০০টি পদ গঠন করতে হবে।

তৃতীয়ত, এবার যে দলটির জন্য অভীক্ষাটি তৈরী হবে তাদের একটি ছোটখাট প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে যে পদগুলি অনুপযোগী বলে

প্রমাণিত হবে সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে ট্রাই-আউট (Try-Out) করা বলে। অনুপযোগী পদ বলতে সেই পদগুলিকে বোঝায় যেগুলি হয় খুব শক্ত বা খুব সহজ কিংবা দ্ব্যর্থবোধক। যেমন, যে পদটির উত্তর ৮০% বা তার বেশী সংখ্যক অভীক্ষার্থী দিতে পারল সেটি খুব সহজ। তেমনই যে পদটির উত্তর মাত্র ২০% বা তার কম সংখ্যক অভীক্ষার্থী দিতে পারল সেটি খুব শক্ত। আর যে পদটির একের বেশী অর্থ হয় সেটি দ্ব্যর্থবোধক। এই তিন শ্রেণীর পদকে প্রকৃত অভীক্ষা থেকে বাদ দিতে হবে।

চতুর্থত, তারপর অবশিষ্ট পদগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ নিয়ে অভীক্ষাটি গঠন করতে হবে। এবার যে দলের জন্য অভীক্ষাটি তৈরী হচ্ছে সেই দলের একটি যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির নর্ম বা মান নির্ণয় করতে হবে। এই সোপানটি অভীক্ষাটির আদর্শায়নে একান্ত প্রয়োজন। কেননা এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই অভীক্ষাটির সর্বজনীন মান পাওয়া যায়।

সবশেষে, পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) ও যাথার্থ্যের (Validity) মান নির্ণয় করতে হবে।

একটি বুদ্ধির অভীক্ষার উদাহরণ

প্রসিদ্ধ বিনে-সাইমন স্কেলের ১৯৩৭ সালের স্ট্যানফোর্ড রিভিসনের M ফর্মের ১১ বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাটি উদাহরণস্বরূপ নীচে দেওয়া হল। এই অভীক্ষাটিতে মোট ৬টি প্রশ্ন বা সমস্যা অভীক্ষার্থীকে সমাধান করতে দেওয়া হয়।

বিনে-সাইমন স্কেল :: ষ্ট্যানফোর্ড রিভিসন
ফর্ম M—বৎসর 11

১। **কারণ নির্ণয়** (Finding Reason)

প্রশ্ন করা হল ঃ—

(ক) কেন ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার বাধ্য হবে তার দুটি কারণ দেখাও।

(খ) কেন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বহুসংখ্যক রেলপথ থাকা দরকার তার দুটি কারণ দেখাও।

২। **স্মৃতি থেকে একটি পুঁতির মালার পুনর্গঠন**

প্রথমে অভীক্ষক অভীক্ষার্থীদের সামনে ১১টি পুঁতিসম্পন্ন একটি পুঁতির মালা তৈরী করবেন এবং অভীক্ষার্থীকে সেটি ভাল করে দেখতে বলবেন। তারপর সেটি তার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে অনুরূপ আর একটি মালা তাকে তৈরী করতে বলবেন।

৩। ভাষামূলক অসঙ্গতি (Verbal Absurdities)

নীচের উক্তিগুলি একটির পর একটি অভীক্ষার্থীকে শোনান হল এবং প্রশ্ন করা হল 'এর মধ্যে কোথায় বোকার মত কথা বা অসম্ভব কোন কিছু বলা হয়েছে ?'

(ক) আমি একটি সুসজ্জিত যুবককে হাত দুটো তার পকেটে পুরে একটি আনকোরা নতুন বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে দেখলাম।

(খ) বাবা ছেলেকে লিখছেন "চিঠির মধ্যে দশটি টাকা পাঠালাম। যদি চিঠি না পাও তবে একটা টেলিগ্রাম কোরো।"

(গ) মার্চ করতে করতে একজন সৈনিক অভিযোগ করল যে সে ছাড়া সৈন্যদলের আর সকলেই ভুল পা ফেলছে।

(ঘ) একজন সহৃদয় লোক ঘোড়ায় করে এক বস্তা শস্য শহরে নিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়ার ভার লাঘব করার জন্য সে নিজে ঘোড়ার পিঠে বসে বস্তাটা নিজের কাঁধে তুলে নিল।

(ঙ এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল 'আমি কামনা করি যে তোমার কবরের মাটি আঁচড়ায় এমন মুরগীগুলি খাওয়া পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাক।'

৪। অমূর্তধর্মী শব্দ (Abstract Word)

প্রশ্ন করা হল ঃ—নীচের শব্দগুলির অর্থ কি ?

(ক) সম্পর্ক (খ) তুলনা করা (গ) জয় করা (ঘ) বাধ্যতা (ঙ) প্রতিহিংসা

৫। তিনটি বস্তুর মধ্যে মিল

প্রশ্ন করা হল ঃ—কোন্ দিক দিয়ে নীচের বস্তুগুলির মধ্যে মিল আছে ?

(ক) সাপ, গরু ও চড়াইপাখী

(খ) গোলাপ, আলু ও গাছ

(গ) পশম, তুলা ও চামড়া

(ঘ) ছুরির ফলা, পয়সা ও তারের টুকরো

(ঙ) বই, শিক্ষক ও খবরের কাগজ

৬। বাক্য মনে রাখা

বলা হল ঃ—ভাল করে শুনে যা বললাম অবিকল তাই হব।

(ক) গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণাবাসে ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটতে যাবার জন্য ভোরে ওঠে।

(খ) সেতুর উপর দিয়ে যে পথটা গেছে তাই ধরে কাল আমরা আমাদের গাড়ী করে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Measurement of Personality)

আধুনিক কালে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারের অভীক্ষা গঠন করা হয়েছে।[১] এগুলির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের (Trait) প্রকৃতি ও মাত্রার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া আর এক ধরনের ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বারা বিশেষ কোন ব্যক্তির মনের অপ্রকাশিত দিকগুলির প্রকৃতি জানা যায়। সেগুলির নাম প্রতিফলনমূলক অভীক্ষা (Projective Test)।

এই দু ধরনের ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের অভীক্ষাগুলি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের—পৃঃ ৪৮৮ পৃঃ ৪৯১ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী

১। শিক্ষায় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা কি বর্ণনা কর। গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলি কি কি? আধুনিক অভীক্ষা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির চেয়ে ভাল?

২। শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা কাকে বলে? বুদ্ধির অভীক্ষার সঙ্গে এই অভীক্ষার কি পার্থক্য?

৩। সহজাত শক্তির অভীক্ষা কাকে বলে? বুদ্ধির অভীক্ষার বিভিন্ন বিভাগগুলি বর্ণনা কর।

৪। একটি সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। কি ভাবে একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) তৈরী করা যায়? বিভিন্ন সোপানগুলি বর্ণনা কর।

৫। বিনে সাইমন স্কেলের একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৬। নীচের অভীক্ষাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(ক) অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা (খ) আর্মি বিটা টেষ্ট (গ) বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (ঘ) পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা।

৭। সম্পাদনী অভীক্ষা কাকে বলে? সম্পাদনী অভীক্ষার দ্বারা কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যায়? কয়েকটি সম্পাদনী অভীক্ষার বর্ণনা দাও।

৮। আগ্রহের অভীক্ষার উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

পরিসংখ্যানের স্বরূপ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বস্তু পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা প্রতি পদেই অনুভব করে থাকি। যেমন, কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোনটি বেশী ভারী, কোনটি কম ভারী, বা কতকগুলি ছেলের মধ্যে কে বেশী লম্বা, কে কম লম্বা ইত্যাদি ধরনের পরিমাপ করাটা প্রায়ই আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। এই পরিমাপ করার একটা সহজ পন্থা হল পরিমাপের বস্তুগুলিকে তাদের বিশেষ গুণ বা ধর্ম অনুযায়ী সারি (Rank) করে সাজান। একে **সারিবিন্যাস** (Ranking) বলা হয়। যেমন, কতকগুলি ছেলেকে তাদের উচ্চতা অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হল, অর্থাৎ সবচেয়ে লম্বা ছেলেটিকে সর্বপ্রথম, তারপর তার চেয়ে যে কম লম্বা তাকে, এইভাবে সব শেষে উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে রাখা হল। ঠিক এইভাবেই আমরা সবচেয়ে ভারী জিনিষটাকে প্রথম, তারপর তার চেয়ে কম ভারী, তারপর তার চেয়ে অর একটু কম ভারী, এইভাবে ওজনের দিক দিয়ে কতকগুলি জিনিষকে সারিবিন্যাস করতে পারি। সারিবিন্যাস থেকে আমরা সম্পূর্ণ সারিতে বিশেষ একটি বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থান জানতে পারি এবং অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থানের সঙ্গে তার অবস্থানের একটি তুলনামূলক ধারণাও পেতে পারি। কিন্তু সারি থেকে বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃত পরিমাপ আমরা পাই না। যেমন, ছেলেদের উচ্চতার সারি থেকে আমরা জানতে পারি যে উচ্চতার দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে বিশেষ একটি ছেলের অবস্থান কোথায়, কিন্তু জানতে পারি না যে সে প্রকৃতপক্ষে কত লম্বা। ব্যক্তির পরিমাপ আমরা সাধারণত প্রকাশ করে থাকি বিশেষ কোন সংখ্যার সাহায্যে। একে আমরা ব্যক্তির **স্কোর** (Score) বলে থাকি। স্কোর নানা রকমের হতে পারে। যেমন, উচ্চতার বেলায় ব্যক্তির স্কোর সেন্টিমিটার, মিটার ইত্যাদি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ওজনের বেলায় গ্রাম, কিলোগ্রাম ইত্যাদি দিয়ে। তেমনই পরীক্ষায় সাফল্যের স্কোর প্রকাশ করা হয় 30, 40, 50 ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে। বুদ্ধির অভীক্ষায় সাফল্যের স্কোর হল বুদ্ধ্যঙ্ক। ব্যক্তির যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য বা কর্মদক্ষতা পরিবর্তনশীল সেগুলিকেই আমরা স্কোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্য সকলের ক্ষেত্রে সমান সেগুলিকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। যেমন মানুষের কটা হাত আছে, বা শরীরের কটা হাড় আছে, এগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তির

কোন বিশেষ স্কোর নেই। কেননা এগুলি সকলের ক্ষেত্রেই এক ও অপরিবর্তনীয়। যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় সেগুলিকে সেইজন্য **বিষমরাশি** (Variable) বলা হয়।

স্কেল (Scale) ও একক (Unit)

সাধারণত ব্যক্তির স্কোর কতকগুলি সম-দূরত্ব-বিশিষ্ট সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। 1, 2, 3, 4, 5 বা 30, 40, 50, 60 এই সারি দুটিতে সংখ্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমদূরত্ব-সম্পন্ন। এই ধরনের সমদূরত্ব-সম্পন্ন সংখ্যাগুলি যখন পাশাপাশি সাজান যায় তখন তাকে স্কেল (Scale) বলা হয়। কোন স্কেলের দুটি পাশাপাশি সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করলে সেই স্কেলের একক (Unit) পাওয়া যায়। যেমন উপরের প্রথম সারিটির একক হল 1, দ্বিতীয় সারিটির একক হল 10।
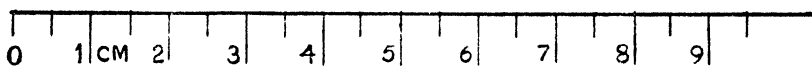
[সেণ্টিমিটারের স্কেল]

সাধারণত প্রত্যেক স্কেলের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এর সংখ্যাগুলির দূরত্ব জ্ঞাপন করে একটি নির্দিষ্ট একক এবং দ্বিতীয়ত, স্কেলটির সুরু 0 বিন্দু থেকে। যে কোন একটি সেণ্টিমিটারের রুলার বা ফিতা পরীক্ষা করলে এ তথ্য দুটির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে স্কেলটির সুরু 0 থেকে হয় না। ফলে আমরা বলতে পারি না যে 60 স্কোরটি 30 স্কোরের চেয়ে দ্বিগুণ ভাল। কিন্তু যে সব স্কেল 0 থেকে সুরু হয় সে সব ক্ষেত্রে আমরা এ ধরনের কথা বলতে পারি, যেমন আমরা বলতে পারি যে 60 মিটার 30 মিটারের ঠিক দ্বিগুণ।

অবিচ্ছিন্ন (Continuous) সারি ও বিচ্ছিন্ন (Discrete) সারি

কোন পরিমাপ থেকে আমরা স্কোরের যে সারিটি পাই সেটি দু'রকমের হতে পারে, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। অবিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে বিরাম বা ছেদটিকে আমরা প্রয়োজন হলে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করতে পারি। যেমন 1 টাকা, 2 টাকা, 3 টাকা—এই সারিটির ক্ষেত্রে আমরা 1 টাকা ও 2 টাকার মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশের কল্পনা করতে পারি এবং আমরা সেগুলিকে সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারি, যেমন 1·25 টাকা, 1·75 টাকা ইত্যাদি। কিন্তু

বিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে ব্যবধানকে ক্ষুদ্রতম কোন অংশে প্রকাশ করা যায় না। যেমন 1টি মানুষ, 2টি মানুষ, 3টি মানুষ—এই সারিতে 1টি মানুষ ও 2টি মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন চলে না। অর্থাৎ 1·25 বা 1·75 মানুষ সত্যকারের হয় না।

অবিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে স্কোরের অর্থ ও মধ্যবিন্দু নির্ণয়

অবিচ্ছিন্ন সারির স্কেলে পর পর দুটি সংখ্যার মধ্যে যে ব্যবধানটি দেখা যায় সেটি প্রকৃতপক্ষে শূন্য স্থান নয়। প্রত্যেকটি স্কোরকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এই ফাঁকটা ঢাকা পড়ে যায়। যেমন, কেউ যদি কোন কাজে 140 স্কোর পেয়ে থাকে, তবে তার প্রকৃত স্কোর হবে 139·5 থেকে 140·5 পর্যন্ত। সেই রকম 141 স্কোরকে ব্যাখ্যা করতে হবে 140·5 থেকে 141·5 পর্যন্ত। ফলে দেখা যাবে যে 140 এবং 141 এর মধ্যে যে শূন্যস্থান ছিল সেটি এই ব্যাখ্যায় আর রইল না। অর্থাৎ 140, 141, 142, এই সারিটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে 139·5—140·5 140·5,—141·5, 141·5—142·5। এই ব্যাখ্যায় 140 স্কোরের মধ্যবিন্দু হল 140·0, 141 স্কোরের মধ্যবিন্দু 141·0 ইত্যাদি।
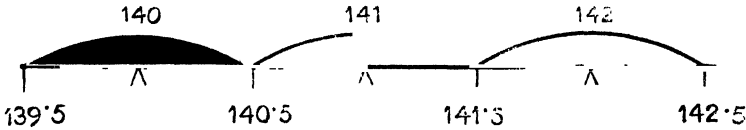
[অবিচ্ছিন্ন স্কোর ও তার মধ্যবিন্দু]

এছাড়া আরও একটি প্রথায় স্কোরের ব্যাখ্যার প্রচলন আছে। সেখানে 140 স্কোরের অর্থ হল 140 থেকে 141 পর্যন্ত, কিন্তু 141 নয়। এই ব্যাখ্যায় স্কোরের মধ্যবিন্দু হল 140·5। তেমনই 141 স্কোরের অর্থ হল 141—142। এই পুস্তকে আমরা স্কোরের প্রথম সংব্যাখ্যানটি গ্রহণ করব।

বিন্যস্ত (Grouped) ও অবিন্যস্ত (Ungrouped) স্কোর

কোন অভীক্ষার প্রয়োগ বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে আমরা এই ধরনের কতকগুলি স্কোর পেয়ে থাকি। যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় অল্প হয় তখন সেগুলির মধ্যে তুলনা করা বা সেগুলি সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা তৈরী করা সম্ভব হয়। কিন্তু যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় অনেক হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই স্কোরগুলিকে শৃংখলাবন্ধ ভাবে না সাজালে সেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন থেকে যায় এবং বিশেষ কোন স্কোর সম্বন্ধে কোন রকম তুলনামূলক ধারণা গঠন করাও যায় না। যেমন, একটি কলেজের 100টি ছেলের উপর সাধারণ জ্ঞানের একটি পরীক্ষা

দেওয়া হল এবং পাওয়া গেল 100টি স্কোর। কিংবা কোন সহরের কত লোক সংখ্যা ঠিক করতে গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় 100টি সহরের লোকসংখ্যার সূচকরূপে পাওয়া গেল 100টি সংখ্যা। এই স্কোরগুলির তাৎপর্য ঠিকমত বুঝতে হলে এদের আগে সাজিয়ে নিতে হবে। স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে সাধারণত যেভাবে সাজান হয় তাকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন (Frequency Distribution) বলা হয়। এক গুচ্ছ স্কোরকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে গুচ্ছের মধ্যে কোন স্কোরটি মাত্র একবার এসেছে, কোনটি আবার একের বেশী বার এসেছে, কোনটি আবার একবারও আসেনি। স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোন একটি স্কোরের এই আবির্ভাবের বার বা সংখ্যাকে **ফ্রিকোয়েন্সী** বলা হয়। যেমন, স্কোরগুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি মাত্র একবার এসেছে তার ফ্রিকোয়েন্সী 1 ; যেটি 5 বার এসেছে তার ফ্রিকোয়েন্সী 5, আর যে স্কোরটি একবারও আসেনি তার ফ্রিকোয়েন্সী 0। এক গুচ্ছ স্কোরকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাজানোকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করা বলা হয়।

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠনের নিয়ম

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী বা আবির্ভাবের বার বা সংখ্যা অনুযায়ী সাজান হয়ে থাকে। এভাবে যখন অবিন্যস্ত (Ungrouped) স্কোরগুচ্ছকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান হয় তখন তাকে বিন্যস্ত (Grouped) স্কোরগুচ্ছ বলা হয়। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন তৈরী করার সময় নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করতে হয়।

১। প্রথমেই স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ নির্ণয় করতে হয়। বৃহত্তম স্কোর এবং ক্ষুদ্রতম স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে **প্রসার বা রেঞ্জ** (Range) বলে। একটি স্কোরগুচ্ছের বৃহত্তম স্কোরটি থেকে ক্ষুদ্রতম স্কোরটি বিয়োগ করলে ঐ স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ বা প্রসার পাওয়া যায়।

২। স্কোরগুলিকে সাজানোর জন্য সেগুলিকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দলে বা শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়। এগুলিকে **শ্রেণী ব্যবধান বা ক্লাস ইণ্টারভ্যাল** (Class-interval) নাম দেওয়া হয়েছে। মোট কতগুলি শ্রেণী-ব্যবধান হবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের আয়তন কত হবে সেটা আগেই নিরূপণ করে নিতে হবে। শ্রেণী-ব্যবধানের সংখ্যা ও আয়তন সাধারণত নির্ভর করে স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জের উপর এবং কিছু পরিমাণে স্কোরগুলির প্রকৃতির উপর।

৩। এইবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী-ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণী-ব্যবধানে সেটিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

নীচে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

উদাহরণ ঃ—50 জন কলেজের প্রবেশপ্রার্থীকে একটি সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা দেওয়া হল। পাওয়া গেল নীচের স্কোরগুলি ঃ—

85	66	51	45	66	91	77	64	71	74
47	78	58	†42	70	58	71	67	80	78
73	48	68	87	81	72	65	69	73	79
*97	81	76	87	56	72	62	93	73	84
75	56	76	61	53	72	62	79	68	83

* সর্বোচ্চ স্কোর † সর্বনিম্ন স্কোর

প্রথমে এই স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ বার করা হল। এর বৃহত্তম স্কোর 97 থেকে এর ক্ষুদ্রতম স্কোর 42 বাদ দিয়ে রেঞ্জ পাওয়া গেল 55।

দ্বিতীয় ধাপে এর শ্রেণী-ব্যবধান বা ক্লাস ইণ্টারভ্যাল নির্ণয় করতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রসার বা রেঞ্জ হচ্ছে 55। সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে সেগুলি সংখ্যায় আটের কম বা পনেরোর বেশী না হয়। অতএব এখানে যদি শ্রেণীব্যবধান 5 নেওয়া হয়, তবে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা দাঁড়ায় 12টি। 55কে 5 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 11, এখানে এর উপরও আর একটি শ্রেণীব্যবধান অতিরিক্ত নিতে হবে। তেমনই যদি শ্রেণীব্যবধানের

শ্রেণীব্যবধান	ট্যালি	ফ্রিকোয়েন্সী (f)
95—99	/	1
90—94	//	2
85—89	////	4
80—84	~~////~~	5
75—79	~~////~~ ///	8
70—74	~~////~~ ~~////~~	10
65—69	~~////~~ /	6
60—64	////	4
55—59	////	4
50—54	//	2
45—49	///	3
40—44	/	1
		N = 50

উপরে প্রদত্ত 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের বিন্যস্ত রূপ।

দৈর্ঘ্য নেওয়া হয় 3 তবে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা হয় 19টি এবং যদি শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য নেওয়া হয় 10 তবে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা হয় 6টি। এখন 5'ই হল সবচেয়ে উপযোগী শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য এবং সেই অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করা হল।

এইবার আমরা স্কোরগুলিকে সেগুলির নিজেদের শ্রেণীব্যবধান অনুযায়ী তালিকা ভুক্ত করব। 29'র পাতার তালিকাটিতে বাঁদিকের প্রথম স্তম্ভটি হল শ্রেণীব্যবধানের। সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্কোরটি আছে সবচেয়ে নিচে, তার উপরে তার চেয়ে বড়, এইভাবে সব উপরে আছে সবচেয়ে বড় শ্রেণীব্যবধানটি। প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে আছে 5টি করে স্কোর। যেমন, 40—44, এই শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যে আছে 40, 41, 42, 43 এবং 44, এই 5টি স্কোর। তার উপরের শ্রেণীব্যবধান 45—49টির মধ্যে আছে 45, 46, 47, 48 এবং 49, এই 5টি স্কোর। সব চেয়ে উপরের শ্রেণীব্যবধান 95—99র মধ্যে আছে 95, 96, 97, 98 এবং 99, এই 5টি স্কোর। 29'র পাতার তালিকার দ্বিতীয় স্তম্ভে যে দাগগুলি দেওয়া হয়েছে এগুলিকে ট্যালি (Tally) বলে। যখনই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে একটি বিশেষ স্কোরকে অন্তর্ভুক্ত করা হল তখনই সেই শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যেমন, এখানে প্রথম স্কোর 85 বণ্টনের নীচে থেকে দশম শ্রেণী-ব্যবধান (85—89)-টির অন্তর্গত। অতএব এই স্কোরটির জন্য ঐ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। তেমনই দ্বিতীয় স্কোর 47 নীচে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধান (45—49)-টির অন্তর্গত। অতএব ঐ স্কোরটির জন্য ঐ শ্রেণী-ব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। এইভাবে সবগুলি স্কোরের জন্য সেগুলি যে যে শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত সেই সেই শ্রেণীব্যবধানের পাশে একটি করে ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যখন 50টি স্কোরই এ-ভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে ট্যালির সংখ্যাও 50 হয়েছে। 29'র পাতার তালিকার তৃতীয় স্তম্ভে আছে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোরগুলির ফ্রিকোয়েন্সীর মোট সংখ্যা। বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ট্যালিগুলি যোগ করলে সেই শ্রেণীব্যবধানের মোট ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া যাবে। যেমন 75—79 শ্রেণীব্যবধানটির ট্যালিগুলি যোগ করে এই শ্রেণীব্যবধানটির মোট ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া গেল 8, সেইরকম 70—74 শ্রেণীব্যবধানটির মোট ফ্রিকোয়েন্সী হল 10; 65—65 শ্রেণীব্যবধানটির মোট ফ্রিকোয়েন্সী হল 6, ইত্যাদি। ফ্রিকোয়েন্সীগুলির যোগফল থেকে পাওয়া যাবে বণ্টনের মোট সংখ্যা (Number) বা N; এখানে N=50.

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তালিকাভুক্ত করার সময় শ্রেণীব্যবধানগুলির প্রকৃত প্রান্ত বা সীমা নির্ণয় করে নিতে হয়। নইলে স্কোরটিকে যে ঠিক কোন শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেটা নির্ণয় করতে অসুবিধা হবে। প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানেরই দুটি প্রান্ত আছে—ঊর্ধ্বপ্রান্ত (Upper limit) এবং নিম্নপ্রান্ত

(Lower limit)। যেমন, 40—44 এই শ্রেণীব্যবধানটির সব নীচে আছে 40 স্কোরটি এবং সব উপরে আছে 44 স্কোরটি। এখন 40 বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 39·5 থেকে 40·5। অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির সুরু 39·5 থেকে।
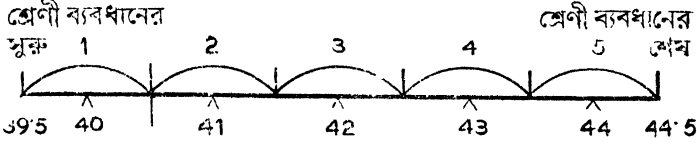
[40—45 শ্রেণীব্যবধানটির সংব্যাখ্যান]

তেমনই 44'র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল 43·5 থেকে 44·5; অতএব 40—44 এই শ্রেণীব্যবধানটির প্রকৃত নিম্নপ্রান্ত হল 39·5 এবং ঊর্ধ্বপ্রান্ত হল 44·5।

সেই রকম 45—49 শ্রেণীব্যবধানটির সংব্যাখ্যান করলে দাঁড়ায় 44·5—49·5। 50—54 শ্রেণীব্যবধানটি 49·5—54·5 ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হতে পারে 44 স্কোরটি কোন্ শ্রেণীব্যবধানে পড়বে? 40—44-তে, না 45—49তে। এর উত্তর হল যে আমরা এ ধরনের দুটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবর্তী স্কোরটিকে নীচের বা উপরের যে কোন শ্রেণীব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। তবে যে নিয়মটা একটি বিশেষ বণ্টনে একবার গ্রহণ করা হবে পরে সেই নিয়মটাই সেই বণ্টনে সব সময় অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান বইতে আমরা এই ধরনের স্কোরগুলিকে নীচের শ্রেণীব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত করব। অর্থাৎ 44 স্কোরটিকে 40—44'র শ্রেণীব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত করব, 49 স্কোরটিকে 45—49 শ্রেণীব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত করব ইত্যাদি।

শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু (Midpoint) নির্ণয়

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠনের সময় প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানে বিশেষ কতকগুলি করে স্কোর তালিকাভুক্ত করা হয়। যেমন 29'র পাতার দৃষ্টান্তে 45—49 শ্রেণীব্যবধানে 5টি স্কোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন এই 5টি স্কোরেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন একটি মানের দরকার পড়ে। সাধারণত শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দুকে ঐ শ্রেণীব্যবধানটির এই ধরনের প্রতিনিধিমূলক মানরূপে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ যে কোন শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোরগুলির প্রত্যেকটির মান ঐ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন 45—49 শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত 5টি স্কোরেরই মান হল ঐ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু 47। মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \text{শ্রেণীব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত} + \frac{\text{ঊর্ধ্বপ্রান্ত} - \text{নিম্নপ্রান্ত}}{2}$$

এই সূত্রটি উপরের দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করে আমরা পাই

$$45-49 \text{ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু} = 44\cdot5 + \frac{49\cdot5 - 44\cdot5}{2} = 44\cdot5 + 2\cdot5 = 47$$

মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের বিকল্প পন্থা

নিম্নলিখিত পন্থাতেও মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা যায়। যথা

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \frac{\text{উর্ধ্বপ্রান্ত} + \text{নিম্নপ্রান্ত}}{2} = \frac{49 \cdot 5 + 44 \cdot 5}{2} = \frac{94}{2} = 47$$

শ্রেণীব্যবধান লিখনের তিনটি পন্থা

একটি শ্রেণীব্যবধানকে কিভাবে লিখতে হয় উপরে তার একটি পদ্ধতির বর্ণনা করা হল। এ ছাড়াও আরও দুটি পন্থায় একটি শ্রেণীব্যবধান লেখা যেতে পারে। যেমন, 40—44 এই শ্রেণীব্যবধানটিকে আমরা (ক) 40 থেকে 45, (খ) 39·5 থেকে 44·5 এবং (গ) 40 থেকে 44, এই তিন উপায়ে লিখতে পারি। এর মধ্যে (খ)'র পন্থাটি সবচেয়ে নিখুঁত, কিন্তু লিখতে সময় এবং শ্রম বেশী লাগে বলে (ক) এবং (গ)'র পন্থা দুটি সাধারণত অনুসৃত হয়। আমরা এ বইতে (গ) পদ্ধতিটিরই অনুসরণ করব। নীচে তিন রকম পন্থা ব্যবহার করে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করা হল।

(ক)			(খ)			(গ)		
শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f	শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f	শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f
95—100	97	1	94·5—99·5	97	1	95—99	97	1
90—95	92	2	89·5—94·5	92	2	90—94	92	2
85—90	87	4	84·5—89·5	87	4	85—89	87	4
80—85	82	5	79·5—84·5	82	5	80—84	82	5
75—80	77	8	74·5—79·5	77	8	75—79	77	8
70—75	72	10	69·5—74·5	72	10	70—74	72	10
65—70	67	6	64·5—69·5	67	6	65—69	67	6
60—65	62	4	59·5—64·5	62	4	60—64	62	4
55—60	57	4	54·5—59·5	57	4	55—59	57	4
50—55	52	2	49·5—54·5	52	2	50—54	52	2
45—50	47	3	44·5—49·5	47	3	45—49	47	3
40—45	42	1	39·5—44·5	42	1	40—44	42	1
		N=50			N=50			N=50

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের চিত্ররূপ—ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম

অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাজিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন

গঠন করা হয় সেটিকে নানা উপায়ে চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়। সেগুলির মধ্যে দুটি সুপ্রচলিত পদ্ধতির নাম হল, ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন বা বহুভুজ (Frequency Polygon) এবং হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র (Histogram)।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন (Frequency Polygon) গঠনের নিয়ম

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন বা হিস্টোগ্রাম, যে কোন চিত্র আঁকতে গেলে প্রথমে একটি অধঃরেখা (Base line) ঠিক করে নিতে হবে। এই অধঃরেখার সর্ব বামপ্রান্তে লম্বভাবে আর একটি রেখা টানতে হবে। বীজগণিতের চিত্র আঁকার সময় যে দুটি রেখাকে x-অক্ষরেখা এবং y-অক্ষরেখা বলা হয় আমাদের অধঃরেখা ও লম্বরেখাটিও সে দুটির সঙ্গে অভিন্ন।

এখন নীচের অধঃরেখা বা x-অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর বসাতে হবে এবং লম্বরেখা বা y-অক্ষরেখার উপর ফ্রিকোয়েন্সীগুলি ছকতে হবে। শ্রেণীব্যবধান-গুলি অধঃরেখায় বসাবার সময় সেগুলির প্রকৃত প্রান্তগুলির উল্লেখ করতে হবে।
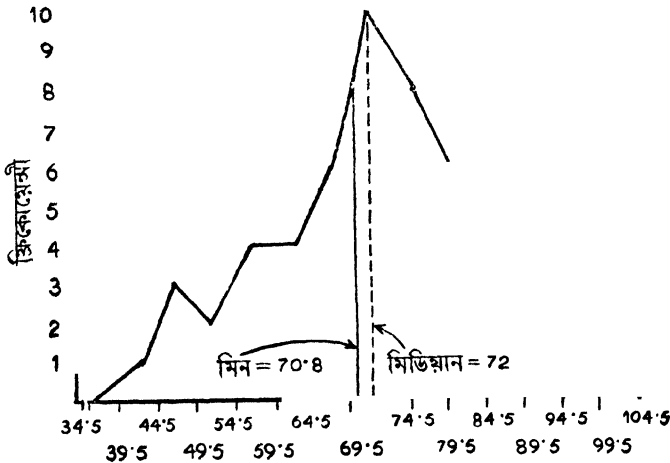
[29'এর পাতার 50টি স্কোরের বণ্টনের ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন]

এর পরের ধাপে চিত্রটিতে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে এবং সেইমত সেইগুলিকে চিত্রে ছকে নিতে হবে। যেমন, দেখা যাচ্ছে 40—44 (অর্থাৎ 39·5—44·5) শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী 1; এটিকে আঁকতে হলে প্রথমে x-অক্ষরেখায় ঐ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 42 স্কোরে পৌঁছতে হবে। তারপর ঐ বিন্দুটির উপর লম্বভাবে y-অক্ষরেখার সমান্তরাল করে 1 একক ঘর উপরের দিকে গুনতে হবে এবং তার ফলে যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে সেইটি হবে ঐ চিত্রে ঐ শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থানমূলক বিন্দু।

সেইভাবে পরের শ্রেণীব্যবধানটি 45—49 (অর্থাৎ 44·5—49·5)'র অন্তর্গত হল 3টি স্কোর। এখানে ঐ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 47'র ঠিক উপরে y-অক্ষরেখার সমান্তরাল করে 3টি একক ঘর গুনে ঐ ফ্রিকোয়েন্সীটির অবস্থান ছকতে হবে। এই ভাবে আমাদের সব কটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থানগুলি ছকে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সীর জন্য আমরা চিত্রটিতে একটি করে বিন্দু পাব। তারপর সেই বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটি পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকেই ঐ শ্রেণীব্যবধানে প্রতিনিধিসূচক বিন্দু বলে ধরে নেওয়া হবে এবং মধ্যবিন্দুর উপর অঙ্কিত লম্বরেখাতেই ফ্রিকোয়েন্সীর বিন্দুটি ছকতে হবে।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সীসূচক বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় সেটি অধঃরেখা বা x-অক্ষরেখাকে স্পর্শ করে না এবং কিছুটা উপরে শূন্যে ঝুলে থাকে। চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য x-অক্ষরেখার বাম প্রান্তে একটি শ্রেণীব্যবধান এবং ডানপ্রান্তে একটি শ্রেণীব্যবধান বেশী নেওয়া হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত দুটি শ্রেণীব্যবধানেরই ফ্রিকোয়েন্সী স্বভাবত 0 বলে এদের মধ্যবিন্দুগুলি x অক্ষরেখার উপরেই অবস্থিত। এই দুটি মধ্যবিন্দুর সঙ্গে চিত্রটিকে সংযুক্ত করলেই পূর্ণাঙ্গ ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটি পাওয়া যাবে। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

75%'র সূত্র

যাতে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটি আকৃতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুষম হয় সেজন্য শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব এবং ফ্রিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ মান—এই দুটি বিবেচনা করে x-অক্ষরেখা ও y-অক্ষরেখার এককগুলি নির্বাচিত করতে হয়। যেমন, যদি x-অক্ষরেখার একক ছোট হয় এবং সে অনুপাতে y-অক্ষরেখার একক বড় নেওয়া হয় তবে পলিগনটি অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হয়ে যাবে। আবার যদি x-অক্ষরেখার একক বড় হয় সেই অনুপাতে y-অক্ষরেখার একক ছোট হয় তবে পলিগনটি ছোট ও উপরের দিকে চ্যাপ্টা দেখাবে। সেই জন্য y-অক্ষরেখায় অঙ্কিত শ্রেণী-ব্যবধানগুলির দৈর্ঘ্য ও x-অক্ষরেখায় অঙ্কিত ফ্রিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ উচ্চতা—এ'দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাত রাখার চেষ্টা করা হয় এবং সাধারণভাবে দেখা হয় যে পলিগনটির উচ্চতা যেন তার অধঃরেখার মোট দৈর্ঘ্যের 75% বা তার কাছাকাছি হয়। একে 75%'র সূত্র বা নিয়ম বলা হয়।

হিস্টোগ্রাম (Histogram) গঠনের নিয়ম

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের আর একটি চিত্ররূপকে হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র বলা হয়। 29'র পৃষ্ঠার ঐ একই বণ্টনের একটি হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র পর পৃষ্ঠায় আঁকা হয়েছে।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের মত হিস্টোগ্রামেও অধঃরেখা বা x-অক্ষরেখায় শ্রেণী-ব্যবধানগুলিকে ছকে নেওয়া হয়। বামপ্রান্তের লম্বরেখায় বা y-অক্ষরেখায় ফ্রিকোয়েন্সীগুলিও একই ভাবে ছকা হয়। এইবার প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীসূচক বিন্দুটি y-অক্ষরেখায় গুনে বার করতে হয় এবং সেই বিন্দুটিকে উর্ধ্বসীমা ধরে x-অক্ষরেখায় ঐ শ্রেণীব্যবধানটির উপর একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হয়। প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রের বিস্তার হবে শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্যের সমান এবং যেহেতু সমস্ত শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য একই, আয়তক্ষেত্রগুলির প্রস্থ বা প্রসার সব ক্ষেত্রেই
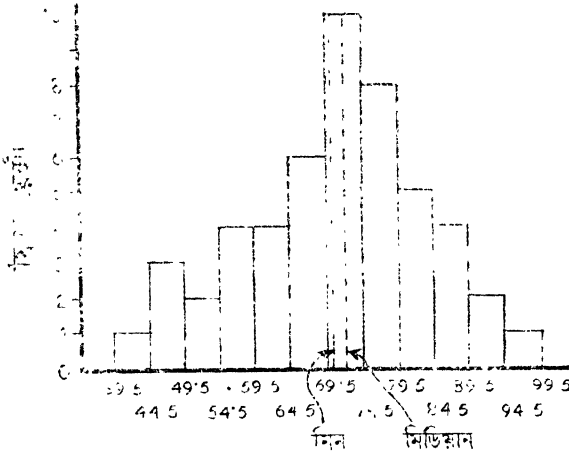
[29'র পৃষ্ঠার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের হিস্টোগ্রাম]

এক হবে। কিন্তু আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা হবে সেই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরের সংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সীর সংখ্যা অনুযায়ী। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা বিভিন্ন হবে।

উপরের দৃষ্টান্তে প্রথম শ্রেণীব্যবধান 40 – 44 (অর্থাৎ 39·5—44·5)'র ফ্রিকোয়েন্সী হল 1। অতএব ঐ শ্রেণীব্যবধানের উপরে y-অক্ষরেখায় 1 একক ঘর গুনে নিয়ে ঐ উচ্চতা পর্যন্ত একটি আয়তক্ষেত্র আঁকা হল। সেই রকম 45—49 (অর্থাৎ 44·5—49·5) শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী হল 3; অতএব ঐ শ্রেণীব্যবধানের উপর y-অক্ষরেখায় 3 একক ঘর গুনে ঐ উচ্চতা পর্যন্ত একটি আয়তক্ষেত্র আঁকা হল। এইভাবে সব কটি শ্রেণীব্যবধানের উপর আয়তক্ষেত্র আঁকলেই এই বণ্টনটির হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্রটি সম্পূর্ণ হবে।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ও হিস্টোগ্রাম উভয়ের বেলাতেই চিত্রের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রটির দ্বারা বণ্টনের সমগ্র ফ্রিকোয়েন্সীকে (যা N অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে) বোঝায়। তবে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীকে স্বতন্ত্র

ভাবে বোঝাবার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু হিস্টোগ্রামের প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্র এক একটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত ফ্রিকোয়েন্সীকে বুঝিয়ে থাকে। সে দিক দিয়ে সমগ্র ফ্রিকোয়েন্সীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অনুপাতের একটি নিখুঁত ধারণা হিস্টোগ্রাম থেকেই পাওয়া যায়।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ও হিষ্টোগ্রামের অভিস্থাপন

একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বণ্টনের দুটি পলিগন বা দুটি হিস্টো-গ্রাম বা একটি পলিগন এবং অপরটি হিস্টোগ্রাম আঁকা যেতে পারে। সাধারণতঃ দুটি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মধ্যে তুলনার সময় একটি পলিগন ও অপরটির হিস্টোগ্রাম একই অক্ষরেখার উপর এঁকে সে দুটির মধ্য মিল ও অমিল পর্যবেক্ষণ
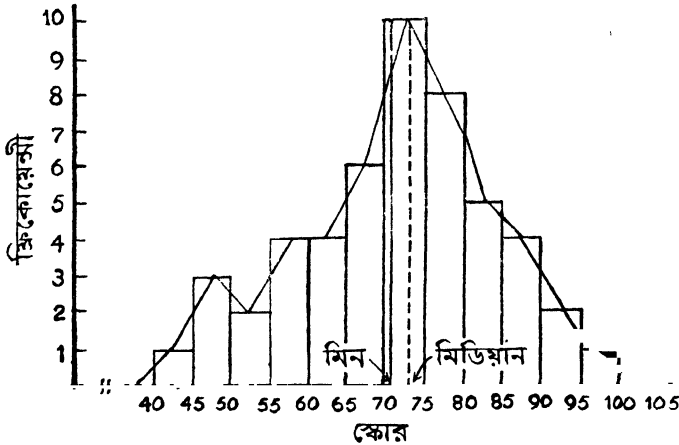
[29'র পৃষ্ঠার 50টি স্কোরের বণ্টনের ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম একই অক্ষরেখায় অভিস্থাপন করা হয়েছে]

করা হয়ে থাকে। এই ধরনের অভিস্থাপনের দ্বারা দুটি বণ্টনের অতি চমৎকার একটি তুলনামূলক সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। উপরের চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

দশমিক সংখ্যার সংবৃতকরণ (Rounding of Decimals)

দশমিক-বিশিষ্ট সংখ্যাগুলিকে প্রায়ই সংক্ষিপ্ত বা সংবৃত করার দরকার পড়ে। এর জন্য একটা নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যেমন, 7·8456 সংখ্যাকে দু'ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাঁড়ায় 7·85, তেমনই একঘর দশমিকে 7·8। সংবৃতকরণের এই নিয়মটি হল যে যে সংখ্যা পর্যন্ত সংবৃত করা হবে যদি তার পরে 5 বা 5'র

বেশী সংখ্যা থাকে তাহলে ঠিক পূরোবর্তী সংখ্যাটি এক অঙ্ক বেড়ে যাবে। আর যদি পরবর্তী সংখ্যাটি 5'র কম হয় তাহলে পূরোবর্তী সংখ্যার কোন রকম পরিবর্তন করার দরকার পড়ে না। যেমন, 6·456 এবং 8·6473কে দু'ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাঁড়াবে 6·46 এবং 8·65, কিন্তু 8·6443কে দু'ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাঁড়াবে 8·64।

অনুশীলনী

1. নীচের বিষম রাশিগুলির মধ্যে কোন্‌টি অবিচ্ছিন্ন সারি এবং কোন্‌টি বিচ্ছিন্ন সারির অন্তর্ভুক্ত বল : (ক) সময় (খ) কোন বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেতন (গ) কোন বিদ্যালয়ের শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা (ঘ) বয়স (ঙ) আদমসুমারির তথ্য (চ) একটি রেলগাড়ি যতটা দূরত্ব ভ্রমণ করেছে (ছ) ক্রিকেটের স্কোর (জ) ওজন (ঝ) ১০০টি বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা (ঞ) বুদ্ধ্যঙ্ক।

2. প্রদত্ত স্কোরগুলির ঊর্ধ্ব প্রান্ত এবং নিম্নপ্রান্ত লেখ : 64, 8, 365, 1, 86, 165

3. নীচে কতকগুলি স্কোরগুচ্ছের প্রসার (Range) দেওয়া আছে। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন তৈরী করতে হলে শ্রেণীব্যবধানের আয়তন কত বড় হবে এবং শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা কত হবে বল।

বিস্তার	শ্রেণীব্যবধানের আয়তন	শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা
15 থেকে 87		
0 থেকে 46		
110 থেকে 211		
65 থেকে '52		
3 থেকে 13		

4. নীচে প্রদত্ত শ্রেণীব্যবধানগুলির ক্ষেত্রে (ক) ঊর্ধ্বপ্রান্ত এবং নিম্নপ্রান্ত এবং (খ) মধ্যবিন্দু গণনা কর।

45—47	160—164	63—67	0—9
1—4	80—89	15—16	26—29

5. নীচের 15টি স্কোরকে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে নিয়ে যাও। শ্রেণীব্যবধানের আয়তন 3 নেবে এবং প্রথম শ্রেণীব্যবধানটি 60 দিয়ে আরম্ভ করবে।

72	75	80	81	60
82	67	76	85	62
75	64	83	79	61

6. শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য (ক) তিন (খ) পাঁচ এবং (গ) দশ ধরে নীচের স্কোরগুলিকে তিনটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে নিয়ে যাও। প্রথম শ্রেণীব্যবধানটি 45 দিয়ে সুরু করবে।

63	78	76	58	95
46	78	92	86	88
74	65	73	72	91
78	70	75	84	99
87	86	93	89	76

7. পূর্বপৃষ্ঠার প্রশ্নসংখ্যা 5 এবং 6-'র ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন দুটির ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন এবং হিষ্টোগ্রাম আঁক।

8. শ্রেণী ব্যবধানের দৈর্ঘ্য 3, 5 এবং 10 ধরে নীচের 100টি স্কোরের বণ্টন আঁক। প্রথম শ্রেণীব্যবধানটি 45 দিয়ে শুরু কর।

90	85	85	96	72
81	84	81	83	92
80	86	86	78	71
85	103	81	78	98
92	83	72	98	110
73	75	85	74	95
89	76	81	105	73
82	86	83	63	56
95	84	90	73	75
73	86	82	71	94
63	78	76	58	95
78	86	80	96	94
46	78	92	86	88
82	101	102	70	50
76	65	73	72	91
103	90	87	74	83
78	75	70	84	98
86	73	85	99	93
103	90	79	81	83
87	86	93	69	76

9. নীচের স্কোরগুলিকে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে নিয়ে যাও।

64	72	70	73	72
69	72	76	86	67
84	63	76	65	77
67	71	82	78	75
61	83	67	81	72

10. শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য 5 ধরে নীচের স্কোরগুচ্ছ দুটির দুটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন তৈরী কর। প্রথম গুচ্ছটির বণ্টনটি 45 দিয়ে এবং দ্বিতীয় গুচ্ছটি 50 দিয়ে শুরু কর।

First Set (N=64)

70	71	67	90	51	73	90
67	79	81	81	58	76	72
51	76	76	90	71	72	62
89	90	76	71	88	66	81
91	91	65	63	65	76	
79	80	71	76	54	80	
72	63	87	91	90	45	
69	66	80	79	71	75	
58	50	47	67	67	52	
64	88	54	70	80	92	

Second Set (N=46)

84	70	78	58	84
80	74	86	52	74
90	87	92	78	62
82	76	85	85	90
84	79	54	94	81
70	97	65	66	77
89	69	56	57	
77	78	71	63	
62	95	65	71	
79	85	70	71	

11. কোন পরীক্ষায় 45 জন শিক্ষার্থী নীচের যে মার্কসগুলি পেয়েছে সেগুলির ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন এবং হিস্টোগ্রাম আঁক।

22	23	29	21	19
	26	30	26	25
29	30	30	23	20
21	31	20	28	28
30	24	24	24	20
28	26	28	26	24
24	22	25	26	27
31	32	35	21	17
27	23	25	34	15

12. শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য তিন ধরে নীচের 25টি স্কোরের একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন আঁক। প্রথম শ্রেণীব্যবধানটি 60 দিয়ে শুরু কর। বণ্টনটিকে চিত্রাকারে নিয়ে যাও।

72	83	78	67	75	67	72	73	64
81	61	82	77	63	86	69	70	
67	75	71	65	84	76	72	72	

13. উপরের বণ্টন দুটির একই অক্ষরেখায় দুটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন আঁক।

14. প্রশ্নসংখ্যা 8 এবং 9এ প্রদত্ত স্কোরগুলির ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন এবং হিস্টোগ্রাম আঁক।

15. শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য 10 ধরে প্রশ্ন 8'র 100টি স্কোরের একটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন আঁক। ঐ একই অক্ষ ব্যবহার করে ঐ পলিগনটির উপর একটি হিস্টোগ্রাম অভিস্থাপন কর।

16. নীচের রাশিগুলি দুই দশমিক ঘরগুলি পর্যন্ত সংবৃত কর।

3·5872	74·168	126·83500
67·9223	25·193	81·72558

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency)

কোন পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানোর পর সেগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতার (Central Tendency) একটা পরিমাপ বার করা হয়। কোন বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায় এমন একটি অঙ্ক যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে পারে। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে স্কোরগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও যখন তারা একটি বণ্টনের অন্তর্গত তখন তাদের বিশেষ একটা কেন্দ্রের দিকে যাবার প্রবণতা আছে। একেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার কোন একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ পেলে দুটি উপকার হয়। প্রথমত, যে দলটির কাছ থেকে স্কোরগুলি পাওয়া গেছে তাদের কাজের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যে দুই বা তার বেশী দলের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। সাধারণত পরিসংখ্যান শাস্ত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের তিন শ্রেণীর পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা, (১) গাণিতিক **মিন** (Arithmetic Mean), (২) **মিডিয়ান** (Median) এবং (৩) **মোড** (Mode)।

১। মিন নির্ণয়ের পন্থা (Calculation of Mean)

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিনই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। মিন বার করার নিয়ম হল সমস্ত স্বতন্ত্র স্কোরগুলিকে যোগ করে সেগুলির যোগফলকে স্কোরের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। সূত্রটি হল—

$$M=\frac{\sum X}{N}$$

[এখানে M = মিন, N = স্কোরগুলির মোট সংখ্যা ; X = স্কোর ; $\sum$ = যোগফল]

উদাহরণ ঃঃ এক ভদ্রলোক পর পর পাঁচ মাসে আয় করলেন যথাক্রমে, 400, 350, 500, 625, 525 টাকা। তাঁর আয়ের মিন বার কর।

তাঁর আয়ের মিন $= \frac{400+350+500+625+525}{5} = 480$ টাকা

মিন নির্ণয়ের উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করা যাবে যখন স্কোরগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের রূপে সাজানো হয়ে যাবে,

তখন উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। কেননা ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত স্কোরের সংখ্যাকে ফ্রিকোয়েন্সীর (f) সংখ্যা দিয়ে বোঝান হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোরকে বোঝান হয় ঐ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দুর দ্বারা। অতএব প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের স্কোরের মোট যোগফল পেতে হলে তার মধ্যবিন্দুটিকে তার ফ্রিকোয়েন্সী (f) দিয়ে গুণ করতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের fX নির্ণয় করা হবে। তারপর fX-গুলির যোগফলকে $\sum fX$ কে মোট সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করলে বণ্টনটির মিন পাওয়া যাবে। অতএব ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন বার করার সূত্র হল,

$$M = \frac{\sum fX}{N}$$

29'র পৃষ্ঠায় 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন বার করতে হলে প্রত্যেক শ্রেণীব্যবধানের fX বার করতে হবে। যেমন 40—44 শ্রেণীব্যবধানটির fX হল 42, 45—49, শ্রেণীব্যবধানটির fX হল 141 ইত্যাদি। এই fX-গুলির যোগফল 3540 এবং এই fX'র যোগফলকে মোটসংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে মিন। এখানে মিন হল $\frac{3540}{50} = 70{\cdot}80$

উদাহরণ ঃ 29'র পৃষ্ঠার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন নির্ণয়।

শ্রেণীব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f		fX
95—99	97	1		97
90—94	92	2		184
85—89	87	4		348
80—84	82	5		410
75—79	77	8	20	616
70—74	72	10		720
65—69	67	6	20	402
60—64	62	4		248
55—59	57	4		228
50—54	52	2		104
45—49	47	3		141
40—44	42	1		42
		N=50		3540

N/2=25

$$\text{মিন} = \frac{\sum fX}{N} = \frac{3540}{50} = 70{\cdot}80$$

মিডিয়ান $= 69{\cdot}5 + \frac{5}{10} \times 5 = 72{\cdot}00$;

স্থূল মোড $= 70 - 74$'র শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু $= 72{\cdot}00$;

প্রকৃত মোড $= 74{\cdot}40$

মিডিয়ান নির্ণয়ের পন্থা (Calculation of Median)

স্কোরগুলি যখন অবিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান হয় না তখন স্কোরগুলির মিডিয়ান নির্ণয় করার নিয়ম হল নিম্নরূপ ঃ—

স্কোরগুলিকে তাদের আয়তন বা মান অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে যে সারিটি পাওয়া যায় তার মধ্যবিন্দুটি হবে স্কোরগুলির মিডিয়ান। উদাহরণস্বরূপ 6, 8, 7, 10, 11, 7, 9—এই স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করতে হলে এগুলিকে প্রথমে এদের আয়তন অনুযায়ী সাজিয়ে একটি সারিতে নিয়ে যেতে হবে। যেমন,

6 7 7 (8) 9 10 11

এবার এই সারিতে 8 স্কোরটির উপরে আছে তিনটি স্কোর, নীচে আছে তিনটি স্কোর। অতএব 8 হল এই স্কোরগুলির মধ্যবিন্দু বা মিডিয়ান।

বিজোড় সংখ্যাসম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান নির্ণয় করা সহজ। জোড়-সংখ্যাসম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করতে হলে এই মধ্যবিন্দুটি সরাসরি পাওয়া যায় না। সেটিকে গণনা করে নিতে হয়। যেমন নীচের জোড়সংখ্যক সারিতে—

8·5

6 7 8 ↑ 9 10 11

এখানে মিডিয়ান বা মধ্যবিন্দু হবে 8 এবং 9—এই দুটি স্কোরের ঠিক মাঝখানের বিন্দুটি। এখন স্কোর 8 হল 7·5 থেকে 8·5 আর স্কোর 9 হল 8·5 থেকে 9·5 (27'র পৃষ্ঠা দেখ)। অতএব মিডিয়ান হল 8 এবং 9'র বা 7·5 এবং 9·5'র মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 8·5।

অবিন্যস্ত স্কোরের মিডিয়ান বার করার সূত্রটি হল—

$$\text{মিডিয়ান} = \frac{(N+1)}{2}\text{তম স্কোরটি}$$ [আয়তন অনুযায়ী সাজানো সারিতে]

যেমন, উপরের প্রথম উদাহরণটিতে

$$\text{মিডিয়ান} = \frac{7+1}{2}\text{তম স্কোরটি}$$ অর্থাৎ 4র্থ স্কোর অর্থাৎ 8।

তেমনই দ্বিতীয় উদাহরণটিতে

মিডিয়ান হল $=\frac{6+1}{2}$তম স্কোরটি অর্থাৎ 3·5তম স্কোরটি অর্থাৎ 8·5 ;

বিন্যস্ত স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানো স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে মিডিয়ান বার করার সূত্র হল—

$$Mdn = l + \left\{\frac{\frac{N}{2} - F}{f_m}\right\} \times i$$

[এখানে Mdn = মিডিয়ান ;

l = যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে তার নিম্নপ্রান্ত ;

$\frac{N}{2}$ মোট সংখ্যার অর্ধেক ;

$F = l$'র নীচে অবস্থিত শ্রেণীব্যবধানগুলিতে যত স্কোর আছে সেগুলির যোগফল ;

f_m = যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে সেই ব্যবধানটির স্কোরের সংখ্যা।

i = শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য।]

এই সূত্রটির প্রয়োগ করে মিডিয়ান বার করতে হলে নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করতে হবে।

১। প্রথমে N/2 বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট স্কোর সংখ্যার অর্ধেক কত দেখতে হবে।

২। এবার বণ্টনের নীচ থেকে N/2 সংখ্যক স্কোর গুনে উপরে উঠতে হবে এবং বার করতে হবে যে কোন্ শ্রেণীব্যবধানে N/2 সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। বুঝতে হবে যে সেই শ্রেণীব্যবধানেই মিডিয়ানটি পড়েছে। তারপর সেই শ্রেণীব্যবধানের নিম্নপ্রান্তটি বার করতে হবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে l এবং l'র নীচে যত স্কোর পাওয়া যাবে সেগুলির যোগফলকে F বলা হয়েছে।

৩। এবার $\frac{N}{2}$ থেকে F বাদ দিতে হবে। পাওয়া যাবে $\frac{N}{2} - F$;

তারপর এই সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে f_m দিয়ে। যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়েছে তার ফ্রিকোয়েন্সী বা স্কোর সংখ্যা হল f_m। এবার এই ভাগফলকে শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য বা i দিয়ে গুণ করতে হবে।

৪। এবার যে সংখ্যাটি পাওয়া গেল তার সঙ্গে l অর্থাৎ যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়েছে তার নিম্নপ্রান্তটি যোগ করতে হবে। যোগ করে যে সংখ্যাটি পাওয়া গেল সেটি হল মিডিয়ান।

উদাহরণ : 29'র পৃষ্ঠার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনটির মিডিয়ান বার করা হচ্ছে। এখানে N/2 হল 25। নীচ থেকে উপরের দিকে ফ্রিকোয়েন্সী গুনে দেখা গেল N/2 বা 25 পড়েছে 70—74 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে। তবে l হল এই শ্রেণীব্যবধানটির নিম্নপ্রান্ত অর্থাৎ 69.5 ; F হল এই শ্রেণীব্যবধানের নীচে যত ফ্রিকোয়েন্সী আছে

তাদের যোগফল অর্থাৎ 1+3+2+4+4+6=20 ; এইবার N/2 − F হল 25 − 20 = 5। তারপর f_m হল 70 −74 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী অর্থাৎ 10। তাহলে,

$$\frac{\frac{N}{2} - F}{f_m} \text{ হল } \frac{5}{10} = \cdot 50$$

এইবার এই সংখ্যাকে i অর্থাৎ শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব বা 5 দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল ·50 × 5 = 2·50। তার পরের ধাপে এই সংখ্যাটি যোগ করা হল l বা যে শ্রেণী ব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়েছে তার নিম্নসীমার সঙ্গে এবং পাওয়া গেল, 69·5 + 2·50 = 72·00 অতএব এই বণ্টনের মিডিয়ান হল 72·00। (পৃ 41—পৃ 42 দ্রষ্টব্য।)

মোড নির্ণয়ের পন্থা (Calculation of Mode)

কোন স্কোরগুচ্ছের দু'প্রকারের মোড নির্ণয় করা যেতে পারে—**অভিজ্ঞতা-নির্ভর মোড** (Empirical Mode) বা **স্থূল মোড** (Crude Mode) এবং **বিজ্ঞানসম্মত মোড** বা **প্রকৃত মোড** (True Mode)।

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের স্থূল মোড হল সেই স্কোরগুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশী বার এসেছে সেটি। যেমন 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14—এই সারিটিতে সবচেয়ে বেশী বার এসেছে 14 সংখ্যক স্কোরটি। অতএব 14 হল এই সারিটির অভিজ্ঞতা-নির্ভর মোড বা স্থূল মোড।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান স্কোরগুচ্ছের স্থূল মোড বার করার নিয়ম হল, যে শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী সব চেয়ে বেশী সেই শ্রেণী-ব্যবধানটির মধ্যবিন্দু নেওয়া। যেমন 29'র পাতার উদাহরণটিতে 70—74 শ্রেণী-ব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী। অতএব এই বণ্টনটির স্থূল মোড হল এই শ্রেণী ব্যবধানটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 72·00।

কোন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের প্রকৃত মোড বলতে বোঝায় সেই বিন্দুটি যে বিন্দুতে স্কোরের বণ্টনে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে স্কোর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একে স্কোরের কেন্দ্রীভবনের শীর্ষবিন্দু বলা চলে। স্থূল মোড হল এই শীর্ষবিন্দুটি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা। প্রকৃত মোড হল সূক্ষ্ম গণনা করে পাওয়া বণ্টনের এই শীর্ষবিন্দুটির পরিমাপ। প্রকৃত মোড নির্ণয়ের সূত্র হল—

মোড = 3 মিডিয়ান − 2 মিন (Mode = 3Mdn − 2M)

অর্থাৎ মিডিয়ানের 3 গুণ থেকে মিনের 2 গুণ বাদ দিলে প্রকৃত মোড পাওয়া যায়। 29'র পাতার বণ্টনটির প্রকৃত মোড হল = (3 × 72·00) − (2 × 70·80)

= 216·00 − 141·60

= 74·40

মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা
(Short Method of Mean Calculation)

মিন নির্ণয় করার সাধারণ পন্থা হল মোট স্কোরগুলির যোগফলকে ($\sum X$) তাদের মোট সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করা। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে সেই শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করে যে গুণ-ফলগুলি পাওয়া যায় সেই গুণফলগুলিকে (fX) যোগ করে সেই যোগফলকে ($\sum fX$) স্কোরের মোট সংখ্যা N দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু যখন স্কোরের সংখ্যা অনেক হয়ে দাঁড়ায় তখন এই পন্থায় মিন বার করা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। সেই জন্য এই সব ক্ষেত্রে মিন বার করার একটি সংক্ষিপ্ত পন্থার অনুসরণ করা হয়। এই পন্থায় আমরা একটি কল্পিত মিন আগেই ধরে নিই বা অনুমান করে নিই। একে আমরা **অনুমিত মিন** (**Assumed Mean or AM**) নাম দিয়ে থাকি। নানা ভাবে এই 'অনুমিত মিন' ধরে নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক পন্থাটি হল বণ্টনের মাঝামাঝি একটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুটি নেওয়া। তবে যে শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী বেশ বেশী এবং যেটির অবস্থিতিও বণ্টনের মাঝামাঝি সেটির মধ্যবিন্দু নিতে পারলে গণনার সুবিধা হয়।

সংক্ষিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয়ের উদাহরণ

(29'র পাতার স্কোরগুচ্ছের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন)

(1) শ্রেণীব্যবধান	(2) মধ্যবিন্দু(X)	(3) (f)	(4) (d')	(5) (fd')
95—99	97	1	5	5
90—94	92	2	4	8
85—89	87	4	3	12
80—84	82	5	2	10
75—79	77	8	1	8 +43
70—74	72	10	0	0
65—69	67	6	−1	− 6
60—64	62	4	−2	− 8
55—59	57	4	−3	−12
50 54	52	2	−4	− 8
45—49	47	3	−5	−15
40—44	42	1	−6	− 6 −55
		N=50		$\sum fd = -12$

AM = 72·00 $c = -\frac{12}{50} = -\cdot240$

$ci = -1\cdot20$ $i = 5$

M = 70·80 $ci = -\cdot240 \times 5 = -1\cdot20$

সংক্ষিপ্ত পন্থায় মিন নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ—

$$\text{Mean} = \text{AM} + ci$$

বা মিন = অনুমিত মিন + সংশোধন × শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য

পূর্ব পৃষ্ঠার বণ্টনটিতে 70—74 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হল সবচেয়ে বেশী এবং সেটির অবস্থানও বণ্টনের মাঝামাঝি। অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দুটি, অর্থাৎ 72কে অনুমিত মিন রূপে নেওয়া হল। কিন্তু অনুমিত মিনটি কখনই নির্ভুল নয়, তার জন্য প্রয়োজন এটিকে সংশোধন করা। সুতরাং আমাদের পরের কাজ হচ্ছে অনুমিত মিনটির সংশোধন (Correction) কতটা হবে তা বার করা এবং অনুমিত মিনের সঙ্গে সেই সংশোধনটি যোগ করে বণ্টনটির প্রকৃত মিন নির্ণয় করা। তার জন্য আমাদের নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

(ক) প্রথমে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু আমাদের অনুমিত মিন থেকে কত দূরে আছে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন, 70—74 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু (72) হল অনুমিত মিন। অতএব 75—79 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু (77) এই অনুমিত মিন থেকে 1 শ্রেণীব্যবধান ঘর সরে আছে। অনুমিত মিন থেকে কোন বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর সরে থাকাকে ঐ শ্রেণীব্যবধানের বিচ্যুতি (Deviation) বলে। সাধারণত d' অক্ষর দিয়ে এ বিচ্যুতিটিকে চিহ্নিত করা হয়। এই বিচ্যুতি মাপা হয় শ্রেণীগত ব্যবধানের এককের দ্বারা। অর্থাৎ অনুমিত মিন থেকে একটি বিশেষ মধ্যবিন্দু ক'টি শ্রেণীব্যবধান দূরে আছে তা গণনা করে। ঐ বিশেষ মধ্যবিন্দুটি অনুমিত মিন থেকে যতগুলি শ্রেণীব্যবধান দূরে থাকবে তত সংখ্যক হবে সেই বিশেষ মধ্যবিন্দুটির d' বা বিচ্যুতি। যেমন, প্রদত্ত বণ্টনটিতে অনুমিত মিন থেকে 75—79'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 1, 80—84'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 2, 84—89'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 3। যে শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত মিনরূপে নেওয়া হয়েছে তার বিচ্যুতি সব সময়ে 0; অতএব d' স্তম্ভে 70—74'র সারিতে বসানো হয়েছে 0, 75—79'র সারিতে 1, 80—84'র সারিতে 2, ইত্যাদি। অনুমিত মিনের নীচে যে সব মধ্যবিন্দু থাকবে সেগুলির বিচ্যুতি হবে ঋণাত্মক এবং সেগুলির পূর্বে বিয়োগচিহ্ন দিতে হবে। অতএব 65—69'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল −1, 60—64'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল −2, 55—59'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল −3 ইত্যাদি।

(খ) d'র স্তম্ভ পূরণ করার পর আমাদের fd' নির্ণয় করতে হবে। যে কোন শ্রেণীব্যবধানের d'র সঙ্গে তার f বা ফ্রিকোয়েন্সী গুণ করলেই fd' পাওয়া যাবে। যেমন 70 -74 শ্রেণীর fd' হল $10 \times 0 = 0$; 75—79'র fd' হল $8 \times 1 = 8$; 65 – 69'র fd' হল $6 \times -1 = -6$ ইত্যাদি।

(গ) এবার অনুমিত মিনের উপরে ধনাত্মক fd' গুলি যোগ করে এবং অনুমিত মিনের নীচে ঋণাত্মক fd' গুলি যোগ করে যথাক্রমে পাওয়া গেল $+43$ এবং -55। এই দুটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে $+43-55=-12$; অনুমিত মিনের সংশোধন (correction বা c) পাওয়া যাবে এই fd'র মোট যোগফলকে ($\sum fd'$) মোট স্কোর সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ এখানে $c=-\frac{12}{50}=-{\cdot}240$। এবার এই সংশোধনকে ($c$) শ্রেণীগত ব্যবধানের দৈর্ঘ্য (i) দিয়ে গুণ করতে হবে, ফলে পাওয়া যাবে $ci=-{\cdot}240\times 5=-1{\cdot}20$।

(ঘ) অনুমিত মিন থেকে প্রকৃত মিন নির্ণয়ের পন্থা হল অনুমিত মিনের সঙ্গে শ্রেণীগত ব্যবধান ও সংশোধনের গুণফল অর্থাৎ ci যোগ করা। এখানে অনুমিত মিন 72·00'র সঙ্গে ci ($-1{\cdot}20$) যোগ করে পাওয়া গেল 70·80। অতএব এই বণ্টনটির প্রকৃত মিন হল 70·80। (45'র পাতার তালিকা দ্রষ্টব্য)

মিন, মিডিয়ান ও মোডের তুলনামূলক প্রয়োগ

দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা তিন রকমের হতে পারে। এখন কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ কেন্দ্রীয় প্রবণতাটি ব্যবহার করা উচিত সেটি জানা দরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুলনামূলক প্রয়োগের একটি মোটামুটি বিবরণী দেওয়া হল।

মিন ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পেতে চাই। দেখা গেছে যে তিন শ্রেণীর কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সবচেয়ে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত।

(খ) যখন বণ্টনটি থেকে আদর্শ বিচ্যুতি (বা SD), সহপরিবর্তনের মান (বা r) ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়। এই পরিমাপগুলি বার করতে হলে আগেই মিন বার করার দরকার হয়।

(গ) যখন বণ্টনটি প্রায় নর্মাল বা স্বাভাবিক হয়ে থাকে।

(ঘ) যখন আমরা প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন একই বলে ধরে নিতে চাই। যেহেতু সমস্ত স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মিন বার করা হয়, সেহেতু মিন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

মিডিয়ান ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন দীর্ঘ গণনা বা হিসাব করার সময়ের অভাব থাকে। মিনের চেয়ে মিডিয়ান সহজে এবং দ্রুত নির্ণয় করা যায়।

(খ) যখন বণ্টনটি খুব বেশী মাত্রায় স্কুড (skewed) থাকে অর্থাৎ যখন বণ্টনের প্রান্তসীমায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর অধিক সংখ্যায় থাকে। বণ্টনটির কোন প্রান্তে খুব চরম প্রকৃতির অর্থাৎ খুব ছোট বা খুব বড় স্কোর যদি বেশী

সংখ্যায় থাকে তবে মিনটি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং অস্বাভাবিক ভাবে খুব ছোট বা বড় হয়ে উঠতে পারে। মিডিয়ান কিন্তু বণ্টনটির প্রান্তে অবস্থিত চরম প্রকৃতির স্কোরের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(গ) যখন আমরা জানতে চাই যে বণ্টনের মধ্যে দৃষ্টান্ত বা ক্ষেত্রগুলি মোটামুটি ভাবে উপরের অর্ধে আছে না নীচের অর্ধে আছে এবং যখন সেগুলি কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে কত দূরে সরে আছে তা বিশদভাবে জানার দরকার পড়ে না।

(ঘ) যখন বণ্টনটি অসম্পূর্ণ থাকে এবং মিন নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

(ঙ) যখন গৃহীত এককটি যে সর্বত্র সমান সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই।

মোড ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন সব চেয়ে দ্রুত নির্ণয় করা যায় এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের দরকার পড়ে।

(খ) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার মোটামুটি বা চলতি একটি পরিমাপ হলেই কাজ চলে যায়।

(গ) যখন আমরা জানতে চাই কোন্ স্কোরটি বা দৃষ্টান্তটি সবচেয়ে বেশী বার বণ্টনের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

অনুশীলনী

1. কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কি বোঝ? শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যানে সাধারণত প্রবণতার কোন কোন্ কেন্দ্রীয় পরিমাপ ব্যবহৃত হয়?

2. একটি বণ্টনের মিন, মিডিয়ান এবং মোড নির্ণয়ের পন্থাগুলি বর্ণনা কর। সেগুলি কখন কখন ব্যবহার করতে হয়? মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

3. 37—38 পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 5, 6, 8, 9 এবং 10 প্রশ্নের বণ্টনগুলির মিন, মিডিয়ান এবং মোড নির্ণয় কর।

4. নীচের বণ্টন দুটির মিন, মিডিয়ান এবং মোড নির্ণয় কর। সংক্ষিপ্ত পন্থায় মিন নির্ণয় করবে।

(ক)

স্কোর	ফ্রিঃ
90—94	2
85—89	2
80—84	4
75—79	8
70—74	6
65—69	11
60—64	9
55—59	7
50—54	5
45—49	0
40—44	2
	N=56

(খ)

স্কোর	ফ্রিঃ
136—139	3
132—135	5
128—131	16
124—127	23
120—123	52
116—119	49
112—115	27
108—111	18
104—107	7
	N=200

বিষমতার পরিমাপ (Measures of Variability)

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency) হল বিশেষ কোন স্কোরগুচ্ছের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং সেই স্কোরগুলির একটি সামগ্রিক রূপ বা ধারণা দেয়। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানলেই স্কোরগুচ্ছটির সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য জানা হয় না। যেমন, ধরা যাক 50টি ছেলেকে এবং 50টি মেয়েকে একটি বিশেষ অভীক্ষা দেওয়া হল। ছেলেদের মিন স্কোর পাওয়া গেল 34·8 এবং মেয়েদের 34·6। এখানে মিনের দিক দিয়ে এই দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ধরা যাক ছেলেদের স্কোর 16 থেকে সুরু করে 52 পর্যন্ত উঠেছে, কিন্তু মেয়েদের স্কোর হয়েছে 18 থেকে 44। এদিক দিয়ে স্কোরগুচ্ছের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ছেলেদের স্কোরগুলি মেয়েদের স্কোরগুলির চেয়ে অনেকখানি বেশী জায়গা জুড়ে আছে।
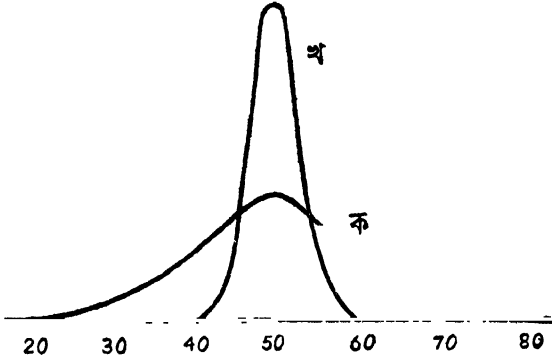
[একই মিন-সম্পন্ন অথচ বিভিন্ন বিষমতা-বিশিষ্ট দুটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন। দুটি পলিগনেরই মিন ৫০; কিন্তু বিষমতার পার্থক্য থাকার জন্য দুটির আকৃতিতে বিরাট পার্থক্য দেখা দিয়েছে]

কিংবা পরিসংখ্যানের ভাষায় ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে অধিকতর বৈষম্যপূর্ণ (Variable)। কোন স্কোরগুচ্ছের এই বৈশিষ্ট্যটি জানতে হলে ঐ গুচ্ছের অন্তর্গত স্কোরগুলির এই বিষমতার (Variability) একটি পরিমাপ করা প্রয়োজন অর্থাৎ জানা প্রয়োজন যে স্কোরগুলি তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারপাশে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বা ছড়িয়ে রয়েছে।

সাধারণত যদি দলটি সমজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তু দিয়ে গঠিত হয় তবে তাদের মধ্যে বিষমতার পরিমাণ কম হয়। আর দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যত পার্থক্য থাকবে তত তাদের বিষমতার পরিমাণ বেশী হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, উপরের

ছবিটিতে একই অক্ষরেখায় দুটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের পলিগন আঁকা হয়েছে। দুটি বণ্টনেরই মিন এক অর্থাৎ 50। কিন্তু দুটির বিষমতার (Variability) প্রকৃতি বেশ বিভিন্ন। যেমন ক দলটির স্কোর 20 থেকে 80 পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু খ দলটির স্কোর 40 থেকে 60 পর্যন্ত বিস্তৃত। দুটির মিন এক হলেও প্রথমটির বিষমতা দ্বিতীয়টির বিষমতার তিন গুণ।

বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়ের পন্থা
(Methods of Measuring Variability)

বিষমতার পরিমাপ নানা উপায়ে বার করা হয়। যথা (1) **রেঞ্জ** (Range) (2) **মিন বিচ্যুতি** (Mean Deviation or MD) বা **গড় বিচ্যুতি** (Average Deviation or AD), (3) **আদর্শ বিচ্যুতি** (Standard Deviation or SD), এবং (4) **চতুর্থাংশ বিচ্যুতি** (Quartile Deviation or Q)।

১। রেঞ্জ (Range)

রেঞ্জ হল কোন স্কোরগুচ্ছের বিষমতার সহজতম পরিমাপ। গুচ্ছের বৃহত্তম স্কোরটি থেকে নিম্নতম স্কোরটি বাদ দিলে রেঞ্জ পাওয়া যায়। 49 পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উদাহরণে ছেলেদের স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ হল 52 – 16 = 36 এবং মেয়েদের স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ হল 44 – 18 = 26 ; রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র দুই প্রান্তের চরম স্কোর দুটিকে হিসাবে ধরি। সেজন্য যদি মাঝখানে লম্বা ফাঁক থেকে যায় কিংবা মোট সংখ্যা (N) যদি অল্প হয়, তবে বিষমতার নির্ণয়ে রেঞ্জ খুব কার্যকর হয়।

২। গড় বা মিন বিচ্যুতি
(Average Deviation or Mean Deviation : : AD or MD)

কোন স্কোরগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণতা (সাধারণত মিনই নেওয়া হয়) থেকে তার প্রত্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি, সেই বিচ্যুতির গড় বা মিনকে গড় বিচ্যুতি (Average Deviation or AD) বা মিন বিচ্যুতি (Mean Deviation or MD) বলা হয়। গড় বা মিন বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় বিচ্যুতিটি ঋণাত্মক (Negative) কি ধনাত্মক (Positive) তা দেখা হয় না এবং সব বিচ্যুতিগুলিকেই ধনাত্মক (Positive) সংখ্যা বলে ধরে নিয়ে তাদের মিন বার করা হয়। যেমন 8, 10, 12, 14, 16 এই ক'টি স্কোরের গড় বা মিন বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে। এদের মিন হল 12 ; এখন মিন থেকে এই স্কোরগুলির বিচ্যুতি বার করার নিয়ম হল প্রত্যেকটি স্কোর থেকে মিনটিকে বিয়োগ করা বা (X – M)। যেমন 8 স্কোরটির বিচ্যুতি হল 8 – 12 = – 4 ; 10 স্কোরটির বিচ্যুতি হল 10 – 12 = – 2 ; তেমনই 12 স্কোরটির বিচ্যুতি হল

12 – 12=0 ; 14 স্কোরটির বিচ্যুতি 14 – 12=2 এবং 16 স্কোরটির বিচ্যুতি 16 – 12=4; অতএব এই ক'টি স্কোরের বিচ্যুতি হল যথাক্রমে –4, – 2, 0, 2, 4 ; এই সংখ্যাগুলির চিহ্নগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগুলি যোগ করে পাওয়া গেল 12 এবং 12কে মোট সংখ্যা 5(N) দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 2·4। এটি হল স্কোরগুলির গড়বিচ্যুতি বা AD কিংবা মিন বিচ্যুতি বা MD।

অতএব AD বা MD নির্ণয় করার সূত্রটি হল।

$$\text{AD বা MD} = \frac{\sum |d|}{N}$$

এখানে $\sum$ = যোগফল, $|d|$ = মিন থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি, / /—এই বার চিহ্ন দুটির দ্বারা বোঝান হচ্ছে যে এই বিচ্যুতির সংখ্যাগুলিকে চিহ্ন-নিরপেক্ষ ভাবে নেওয়া হবে। অর্থাৎ সেগুলিকে সব ধনাত্মক বলে ধরা হবে। N = মোট স্কোরগুলির সংখ্যা।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের AD বা MD নির্ণয়

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কোরের মিন থেকে বিচ্যুতিগুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। কিন্তু বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটি স্কোরের স্বতন্ত্র বিচ্যুতি বার করতে পারি না। সেজন্য তার পরিবর্তে মিন থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতিটি গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া বাকী পদ্ধতিগুলি একই রকম। যেমন, 29'র পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে 95 – 99 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু হল 97·00 এবং মিন হল 70·80। অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির বিচ্যুতি(d) হল 97·00 – 70·80 = 26·20 ; এভাবে 70—74 শ্রেণীব্যবধান পর্যন্ত বিচ্যুতি হবে ধনাত্মক (Positive) ; কিন্তু তার পর থেকেই বিচ্যুতি হবে ঋণাত্মক (Negative)। যেমন, 65—69 শ্রেণী-ব্যবধানটির বিচ্যুতি(d) হল 67·00 – 70·80 = – 3·80 এবং সব চেয়ে নীচের শ্রেণীব্যবধানটি (40—44)'র বিচ্যুতি(d) হল – 28·80।

এভাবে প্রত্যেকটি মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি(d) বার করার পর আমরা সেগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করলাম। যেমন 95—99'র বিচ্যুতি হল 26·20 এবং ফ্রিকোয়েন্সী (f) হল 1 ; অতএব তার fd হল 26·20 ; সেইরকম 90—94 শ্রেণীব্যবধানটির d হল 21·20 এবং f হল 2 ; অতএব তার fd হল 21·20 × 2 = 42·40 ; 65—69 শ্রেণীব্যবধানটির d হল – 3·80 এবং f হল 6 ; অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির fd হল – 3·80 × 6 = – 22·80 ; এই ভাবে আমরা সব কটি শ্রেণীব্যবধানের fd নির্ণয় করতে পারি।

এর পরের ধাপে এই fdগুলিকে একসঙ্গে যোগ করে ফেলতে হবে তাদের গাণিতিক চিহ্নগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। এখানে যোগফল পাওয়া গেল 502·00। এইবার এই যোগফলকে মোটসংখ্যা(N) 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 10·04 ; অতএব এই বণ্টনটির AD বা MD হল 10·04।

অতএব বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে AD বা MD বার করার সূত্র হল।

$$AD \text{ বা } MD = \frac{\sum |fd|}{N}$$

এখানে $\sum |fd|$ =(মিন থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি × ফ্রিকোয়েন্সী)'র চিহ্ননিরপেক্ষভাবে মোট যোগফল।

৩। আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation or SD)

আদর্শ বিচ্যুতি কিংবা SD সাধারণভাবে বিষমতার পরিমাপ রূপে অন্যান্য বিষমতার পরিমাপের চেয়ে বহুল পরিমাণে ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য। AD (বা MD)'র নির্ণয়ে আমরা গাণিতিক চিহ্নকে বাদ দিয়ে থাকি এবং সমস্ত বিচ্যুতিকেই ধনাত্মক সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। এর ফলে আমাদের এই পরিমাপটি ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।

কিন্তু SD'র নির্ণয়নে আরও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয়। সেখানে গাণিতিক চিহ্নের এই অসুবিধা দূর করার জন্য সমগ্র বিচ্যুতি বা dকে বর্গ করে নেওয়া হয়। ফলে বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নগুলি দূর হয়ে গিয়ে সব d^2ই ধনাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তারপর সেগুলিকে যোগ করে যোগফলকে মোটসংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগফলের বর্গমূল (Square root) বার করা হয় এবং তা থেকে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি বা SD বলে। SDকে সাধারণ গ্রীক চিহ্ন সিগমা (σ) দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়।

অতএব আদর্শ বিচ্যুতি বা σ হল বণ্টনের মিন থেকে নেওয়া বিচ্যুতিগুলির বর্গীকৃত (Squared) রূপের মিনের বর্গমূল। একটি ছোট অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক। যথা—

স্কোরগুচ্ছ 8, 10, 12, 14, 16 [মিন = $\frac{60}{5}$ = 12·00]
মিন থেকে বিচ্যুতি (d) : −4, −2, 0, 2, 4
বিচ্যুতির বর্গ (d^2) : 16, 4, 0, 4, 16
বিচ্যুতির বর্গের যোগফল ($\sum d^2$) : $16+4+0+4+16=40$
বর্গীকৃত বিচ্যুতির যোগফল ($\sum d^2$) ÷ মোট সংখ্যা (N) = $\frac{40}{5} = 8$
এই ভাগফলের বর্গমূল = $\sqrt{8} = 2{\cdot}83$
অতএব এই স্কোরগুচ্ছের $\sigma = 2{\cdot}83$

এই থেকে আমরা অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে SD বা σ নির্ণয়ের নীচের সূত্রটি তৈরী করতে পারি।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

[এখানে d^2 = মিন থেকে একটি স্কোরের বিচ্যুতির বর্গ]

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র স্কোরের বিচ্যুতি(d) না বার করে প্রতি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু ও মিনের মধ্যে ব্যবধান বার করা হয় এবং সেই বিচ্যুতির বর্গ করে নেওয়া হয়। যেমন 29'র পাতার বণ্টনটিতে 95—99 শ্রেণী-ব্যবধানটির বিচ্যুতি (d) হল 26·20 এবং তার বর্গ(d^2) হল 686·44। এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী (f) 1 হওয়াতে এই শ্রেণীব্যবধানটির fd^2 হল 686·44 ; তেমনই 90—94 শ্রেণীব্যবধানটির বিচ্যুতি 21·20 এবং তার বর্গ (d^2) হল 449·44। এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী f) 2 হওয়াতে এই শ্রেণীব্যবধানটির fd^2 হল 898·88। সেই রকম 65—69 শ্রেণীব্যবধানটির বিচ্যুতি বা d হল $-3·80$; অতএব d^2 হল 14·44 ; এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী (f) হল 6 ; অতএব fd^2 দাঁড়াল $14·44 \times 6 = 86·64$। এভাবে সমস্ত শ্রেণীব্যবধানগুলির fd^2 বার করার পর সেগুলি যোগ করা হল এবং যোগফল ($\sum fd^2$) পাওয়া গেল 7978·00। এই যোগফলকে N অর্থাৎ 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 159·56 এবং এর বর্গমূল হল 12·63। অতএব এই বণ্টনটির SD বা σ হল 12·63। এই থেকে আমরা বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ বা ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের σ নির্ণয়ের সূত্রটি পাচ্ছি।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}}$$

এখানে $\sum fd^2$ = (মিন থেকে শ্রেণীব্যবধানের বিচ্যুতির বর্গ $\times$ ঐ ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী)-র মোট যোগফল

সংক্ষিপ্ত পন্থায় SD বা সিগ্‌মা (σ) নির্ণয়

উপরের SD বা σ নির্ণয়ের যে পন্থাটির বর্ণনা দেওয়া হল সেটি বৃহৎ বণ্টনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। কেননা অনেক সময় বিচ্যুতিগুলির বর্গরূপ বেশ বড় হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। সেজন্য SD নির্ণয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

এই পন্থায় প্রথমে একটি অনুমিত মিন ধরে নেওয়া হয়। অনুমিত মিন ধরে

নেওয়ার পন্থা সম্বন্ধে 47 পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। পরে সেই অনুমিত মিন থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের বিচ্যুতি (d') নির্ণয় করা হয়।

(1) স্কোর	(2) মধ্যবিন্দু	(3) f	(4) d'	(5) fd'	(6) fd'^2
95—99	97	1	5	5	25
90—94	92	2	4	8	32
85—89	87	4	3	12	36
80—84	82	5	2	10	20
75—79	77	8	1	8(+43)	8
70—74	72	10	0	0	0
65—69	67	6	−1	6	6
60—64	62	4	−2	−8	16
55—59	57	4	−3	−12	36
50—54	52	2	−4	−8	32
45—49	47	3	−5	−15	75
40—44	42	1	−6	−6 (−55)	36
		N=50		−12	322

অনুমিত মিন বা AM=72·00 $\quad c = -\frac{12}{50} = -\cdot240$

প্রকৃত মিন বা M=72·00+(−1·20) $\quad ci = -\cdot240 \times 5 = -1\cdot20$

=70·80 $\quad c^2 = \cdot0576$

$$\text{SD বা } \sigma = i\sqrt{\frac{\sum fd'^2}{N} - c^2} = 5\sqrt{\frac{322}{50} - \cdot0576} = 12\cdot63$$

তারপর সেই বিচ্যুতির বর্গ করে তাকে ফ্রিকোয়েন্সী f দিয়ে গুণ করা হয়। ফলে পাওয়া যায় fd'^2। এখন fd'^2 গুলির যোগফল বা $\sum fd'^2$কে N দিয়ে ভাগ করে যা হয় তা থেকে অনুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ (c^2) বিয়োগ করা হয়। এই বিয়োগ-ফলের বর্গমূল নির্ণয় করলে যা পাওয়া যাবে তাকে শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য(i) দিয়ে গুণ করলে SD বা σ পাওয়া যাবে।

অতএব বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে σ বার করার সূত্র হল—

$$\sigma = i\sqrt{\frac{\sum fd'^2}{N} - c^2}$$

[এখানে $\sum fd'^2$ হল প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর অনুমিত মিন থেকে বিচ্যুতির বর্গরূপের যোগফল ; c^2 = অনুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ ; N = মোট সংখ্যা ; i = শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য ।]

উদাহরণস্বরূপ নীচে পূর্ব পৃষ্ঠায় বণ্টনটির SD সংক্ষিপ্ত পন্থায় বার করা হচ্ছে। এই বণ্টনটিতে 70—74 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 72·00কে অনুমিত মিন রূপে ধরা হল। অতএব শ্রেণীব্যবধানটির d' হচ্ছে 0 ; তার উপরের শ্রেণীব্যবধান 75—79'র d' হল 1 ; 80—84 শ্রেণীব্যবধানের d' হল 2 ইত্যাদি। তেমনই নীচের দিকে 65—69 শ্রেণীব্যবধানটির d' হল -1, 60 - 64 শ্রেণীব্যবধানটির d' হল -2 ইত্যাদি। এইভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানের d' নির্ণয় করার পর fd' নির্ণয় করা হল, প্রত্যেকটি d'র সঙ্গে fকে গুণ করে। তার পরের স্তম্ভে fd'^2 নির্ণয় করা হল d'গুলিকে বর্গ করে এবং পরে সেই বর্গগুলিকে f দিয়ে গুণ করে। তারপর সেই fd'^2গুলিকে যোগ করে $\sum fd'^2$ পাওয়া গেল। এখানে $\sum fd'^2$ হল 322। এবার আমাদের অনুমিত মিনের সংশোধন বা c বার করতে হবে। fd'গুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করে c পাওয়া যায়। (47 পৃষ্ঠা দেখ) এখানে c হল $-\frac{12}{50} = -\cdot240$; c'র বর্গ করে পাওয়া গেল ·0576। অতএব এক্ষেত্রে

$$\sigma = i\sqrt{\frac{\sum fd'^2}{N} - c^2} = 5\sqrt{\frac{322}{50} - \cdot0576} = 12{\cdot}63$$

৪। চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation বা Q)

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের বিচ্যুতি গণনা করার আর একটি পন্থা হল তার চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা Q বার করা। Q বলতে বোঝায় বণ্টনটির 75তম পার্সেণ্টাইল (P_{75}) এবং 25তম পার্সেণ্টাইল (P_{25})—এ দুয়ের অন্তর্বর্তী দূরত্বের ঠিক মধ্যবিন্দুটি। 25তম পার্সেণ্টাইল বলতে বোঝায় স্কোরের স্কেলেতে সেই বিন্দু যার নীচে 25% স্কোর আছে। এই বিন্দুকে প্রথম চতুর্থাংশ (first quartile) বা Q_1 বলা হয়। 75তম পার্সেণ্টাইল হল স্কোরের স্কেলেতে সেই বিন্দু যার নীচে 75% স্কোর আছে। এই বিন্দুকে তৃতীয় চতুর্থাংশ (third quartile) বা Q_3 বলা হয়। কোন বণ্টনের এ দুটি বিন্দু পাওয়া গেলে Q বার করার সূত্রটি হল—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বার করতে হলে প্রথম Q_1 বা (P_{25}) এবং Q_3 বা (P_{75}) বার করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে Q_2 হল P_{50} বা মিডিয়ান অর্থাৎ স্কোরের স্কেলে সেই বিন্দু যার নীচে 50% স্কোর এবং

উপরেও 50% স্কোর আছে। 54 পৃষ্ঠার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের Q_1 হল 62·62 এবং Q_3 হল 79·19 ; অতএব বণ্টনের

$$Q = \frac{79·19 - 62·62}{2} = \frac{16·57}{2} = 8·28$$

পার্সেণ্টাইল, Q_1 ও Q_3 গণনা করার পন্থা পৃঃ 68—পৃঃ 69-তে বর্ণিত হয়েছে।

বিভিন্ন বিষমতার পরিমাপের প্রয়োগবিধি

আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন পন্থায় একটি বণ্টনের বিষমতার পরিমাপ নির্ণয় করা যায়। কোন্ সময় কোন্ পরিমাপটির ব্যবহার করতে হয় তার কতকগুলি সূত্র নীচে দেওয়া হল।

রেঞ্জ ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় খুব অল্প এবং ছড়ানো থাকে এবং যখন উন্নত ধরনের কোন বিষমতার পরিমাপ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় না।

(খ) যখন বণ্টনের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্কোরগুলি এবং বণ্টনেতে অবস্থিত স্কোরগুলির একটি মোটামুটি বিস্তৃতি জানলেই কাজ চলে।

(গ) যখন স্বল্পতম সময়ে বিষমতার পরিমাপটি জানার দরকার হয়।

চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা Q ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ রূপে কেবলমাত্র মিডিয়ানটিই জানা থাকে।

(খ) যখন বণ্টনটির নীচের দিকটা বা উপরের দিকটা অজ্ঞাত বা অসমাপ্ত থাকে।

(গ) যখন চরম বা ছড়ানো স্কোরের সংখ্যা অনেক থাকে বা বণ্টনটিতে স্কুনেশ (Skewness) খুব বেশী পরিমাণে থাকে।

(ঘ) যখন বণ্টনটির ঠিক মধ্যবর্তী 50% স্কোরের দুপ্রান্তের স্কোর দুটি জানার দরকার হয়।

মিন বিচ্যুতি বা MD ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন বণ্টনটিতে খুব চরমবিচ্যুতিসম্পন্ন স্কোর থাকে এবং যার ফলে সেগুলিকে দ্বিগুণ করলে (SD বা সিগমা বার করতে হলে স্কোরগুলিকে দ্বিগুণ করতেই হয়) SD'র পরিমাপটি অযথা প্রভাবিত হয়ে ওঠে।

(খ) যখন খুব পরিশ্রম না করে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা বিচ্যুতির পরিমাপ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়।

(গ) যখন মিন থেকে প্রত্যেকটি বিচ্যুতিকেই তার আয়তন অনুযায়ী ওজন করার দরকার পড়ে।

আদর্শ বিচ্যুতি বা SD ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন বিষমতার নির্ভুলতম পরিমাপটি চাওয়া হয়।

(খ) যখন SD'র উপর নির্ভরশীল এমন সব পরিসংখ্যান (যেমন সহ-পরিবর্তনের মান বা r) নির্ণয় করার দরকার পড়ে।

(গ) যখন স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রের সংশ্লিষ্ট নানা সংব্যাখ্যানের প্রয়োজন হয়।

(ঘ) যখন চরম বিচ্যুতিগুলিরও যথাযথ প্রভাব বিষমতার পরিমাপে থাকাটা কাম্য বলে মনে করা হয়।

বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ

যখন বণ্টনটিকে স্বাভাবিক প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয় তখন একটি বিষমতার পরিমাপ থেকে আর একটি বিষমতার পরিমাপে নীচের হিসাব অনুযায়ী যাওয়া যায়।

$$Q = 8{\cdot}845MD = {\cdot}6745\sigma$$
$$MD = 1\ 183Q = {\cdot}798\sigma$$
$$\sigma = 1\ 483Q = 1{\cdot}253MD$$

অনুশীলনী

১। 37 এবং 38 পৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রশ্নসংখ্যা 5, 6 8, 9 এবং 10র ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনগুলির MD, Q এবং SD নির্ণয় কর।

২। নীচের স্কোরগুলির MD এবং SD নির্ণয় কর:—

68, 65, 70, 50, 62, 56, 52 এবং 50

৩। বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলির কোন্‌টি কখন ব্যবহার করতে হয় বল। সকল বিষমতার পরিমাপের মধ্যে SDকে সবচেয়ে নির্ভুল পরিমাপ বলা হয় কেন? যখন কোন বণ্টনে চরম প্রকৃতির বা ছড়ানো স্কোর থাকে তখন Qকে সবচেয়ে ভাল বিষমতার পরিমাপ বলা হয় কেন?

৪। বিষমতার পরিমাপ বলতে কি বোঝ? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকৃতির বিষমতার পরিমাপের ব্যবহার ও উপযোগিতা আলোচনা কর।

পাঁচ

স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র (Normal Probability Curve)

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে একদল ছেলের উপর বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে যে স্কোরগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে পলিগনের চিত্রের আকারে নিয়ে গেলে অনেকটা উপুড় করা একটা ঘণ্টার আকৃতি নেয়। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ঘটিত পরিমাপের ফলাফলগুলিকে সাজালে চিত্রগুলি একই ধরনের ঘণ্টার আকার গ্রহণ করে। এই চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হল যে মাঝখানের অংশটি ফোলা এবং উঁচু আর শীর্ষবিন্দুর দুধার থেকে রেখাটি ধীরে ধীরে নেমে এসে দুপাশে সরু হয়ে গেছে। চিত্রটি ব্যাখ্যা করলে এই রূপ দাঁড়ায়। বামদিকের প্রান্তে থাকে সবচেয়ে ছোট স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা স্বল্পতম। ক্রমশ যতই মধ্যভাগের দিকে এগোতে থাকে স্কোরগুলি আয়তনে তত বাড়তে থাকে এবং সেগুলির সংখ্যাও ক্রমশ বেশী হতে থাকে। চিত্রটির ঠিক মাঝখানটা ও তার আশেপাশে থাকে মাঝারি আয়তনের স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা বন্টনের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে এবং তার জন্যই চিত্রটির মাঝখানটা ফোলা ও উঁচু হয়ে যায়। তারপর স্কোরগুলি আয়তনে আরও বাড়তে থাকে, যদিও সেগুলি সংখ্যায় তখন কমতে থাকে। তার ফলে চিত্রটি ক্রমশ শেষের দিকে নীচু হতে থাকে। এইভাবে ডানদিকের শেষ প্রান্তে থাকে সর্বোচ্চ স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা বাঁদিকের সর্বনিম্ন স্কোরগুলির মতই সবচেয়ে কম।

সাধারণ পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যে সব চিত্র পাই সেগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে ঘণ্টার আকৃতিসম্পন্ন হয় না। প্রায়ই দেখা যাবে যে একটা দিক অপর দিকের চেয়ে বেশী উঁচু বা নীচু এবং মাঝখানটা সমানভাবে ফোলা বা উন্নত নয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রের এই ধরনের অসমঞ্জসতার কারণ হল যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ না করা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকা ইত্যাদি। এই ধরনের আকৃতিগত বন্টনের একটি আদর্শ চিত্ররূপ আছে যার সঙ্গে সমস্ত পরীক্ষণলব্ধ চিত্রেরই আকৃতিগত মিল আছে যদিও পুরোপুরি মিল নেই। একেই স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র (Normal Distribution Curve) বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র (Normal Probability Curve) বলা হয়। পর পৃষ্ঠায় স্বাভাবিক বণ্টনের একটি চিত্র দেওয়া হল। চিত্রটির অধঃরেখার (x-অক্ষরেখার) ঠিক মধ্যবিন্দু হচ্ছে মিন। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে মিডিয়ান এবং মোডও অভিন্ন হবে, অর্থাৎ অধঃরেখার মধ্যবিন্দুতে মিন, মিডিয়ান, মোড তিনটি একটি বিন্দুতে মিলে যাবে যেমন দেখা যাচ্ছে প্রদত্ত বণ্টনটির ক্ষেত্রে।

অসমঞ্জস বণ্টনে অর্থাৎ যেখানে বণ্টনটি পুরোপুরি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপ গ্রহণ করেনি, সেখানে মিন, মিডিয়ান এবং মোড তিনটি ভিন্ন হয়ে থাকে (পৃঃ 61—পৃঃ 62)। স্বাভাবিক বণ্টনের মিনের উপর যদি একটি লম্ব টানা হয় তবে সেই রেখাটি চিত্রটিকে
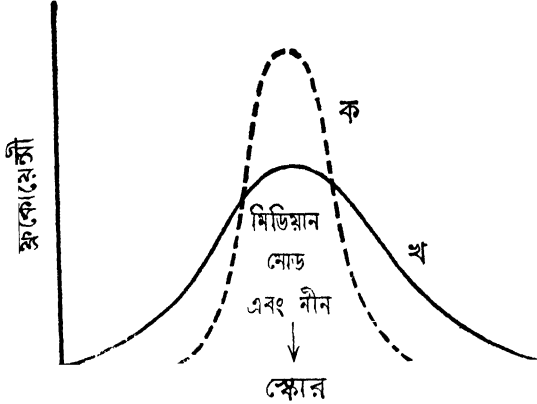
সমান দু' ভাগে বিভক্ত করবে। এইটি হল মিনের রেখা। এই রেখাটির বাঁ পাশে থাকবে 50% স্কোর আর ডান পাশে থাকবে 50% স্কোর। [60 পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য]

সম্ভাবনার মৌলিক নীতি

স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রটি বুঝতে হলে সম্ভাবনার প্রাথমিক নীতিটি বোঝা দরকার। একই ধরনের ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা যতবার ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায় তাকেই ঐ ঘটনাটির সম্ভাবনা (Probability) বলা হয়। এই সম্ভাবনাকে গাণিতিক অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। একটি মুদ্রাকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে হয় অশোকস্তম্ভের দিকটি, নয় সংখ্যার দিকটি পড়বে। অতএব অশোকস্তম্ভের দিকটির পড়ার সম্ভাবনা হল 2 বারে 1 বার বা $\frac{1}{2}$। তেমনই একটি ছ-দিক-সম্পন্ন পাশার একটি ছক উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে তার কোন বিশেষ দিকটির পড়ার সম্ভাবনা 6 বারে 1 বার বা $\frac{1}{6}$। সম্ভাবনার অনুপাত সবচেয়ে কম হলে ·00 হবে এবং সবচেয়ে বেশী হলে 1·00 হবে। যেমন, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা হল ·00 এবং কোন মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা হল 1·00।

এখন দুটি মুদ্রাকে যদি উপরে দিকে বার বার ছোঁড়া যায় তাহলে আমরা কি ধরনের ফল পাই দেখা যাক। প্রত্যেক মুদ্রার ক্ষেত্রেই হয় অশোকস্তম্ভ (অ), নয় সংখ্যার (স) দিকটি পড়তে পারে। ফলে দুটি মুদ্রার পিঠগুলির আবির্ভাবের সম্মেলনগুলি বিভিন্নতার দিক দিয়ে নীচের চার রকম হতে পারে। প্রথম মুদ্রাটি (ক) ও দ্বিতীয় মুদ্রাটি (খ) অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হল।

1	2	3	4
(ক) (খ)	(ক) (খ	(ক) (খ)	(ক) (খ)
অ অ	অ স	স অ	স স

এখানে উপরের প্রত্যেক সম্মেলনেরই সম্ভাবনা হল 4 বারে 1 বার বা $\frac{1}{4}$। অতএব দেখা যাচ্ছে দুটিই অশোকস্তম্ভ (অ-অ) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার, দুটিই সংখ্যার দিক (স-স) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার, একটি অশোকস্তম্ভ ও একটি সংখ্যার দিক পড়তে পারে 4 বারে 2 বার (অ-স+স-অ)। অর্থাৎ অ-অ'র সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$, স-স'র সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$ এবং স-অ এবং অ-স মিলিয়ে পড়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$। এইবার যদি দুটি মুদ্রাকে বহুবার উপরের দিকে এইভাবে ছোঁড়া যায় এবং তারপর তাদের বিভিন্ন দিকের পতনের সম্মেলনের একটি ছবি আঁকা যায়, তবে দেখা যাবে যে বণ্টনটি একটি ঘণ্টাকৃতি চিত্রের আকার ধারণ করেছে।

সমস্ত বণ্টনেরই বিষমতার (Variability) পরিমাপ করা হয় ঐ বণ্টনটির কোন কেন্দ্রীয় প্রবণতা থেকে। সাধারণত গাণিতিক মিনকেই এই কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হয়। স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রে মিন থেকে ডানদিকে (অর্থাৎ উচ্চ স্কোরসম্পন্ন দিকে) অক্ষ-রেখার উপর 1σ পর্যন্ত মেপে নিলে যে বিন্দুটি পাওয়া যায় তাকে $+1\sigma$'র বিন্দু বলা
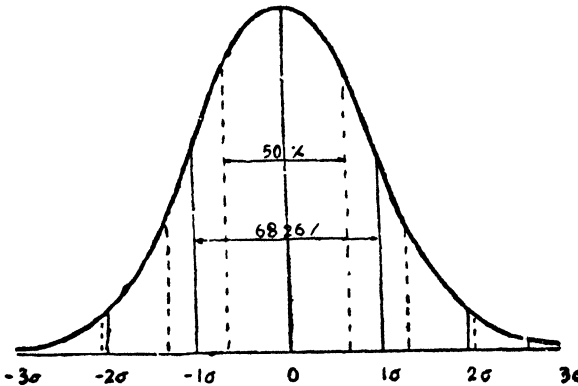
হয় এবং গণনা করে দেখা গেছে যে চিত্রটির যতটুকু স্থান ঐ বিন্দু ও মিনের মধ্যে পড়বে তাতে থাকবে মোট স্কোরের 34·13%। (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)। তেমনই চিত্রের বাঁদিকে (অর্থাৎ নিম্ন-স্কোরসম্পন্ন দিকে) অক্ষরেখার উপর 1σ মেপে নিলে আমরা -1σ'র বিন্দু পাব এবং মিন থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত স্থানটির মধ্যেও মোট স্কোরের 34·13% থাকবে। অর্থাৎ -1σ থেকে $+1\sigma$ পর্যন্ত স্থানের মধ্যে থাকবে 34·13% + 34·13% = 68·26% স্কোর। ঠিক এইভাবে মিনের বাঁদিকে -1σ'র পর -2σ এবং ডানদিকে $+1\sigma$'র পর $+2\sigma$ অক্ষরেখার উপর মেপে নেওয়া যেতে পারে। দেখা

গেছে -2σ এবং -1σ'র মধ্যে থাকে 13·59% স্কোর। তেমনই $+2\sigma$ এবং $+1\sigma$'র থাকে 13·59% স্কোর অর্থাৎ -2σ থেকে $+2\sigma$'র মধ্যে থাকে মোট 68·26%+13·59%+13·59%=95·44% স্কোর। এইভাবে অক্ষরেখার $+2\sigma$'র পরে $+3\sigma$ এবং -2σ'র পরে -3σ মেপে নেওয়া যায় এবং দেখা যাবে যে -3σ থেকে $+3\sigma$'র মধ্যে থাকে 99·73% স্কোর। সাধারণ $\pm 3\sigma$'র পর আর যাওয়া হয় না, কেননা বণ্টনের প্রায় সমস্ত স্কোরই এই দুটি প্রান্তবিন্দুর মধ্যে এসে যায়।

আজকাল বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নানা শ্রেণীর ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বা ঘটনা এই স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্ররূপ অনুসরণ করে থাকে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোন দেশের বা কোন জাতির নারী ও পুরুষের জন্মের অনুপাত, গাছপালা বা প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মের হার ; উচ্চতা ও ওজন ; জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হার ; কোন ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের বেতন বা উৎপাদন ; বুদ্ধির অভীক্ষার ফল ; প্রতিক্রিয়া কাল (Reaction Time) ; শিক্ষামূলক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি।

অসমঞ্জসতার পরিমাপ (Measuring Asymmetry)

যখন কোন বণ্টনের চিত্র আদর্শ চিত্ররূপ অনুসরণ করে না তখন তাকে অসমঞ্জস (Asymmetrical) চিত্র বলে। এই অসমঞ্জসতা দু'শ্রেণীর হয়। তির্যকতা বা স্কুনেশ (Skewness) ও কার্টোসিস (Kurtosis)।

তির্যকতা বা স্কুনেশ (Skewness)

একটি বণ্টনকে তির্যক বা স্কুড (Skewed) বলা হয় যখন তার মিন, মিডিয়ান ও মোড একই বিন্দুতে পড়ে না। আমরা জানি স্বাভাবিক বণ্টনে মিন, মিডিয়ান
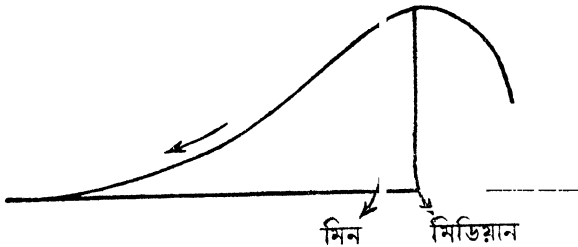
[ঋণাত্মকভাবে স্কুড (Negatively Skewed)]

ও মোড একই বিন্দুতে মিশে যায়। তির্যকতা বা স্কুনেশ আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে—ঋণাত্মক (Negative) ও ধনাত্মক (Positive)। একটি চিত্রকে

ঋণাত্মকভাবে স্কুড (Negatively Skewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্কোর ডানদিকে জমা হয়ে যায়, ফলে বামদিকটি যায় নীচু হয়ে এবং ডানদিকটি বেশী পরিমাণে ফুলে যায়। আবার একটি চিত্রকে ধনাত্মকভাবে স্কুড (Positively
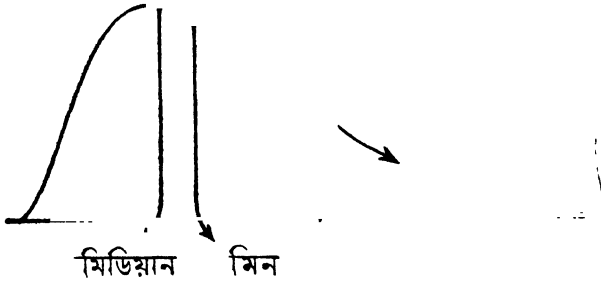
[ধনাত্মক স্কুড (Positively Skewed)]

Skewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্কোরই বাঁদিকে এসে জমা হয়, ফলে ডানদিকটি যায় নীচু হয়ে এবং বাঁদিকটি ওঠে বেশী পরিমাণে ফুলে। ঋণাত্মক স্কুনেশের ক্ষেত্রে প্রথমে থাকে মিন, পরে মিডিয়ান। আর ধনাত্মক স্কুনেশের ক্ষেত্রে প্রথমে থাকে মিডিয়ান, পরে থাকে মিন। স্কুনেশ নির্ণয় করার একটি সূত্র হল—

$$SK = \frac{3\,(\text{মিন} - \text{মিডিয়ান})}{\sigma}$$

29 পৃষ্ঠার বণ্টনে এই সূত্রটি প্রয়োগ করে বণ্টনটির স্কুনেশ পাওয়া গেল :

$$SK = \frac{3(70{\cdot}80 - 72{\cdot}00)}{12{\cdot}63} = -{\cdot}29$$

কার্টোসিস (Kurtosis)

কার্টোসিস বলতে বোঝায় চিত্রটি মাথায় স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের তুলনায় কতটুকু ছুঁচালো বা কতটুকু চ্যাপ্টা। পরের পাতার ছবিটিতে খ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি হল স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র। কার্টোসিস দু'রকমের হতে পারে। বণ্টনটি স্বাভাবিক বণ্টনের চেয়ে অধিক ছুঁচালো হতে পারে। আবার বণ্টনটি স্বাভাবিক বণ্টনের চেয়ে অধিক চ্যাপ্টা হতে পারে। পর পৃষ্ঠার চিত্রটিতে ক-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি

স্বাভাবিক বণ্টনের ছবির চেয়ে উচ্চশীর্ষসম্পন্ন বা বেশী ছুঁচালো। একে বলা হয় লেপ্টোকার্টিক (Leptokurtic)। গ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের চেয়ে
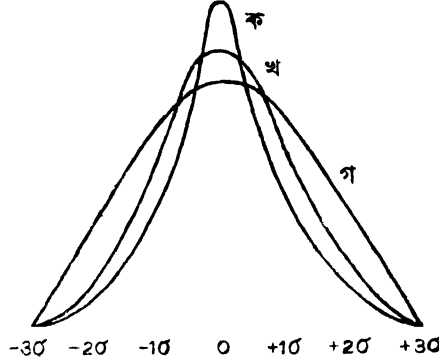
[কার্টোসিসের পরিমাপ]

নিম্নশীর্ষসম্পন্ন বা চ্যাপ্টা। একে বলা হয় প্ল্যাটিকার্টিক (Platikurtic)।

অসমঞ্জস বা অস্বাভাবিক বণ্টন (Non-normal Distribution)

আমরা দেখেছি যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ (traits) আছে যেগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাজালে চিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের আকার ধারণ করে। যেমন বুদ্ধি, উচ্চতা, জন্ম-মৃত্যুর হার ইত্যাদি।

তেমনই আবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির বণ্টন মোটেই স্বাভাবিক আকৃতির নয়। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির আবির্ভাব সম্ভাবনার (chance) প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি একটি উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী বা তীব্র মাত্রার হয় তাহলে ঐটির আবির্ভাব সম্ভাবনার প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলবে না। সেখানে বণ্টনের আকৃতি তখন স্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে না। ফলে বণ্টনের চিত্রটিতে স্কুনেশ বা কার্টোসিস বা দুইই থাকতে পারে।

আমরা এর আগে জেনেছি যে যদি দুটি মুদ্রাকে বার বার উপরের দিকে ছোঁড়া যায় তাহলে তাদের অশোকস্তম্ভের দিকটা এবং সংখ্যার দিকটার পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের আকৃতি ধারণ করবে। কিন্তু যদি মুদ্রা দুটির বিশেষ একটি দিক অপর দিকের চেয়ে ভারী করে তৈরী করা হয় তাহলে তাদের দুটি পিঠের পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখাচিত্রটি অসমঞ্জস বা অস্বাভাবিক বণ্টনের আকৃতি ধারণ করবে। মনে করা যাক এই ধরনের দুটি মুদ্রার

ক্ষেত্রে অশোকস্তম্ভের দিকটার পড়ার সম্ভাবনা এবং সংখ্যার দিকটার পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে অনুপাত হল 4 : 1 ; তাহলে এই দুটি মুদ্রার উৎক্ষেপণে তার দু'পিঠের পতনের সম্মেলনের যদি রেখাচিত্র আঁকা হয় তাহলে চিত্রটি ভীষণভাবে স্কুড হয়ে যাবে এবং নীচের বাঁদিকের প্রথম চিত্রটির মত আকৃতি নেবে। এই ধরনের চিত্রটি অনেকটা J অক্ষরের মত দেখতে বলে একে J-রেখাচিত্র (J-curve) বলা হয়।

আর এক ধরনের অস্বাভাবিক বা অসমঞ্জস বণ্টনকে অনেকটা ইংরাজী U অক্ষরের মত দেখতে হয়। মনে করা যাক এমন একটা রোগ পাওয়া গেল যেটা ছেলে বয়সে এবং বৃদ্ধ বয়সে খুব বেশী হয় কিন্তু মধ্যবর্তী বয়সে বেশ কম দেখা যায়। এখন
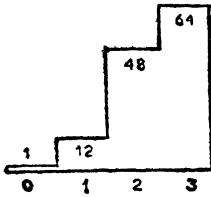
J—চিত্র
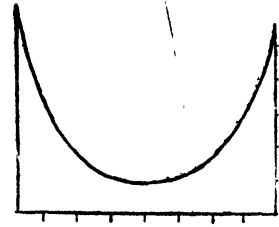
U—চিত্র

এই রোগের আবির্ভাবের বণ্টনের যদি একটি রেখাচিত্র আঁকা যায় তাহলে তা U'র আকৃতি নেবে। এই ধরনের চিত্রকে U-চিত্র (U-curve) বলা হয়। উপরের ডানদিকের ছবিটি U-বণ্টনের উদাহরণ।

অনুশীলনী

১। পাঁচটি মুদ্রাকে বত্রিশ বার উপরে ছোঁড় এবং কতবার 'সংখ্যার' দিক এবং কত বার 'অশোকস্তম্ভের' দিকটি পড়ে লিপিবদ্ধ কর। এই পতনের বাবের একটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন আঁক। বণ্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি (SD) নির্ণয় কর।

২। নীচে প্রদত্ত প্রান্ত দুটির মধ্যে স্বাভাবিক বণ্টনের কত অংশ অন্তর্ভুক্ত বল—

(ক) মিন এবং 1σ (এবং -1σ) (গ) 1σ এবং -1σ

(খ) মিন এবং 2σ (এবং -2σ) (ঘ) 3σ এবং -3σ

ক্রমসমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ বণ্টন ও অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি

ইতিপূর্বে আমরা পলিগন এবং হিস্টোগ্রামের সাহায্যে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের চিত্ররূপ দেবার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বর্তমানে আমরা আরও দুটি চিত্রমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। একটি হল ক্রমসমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র (Cumulative Frequency Graph) এবং অপরটি হল ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা চিত্র বা কিউমুলেটিভ পার্সেণ্টেজ কার্ভ (Cumulative Percentage Curve) বা ওজাইভ (Ogive)।

ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র

(Cumulative Frequency Graph)

ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্রও একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনকে চিত্রের আকারে নিয়ে যাবার আর একটি পদ্ধতি বিশেষ। এই চিত্রে ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। এই জন্যই এই ধরনের চিত্ররূপকে কিউমুলেটিভ (Cumulative) বা ক্রমসমষ্টিমূলক চিত্র বলা হয়।

29 পাতায় প্রদত্ত বণ্টনটির ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীতে নিয়ে গেলে দাঁড়ায় :—

স্কোর	ফ্রিকোয়েন্স	ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী (*cum.f*)
95—99	1	50
90—94	2	49
85—89	4	47
80—84	5	43
75—79	8	38
70—74	10	30
65—69	6	20
60—64	4	14
55—59	4	10
50—54	2	6
45—49	3	4
40—44	1	1
	N=50	

এই বণ্টনে ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে নীচে থেকে উপর দিকে পর পর যোগ করে যাওয়া হয়েছে। যেমন, প্রথম শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হল 1,

দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধানের হল 1+3=4, তৃতীয়টির 4+2=6, চতুর্থটির 6+4 =10, এইভাবে সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী দাঁড়াচ্ছে 50 অর্থাৎ মোট সংখ্যা বা N'র সমান। এইবার ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী বণ্টনটিকে যদি চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া যায় তবে আমরা নীচের রেখাচিত্রটি পাব।

এই চিত্রে বণ্টনটির শ্রেণীব্যবধানগুলি x-অক্ষরেখায় এবং ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলি y-অক্ষরেখায় বসান হয়েছে। মোট শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা হল 12, অতএব 75%'র সূত্র অনুযায়ী চিত্রটির উচ্চতা 12'র $\frac{3}{4}$ অর্থাৎ 9 শ্রেণী-ব্যবধানের সমান হবে। এখানে সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সী হল 50। অতএব
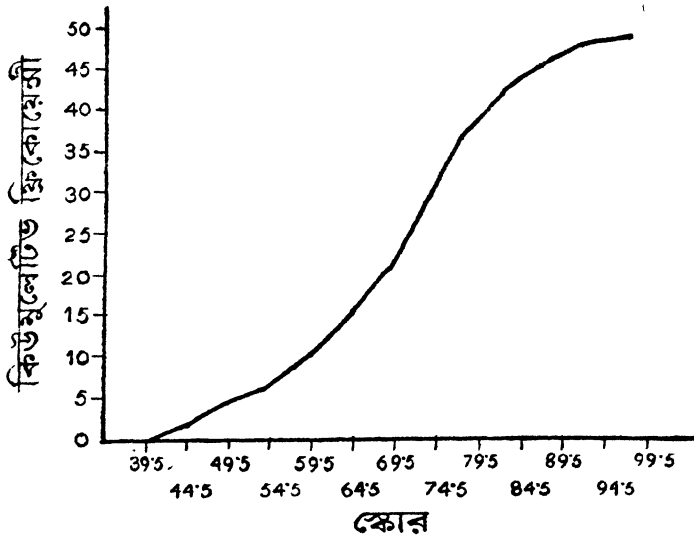
[65 পৃষ্ঠার বণ্টনের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী গ্রাফ বা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র]

50÷9=6 স্কোর (কাছাকাছি) হল y-অক্ষরেখার এককের দৈর্ঘ্য। অঙ্কনের সুবিধার জন্য উপরের চিত্রে y-অক্ষরেখার এককের দৈর্ঘ্য 5 এবং মোট এককের সংখ্যা 10 ধরে নেওয়া হয়েছে।

ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র অঙ্কনের সময় একটি কথা মনে রাখতে হবে। পলিগন অঙ্কনে আমরা প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু নিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী ঐ শ্রেণীব্যবধানের উর্ধ্বসীমায় ছুঁতে হবে। ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে একেবারে নীচে থেকে সুরু করে প্রত্যেক শ্রেণীব্যবধানের শেষ সীমা পর্যন্ত যত স্কোর আছে সবগুলিকে যোগ করে ঐ ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী নির্ণয় করা হয়।

ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ

(Cumulative Percentage Curve or Ogive)

ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্রে ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে সাধারণত ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মত পর পর যোগ করে যাওয়া ত হয়ই, উপরন্তু প্রত্যেকটি
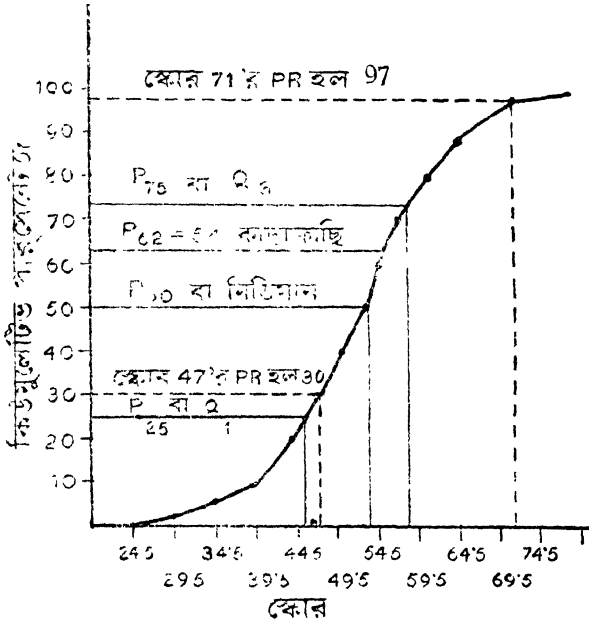
[65 পৃষ্ঠার বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ]

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মোট সংখ্যা N'র শতকরা রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন, 65 পৃষ্ঠার ক্রমসমষ্টিমূলক বণ্টনে 45—49 শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হল 4 ; এখানে মোট সংখ্যা (N) হল 50 ; অতএব যদি এই ফ্রিকোয়েন্সীটিকে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এটি দাঁড়াবে 8। তেমনই 60—64 শ্রেণীব্যবধানটির শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হবে 28 ; 80—84'র ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী হবে 86। পরের পাতায় একটি নূতন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী (Cumulative Frequencies) এবং ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীর (Cumulative Percentage Frequencies) তালিকা দেওয়া হল।

(1)	(2)	(3)	(4)
স্কোর	f	*Cum.f*	*Cum %f*
75—79	1	125	100·0
70—74	3	124	99·2
65—69	6	121	96·8
60—64	12	115	92·0
55—59	20	103	82·4
50—54	36	83	66·4
45—49	20	47	37·6
40—44	15	27	21·6
35—39	6	12	9·6
30—34	4	6	4·8
25—29	2	2	1·6
	N=125		

উপরের বণ্টনে প্রথম স্তম্ভে শ্রেণীব্যবধানগুলির, দ্বিতীয় স্তম্ভে তাদের ফ্রিকোয়েন্সীগুলির, তৃতীর স্তম্ভে ঐ ফ্রিকোয়েন্সীগুলির ক্রমসমষ্টিমূলক (Cumulative) রূপ এবং চতুর্থ স্তম্ভে ঐ ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলির শতকরা রূপ দেওয়া হয়েছে। শতকরা বলতে অবশ্য বোঝাচ্ছে মোট সংখ্যা N'র শতকরা রূপ। এই শতকরা নির্ণয় করার নিয়ম হল প্রথম $\frac{1}{N}$ বার করে নিতে হয়। একে হার (Rate) বলা হয়। এইবার প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীকে ঐ হার দিয়ে গুণ করে তারপর 100 দিয়ে গুণ করে নিলেই ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, উপরে প্রদত্ত বণ্টনের হার হল $\frac{1}{125} = \cdot 008$। এইবার 25—29 শ্রেণীব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা হবে $2 \times \cdot 008 \times 100 = 1\cdot 6$; সেই রকম 30—34 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হবে $6 \times \cdot 008 \times 100 = 4\cdot 8$ ইত্যাদি।

শতাংশবিন্দু নির্ণয় (Calculation of Percentile Points)

আমরা দেখেছি যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে মিডিয়ান হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে স্কোরগুলির 50%। তেমনই Q_1 হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 25% স্কোর এবং Q_3 হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 75% স্কোর। সেই রকম বণ্টনের মধ্যে আমরা আরও অনুরূপ বিন্দু কল্পনা করতে পারি যার নীচে 10%, 40%, 65%, 92%, কিংবা যে কোন শতকরা স্কোর থাকতে পারে এই ধরনের বিন্দু-

গুলিকে সাধারণভাবে পার্সেণ্টাইল (Percentile) বা শতাংশ বিন্দু বলা হয় এবং সেগুলিকে P_{10}, P_{47}, P_{65}, ইত্যাদি প্রতীক দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য মিডিয়ান হল P_{50}, Q_1 হল P_{25} এবং Q_3 হল P_{75}।

শতাংশ বিন্দু এবং পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করার সূত্র হল :—

$$Pp = l + \left\{\frac{pN - F}{fp}\right\} \times i$$

[এখানে p হল বণ্টনে যে শতকরা চাওয়া হয়েছে সেটি, যেমন, 13%, 35% ইত্যাদি।

l হল যে শ্রেণীব্যবধানে Pp পড়ে তার ঠিক নিম্নসীমা।

pN হল Ppতে পৌঁছতে N'র যে অংশটুকু নীচে থেকে গুনে নিতে হবে।

F হল l'র নীচে যত শ্রেণীব্যবধান আছে সে সবগুলির স্কোরের সমষ্টি।

fp হল Pp যে শ্রেণীব্যবধানে পড়ে তার স্কোরগুলির সংখ্যা

i হল শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য।]

উদাহরণস্বরূপ, 65 পৃষ্ঠার বণ্টনটির P_{10} বার করা হচ্ছে। এখানে N হচ্ছে 50। অতএব এখানে 10% বলতে 50'র 10% বা 5। অতএব P_{10} হল বণ্টনের সেই বিন্দু যার ঠিক নীচে 5টি স্কোর আছে। অতএব নীচে থেকে গুনে দেখা গেল যে 5টি স্কোর গিয়ে শেষ হচ্ছে বা P_{10} গিয়ে পড়ছে 50—54 শ্রেণীব্যবধানে। অতএব এখানে l হল 50—54'র নিম্নসীমা বা 49·5। pN হল এখানে P_{10}'র নীচে N'র যে অংশটা পড়েছে, এখানে 5 ; F হল l'র নীচের শ্রেণীব্যবধানগুলির স্কোরের সমষ্টি, এখানে 4 ; fp হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধানে P_{10} পড়ছে তার মোট স্কোর, এখানে 2 ; আর i হল এখানে 5 ; অতএব উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা পাচ্ছি—

$$P_{10} = 49{\cdot}5 + \left(\frac{5-2}{2}\right) \times 5 = 52{\cdot}0$$

এইভাবে আমরা 65 পৃষ্ঠার বণ্টনটির P_{20}, P_{30}, P_{50}, P_{60} ইত্যাদিও নির্ণয় করতে পারি। যেমন—

$P_{20} = 59{\cdot}5 + \left(\frac{10-10}{4}\right) \times 5 = 59{\cdot}5$ [50'র 20% = 10]

$P_{30} = 64{\cdot}5 + \left(\frac{15-14}{6}\right) \times 5 = 65{\cdot}3$ [50'র 30% = 15]

$P_{40} = 69{\cdot}5 + \left(\frac{20-20}{8}\right) \times 5 = 69{\cdot}5$ [50'র 40% = 20]

$P_{50} = 69{\cdot}5 + \left(\frac{25-20}{10}\right) \times 5 = 72{\cdot}0$ [50'র 50% = 25] (মিডিয়ান)

$P_{60} = 74{\cdot}5 + \left(\frac{30-30}{8}\right) \times 5 = 74{\cdot}5$ [50'র 60% = 30]

$P_{70} = 74{\cdot}5 + \left(\frac{35-30}{8}\right) \times 5 = 77{\cdot}6$ [50'র 70% = 35]

$P_{80} = 79{\cdot}5 + \left(\frac{40-38}{5}\right) \times 5 = 81{\cdot}5$ [50'র 80% = 40]

$P_{90} = 84{\cdot}5 + \left(\frac{45-43}{4}\right) \times 5 = 87{\cdot}0$ [50'র 90% = 45]

শতাংশ সারি গণনা
(Calculation of Percentile Rank or PR)

শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইলগুলি হল বণ্টনের মধ্যে বিশেষ বিন্দু যার নীচে মোট স্কোর বা N'র বিশেষ বিশেষ শতকরা থাকে। P_{10} মানে হল বণ্টনের মধ্যে সেই বিন্দু যার নীচে মোট স্কোরের 10% থাকে।

কিন্তু শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (সংক্ষেপে PR) বলতে একটি বণ্টনে কোন বিশেষ ব্যক্তির অবস্থিতিকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব স্কোর অনুযায়ী বণ্টনের মধ্যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানটিকেই ঐ বণ্টনের মধ্যে ব্যক্তির সারি (Rank) বলা যেতে পারে। এই সারিটিকে শতকরা রূপে অর্থাৎ 100'র অংশরূপে প্রকাশ করার জন্য এটিকে পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক বা শতাংশ সারি নাম দেওয়া হয়েছে।

শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) নির্ণয় করার সময় প্রথমে যে ব্যক্তির PR নির্ণয় করা হয় তার স্কোরটি নিতে হয়। তারপর দেখতে হয় যে মোট স্কোরের শতকরা কত ভাগ ঐ স্কোরটির নীচে আছে। এই শতকরাটি হল ঐ ব্যক্তির শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক বা PR।

এইবার শতাংশ সারি বা PR'র সঙ্গে শতাংশ বিন্দু বা পার্সেণ্টাইলের পার্থক্যটা বোঝা যাবে। পার্সেণ্টাইল বা শতাংশ বিন্দু নির্ণয় করার সময় আমরা সুরু করেছিলাম মোট স্কোরের একটি বিশেষ শতকরা নিয়ে যেমন 10% বা 30%; তারপর আমরা বণ্টনটির নীচে থেকে উপর দিকে গণনা করে দেখেছিলাম যে কোন্ বিন্দুতে গিয়ে পেঁছিলে ঐ বিশেষ শতকরাটি পাওয়া যাবে এবং গণনার ফলে যে বিন্দুটি পাওয়া গেল সেই বিন্দুটিকেই পার্সেণ্টাইল বা শতাংশ বিন্দু নাম দিয়েছিলাম, যেমন P_{10} বা P_{30}।

কিন্তু শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করার সময় আমরা ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করি। এখানে আমরা ব্যক্তির স্কোর থেকে সুরু করি এবং বণ্টনের মধ্যে ঐ স্কোরের নীচে শতকরা কত স্কোর আছে তা নির্ণয় করি।

উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক যে 65 পৃষ্ঠার বণ্টনে এক ব্যক্তির স্কোর হল 67. তার PR কত? বণ্টন থেকে দেখা যাচ্ছে যে 67 স্কোরটি পড়ছে 65—69 শ্রেণী-ব্যবধানে। এই শ্রেণীব্যবধানটির ঠিক নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ এর নিম্নপ্রান্ত 64·5 পর্যন্ত আছে 14টি স্কোর এবং শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে 6টি স্কোর। এখন এই শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ 5 দিয়ে 6কে ভাগ করলে আমরা শ্রেণীব্যবধানটির প্রতি এককে পাব 1·2 স্কোর। এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির স্কোরটি (অর্থাৎ 67) ঐ

শ্রেণীব্যবধানটির নিম্নপ্রান্ত 64·5 থেকে (67·0 – 64·5) 2·5 স্কোর একক দূরে অবস্থিত। 2·5কে 1·2 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 3·00 এবং এটাই হল ঐ শ্রেণীব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত 64·5 থেকে 67'র স্কোরগত দূরত্ব। এইবার 14'র (62·4'র নীচে মোট স্কোর) সঙ্গে 3·00 যোগ করে পাওয়া গেল 17 এবং 17 হল মোট স্কোর বা N'র সেই অংশ যা 67'র নীচে আছে। এইবার আমরা এই 17কে মোট স্কোরের শতকরায় নিয়ে গেলে পাব 34%। অতএব স্কোর 67'র PR বা শতাংশ সারি হল 34 ; এইভাবে আমরা বণ্টনের যে কোন স্কোরের PR বা শতাংশ সারি বার করতে পারি। যেমন, 65 পাতার বণ্টনের স্কোর 63'র PR হল 26, 52'র PR হল 10, 72'র (মিডিয়ান) PR হল 50 এবং 87'র PR হল 90।

শতাংশ বিন্দু বা পার্সেণ্টাইল এবং শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক—এ দু'টি ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা বণ্টন (68 পাতায় দ্রষ্টব্য) এবং ওজাইভের চিত্র (67 পাতায় দ্রষ্টব্য) থেকে সরাসরি গণনা করা যায়। যেমন—

65 পাতার বণ্টনটির ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীগুলি থেকে 71তম শতাংশ বিন্দুটি গণনা করা হচ্ছে। ঐ বণ্টনটির (4) নম্বর স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে যে

মোট স্কোরের 66·4% আছে 54·5 বিন্দু পর্যন্ত

মোট স্কোরের 82·4% আছে 59·5 বিন্দু পর্যন্ত।

তাহলে (82·4% – 66·4%) স্কোরের জন্য আছে 5·0 স্কোর।

কিন্তু 71% হচ্ছে 66·4%'র চেয়ে 4·6% উপরে।

তাহলে 16·0%'র জন্য যদি 5 বিন্দু থাকে

তবে 4·6%'র জন্য থাকবে $\frac{5}{16\cdot0} \times 4\cdot6 = 1\cdot4$ বিন্দু।

অতএব 71তম পার্সেণ্টাইল হল $54\cdot5 + 1\cdot4 = 55\cdot9$

অনেক সময় এভাবে গণনা করারও দরকার পড়ে না এবং আমরা সরাসরি বণ্টন থেকে কতকগুলি পার্সেণ্টাইল গুনে ফেলতে পারি। যেমন ঐ বণ্টনটিতে 22তম পার্সেণ্টাইল 44·5'র কাছাকাছি বা 92তম পার্সেণ্টাইল 64·5, 97তম পার্সেণ্টাইল 69·5'র কাছাকাছি, ইত্যাদি।

PRও আমরা এভাবে সরাসরি বণ্টন থেকে গণনা করতে পারি। যেমন, মনে করা যাক 48 স্কোরের PR বার করা হচ্ছে। বণ্টনের (4) স্তম্ভ থেকে দেখা গেল যে 44·5 বিন্দুর নীচে আছে মোট স্কোরের 21·6% ; স্কোর 48 হল 44·5 থেকে 3·5 বিন্দু দূরে। 48 স্কোর পড়েছে 45—49 শ্রেণীব্যবধানেতে যার মধ্যে আছে 5টি স্কোর একক এবং মোট বণ্টনের 16·0% (37·6 – 21·6) পড়েছে এই শ্রেণী-ব্যবধানেতে। অতএব 5 এককে যদি 16·0% থাকে, তাহলে 3·5 এককে থাকবে $\left(\frac{16\cdot0}{5\cdot0} \times 3\cdot5\right)\% = 11\cdot2\%$ = 48'র স্কোর-দূরত্ব 44·5 থেকে। তাহলে 48 স্কোরের

নীচে থাকছে মোট 21·6%+11·2%=32·8%=33%। অতএব 48'র PR হল 33। মনে রাখতে হবে, যে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীগুলি বণ্টনে দেওয়া থাকে সেগুলি শ্রেণীব্যবধানের ঠিক ঊর্ধ্ব প্রান্তটির PR কে বোঝায়। যেমন 55—59 শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী হল 82·4। অতএব 59·5 স্কোরের PR হল 82·4। তেমনই 74·5'র PR হল 99·2, 64·5'র PR হল 92·0 ইত্যাদি।

ওজাইভ চিত্র থেকেও পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক গণনা করা যায়। যেমন উদাহরণস্বরূপ, নীচের ওজাইভে আমরা P_{50} বা মিডিয়ান বার করতে চাই। y-অক্ষে যেখানে 50 ফ্রিকোয়েন্সী আছে সেখান থেকে x অক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরাল করে ওজাইভ রেখার উপর একটি রেখা টানা হল। যে বিন্দুতে রেখাটি ওজাইভকে স্পর্শ করল সেখান থেকে x-অক্ষরেখার উপর একটি লম্ব টানা হল। x-অক্ষের উপর যে স্কোরটিতে ঐ লম্বটি স্পর্শ করল সেইটি হল মিডিয়ান, এখানে 51·5। এইভাবে পাওয়া পার্সেণ্টাইলগুলি সব সময় একেবারে নির্ভুল হয় না, কিন্তু সাধারণভাবে কাজ চালানোর পক্ষে যথেষ্টই কার্যকর বলে ধরা হয়। যেমন, এই শ্রেণীবণ্টনটির মিডিয়ান গাণিতিক নিয়মে বার করলে পাওয়া যাবে 51·65, ওজাইভ থেকে পাওয়া গেল 51·5। একই ভাবে ঐ চিত্র থেকে আমরা অন্যান্য পার্সেণ্টাইল বার করতে পারি। P_{25} বা Q_1 হল 45·0, P_{75} বা Q_3 হল 57·0। অঙ্ক কষে বার করলে Q_1 পাওয়া যাবে 45·56 এবং Q_3 হবে 57·19।
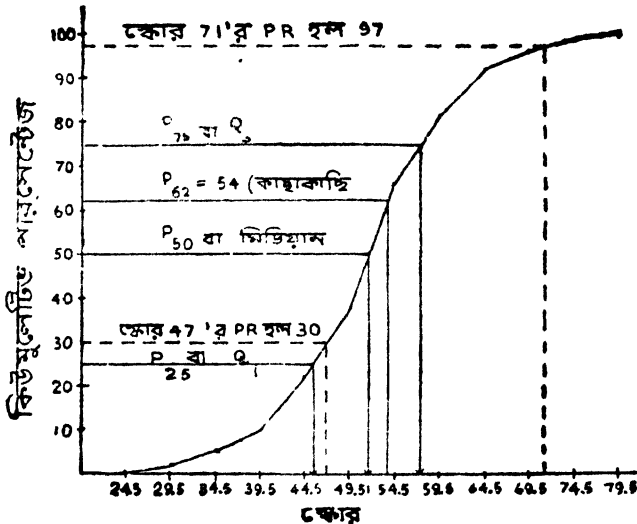
[65 পৃষ্ঠার বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র বা ওজাইভ]

ওজাইভ থেকে শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করতে ঠিক উল্টো পথে যেতে হয়। প্রথমে x-অক্ষরেখায় ব্যক্তির স্কোরটি বার করতে হয়। এইবার

ঐ বিন্দুর উপর একটি লম্ব টানতে হয় এবং ঐ লম্ব যে বিন্দুতে ওজাইভকে স্পর্শ করল সেই বিন্দু থেকে y-অক্ষরেখার উপর x-অক্ষরেখার সমান্তরাল করে সরলরেখা টানা হল। যে বিন্দুতে এই রেখাটি y-অক্ষরেখাকে স্পর্শ করল সে বিন্দুটির শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীই হল ঐ স্কোরটির PR। যেমন, 71 স্কোরের PR এভাবে বার করলে পাওয়া যাবে 97। তেমনই 47 স্কোরের PR পাওয়া যাবে 30, ইত্যাদি। পার্সেণ্টাইলের মতই ওজাইভ থেকে বার করা PR সব সময় নিখুঁত হয় না। অবশ্যই সাধারণ কাজের পক্ষে এভাবে নির্ণয় করা PRই যথেষ্ট।

ওজাইভের ব্যবহার

ওজাইভের বহুবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রথমত, ওজাইভের সাহায্যে আমরা শতাংশ বিন্দু বা পার্সেণ্টাইল এবং শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করতে পারি। এর দ্বারা গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় ও শ্রম বাঁচে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত, ওজাইভের সাহায্যে দুটি দলের কাজের মধ্যে একটি সামগ্রিক তুলনা করা যেতে পারে। মনে করা যাক 200টি দশ বৎসরের ছেলে এবং 200টি দশ বৎসরের
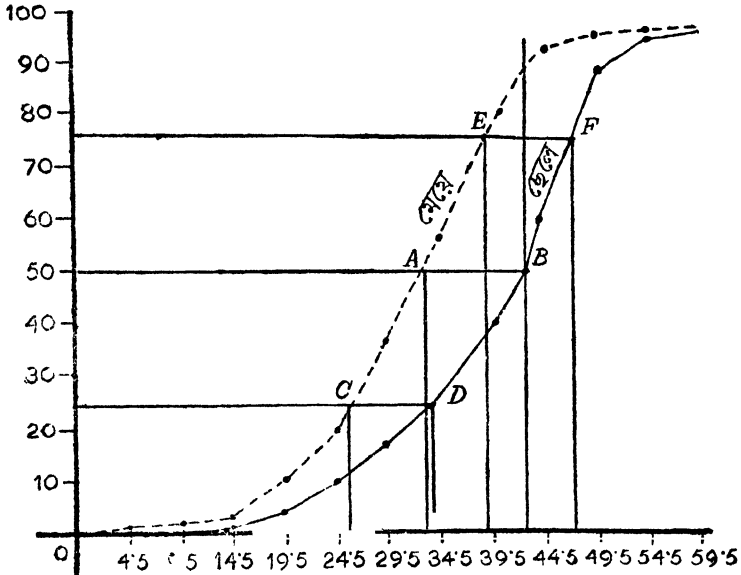
[একই অক্ষরেখায় একদল ছেলে ও একদল মেয়ের স্কোরের ওজাইভ]

মেয়ের উপর একটি অভীক্ষা দেওয়া হল। এই দুটি দল থেকে দু'প্রস্থ স্কোর পাওয়া গেল এবং সেগুলির সাহায্যে একই অক্ষরেখায় দুটি ওজাইভ টানা হল। এখন এই দুটি ওজাইভ থেকে আমরা দু'দল সম্বন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

যেমন, দেখা যাচ্ছে যে, ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে সব দিক দিয়ে বেশী। এই দু' দলের স্কোরের পার্থক্যের পরিমাণ বোঝা যাবে দুটি ওজাইভের মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুর দূরত্ব থেকে। এই ওজাইভ দুটি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে বণ্টনের নীচের ও উপরের দিকের ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে স্কোরের পার্থক্য বেশ উল্লেখযোগ্য। বণ্টনের দু'চারটি বিন্দু পরীক্ষা করলে এ সিদ্ধান্তটি আরও সমর্থিত হবে। যেমন, মেয়েদের বণ্টনের মিডিয়ান হল 32, ছেলেদের 42 এবং ছবিতে এই দূরত্বটি জানান হয়েছে AB রেখার দ্বারা। সেই রকম দুটি বণ্টনের Q_1 দুটি এবং Q_3 দুটির মধ্যে দূরত্বকে জানান হয়েছে যথাক্রমে CD ও EF রেখা দুটির দ্বারা।

তৃতীয়ত, ওজাইভের সাহায্যে পার্সেণ্টাইল নর্ম (Percentile Norm) বা শতাংশ বিন্দুর মান বার করা যায়। নর্ম বা মান কথাটির অর্থ হল কোন দলের কাজ বা কৃতিত্বের প্রতিনিধিমূলক একটি পরিমাপ। সাধারণত দলটির স্কোরের গাণিতিক মিন বা মিডিয়ানকেই এই মানরূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সময় সময় বিভিন্ন পার্সেণ্টাইল পয়েণ্টকেই এই মানের পরিমাপ বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি ছেলে গণিতের পরীক্ষায় 63 পেয়েছে, ইংরাজীতে পেয়েছে 56। এখন এই স্কোরগুলি থেকে ছেলেটির গণিতে বা ইংরাজীতে সত্যকারের জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ অঙ্কে 63 স্কোর বা ইংরাজীতে 56 স্কোর তার অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় ভাল, খারাপ না মাঝারি বা কতটুকু ভাল বা খারাপ বা মাঝারি তা জানার উপায় নেই। এখন ধরা যাক এই দুটি স্কোরের পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করে দেখা গেল যে 63'র PR হচ্ছে 43 এবং 56'র PR হচ্ছে 68। অর্থাৎ অঙ্কে ছেলেটির নীচে তার সহপাঠীদের 43% আছে এবং ইংরাজীতে তার নীচে আছে 68%। অতএব আমরা বলতে পারি যে সে অঙ্কে তেমন ভাল নয়, কিন্তু ইংরাজীতে সে বেশ ভালই।

অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি (Other Graphic Methods)

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে যে সব মূল্যবান তথ্য আমরা পাই সেগুলিকে চিত্রাকারে সাজালে আমাদের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হয়। মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানে নানা প্রকৃতির চিত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন, রেখাচিত্র (Line Graph), বার চিত্র (Bar Graph), পাই চিত্র (Pie Diagram), ফ্রিকোয়েন্সী বহুভুজ (Frequency Polygon), হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র (Histogram) ইত্যাদি। এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। রেখা চিত্র (Line Graph)

পরের পাতার ছবিটিতে অর্থহীন শব্দ তালিকা, গদ্য, কবিতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা এই চার শ্রেণীর বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কত সময়ের ব্যবধানে কতটা

মনে রাখতে পারি তার একটি রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে 5 দিন পরে অর্থহীন শব্দ-তালিকার ক্ষেত্রে 30%, গদ্যের ক্ষেত্রে 42%, কবিতার ক্ষেত্রে
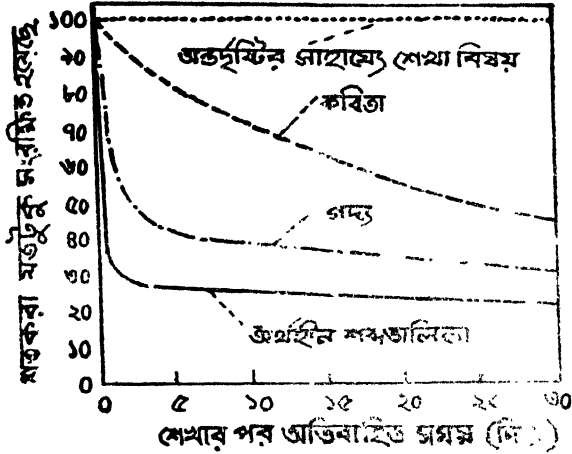
বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখার পরিমাণের রেখাচিত্র

82% এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা বস্তুর ক্ষেত্রে 100% আমরা মনে রাখি। এই ভাবে এই রেখাচিত্র থেকে 10, 15, 20 বা 30 দিন পরেও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কি পরিমাণ আমরা মনে রাখতে পারি তা জানা যায়।

২। বার চিত্র (Bar Graph)

মনোবিজ্ঞানে যখন কোন বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একের বেশী বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতে হয় তখন বার গ্রাফ ব্যবহৃত হয়। যেমন, দেখা গেল 4টি শহরের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হার নিম্নরূপ:

	অর্ধশিক্ষিত (শতকরা)	অশিক্ষিত (শতকরা)	উচ্চশিক্ষিত (শতকরা)
১ম শহর	55	30	15
২য় শহর	60	10	30
৩য় শহর	50	45	5
৪র্থ শহর	40	20	40

উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলিকে আমরা অনায়াসে নীচের চিত্রটিতে রূপান্তরিত করতে পারি।

একেই বার চিত্র বা বার গ্রাফ বলা হয়।

৩। পাই চিত্র (Pie Diagram)

কোন পরিমাপ থেকে পাওয়া তথ্যকে আমরা আবার বৃত্তের আকারে প্রকাশ করতে পারি। একে পাই (Pie Diagram) বলে। একটি বৃত্তের কেন্দ্রের চারধারের কোণের সমষ্টি হয় 360°; বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রটিকে 360টি কোণে ভাগ করা যায়। এইবার প্রদত্ত মোট সংখ্যাকে যদি ঐ বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রের সমান বলে ধরা হয় তাহলে প্রত্যেকটি স্কোর বা সংখ্যাকে এই 360°'র অংশরূপে বিভক্ত করা যায়। যেমন, একটি ক্লাসের ছেলেদের উপর একটি ইংরাজীর অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেল যে যারা ইংরাজীতে ভাল (অর্থাৎ যারা 60%'র বেশী মার্কস পেয়েছে) তারা 15%, যারা ইংরাজীতে মন্দ (অর্থাৎ যারা 30%'র কম মার্কস পেয়েছে) তারা 25%, আর যারা ইংরাজীতে মাঝারি (অর্থাৎ যারা 30% থেকে 60% মার্কস পেয়েছে) তারা 60%। এখন এই ফলাফলটিকেই পাই চিত্রে রূপান্তরিত

করলে আগের পাতার ছবিটি পাওয়া যাবে। বৃত্তের মোট 360°কে 100%'র সমান ধরে নিয়ে 60%'র জন্য 216°, 25%'র জন্য 90° এবং 15%'র জন্য 54°—এইভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হল।

৪। ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ও হিস্টোগ্রাম : ইতিপূর্বে এই দুটি চিত্ররূপ নিয়ে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পৃঃ ৯—পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী

1. স্কোর	ছেলে	মেয়ে
179—183	6	8
174—178	7	1
169—173	8	9
164—168	10	16
159—164	12	20
154—158	15	18
149—153	23	19
144—148	16	11
139—143	10	13
134—138	12	1
129—133	6	7
124—128	3	9
	N=128	N=139

(ক) উপরের দু গুচ্ছ স্কোরের দুটি ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র (**Cumulative frequency graph**) আঁক।

(খ) একই অক্ষের উপর ঐ দুটি বণ্টনের ওজাইভ আঁক।

(গ) ঐ বণ্টন থেকে $P_{10}, P_{30}, P_{60}, P_{90}$, গণনার সাহায্যে নির্ণয় কর এবং পরে ওজাইভ চিত্র থেকে ঐগুলির মান নির্ণয় করে দুয়ের মধ্যে তুলনা কর।

(ঘ) দুটি বণ্টনের 155, 168, এবং 170 স্কোরের PR নির্ণয় কর।

(ঙ) প্রথম দলের কত শতাংশ দ্বিতীয় দলের মিডিয়ানের উপরে আছে বল।

উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলিকে আমরা অনায়াসে নীচের চিত্রটিতে রূপান্তরিত করতে পারি।

একেই বার চিত্র বা বার গ্রাফ বলা হয়।

৩। পাই চিত্র (Pie Diagram)

কোন পরিমাপ থেকে পাওয়া তথ্যকে আমরা আবার বৃত্তের আকারে প্রকাশ করতে পারি। একে পাই (Pie Diagram) বলে। একটি বৃত্তের কেন্দ্রের চারধারের কোণের সমষ্টি হয় 360°; বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রটিকে 360টি কোণে ভাগ করা যায়। এইবার প্রদত্ত মোট সংখ্যাকে যদি ঐ বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রের সমান বলে ধরা হয় তাহলে প্রত্যেকটি স্কোর বা সংখ্যাকে এই 360°'র অংশরূপে বিভক্ত করা যায়। যেমন, একটি ক্লাসের ছেলেদের উপর একটি ইংরাজীর অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেল যে যারা ইংরাজীতে ভাল (অর্থাৎ যারা 60%'র বেশী মার্কস পেয়েছে) তারা 15%, যারা ইংরাজীতে মন্দ (অর্থাৎ যারা 30%'র কম মার্কস পেয়েছে) তারা 25%, আর যারা ইংরাজীতে মাঝারি (অর্থাৎ যারা 30% থেকে 60% মার্কস পেয়েছে) তারা 60%। এখন এই ফলাফলটিকেই পাই চিত্রে রূপান্তরিত

করলে আগের পাতার ছবিটি পাওয়া যাবে। বৃত্তের মোট 360°কে 100%'র সমান ধরে নিয়ে 60%'র জন্য 216°, 25%'র জন্য 90° এবং 15%'র জন্য 54°—এইভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হল।

৪। **ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম ঃ** ইতিপূর্বে এই দুটি চিত্ররূপ নিয়ে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পৃঃ ৯—পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী

1. স্কোর	ছেলে	মেয়ে
179—183	6	8
174—178	7	1
169—173	8	9
164—168	10	16
159—164	12	20
154—158	15	18
149—153	23	19
144—148	16	11
139—143	10	13
134—138	12	1
129—133	6	7
124—128	3	9
	N=128	N=139

(ক) উপরের দু গুচ্ছ স্কোরের দুটি ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র (Cumulative frequency graph) আঁক।

(খ) একই অক্ষের উপর ঐ দুটি বণ্টনের ওজাইভ আঁক।

(গ) ঐ বণ্টন থেকে $P_{10}, P_{30}, P_{60}, P_{90}$, গণনার সাহায্যে নির্ণয় কর এবং পরে ওজাইভ চিত্র থেকে ঐগুলির মান নির্ণয় করে দুয়ের মধ্যে তুলনা কর।

(ঘ) দুটি বণ্টনের 155, 168, এবং 170 স্কোরের PR নির্ণয় কর।

(ঙ) প্রথম দলের কত শতাংশ দ্বিতীয় দলের মিডিয়ানের উপরে আছে বল।

2. নীচের বণ্টনের একটি ওজাইভ আঁক।

স্কোর	ফ্রিকোয়েন্সী
160—169	1
150—159	5
140—149	13
130—139	45
120—129	40
110—119	30
100—109	51
90—99	48
80—89	36
70—79	10
60—69	5
50—59	1
	N=285

নীচের স্কোরগুলির শতাংশ মান (Percentile norm) নির্ণয় কর।

95 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 এবং 1

3. এক শিক্ষার্থী গণিতের 30 জনের ক্লাসে ৬ষ্ঠ এবং ইংরাজীর 50 জনের ক্লাসেও ৬ষ্ঠ হয়েছে। এই দুটি বিষয়ে তার PR নির্ণয় কর।

4. ভারতের পাঁচটি শহরের জনসংখ্যার নিম্নলিখিত তথ্যের উপর একটি বার গ্রাফ আঁক।

শহর	ব্যবসায়ী	চাকুরিরত	বেকার
কলিকাতা	49%	21%	30%
বোম্বাই	52%	26%	22%
তামিলনাড়	33%	34%	33%
কটক	22%	52%	26%
দিল্লী	32%	39%	29%

5. উপরের প্রতিটি শহরের জনসংখ্যার উপর একটি করে পাই চিত্র (Pie diagram) আঁক।

সহপরিবর্তন (Correlation)

আমাদের আশেপাশে এমন দুটি বস্তু, ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আমরা প্রায়ই এসে থাকি যেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। এ ধরনের ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে সহপরিবর্তন (Correlation)। যেমন, কোন দেশের বৃষ্টিপাতের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যোৎপাদন কমে বাড়ে বা রাজনৈতিক স্থায়িত্বের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি কমে বাড়ে বা ব্যক্তির বুদ্ধি বেশী কম হওয়ার উপর অপরাধপ্রবণতার কমাবাড়া নির্ভর করে ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিসংখ্যানে এই সহপরিবর্তনের মানকে r অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়।

এখন এই পরিবর্তনের পরিমাণ নানা আয়তনের হতে পারে। একটি বৃত্তের ব্যাসের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধি কমে বাড়ে। কিন্তু দেখা গেছে যে ব্যাসের দৈর্ঘ্য যেমন তেমন বাড়ান হোক না কেন বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের অনুপাত সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে। বৃত্তের পরিধি ব্যাসের দৈর্ঘ্যের 3 গুণের কিছু বেশী হয়ে থাকে এবং এই অনুপাত কখনও বদলায় না। অতএব একটি বৃত্তের ব্যাস এবং পরিধির মধ্যে সহপরিবর্তনকে আমরা নিখুঁত বা পূর্ণ বলতে পারি। সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান বা r'কে 1·00 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেখানে দুটি ঘটনার মধ্যে কোন পরিবর্তনগত সম্বন্ধ নেই অর্থাৎ একটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অপরটির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না, সে সকল ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান বা r হল ·00 বা শূন্য। এখন নিখুঁত বা পূর্ণ সহপরিবর্তন ($r=1·00$) এবং শূন্য সহপরিবর্তন ($r=·00$)—এ দুই প্রান্তের মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের সহপরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। যেমন, পূর্ণ সহপরিবর্তনের চেয়ে কিছু কম হল ·95 বা ·90 মানসম্পন্ন সহপরিবর্তন, ঠিক মাঝামাঝি সহপরিবর্তনের সূচক হল ·50 সহপরিবর্তন এবং অল্প সহপরিবর্তনের সূচক মান হল ·30, ·25, ·15 ইত্যাদি। 1·00 থেকে ·00'র মধ্যবর্তী সহপরিবর্তনগুলিকে ধনাত্মক (Positive) বলা হয়। এর অর্থ এই যে দুটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে পরিবর্তনটি সমমুখী অর্থাৎ একটির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর একটির মধ্যে বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং একটির হ্রাসের সঙ্গে আর একটির মধ্যে হ্রাস দেখা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ যারা বুদ্ধির অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও ভাল ফল দেখায় এবং যারা বুদ্ধির অভীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও মন্দ ফল দেখায়। এখানে বুদ্ধি ও পরীক্ষার সাফল্যের মধ্যে সহপরিবর্তনটা ধনাত্মক বা সমমুখী।

তেমনই সহপরিবর্তন আবার ঋণাত্মকও (Negative) হতে পারে। যেখানে দুটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সহপরিবর্তন বিপরীতমুখী সেখানে ঋণাত্মক সহপরিবর্তন আছে বলা হয়। যেমন, শিক্ষা এবং অপরাধপ্রবণতা—এ দু'য়ের মধ্যে ঋণাত্মক সহ-পরিবর্তন আছে। শিক্ষা বাড়লে দেশে অপরাধপ্রবণতা কমে। শিক্ষা কমলে অপরাধপ্রবণতা বাড়ে। ঋণাত্মক সহপরিবর্তন জ্ঞাপন করা হয় বিয়োগচিহ্নের সাহায্যে। পূর্ণ ঋণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল $-1{\cdot}00$; ·00 থেকে $-1{\cdot}00$'র মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের ঋণাত্মক সহপরিবর্তনের ক্ষেত্র থাকতে পারে। যেমন, $-{\cdot}82$, $-{\cdot}64$, $-{\cdot}13$ ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে পূর্ণ ধনাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল 1·00 এবং পূর্ণ ঋণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল $-1{\cdot}00$। এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যে অর্থাৎ $+1{\cdot}00$ এবং $-1{\cdot}00$'র মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রকৃতির সহপরিবর্তন থাকতে পারে। সাধারণত পূর্ণ সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে, যা সাধারণত পাওয়া যায় তা দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী কোন মান যেমন, ·79, $-{\cdot}32$, ·50, $-{\cdot}62$ ইত্যাদি মানের সহপরিবর্তনগুলি।

সাধারণত মনোবিজ্ঞানে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয় কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে দুটি দলের মধ্যে। কিংবা দুটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে। যেমন, সৌন্দর্যবোধের দিক দিয়ে একদল শ্রমিক ও একদল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কি সম্বন্ধ বা অফিস পরিচালনার কুশলতার দিক দিয়ে একদল ছেলে ও একদল মেয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ ইত্যাদি নির্ণয় করা যেতে পারে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের মাধ্যমে। তেমনই এক দল ছেলের মধ্যে ইংরাজীর জ্ঞান এবং ইতিহাসের জ্ঞানের দিক দিয়ে বা উচ্চতা এবং ওজনের দিক দিয়ে কিংবা বুদ্ধি এবং স্মৃতির দিক দিয়ে কি সম্বন্ধ তাও নির্ণয় করা যেতে পারে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের মাধ্যমে।

উদাহরণ—১। দশটি ছেলেকে একটি বুদ্ধির অভীক্ষা এবং একটি স্মৃতির অভীক্ষা দেওয়া হল। তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল, যথা—

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বুদ্ধির স্কোর	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
স্মৃতির স্কোর	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

এখানে দেখা যাচ্ছে যে 10টি ছেলের মধ্যে বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, স্মৃতির অভীক্ষাতেও সে সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষাতেও সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে। যে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাঝারি স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষাতেও মাঝারি স্কোর পেয়েছে। অর্থাৎ এ দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে সহপরিবর্তনটি সমমুখী এবং নিখুঁত। এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান হল পূর্ণ ধনাত্মক বা $r = 1 \cdot 00$।

উদাহরণ—২। আবার আর দশটি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির অভীক্ষা দিয়ে নীচের স্কোরগুলি পাওয়া গেল।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বুদ্ধির স্কোর	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
স্মৃতির স্কোর	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5

এখানে দেখা যাচ্ছে 10টি ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, সে স্মৃতির অভীক্ষায় সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে, বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে, স্মৃতির অভীক্ষায় সে সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে। কেবল তাই নয়, যারা বুদ্ধির অভীক্ষায় উচ্চ স্কোর পেয়েছে তারা স্মৃতির অভীক্ষাতেও ঠিক সমান অনুপাতে নিম্ন স্কোর পেয়েছে। অর্থাৎ এই দুটি স্কোর গুচ্ছের মধ্যে পরিবর্তনটি বিপরীতমুখী এবং নিখুঁত। এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবর্তন হল পূর্ণ ঋণাত্মক বা $r = -1 \cdot 00$।

উদাহরণ—৩। আবার আর 10টি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং স্মৃতির অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেল যে তারা নীচের স্কোরগুলি পেয়েছে।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বুদ্ধির স্কোর	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
স্মৃতির স্কোর	10	5	13	6	8	14	11	12	7	9

এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোনরূপ মিল বা সম্পর্ক নেই। যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষায় মাঝামাঝি স্কোর পেয়েছে, আবার যে সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে সেও মাঝামাঝি স্কোর পেয়েছে। অন্যান্য স্কোরগুলির দিক দিয়েও দুটি অভীক্ষার ফলের মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র নেই। এই ক্ষেত্রটিকে আমরা প্রায় শূন্য সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করতে পারি। অর্থাৎ এখানে $r = \cdot 00$'র কাছাকাছি। (প্রকৃতপক্ষে $r = \cdot 13$)।

সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়

সহপরিবর্তনের মানকে (**Co-efficient of Correlation**) সাধারণত r অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। r নির্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত পদ্ধতির নাম হল প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (**Product Moment Method**)।

১। প্রোডাক্ট মোমেণ্ট বা r নির্ণয়ের পদ্ধতি
(Product Moment Method)

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষাথীর প্রতিটি স্কোরের মিন বিচ্যুতি বার করে নিতে হয়। প্রত্যেক অভীক্ষাথীর ক্ষেত্রে দুটি করে স্কোর থাকে, ফলে প্রত্যেক অভীক্ষাথীর ক্ষেত্রে দুটি করে মিন বিচ্যুতি, x এবং y পাওয়া যায়। তারপর এই মিন-বিচ্যুতি দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে গুণ করে xy পাওয়া যায়। এইভাবে পাওয়া xy গুলিকে যোগ করে $\sum xy$ বার করতে হয়।

এবার স্কোরগুচ্ছ দুটির সিগমা বার করে নিতে হয়। তারপর এই সিগমা দুটির গুণফলকে $(\sigma_x\sigma_y)$ মোট সংখ্যা N দিয়ে গুণ করতে হয়। পাওয়া যায় $N\sigma_x\sigma_y$। তারপর $\sum xy$ কে $N\sigma_x\sigma_y$ দিয়ে ভাগ করলে স্কোরগুচ্ছ দুটির r পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতিতে r নির্ণয়ের সূত্র হল।

$$r = \frac{\sum xy}{N\sigma_x\sigma_y}$$

উদাহরণ: 5 জন অভীক্ষাথীর উপর বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির অভীক্ষা প্রয়োগ করে পাওয়া গেল দুটি স্কোরগুচ্ছ। তাদের সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হচ্ছে।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
অভীক্ষাথী	বুদ্ধির স্কোর	স্মৃতির স্কোর	x	y	xy
ক	22	30	3	0	0
খ	19	25	0	−5	0
গ	16	10	−3	−20	60
ঘ	20	40	1	10	10
ঙ	18	45	−1	15	−15
					55

বুদ্ধির স্কোরের মিন = 19 ; সিগমা = 2·00

স্মৃতির স্কোরের মিন = 30 ; সিগমা = 12·25

$$r = \frac{\sum xy}{N\sigma_x\sigma_y} = \frac{55}{5 \times 2{\cdot}00 \times 12{\cdot}25} = {\cdot}45$$

সারি পার্থক্যের পদ্ধতি বা রো ρ নির্ণয়

(Rank Difference Method)

প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি ছাড়াও আরও একটি পদ্ধতির সাহায্যে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটিকে সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে অভীক্ষার্থীদিগকে তাদের স্কোর অনুযায়ী সারিবিন্যাস করে নিয়ে তাদের দুটি স্কোরগুচ্ছের সারিগত পার্থক্য থেকে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে নির্ণীত সহপরিবর্তনের মানকে রো (ρ) বলা হয়। এই পদ্ধতিটি প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতির মত নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত না হলেও মোটামুটি কাজ চালানোর পক্ষে খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশ কম এবং অল্পায়াসে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা যায় বলে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদ্ধতিটি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পিয়ারম্যানের আবিষ্কার।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের প্রথম স্কোরগুচ্ছ অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হয়। অর্থাৎ যে সব চেয়ে বেশী স্কোরটি পেয়েছে তার সারি হবে 1; তার পরের মানসম্পন্ন স্কোরটি যে পেয়েছে তার সারি হবে 2; তৃতীয় মান-সম্পন্ন স্কোরটি যে পেয়েছে তার সারি হবে 3 ইত্যাদি। যদি দু'জনে একই স্কোর পায় তবে তাদের প্রত্যেককে দুটি সারির ঠিক মধ্যবর্তী সারিতে ফেলা হবে। যেমন, দেখা গেল যে দু'জনে অষ্টম মানসম্পন্ন স্কোর পেয়েছে। তাহলে এ দু'জনের প্রত্যেকের সারি হবে 8 এবং 9'র মধ্যবর্তী সারি অর্থাৎ 8·5। এ দু'জনের পরের ব্যক্তিটির সারি হবে 10। তেমনই যদি নবম মানসম্পন্ন স্কোরটি তিনজন পেয়ে থাকে তবে তাদের 3 জনের প্রত্যেকের সারি হবে 9, 10 11'র মধ্যবর্তী সারিটি অর্থাৎ 10। এই তিনজনের পরের স্কোরসম্পন্ন ব্যক্তিটির সারি 12 হবে।

এভাবে দুটি বিভিন্ন স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রেই অভীক্ষার্থীদের সারি নির্ণয় করতে হবে। তারপর প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর সারি দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। যেমন, ধরা যাক, কারও যদি প্রথম স্কোরগুচ্ছের সারি হয় 4 এবং দ্বিতীয় স্কোরগুচ্ছের সারি হয় 2, তবে তার সারি-পার্থক্য হবে $(4-2)=2$; তেমনই কারও যদি প্রথম স্কোরগুচ্ছের সারি 5 হয় এবং দ্বিতীয় স্কোরগুচ্ছের সারি 8 হয়, তবে তার সারি পার্থক্য হবে $(5-8)=-3$, এই সারিপার্থক্যকে D বলা হয়। প্রথম সারির স্কোর যদি দ্বিতীয় সারির স্কোরের চেয়ে বড় হয় তবে D ধনাত্মক বা যোগচিহ্নসম্পন্ন হবে। আর যদি দ্বিতীয় সারির স্কোর প্রথম সারির স্কোরের চেয়ে বড় হয় তবে D ঋণাত্মক বা বিয়োগচিহ্নসম্পন্ন হবে। D গুলির যোগফল সর্বদাই শূন্য হবে। এইবার প্রত্যেক D'কে বর্গ করে D^2 পাওয়া গেল। বিভিন্ন D^2 গুলিকে যোগ করে পাওয়া গেল $\sum D^2$।

রো (ρ) নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$\rho = 1 - \frac{6 \times \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

রো ρ নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টান্ত

উদাহরণ—১। 6 জন ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং পরে স্মৃতির অভীক্ষা দেওয়া হল। তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ছাত্র	বুদ্ধির স্কোর	স্মৃতির স্কোর	বুদ্ধির স্কোরের সারি	স্মৃতির স্কোরের সারি	সারি পার্থক্য (D)	(পার্থক্য²) (D^2)
ক	10	16	4	2	2	4
খ	7	14	5	3	2	4
গ	15	18	2	1	1	1
ঘ	20	12	1	4	– 3	9
ঙ	6	8	6	6	0	0
চ	12	10	3	5	– 2	4
					0	22

$$\rho = 1 - \frac{6 \times \sum D^2}{N(N^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 22}{6(36 - 1)} = 1 - \frac{132}{210}$$

$$= \frac{78}{210} = \cdot 37$$

এখানে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের বুদ্ধির স্কোর অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হল। 'ঘ' পেয়েছে সব চেয়ে বেশী স্কোর 20 ; অতএব তার সারি হল 1, তার পরের স্কোর 15 পেয়েছে 'গ', অতএব তার সারি হল 2, 'চ' পেয়েছে তার পরের স্কোর 12, অতএব তার সারি হল 3 ; এইভাবে বাকী অভীক্ষার্থীদেরও সারিবিন্যাস করা হল। এইবার অভীক্ষার্থীদের স্মৃতির স্কোর অনুযায়ী একই ভাবে সারিবিন্যাস করা হল। এখানে 'গ' পেয়েছে সব চেয়ে বড় স্কোর 18 ; অতএব তার সারি হল 1 ; 'ক' পেয়েছে তার পরের স্কোর অর্থাৎ 16 ; অতএব 'ক'র সারি হল 2 ; এই ভাবে বাকী অভীক্ষার্থীদের স্মৃতির স্কোরের সারিবিন্যাস করা হল। এইবার প্রতিটি অভীক্ষার্থী'র এই দুই স্কোরের সারির মধ্যে পার্থক্য বা D নির্ণয় করা হল। যেমন, 'ক'র D হল 4 – 2 = 2 ; 'ঘ'র D হল 1 – 4 = – 3 ইত্যাদি। Dগুলির মোট যোগফল

দেখা গেল 0 হয়েছে। Dগুলিকে বর্গ করে D^2 পাওয়া গেল এবং D^2র যোগফল $\sum D^2$ পাওয়া গেল 22।

এইবার ρ'র সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা এই স্কোরগুলির সহপরিবর্তনের মান বা 'রো' পেলাম ·37

উদাহরণ—২। 81 পৃষ্ঠার তৃতীয় উদাহরণের 10টি অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির স্কোর ও স্মৃতির স্কোরের মধ্যে 'রো' বার করা হচ্ছে।

ছাত্র	বুদ্ধির স্কোর	স্মৃতির স্কোর	প্রথম সারি	দ্বিতীয় সারি	সারি-পার্থক্য(D)	পার্থক্য)^2 (D^2)
ক	10	10	10	5	5	25
খ	11	5	9	10	−1	1
গ	12	13	8	2	6	36
ঘ	13	6	7	9	−2	4
ঙ	14	8	6	7	−1	1
চ	15	14	5	1	4	16
ছ	16	11	4	4	0	0
জ	17	12	3	3	0	0
ঝ	18	7	2	8	−6	36
ঞ	19	9	1	6	−5	25
					0	144

$$\rho = 1 - \frac{6 \times 144}{10(10^2-1)} = 1 - \frac{864}{990}$$

$$= \frac{126}{990} = \cdot 13$$

উদাহরণ—৩ঃ 8 জন অভীক্ষার্থীকে দুটি অভীক্ষা দেওয়া হল এবং তা থেকে দুটি স্কোরগুচ্ছ পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে "রো" বার করা হচ্ছে।

(1) অভীক্ষার্থী	(2) প্রথম অভীক্ষা	(3) দ্বিতীয় অভীক্ষা	(4) ১ম অভীক্ষার সারি	(5) ২য় অভীক্ষার সারি	(6) পার্থক্য (D)	(7) (পার্থক্য)^2 $(D)^2$
ক	15	40	8	8	0	0
খ	18	42	5	5	0	0
গ	22	50	1	1	0	0
ঘ	17	45	6	3	3	9
ঙ	19	43	4	4	0	0
চ	20	46	3	2	1	1
ছ	16	41	7	6·5	·5	0·25
জ	21	41	2	6·5	—4·5	20·25
						30·50

$$\rho = 1 - \frac{6 \times 30{\cdot}50}{8(64-1)} = 1 - \frac{183{\cdot}0}{504} = \frac{321}{504} = \cdot 64$$

আগের উদাহরণের অনুরূপ পদ্ধতিতে এখানে রো নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় অভীক্ষাটিতে ছ এবং জ দু'জনে একই স্কোর অর্থাৎ 41 পেয়েছে। 41 হচ্ছে এই গুচ্ছে ষষ্ঠ স্কোর এবং ছ ও জ উভয়েরই সারি সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল 6; কিন্তু তা না হয়ে দু'জনকেই 6·5 সারিতে ফেলা হল। যেহেতু এরা মোট দুটি স্থান অধিকার করেছে সেহেতু 6 এবং 7 এই দুটি সারি সংখ্যা বাদ দিয়ে পরের অভীক্ষার্থীকে (অর্থাৎ ক'কে) 8'র সারিতে বসান হল। বাকী পদ্ধতি আগের মত।

অনুশীলনী

1. প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে নীচের স্কোরগুচ্ছগুলির সহপরিবর্তনের মান (r) নির্ণয় কর :

(i)

অভীক্ষার্থী	স্কোর (ক)	স্কোর (খ)
ক	15	40
খ	18	42
গ	22	50
ঘ	17	45
ঙ	19	43
চ	20	46
ছ	16	41
জ	21	41

(ii)

অভীক্ষার্থী	অভীক্ষা-1	অভীক্ষা-2
ক	50	60
খ	26	40
গ	76	50
ঘ	76	50
ঙ	38	56
চ	42	43
ছ	51	57
জ	63	38
ঝ	37	41
ঞ	78	55

(iii) অভীক্ষা-1	অভীক্ষা-2	(iv) অভীক্ষা-3	অভীক্ষা-4	(v) অভীক্ষা-5	অভীক্ষা-6
13	11	12	7	13	7
12	14	10	3	12	11
10	11	9	8	10	3
10	7	8	5	8	7
18	9	7	7	7	2
6	11	7	12	9	12
6	3	6	10	6	6
5	7	5	9	4	2
3	6	4	13	3	9
2	1	2	11	1	6

2. নীচের স্কোরগুচ্ছগুলির মধ্যে সহপরিবর্তন নির্ণয় কর।

(i) ক	খ	(ii) ক	খ
22	11	2	10
8	5	20	4
19	6	25	11
32	8	14	6
13	2	11	2
24	5	2	9
22	4	38	17
35	1	16	6
18	7	14	4
13	10	23	25

3. সহপরিবর্তন (Correlation) বলতে কি বোঝ? সহপরিবর্তন কত প্রকারের হতে পারে?

4 সহপরিবর্তনের মান কাকে বলে? কি ভাবে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয করতে হয় একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাও।

5. প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

6. কিভাবে রো (ρ) নির্ণয করতে হয়? একটি উদাহরণ দিযে এই পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

আট

সিগ্‌মা স্কোর বা আদর্শ স্কোর (σ-Score or Standard Score)

মনোবিজ্ঞানে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সব স্কোর পাওয়া যায় সেগুলিকে অনেক সময় স্কেলের আকারে সাজিয়ে নেওয়ার দরকার পড়ে। স্কেল বলতে বোঝায় এমন একটি ছেদহীন সরলরেখা যার উপর স্কোরগুলিকে তাদের আয়তন অনুযায়ী 'ছোট থেকে বড়' —এইভাবে পর পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণত স্কেলের এককগুলি সম-অর্থবোধক এবং সম-দূরত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে।

শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যানে কোন বিশেষ অভীক্ষা থেকে পাওয়া স্কোরগুলিকে সিগ্‌মা স্কোর বা আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে নিয়ে যাওয়ার ফলে স্কোরগুলি একটি বিশেষ স্কেলের আকারে পরিণত হয় এবং তখন সেগুলির পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

মনে করা যাক যে একটি অভীক্ষার মিন হল 120 এবং σ হল 24। এখন যদি সুশীল ঐ অভীক্ষায় 144 পেয়ে থাকে তাহলে তার মিন বিচ্যুতি হল 144—120= 24। এইবার সুশীলের এই 24 বিচ্যুতিটিকে যদি অভীক্ষাটির σ দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে সুশীলের σ স্কোর হবে $\frac{24}{24}=1{\cdot}00$।

সেই রকম মোহনের স্কোর যদি 108 হয় তাহলে তার মিন-বিচ্যুতি হবে 108 – 120= – 12। অতএব তার σ-স্কোর হবে $-\frac{12}{24}= -{\cdot}5$।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যখন মিন থেকে কোন স্কোরের বিচ্যুতিকে ঐ অভীক্ষার σ'র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তাকে σ-স্কোর বলা হয়। σ-স্কোরকে অনেক সময় z-স্কোরও (z-Score) বলা হয়।

যখন কোন বণ্টনের স্কোরগুলিকে σ-স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যে নতুন স্কোর গুলি পাওয়া যায় সেগুলির মিন সব সময়েই হবে 0 এবং σ হবে সব সময় 1·00; যেহেতু বণ্টনে প্রায় অর্ধেক স্কোর মিনের উপরে থাকে, আর বাকী অর্ধেক নীচে থাকে, সেহেতু σ-স্কোরের প্রায় অর্ধেক হবে ধনাত্মক বা যোগচিহ্নসম্পন্ন, বাকী অর্ধেক হবে ঋণাত্মক বা বিয়োগচিহ্নসম্পন্ন। তাছাড়া σ-স্কোরগুলি প্রায়ই ছোট ছোট দশমিক ভগ্নাংশরূপে থাকে বলে সেগুলি নিয়ে যোগবিয়োগের কাজ করতে অসুবিধা হয়। এজন্য আজকাল σ-স্কোরগুলিকে নতুন একটি বণ্টনে নিয়ে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এই নতুন বণ্টনের মিন এবং σ এমন আয়তনের নেওয়া হয় যাতে সমস্ত স্কোরগুলি ধনাত্মক বা যোগচিহ্নসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং তার ফলে যোগবিয়োগের সুবিধা হয়। এই ধরনের স্কোরগুলিকে আদর্শ স্কোর (Standard Score) বলা হয়।

আদর্শ স্কোরের সূত্র

কোন অভীক্ষার সাধারণ স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে হলে নীচের সূত্রটি প্রয়োগ করতে হয়। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল যে সাধারণ স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে গেলে বণ্টনটিও কোন আকৃতিগত পরিবর্তন হয় না। প্রথম বণ্টনটি যদি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপে থাকে তাহলে নতুন বণ্টনটিও স্বাভাবিক বণ্টনের রূপ নেবে। আর প্রথম বণ্টনটি অসমঞ্জস বা স্কুড থাকলে নতুন বণ্টনটিও অসমঞ্জস বা স্কুড হবে। কেবল পরিবর্তন হবে মিনের এবং সিগ্‌মার। সাধারণ স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়ার সূত্রটি হল এই ঃ—

$$X' = \frac{\sigma'}{\sigma}(X - M) + M'$$

এখানে X = প্রদত্ত বণ্টনের সাধারণ স্কোর
X' = নতুন বণ্টনের আদর্শ স্কোর
M = প্রদত্ত বণ্টনের মিন
M' = আদর্শ স্কোরের বণ্টনের মিন
σ = সাধারণ স্কোরের বণ্টনের SD
σ' = আদর্শ স্কোরের বণ্টনের SD

এইবার উপরের ফরমূলা প্রয়োগ করে যে কোন বণ্টনের স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে পারা যায়। যেমন,

উদাহরণ—১ ঃ—একটি বণ্টনে দেওয়া আছে মিন = 64 এবং $\sigma = 15$; রমেনের স্কোর হল 71 এবং সুশীলের 52 ; এই দুটি সাধারণ স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে হবে যার মিন হল 500 এবং σ হল 100 ;

উঃ – উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা পাই—

$$X' = \frac{100}{15}(X - 64) + 500$$

এখানে Xর পরিবর্তে রমেনের স্কোর 71 বসালে,

$$X' = \frac{100}{15}(71 - 64) + 500$$
$$= 546{\cdot}66 = 547$$

আবার Xর পরিবর্তে সুশীলের স্কোর 52 বসালে

$$X' = \frac{100}{15}(52 - 64) + 500 = 420$$

আমরা ইচ্ছা করলে যে কোন অন্য মিন ও σ-সম্পন্ন বণ্টনের আদর্শ স্কোরে রমেনের স্কোর এবং সুশীলের স্কোরকে পরিবর্তিত করতে পারি। যেমন, মিন = 10 এবং $\sigma = 3$ সম্পন্ন একটি বণ্টনে রমেন ও সুশীলের প্রদত্ত স্কোর দুটিকে পরিবর্তিত করতে পারি। এই বণ্টনটিতে রমেনের স্কোর হবে 11 এবং সুশীলের স্কোর হবে 8 ; তেমনই

যে বণ্টনের মিন $=100$ এবং $\sigma=20$ সে বণ্টনে রমেনের স্কোর হবে 109 এবং সুশীলের স্কোর হবে 84।

উপরের সুবিধা ছাড়াও আদর্শ স্কোরের আর একটি উপযোগিতা আছে। দুই বা তার বেশী অভীক্ষা থেকে পাওয়া একই অভীক্ষার্থীর বিভিন্ন স্কোরগুলির মধ্যে সাধারণত কোন তুলনা করা চলে না। তার প্রধান কারণ হল এই যে বিভিন্ন অভীক্ষা-গুলির একক সব সময় এক হয় না। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ বুদ্ধির অভীক্ষায় 42 এবং ইংরাজীর অভীক্ষায় 162 পেয়ে থাকে তাহলে দুটি স্কোরের মধ্যে সত্যকারের কোন তুলনা চলতে পারে না। কেননা এই দুটি অভীক্ষায় ব্যবহৃত এককগুলি সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যদি আমরা এই স্কোর দুটিকে একই বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তাদের মধ্যে অতি সন্তোষজনকভাবে তুলনা চলতে পারে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই বণ্টনের আকৃতি যদি এক প্রকৃতির হয় তবেই এই ধরনের তুলনা সম্ভব হয়। যেখানে বণ্টন দুটি বিভিন্ন আকারসম্পন্ন সেক্ষেত্রে স্কোরগুলিকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে গিয়ে তুলনা করা চলবে না। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে যে সব বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয় সেগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক বণ্টনের আকৃতিসম্পন্ন। সেইজন্য শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে আদর্শ স্কোরের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে।

উদাহরণ ২ ঃ—দেওয়া আছে পঠন অভীক্ষার মিন $=71$ এবং $\sigma=12$ এবং গণিত অভীক্ষার মিন $=28$ এবং $\sigma=8$; সুধাংশু পঠন অভীক্ষায় পেয়েছে 62 এবং গণিতে 22; সুধাংশুর এই দুটি সাধারণ স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাও যার মিন $=100$ এবং $\sigma=20$ এবং তাদের মধ্যে তুলনা কর।

উঃ—সুধাংশুর পঠন অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{20}{12}(62-71)+100=85$

গণিত অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{20}{8}(22-28)+100=85$

দেখা যাচ্ছে যে পঠন অভীক্ষায় সুধাংশুর স্কোর মিনের চেয়ে 9 বিন্দু নীচে এবং গণিত অভীক্ষায় তার স্কোর মিনের চেয়ে 6 বিন্দু নীচে। কিন্তু যখন উভয় স্কোরকেই আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গেল যে পঠন ও গণিতে সে একই স্কোর 85 পেয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সুধাংশুর পঠন ও গণিতের স্কোরের মধ্যে কোন প্রকৃত পার্থক্য নেই।

উদাহরণ ৩ ঃ—দেওয়া আছে ইংরাজী অভীক্ষার মিন $=52$ এবং $\sigma=10$ এবং বাংলা অভীক্ষার মিন $=120$ এবং $\sigma=12$; রমলা ইংরাজীতে পেয়েছে 50 এবং বাংলায় পেয়েছে 168; এই দুটি স্কোরকে এমন একটি আদর্শ স্কোরের বণ্টনে নিয়ে যাও যার মিন $=200$ এবং $\sigma=50$ এবং নতুন স্কোর দুটির মধ্যে তুলনা কর।

উঃ—রমলার ইংরাজী অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{50}{10}(50-52)+200=190$

রমলার বাংলা অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{50}{10}(168-120)+200=400$

এখানে আদর্শ স্কোর দু'টির মধ্যে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে রমলা বাংলায় ইংরাজীর চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত।

অনুশীলনী

1. নীচের সাধারণ স্কোরগুলিকে মিন $=400$ এবং $\sigma=80$ সম্পন্ন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাও।

(ক) 68, 72, 34 (মিন $=56$; $\sigma=14$)

(খ) 20, 29, 62, 74 (মিন $=39$; $\sigma=11$)

(গ) 120, 30, 7 (মিন $=15$; $\sigma=20$)

2. প্রদত্ত আছে একটি পঠন অভীক্ষার মিন $=85$ এবং $\sigma=18$ এবং একটি লিখন অভীক্ষার মিন $=50$ এবং $\sigma=12$।

(ক) নীলা পঠন অভীক্ষায় পেয়েছে 62 এবং লিখন অভীক্ষায় পেয়েছে 65 ; এই দুটি সাধারণ স্কোরকে মিন $=200$ এবং $\sigma=50$ সম্পন্ন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাও এবং দুয়ের মধ্যে তুলনা কর।

(খ) শেখর পঠন অভীক্ষায় পেয়েছে 96 এবং লিখন অভীক্ষায় পেয়েছে 48 ; এই সাধারণ স্কোরগুলির মিন $=500$ এবং $\sigma=100$ সম্পন্ন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাও এবং দু'য়ের মধ্যে তুলনা কর।

(গ) রমা পঠন অভীক্ষায় পেয়েছে 60 এবং লিখন অভীক্ষায় পেয়েছে 45 ; এই সাধারণ স্কোরগুলিকে মিন $=1000$ এবং $\sigma=200$ সম্পন্ন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাও এবং দু'য়ের মধ্যে তুলনা কর।

নয়

অতিরিক্ত অনুশীলনী (১)

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার্থীদলের উপর বিভিন্ন অভীক্ষা প্রয়োগ করে নীচের স্কোরগুলি পাওয়া গেল। প্রত্যেকটি স্কোরগুচ্ছকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে নিয়ে যাও এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মিন, মিডিয়ান, মোড, MD, Q এবং SD নির্ণয় কর।

1. 19 20 24 21 20 21 20 22 10 20
23 19 17 20 19 19 21 21 21 22
11 20 18 18 27 19 20 23 25 19
18 19 20 19 22 18 23 20 11 21
13 18 20 16 20 25 22 19 20 21

2. 18 15 10 12 9 13 11 17 8 9
10 7 15 5 16 8 12 10 12 10
9 14 21 11 9 18 4 12 11 13
8 13 6 10 11 8 12 7 14
11 10 9 11 10 8 10 9 9

3. 18 21 23 22 42 19 13 18 27 19
19 18 17 18 24 10 27 30 21 6
9 21 16 24 21 20 19 15 28 27
23 14 7 15 34 13 17 14 15 10
14 28 17 25 28 16 16 20 24 28

4. 40 22 16 75 11 88 63 16 100 34 33 70 21
63 34 16 40 7 57 63 39 75 11 8 39 69
8 51 33 27 58 9 45 21 75 8 40 16 70
21 23 15 45 9 22 27 7 17 22 39 10 28
27 40 76 46 34 16 94 28 21 40 64 75 22

5. 25 19 20 16 23 25 20 20 24 23
21 27 25 19 20 17 16 24 12 12
15 12 25 18 13 28 28 19 23 22
21 10 17 21 22 12 15 6 19 16
27 26 24 15 17 22 21 16 22 12
24 31 24 23 15 23 18 25 31 21

6.

37	22	21	23	16	27	12	19	22	29
24	26	11	29	10	18	22	23	25	27
27	21	26	21	26	14	14	18	25	11
17	24	23	14	20	22	16	25	10	35
52	61	56	36	26	46	53	53	49	33
49	55	66	53	57	45	49	45	41	55
18	48	60	51	53	42	48	39	37	52
60	51	58	48	50	36	42	62	36	
62	58	54	46	49	59	33	55	35	

7.

138	125	89	88	94	85	89	79	77	67
109	121	122	85	67	95	78	69	66	61
105	118	110	70	66	81	81	80	72	
101	103	103	101	109	70	85	76	71	
81	99	89	98	102	73	77	68	70	

8.

52	40	53	38	50	54	46	58
36	52	46	56	43	49	44	50
41	51	54	47	42	45	70	70
28	47	52	40	60	64	62	55
44	35	49	59	65	56	61	65

9. শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্যরূপে একবার 5 এবং আর একবার 3 ধরে নিয়ে নীচের স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে নিয়ে যাও।

(ক)

59	53	57	62	65	57	83
48	76	61	37	51	81	77
71	82	54	61	50	58	57
40	66	61	55	50	59	59
69	66	56	43	47	76	
48	47	64	62	57	81	
65	53	60	51	63	60	
57	66	47	76	57	52	
53	71	61	73	70	50	
67	47	60	54	81	69	

(খ)

43	52	46	43	52	57	48
38	44	43	42	45	46	40
47	38	45	51	46	54	41

50	42	56	43	51	50	40
53	31	51	48	43	41	
62	48	65	48	51	48	
42	46	35	45	44	40	
52	51	38	40	45	55	
59	39	44	47	43	34	
42	44	43	41	48	55	

10. উপরের দু'গুচ্ছ স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন এবং হিস্টোগ্রাম আঁক।

11. নীচের দুটি দলের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন এবং হিস্টোগ্রাম আঁক।

স্কোর	ফ্রিঃ প্রথম দল	ফ্রিঃ দ্বিতীয় দল
90—94	4	2
85—89	10	0
80—84	14	0
75—79	19	0
70—74	32	2
65—69	31	4
60—64	40	5
55—59	28	12
50—54	29	13
45—49	21	21
40—44	18	21
35—39	10	19
30—34	6	20
25—29	1	14
20—24	3	1
	266	134

12. প্রথম দলের ফিক্রোয়েন্সী পলিগন দ্বিতীয় দলের হিস্টোগ্রামের উপর অভিস্থাপিত কর।

13. একটি পরীক্ষায় 50 জন শিক্ষার্থী নীচের মার্কসগুলি পায়—

31, 13, 20, 31, 30, 45, 38, 42, 30, 30, 30,46, 36, 2, 41, 44, 18, 26, 44, 30, 19, 5, 44, 15, 9, 13, 7, 25, 12, 30, 6, 22, 24, 31, 15, 6, 39, 32, 21, 20, 42, 31, 19, 14, 23, 28, 17, 53, 22, 21.

এই স্কোরগুলির বণ্টনের একটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন আঁক এবং বণ্টনটির মিডিয়ান, মিন এবং আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

14. একটি গণিতের পরীক্ষায় 28 জন শিক্ষার্থী নীচের স্কোরগুলি পায়।

18, 28, 26, 44, 52, 60, 52, 44, 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86, 80, 74, 76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, ৮4, 80, 82, 74.

এই স্কোরগুলির বণ্টনের একটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন আঁক এবং স্কোরগুলির মিন, মিডিয়ান এবং আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

15. একটি পরীক্ষা দিয়ে 45 জন শিক্ষার্থীর নীচের মার্কসগুলি পাওয়া গেছে ঃ—
24, 25, 24, 25, 31, 22, 30, 24, 25, 27, 28, 29, 19, 28, 27, 25, 30, 31, 26, 30, 32, 30, 25, 32, 26, 24, 21, 29, 24, 17, 29, 29, 27, 30, 26, 25, 30, 28, 30, 26, 26, 23, 20, 25, 15.

ঐ স্কোরগুলিকে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে নিয়ে যাও এবং বণ্টনটির একটি হিস্টোগ্রাম আঁক। ঐ বণ্টনের (ক) মিডিয়ান (খ) মিন (গ) আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

16. নীচের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন, মিডিয়ান, মোড এবং SD নির্ণয় কর।

(ক)

স্কোর	ফ্রিঃ
52—53	1
50—51	0
48—49	5
46—47	10
44—45	9
42—43	14
40—41	7
38—39	8
36—37	6
34—35	5
32—33	3
	68

(খ)

স্কোর	ফ্রিঃ
66—71	1
60—65	6
54—59	13
48—53	13
42—47	17
36—41	33
30—35	32
24—29	32
18—23	23
12—17	24
6—11	7
0—5	1
	202

17. শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য 3 নিয়ে নীচের 25টি স্কোরের বণ্টন গঠন কর এবং বণ্টনের মিন এবং মিডিয়ান নির্ণয় কর।

72	75	77	67	72
81	78	65	86	73
67	82	76	76	70
83	71	63	72	72
61	67	84	69	64

18. কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপগুলি বর্ণনা কর। নীচের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন, মিডিয়ান এবং SD নির্ণয় কর।

স্কোর	ফ্রিকোয়েন্সী
48-52	1
53-57	4
58-62	5
63-67	10
68-72	18
73-77	28
78-82	20
83-87	8
88-92	4
93-97	2

19. নীচের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন, মিডিয়ান এবং মোড গণনা কর।

স্কোর	ফ্রিঃ
120-122	2
117-119	2
114-116	2
111-113	4
108-110	5
105-107	9
102-104	6
99-101	3
96-98	4
93-95	2
90-92	1

20. কাকে আদর্শ বিচ্যুতি বলে ? উদাহরণ সহযোগে আদর্শ বিচ্যুতির বিভিন্ন পরিমাপগুলি কিভাবে নির্ণয় করা যায় দেখাও।

21. নীচের বণ্টনটির মিন, মিডিয়ান এবং SD গণনা কর।

স্কোর	ফ্রিকোয়েন্সী
21-25	3
16-20	7
11-15	16
6-10	12
1-5	4

22. কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপগুলি কি কি ? সেগুলির কোনটি কখন ব্যবহার করতে হয় ?

10 জন শিক্ষার্থী নীচের স্কোরগুলি পেয়েছে।

5, 2, 7, 3, 6, 5, 4, 3, 4, 5,

এই স্কোরগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপগুলি গণনা কর।

23. নীচের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের (ক) মিন এবং (খ) আদর্শ বিচ্যুতি গণনা কর এবং বণ্টনটিকে চিত্রাকারে নিয়ে যাও।

স্কোর	ফ্রিকোয়েন্সী
21—25	3
16—20	7
11—15	20
6—10	6
1—5	4
	40

24. (ক) কাকে আদর্শ স্কোর বলে। এই স্কোরের ব্যবহার বর্ণনা কর।

(খ) সহপরিবর্তনের মান কাকে বলে ? এর উপযোগিতা কি ?

25. নীচের স্কোরগুচ্ছগুলির সহপরিবর্তন নির্ণয় কর।

(ক) X	Y	(খ) X	Y
11	24	10	29
5	[illegible]2	4	5
6	44	11	76
8	72	6	4
2	25	2	32
5	30	9	61
4	38	17	56
1	54	6	61
7	37	4	17
10	61	25	61

26. নীচের স্কোরগুলির সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় কর।

(ক) অভীক্ষা-1	অভীক্ষা-2	(খ) অভীক্ষা-1	অভীক্ষা-2
72	61	22	30
58	55	40	24
69	56	45	31
82	58	34	26
63	52	31	22
74	55	22	29
72	54	58	31
85	51	36	26
68	57	34	24
63	60	43	54

নয়

উত্তরমালা

অনুশীলনী (পৃঃ 37—পৃঃ 39)

1. (ক) অবিচ্ছিন্ন (খ) বিচ্ছিন্ন (গ) বিচ্ছিন্ন (ঘ) অবিচ্ছিন্ন (ঙ) বিচ্ছিন্ন (চ) অবিচ্ছিন্ন (ছ) বিচ্ছিন্ন (জ) অবিচ্ছিন্ন (ঝ) বিচ্ছিন্ন (ঞ) বিচ্ছিন্ন

2. 63·5, 64·5 ; 7·5, 8·5 ; 364·5, 365·5 ; 0·5, 1·5 ; 85·5, 86·5 ; 164·5, 165·5.

3.

শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য	শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা
[illegible]	15
4 or 5	10 or 12
10	11
10	9
1	10

4.

	নিম্ন সীমা	ঊর্ধ্ব সীমা	মধ্য বিন্দু
	44·5	47·5	46·5
	·5	4·5	2·5
	159·5	164·5	162·0
	79·5	89·5	84·5
	62·5	67·5	65·0
	14·5	16·5	15·5
	−·5	9·5	4·5
	25·5	29·5	27·5
16.	3·59	74·17	126·84
	46·92	25·19	81·73

অনুশীলনী (পৃঃ 48)

3.

মিন	73·60	78·80	83·00	73·12	73·17	76·03
মিডিয়ান	76·00	78·25	83·25	73·00	73·59	76·38
মোড	80·80	77·15	83·75	72·76	74·43	77·08

4.

(ক)	(খ)
মিন = 67·36	মিন = 119·45
মিডিয়ান = 66·77	মিডিয়ান = 119·42
মোড = 65·59	মোড = 119·38

অনুশীলনী (পৃঃ 57)

	প্রঃ 5	প্রঃ 6	প্রঃ 8	প্রঃ 9	প্রঃ 10	প্রঃ 10
1.	MD=7·28	9·62	9·78	5·42	10.15	9·36
	Q=8·00	7·97	8·15	4·78	8·37	8·02
	SD=8·28	13·26	12.31	6·71	12·55	12·54

2. MD=7·13
SD=7·64

অনুশীলনী (পৃঃ 64)

1. SD=1·12 2. (ক) 34·13, – 34·13 (খ) 47·72, – 47·72
(গ) 68·26 ঘ) 99·73

অনুশীলনী (পৃঃ 77—78 পৃঃ)

1. (গ)

	প্রথম দল		দ্বিতীয় দল	
	ওজাইভ	গণনাকৃত	ওজাইভ	গণনাকৃত
P_{10}	135·00	135·08	136·5	136·56
P_{30}	146·00	145·81	148·5	148·69
P_{60}	156·00	155·77	159·75	159·85
P_{90}	174·00	173·64	175·50	175·81

(ঘ)	প্রথম দল	দ্বিতীয় দল
155'র PR	58	47
163'র PR	83	78
170'র PR	85	84

(ঙ) প্রায় 40%

2.

স্কোর	: 95	90	80	70	60	50
শতাংশ বিন্দু	: 142·5	137·5	131·5	124·5	116·5	107
স্কোর	: 40	30	20	10	5	1
শতাংশ বিন্দু	: 102	96 5	91	82·5	79	64·5

3. PR 82 (গণিত)
PR 39 (ইংরাজী)

অনুশীলনী (পৃঃ 86—পৃঃ 87)

1. (i) $r=\cdot65$ (ii) $r=\cdot67$ (iii) $r=76$
(iv) $r=-\cdot69$ (v) $r=\cdot14$

2. (i) $r=-\cdot16$ (ii) $r=\cdot47$

অনুশীলনী (পৃঃ 91)

1. (ক) 469 ; 491 ; 274
   (খ) 262 ; 327 ; 567 ; 655
   (গ) 540 ; 180 ; 88
2. (ক) পঠন=136 ; লিখন=263
   (খ) পঠন=561 ; লিখন=483
   (গ) পঠন=721 ; লিখন=917

অতিরিক্ত অনুশীলনী (১) (পৃঃ 92—পৃঃ 97)

	মিন	মিডিয়ান	মোড	SD	Q_1	Q_3	Q
1.	19·66	20·03	20·77	3·25	18·89	22·26	1·69
2.	11·00	10·37	9·11	3·50	8·77	12·90	2·07
3.	19·66	19·30	18·58	6·24	15·33	24·40	4·5
4.	37·66	33·00	23·68	23·77	16·75	57·75	20·5
5.	20·30	20·71	21·53	5·12	16·41	24·05	3·8
6.	36·15	35·75	34·95	16·01	22·19	50·50	14·1
7.	88·33	84·50	76·84	18·39	73·82	102·31	14·2
8.	50·50	50·12	51·26	10·22	43·07	57·50	7·
13.	25·00	25·67	25·81	12·31	16·81	32·75	7·
14.	63·93	67·50	74·64	21·33	45·00	81·79	18·
15.	26·17	26·25	26·41	3·68	24·25	29·18	2·
16. (ক)	41·71	42·21	43·23	4·56	38·25	45·28	3
16. (খ)	32·83	32·13	30·75	13·93	19·72	41·41	10
17.	72·92	71·75	69·41	6·56	68·19	77·56	4
18.	74·10	74·64	75·72	8·79	68·89	79·75	
19.	106·00	105·83	105·49	—	—	—	
21.	12·17	12·06	—	5·22	—	—	
22.	4·40	4·50	4·70	—	—	—	
23.	10·88	—	—	5·06	—	—	

25. (ক) $r = \cdot 18$ (খ) $r = \cdot 49$

26. (ক) $r = -\cdot 16$ (খ) $r = \cdot 47$

List of Instincts and Emotions

(Page 35—Page 37)

	Instinct	Emotion
1.	Escape	Fear
2.	Combat	Anger
3.	Repulsion	Disgust
4.	Parental Instinct	Tender Emotion
5.	Appeal	Distress
6.	Mating	Lust
7.	Curiosity	Wonder
8.	Submission	Negative Self-Feeling
9.	Self-Assertion	Positive Self-Feeling
10.	Gregarious Instinct	Feeling of Loneliness
11.	Food-Seeking	Gusto
12.	Acquisition	Feeling of Ownership
13.	Construction	Feeling of Creating
14.	Laughter	Amusement

List of Propensities

Page 37—Page 38)

1. Food-seeking propensity
2. Disgust propensity
3. Sex propensity
4. Fear propensity
5. Curiosity propensity
6. Protective or parental propensity
7. Gregarious propensity
8. Self-assertive propensity
9. Submissive propensity
10. Anger propensity
11. Appeal propensity
12. Constructive propensity
13. Acquistive propensity
14. Laughter propensity
15. Comfort propensity
16. Rest or Sleep propensity
17. Migratory propensity

Guilford's Factors of Personality

(Page 48)

1. Social Introversion
2. Thinking introversion
3. Depression
4. Cycloid tendency
5. Rhathymia
6. General activity
7. Ascendance-Submission
8. Masculinity-Feminity
9. Inferiority
10. Nervousness
11. Objectivity
12. Co-operativeness
13. Agreeableness

Cattel's Factors of Personality

(Page 48)

1. Cyclothymia—Schizothymia
2. General Intelligence—Mental Defect
3. Emotional stability—General neuroticism
4. Dominance—Submission
5. Surgency—Desurgency
6. Positive character—Immature dependent character
7. Adventurousness—Introversion
8. Emotional sensitivity—Tough maturity
9. Paranoid schizothymia—Trustful accessibility
10. Bohemianism—Practical Concernedness
11. Sophistication—Simplicity
12. Suspiciousness—Truthfulness
13. Radicalism—Conservatism
14. Self-sufficiency—Lack of resolution
15. Will control and Character stability
16. Nervous tension